রণেশ দাশগুপ্ত রচনাসমগ্র

রণেশ দাশগুপ্ত রচনাসমগ্র

রণেশ দাশগুপ্ত রচনাসমগ্র

২য় খণ্ড

সম্পাদনা

সৌমিত্র শেখর

বাংলা একাডেমি ঢাকা

প্রথম প্রকাশ
আষাঢ় ১৪২১/ জুন ২০১৪

বাএ ৫২৪১
(অর্থবছর ২০১৩-২০১৪ গসঅবি: সংকলন ০৩)

মুদ্রণ সংখ্যা
১২৫০

পাণ্ডুলিপি
সংকলন উপবিভাগ
গবেষণা, সংকলন এবং অভিধান ও বিশ্বকোষ বিভাগ

প্রকাশক
শামসুজ্জামান খান
মহাপরিচালক
বাংলা একাডেমি ঢাকা ১০০০

মুদ্রক
সমীর কুমার সরকার
ব্যবস্থাপক
বাংলা একাডেমি প্রেস ঢাকা ১০০০

প্রচ্ছদ
অশোক কর্মকার

মূল্য
তিনশত টাকা মাত্র

Ranesh Dashgupta Rachanasamagra Dwitiyo Khando (Selected Works of Ranesh Dashgupta Vol 2) Edited by Dr. Soumitra Shekhar. Published by Shamsuzzaman Khan, Director General, Bangla Academy, Dhaka 1000, Bangladesh. First Published: June 2014. Price : 300 Taka Only.

ISBN 984-07-5250-7

ভূমিকা

'আমাদের দুর্গত জগতের তারাই সেরা মানুষ
নাম না বললেও তোমরা চিনবে
দীঘল সন্ধ্যাগুলির অগ্নিশিখাগুলিকে বুঝবে।'
–লুই আরাগঁ (রণেশ দাশগুপ্ত অনূদিত)

আলো দিয়ে আলো জ্বালাবার দায় নিয়ে যিনি বাংলা সাহিত্যে দিগন্তবিস্তারী কর্মযজ্ঞ আরম্ভ করেছিলেন এবং প্রগতির পথনির্মাণ করে প্রাতঃস্মরণীয় হয়ে আছেন উত্তর-প্রজন্মের কাছে, তিনি রণেশ দাশগুপ্ত (১৯১২–১৯৯৭)। তাঁর রচনাসমগ্র দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হল।

ক.

বাংলাদেশের বুদ্ধিবৃত্তিক আন্দোলনে অগ্রণী ছিলেন রণেশ দাশগুপ্ত। তিনি একাধারে সাংবাদিক, তাত্ত্বিক-রাজনীতিক, সৎ-সংগঠক, সাহিত্যবোদ্ধা ও সমালোচক। বহুক্ষেত্র-বিচরিত মানুষ হলেও তাঁর প্রতিটি পদক্ষেপের আত্মপ্রণোদনার উৎস কিন্তু চিন্তার নির্দিষ্টতা থেকে; আদর্শের নিগূঢ় আন্তঃপ্রেরণায়। তিনি সাহিত্য-বিবেচক, সংস্কৃতিচিন্তক, উত্তর-প্রজন্মের কাছে প্রগতির পথনির্দেশক। তিনি যেভাবে সাহিত্যবিবেচনা করেছেন, তাঁর এ বিবেচনা কোনো কঠিনতত্ত্বের বৃশ্চিক-বিষ্ঠাজাত নয়; নিজস্ব চিন্তনের উর্বর ভূমিতেই প্রোথিত এর মূল– রসের অমিত উৎস যেখানে দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদী দর্শন। শুদ্ধতর অর্থে বাংলাসাহিত্যচিন্তার প্রকাশটা বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় থেকেই শুরু,– রবীন্দ্রনাথে সৌন্দর্য, মনুষ্যত্ব আর ব্যাপকতার প্রতিষ্ঠা। প্রমথ চৌধুরী-বুদ্ধদেব বসু-আবু সয়ীদ আইয়ুব প্রমুখ একে নিয়ে এলেন বিকাশশীলতার মোহনায়, ব্যক্তি-জিজ্ঞাসার অম্বুজে। এরপর এই সাহিত্যচিন্তার দিকটি বিশেষ গুরুত্ব নিয়ে প্রতিষ্ঠিত হলো আমাদের বোধে। কালক্রমে এই সাহিত্যকে শুধুই 'অন্তর হতে আহরি বচন' বলতে না-রাজ যাঁরা, যাঁরা বলেন– সাহিত্যও হতে পারে সমাজবিকাশের অন্যতম মাধ্যম, শান্তির প্রণোদনা লুকিয়ে থাকে সাহিত্য-সংস্কৃতিতে, যাঁরা আরো একটু এগিয়ে মেহনত বা শ্রমের সঙ্গে যুক্ত করেন সাহিত্য ও সংস্কৃতিচর্চাকে– তাঁরা সাহিত্য-সংস্কৃতিকে নিয়ে

এলেন প্রগতির ধারায়, সমাজবদলের বাঁকে। ১৯৪৭-এর দেশভাগ, পাকিস্তানি শাসনামলের নিপীড়ন-নির্যাতনসহ নানা বৈরী পরিবেশের কারণে দেশত্যাগ করেন অনেকে। কিন্তু বৈরী সময়ের অভিঘাত মোকাবেলা করেই রণেশ দাশগুপ্ত হয়ে ওঠেন বাংলাদেশের প্রথম সারির বুদ্ধিজীবী। মুক্তিযুদ্ধ পরবর্তীকালেও রণেশ দাশগুপ্ত স্বাধীন দেশের সাহিত্য-সংস্কৃতি বিনির্মাণে অভিভাবকের ভূমিকা পালন করেছেন। সাতচল্লিশ-উত্তরকালে এ অঞ্চলে জন্মগ্রহণকারী রাজনৈতিক নেতা, সংস্কৃতিকর্মী প্রমুখ প্রায় দলে দলে যখন দেশত্যাগ করে ভারতে চলে গেছেন, সে সময় ভারতের আসামে জন্মগ্রহণকারী রণেশ দাশগুপ্ত থেকে যান পাকিস্তান অর্থাৎ আজকের বাংলাদেশে। আপাত দৃষ্টিতে এ এক বিপরীত সিদ্ধান্ত। তবে এই সিদ্ধান্ত এ অঞ্চল এবং এর মানুষকে গভীরভাবে ভালোবাসা থেকে জাত। শেষজীবনের কিছু সময় তাঁর কলকাতাবাস ঘটলেও তিনি বাংলাদেশের সাহিত্য-সংস্কৃতি-রাজনীতি নিয়েই ভাবিত ছিলেন, বাংলাদেশের মানুষের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগও ছিল প্রতিনিয়ত। যে কারণে তাঁর শব এসেছে বাংলাদেশে এবং তাঁর শেষকৃত্য সম্পন্ন করেছে এদেশের মানুষ, বাংলাদেশেরই মাটিতে। আমি ভারত সরকারের বৃত্তিপ্রাপ্ত গবেষক হিসেবে কলকাতার রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে পিএইচ.ডি. গবেষণা করি ১৯৯২ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ১৯৯৭ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত। সে সময় অসংখ্য দিন সুন্দরীমোহন এভিনিউস্থ পদ্মপুকুর বাসস্টপের কাছেই লেনিন স্কুলে রণেশ দাশগুপ্তের সান্নিধ্যে কাটিয়েছি, ঘরোয়া আলাপে-আলাপে ঋদ্ধ করেছি নিজেকে, জেনেছি অনেক কথা– তাঁর জীবনের, তাঁর সমকালের। ১৯৯৭ খ্রিষ্টাব্দের ১২ই অক্টোবর, রোববার কলকাতায় রণেশ দাশগুপ্তের একান্ত দীর্ঘ সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেছিলাম। ঢাকার দৈনিক *জনকণ্ঠ* পত্রিকায় ১৯৯৭ খ্রিষ্টাব্দের ১৪ই নভেম্বর সাক্ষাৎকারটি প্রকাশ পায়। দেখা যাচ্ছে, সেটি ছিল তাঁর শেষ সাক্ষাৎকার। আমার গৃহীত সেই সাক্ষাৎকার এবং রণেশ দাশগুপ্তের স্মৃতিকথা *কখনো অতসী কখনো চম্পা*-র আলোকে রণেশ দাশগুপ্তের 'জীবনকথা' তুলে ধরা হল।

খ.

রণেশ দাশগুপ্তের জন্ম ১৯১২ খ্রিষ্টাব্দের ১৫ই জানুয়ারি। তাঁর মা ইন্দুপ্রভা (সেন) দাশগুপ্ত প্রসব-পূর্বকালে গিয়েছিলেন নিজের পিত্রালয় আসামের ডিব্রুগড়ে। ইন্দুপ্রভার পিতা কালীমোহন সেন ছিলেন ঐ অঞ্চলের নামকরা লোক। অবশ্য কালীমোহনের আদি নিবাস ছিল বিক্রমপুরের সোনারঙ গ্রামে। তাঁর আসামের বাড়িতেই রণেশ দাশগুপ্তের জন্ম। ছেলেবেলায় রণেশ দাশগুপ্তের ডাকনাম ছিল খোকা। তাঁর পিতা অপূর্বরত্ন দাশগুপ্ত ছিলেন নামী ফুটবলার। মোহনবাগান, কুমারটুলি ইত্যাদি নামকরা দলের মতো আর একটি দল 'স্পোর্টিং ইউনিয়ন' ক্লাবের হয়ে তিনি খেলতেন। সেই খেলার সূত্রেই তাঁর কলকাতায় বসবাস। ছাত্রাবস্থায় বিয়ে করেছিলেন তিনি, পরে রণেশ দাশগুপ্তের জেঠামশাই নিবারণচন্দ্র দাশগুপ্তের কল্যাণে বিহারের রাঁচিতে এ.জি. অফিসে অপূর্বরত্নের চাকরি হয়। রণেশ দাশগুপ্তের জন্মের আগেই অপূর্বরত্ন স্ত্রীসহ রাঁচিতে চলে যান। নিবারণচন্দ্র ছিলেন ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন মানুষ, পুরুলিয়া জেলা স্কুলের প্রধান শিক্ষক এবং মনেপ্রাণে গান্ধীবাদী। মহাত্মা গান্ধীর আহ্বানে তিনি চাকরি ছেড়ে অহিংস

আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন ; তাঁর পুত্র বিশিষ্ট লেখক, পরে সংসদ সদস্য বিভূতিভূষণ দাশগুপ্ত। রণেশ দাশগুপ্তের জন্মের পর চাকরির কারণে অপূর্ব্বরত্নকে রাঁচি থেকে পুনায় যেতে হয়। এ সময় প্রথম বিশ্বযুদ্ধের উত্তাপে উত্তপ্ত ভারত। শংকা সবার মনেই। সিদ্ধান্ত হয় ইন্দুপ্রভা সন্তানসহ থাকবেন নিবারণচন্দ্রের বাড়িতে, পুরুলিয়ায়। তাই রণেশ দাশগুপ্তের শৈশব কাটে এই পুরুলিয়াতে, জেঠুর তত্ত্বাবধানে। চার ভাই, পাঁচ বোনের মধ্যে রণেশ দাশগুপ্ত ছিলেন মা-বাবার দ্বিতীয় সন্তান, কিন্তু প্রথম পুত্র। এই পরিবারের প্রথম সন্তানের নাম প্রতিভা দাশগুপ্ত, ডাকনাম ডলি। রণেশ দাশগুপ্তের অন্য ভাইবোনের কয়েকজন হলেন: শেফালি দাশগুপ্ত (খুকি), প্রবীর দাশগুপ্ত, অজিত দাশগুপ্ত (ছুটু)। পুরুলিয়ায় রামপদ পণ্ডিতের পাঠশালায় রণেশ দাশগুপ্তের হাতেখড়ি হয়। পরে রাঁচি জেলা স্কুল থেকে তিনি ম্যাট্রিক পাস করেন ১৯২৯ খ্রিস্টাব্দে। বিজ্ঞানে পড়বেন বলে ভর্তি হলেন বাঁকুড়া খ্রিশ্চিয়ান কলেজে, কিন্তু সেখান থেকে রাজনৈতিক কারণে তাঁকে বহিষ্কার করা হয়। ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দের জুলাই মাসে রণেশ দাশগুপ্তের নেতৃত্বে তিনজন ছাত্র বাঁকুড়ায় ভারতীয় পতাকা উত্তোলন করেন। আর এই 'অপরাধে'ই বহিষ্কার করা হয় তাঁকে। রাজনীতির সঙ্গে রণেশ দাশগুপ্ত জড়িয়েছিলেন স্কুলজীবনেই। পার্শ্ববর্তী টেকনিক্যাল স্কুলের ছাত্র হরিপদ দে তাঁকে ব্রিটিশবিরোধী স্বদেশী আন্দোলনের পথে আকৃষ্ট করেন। হরিপদ দে'র কাছ থেকে প্রাপ্ত বই ও নানা রাজনৈতিক রচনা পাঠ করে রণেশ দাশগুপ্ত গুপ্ত-সংগঠন 'অনুশীলন'-এর সঙ্গে সম্পৃক্ত হন। বাঁকুড়া খ্রিশ্চিয়ান কলেজ থেকে বহিস্কৃত হবার পর তাঁকে ভর্তি করে দেয়া হলো কলকাতা সিটি কলেজে। থাকতেন রামমোহন ছাত্রাবাসে। সেখানেও রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়েন তিনি। রাষ্ট্রের জন্য বিপজ্জনক গ্রন্থ সংরক্ষণ ও পঠন-পাঠনের কারণে এ সময় পুলিশি হানা হয় তাঁর কক্ষে। ১৯৩১ খ্রিস্টাব্দে তিনি দ্বিতীয় বিভাগে আই.এস.সি. পাস করেন ঐ কলেজ থেকে। পাস করার পর রণেশ দাশগুপ্তকে পাঠিয়ে দেয়া হলো বরিশালে এবং সেখানে তিনি ভর্তি হলেন ব্রজমোহন (বি.এম.) কলেজে। বরিশালে তিনি উঠলেন তাঁর আর এক জেঠু সত্যানন্দ দাশের বাড়িতে। সত্যানন্দ দাশ কবি জীবনানন্দ দাশের বাবা। অর্থাৎ জীবনানন্দ দাশ রণেশ দাশগুপ্তের জেঠতুতো দাদা। বি. এম. কলেজে ইংরেজি সাহিত্যে অনার্স নিয়ে বি. এ. শ্রেণিতে ভর্তি হন রণেশ দাশগুপ্ত। বিজ্ঞান ত্যাগ করে মানবিকী শাখায় ভর্তি হলেও তাঁর ভাষাজ্ঞান, বিশেষ করে ইংরেজি ভাষার ওপর দখল অন্যদের চমকে দিতো এবং সে-সূত্রেই তিনি 'ভালো ছাত্র' বলে কলেজে পরিচিতি পেয়ে যান। কিন্তু বিদেশি সাহিত্য পড়া আর পরীক্ষায় পাস এক নয়। তাই তাঁর প্রাতিষ্ঠানিক লেখাপড়া ওখানেই শেষ। আসলে বরিশালে বাস করার সময়ও রণেশ দাশগুপ্ত রাজনীতির সঙ্গে সম্পর্ক রাখেন গভীরভাবে। জেঠুর বাড়ি 'সর্বানন্দ ভবন'-এ তাঁর রাজনৈতিক বন্ধুদের সমাগমের কারণে মাত্র তিন-চার মাসের মধ্যে তাঁকে জেঠুর বাড়ি ত্যাগ করে কলেজ হোস্টেলে উঠতে হয়। সত্যানন্দ দাশ ব্রজমোহন স্কুলের প্রধান শিক্ষক ছিলেন। তার চেয়ে বড় কথা এই পরিবারটি রাজনীতিমুক্ত এবং ব্রাহ্মধর্মাবলম্বী সদাচারী পরিবার হিসেবে বরিশালে সর্বজন শ্রদ্ধেয় ছিল। এই পরিবার রণেশ দাশগুপ্তের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড ভালো চোখে দেখে নি। বি.এ. পাস না করেই ১৯৩৩ খ্রিস্টাব্দে বরিশাল থেকে তিনি ঢাকায় চলে আসেন। ১৯৩১ খ্রিস্টাব্দে রণেশ

দাশগুপ্তের বাবা আহত হয়ে চাকরি থেকে অবসর নেন এবং বিক্রমপুরের বাড়ি নদীতে ভেঙে যাওয়ায় এর পরের বছর ঢাকার লক্ষ্মীবাজারে একটি বাড়ির দোতলায় ভাড়াটিয়া হিসেবে আসেন। বাড়ির হোল্ডিং নম্বর সম্পর্কে রণেশ দাশগুপ্ত স্মৃতি থেকে বলেছেন: '১৪ কে.জি. গুপ্ত লেন।' ১৯৩৮ খ্রিস্টাব্দে রণেশ দাশগুপ্তের পিতা অপূর্বরত্নের মৃত্যু হলে তাঁরা তাঁতিবাজারে চলে আসেন। বরিশাল থেকে ঢাকায় এসেও তিনি সম্পর্ক রাখেন অনুশীলন গ্রুপের সঙ্গে এবং কমিউনিস্ট গোপাল বসাক, নলিন্দ্র সেন, মুকুল বোস প্রমুখের নেতৃত্ব প্রখরতায় কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে যুক্ত হন।

কলকাতার পাশাপাশি ঢাকাতে তখন বিচ্ছিন্নভাবে আধুনিক সাহিত্যচর্চা হচ্ছে। বুদ্ধদেব বসু, অজিত দত্ত ছাত্রাবস্থাতেও বেশ নাম করেছেন। এই আধুনিক সাহিত্যের বাইরে সম্প্রদায়ের উর্ধ্বে উঠে প্রগতি সাহিত্যের বাতাবরণ প্রথম সৃষ্টি করেন রণেশ দাশগুপ্তরা। তাঁরা বুদ্ধদেব বসু-জীবনানন্দ দাশদের সাহিত্যধারার বাইরে, কলাকৈবল্যবাদের অতি মাখামাখিকে অস্বীকার করে নতুন সাহিত্যধারার পত্তন করেন। ঢাকার 'মুসলিম সাহিত্য-সমাজ' (১৯২৬) সম্পর্কে এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন: ''সাহিত্য-সমাজের' আন্দোলন প্রগতিশীল ঠিকই কিন্তু তা সম্প্রদায়ের উর্ধ্বে নয়। মুসলিমদের কুসংস্কারাচ্ছন্নতা দূর করার লক্ষ্যে এর গঠন। পরে তো এর নাম হলো 'মুসলিম সাহিত্য-সমাজ'। আমরাই প্রথম সম্প্রদায়িকতার উর্ধ্বে উঠে শোষণহীন সমাজ গঠনের প্রত্যয়ে মেহনতি মানুষের জন্যে সাহিত্য– এই শ্লোগানে এগিয়ে গেলাম।' হীরেন মুখার্জি লন্ডন থেকে ভারতে ফিরে এসে ১৯৩৮ খ্রিস্টাব্দে সর্বভারতীয় মুক্তমনা কবি-সাহিত্যিকদের রচনা নিয়ে 'প্রগতি' নামে একটি সংকলন প্রকাশ করেন। ঐ বছরই গড়ে ওঠে 'প্রগতি লেখক সংঘ'। এটি মূলত লন্ডন ফেরতদের সংগঠন হয়ে দাঁড়িয়েছিল। কিন্তু আবু সয়ীদ আইয়ুব এতে যোগ দিলে সর্বস্তরে সংগঠনটির গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি পায়। উত্তর ভারতের প্রেমচান্দ, সাজ্জাদ জহির প্রমুখের লেখা এই সংগঠনের সদস্যদের উদ্বুদ্ধ করেছিল। ঢাকাতেও এর প্রভাব পড়ে। ১৯৪০ খ্রিস্টাব্দে রণেশ দাশগুপ্ত ও অচ্যুত গোস্বামীর যৌথ সম্পাদনায় *ক্রান্তি* নামে একটি সংকলন প্রকাশ পায়। *ক্রান্তি* এর পরও বের হয়েছে। আগে বিষয় নির্দিষ্ট করে দিয়ে তার পর লেখকদের কাছ থেকে *ক্রান্তি*র লেখা নেয়া হতো। রণেশ দাশগুপ্ত *সোনার বাংলা* পত্রিকারও সহযোগী সম্পাদক ছিলেন; এর সম্পাদক ছিলেন নলিনীকিশোর গুহ। *সোনার বাংলা* অনুশীলন সমিতির লোকদের পরিচালনায় প্রকাশ পেতো। ১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দে ম্যাক্সিম গোর্কির মৃত্যু হয়। এই পত্রিকাতেই রণেশ দাশগুপ্তের প্রথম লেখা– গোর্কির ওপর, প্রকাশ পায়। স্মরণার্হ, *সোনার বাংলা* পত্রিকাতেই শামসুর রাহমানের প্রথম লেখা প্রকাশ পায়। এই পত্রিকাতে লেখা দিতে এসে তরুণ অচ্যুত গোস্বামী পরে প্রগতিকেন্দ্রিক চিন্তাধারার প্রতি আকৃষ্ট হন এবং তাঁকে এই চিন্তার প্রতি আকর্ষণ করেন রণেশ দাশগুপ্ত। পরে অচ্যুত গোস্বামীর ঘরই হয়ে ওঠে প্রগতি লেখক সংঘের প্রথম ঠিকানা। *বাংলা উপন্যাসের ধারা* অচ্যুত গোস্বামীর গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ। অচ্যুত গোস্বামীকে রণেশ দাশগুপ্ত প্রগতি লেখক সংঘের দিকে আকৃষ্ট করলেও এই পথে রণেশ দাশগুপ্তকে আকৃষ্ট করেন সোমেন চন্দ। সোমেন চন্দ রণেশ দাশগুপ্তের চেয়ে বয়সে ছোট ছিলেন কিন্তু ছিলেন সৃষ্টিশীল লেখক। আর এ সময় কিরণশঙ্কর সেনগুপ্তও মূলত তাত্ত্বিক

আলোচক হিসেবেই বিবেচিত ছিলেন। ১৯৪০ খ্রিস্টাব্দে ঢাকায় হিন্দু-মুসলিমের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হয়। এর প্রতিরোধে উদ্যোগী হন প্রগতি লেখক সংঘের সবাই। কাজী আবদুল ওদুদ এই সংঘের সভায় সভাপতিত্ব করেন। সোমেন চন্দের 'দাঙ্গা' গল্পটি এ সময়ই লেখা। দাঙ্গা বিরোধী জনমত সংগ্রহের সময় তিনি অনেক উদার মুসলিম লিগারের সাহায্যও পেয়েছিলেন। তখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলছে। কমিউনিস্ট পার্টি এ সময় 'জনযুদ্ধ' তত্ত্বটি প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করে। এই তত্ত্বকে সামনে নিয়ে ১৯৪২ খ্রিস্টাব্দে আয়োজন করা হলো ফ্যাসিবাদ বিরোধী সম্মেলন। সোমেন চন্দ এই সম্মেলনে রেল-রোড ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের পক্ষ থেকে যোগ দিতে আসার পথে নিহত হন। সোমেন চন্দের মৃত্যুর পর প্রগতি লেখক সংঘে অজিত গুহসহ অনেকে যুক্ত হন এবং এটি ঢাকার সাহিত্যিক পরিমণ্ডলে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে।

দ্বিজাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে ভারত-বিভক্তির (আগস্ট ১৯৪৭) পর মা, চার বোন ও এক ভাই অর্থাৎ পরিবারের সদস্যদের নিয়ে রণেশ দাশগুপ্ত ঢাকাতেই থাকেন। এ সময় কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যদের ওপর পাকিস্তান সরকারের নির্যাতনের মাত্রা বেড়ে যায়। হিন্দুদেরও বিবেচনা করা হয় পাকিস্তানের শত্রু হিসেবে। এ সব সূত্রে রণেশ দাশগুপ্তের ওপরও নেমে আসে নানা সরকারি নির্যাতন। পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্য বিপদ্‌জনক বিবেচনায় ১০ই মার্চ, ১৯৪৭ তারিখে তাঁকে গ্রেফতার হন। পরে শেখ মুজিবুর রহমানের আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে ১৫ই মার্চ রণেশ দাশগুপ্ত ও বন্দি ধরণী রায় মুক্তি পান। চার মাস পর আবার এ দুজনকে গ্রেফতার করা হয় এবং বিনা বিচারে আটক থাকেন তাঁরা। পাকিস্তানে এ দুজনই প্রথম বিনাবিচারে আটক রাজবন্দি। অবশ্য পরে বাঙালিদের বিনাবিচারে আটক রাখা পাকিস্তান সরকারের জন্য 'স্বাভাবিক কর্মে' পরিণত হয়েছিল। বিনাবিচারে নানা জেলে দীর্ঘ সময় আটক থাকাকালে রণেশ দাশগুপ্ত রাজবন্দিদের শিরোমণিতে পারিণত হন। এ সময় কখনো তিনি বন্দিদের নিয়ে আন্দোলন করেছেন, কখনো তাঁদের শিক্ষা দিয়েছেন বিশ্বসাহিত্য, রাজনীতি বা সংস্কৃতির রূপান্তর-প্রসঙ্গ। এ সময়ের মধ্যে ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দের জগৎখ্যাত ভাষা আন্দোলন অনুষ্ঠিত হয়। যশোর, রাজশাহী ইত্যাদি জেল থেকে বদলি হয়ে রণেশ দাশগুপ্তের ঠাঁই হয় ঢাকা জেলে। ১৯৫৩ খ্রিস্টাব্দে ২১শে ফেব্রুয়ারি ভাষা আন্দোলনের প্রথম বার্ষিকীতে জেলখানাতেই অভিনয় করার উপযোগী একটি নাটক লেখার জন্য রণেশ দাশগুপ্ত অনুরোধ করেন আরেক বন্দি মুনীর চৌধুরীকে। রণেশ দাশগুপ্ত অনুরোধের পরিপ্রেক্ষিতেই রচিত এবং জেলখানাতে অভিনীত হয় মুনীর চৌধুরীর বিখ্যাত নাটক *কবর*। জেলখানাতে অবস্থানকালেই তিনি উর্দু ভাষা ভালোভাবে শিখে ফেলেন। পরে উর্দু কবিদের কবিতা অনুবাদের ক্ষেত্রে তিনি দক্ষতার পরিচয় দেন। ১৯৫৫ খ্রিস্টাব্দের বিনাবিচারে আটক রাজবন্দি রণেশ দাশগুপ্ত মুক্তিলাভ করেন। ১৯৫৭ খ্রিস্টাব্দে মওলানা ভাসানীর নেতৃত্বে ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (ন্যাপ) গঠিত হলে কমিউনিস্টরা ন্যাপে যোগ দেন। প্রায় এ সময় থেকেই দৈনিক *সংবাদ* বামপন্থীদের মুখপত্র হিসেবে প্রকাশ হতে থাকে এবং রণেশ দাশগুপ্ত এ পত্রিকায় যোগ দেন। এর পর *সংবাদ*-এর সঙ্গে রণেশ দাশগুপ্তের বাংলাদেশে অবস্থানকালে সম্পর্ক আর কখনো ছিন্ন হয় নি। শহীদ সাবেরের পর 'মধুব্রত' ছদ্মনামে *মনে মনে* শিরোনামে কলামটি

সংবাদ-এ লিখেছেন তিনি। নিয়মিত অন্য লেখাতো ছিলই। *সংবাদ*-এর সাহিত্যপাতা 'রবিবাসরীয়' সম্পাদনার দায়িত্বও ছিল তাঁর ওপর। পরে 'লোক লোকালয়ে' শিরোনামেও একটি নতুন কলাম লিখেছেন তিনি। ১৯৫৮ খ্রিস্টাব্দে মুসলিম লিগের প্রার্থীকে পরাজিত করে কমিউনিস্ট পার্টির প্রার্থী হিসেবে ঢাকা মিউনিসিপ্যালিটির কমিশনার নির্বাচিত হন রণেশ দাশগুপ্ত। নির্বাচনে পঁয়ত্রিশটি পদের মধ্যে পঁচিশটি পদ পায় মুসলিম লীগ, বাকি পদগুলো পায় আওয়ামী লীগসহ অন্যান্য বিরোধী দল। কমিউনিস্ট পার্টির প্রার্থীদের মধ্যে একমাত্র তিনিই নির্বাচিত হন। জ্ঞান চক্রবর্তী পোস্টার ছাপানোর দায়িত্বে ছিলেন এবং রণেশ দাশগুপ্তকে 'প্রখ্যাত লেখক' বলে অভিহিত করে পোস্টারের কথা লিখেছিলেন। কমিশনার নির্বাচিত হবার পর তাঁতিবাজারে তিনি বাস করতেন। কারণে এতে মানুষ সহজেই তাঁর দেখা পেতে পারে। কিন্তু তাঁর থাকবার ঘরটি ছিল অতিছোট ও আড়ম্বরহীন। এ সময়ই তিনি দৈনিক *সংবাদ* পত্রিকায় লেখালেখি করেন এবং এর পর থেকে এই পত্রিকার গুরুত্বপূর্ণ একজন হয়ে ওঠেন। পরে জমিল শরাফী নামে অনেক গ্রন্থ সম্পাদনা করেছেন তিনি। ১৯৭৫ খ্রিস্টাব্দে *সংবাদ* পত্রিকার অধীনে প্রতিষ্ঠিত লালন প্রকাশনী থেকে *সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কাব্যসংকলন* প্রকাশিত হয় জমিল শরাফীর সম্পাদনায়। অবশ্য স্বনামে তিনি পাকিস্তান আমলে বাংলা বাজার খান ব্রাদার্স এন্ড কোম্পানি থেকে জীবনানন্দ দাশের কাব্যসম্ভার সম্পাদনা করেন। এক বছরের মধ্যে এই গ্রন্থের দুটো সংস্করণ শেষ হয়। এটিই বাংলাদেশে জীবনানন্দচর্চার প্রথম উদ্যোগ। তাঁর সম্পাদিত এই গ্রন্থের মাধ্যমে বাংলাদেশের মানুষ এক গ্রন্থে পুরো জীবনানন্দ-কাব্য প্রথম হাতে পায়। পরে অবশ্য আবদুল মান্নান সৈয়দ এ দেশে জীবনানন্দচর্চায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন। 'রেজা' ছদ্মনামেও তিনি কিছু লেখা লিখেছেন। ১৯৫৫ খ্রিস্টাব্দে বিনাবিচারে আটক অবস্থায় জেলখানা থেকে মুক্তির পর ১৯৬২ খ্রিস্টাব্দে আবার তাঁকে গ্রেফতার করা হয়, ১৯৬৩ খ্রিস্টাব্দে মুক্তি পান তিনি; ১৯৬৫ সালে পাক-ভারত যুদ্ধের কারণে পাকিস্তান সরকার তাঁকে গ্রেফতার করলে ১৯৬৮ সালে তিনি মুক্তি পান। ১৯শে মে, ১৯৬৮ তারিখে দৈনিক *সংবাদ*-এর প্রথম পাতায় 'শ্রীরণেশ দাশগুপ্ত ও সত্যেন সেনের মুক্তিলাভ' শিরোনামে এই খবর ছাপা হয়: 'প্রখ্যাত সাহিত্যিক-সাংবাদিক শ্রীরণেশ দাশগুপ্ত ও শ্রীসত্যেন সেন দীর্ঘ আড়াই বৎসরাধিক কাল কারাগারে আটক থাকার পর গতকাল (শনিবার) অপরাহ্ণে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছেন। ১৯৬৫ সালের ১৫ই সেপ্টেম্বর শ্রীসত্যেন সেনের দেশরক্ষা আইনে আটক করা হয়। ঢাকার ডেপুটি কমিশনার কর্তৃক উভয়ের গতিবিধি ঢাকা পৌর এলাকার মধ্যে নিয়ন্ত্রণ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, ৬০ বৎসর বয়স্ক শ্রীসত্যেন সেন বিভিন্ন সময় প্রায় বিশ বৎসর এবং শ্রীরণেশ দাশগুপ্ত প্রায় বার বৎসর কারাগারে অতিবাহিত করেন। এখানে উল্লেখ্য যে, সত্যেন সেন টিউমার, হাঁপানি প্রভৃতি রোগে আক্রান্ত হইয়া অত্যধিক দুর্বল হইয়া পড়িয়াছেন। মুক্তিপ্রাপ্ত শ্রীরণেশ দাশগুপ্ত ও শ্রীসত্যেন সেন গতকল্য এক বিবৃতিতে প্রদেশের বিভিন্ন কারাগারে আটক রাজবন্দীর মুক্তি দাবি করিয়াছেন। এই সকল রাজবন্দীর মধ্যে রহিয়াছেন ন্যাপ ও আওয়ামী লীগের নেতা ও কর্মী, কৃষক ও শ্রমিক সংগঠনের নেতা ও কর্মী এবং ছাত্র নেতা ও কর্মী।' বিভিন্ন সময়

যাঁদের সঙ্গে রণেশ দাশগুপ্ত জেলে ছিলেন তাঁরা হলেন: শেখ মুজিবুর রহমান, তাজউদ্দিন আহমদ, তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া, কফিলউদ্দিন আহমদ চৌধুরী, কোরবান আলী, গাজী গোলাম মোস্তফা, সত্যেন সেন, মুনীর চৌধুরী, জ্ঞান চক্রবর্তী, শহীদুল্লা কায়সার, সরদার ফজলুল করিম, কামাল লোহানী, মহাম্মদ আমিন প্রমুখ। জেলে বাসকালেও তিনি সমাজবাদী সাহিত্যচর্চা ও প্রগতিশীল চিন্তাধারা অব্যাহত রেখেছিলেন। এই জেলবাসের সময় বাদ দিলে ১৯৫৫ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৯৭১ পর্যন্ত তৎকালীন পূর্বপাকিস্তানে প্রগতিশীল আন্দোলন-সংগ্রামের কেন্দ্রে যে মানুষটি ছিলেন, তিনি রণেশ দাশগুপ্ত। একই সঙ্গে তিনি ঢাকা ও ঢাকার বাইরে প্রগতিশীল চিন্তা ও আন্দোলন-সংগ্রামের আলো দিয়ে আলো জ্বালিয়েছেন। নবীন সাহিত্যকর্মী, সংস্কৃতিকর্মী, সংবাদকর্মী, রাজনৈতিককর্মী সৃষ্টিতে তাঁর ভূমিকা প্রাতঃস্মরণীয় ও ঐতিহাসিক। মুক্তিযুদ্ধে তাঁর ভূমিকা ছিল বলিষ্ঠ। পাকিস্তানি আগ্রাসন থেকে মুক্তি ও বাঙালির স্বাধীনতা অর্জনের লড়াইয়ে তিনি ছিলেন অন্যতম পথদ্রষ্টা।

স্বাধীন বাংলাদেশে রণেশ দাশগুপ্ত হয়ে উঠেছিলেন বাঙালির প্রধান বুদ্ধিজীবী। স্বাধীনতা-উত্তর সংবাদপত্রের পাতায় প্রায় প্রতিদিনই তাঁর কোনো না কোনো বক্তব্য-বিবৃতির উল্লেখ পাওয়া যাবে। এ সময় প্রকাশিত পত্রিকাসমূহের বিশেষ সংখ্যা, একুশে বা স্বাধীনতা-বিজয় দিবসে প্রকাশিত শত শত সংকলন ইত্যাদিতে রণেশ দাশগুপ্তের কোনো না কোনো লেখা ছিলই। তাঁর লেখা না থাকলে পত্রিকার গুরুত্বই যেন কমে যেত। ঢাকাসহ দেশের নানা স্থানের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে তিনি প্রধান অতিথি হিসেবে যোগ দিয়েছেন। অর্থাৎ স্বাধীন বাংলাদেশকে শোষণমুক্ত বাংলাদেশ হিসেবে গড়ার নব-আন্দোলনে মহানন্দে মেতে উঠেছিলেন রণেশ দাশগুপ্ত। কিন্তু ১৯৭৫ খ্রিস্টাব্দের আগস্ট মাসে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে সপরিবারে হত্যার মাধ্যমে সৃষ্ট হওয়া অন্ধকারের রাজনীতি সে আনন্দ ও আন্দোলনে ছেদ টানে। এর পর প্রলম্বিত হয় হত্যার ঐ রাজনীতি। নভেম্বরে জেলখানায় হত্যা করা হয় জাতীয় চার নেতা নজরুল ইসলাম, তাজউদ্দিন আহমদ, মনসুর আলী, মো. কামরুজ্জামানকে। এই গোপন হত্যার রাজনীতি এবং ক্ষমতার হাতবদল ঘটতেই থাকে। এ সময় ঔপন্যাসিক শওকত ওসমান, আবু জাফর শামসুদ্দীন প্রমুখ সাহিত্যিক-সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব দেশত্যাগ করে ভারতে আশ্রয় নেন। ১৯৭৫ খ্রিস্টাব্দের অক্টোবরের শেষ সপ্তাহে রণেশ দাশগুপ্ত বিমানের ফেরত টিকিটসহ ব্যক্তিগত কাজে গিয়েছিলেন কলকাতায়। পঁচাত্তরের নভেম্বরে ঘটে যাওয়া বাংলাদেশের ঘটনাবলি এবং বন্ধুদের অনুরোধ বাংলাদেশে ফেরা থেকে তাঁকে নিবৃত্ত করে। এর পর কলকাতা-জীবন তাঁর। এ সময় বেশ কয়েকটি স্থান-বদ্‌লে অবস্থান ঘটে তাঁর। প্রথমে ওঠেন দাদার কড়েয়ার ফ্লাটে, পরে ভাগ্নেদের বালিগঞ্জ প্লেসের বাসায়, সেখান থেকে ভাইপোর পলতার বাড়িতে বা সেখানেই বোনের বাড়িতে। কিছু দিন তিনি বঙ্গেশ্বর রায়ের ব্রাইট স্ট্রিটের বাসায় থাকেন এবং পরে ওঠেন *শান্তি-স্বাধীনতা-সমাজতন্ত্র* পত্রিকার ওরিয়েন্ট রো'র কার্যালয়ে। ১৯৮৭ খ্রিষ্টাব্দ অবধি এভাবে অস্থায়ী ঠিকানাসমূহে অবস্থান করার পর ওরিয়েন্ট রো থেকে রণেশ দাশগুপ্ত প্রায় একটি স্থায়ী ঠিকানা পান 'লেনিন স্কুলে'। এর ডাক-ঠিকানা: পি-৪৩, সুন্দরীমোহন এভিন্যু, কলকাতা-৭০০০১৪। কলকাতার এন্টালি এলাকার বাসস্টপ পদ্মপুকুর থেকে

লেনিন স্কুল ছিল দুমিনিটের হাঁটাপথ। লেনিন স্কুল সিপিআইয়ের পরিত্যক্ত প্রশিক্ষণভবন এবং এর আগে মুখপত্র *কালান্তর*-এর কার্যালয় ছিল। অত্যন্ত আড়ম্বরহীনভাবে, অনেকটা পরমুখাপেক্ষী হয়ে বার্ধক্যতাড়িত শেষজীবন এখানেই তাঁকে অতিবাহিত করতে হয়েছে। বার্ধক্যজর্জর হওয়ার আগ পর্যন্ত কলকাতায় প্রগতিশীল লেখক-শিল্পীদের কিছু অনুষ্ঠানে তিনি অংশ নিয়েছেন। তবে উল্লেখ করার বিষয়, অর্থকষ্টসহ কলকাতায় অবস্থান করলেও ভারতের নাগরিকত্ব বা মাসিক ভাতা গ্রহণের প্রস্তাব তিনি ফিরিয়ে দিয়েছিলেন। সেখানে অবস্থান করেও বাংলাদেশের পত্রিকায় তিনি লিখেছেন, বাংলাদেশ থেকে গ্রন্থ প্রকাশ করেছেন। ১৯৯৭ খ্রিস্টাব্দের আগস্ট থেকে তাঁর শরীরিক অবস্থার চরম অবনতি ঘটতে থাকে। ৪ঠা নভেম্বর কলকাতার পিজি হাসপাতালে তাঁর মৃত্যু হয়। বাংলাদেশ-ভারত সরকারের যৌথ আয়োজনে রণেশ দাশগুপ্তের মরদেহ ৫ই নভেম্বর বাংলাদেশে এসে পৌঁছে এবং পর দিন ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয় তাঁর শেষকৃত্য। শেষকৃত্য অনুষ্ঠানের আগে আজীবন সংগ্রামী, ধীমান সাহিত্য-সংস্কৃতি ব্যক্তিত্ব, প্রথিতযশা প্রাবন্ধিক অকৃতদার রণেশ দাশগুপ্তের মরদেহে শেষশ্রদ্ধা জানাতে কেন্দ্রীয় শহিদ মিনারে স্মরণকালের বিশাল জনসমাবেশ ঘটে।

গ.

রণেশ দাশগুপ্ত রচনাসমগ্র ২য় খণ্ডে স্থান পেয়েছে তাঁর ছয়টি গ্রন্থ। এগুলো হলো: *ল্যাটির আমেরিকার মুক্তিসংগ্রাম, মুক্তিধারা, রহমানের মা ও অন্যান্য, সেদিন সকালে ঢাকায়, সাম্যবাদী উত্থান প্রত্যাশা : আত্মজিজ্ঞাসা; কখনো চম্পা কখনো অতসী*। এগুলো প্রবন্ধ, গল্প, কলামরচনা, আত্মজীবনীমূলক বই। এই খণ্ডভুক্ত রণেশ দাশগুপ্তের *ল্যাটিন আমেরিকার মুক্তিসংগ্রাম* একটি কালোত্তীর্ণ গ্রন্থ। বিগত শতাব্দির শেষার্ধের সূচনাকালে ল্যাটিন আমেরিকার মানুষ আন্দোলন-সংগ্রাম করে বিশ্বব্যাপী সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়। এর আগে এই বিরাট অঞ্চলের লোক-সংগ্রাম বা মানুষের জীবনযাপন সম্পর্কে অন্যরা খুব কমই অবগত ছিল। তবে বার বার অভ্যুত্থান ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অনুগত বাহিনীর ক্ষমতাদখল সম্পর্কেও অনেকে জানতেন এবং তারা ধরেই রেখেছিলেন এই বিশাল অঞ্চলের কোনো ভবিষ্যত নেই। রণেশ দাশগুপ্ত তুলনা করেছেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র একটি বিরাট মৎস্য আর ল্যাটিন আমেরিকার দেশগুলি সেই মৎস্যের পোনার মতো তাকে অনুসরণ করে; জাতিসংঘে মার্কিনিদের অন্ধভাবে সমর্থন দেয়, মার্কিন স্বার্থের পরিপন্থী কিছু করে না। ১৯৫৯ খ্রিস্টাব্দে কিউবায় ফিদেল ক্যাস্ট্রোর নেতৃত্বে অভ্যুত্থান ও সেখানে গণসরকার প্রতিষ্ঠিত হলে সে সংবাদ বিশ্বময় মার্কিনবিরোধীদের আশার সঞ্চার করে এবং ল্যাটিন আমেরিকার অন্য দেশের জনগণকেও উজ্জীবিত করে। ১৯৬২ খ্রিস্টাব্দে দ্বীপদেশ কিউবাকে জাহাজ নিয়ে সর্বাত্মক আক্রমণ করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। কিন্তু প্রায় এককোটি কিউবান সম্মিলিতভাবে সে আক্রমণ প্রতিরোধ করলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র অনুধাবন করতে পারে যে, সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে কিউবাতে এবং ফিদেল ক্যাস্টো সঠিকভাবেই এর নেতৃত্ব দিয়ে চলেছেন। শুধু কিউবার জনগণের দিশারী হিসেবেই নন, ক্যাস্টোর নেতৃত্বে ১৯৬৬ খ্রিস্টাব্দে কিউবার রাজধানী হাভানাতে স্থাপিত হয় ত্রিমহাদেশীয় অর্থাৎ আফ্রো-

এশীয়-ল্যাটিন আমেরিকার মুক্তিসংগ্রাম সংস্থা। এটি আফ্রিকা, এশিয়া, ল্যাটিন আমেরিকার দরিদ্র বিশাল জনগোষ্ঠীকে জাতীয় মুক্তির পথপ্রদর্শনে কাজ করে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র শোষণের মাধ্যমে এই অঞ্চলের সম্পদ কুক্ষিগত করে। পেট্রোল-তেল, মুক্তা, কয়লা, লোহা, সোনা, রূপা, হীরা, প্লাটিনাম, তামা এবং আখ, কলা, কফি, কোকোর অফুরান্ত সম্পদের অধিকারী হলেও এই অঞ্চলের মানুষের ক্ষুধা, দারিদ্র্য, অপুষ্টি, অকালমৃত্যুতাড়িত হয়ে জীবন কাটায়। তারা জানেই না, এতো সম্পদের অধিকারী হয়েও কেন এই দীন অবস্থা তাদের। চেতনার স্তরটিই অনেক নিচে। এই চেতনার স্তর ঊর্ধ্বমুখী করণে কোনো কার্যকর পদক্ষেপ গৃহীত হয়নি আগে। ল্যাটিন আমেরিকার কোনো কোনো দেশের অধিকাংশ মানুষ তিরিশ বছরের নিচে বাঁচে; কোনো কোনো দেশের শতকরা চল্লিশ ভাগ মানুষ পনের বছরের মধ্যে মারা যায়! কি বীভৎস বাস্তবতা! একদিকে স্থানীয় সামন্তবাদী শোষণ অন্য দিকে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের আগ্রাসন– এই দুই ধারার শোষণের কারণে ল্যাটিন আমেরিকার মানুষের জীবন পশুর মতোই হয়ে পড়ে। বলিভিয়ায় সামন্তপ্রভুরা পরস্পরের মধ্যে জমি হস্তান্তর করার সময় অথবা ভূমির দাম সাব্যস্ত করার সময় 'পিয়োন' বা ভূমিদাসসহ দাম করে। এরচেয়ে অমানবিক প্রথা আর কী হতে পারে? রণেশ দাশগুপ্ত তাঁর *ল্যাটিন আমেরিকার মুক্তিসংগ্রাম* গ্রন্থে ল্যাটিন আমেরিকার দেশগুলো করুণ অবস্থা বাঙালি পাঠকের সামনে তুলে ধরেছেন। তাঁর প্রত্যাশা এমনতর, এখান থেকে বাঙালি অনেকটাই শিখতে পারবে। ল্যাটিন আমেরিকাবাসীদের এই অবস্থা বাঙালিদের অবস্থার সঙ্গে তুলনীয় বটে। কারণ, ব্রিটিশ ও পাকিস্তানিদের দীর্ঘ শোষণের ফলে বাঙালিরাও হয়ে পড়ে শোষণের ক্রীড়নকে। শোষিত হয়ে পুতুলসদৃশ মানুষগুলো প্রতিবাদ করতেও ভুলে যায়। ল্যাটিন আমেরিকায় এরই মধ্যে কয়েকজন জনপ্রিয় ও জনদরদী মানুষ এগিয়ে আসেন। এঁরা কেউ কেউ নির্বাচিতও হন। কিন্তু কাঙ্ক্ষিত কর্ম তাঁরা করতে পারেননি। কারণ, অপসারণ, বন্দি বা হত্যার শিকার হন তাঁরা। ব্রাজিল, গুয়েতেমালা ইত্যাদি দেশে নির্বাচিত সরকারকে উৎখাত বা হত্যাও করা হয়। মার্কিনিরাই এটা করে। কিন্তু ধ্রুবতারার মতো চে গুয়েভারা পথ দেখান তরুণ প্রজন্মকে। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের হাতে নিহত হলেও এই বিপ্লবী সমগ্র ল্যাটিন আমেরিকার অসমাপ্ত বিপ্লবকে এগিয়ে নেবার প্রতীকে পরিণত হন। রণেশ দাশগুপ্ত এই গ্রন্থে চে গুয়েভারাকে প্রকৃত নায়কের মর্যাদায় অভিষিক্ত করেছেন এবং দেখিয়েছেন চে কিভাবে উত্তর-প্রজন্মকে প্রভাবিত করেছেন। তাঁর এ গ্রন্থটিকে একনজরে দেখা যেতে পারে এভাবে: প্রথমেই 'যে পরিপ্রেক্ষিতে দেখা' শিরোনামে রণেশ দাশগুপ্ত তাঁর গ্রন্থরচনার প্রেক্ষাপটটি বর্ণনা করেছেন। তিনি লিখেছেন যে, ল্যাটিন আমেরিকার জাতীয় মুক্তিসংগ্রামের স্তরগুলি সে অঞ্চলেরই বিভিন্ন দেশে নানারূপ। তারপরও সে কথকতা ভালোভাবে বুঝতে হবে। রণেশ দাশগুপ্তের ভাষায়: 'এই বিষয়টিকে আমাদের চোখের সামনে রাখতে হচ্ছে মুক্তিসংগ্রামের বিভিন্ন প্রশ্নকে বুঝবার জন্য। সশস্ত্র সংগ্রামের তত্ত্ব চে গুয়েভারা প্রমুখের বই থেকে সংগ্রহ করতে হবে। এই সব বইতে যে সব নীতিগত বিশ্লেষণ আছে তার দুয়েকটি লাইন তুলে কোনো একটি বক্তব্য পেশ করা দুঃসাধ্য। তবু করতে হবে। এরই পাশাপাশি যৌথ গণশক্তি গড়ে তোলার জন্যে যে সংগ্রাম চলছে, তার কথা অতি সামান্যই জনতে পারা

গিয়েছে। এ সম্বন্ধে বক্তব্য তুলে ধরাও সহজ নয়।' রণেশ দাশগুপ্ত লিখেছেন, তা-ও করতে হবে। কারণ এক মহাদেশের সংগ্রাম থেকে অন্য মহাদেশে, এক দেশের সংগ্রাম থেকে অন্য দেশে সংগ্রামের আলো জ্বালাতে হবে। তাঁর অভিপ্রায়টি রণেশ দাশগুপ্তের রাজনৈতিক চেতনানুসারে স্বাভাবিক। এর পর তিনি লেখেন 'মহাদেশের মধ্যে মহাদেশ'। এই অংশটি মূলত আমেরিকা মহাদেশ ভূখণ্ডের সাধারণ পরিচিতি। এখানে পশ্চিম গোলার্ধের আমেরিকা মহাদেশের মধ্যে যে আরেক মহাদেশ অবস্থিত এবং সেখানে ভাষা ও সংস্কৃতির ভিন্নতা আছে; আছে আর্জেন্টিনা, বলিভিয়া, ব্রাজিল, চিলি, কলম্বিয়া, কোস্টারিকা, কিউবা, ডোমিনিকান প্রজাতন্ত্র, ইকুয়েডর, এল সালভাদর, গুয়াতেমালা, হাইতি, হন্ডুরাস, মেক্সিকো, নিকারাগুয়া, পানামা, প্যারাগুয়ে, উরুগুয়ে, ভেনিজুয়েলা, পেরুর মতো বিশটি দেশ– সেকথাই লিখেছেন রণেশ দাশগুপ্ত। 'আদিবাসীরা কোথায়' শিরোনামে রণেশ দাশগুপ্ত লিখেছেন কিভাবে এই বিরাট অঞ্চল থেকে আদিবাসীরা হারিয়ে যায়। তিনি মোটামুটি একটি পরিসংখ্যান দিয়ে দেখিয়েছেন, আদিবাসী কত শতাংশ, কত শতাংশ মিশ্র জনগোষ্ঠী, কত শতাংশ শ্বেতাঙ্গ। পর ভাষা ও সংস্কৃতির আগ্রাসন এই অঞ্চলের স্বাতন্ত্র্যকে ম্লান করে। 'স্পেন ও অন্যান্য ইউরোপিয় রাজ্যের ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্য' শিরোনামে স্পেনসাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা ও এর অধীনে একের পর এক অঞ্চলগুলোর অধিভুক্তির মাধ্যমে স্বাতন্ত্র্য বিনষ্টের কথা লিখেছেন লেখক। তিনি ইতিহাসের ধারাবাহিকতায় কিভাবে স্পেন সাম্রাজ্য ধ্বংস হয়ে বিভিন্ন প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা পায় সেকথাও উল্লেখ করেন। 'অসমাপ্ত গণতান্ত্রিক প্রজাবিপ্লব– সাবেকী ও নয়া প্রতিবন্ধক' শিরোনামে লেখক লিখেছেন, ১৮২৫ খ্রিস্টাব্দে ল্যাটিন আমেরিকা থেকে স্প্যানসাম্রাজ্যের পতন আরম্ভ হয় কিন্তু এ সময় স্বাধীন দেশগুলো তাদের নিজস্ব শাসনব্যবস্থা গড়ে তুলতে পারেনি। তবে কোনো কোনো দেশ, বিশেষ করে কিউবা একটি নতুন পথ দেখায় এবং তাহলো সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ সংগ্রাম। এই সংগ্রামকে রণেশ দাশগুপ্ত অভিহিত করেছেন জাতীয় মুক্তিসংগ্রাম' বলে। তিনি 'কিউবার জাতীয় মুক্তিসংগ্রাম– উনিশ শতকে' শিরোনামে লেখেন, ১৮৯৫ খ্রিস্টাব্দে জোস মার্তিনের নেতৃত্বে যে গণসংগ্রাম সূচিত হয় তার ধারাবাহিকতাতেই পরে ফিদেল ক্যাস্টোর নেতৃত্বে মুক্তি পায় কিউবা। তাই জোস মার্তিন কিউবায় জাতীয় বীর হিসেবেই পরিচিত এবং তাঁর সমাধিতে পুষ্পশ্রদ্ধা প্রদান করা হয় সরকারিভাবে। রণেশ দাশগুপ্ত বোঝাতে চেয়েছেন, সংগ্রামের নানা স্তর থাকে– সেই স্তর অতিক্রমের জন্যও চাই প্রস্তুতি। যেমনটি হয় মেক্সিকোতে। ১৮৬১ খ্রিস্টাব্দে ফ্রান্স মেক্সিকোতে সেনাবাহিনী নামিয়ে মেক্সিকোর সার্বভৌমত্ব কেড়ে নেয়। জনসংগ্রামের মাধ্যমে অবশ্য সে সার্বভৌমত্ব ফিরে আসে। সে কথাই আছে এই গ্রন্থের 'মেক্সিকোতে ঘাতপ্রতিঘাত' অংশে। এভাবে রণেশ দাশগুপ্ত তাঁর এ গ্রন্থে 'সাম্রাজ্যবাদী অর্থপুঁজি নিয়োগের সূত্রপাত'; 'বৃহৎ ভূস্বামী প্রথা ল্যাটিফুরিয়া ও সাম্রাজ্যবাদের মিতালি'; 'মধ্য আমেরিকার কয়েকটি দেশে'; 'নয়া ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যবাদী শোষণের ক্ষেত্র'; 'প্রথম বিশ্বযুদ্ধ এবং দৃশ্যপটের পরিবর্তন'; 'মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের প্রাধান্য'; 'দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তরকালে মার্কিনি সাম্রাজ্যবাদের একচ্ছত্র তৎপরতা'; 'মুক্তিসংগ্রামী গেরিলাদের বিরুদ্ধে মার্কিনি তাঁবেদার গেরিলা প্রয়োগ'; 'মার্কিনি প্রাধান্যেও হাল আমলের জমা-খরচ (১)'; 'হাল

আমলের মার্কিনি জমা-খরচ (২)'; 'ল্যাটিন আমেরিকার বিকলাঙ্গ অর্থনৈতিক কাঠামো'; 'মার্কিন অগ্রগতির জন্য মৈত্রী (এলায়েন্স ফর প্রগ্রেস)'; 'সামরিক সাহায্যের পরিণতি'; 'জাতীয় গণমুক্তি সংগ্রামের অব্যাহত ধারা'; 'কিউবার সর্বাত্মক বিপ্লব'; 'স্বাধীনতা সংগ্রামীদের শিবিরে তাত্ত্বিক পরিস্থিতি'; 'প্রথম ও. এল. এ. এস সম্মেলন'; 'ত্রিমহাদেশীয় সম্মেলন'; 'সাংস্কৃতিক বিপ্লবের ইশারা' শিরোনামে এই গ্রন্থে মূলত ল্যাটিন আমেরিকাভুক্ত দেশগুলোর পূর্বাবস্থা, সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসনের শিকার হয়ে মানুষের হীন জীবনযাপন, সাম্রাজ্যবাদী শক্তির অমানবিক নিধনযজ্ঞ, এর বিরুদ্ধে জনগণতান্ত্রিক সংগ্রামের সূচনা, প্রথমে ব্যর্থতা, পরে সাফল্য, এই সাফল্যের পেছনে দেশপ্রেমিকদের জীবনোৎসর্গের কথকতা ইত্যাদি অত্যন্ত আন্তরিকতার সঙ্গে উল্লেখ করা হয়েছে এই গ্রন্থে। ভাবতে অবাক লাগে, তথ্য ও গ্রন্থাবলি সহজপ্রাপ্তির এই যুগেও ল্যাটিন আমেরিকার মানুষের সংগ্রাম সম্পর্কে সাধারণভাবে মানুষের জানার পরিধি যেখানে সীমায়িত সেখানে ঘটনার প্রায় সমকালে অর্থাৎ গত শতকেই রণেশ দাশগুপ্ত এই সংগ্রাম সম্পর্কে সম্যকভাবে ওয়াকিবহাল ছিলেন। শুধু ওয়াকিবহালই ছিলেন না, নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি থেকে এই সংগ্রামের একটি তাত্ত্বিক কাঠামো দাঁড় করিয়ে বাঙালিকে জাগ্রত করতে চেয়েছেন নিশ্চয়।

মুক্তিধারা গ্রন্থটির একটি উপশিরোনাম যুক্ত করেছেন রণেশ দাশগুপ্ত: 'বাংলাদেশের অভ্যুদয় বিশ্বপ্রেক্ষা'। এ বইটি যদিও ১৯৮৯ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশ পায় তবু গ্রন্থভুক্ত অনেক প্রবন্ধই রচিত এবং সাময়িকপত্রে বা গ্রন্থে প্রকাশিত এর প্রায় আঠার-উনিশ বছর আগে। প্রবন্ধের শিরোনামগুলো স্মরণ করা যাক: বাংলাদেশের জাতীয় মুক্তি-সংগ্রামের গতিপ্রকৃতি; শ্রেণিদৃষ্টিতে বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামের চিত্তভূমি; দুই পর্বে একুশে ফেব্রুয়ারি, বাংলাদেশ; স্বাধীনতা দিবসে হিসাবের খাতায় জমা-বিপ্লব; ২৪শে এপ্রিলের শহীদদের স্মরণে; বলি বলি করি, বলিতে না পারি; নৈরাশ্যবাদী একাকীত্ব সম্পর্কে; সাম্যবাদী প্রত্যয়ের প্রশ্নে; মার্কসবাদ কি অপ্রস্তুত?; প্রসঙ্গ রলাঁ: শান্তি স্বাধীনতা সাম্য। এর প্রথম প্রবন্ধ 'বাংলাদেশের জাতীয় মুক্তি-সংগ্রামের গতিপ্রকৃতি' প্রকাশ পায় কলকাতা থেকে ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত সংকলন-গ্রন্থ *রক্তাক্ত বাংলায়*। দ্বিতীয় প্রবন্ধ 'শ্রেণিদৃষ্টিতে বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামের চিত্তভূমি'ও ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দেই বের হয় কলকাতার বিখ্যাত *পরিচয়* পত্রিকার 'বাংলাদেশ সংখ্যায়'। 'দুই পর্বে একুশে ফেব্রুয়ারি, বাংলাদেশ' নামের প্রবন্ধটিও *পরিচয়* পত্রিকায় বের হয়, ১৯৮৭ খ্রিস্টাব্দের শারদীয় সংখ্যায়। 'স্বাধীনতা দিবসে হিসাবের খাতায় জমা-বিপ্লব' প্রবন্ধটি বের হয় ১৯৮৮ খ্রিস্টাব্দে ঢাকা থেকে প্রকাশিত সিপিবি-র মুখপত্র সাপ্তাহিক *একতা* পত্রিকার স্বাধীনতা দিবস সংখ্যায়। '২৪শে এপ্রিলের শহীদদের স্মরণে' প্রবন্ধটি বের হয় কলকাতা থেকে প্রকাশিত সিপিআই-এর মুখপত্র *দৈনিক কালান্তর*-এর ২৪শে এপ্রিল, ১৯৮৮ সংখ্যায়। 'বলি বলি করি, বলিতে না পারি' প্রবন্ধটি পূর্বে প্রকাশিত কি-না এর তথ্যসূত্র পাওয়া যায় না। 'নৈরাশ্যবাদী একাকীত্ব সম্পর্কে' প্রবন্ধটি ১৯৭৫ খ্রিস্টাব্দে ঢাকা থেকে সাপ্তাহিক *একতা*-র একুশে ফেব্রুয়ারি সংখ্যায় প্রকাশ পায়। 'সাম্যবাদী প্রত্যয়ের প্রশ্নে' প্রবন্ধটি প্রকাশ পায় ১৯৭৯ খ্রিস্টাব্দে কলকাতা থেকে প্রকাশিত *বুদ্ধিজীবী ও নানা প্রশ্ন* সংকলন-গ্রন্থে। 'মার্কসবাদ কি অপ্রস্তুত?' প্রবন্ধটিও

ঢাকা বামপন্থীদের পরিচালনায় প্রকাশিত মাসিক *মুক্তির দিগন্ত* পত্রিকার মার্চ, ১৯৮৬ সংখ্যায় প্রকাশ পায়। এই গ্রন্থের শেষ প্রবন্ধ 'প্রসঙ্গ রলাঁ: শান্তি স্বাধীনতা সাম্য' প্রকাশিত হয় ১৯৮৮ খ্রিস্টাব্দে কলকাতার শারদীয় *কালান্তর* পত্রিকায়। এই গ্রন্থের প্রথম প্রবন্ধে রণেশ দাশগুপ্ত বাংলাদেশের জাতীয় মুক্তিসংগ্রামকে পাঁচ ভাগে ভাগ করে নিয়েছেন। এগুলো হচ্ছে, রণেশ দাশগুপ্তের ভাষায়: 'প্রথম অংশ ১৯৪৭ থেকে ১৯৭১ পর্যন্ত চব্বিশ বছরের ঘটনাবলীর একটা চুম্বক। পর্যায়ের পর পর্যায়ে যে ঘটনা-ধারা দ্বন্দ্বাত্মক গতিপথে অগ্রসর হয়ে ১৯৪৭-'৪৮ সালের নিয়মতান্ত্রিক গণতন্ত্র ও প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের অধিকার আদায়ের আন্দোলন থেকে বৈপ্লবিক গণতন্ত্রের সংগ্রামে এবং সার্বভৌম স্বাধীনতা ঘোষণায় উপনীত হলো ১৯৭১ সালে, এখানে তার ক্রমাত্মক দিকগুলি ধরা পড়বে। দ্বিতীয় অংশ হচ্ছে পূর্ব বাংলাকে যে বিশেষ ঔপনিবেশিক শোষক ও শাসকচক্রের বিরুদ্ধে উপরি-উক্ত চব্বিশ বছর ধরে লড়াই করে আসতে হয়েছে এবং ১৯৭১ সালের যে চক্রের বিরুদ্ধে পূর্ব বাংলাকে সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধে নিয়োজিত হতে হলো, তার চরিত্র-বিচার তথা শ্রেণি-নির্ণয় ও গোষ্ঠী-চিহ্নিত। পূর্ব বাংলার মুক্তিসংগ্রাম যে প্রথমাবধি সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী মুক্তিসংগ্রাম এবং ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ ও যে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী মুক্তিযুদ্ধ, সেটিও এখানে মূল বিবেচ্য। তৃতীয় অংশ হচ্ছে বৈপ্লবিক দৃষ্টিভঙ্গিতে জাতীয় মুক্তিসংগ্রামে সঞ্চালক শক্তিগুলির শ্রেণিগত ভূমিকা ও গুণাগুণ-বিচার এবং সে দিক থেকে মুক্তিসংগ্রামের চরিত্র নির্ণয়। সে পরিপ্রেক্ষিতেই এই সব শক্তির ভবিষ্যৎ গতি পরিণতিও এই অংশে আলোচ্য। চতুর্থ অংশ হচ্ছে, পূর্ব বাংলার জাতীয় মুক্তিসংগ্রামের সংগ্রামী অতীতের এবং বিশেষ করে নিকট অতীতের যে উপাদানগুলি কাজ করছে কিংবা করতে যাচ্ছে, তার মূল্যায়ন। পঞ্চম অংশ হচ্ছে, পূর্ব বাংলার মুক্তিসংগ্রামের আন্তর্জাতিকতা-নির্ণয়।' লেখক ১৯৪৭ থেকে ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দকে আবার সময় বিবেচনায় বার ভাগে ভাগ করেছেন। তিনি বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামের ভবিষ্যত উজ্জ্বল বলে অভিমত প্রদান করেন, তবে লেখেন– যদি জনগণের সম্পৃক্ততা ধরে রাখা যায়। পরের প্রবন্ধে লেখক বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামকে শ্রেণিদৃষ্টিতে ব্যাখ্যা করেছেন। তাঁর অভিমত– 'এখানে লোক-অভ্যুদয়ের ব্যাপারটিকে প্রাথমিকভাবেই যাচাই করে নিতে গেলে দেখা যাবে, কয়েকটি নির্দিষ্ট বিষয়ে লক্ষ্য অর্জনে ব্রতী গণ-আন্দোলন শ্রেণিসজ্জার দিক দিয়ে পরিমাণগতভাবে বৃদ্ধি পেয়ে আসছে।' প্রবন্ধের শেষে তিনি মন্তব্য করেছেন: 'স্বাধীন শোষণমুক্ত বাংলা ছাত্রসমাজ এবং মেহনতী মানুষের উভয়েরই চিন্তা চেতনার ফসল।' তাঁর এ মন্তব্য যথাযথ। 'দুই পর্বে একুশে ফেব্রুয়ারি, বাংলাদেশ' প্রবন্ধে রণেশ দাশগুপ্ত বাংলাদেশ সৃষ্টির পেছনে একুশের আন্দোলনকেই মুখ্য বিবেচনা করেছেন। তিনি লিখেছেন– প্রথম পর্বে অর্থাৎ ১৯৫২-এর একুশের ফেব্রুয়ারিতে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের অন্তর্কাঠামো গড়ে উঠেছে। আর দ্বিতীয় পর্বে বার বার ফিরে এসেছে একুশে। তাঁর ভাষায়: 'দ্বিতীয় পর্বেও একুশে ফেব্রুয়ারির নিরন্তর অভ্যুদয় ও অবিরত দায়িত্বের ব্যাপারটা হচ্ছে প্রথম পর্বের সম্পন্ন করা অথবা অগ্রসর করে দেয়া কাজগুলিকে একই সঙ্গে রক্ষা ও প্রসারিত করা এবং এদের অবলম্বন করেই মুক্তিযুদ্ধে অর্জিত স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বকে জাতীয়তা, গণতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা ও সমাজতন্ত্রের নীতি ও আদর্শ অনুসারে জনজীবনে বাস্তবায়িত

ও ফলপ্রসূ করে তোলার নির্মাণ প্রকল্পে কর্মসূচি ও প্রেরণা জোগানো।' লেখকের 'স্বাধীনতা দিবসে হিসাবের খাতায় জমা-বিপ্লব' প্রবন্ধটি তিনি রচনা করেছেন স্বাধীনতা লাভের সতের বছর পর। তিনি মুক্তিযুদ্ধকে ব্যাখ্যা করেছেন লেনিনের ভাষায়। তাই একে বলেছেন: 'বিপ্লবী পরিস্থিতি বলা যেতে পারে, সেটা একাত্তরে বাংলাদেশে এসেছিল। দ্বিতীয়ত, সঙ্গে সঙ্গেই এই পরিস্থিতি সেভাবে মুক্তিযুদ্ধে রূপান্তরিত হয়েছিল, সেটা ছিল বিপ্লব এবং সফল বিপ্লব। সাম্রাজ্যবাদের তল্পীবাহক তদানীন্তন শাসকচক্র ঝাড়ে-বংশে জনগণ থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল। তারা তাদের মনিবদের কড়া প্রহরায় সুরক্ষিত প্রশাসনের সমস্ত ব্যবস্থাপনা থেকে পুরোপুরি বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল। এরই পাশাপাশি বিপ্লবী পরিস্থিতিতে সমস্ত গণতান্ত্রিক মুক্তিসংগ্রামী ধারাগুলি একটি কেন্দ্রবিন্দুর অভিমুখী হয়েছিল এবং বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সামগ্রিক অসহযোগের কর্মপন্থাকে বাস্তবায়িত করার ব্যবস্থা করে এবং স্বাধীনতা ঘোষণা করে বাংলাদেশের শ্রমিক-কৃষক-যুব-ছাত্র-ছাত্রী-বুদ্ধিজীবী ও নারীসমাজসহ জনগণের সকল অংশের, সমাজবিপ্লবী ও প্রগতিবাদী রাজনৈতিক পার্টি, গণসংগঠন এবং ব্যক্তি ও সংস্থার অভিমত ও আকাঙ্ক্ষার ঈপ্সিত পদক্ষেপটি নিয়েছিলেন, বিপ্লব সম্পাদিত হয়েছিল।' বঙ্গবন্ধু যে 'বিপ্লব সম্পাদিত' করেছিলেন এই মন্তব্যটি ঐ সময় কোনো বামপন্থীর লেখনী থেকে প্রকাশ করা খুব সহজ ছিল না। রণেশ দাশগুপ্ত সেই সাহসী ব্যক্তি, যিনি বোধ দিয়ে ব্যাখ্যা করেছেন জাতীয় ঘটনাবলি। তাই অন্য বামপন্থী বা কমিউনিস্ট পার্টির অভিমতের সঙ্গে তাঁর মতের পার্থক্য বিস্তর। রণেশ দাশগুপ্ত তাঁর '২৪শে এপ্রিলের শহীদদের স্মরণে' প্রবন্ধে রাজশাহীর ঐতিহাসিক খাপড়া ওয়ার্ডে ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দে শাসকদের গুলিতে সাতজন বামপন্থীর শহিদ হওয়াকে স্মরণ করে লিখেছেন: '২৪শে এপ্রিলের শহীদেরা আমাদের উপমহাদেশের সামগ্রিক স্বাধীনতা সংগ্রাম ও সমাজ বদলের লড়াই-এর মধ্য থেকে বেরিয়ে এসেছেন। তাঁরা বিশ্ববিপ্লবের অংশ এবং সেই দিক থেকেও আদরণীয় ও স্মরণীয়।' রণেশ দাশগুপ্তের 'বলি বলি করি, বলিতে না পারি' প্রবন্ধে উপমহাদেশের উর্দুভাষী কবি ফয়েজ আহমদ ফয়েজের ঢাকা সফরের সময় বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ-এর সঙ্গে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও সুভাষচন্দ্র বসুর দেখা হবার তুলনা করেছেন। তাঁদের অনেক কথা ও অনেক অব্যক্ত কথার উল্লেখই এই প্রবন্ধের মূল। 'নৈরাশ্যবাদী একাকীত্ব সম্পর্কে' প্রবন্ধে নৈরাজ্যবাদ এবং তা থেকে একাকীত্ববোধ আধুনিকতার লক্ষণ বলে পাশ্চাত্যের মতো বাংলাদেশেও যারা মনে করেন তাদের সম্পর্কে এই প্রবন্ধে রণেশ দাশগুপ্ত বলেছেন: 'এই একাকীত্বের নৈরাশ্যবাদী দর্শন ঘনীভূত ও সংক্রমিত হতে হতে নৈরাশ্যবাদের জন্য পাকাপাকি ঘাঁটি তৈরি করতে পারে।' রণেশ দাশগুপ্তের 'সাম্যবাদী প্রত্যয়ের প্রশ্নে' প্রবন্ধে তিনি বলেছেন: 'সাম্যবাদী প্রত্যয়কে যাচাই করে নিতে হবে আন্তর্জাতিক সাম্যবাদী সহযোগিতার মারফত।' গত শতকের আটের দশকে খুব গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন ছিল মার্কসবাদ নিয়ে। অনেকে প্রশ্ন করেছেন: মার্কসবাদ কি অপ্রস্তুত আধুনিক পৃথিবীর সমস্যা মোকাবিলায়? রণেশ দাশগুপ্ত সে সময় লেখেন 'মার্কসবাদ কি অপ্রস্তুত' প্রবন্ধটি। এই প্রবন্ধে তিনি পৃথিবীব্যাপী মার্কসবাদীদের কর্ম তুলে ধরে সিদ্ধান্ত দিয়েছেন: 'অবশ্যই এই প্রচণ্ড ধৈর্যশীল, দৃঢ় এবং সঙ্গে সঙ্গে নমনীয় কোমল মহান বিপ্লবী মার্কসবাদের

সূত্রগুলিকে যখনই চেয়েছেন তখনই হাতে পেয়েছেন কঠোর সাধনার ফল হিসেবে।' অর্থাৎ মার্কসবাদ সময়ের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিয়ে পারে। বিপ্লবীদের দায়িত্ব হলো যুগোপযোগী করে মার্কসবাদকে গ্রহণ করা। 'প্রসঙ্গ রলাঁ : শান্তি স্বাধীনতা কাম্য' প্রবন্ধে রোমাঁ রলাঁর কর্মময় জীবন সংক্ষেপে আলোচনা করে রণেশ দাশগুপ্ত উল্লেখ করেছেন তিনি ছিলেন দেশে দেশে বিপ্লবীদের বন্ধু ও অনুপ্রেরণাদায়ী। সব মিলিয়ে *মুক্তিধারা* প্রবন্ধ গ্রন্থটি রণেশ দাশগুপ্তের চিন্তাধারাকে বাংলাদেশ ও বিশ্ব-পরিপ্রেক্ষিতে চমৎকার ও সুদৃঢ়ভাবে প্রকাশ করেছে।

রহমানের মা ও অন্যান্য একটি গল্পগ্রন্থ। রণেশ দাশগুপ্ত কিছু গল্প লিখেছেন এবং তা পত্রপত্রিকায় প্রকাশ পেয়েছে। সেগুলো থেকেই এগারটি গল্প নিয়ে বের হয় এই বই। এ বইয়ে পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা প্রাসঙ্গিক স্কেচ ছিল। রণেশ দাশগুপ্তের আরো কিছু অগ্রন্থিত গল্পের সন্ধান পাওয়া যায়। *রহমানের মা ও অন্যান্য* গ্রন্থের গল্পগুলো প্রচলিত গল্প থেকে বেশ ভিন্ন ধরনের। এখানে বানিয়ে বলা গল্প নেই, গল্পে অতিরেকও কম। বাংলা সাহিত্যে বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় (বনফুল)-এর গল্পের সঙ্গেই একমাত্র এর তুলনা করা চলে। কারণ লেখক এখানে লক্ষ্যভেদী ব্যাধের মতো নির্দিষ্ট বিষয়কে অবলম্বন করে নির্দিষ্ট লক্ষ্যে উপনীত হয়েছেন। গল্পে বহিরঙ্গীয় পারিপাট্যের চেয়ে বক্তব্য-বিষয়ই প্রধান। যেমন, গ্রন্থের প্রথম গল্প 'রহমানের মা'। একজন শহিদের মা পর্দানশিন থাকার পরও স্বাধীনতা-উত্তর দেশগঠনে কিভাবে নিজেকে সম্পৃক্ত করতে চেয়েছেন এবং সে ক্ষেত্রে পর্দা তার জন্য প্রতিবন্ধক হয়নি– গল্পে এ কথাই বলা হয়েছে। 'দাগী' গল্পে মে দিবস উপলক্ষে শ্রমিক ঐক্য প্রতিষ্ঠায় গুলির মুখেও বুক পেতে দেবার কথা বর্ণনা করা হয়েছে। 'জাত কুস্তি' গল্পে দেখানো হয়েছে হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গা ও অনৈক্যের যুগেও মৈত্রী ও ঐক্যের সুর ও কথা। দিলওয়ার হোসেন নামের এক মুসলিম কুস্তি তারই সহকর্মী ও কুস্তি গোপাল বসাকের বীরত্বপূর্ণ কর্মের বর্ণনা দেয় এই গল্পে। 'গিরিধারী প্রসাদ' গল্পে এক অবাঙালির কর্তব্যজ্ঞান বর্ণিত হয়েছে। গত শতকের চল্লিশের দশকে ভারত জুড়ে যখন রাজনৈতিক অস্থিরতা বিরাজমান তখনও ঢাকায় কর্মরত গিরিধারী প্রসাদ অন্যের দোকানের চাবির তত্ত্বাবধায়ক। দাঙ্গায় সে নিহত হলে তার কাছে অন্যান্য জিনিসের সঙ্গে একটি চিঠিও পাওয়া যায়। তার স্ত্রীর লেখা। তার স্ত্রী লিখেছে: দেশের এই অবস্থায় স্ত্রীর চাবির চাইতে মানবের চাবি গিরিধারীর কাছে বড় হলো? 'সিঁদুরের ফোটা' গল্পে ১৯৬৪ খ্রিস্টাব্দের হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গার সময় এক মুসলিম অধ্যাপিকার সিঁদুরের ফোটা পরে দাঙ্গার বিরুদ্ধে প্রতিবাদের কথা উঠে এসেছে। 'মাল্যদান' গল্পে শহিদ মিনারে মাল্যদানকালে ফুলের মালা বার বার স্থানচ্যুত হয়ে পড়ায় আয়োজক জনৈক অধ্যাপক তাঁর ছাত্রদের ভারি কিছু আনতে পরামর্শ দেন, যাতে তার চাপায় মালা তিনি রাখতে পারেন। দেখা যায়, শহিদের দুটো মাথার খুলি কুড়িয়ে আনে তার ছাত্ররা। সেই মাথার খুলিই সমস্ত শহিদের পক্ষে শ্রদ্ধার মালা পায়। 'লোহা লাল হবার সময়' গল্পে একজন পুলিশ অফিসারের কথা উঠে এসেছে। যে পুলিশ অফিসার ১৯৬৮ খ্রিস্টাব্দের উত্তাল দিনগুলোতে ঢাকা সিটিতে কর্মরত ছিলেন এবং যিনি একদিন বিপদগ্রস্ত এক বিশ্ববিদ্যালয়-ছাত্রীকে দায়িত্বের সঙ্গে সহযোগিতা করেছিলেন, তিনি মুক্তিযুদ্ধের সময় শহিদ হন। কারণ তিনি বাঙালির পক্ষে অবস্থান নিয়েছিলেন।

'বংশীধারী' গল্পে কমল নামের এক বাঁশিবাদকের মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ ও শহিদ হওয়ার কথা আছে। যে কমল বাঁশির ছিদ্রে আঙুল দিয়ে সুর তুলতো, সেই কমলই ট্রিগারে আঙুল রেখে শহিদ হয়। 'লুৎফর রহমান' গল্পে লুৎফর রহমান নামের এক বামপন্থী কয়েদির সরকার বিরোধী গুরুত্বপূর্ণ চিঠি বা কাগজপত্র গিলে খেয়ে ফেলার কথা আছে। অবশেষে টিবি হয়ে রক্তবমি করে মৃত্যু হয় তার। তবু গুরুত্বপূর্ণ কাগজ সে সরকারি লোকদের হাতে পড়তে দেয়নি। 'কার পায়ে খুন গো' গল্পে মুক্তিযুদ্ধকালের একটি ঘটনাকে বাণীরূপ প্রদান করা হয়েছে। 'কাঁথা সিলাই হইছে, নিশ্চিন্ত' গল্পে ১৯৫৫ খ্রিস্টাব্দের একুশে ফেব্রুয়ারির পর যাদের গ্রেফতার করা হয় তাদের কয়েকজনের কথা বলা হয়েছে। জেলের মধ্যে তাদের নিজেদের কর্ম ও আদর্শের কথা, নারীদের গ্রেফতার হওয়া ইত্যাদি উঠে এসেছে এই গল্পে। গল্পে এক কয়েদির স্ত্রী পোস্টকার্ডে চিঠি লেখে জানায়: কাঁথা সেলাই হয়েছে, সে যেন নিশ্চিন্ত থাকে। কয়েদির স্ত্রীর এই কথা বহুমাত্রিক সন্দেহ নেই। প্রকৃতপক্ষে রণেশ দাশগুপ্তের এই গল্পগ্রন্থের গল্পগুলোর প্রেক্ষাপট বাস্তব ঘটনাবলি। বাস্তবতার প্রস্তরমেদিনীতে তিনি ফুটিয়েছেন ছোটগল্পের প্রত্যাশিত লাল গোলাপ। এর আয়তন বা গন্ধ নিয়ে প্রশ্ন উত্থাপন বা আলোচনার সুযোগ থাকলেও এটি যে গোলাপ এবং রঙে লাল সেটি সত্য। তেমনি রণেশ দাশগুপ্তের এগুলো ছোটগল্পই, করণকুশলতার চূড়ান্ত বিচারে তা যতোই প্রশ্নের আওতায় থাক না কেন।

সেদিন সকালে ঢাকায় গ্রন্থটি রণেশ দাশগুপ্তের কলাম রচনা। তবে এর স্টাইল ভিন্ন। বিগত শতাব্দির ষাটের দশকেই দুই পর্যায়ে দৈনিক *সংবাদ*-এ সম্পাদকীয় বিভাগে কর্মরত থাকার সময় একটি ব্যক্তিগত কলামে লিখেছেন রণেশ দাশগুপ্ত। এর প্রথম পর্যায়ে 'মনে মনে' কলাম মধুব্রত নাম দিয়ে। রণেশ দাশগুপ্ত এই ধরনের লেখা শুরু করেন তাঁর প্রিয় সুহৃদ কবি ও পঞ্চাশের দশক থেকে প্রগতি লেখক ও পরবর্তী প্রগতিবাদী সংঘ সমিতিতে সদাসক্রিয় সৈয়দ নূরুদ্দীনের *সংবাদ*-এর ব্যক্তিগত স্তম্ভটিকে অব্যাহত রাখার জন্য। সৈয়দ নূরুদ্দীন পঞ্চাশের দশকের মাঝামাঝি থেকে ষাটের দশকের প্রারম্ভ পর্যন্ত *সংবাদ*-এর অন্যতম কর্ণধার ছিলেন এবং বিশেষ করে 'মনে মনে' নামে স্তম্ভটিতে লিখতেন। সৈয়দ নূরুদ্দীন একটি আধা সরকারি সংস্থার (কৃষি) দায়িত্ব নেয়ায় *সংবাদ*-এ নিয়মিতভাবে লেখা বন্ধ করেন। কিন্তু 'মনে মনে' স্তম্ভটির শৈলী অনেকের মতো রণেশ দাশগুপ্তেরও খুব পছন্দ ছিল। এই জন্যই সৈয়দ নূরুদ্দীন লেখা বন্ধ করলে তিনি একই নামে লেখা শুরু করেন। *সেদিন সকালে ঢাকায়* ঐ কলামের কয়েকটি লেখা। কিন্তু কলামগুলো গতানুগতিক নয়– দীর্ঘও নয়। এর মধ্যে আছে কাব্যময়তা, আছে ভাবনার খোরাক। পুরো ঘটনা থেকে চমক দিয়ে ঘটনান্তরে প্রবেশের নৈপুণ্যও আছে এখানে। যেমন, নাম-লেখাটিতে একটি তত্ত্বকে বাস্তবতার সঙ্গে মিলিয়ে প্রকাশ করা হয়েছে। লেখক লিখেছেন: কোনো এক সকালে ফ্রক পরা এক কিশোরী রিক্সাতে যাচ্ছে বিশাল এক তানপুরা হাতে নিয়ে। লেখকের কল্পনায়, কিশোরী যেন সুরসৃষ্টিতে বসেছে এই নাগরিক কোলাহলের মধ্যেই। অনেকে তার দিকে তাকাচ্ছে। কিশোরীর কোনো দিকে খেয়াল নেই। সে প্রায় ধ্যানস্থ, এক দিকে তাকিয়ে। এই লেখা পাঠ করতে করতে পাঠক বুঝতে পারেন, ঢাকার খুবই পরিচিত দৃশ্য এটা। রিক্সাতে

অনেকেই হারমোনিয়ম, তারপুরা, ফুলের টব, নিজস্ব মালামাল কত কি নিয়ে চলাফেরা করে! একটি কিশোরীও হয়তো যাচ্ছে কোথাও তানপুরা নিয়ে। এ আর এমন কি? কিন্তু রণেশ দাশগুপ্ত এই বর্ণনার শেষে লেখেন: 'চলমান ছবিটা দেখে শেষের এই কথাটাই মনে লেগে রইল অনেকক্ষণ, তারপর মনের মধ্যে পরিপুষ্ট হয়ে উঠল এমন একটি ছবি, যাকে পছন্দ করি না। এই ছবিটির নির্মাতা হচ্ছে একটি রেওয়াজ। এই রেওয়াজ হচ্ছে শিল্পীর বিচ্ছিন্নতার রেওয়াজ, জনতা থেকে দূরে সরে যাওয়ার রেওয়াজ। এই বালিকাও কি সেই রেওয়াজে আবদ্ধ হয়ে বসবে?' এই দিয়েই শেষ করেন লেখাটি। আর এই কয়েকটি বাক্যের কারণে হঠাৎ করেই লেখাটি বিশেষ গুরুত্ব দাবি করে। কারণ লেখাটি তখন হয়ে ওঠে সেই আন্তর্জাতিক বিতর্কের অংশ: 'শিল্পী কি শুধুই শিল্পসচেতন, নাকি জীবন ও পরিপার্শ্ব সচেতন হবেন?' রণেশ দাশগুপ্তের 'জীবনের সিঁড়ি' এমন একটি অসাধারণ রচনা। ছোটরাই যে এগিয়ে থাকে, তাদের মধ্যেই যে সম্ভাবনার ইঙ্গিত থাকে লেখক তাঁর লেখায় সেকথা বলেছেন। একজন মেম ও তার মেয়ে বা নাতনি; একটি ফটোগ্রাফের মা ও সন্তান; লেখকের জানালার ধারে ছোট ভাইকে কোলে নিয়ে আসা এক কিশোরী– এমন তিনটি ছোট বর্ণনায় লেখক তুলে ধরেছেন জীবনেরমুখে থাকে নবীনরাই। 'দোটানা' নিবন্ধ লেখকের ব্যক্তিগত ঘটনাকে কেন্দ্র করে রচিত হলেও তা মানুষের সাধারণ সমস্যার প্রকাশমাত্র। এই লেখায় রণেশ দাশগুপ্ত লিখেছেন, এক দিন পত্রিকার কাজ সেরে নাইটশো সিনেমায় যান তিনি। নিচে সাধারণ শ্রেণিতে টিকেট না পাওয়ায় দোতলায় সৌখিন শ্রেণিতে টিকেট করতে হয় তাঁকে। কিন্তু সেখানে ঢুকেই দোটানা বা হীনম্মন্যতায় ভোগেন তিনি। কারণ তিনি বুঝতে পারেন, কয়েক দিন ধরে ধোয়া হয়নি তাঁর পাজামা ও জামা। জামার হাতা অসম্ভব রকমের কুঁচকানো কিন্তু পকেটে কলম চকচক করছে। এখানেই লেখাটি শেষ হতে পারত। কিন্তু রণেশ দাশগুপ্তের এ ধরনের লেখার মাহাত্ম্য হলো তিনি একটি বক্তব্য রেখে যান লেখায়। এখানেও আছে এবং সেটি হলো মনের দ্বিধা। তিনি লেখাতে উল্লেখ করেছেন, একজন ফিটার ময়লা জামা পরে দিব্যি চলতে পারে, তার মরে কোনো দ্বিধা থাকে না কিন্তু একজন সাংবাদিকের মনে দ্বিধা! অথচ, উভয়েই শ্রম দিচ্ছে, কাজের কারণেই তাদের পোশাক ময়লা হচ্ছে। আসলে, লেখক বা সাংবাদিক বলে, পকেটে একটি কলম আছে বলে মনের মধ্যে যে আভিজাত্যবোধ লালিত হয় সেটিই প্রকৃত শত্রু। এই গ্রন্থের লেখাগুলোতে রণেশ দাশগুপ্তের জীবনের অনেক উপাদান পাওয়া যাবে। যেমন, তিনি যে ঘরে বাস করতেন তা অতি ছোট এবং সেটাতে একটিমাত্র জানালা ছিল, তিনি প্রায়ই প্রেক্ষাগৃহে চলচ্চিত্র দেখতে যেতেন ইত্যাদি। বত্রিশটি লেখার সমন্বয়ে এই গ্রন্থ। এতো লেখা রণেশ দাশগুপ্তের আর কোনো গ্রন্থভুক্ত হয়নি। সংখ্যায় বেশি হলেও আয়তনে ছোট এর সবই।

সাম্যবাদী উত্থান প্রত্যাশা: আত্মজিজ্ঞাসা গ্রন্থটি কলকাতা থেকে প্রকাশিত রণেশ দাশগুপ্তের একমাত্র গ্রন্থ। এই গ্রন্থে লেখক সাম্যবাদী লোকউত্থানের ঝরনাতলায় আমন্ত্রণ জানিয়েছেন সকলকে। এর প্রথম প্রবন্ধ 'বিদ্যাসাগর: আধুনিক বিদ্রোহী রূপরঙ্গী'। এই প্রবন্ধে রণেশ দাশগুপ্ত মাইকেল মধুসূদন দত্তের পাশাপাশি আলোচনা করেছেন বিদ্যাসাগরকে। তাঁর সিদ্ধান্ত: 'মাইকেলকে বুঝবার জন্য বিদ্যাসাগর এবং

বিদ্যাসাগরকে বুঝবার জন্য মাইকেল প্রতিনিয়ত আমাদের জীবনচর্চায় উপস্থিত হয়েছেন।' তাঁর একটি অসাধারণ লেখা 'স্বামী বিবেকানন্দ: সহযাত্রী সাম্যবাদী'। স্বামী বিবেকানন্দকে শুধুই একজন ভাববাদী পুরুষ হিসেবে দেখেননি রণেশ দাশগুপ্ত। তিনি বিবেকানন্দের জনসম্পৃক্ততা ও জনজাগরণমূলক কর্মকে মার্কসবাদী দৃষ্টিতে ব্যাখ্যা করে লিখেছেন: 'সাম্যবাদী সহযাত্রী স্বামী বিবেকানন্দের চিন্তাভাবনার এই সহযোগিতাকে মার্কসীয় চিন্তা ও কর্মকাণ্ডের ধারক বাহকেরা যথাসত্ত্বর সমাজতন্ত্রের পনুরুত্থানের তথা নতুনতর প্রয়াসের ক্ষেত্রে বড় রকমের সহায়ক রূপে গ্রহণ করবেন, এটা আমরা কায়মনোবাক্যে প্রত্যাশা করব।' রণেশ দাশগুপ্তের প্রবন্ধ "মওলানা আজাদের 'গুবারে খাতির' (বিদীর্ণ হৃদয়)" মূলত মওলানা আজাদের ২৮৪ পৃষ্ঠা ব্যাপী একটি বইয়ের আলোচনা। লেখক তাঁর প্রবন্ধে গ্রন্থটির ঘটনাবলি বিবৃত করে লিখেছেন: "মওলানা আজাদ বরাবরই বস্তুত পক্ষে ও প্রধানত একজন বিশ্লেষক ও ব্যাখ্যাকার রূপে গদ্য বৃত্তান্তের বড় রকমের শিল্পী। তবে তিনি তাঁর রচনাশৈলীর প্রাসাদগুণের দিক থেকেও 'গুবারে খাতির' এ চূড়ান্ত উৎকর্ষে পৌঁছেছেন। এতে তিনি বক্তব্যের তীক্ষ্ণতা ও পরিচ্ছন্নতাকে কাব্যিক ব্যঞ্জনাও দিয়েছেন।" রণেশ দাশগুপ্তের লেখা 'রবীন্দ্রনাথ: যৌবনের কাছে প্রার্থী'তে লেখক রবীন্দ্ররচনায় তরুণের বন্দনা কোথায় এবং কিভাবে গেয়েছেন তার উল্লেখ আছে। '১৪০০ সাল' কবিতা থেকে '*রক্তকরবী*', '*অচলায়তন*', '*তাসের দেশ*' ইত্যাদি গ্রন্থের প্রাসঙ্গিক উল্লেখ রয়েছে তাঁর লেখায়। পরে রবীন্দ্রনাথ বাঙালির মুক্তিযুদ্ধকে কিভাবে প্রভাবিত করেছিলেন, সেকথাও আছে তাঁর লেখায়, এভাবে: "সেদিন বাংলাদেশের তারুণ্য শক্তি যৌবনের প্রতি রবীন্দ্রনাথের আবেদনকে সামনে রেখে যে সাহসী পদক্ষেপ করেছিল, তা বৈপ্লবিক রূপ নিয়ে ঘটিয়েছিল মুক্তিযুদ্ধ, যার সংগীতের পুরোভাগে জায়গা নিয়েছিল রবীন্দ্রনাথের 'সোনার বাংলা'। লাখো লাখো শহীদ এই গানে নতুন করে রবীন্দ্রনাথকে জানিয়ে দিয়েছে যৌবনের সাড়া কিভাবে অব্যাহত রয়েছে।" রণেশ দাশগুপ্ত সাম্প্রদায়িকতা ও বিভেদধর্মের বিরুদ্ধে বাউলধারাকে কাজে লাগাতে বলেছেন। তাঁর লেখা 'লালন: শাশ্বত ও বৈপ্লবিক' প্রবন্ধে তিনি উল্লেখ করেন– দুটি দিক থেকে লালন বা বাউলদের আদর্শকে কাজে লাগানো যায়: এক. আমাদের উপমহাদেশ জুড়ে ধর্মীয় সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধি ও সংঘর্ষের নিরসনের জন্য আজ চাই জনগণমনে মানবিকতাবোধ ও বৈপ্লবিক চিন্তাভাবনা; দুই. বাংলার রাজনৈতিক কাঠামোকে অক্ষুণ্ন রেখে মৈত্রীর সেতুকে নবায়িত করার জন্যও বাউলদর্শন প্রয়োজন। তাঁর মতে– এই দুটো ক্ষেত্রের গতানুগতিক ও স্বতঃস্ফূর্ত কর্মসূচি পরিহার করে চিন্তায় ও কাজে সংগ্রামের প্রয়োজনে বিপ্লবাত্মক এবং ব্যাপক জনগণ-আশ্রয়ী পদক্ষেপ নেয়া দরকার। 'সাম্যবাদী উত্থান প্রত্যাশা: রাহুল সাংকৃত্যায়ন জন্মশতবার্ষিকীতে' রচনায় মার্কসবাদী লেখক রাহুল সাংকৃত্যায়নের জন্মশতবর্ষসূত্রে অন্য মার্কসবাদীদের নিয়েও আলোচনা করেছেন রণেশ দাশগুপ্ত। রাহুলের *ভল্গা থেকে গঙ্গা* গ্রন্থ-প্রসঙ্গও উঠে এসেছে প্রাসঙ্গিকভাবে। এই গ্রন্থের নাম-প্রবন্ধ 'সাম্যবাদী উত্থান প্রত্যাশা: আত্মজিজ্ঞাসা'। এ প্রবন্ধে লেখক তৎকালীন তরুণ লেখক অসীম রায় রচিত গল্প ও মহাকাব্যিক উপন্যাস *একালের কথা*-র উল্লেখ করেছেন, যেখানে ছেচল্লিশের কলকাতার দাঙ্গার কথা আছে। তবে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার বিরুদ্ধে সম্মিলিত অসাম্প্রদায়িক অবস্থান ছিল এই উপন্যাসের মর্মবাণী। চলচ্চিত্রকার ও লেখক ফেলিক্স

গ্রিন (Felix Green) রচিত *শত্রু (মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ)-The Enemy (US Imperialism)* বিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের মাঝামাঝি সময়ে সমাজতন্ত্র ও সাম্যবাদের ভাঙাভাঙির মধ্যেও যে এরকমের একটি চরিত্র এবং এমন ধরনের চিন্তার প্রকাশ পেয়েছে তাতে আশান্বিত হবার কারণ আছে। ঢাকার জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী ১৯৭৯ সালে চিলি তথা লাতিন আমেরিকার সাম্যবাদী মহাকবি পাবলো নেরুদার রচনা নিয়ে *আত্মস্মৃতি ও কয়েকটি কবিতা* নাম দিয়ে একটি বই প্রকাশ করে। সেখানেও আছে আত্মজাগরণের চেতনা। নেরুদার লেখা অনুবাদ করেছেন বাংলাদেশের শামসুর রাহমান, শহীদ কাদরী, রফিক আজাদ, মোজাম্মেল হোসেন, মফিদুল হক, খান মোহাম্মদ ফারাবী প্রমুখ। সব মিলিয়ে বিগত শতাব্দির নয়ের দশকে বিশ্বব্যাপী সমাজতন্ত্রে যে বিপর্যয়, তার পরিপ্রেক্ষিতে আত্মজিজ্ঞাসায় পুনরুত্থানের প্রত্যয় আছে এই লেখায়। রণেশ দাশগুপ্তের লেখা এ মশাল 'নেভে নেভে নেভে না' (রোমাঁ রলাঁকে জন্মদিনে) থেকে বোধকরি এ অংশ উদ্ধার করলেই বোঝা যাবে, রোমাঁ রলাঁকে কেন স্মরণ করতে চান তিনি: '১৯৯২-এর সূচনার মুখে বিভিন্ন ঘটনাচক্রে সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের যে আনুষ্ঠানিক বিলুপ্তি ঘটলো সাম্রাজ্যবাদীদের উল্লাসধ্বনির মধ্যে, তখন রলাঁকে স্মরণ করতে গিয়ে আমরা তাঁর ফরাসি বিপ্লবের টর্নেডোর উপমাটিকে মনে রেখে বলবো, রলাঁ যাকে মশাল বলে অভিহিত করেছিলেন, সেই সোভিয়েত সমাজতন্ত্রের গণঅভ্যুত্থানের অবিশ্রান্ত ধারার মধ্য দিয়ে শতসহস্র মশাল জ্বালিয়ে দিয়েছে। সুতরাং সোভিয়েত বিপ্লবের মশাল আজ সাময়িকভাবে চোখের আড়ালে গেলেও একে নির্বাপিত করার প্রচেষ্টা তো আজ আরও হাজারগুণ বেশি সুদূর-পরাহত হয়ে গিয়েছে।' রণেশ দাশগুপ্তের এই প্রত্যাশাটি গুরুত্বপূর্ণ। এরপর রণেশ দাশগুপ্ত তাঁর এই গ্রন্থে বাংলাসাহিত্য সংশ্লিষ্ট কতিপয় প্রসঙ্গ অবতারণা করেছেন। নামেই এগুলোর পরিচয়: ''অপরাজিত' উপন্যাসে কমিউনিস্ট চরিত্র"; 'বিজন ভট্টাচার্য: বরেণ্য বিপ্লবী লোকায়ত নট ও নাট্যকার'; 'জীবনানন্দের মার্কস লেনিন কমিউনিস্টরা'। তাছাড়া বাংলাদেশের নারীলেখকদের ওপর লেখা "বাংলাদেশে 'নয় এ মধুর খেলার' রচয়িত্রীরা"ও গুরুত্বপূর্ণ। মহাশ্বেতা দেবীর রচনাকে কেন্দ্র করে তিনি লিখেছেন 'আদিবাসী বিদ্রোহের শিল্পরূপ-সন্ধান' শিরোনামের প্রবন্ধ। ল্যাটিন আমেরিকার ওপর এর আগে স্বতন্ত্র গ্রন্থ তিনি লিখেছেন। কিন্তু ল্যাটিন আমেরিকা যে তাঁর প্রিয় বিষয় এ গ্রন্থেও সে প্রমাণ আছে। দুটো প্রবন্ধ: 'আন্তর্জাতিক জিজ্ঞাসা: ল্যাটিন আমেরিকার মুক্তিসংগ্রামের ঔপন্যাসিক আলেজো কার্পেনটিয়ার' এবং 'মার্কোয়েজের অনন্য উপন্যাস *একশ বছরের নিঃসঙ্গতা* নিয়ে কিছু কথা'। মার্কেয়েজের এই উপন্যাসের ওপর বাংলাদেশের কোনো লেখকের এটিই পরিপূর্ণ প্রথম রচনা।

কখনো চম্পা কখনো অতসী রণেশ দাশগুপ্তের আত্মজীবনীর প্রারম্ভ, তবে অনুলিখিত। এর দ্বিতীয় অংশে আছে পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁর সাক্ষাৎকার। সব মিলিয়ে ১৯৬৪ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত কিছু ঘটনার উল্লেখ এখানে পাওয়া যাবে।

ঘ.

রণেশ দাশগুপ্ত ছিলেন গণমুখী লেখক। তাঁর লেখা গ্রন্থাকারে যতটুকু প্রকাশিত হয়েছে এর বাইরে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে অনেক। তাই বাংলা একাডেমির কাছ থেকে ২০০২

সালে রণেশ দাশগুপ্তের রচনা-সংগ্রহের প্রস্তাব পাওয়ামাত্র বাংলাদেশ ও কলকাতার বহুজনের সঙ্গে ব্যক্তিগত আমি সময় ও অর্থ ব্যয় করে বহুবার যোগাযোগ করি। রণেশ দাশগুপ্তের সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত পরিচয় থাকার আবেগটি এখানে কাজ করে সত্যি, কিন্তু এর চেয়ে অধিক মনে হয়, তাঁর মতো একজন পবিত্র সাহিত্য-সংস্কৃতিবোদ্ধা ও আলোচকের রচনা-সংগ্রহ করার সুযোগ পাওয়া ভাগ্যের ব্যাপার! আমি বাংলাদেশের অনেকের সঙ্গেই যোগাযোগ করি, কিন্তু বলতে দ্বিধা হয়, সবার কাছ থেকে প্রত্যাশা মতো সহযোগিতা পাইনি। রণেশ দাশগুপ্তের রচনা-সংগ্রহে বাংলাদেশের যাঁরা আমাকে অকৃপণভাবে সহযোগিতা করেছেন তাঁরা হলেন: প্রয়াত নারীনেত্রী হেনা দাস, অধ্যাপক ড. তাইবুল হোসেন, ছড়াকার আখতার হুসেন, অধ্যাপক সৈয়দ আজিজুল হক, উদীচীর প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক মাহমুদ সেলিম, সংস্কৃতিকর্মী অমিত রঞ্জন দে, আমার ছাত্র মিলন রায় প্রমুখ। অমিত রঞ্জন দে বিশেষভাবে আগ্রহ দেখিয়ে স্বপ্রণোদিত হয়ে রচনাসমগ্র কম্পোজের দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। পশ্চিমবঙ্গ থেকে যাঁরা সহযোগিতা করেছেন অকৃপণভাবে, তাঁরা হলেন: সোমেন চন্দ-সহোদর কল্যাণ চন্দ, *মূল্যায়ন*-সম্পাদক অধ্যাপক নরহরি কবিরাজ, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন অধ্যাপক ড. সুমিতা চক্রবর্তী, *ঐকতান*-সম্পাদক ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন যুগ্ম-নিবন্ধক নীতীশ বিশ্বাস, *ভারত ও সমাজতান্ত্রিক জিডিআর* পত্রিকার সম্পাদক অধ্যাপক পঞ্চানন সাহা *এবং প্রতর্ক*-সম্পাদক দেবাশিস্ সেনগুপ্ত *এবং এই সময়*-সম্পাদক অধ্যাপক অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়, *কবিতা সীমান্ত*-সম্পাদক দীপেন রায়, সিপিআই নেত্রী প্রণতি মুখোপাধ্যায় প্রমুখ। আমি উল্লিখিত সবাইকে বিশেষভাবে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। বাংলা একাডেমির মহাপরিচালক শামসুজ্জামান খানের ব্যক্তিগত আগ্রহের কারণেই *রণেশ দাশগুপ্তের রচনাসমগ্র* প্রথম খণ্ড যেমন প্রকাশিত হয়েছে, তেমনি দ্বিতীয় খণ্ডও প্রকাশ পেল। তাঁর প্রতি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি। বাংলা একাডেমির উপপরিচালক ড. তপন বাগচীর ইচ্ছা ও উদ্যোগের কারণে এটা অত্যন্ত স্বল্প সময়ে সবার হাতে আসতে পেরেছে। এ প্রসঙ্গে স্মরণ করি, বাংলা একাডেমির পরিচালক অপরেশ কুমার ব্যানার্জী ও উপপরিচালক ড. আমিনুর রহমান সুলতানের কথাও। রচনাসমগ্রের ব্যাপারে তাঁদের উভয়ের আগ্রহ ছিল অপরিসীম। আমি তাঁদের জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ।

রচনাসমগ্রের বর্তমান খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত রণেশ দাশগুপ্তের গ্রন্থগুলোর মধ্যে যে বানানরীতি পাওয়া গেছে তা-ই মোটামুটি অনুসৃত হল। এতে সমকালের পরিপ্রেক্ষিতে রণেশ দাশগুপ্তের রচনার রূপ ও মেজাজ উভয়ই বোঝা যাবে।

সৌমিত্র শেখর
অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
scpcdu@gmail.com

সূচিপত্র

রণেশ দাশগুপ্ত (১৫ জানুয়ারি ১৯১২- ৪ঠা নভেম্বর ১৯৯৭)

ল্যাটিন আমেরিকার মুক্তিসংগ্রাম

॥ ১॥

মহাদেশের মধ্যে মহাদেশ

পৃথিবীর পশ্চিম গোলার্ধে আটলান্টিক ও প্রশান্ত মহাসমুদ্রের তরঙ্গরাশিতে ঘেরা আমেরিকা মহাদেশের দুটি ভৌগলিক ভাগ রয়েছে: উত্তর আমেরিকা আর দক্ষিণ আমেরিকা। কিন্তু আরও একভাবে আমেরিকা মহাদেশ দুইভাগে বিভক্ত। এই ভাগ রাষ্ট্রীক-সামাজিক-সাংস্কৃতিক। আমেরিকা পনেরো শতকের ইউরোপিয় ঔপনিবেশিক বসবাসকারীদের দেওয়া নাম। এই দুই ভাগও তেমনি তাদেরই নামে নামাঙ্কিত হয়েছে। আমেরিকা উত্তরাংশে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং কানাডাকে নিয়ে গঠিত ভূখণ্ড হচ্ছে প্রধানত ইংরেজিভাষী। এর কানাডিয় অংশের একটি ফরাসি এলাকা বাদে আর সর্বত্রই ইংরেজ এবং আইরিশ ছাড়া আর যারা বসবাসকারী তাদের আদি বাসভূমি নরওয়ে, হল্যান্ড, জার্মেনি এবং ইউরোপের অন্যান্য উত্তর অথবা পূর্ব অঞ্চলের দেশ। এদিক দিয়ে আমেরিকার উত্তর অঞ্চলকে বলা যেতে পারে প্রধানত উত্তর-ইউরোপিয়ভাষী। আমেরিকা মহাদেশের মধ্যবলয় এবং সমগ্র দক্ষিণাংশ প্রধানত স্পেনিশভাষী হিসাবে চিহ্নিত। মধ্য আমেরিকার মেক্সিকো থেকে শুরু করে দক্ষিণ আমেরিকার সুদুর প্রান্তের আর্জেন্টিনা ও চিলি পর্যন্ত স্পেনিশভাষী রাষ্ট্রপুঞ্জের মধ্যে একমাত্র ব্রাজিল হচ্ছে পর্তুগীজভাষী। এই বিপুল এলাকাতে কয়েকটি ছোট ছোট ইংরেজি ও ডাচভাষী পকেট থাকলেও অধিকাংশ রাষ্ট্রেই স্পেনিশভাষীদের প্রাধান্য থাকায় সমগ্র এলাকার নাম হয়েছে ল্যাটিন আমেরিকা। এর কারণ ফরাসি, ইটালিয়ান আর পর্তুগীজের মতো স্পেনিশভাষা ল্যাটিন ভাষার অন্তর্ভুক্ত। মধ্য আমেরিকার সঙ্গে সংলগ্ন আটলান্টিক মহাসাগরের কয়েকটি দ্বীপ নিয়ে কিউবা এবং হাইতি ও ডোমিনিকান প্রজাতন্ত্র অবস্থিত। এরাও ল্যাটিন আমেরিকার অন্তর্ভুক্ত।

পশ্চিম গোলার্ধের আমেরিকা মহাদেশের মধ্যে এই যে আরেক মহাদেশ, এর লোক সংখ্যা পঁচিশ কোটি। এর মধ্যে রয়েছে ছোটবড় কুড়িটির অধিক প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্র। এদের মধ্যে সবচেয়ে বড় দেশ ব্রাজিল। এর লোক সংখ্যা প্রায় আট কোটি, আয়তন খুব বেশি-৩২, ৮৮, ০৬৩ বর্গমাইল। ডোমিনিকান প্রজাতন্ত্র আবার খুব ছোট দেশ, একটি দ্বীপের অর্ধেক মাত্র। এর লোক সংখ্যা চব্বিশ লক্ষের কিছু বেশি: আয়তন ১৯ হাজার ৩৩২ বর্গমাইল। ল্যাটিন আমেরিকার কুড়িটি প্রজাতন্ত্রের নাম: আর্জেন্টিনা, বলিভিয়া, ব্রাজিল, চিলি, কলম্বিয়া, কষ্টারিকা, কিউবা, ডোমিনিকান প্রজাতন্ত্র, ইকুয়েডর, এল সালভাদর, গুয়াতেমাল, হাইতি, হন্ডুরাস, মেক্সিকো, নিকারাগুয়া, পানামা, প্যারাগুয়ে, উরুগুয়ে, ভেনিজুয়েলা, পেরু। এ ছাড়া দক্ষিণ আমেরিকার গুইয়ানাতে বাগিচার কাজ করানোর জন্য ফরাসি, ব্রিটিশ ও ডাচ ব্যবসায়ীরা যে এশীয়-আফ্রিকান 'কুলীকামিন' নিয়োগ করেছিল, তারা এখন অধিকার সচেতন জনসমষ্টি

হিসেবে উঠে দাঁড়াচ্ছে। ল্যাটিন আমেরিকার গুইয়ানাতে রয়েছে তিনটি খুদে ঔপনিবেশিক এলাকা—ফরাসি, ডাচ এবং ব্রিটিশ কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত গুইয়ানা। এই এলাকারই গায়ে সমুদ্রবক্ষে পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ, ব্রিটিশ উপনিবেশ। সম্প্রতি এরা সবাই আনুষ্ঠানিকভাবে রাজনৈতিক স্বাধীনতা পেয়েছে। এদের রাজনৈতিক-সামাজিক-সাংস্কৃতিক অবস্থান মিশ্রিত ধরণের।

অধিবাসীরা কোথায়

সমগ্র আমেরিকা মহাদেশকেই ইউরোপিয়রা আবিষ্কার করেছে প্রায় পাঁচশত বছর আগে। সুতরাং ল্যাটিন হোক কিংবা ইংরেজি অথবা জার্মেনভাষী হোক, পশ্চিম গোলার্ধের সমস্ত আধুনিক রাষ্ট্রেরই বয়স পাঁচশত বছরের কম। প্রশ্ন হতে পারে, ল্যাটিন আমেরিকার রাষ্ট্রপুঞ্জেও কি তাহলে আমেরিকার হাজার হাজার বছরের আদি বাসিন্দাদের কোন স্থান নেই? তারা কি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কিংবা কানাডার আদিবাসীদের মতো প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়ে যাদুঘরের বাসিন্দা? এ প্রশ্নের উত্তর এই যে, ল্যাটিন আমেরিকাতে আদিবাসিন্দারা নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়নি। তাদের অস্তিত্ব দুইভাবে অতীতকে অতিক্রম করে বর্তমানে এসে পৌঁছেছে। প্রথমত পর্বত ও অরণ্যসঙ্কুল দুর্গম অঞ্চলগুলিতে আদিবাসী গোষ্ঠীসমূহ তাদের জীবনযাত্রা বজায় রেখেছে। দ্বিতীয়ত স্পেনিয় অথবা অন্যান্য ইউরোপিয় উপনিবেশ স্থাপনকারীদের সঙ্গে তাদের রক্তের সম্পর্ক মিশে গিয়ে এক নতুন মানবগোষ্ঠী গড়ে উঠেছে। এই মিশ্রিত মানব-গোষ্ঠী মেষ্টিজো নামে পরিচিত। উপনিবেশ স্থাপনকারী স্পেনিশ-ইউরোপিয়দের একটি অংশ অবশ্য তাদের স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখে শ্বেতাঙ্গ থেকেছে। এই বিশুদ্ধ স্পেনিশদের বলা হয় ক্রিওল। ক্রিওলদের মধ্যে কিছু বিশুদ্ধ অন্যান্য ইউরোপিয় রয়েছে। ল্যাটিন আমেরিকার এই ঐতিহাসিক বৈশিষ্ট্যের নিদর্শন হিসাবে দেখানো যেতে পারে যে, ইকুয়েডরের অধিবাসীদের মধ্যে শতকরা ১০ ভাগ শেতাঙ্গ, শতকরা ৩৯ ভাগ মিশ্রিত বা মেষ্টিজো। কলম্বিয়ার অধিবাসীদের শতকরা ৬৮ ভাগ হচ্ছে মিশ্রিত বা মেষ্টিজো, শতকরা ২০ ভাগ শ্বেতাঙ্গ, শতকরা সাত ভাগ আদিবাসী এবং শতকরা ৫ ভাগ নিগ্রো। পানামাতে প্রায় আধাআধি আদিবাসী উপাজাতি। পেরু এবং প্যারাগুয়েতে অধিকাংশ অধিবাসী মিশ্রিত বা মেষ্টিজো।

অবশ্য ল্যাটিন আমেরিকার সমস্ত দেশেই প্রথমদিকে বিশুদ্ধ স্পেনিশ-ইউরোপিয় এবং পরের দিকে বিশুদ্ধ স্পেনিশ অথবা মিশ্রিত বা মেষ্টিজোরাও বিগত পাঁচ'শ বছরে অর্থনৈতিক সম্পদের মালিক ও জিম্মাদার হয়েছে। আদিবাসিন্দারা থেকেছে ক্ষেতমজুর অথবা খনি এবং বাগিচার শ্রমিক। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সাধারণভাবে অচ্ছ্যুত হলেও পেরু, মেক্সিকো এবং গুয়াতেমালার মতো দেশগুলিতে আদিবাসিন্দারা শোষণহীন ও গণতান্ত্রিক সমাজ গড়ে তোলার সংগ্রামে মূলশক্তি হিসাবে কাজ করে আসছে। বিশেষ করে মেক্সিকোতে গত শতাব্দিতে প্রজাতন্ত্রী বিপ্লবের নায়ক ছিলেন জুয়ারেস, একজন আদিবাসী। তিনি সমগ্র গণতান্ত্রিক মেক্সিকান জনগণের প্রতিভূ হয়ে উঠেছিলেন। এদিক দিয়ে আমেরিকা মহাদেশের হাজার হাজার বছরের আদিবাসিন্দা লোকসমষ্টির বৈশিষ্ট্য সঞ্চারিত হয়ে রয়েছে ল্যাটিন আমেরিকার ইতিহাসে, কোথাও কোথাও চালক

শক্তিরূপে। কিন্তু আধুনিক রাষ্ট্রনৈতিক ও অর্থনৈতিক সামাজিক ইতিহাসের ভিত-পত্তন হয়েছিল প্রায় পাঁচশত বছর আগে, স্পেনের জাহাজ-বহরের নায়ক কলম্বাস কর্তৃক আমেরিকা মহাদেশ আবিস্কৃত হওয়ার পর থেকে।

স্পেন ও অন্যান্য ইউরোপিয় রাজ্যের ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্য

১৪৯২ সালে কলম্বাসের নায়কতায় স্পেনের কয়েকটি জাহাজ আমেরিকা মহাদেশের গায়ে আটলান্টিক মহাসাগরে একটি দ্বীপের কাছে নোঙ্গর করার পরে ১৫০৪ সালের মধ্যে কয়েকবার জাহাজ যাতায়াতের মধ্য দিয়ে স্থাপিত হয় স্পেনের ঔপনিবেশক সাম্রাজ্যের প্রথম ঘাঁটি স্যান্টো ডোমিংগো। এরপর অন্যান্য স্পেনিশ জাহাজী অভিযাত্রীরা দখল করল কিউবা, জ্যামেকা, পুয়ের্টো রিকো। এই সব ঘাঁটি থেকে মূল মহাদেশ দখলের আয়োজন শুরু হলো এবং ১৫৫০ সালের মধ্যেই সমগ্র মধ্য এবং দক্ষিণ আমেরিকাতে প্রধানত স্পেনিশ রাজ্য বিস্তারকারীরা আদিবাসীদের প্রচণ্ড প্রতিরোধকে আধুনিক আগ্নেয়াস্ত্রের আঘাতে চুর্ণ করে একের পর এক এলাকা দখল করে বসল। লোভী, বীভৎস ও বর্বর ছিল এই হামলাগুলি। বণিকের মানদণ্ড প্রথম দিন থেকেই রাজদণ্ডে পরিণত হয়েছিল। মেক্সিকো, মধ্য আমেরিকা, পেরু এবং চিলিতে আদিবাসী মায়া, আজটেক এবং ইনকা সভ্যতার দুর্গ প্রাকারের ধ্বংসস্তুপে উড়েছিল স্পেনের ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যের পতাকা। রক্তাক্ত শৃঙ্খল সূত্রে গাঁথা হয়েছিল উপনিবেশগুলি–সে সূত্র স্পেনের রাজকীয় ফরমান। কিন্তু অসমভাবে, খণ্ড খণ্ডভাবে আগুপিছু স্থাপিত হয়েছিল এই উপনিবেশগুলি। এরা পৃথক পৃথক উপনিবেশ-স্থাপনকারীদের দলের পৃথক পৃথক রাজ্য হিসেবে গড়ে উঠেছিল, স্পেনের রাজসিংহাসন এবং গির্জাকে সাধারণভাবে আনুগত্য জানিয়ে।

স্পেনের এই ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্য স্থাপনের ব্যাপারটি যখন জোরে-শোরে চলছে, তখন অন্যান্য ইউরোপিয়রাও জাহাজ নিয়ে বেরিয়ে পড়েছে, আটলান্টিক মহাসাগর পাড়ি দিয়ে উত্তর আমেরিকার পশ্চিম উপকূলে বসতিস্থাপন করতে শুরু করেছে। অবশ্য আমেরিকা মহাদেশের সম্পদ বাঁটোয়ারার প্রশ্ন সে সময়ে উত্থাপিত হয়নি। মধ্য এবং দক্ষিণ আমেরিকাতেও এই সময়েই ইংরেজ, পর্তুগীজ, ফরাসি ও ডাচদের উপনিবেশ গড়ে ওঠে। উত্তর আমেরিকাতে স্থাপিত হয় বিভিন্ন উপনিবেশ ইংরেজ ও ফরাসিদের উদ্যোগে। স্থাপিত হয় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রথম কয়েকটি রাজ্যের কাঠামো। প্রায় তিনশত বছর ধরে চলে ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্য স্থাপনের মাধ্যমে দলে দলে ইউরোপিয় বসবাসকারীদের আস্তানা স্থাপন। অবশ্য স্পেনিশ ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যের ভিতরকার রাজ্যগুলির সীমান্তবিরোধ এবং আদিবাসীদের অভ্যুত্থান বরাবরই সংকট সৃষ্টি করে রাখে। আমেরিকা মহাদেশের বন্দরে বন্দরে গুতোগুতি ছিল বিভিন্ন ইউরোপিয় অভিযাত্রীদের মধ্যে। স্পেন ইংল্যান্ডের কাছে সমুদ্র যুদ্ধে পরাজিত হয়েছিল, কিন্তু তার সাম্রাজ্যের উপর সে সময়ে হাত পড়েনি। তখন যে সমস্ত ইউরোপিয় শক্তি আমেরিকা মহাদেশের বিস্তীর্ণ এলাকাগুলিকে গিলে বসেছে, সেগুলিকে তারা মালিকানা জারি করে ভোগ দখলের কাজে লাগানোর জন্য চেষ্টা করেছে। অফুরান্ত পতিত জমি ও বিভিন্ন ধাতুর খনিজ সম্পদ আহরণ করার ভারি কাজগুলোর জন্যেই ল্যাটিন আমেরিকাতে

আদিবাসীদের বাঁচিয়ে রাখা হয়েছিল। এছাড়াও দাসমজুর আমদানি শুরু হয়েছিল আফ্রিকা থেকে। বৃটেন স্পেনিশ সাম্রাজ্য-বিস্তারকারীদের সাহায্য করেছিল এ ব্যাপারে। কার্ল মার্কসের 'পুঁজি' গ্রন্থের এক জায়গায় দেখা যায়, ১৭৪৩ সাল পর্যন্ত ল্যাটিন আমেরিকাতে বছরে ৪৮০০ নিগ্রো ক্রীতদাস সরবরাহ করার সর্বস্বত্ব সংগ্রহ করেছিল বৃটেন। বৃটেনের লিভারপুল বন্দর দাস ব্যবসায়ের ফলে ফেঁপে উঠেছিল।

স্পেন সাম্রাজ্য ধ্বংস–বিভিন্ন প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা

অষ্টাদশ শতাব্দির শেষ দিকে বা উনিশ শতকের শুরুতেই ল্যাটিন আমেরিকাতে স্পেনের সাম্রাজ্য বিপর্যস্ত হয়ে গেল। এই বিপর্যয়ের বীজ বেশ কিছু আগেই অঙ্কুর মেলতে শুরু করেছিল, উনিশ শতকের প্রথমে এরা ঝড়ের দোলায় দুলতে শুরু করল। সাম্রাজ্যের উপর আঘাত এলো দুই দিক থেকে। প্রথমত ভিতর থেকে, দ্বিতীয়ত বাহির থেকে।

প্রথম দিকটাই দেখা যাক আগে। ল্যাটিন আমেরিকার বিভিন্ন রাজ্যে বসবাসকারী ক্রিওল এবং মেষ্টিজোরা যে অর্থনৈতিক কাঠামোগুলোকে গড়ে তুলেছিল, তাতে স্পেনের রাজা এবং গির্জার পুরোহিতদের পাওনা ক্রমেই অবাঞ্ছিত হয়ে পড়তে শুরু করেছিল। শেষ পর্যন্ত মার্কিনিরা যখন ব্রিটিশ রাজাকে কর দিতে অস্বীকার করে পৃথক হয়ে যুক্তরাষ্ট্র গঠন করল, তখন এর প্রভাব ল্যাটিন আমেরিকাতেও পড়ল। তবে একটা ভাববিপ্লবেরও তরঙ্গ এসেছিল ফরাসি বিপ্লবের সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতার আদর্শের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট দুটি প্রক্রিয়ার তাগিদ নিয়ে। এদের একটি রাজতন্ত্রের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ, আরেকটি গির্জার সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদের তাগিদ। রাজা ও গির্জাকে পরগাছা বলে নির্দিষ্ট করা হয়েছিল ফরাসি বিপ্লবে। এই দুই প্রতিষ্ঠানকে খর্ব করার জন্য এবং অর্থনৈতিক কর্তৃত্ব ও প্রজাতান্ত্রিক শাসনতন্ত্র কায়েমের জন্য সংগ্রাম শুরু হলো ল্যাটিন আমেরিকার রাজ্যে রাজ্যে। দেখতে দেখতে দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়ল এই সংগ্রাম। ১৮২৫ সালের মধ্যে একমাত্র কিউবা, পুয়ের্টোরিকো এবং প্রশান্ত মহাসাগরস্থ ফিলিপাইন ছাড়া আর সমস্ত রাজ্যই স্পেনের সাম্রাজ্য থেকে ভেঙ্গে বেরিয়ে গেল। কিউবা এবং অবশিষ্ট সাম্রাজ্যেও স্বাধীনতা ও প্রজাতন্ত্রের সংগ্রাম অব্যাহত রইল। কিউবা শেষ পর্যন্ত মুক্ত হয়ে স্পেনের রাজকীয় কব্‌জা থেকে ১৯০২ সালে এবং প্রজাতন্ত্রও স্থাপিত হয়। ফিলিপাইন ও পুয়োর্টোরিকাতে মার্কিন কর্তৃত্ব স্থাপিত হয়।

স্পেনের সাম্রাজ্য যে দ্বিতীয় দিক থেকে বিপন্ন হয়েছিল সে হচ্ছে মার্কিনি এবং বিভিন্ন ইউরোপিয় পুঁজিপতিদের তরফ থেকে ল্যাটিন আমেরিকাতে অর্থনৈতিক সাম্রাজ্য-বিস্তারের ধারাবাহিক এবং ক্রমবর্ধমান প্রয়াস। উনিশ শতকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র খোলাখুলি বলে বসলো যে, পশ্চিম গোলার্ধটা হচ্ছে মার্কিনি এলাকা। স্পেনের সঙ্গে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রত্যক্ষ সংঘাত শুরু হয়ে গেল। আর এর মধ্যেই ইংরেজ, মার্কিন, জার্মেন, ডাচ, পর্তুগীজ ও ফরাসি পুঁজিবাদীরা শুরু করল পুঁজিনিয়োগ করে ল্যাটিন আমেরিকার খনিজ এবং অর্থনৈতিক সম্পদ লুণ্ঠনের পালা। স্পেন-সাম্রাজ্যের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কব্‌জা বেহাত হয়ে গেল একেবারে পুরোপুরি উনিশ শতকের শেষে।

অসমাপ্ত গণতান্ত্রিক প্রজাবিপ্লব—সাবেকী ও নয়া প্রতিবন্ধক

স্পেনের রাজতন্ত্র এবং গীর্জাতন্ত্রের কবল থেকে মুক্ত হয়ে ল্যাটিন আমেরিকার জনগণ প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করল। কিন্তু রাত ভোর হলে দেখা গেলো, তার আরেকটা অদৃশ্য সাম্রাজ্যের নাগপাশে আবদ্ধ হয়ে পড়েছে। এ সম্বন্ধে সচেতন হতে ল্যাটিন আমেরিকার জনগণের সময় লেগেছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত যখন বর্তমান শতকে মার্কিনি সাম্রাজ্যবাদীরা পরোক্ষ ভূমিকা ছেড়ে প্রত্যক্ষ সাম্রাজ্যবাদী ভূমিকা গ্রহন করেছে, তখন থেকে মুক্তি-আন্দোলনের ধারা নতুন খাতে প্রবাহিত ও প্রসারিত হয়েছে। আজ আমাদের সামনে এই ধারা বিপুলভাবে সম্প্রসারিত। এর লক্ষ্য সুনির্দিষ্ট হয়ে উঠেছে। এই মুক্তি সংগ্রামই হবে এখানে মূল আলোচ্য বিষয়। তবে একে পুরোপুরিভাবে বুঝবার জন্যই গত শতাব্দির সংগ্রামের পটভূমিকে ভাল করে জেনে নেওয়া দরকার।

গত শতাব্দিতে ১৮২৫ সালের মধ্যে ল্যাটিন আমেরিকাতে স্পেনের সাম্রাজ্য ভেঙ্গে টুকরো টুকরো হয়ে যাওয়ার পরে কিউবা, পুয়োর্টোরিকো এবং ফিলিপাইন ছাড়া আর সর্বত্র যে প্রজাতন্ত্রগুলি গড়ে ওঠে, তাদের বসবাসকারী জনগণের আশাআকাঙ্ক্ষা অনুযায়ী রাজনৈতিক ব্যবস্থা গড়ে ওঠার ব্যাপারটা নিজস্ব স্বাভাবিক গতিতে চলতে পারেনি। ল্যাটিন আমেরিকার উনিশ শতকের ইতিহাস এদিক দিয়ে জটিল ঘাত-প্রতিঘাতের ইতিহাস।

কিউবার জাতীয় মুক্তিসংগ্রাম—উনিশ শতকে

কিউবা দ্বীপে স্পেনের রাজকীয় আধিপত্য কায়েম থাকে এবং ঔপনিবেশিক রাজকীয় শৃঙ্খল ছিন্ন করার জন্য কিউবাতে চলতে থাকে মাঝে মাঝে গণঅভ্যুত্থান এবং খণ্ড খণ্ড সশস্ত্র সংগ্রাম, যাকে গেরিলা কায়দায় লড়াই বলা হয়। ল্যাটিন আমেরিকার আদিবাসীরা স্পেনিশ সাম্রাজ্যবাদীদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে এই পদ্ধতি প্রয়োগ করেছিল অষ্টাদশ শতক পর্যন্ত। ১৮৫০-৫১ সালে স্পেনের প্রতিদ্বন্দ্বী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মৌন-সম্মতিক্রমে নাসিমো লোপেজ নামক একজন কিউবান একটি সশস্ত্র বাহিনী নিয়ে দু'বার কিউবাতে অবতরণ করেন। দু'বারই এই অভিযান ব্যর্থ হয় এবং লোপেজকে গুলি করে মারা হয়। এর কিছুকাল পরে স্পেনের রাজকীয় চক্রের শাসনের বিরুদ্ধে একজন ক্রিওল জমিদারের নেতৃত্বে দশ বছর স্বাধীনতা যুদ্ধ চলে। এই স্বাধীনতা-যুদ্ধের দুটি বৈশিষ্ট্য ছিল: (১) আদর্শ স্বাধীন কিউবা, যা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যোগ দেবে না, (২) দ্বীপের পূর্বাঞ্চলে রক্তাক্ত গেরিলা কায়দায় খণ্ড খণ্ড সশস্ত্র সংগ্রাম পরিচালনা। এর ফলে ১৮৭৮ সালে রাজকীয় চক্রের শাসন কিছুটা শিথিল হয়। দাসপ্রথার অবসান ঘোষণা করা হয়। কিন্তু জাতীয় মুক্তিই ছিল মূল প্রশ্ন এবং এর সমাধানের জন্য এ সময়ে যিনি কিউবার বিপ্লবের পথ প্রদর্শক হিসাবে পরিচিত, সেই জোস মার্তির নেতৃত্বে নতুনতর বিদ্রোহের প্রস্তুতি চলতে থাকে। ১৮৯৫ সালে এই গণবিদ্রোহ আত্মপ্রকাশ করে জোস মার্তিরই নেতৃত্বে। তাঁর সঙ্গে যোগ দেন এর আগের বারের গেরিলা সংগ্রামের নেতা গোমেজ। কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই অবশ্য মার্তি নিহত হন। এই বিদ্রোহের ফলে আসে কিউবার আত্মনিয়ন্ত্রণের স্বীকৃতি ১৮৯৮ সালে। কিন্তু এই সময়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র স্পেনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে কিউবাতে সৈন্য নামিয়ে দেয়। ১৯০২ সাল পর্যন্ত

মার্কিনি সামরিক সরকার কায়েম থাকে কিউবাতে। তবে ইতোমধ্যে স্বাধীন কিউবাকে তাদের না স্বীকার করে উপায় ছিল না। ১৯০২ সালে তাই কিউবার প্রজাতন্ত্রের সূত্রপাত। এই ডামাডোলের মধ্যেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সেদিনকার অসম-চুক্তি মারফত কিউবার ভূখণ্ডে গুয়ানটিয়ানামোতে নৌঘাঁটি স্থাপনের ইজারা আদায় করে নেয়। সেই নৌঘাঁটি আজও কিউবার বুকের মধ্যে বেয়নেটের মতো বিঁধে আছে। এখানে উল্লেখ করে রাখা দরকার, এই সময়েই পুয়ের্টোরিকো এবং ফিলিপাইনে মার্কিনি কবজা জাঁকিয়ে বসে।

কিউবার অধিবাসীরা তাদের জাতীয় মুক্তিসংগ্রামের সেই জয়ের মুহূর্তে হয়তো মার্কিনি হস্তক্ষেপ এবং সামরিক ঘাঁটিকে খুব ছোট করে দেখেছিল। কারণ, সে সময়ে তাদের সামনে স্পেনের ঔপনিবেশিক আধিপত্য ও শোষণই সর্বপ্রধান সমস্যা। স্পেনের রাজকীয় চক্রের আমলা-ফয়লারা কিউবাবাসীদের হাড়-মাংস চিবিয়ে খেয়ে ফেলেছিল। সেইজন্য এই রাজকীয় চক্রের উৎখাতই ছিল প্রজাতন্ত্রীদের প্রধান কার্যক্রম। স্পেনিশ ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যবাদীরা কিউবাতে যে লুণ্ঠন চালিয়েছিল, তার চিত্র তীক্ষ্ণভাবে ফুটে উঠেছে স্পেনের কমিউনিস্ট নেত্রী লা পাসিওনারার একটি উক্তিতে। তিনি বলেছিলেন: "স্পেনের ঔপনিবেশিক দফতরের হাজার হাজার সামরিক ও বেসামরিক কর্মচারী কিউবার মতো একটি উপনিবেশের ইক্ষু সম্পদ, ক'ফি আর তামাক সব চেটেপুটে খেয়ে ফেলছিল।" এই অবস্থায় কিউবার অধিবাসীরা স্বতন্ত্র স্বাধীন প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠাতে সে দিন উৎফুল্ল হয়েছিল নিশ্চয়। এর পরে আসে ভিতর ও বাহিরের সমস্যা, বর্তমান শতাব্দির জমা খরচে তার আলোচনা করা যাবে।

এখানে কিউবার কথা আপাতত শেষ করার আগে জো মার্তির কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করা দরকার। আজকের সাম্যবাদী কিউবাতেও আমরা দেখতে পাব, হাভানার ময়দানে জোস মার্তির যে প্রতিমূর্তি রয়েছে, তার পাদদেশে ফুল দেওয়া হচ্ছে সরকারিভাবে। জোস মার্তি আজও জাতীয় মুক্তি-সংগ্রামের এবং গণতান্ত্রিক আদর্শের প্রতীক রয়ে গিয়েছেন! তিনি ছিলেন কবি এবং আদর্শবাদী লেখক এবং একই সঙ্গে মুক্তিযোদ্ধা। তিনি মুক্তিযুদ্ধের শহীদ সৈনিক হিসাবেই সম্মানিত।

মেক্সিকোতে ঘাতপ্রতিঘাত

ল্যাটিন আমেরিকার উনিশ শতকের প্রজাতান্ত্রিক সশস্ত্র অভ্যুত্থান ও সংগ্রামের পুরোধা ও প্রধান সংগঠক সাইমন বলিভার ঝড়ের মতো সারা মহাদেশ ঘুরে বেড়ালেও এবং ভেনিজুয়েলা প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করে সফলতার পতাকা উড়ালেও ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে উদ্বিগ্ন ছিলেন এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মতিগতি যে শুভ হবেনা সে সম্বন্ধে হুশিয়ারি দিয়েছিলেন। স্পেনের সাম্রাজ্য ভেঙ্গে যাবার পরেই মার্কিন, ফরাসি, জার্মেন এবং ব্রিটিশ পুঁজিপতি এবং ব্যবসায়ীরা ঝাঁপিয়ে পড়ল নতুন ধরণের পঙ্গপালের মতো। সে সময়ে তাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি মারমুখো ছিল বৃটেন ও ফ্রান্স। যখন মেক্সিকো প্রজাতন্ত্রের নেতা জুয়ারেস বিদেশি ঋণ শোধ স্থগিত করেছিলেন, তখন স্পেন, বৃটেন এবং ফ্রান্স ১৮৬১ সালে মেক্সিকোতে সেনাবাহিনী নামিয়ে মেক্সিকোর সার্বভৌমত্বকে ধ্বংস করতে প্রয়াসী হয়। ব্রিটিশ ও স্পেনিশ সেনাবাহিনী প্রাথমিক উত্তেজনার পর সরে

গেলেও ফরাসি সেনাবাহিনী সেখানে থেকে যায়। তারা মেক্সিকোর রাজধানী-শহর দখল করে ১৮৬৩ সালে ইউরোপের অষ্ট্রিয়ার রাজা ম্যাক্সিমিলিয়ানকে সম্রাট বলে ঘোষণা করে প্রজাতন্ত্রকে খতম করে দিতে চেষ্টা করে। মেক্সিকোর জনসাধারণ নতুনভাবে প্রজাতন্ত্র রক্ষা ও জাতীয় মুক্তির জন্য লড়াইতে প্রবৃত্ত হলেন এবং শেষ পর্যন্ত জয়ী হলেন। ১৮৬৭ সালে মেক্সিমিলিয়ান এবং ফরাসি সামরিক বাহিনীর শোচনীয় পরাজয় ঘটে।

মেক্সিকো প্রজাতন্ত্র সেদিনকার মতো রাহুমুক্ত হয়

উনিশ শতকের মেক্সিকোর ভূমিকাকে এদিক দিয়ে বর্তমান শতাব্দির কিউবার সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে। শুধু তাই নয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শুরু পর্যন্ত বর্তমান শতাব্দিতেও মেক্সিকো ল্যাটিন আমেরিকার গণমুক্তি বিপ্লবের সূতিকাগার হিসাবে চিহ্নিত হয়ে এসেছে। সে আলোচনা পরে হবে। তবে সমস্ত পশ্চিমী শক্তি একত্রিত হয়ে মেক্সিকোকে উনিশ শতকেও দমন করতে পারেনি। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র মেক্সিকোর উপর চড়াও হয়ে ভূখণ্ড কেড়ে নিয়েছে, কিন্তু প্রজাতন্ত্রের মর্মভূমিকে কখনো শত হুমকি কিংবা প্রলোভনেও করায়ত্ত করতে সক্ষম হয়নি। মেক্সিকো সাম্রাজ্যবাদীদের কাছে তখন থেকেই প্রহেলিকা।

সাম্রাজ্যবাদী অর্থপুঁজি নিয়োগের সূত্রপাত

শুধু মেক্সিকোতে নয়, সাধারণভাবে সমগ্র ল্যাটিন আমেরিকাতে মার্কিনিদের সঙ্গে সঙ্গে আগু-পিছু করে সমস্ত পশ্চিমী সাম্রাজ্যবাদীচক্র পুঁজি খাটিয়ে সস্তা মজুরদের শোষণ করে মুনাফার পাহাড় জাহাজে চাপিয়ে লন্ডন, প্যারী, বার্লিন, নিউইয়ার্কের ব্যাংকে জমা করার পথ নিয়েছিল। এই অর্থের ফাঁসে যারা আটকা পড়েছিল, তারা সকলে এর পূর্ণ তাৎপর্য তখনও বুঝতে পারেনি। প্রথম মহাযুদ্ধের আগে যেসব হিসাব পাওয়া যায় তাতে দেখা যায়, ব্রাজিলের রেলওয়ে তৈরি করার ব্যাপারে ফরাসি, বেলজিয়ান, ব্রিটিশ আর জার্মেন পুঁজি খাটছে। লেনিনের লেখা 'সাম্রাজ্যবাদ' গ্রন্থে উদ্ধৃত একটি মার্কিনি হিসাবে পাওয়া যায়: "দক্ষিণ আমেরিকায় পাঁচটায় জার্মেন ব্যাংকের ৪০টা শাখা আছে এবং পাঁচটা ব্রিটিশ ব্যাংকের ৭০টা শাখা আছে। বৃটেন এবং জার্মেনি আর্জেন্টাইন, উরুগুয়ে এবং ব্রাজিলে গত ২৫ বছরে প্রায় ৪০০ কোটি ডলার নিয়োগ করেছে এবং এর ফলে তারা এই তিন দেশের সমগ্র ব্যবসা-বাণিজ্যের শতকরা ৪৬ ভাগ ভোগ করছে।" আরেকটা হিসাবে দেখা যায়, ১৯১৩ সাল নাগাদ বিদেশি পুঁজি নিয়োজিত রয়েছে ৬২১ কোটি ডলার। এর মধ্যে মার্কিনি পুঁজি তখনও অবশ্য প্রধান হয়ে ওঠেনি। তার ঝোঁক ছিল ল্যাটিন আমেরিকারা বাগিচা ও খনিজ সম্পদের ইজারা নিয়ে সেগুলি থেকে কাঁচামাল আর পণ্যদ্রব্য পানির দরে সংগ্রহ করে পশ্চিমী দেশগুলির, অর্থাৎ মার্কিন, ব্রিটিশ, ফরাসি, ডাচ, বেলজিয়ান, জার্মেন প্রভৃতি শিল্পোন্নত দেশগুলির খোরাক যোগানো। এরই পরিপূরক লক্ষ্য ছিল ল্যাটিন আমেরিকাকে ইউরো-মার্কিন শিল্পপণ্যের একচেটিয়া বাজার করে রাখা। এর মধ্যে প্রধান প্রতিবন্ধক ছিল সেদিন বিদ্রোহী মেক্সিকো।

বৃহৎ ভূস্বামী প্রথা ল্যাটিফুন্ডিয়া ও সাম্রাজ্যবাদের মিতালি

স্পেন-সাম্রাজ্যের ধ্বংসস্তূপের মধ্যে ল্যাটিন আমেরিকার প্রজাতন্ত্রসমূহের গোড়াপত্তন হলেও উনিশ শতকে এবং বিশ শতকেও একমাত্র মেক্সিকো ছাড়া সাম্রাজ্যিক আমলের বৃহৎ ভূস্বামী-প্রথা প্রায় সর্বত্র বহাল থেকে যায়। মেক্সিকোতেও আজ পর্যন্ত এই প্রথার বিরুদ্ধে সংগ্রাম চলছে। এই প্রথা প্রতিক্রিয়ার মূল আভ্যন্তরীণ ঘাঁটি হিসাবে কাজ করে আসছে উনিশ শতকের সমস্তরকম গণতান্ত্রিক আশা আকাঙ্ক্ষাকে পর্যুদস্ত করে দিয়ে। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, গির্জাগুলি বৃহৎ জোতজমার মালিক হওয়ায় প্রথমাবধি সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থ ও স্বৈরতন্ত্রকে সমর্থন করে এসেছে।

ল্যাটিন আমেরিকার অধিকাংশ দেশে আজও শতকরা আশিভাগ লোকের কোন চাষের জমি নেই। মুষ্টিমেয় মালিকের হাতে রয়েছে দেশের অধিকাংশ জমি। একটি হিসাবে দেখা যায়, যাদের হাতে জমি, তাদের শতকরা ২.২ জনের কবজায় রয়েছে সমগ্র জমির শতকরা ৫৮ ভাগ এবং চাষযোগ্য জমির শতকরা ১৮.৫ ভাগ। এর অর্থ এই যে মুষ্টিমেয় মালিক দেশের প্রায় অর্ধাংশের মালিক। এই মালিকদের হাতেই খনি, খামার আর বাগিচার চাবিকাঠি। যে মূল তাগিদ নিয়ে প্রজাতন্ত্র স্থাপনের জন্য অভ্যুত্থান ঘটেছিল, তাকে এই মালিকরা চাপা দিয়ে এসেছে।

ল্যাটিন আমেরিকার জনগণ যে ত্রিবিধ শোষণের অবসানের জন্য সংগ্রাম করছে, তার একটি হচ্ছে বৃহৎ ভূস্বামী প্রথা লাটিফুন্ডিয়া। এই সামন্তবাদী ভূমিব্যবস্থায় শতাব্দির পর শতাব্দি ধরে অধিকাংশ জমি রয়ে গিয়েছে মুষ্টিমেয় জমিদার জোতদারের হাতে। আসল যারা চাষী তাদের অধিকাংশই অতি অল্প পরিমাণ জমির অধিকারী অথবা ভূমিহীন। এই ভূমিহীনতার প্রথার নাম মিনিমিফুন্ডিয়া। কিউবাতে অবশ্য সাম্প্রতিক বিপ্লবের পরে এই প্রথার শেষ হয়েছে। সামন্তবাদী বৃহৎ ভূস্বামী প্রথাকে খতম করা হয়েছে, খোদ চাষীদের মধ্যে জমি বিলিবণ্টন করে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু ল্যাটিন আমেরিকার অন্যান্য দেশে এই প্রথার উচ্ছেদ সাধনের সংগ্রাম আজও চলছে। এই সংগ্রাম ল্যাটিন আমেরিকার জনগণের সর্বাত্মক মুক্তিসংগ্রামের অবিচ্ছেদ্য ধারা। কারণ, বৃহৎভূস্বামী প্রথার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার অর্থই হচ্ছে গণতন্ত্রের জন্য সংগ্রাম করা, সাম্রাজ্যবাদী কবজার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা। বৃহৎ ভূস্বামী প্রথা একদিকে ল্যাটিন আমেরিকার দেশে দেশে স্বৈরাচারী সরকারের স্তম্ভস্বরূপ।

আবার, এই বৃহৎ ভূস্বামী প্রথার দরুণই বিশেষ করে মার্কিন বৃহৎ পুঁজিপতি সাম্রাজ্যবাদীরা ল্যাটিন আমেরিকাতে জামিয়ে বসে থাকতে পারছে। সাম্রাজ্যবাদীরা বৃহৎ ভূস্বামীদের বিরাট বিরাট ভূমিখণ্ড ইজারা নিয়ে লৌহ-আকর এবং তেলের খনি থেকে শুরু করে কফি এবং কলার বাগিচাতে ডলার খাটাচ্ছে। সাম্রাজ্যবাদীদের কাছ থেকে প্রচুর উপস্বত্ব পেয়ে বৃহৎ ভূস্বামীরা স্বাভাবিকভাবেই জমিকে চাষের কাজে লাগাবার ব্যাপারে উপেক্ষা দেখিয়ে এসেছে। একদিকে তারা যেমন সাম্রাজ্যবাদীদের হাতে নিজেদের দেশের সম্পদ তুলে দিয়েছে, তেমনি সাম্রাজ্যবাদীদের সহায়তায় চাষীদের জমির দাবিকেও দমন করে আসছে। মার্কিন বৃহৎ পুঁজিবাদ এবং সামন্তবাদের এই সম্মিলিত লুণ্ঠন আর শোষণের ভাগীদার হচ্ছে সামরিক আমলাতন্ত্র। তারা ইতোমধ্যেই যে মুনাফার অংশ পেয়েছে, তা থেকে নাতি-বৃহৎ পুঁজিপতি হয়ে উঠেছে

এবং জনগণের মুক্তিসংগ্রামকে নিজ শ্রেণি স্বার্থেও ঠেকিয়ে রাখার চেষ্টা করছে। তারা সরকারকে পরিণত করেছে সাম্রাজ্যবাদের সেবাদাসে। সুতরাং বৃহৎ ভূস্বামী প্রথাকে অপসারিত করার কার্যক্রম হচ্ছে ল্যাটিন আমেরিকার জনগণের মুক্তিসংগ্রামের মূল কার্যক্রমের অন্যতম। তাঁবেদার সরকারগুলির বিরুদ্ধে জনগণের সংগ্রামের কার্যক্রমে রয়েছে ভূমিবিপ্লবের তাগিদ। এখানে বৃহৎ ভূস্বামী প্রথা সম্বন্ধে একটা ধারণা দেওয়ার জন্য কয়েকটি দেশের হিসাব দৃষ্টান্তস্বরূপ পেশ করা হল।

চিলি (১৯৬৪-৬৫ সালের হিসাব) দুই লক্ষ তিপ্পান্ন হাজার ৪৯২টি কৃষি ক্ষেতের মধ্যে ৩৩৩১টি ক্ষেতেই (খামারে) দেশের শতকরা ৭২.৭ জমি। এই ধরণের প্রত্যেকটি খামারেই ২৫০০ একরের বেশি জমি। অন্যপক্ষে ৭৪ হাজার ১২০টি কৃষিক্ষেতে সবমিলিয়ে দেশের শতকরা ৭.৭ ভাগ জমি। মাঝামাঝি ধরণের ভূমাধিকারীর সংখ্যা ১৯,৩৩৩। এদের হাতে সবমিলিয়ে শতকরা ১৮.২ ভাগ জমি। ১৯৬০ সালের একটি হিসাবে দেখা যায়, গ্রামীণ পরিবারের শতকরা ৭০ ভাগেরই দৈনিক আয় মাত্র পরিবার প্রতি ১.৪৫ এসকুডোস (সাড়ে চার টাকা), অপরদিকে জমিদার পরিবারগুলির প্রত্যেকের দৈনিক আয় ৪৬ এসকুডোস (১৩৮ টাকা)।

প্যারাগুয়ে (১৯৬৮ সনের হিসাব)

১৫০০ বড় জমিদার পরিবার রয়েছে। এদের মধ্যে পঁচিশ পরিবারের হাতে রয়েছে ৪ কোটি দশ লক্ষ একর জমি। অপরদিকে ১৯৬০ সালের হিসাব অনুযায়ী ভূমিহীন চাষীর সংখ্যা এক লক্ষ বিশ হাজার। ইতোমধ্যে এই সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে।

হাইতি (১৯৬৮ সালের হিসাব)

পাঁচ একর পর্যন্ত জমির মালিক এমন এক লক্ষ উনচল্লিশ হাজার গরিব কৃষকের হাতে রয়েছে দেশের সর্বমোট শতকরা দশভাগ জমি। ৬১ হাজার মধ্যম কৃষকের হাতে রয়েছে শতকরা ২০ ভাগ জমি। আর বিশ হাজার বড় জোতদার জমিদারের হাতে রয়েছে দেশের শতকরা ৬৬ ভাগ জমি।

পেরু

৫০ একর পর্যন্ত জমির মালিক এমন কৃষকদের হাতে রয়েছে দেশের জমির শতকরা ২১ ভাগ। ২৫০ একর পর্যন্ত জমির মালিক এমন ভূস্বামীদের হাতে রয়েছে শতকরা ১৩ ভাগ জমি। ২৫০ একরের বেশি জমির মালিক এমন ভূস্বামীদের হাতে রয়েছে শতকরা ৬০ ভাগ জমি।

ইকুয়েডর

মুষ্টিমেয় সংখ্যক জমিদার জোতদারের হাতে রয়েছে দেশের শতকরা ৬০ ভাগ জমি। অপরিমেয় অধিকাংশ কৃষিজীবীর হাতে রয়েছে শতকরা ২০ ভাগ জমি।

এখানে আরো একটি ছবি দাখিল করলে ল্যাটিফুন্ডিয়া সমস্যাটিকে ভাল করে বুঝতে পারা যাবে। ল্যাটিন আমেরিকার মুক্তি সংগ্রামে বৃহৎ ভূস্বামী প্রথা বিলোপের কর্মসূচি শুধু যে বারবার কৃষকবিদ্রোহের রূপ নিয়েছে, তাই নয়। গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার অবিশ্রান্ত প্রচেষ্টার সঙ্গে সঙ্গে ভূমিসংস্কার বিধির জন্যও চাপ দেওয়া হয়েছে। কোথাও ভূমিসংস্কার বিধি প্রবর্তিত হয়ে প্রাথমিক সাফল্য লাভ করেছে। কোথাও বা আনুষ্ঠানিকভাবে গৃহীত হবার পরে পরিত্যক্ত না হলেও ভূমাধিকারী-গোষ্ঠীর রাজনৈতিক ক্ষমতার দরুণ ভূমিসংস্কারবিধিগুলি অকেজো হয়ে রয়েছে। কোথাও সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থ ও বৃহৎ ভূস্বামীদের চাপে ভূমিসংস্কার বিধি প্রতারিতও হয়েছে। কোথাও ডান হাতে নিঃস্ব কৃষকদের জমি দিয়ে বাঁ হাতে নিয়ে নেওয়ার ব্যবস্থা হয়েছে। নিম্ন প্রদত্ত বিবরণ পড়লেই এ কথা বুঝতে পারা যাবে।

মেক্সিকোতে

মেক্সিকোতে জনগণ শোষণমুক্ত সমাজ আর জনগণতন্ত্রের জন্য বর্তমান শতাব্দির শুরুতে যে সশস্ত্র সংগ্রাম আরম্ভ করে, তার চূড়ান্তত্ব শিখরে ১৯১৫ সালে ভূমি সংস্কারের ঘোষণা জারী হয়। এই ঘোষণায় কৃষকদের মধ্যে এজিদোস বা চাষী-পঞ্চায়েতের মাধ্যমে জমি চাষের কথা বলা হয়। এই কর্মসূচিতে বৃহৎ জোতজমিগুলিকে বাধ্যতামূলকভাবে ভাগ করে দেওয়ার কথা বলা হয় এবং জমির উচ্চতম সীমানাও নির্ধারিত করে দেওয়া হয়। এরপরে ১৯৩৫-৪০ সালে সামন্তবাদ-বিরোধী তথা বৃহৎ ভূস্বামী প্রথা-বিরোধী সংগ্রাম একটা অভ্যুত্থানের রূপ পরিগ্রহণ করে। সেদিন বিপ্লবী ধ্যান-ধারণা সম্পন্ন প্রেসিডেন্ট লাজারো কার্দেনাসের আমলে বৃহৎ ভূস্বামীদের উপর চূড়ান্তত্ব আঘাত হানা হয়। এই সময়ে ৬ কোটি একর জমি কৃষকদের মধ্যে বিলি করে দেওয়া হয়। কিন্তু ১৯৭০ সাল নাগাদ পৌঁছেও এই সমস্যার পুরোপুরি সমাধান হয়নি। দেশি পঞ্চায়েত বা এজিদোসের আওতায় ১৫ লক্ষ গৃহস্থালি রয়েছে। এর বাইরে রয়েছে ১০ লক্ষ গৃহস্থালি, যাদের জমির পরিমাণ গৃহস্থালির গড় হিসাবে সাড়ে বারো একর। এদের মধ্যে অনেকের জমি সাড়ে চার একরের বেশি হবে না। এ ছাড়া মেক্সিকোতে ৬৮ সালের হিসাবে দেখা যায়, ১০ লক্ষ চাষীর কোনো জমি নেই। কৃষিমজুরের এক বিরাট বাহিনী রয়েছে যারা কেউ বা সারা সময় কাজ পায়, কেউ বা আংশিক। এই ব্যাপারটা কিভাবে ঘটলো?

কারণ খুঁজলে আমরা দেখবো, ১৯১৫ সালে যে ভূমি সংস্কার বিধি জারি করা হয়, তাতে বৃহৎ ভূস্বামী প্রথা সম্পর্কে কয়েকটা ফাঁক থেকে গিয়েছিল। এতে জমির উচ্চতম সীমানা নির্ধারণ করে দেওয়া হয়েছিল আড়াইশ' একর। ১৯৪০ সালে এই বিধির উপর যে সংশোধন আসে কার্দেনাসের আমল শেষ হবার পরে, তাতে ধনতান্ত্রিক ভিত্তিতে মুষ্টিমেয়ের হাতে জমি কেন্দ্রিভূত সুবিধা করে দেওয়া হয়। মেক্সিকোতে এই সুবিধাভোগী ব্যবস্থার নাম দেওয়া হয়েছে "নাইলন ল্যাটিফুন্ডিয়া।" ১৯৬০ সালের একটা হিসাবে দেখা যায়, ৩৮৫৪ টা জোত রয়েছে যাদের প্রত্যেকের জমির পরিমাণ সাড়ে বারো হাজার একর অথবা এর থেকেও বেশি।

মধ্য আমেরিকার কয়েকটি দেশে

মেক্সিকোর ঠিক দক্ষিণে মধ্য আমেরিকার গলায় ছোট ছোট ছয়টি দেশ—কস্টারিকা, এল সালভাদর, গুয়াতেমালা, হন্ডুরাস, নিকারাগুয়া এবং পানামা। এই দেশগুলি একান্ত ভাবে বাণিজ্যিক ফসল-নির্ভর (কলা, কফি এবং অন্যান্য)। এদের প্রত্যেকেরই ভূমিহীন চাষীর সংখ্যা তুলনামূলকভাবে অত্যাধিক। এখানে জমির মালিকানাতে প্রাধান্য রয়েছে মার্কিনি প্রতিষ্ঠানগুলির। সুতরাং এই সব দেশে ভূমিসংস্কারের প্রচেষ্টা প্রধান বাধার সম্মুখীন হয়েছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কাছ থেকে। উদাহরণস্বরূপ গুয়াতেমালার কথা বলা যাক।

গুয়াতেমালায়

১৯৪৪ সালের অক্টোবর মাসে গুয়াতেমালাতে যে গণতান্ত্রিক বিপ্লবের সূত্রপাত হয় মার্কিনি তাঁবেদার স্বৈরাচারি শাসক চক্রের উচ্ছেদ সাধন করে, তার কর্মসূচির শীর্ষস্থানে থাকে সামান্তবাদের তথা বৃহৎ ভূস্বামী প্রথার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ। ১৯৫২ সালে ভূমিসংস্কার বিধান জারী হল। চাষী এবং কৃষিমজুরদের জমি দেওয়া হলো একেবারে নামমাত্র মূল্যের কড়ারে। ঠিক হলো চাষীরা পঁচিশ বছর ধরে ফসলের শতকরা তিন থেকে পাঁচ ভাগ সরকারকে দেবেন মূল্য বাবদ। সরকারের তরফ থেকে সমবায় প্রথাকে উৎসাহিত করা হল। জমির সর্বোচ্চ সীমানা নির্ধারিত হলো ৬০০ একর। এর বেশি জমি বাজেয়াপ্ত করে নেওয়া হল।

বৃহৎ ভূস্বামীরা এই ভূমিসংস্কারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করল। বৃহৎ ভূস্বামীদের মধ্যে রয়েছে মার্কিনি ইউনাইটেড ফ্রুটকোম্পানি। এই কোম্পানি গুয়াতেমালার সবচেয়ে ভাল জমির প্রায় দশ লক্ষ একরের মালিক। ১৯৫৪ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে লালিত পালিত ও শিক্ষা প্রাপ্ত এবং নামে গুয়াতেমালান ভাড়াটে সেনাবাহিনী গণতান্ত্রিক সরকারকে অপসারিত করল এবং ১৯৫২ সালের ভূমিসংস্কার আইন নাকচ হয়ে গেল। এই তাঁবেদারদের আমলে কিছু চাষীকে জমি দিয়ে একটা নামকাওয়াস্তে ভূমিসংস্কার করা হয়েছে। বৃহৎ ভূস্বামীদের গায়ে হাত দেওয়া হয়নি।

ব্রাজিলে

প্রায় ৮ কোটি লোকসংখ্যা সমন্বিত এই বৃহৎ দেশের অর্ধেকেরও বেশি অধিবাসী কৃষিকাজে নিয়োজিত। তবু আবাদ-উপযোগী জমির নামমাত্র শতকরা ৪.৪ ভাগে চাষ হয়। ১৯৬০ সালের প্রথম দিকের হিসাবে দেখা যায়, ১৫ লক্ষ ছোট ছোট জোতের মালিকানায় রয়েছে সবসমেত প্রায় ১ কোটি ৩৫ লক্ষ একর (গড়পড়তা প্রতি জোত ১০ একরের কিছু কম)। অপরদিকে ১৭১০টা বৃহৎ জোতের মালিকানায় রয়েছে ১৩ কোটি একর জমি। এই ভূস্বামীদের প্রত্যেকের রয়েছে প্রায় ২৫ হাজার একর জমি। ভূমিসংস্কারের জন্য বিভিন্ন রাজনৈতিক দল চাপ দিয়েছে, বৃহৎ ভূস্বামীদের তরফের অবিশ্রান্ত বাধার দরুণ এদিক দিয়ে কিছুই এগোয়নি। মার্কিনি তাঁবেদাররা একটা লোক দেখানো ভূমিসংস্কার বিধির কর্মসূচি নিয়েছে। কিন্তু এর লক্ষ্য হিসাবে ধরা হয়েছে মালিকানাবিহীন জমিতে চাষীদের নিয়ে বসানো। অর্থাৎ বৃহৎ ভূস্বামী প্রথার গায়ে আঁচড় লাগেনি।

ভেনিজুয়েলাতে

১৯৬০ সালের মার্চ মাসে ভূমি সংস্কার আইন জারী হয়েছে। তদানুসারে প্রতিমাসে দুই হাজার চাষী পরিবারকে ষাট সত্তর একর করে জমি দেওয়া হচ্ছে। ১৯৬৮ সালের হিসাবে দেখা যায়, এখনও ৫ লক্ষ চাষী পরিবার জমি পায়নি। যে হারে বণ্টন চলেছে, সেটাই চলতে থাকলে ১৯৮৫ সাল নাগাদ চাষীরা জমি পাবে। এই দীর্ঘসূত্রী ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে কায়েমি স্বার্থবাদীরা গুছিয়ে বসতে চাইছে।

পেরুতে

১৯৬৪ সালে একটা ভূমি সংস্কার আইন জারী হয়েছে। এতে প্রত্যেক বছর আটশত পরিবারকে জমি দেওয়া হবে। যেহেতু পেরুতে দশ লক্ষ্যেরও বেশি ভূমিহীন চাষী রয়েছে, সেজন্য হাজার বছর লাগবে জমি বণ্টন সমাপ্ত হতে।

আর্জেন্টিনায়

আর্জেন্টিনা এবং উরুগুয়ে হচ্ছে ল্যাটিন আমেরিকার মধ্যে সবচেয়ে বেশি কৃষিপণ্য উৎপাদক দেশ। কিন্তু এই দুটি দেশেই কোনো ভূমিসংস্কারের ব্যবস্থা প্রায় করাই হয়নি। আর্জেন্টিনায় গ্রামীণ মেহনতী বাসিন্দাদের তিন পঞ্চমাংশেরই কোনো জমি নেই। দেশের চাষযোগ্য জমির অর্ধেকেরও বেশি চারণ-ভূমি হিসেবে ব্যবহৃত হয়। পশু পালনের খামারগুলি বৃহৎ মালিকানার অন্তর্ভুক্ত। গরিব চাষী কিংবা ভাগচাষীদের উপর চলেছে চূড়ান্ত জুলুম ও শোষণ। ১৯৫৬ সালে একটা নামকাওয়াস্তে ভূমিসংস্কার বিধিতে ভাগচাষীদের যে ব্যবস্থা দেওয়া হয়েছে জমি কিনে নেওয়ার জন্য, তাতে অসুবিধাই হয়েছে বেশি। কারণ, তাদের হাতে অর্থ নেই। সাবেক চুক্তিকেই চাষীরা বহাল রাখছে। তা নাহলে জমি থেকে তারা উৎখাত হয়ে যাবে। তাছাড়া জমির খাজনা বৃদ্ধির দরুন এক লক্ষ গরিব চাষী তাদের স্বল্প পরিমাণ জমি থেকেও উৎখাত হয়ে যেতে পারে।

১৯৬৭-৬৮ সালের একটি হিসাবে দেখা যায়, সবচেয়ে ভাল চাষযোগ্য জমির শতকরা ৬৮ ভাগ রয়েছে বৃহৎ ভূস্বামীদের মালিকানাধীন। গরিব চাষীদের সংখ্যা হবে ১ লক্ষ ৩০ হাজার। এদের হাতে রয়েছে চাষযোগ্য জমির মাত্র ২.৩ ভাগ। ১৯৬২ সালে প্রথম ভূমিসংস্কার আইন জারী হয়। এতে সরকারি অনাবাদী জমি "কিছুটা শস্তা দরে" গরিব চাষীদের কাছে বিক্রি করার কথা বলা হয়েছে। কিন্তু বৃহৎ ভূস্বামীদের গায়ে হাত দেওয়া হয়নি। ১৯৬২ থেকে ১৯৬৬ সালের হিসাবে দেখা গিয়েছে, মাত্র ৩ হাজার ৮৫০ টি পরিবার জমি পেয়েছে। ১৯৬৭ সালের জুলাই মাসে একটা আইন পাশ হয়েছে জমির সর্বোচ্চ সীমানা ২০০ একরে বেঁধে দেওয়ার জন্য। কিন্তু জমি কেন্দ্রীয়-করণের বহু ফাঁক রয়ে গিয়েছে। এতদ্‌সত্ত্বেও বৃহৎ ভূস্বামীরা এই আইন কার্যকরীকরণে প্রচণ্ড বাধা দিচ্ছে।

বলিভিয়ায়

কায়েমি স্বার্থবাদী শাসকচক্রের বিরুদ্ধে ১৯৫৩ সালের ২রা আগস্ট যে প্রচণ্ড গণবিক্ষোভ ঘটে, তার আনুকূল্যে এই দেশে একটা ভূমিসংস্কার আইন প্রবর্তিত হয়।

এতে ক্ষতিপূরণ দিয়ে বৃহৎ জোটগুলিকে বাজেয়াপ্ত করার ব্যবস্থা করা হয়। বেগার-প্রথা এবং ভাগচাষ প্রথা রহিত করা হয় এবং আদিবাসীদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা হয়। ১ লক্ষ ৫০ হাজার চাষী পরিবার জমি পায়। কিন্তু তারা এত নিঃস্ব যে সঙ্গে সঙ্গে রাষ্ট্রের তরফ থেকে আর্থিক ও কারিগরি সাহায্য না পাওয়ার দরুণ তাদের অধিকাংশই জমি রাখতে পারেনি। তারা আবার বৃহৎ ভূস্বামী অথবা পুঁজিপতিদের ভূমিদাসে পরিণত হয়েছে।

॥ ২॥

নয়া ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যবাদী শোষণের ক্ষেত্র

বর্তমান শতাব্দির এবং বিশেষ করে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রারম্ভে ল্যাটিন আমেরিকাতে যে পরিস্থিতির উদ্ভব হয়, তাকে মোটামুটি নিম্নোক্তভাবে সংক্ষেপে চিহ্নিত করা যেতে পারে:

(১) আর্জেন্টিনা সমেত বিভিন্ন ছোটবড় প্রজাতন্ত্র নিজেদের মধ্যেকার সীমানা-সংক্রান্ত বিরোধ মিটাতে পারেনি। তবে তারা প্রত্যেকেই মোটামুটি ভৌগোলিক অখণ্ডতাসম্পন্ন জাতীয় রাষ্ট্রের কাঠামোতে পৌছেছে। এই কাঠামোতে অন্যতম স্তম্ভ হয়ে দাঁড়িয়েছে সামরিক বাহিনী। দেশে দেশে যে সশস্ত্র গণবাহিনী স্পেনের সাম্রাজ্যিক ফৌজের বিরুদ্ধে লড়েছিল এবং গড়ে উঠেছিল স্বাধীনতা রক্ষার জন্য, তাদের প্রধানেরা জাতীয় রাষ্ট্রগুলির প্রথমত রক্ষক এবং শেষ পর্যন্ত সরকারি ক্ষমতার ভক্ষক হয়ে উঠেছে। সীমানা-নির্ধারণী যুদ্ধের মধ্য দিয়ে এরা যে প্রাধান্য পেয়েছিল, তাতে এবং মাঝে মাঝে আদিবাসী এবং মেষ্টিজোদের বিক্ষোভকে শান্ত করার মাধ্যমে এরা যে তৎপরতা দেখিয়েছে, তাতে এরা ক্ষমতাভোগীর শিরোপা নিয়েছে।

(২) বৃহৎ ভূস্বামী প্রথা অব্যাহত থাকার দরুণ কৃষি-উৎপাদন নিম্নস্তরে রয়ে গিয়েছে এবং সাম্রাজ্যবাদী শিল্প-পণ্যের অর্থনীতির সংগে বৃহৎ ভূস্বামীপ্রথার যোগসাজশ হওয়ায় দেশীয় প্রাথমিক শিল্পোন্নয়নও শ্বাসরুদ্ধ হয়ে রয়েছে। আভ্যন্তরীণ অর্থনৈতিক অবস্থা একান্ত অনুন্নত, দুর্বল এবং পরনির্ভর। একেকটি বিশেষ কাঁচামাল উৎপাদন ও তার রফতানির উপর নির্ভরশীল হয়ে উঠেছে জাতীয় অর্থনীতি। স্থানীয় পুঁজির গঠন প্রক্রিয়া নিরুৎসাহিত। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে, বলিভিয়ার খনিজ টিন এবং মেক্সিকোর তেলে এই দুই দেশের শিল্পোন্নয়ন হচ্ছে না।

(৩) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং পশ্চিম ইউরোপের শিল্পোন্নত দেশগুলির একচেটিয়া বৃহৎ পুঁজিপতি ও ব্যবসায়ীরা ল্যাটিন আমেরিকার খনিজ সম্পদ, বাগ-বাগিচা এবং বাজারের কর্তৃত্ব এবং মালিকানা করায়ত্ত করে নিয়েছে। তাদেরই হাতে চলে গিয়েছে অর্থনৈতিক চাবিকাঠি। খনি এবং বাগিচাতে যে পুঁজি খাটছে, তার মুনাফা বাইরে চলে যাচ্ছে।

(৪) সামগ্রিক রাজনৈতিক ক্ষেত্রে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র অনেক আগে থেকেই অর্থাৎ ১৮২৩ সালে প্রেসিডেন্ট মনরোর ঘোষণা-মারফত আমেরিকা মহাদেশের অভিভাবকের ভূমিকা গ্রহণ করলেও, প্রেসিডেন্ট লিঙ্কনের আমলে গৃহযুদ্ধের দরুণ কিছুকাল আলগা থেকে যায়। বিম শতকের শুরুতে দেখা যায়, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র রাজনৈতিকভাবে অনেক বেশি সক্রিয় হয়ে উঠেছে। ১৮৯০ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে আন্তঃআমেরিকা

সংঘ' গঠনের মধ্য দিয়ে এবং পরবর্তীকালে 'নিখিল আমেরিকা সংঘের' মাধ্যমে এবং বিশেষ করে কিউবাতে সেনাবাহিনী নামিয়ে মার্কিনিরা তাদের অবস্থানকে জোরদার করে। এর অর্ধশতাব্দি আগে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিগ্রো ক্রিতদাসের মালিকেরা কয়েক কোটি ডলার দিয়ে স্পেনের কাছ থেকে কিউবা কিনতে চেয়েছিল; স্পেন ফ্রান্সের কাছে কিউবা দ্বীপ বিক্রি করে দিতে চেয়েছিল, কিন্তু বৃটেন এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিরোধিতার দরুণ সেটা সম্ভব হয়নি। দ্বিতীয় মার্কিন প্রেসিডেন্ট আডামস বলেছিলেন, স্পেন থেকে ছিন্ন হওয়া মাত্র কিউবা দ্বীপ মাটিতে আপেল ফল পড়ার মতো মাধ্যাকর্ষণ শক্তির টানে মার্কিনি হয়ে যেতে বাধ্য। বৃটেন ও ফ্রান্স এই ধারণার ঘোরতর বিরোধিতা করেছিল। উনিশ শতকের শেষে এবং বিশ শতকের প্রারম্ভে দেখা যায়, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র গা ঝাড়া দিতে শুরু করেছে। ১৯০৩ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কলম্বিয়ার একাংশ দখল করে যে 'পানামা স্বাধীন প্রজাতন্ত্র' কায়েম করে, তার কাছ থেকেই পানামা খাল এলাকা আদায় করে নেয়। ১৯০৫ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র স্যান্টো ডোমিংগোর অছিগিরি আদায় করে নেয়। অবশ্য এর আঘাতটা সরাসরি বৃটেন কিংবা ফ্রান্সের গায়ে খুব বেশি লাগেনি।

(৫) শোষিত ও নির্যাতিত জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষা অসংগঠিত প্রয়াসে আবদ্ধ। নির্বাচিত সরকারগুলি গঠিত হচ্ছে অত্যন্ত ক্ষণস্থায়ী কার্যক্রম ও প্রতিশ্রুতির ভিত্তিতে। ব্যক্তিত্বই হচ্ছে রাজনীতিজ্ঞতার মাপকাঠি। অভিজাত পরিবারগুলি থেকে বাছাই হচ্ছে রাষ্ট্রনায়ক। সরকারের চরিত্র হচ্ছে সাধারণত ক্রিওল অলিগার্কি বা শ্বেতাঙ্গ ধনবানদের প্রশাসন। এদের সঙ্গে কদাচিৎ কোথাও মেস্টিজো বা মিশ্রিতরা পাত্তা পেয়েছে। যেমন মেক্সিকোতে।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ এবং দৃশ্যপটের পরিবর্তন, মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের প্রাধান্য

উপরিউক্ত পটভূমিতে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ নিয়ে এল এক নাটকীয় পরিবর্তন। ল্যাটিন আমেরিকাতে অর্থনৈতিক প্রাধান্যের ব্যাপারে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বৃটেন, ফ্রান্স এবং জার্মেনির অনেক পিছনে ছিল। কিন্তু গতিধারা পাল্টে গেল। জার্মেনি যুদ্ধে পরাজিত হয়ে প্রায় অদৃশ্য হয়ে গেল। বৃটেন এবং ফ্রান্সের তুলনায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এক লাফে অনেকটা এগিয়ে গেল।

এখানে বৃটেন এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক ল্যাটিন আমেরিকাতে পুঁজি নিয়োগের একটা তুলনামূলক হিসাব দাখিল করা যেতে পারে, সাম্রাজ্যবাদী পাশার প্রাথমিক দান-পাল্টানোর ব্যাপারটাকে বুঝবার জন্য। ই ভার্গা এবং মেন্ডেলসন লেনিনের 'সাম্রাজ্যবাদ' গ্রন্থের যে ক্রোড়পত্র তৈরি করেন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগে, তা' থেকে হিসাবটা নেওয়া হয়েছে:

ব্রিটিশ পুঁজি : (ডলারের হিসাবে)

	১৯১৩ সাল	১৯২৯ সাল
আর্জেন্টিনায়	১৮৬ কোটি ১০ লক্ষ	২১৪ কোটি

বলিভিয়ায়	২০ লক্ষ	১ কোটি ৩০ লক্ষ
ব্রাজিলে	১১৬ কোটি ২০ লক্ষ	১৪১ কোটি ৪ লক্ষ
চিলিতে	৩৩ কোটি ২০ লক্ষ	৩৯ কোটি
কলম্বিয়ায়	৩ কোটি ৪০ লক্ষ	৩ কোটি ৮০ লক্ষ
ইকুয়েডরে	১ কোটি ৫০ লক্ষ	২ কোটি ৩০ লক্ষ
প্যারাগুয়েতে	১ কোটি ৬০ লক্ষ	১ কোটি ৮০ লক্ষ
পেরুতে	১৩ কোটি ৩০ লক্ষ	১৪ কোটি ১০ লক্ষ
উরুগুয়েতে	২৪ কোটি	২১ কোটি ৭০ লক্ষ
ভেনিজুয়েলাতে	৪ কোটি ১০ লক্ষ	৯ কোটি ২০ লক্ষ
কস্‌টারিকাতে	৩ কোটি ৩০ লক্ষ	২ কোটি ৭০ লক্ষ
গুয়াতেমালাতে	৫ কোটি ২০ লক্ষ	৫ কোটি ৮০ লক্ষ
হন্ডুরাসে	১ কোটি ৬০ লক্ষ	২ কোটি ৫০ লক্ষ
নিকারাগুয়ায়	৬০ লক্ষ	৪০ লক্ষ
সালভাদরে	১ কোটি ১০ লক্ষ	১ কোটি
পানামাতে	–	৮০ লক্ষ
কিউবাতে	২২ কোটি ২০ লক্ষ	২৩ কোটি ৮০ লক্ষ
হাইতি	-	–
মেক্সিকো	৮০ কোটি ৮০ লক্ষ	১০৩ কোটি ৫০ লক্ষ
ডোমিনিকান প্রজাতন্ত্রে	–	–
সর্বসমেত	৪৯৮ কোটি ৪০ লক্ষ ডলার	৫৮৯ কোটি ৫০ লক্ষ ডলার

মার্কিন পুঁজি (ডলারের হিসাবে)

	১৯১৩ সাল	১৯২৯ সাল
আর্জেন্টিনায়	৪ কোটি	৬১ কোটি ১০ লক্ষ
বলিভিয়ায়	১ কোটি	১৩ কোটি ৩০ লক্ষ
ব্রাজিলে	৫ কোটি	৪৭ কোটি ৬০ লক্ষ
চিলিতে	১ কোটি ৫০ লক্ষ	৩৯ কোটি ৬০ লক্ষ
কলম্বিয়ায়	২০ লক্ষ	২৬ কোটি ১০ লক্ষ
ইকুয়েডরে	১ কোটি	২ কোটি ৫০ লক্ষ
প্যারাগুয়েতে	৩০ লক্ষ	১ কোটি ৫০ লক্ষ
পেরুতে	৩ কোটি ৫০ লক্ষ	১৫ কোটি ১০ লক্ষ
উরুগুয়েতে	৫০ লক্ষ	৬ কোটি ৪০ লক্ষ
ভেনিজুয়েলাতে	৩০ লক্ষ	১৬ কোটি ২০ লক্ষ
কস্‌টারিকাতে	৭০ লক্ষ	৩ কোটি ৬০ লক্ষ
গুয়াতেমালাতে	২ কোটি	৩ কোটি ৮০ লক্ষ
হন্ডুরাসে	৩০ লক্ষ	১ কোটি ৩০ লক্ষ
নিকারাগুয়ায়	৩০ লক্ষ	২ কোটি ৪০ লক্ষ
সালভাদরে	৩০ লক্ষ	১ কোটি ৫০ লক্ষ

পানামাতে	৫০ লক্ষ	৩ কোটি ৬০ লক্ষ
কিউবাতে	২২ কোটি	১৫২ কোটি ৬০ লক্ষ
হাইতি	৪০ লক্ষ	৩ কোটি ১০ লক্ষ
মেক্সিকোতে	৪০ কোটি	১৫৫ কোটি
ডোমিনিকান প্রজাতন্ত্রে –	৪০ লক্ষ	২ কোটি ৪০ লক্ষ
সর্বসমেত	১২৪ কোটি ২০ লক্ষ ডলার	৫৫৮ কোটি ৮৭ লক্ষ ডলার।

আরেকটি হিসাবে দেখা যায় তিনটি দেশের আমদানি বাণিজ্যে বৃটেন এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শতকরা অংশ নিম্নরূপ:

	১৯১৩ সাল	১৯৩১ সাল
আর্জেন্টিনা		
বৃটেন	৩১	২০
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র	১৪.৭	১৬.৪
ব্রাজিল		
বৃটেন	২৪.৫	১৭.৫
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র	১৫.৭	২৫
চিলি		
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র	১৬.৭	৩৪,৩

এখানে সর্বশেষ হিসাব আরো অর্থবহ। ১৯২৪ থেকে ১৯৩১ সাল পর্যন্ত ৭ বছরে ল্যাটিন আমেরিকাতে বৃটেন এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যে পুঁজি রপ্তানি করেছে, তাতে দেখা যায়, বৃটেন রপ্তানি করেছে ৬৫ কোটি ৫০ লক্ষ ডলার, আর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র রপ্তানি করেছে ১৭৫ কোটি ৮০ লক্ষ ডলার।

উপরিউক্ত সমস্ত হিসাবে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তীকালে ল্যাটিন আমেরিকাতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একচেটিয়া প্রভাব বৃদ্ধির প্রথম পদক্ষেপ সুস্পষ্ট দেখতে পাওয়া যাবে। এই হিসাব থেকেই তুলে নিয়ে এখানে আরও দেখানো যায় যে, গত প্রায় দুই শতাব্দি ধরে পশ্চিমী পুঁজি সর্বগ্রাসী অক্টোপাসের মতো ল্যাটিন আমেরিকাকে বেঁধে ফেলেছিল। বর্তমানে মার্কিনি সাম্রাজ্যবাদের সম্প্রসারণশীল ভিত্তিটা আরও বেশি করে দৃষ্টিগোচর হয়েছে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে মার্কিন ডলার ইউরোপের শিল্পোন্নত দেশগুলিকেও ঋণজালে বেঁধে ফেলেছিল। তবে তখনো প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল বৃটেন এবং ফ্রান্স। কিন্তু মার্কিনি ডলার অতিশীঘ্র সবাইকে ছাড়িয়ে গেল। বণিকের মানদণ্ড এর সঙ্গে সঙ্গেই একেবারে উলঙ্গ ক্ষমতা বিস্তারের খড়্গ-কৃপান হয়ে গেল। হাজার হাজার কোটি ডলার পুঁজি আর তার মুনাফাকে সুরক্ষিত করার জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ল্যাটিন আমেরিকার প্রজাতান্ত্রিক দেশগুলিতে ইচ্ছামতো রাজনৈতিক ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণের জন্য উঠে পড়ে লেগে গেল।

॥ ৩॥

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তরকালে মার্কিনি সাম্রাজ্যবাদের একচ্ছত্র তৎপরতা

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তরকালে মার্কিনি বৃহৎ পুঁজিপতি এবং ব্যবসায়ীরা একদিকে যেমন বৃটেনকে অধমর্ণ বানিয়েছে, তেমনি সঙ্গে সঙ্গে ল্যাটিন আমেরিকাতে তাদের অর্থনৈতিক

চক্রজালকে আরও প্রসারিত করেছে। ল্যাটিন আমেরিকার জনগণকে তাদের এই ডলারের চক্রজালে আবদ্ধ রাখার জন্য রাজনৈতিক প্রভুত্বকে তারা দুইভাবে প্রসারিত করতে চেষ্টা করেছে।

প্রথমত, ১৯৪৮ সালে ওয়াশিংটনকে কেন্দ্র করে তারা আমেরিকান জাতিসংঘকে একটা ছায়া-সামরিক সংস্থায় পরিণত করেছে। দ্বিতীয়ত, ল্যাটিন আমেরিকার বিভিন্ন প্রজাতন্ত্রের সামরিক বাহিনীর কর্তাদের হয় পুঁজিপতি বানিয়েছে, নয়তো মার্কিন পুঁজির শরিক করে নিয়েছে। এদের এবং অন্যান্য কিছুসংখ্যক ক্রীড়ানকের সাহায্যে প্রজাতন্ত্রী সরকারগুলিকে মার্কিনি বৃহৎ পুঁজিপতিচক্রের আদেশ মানতে বাধ্য করেছে।

জাতীয় স্বাধীনতাকামী জনগণের সংগ্রামী সম্মিলিত সংঘ, বিক্ষোভ, হরতাল এবং গেরিলাবাহিনীকে দমন করবার জন্য মার্কিনিরা সামরিক একনায়কদের উৎসাহিত করছে, যখন যেখান খেয়াল সেখানেই।

মুক্তিসংগ্রামী গেরিলাদের বিরুদ্ধে মার্কিনি তাঁবেদার "গেরিলা" প্রয়োগ

ল্যাটিন আমেরিকার মুক্তিকামী জনগণের সশস্ত্র গেরিলা অভ্যুত্থানকে আটকাবার জন্য মার্কিনিরা যে সব 'শক্ত লোক' বসিয়ে আসছে বিশেষ করে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর থেকে, তারা গণতন্ত্রের ধার ধারে না। তারাই তাসের ঘরের মতো সাধারণ নির্বাচনের ভোটের ভিত্তিতে গঠিত সরকারগুলিকে অপসারিত করে আসছে। ল্যাটিন আমেরিকাতে তাই এটা নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা। এটা ল্যাটিন আমেরিকার লোকসমষ্টির কোন চরিত্রগত দোষ নয়। এর মূল কারণ হচ্ছে মার্কিনি বৃহৎ পুঁজির নিরাপত্তা স্বার্থ। ল্যাটিন আমেরিকাতে এই মার্কিনি শিখণ্ডীদের নাম "গেরিলা" বা নির্মম স্বেচ্ছাচারী মানুষ। এদের মারফত ল্যাটিন আমেরিকার প্রজাতন্ত্রগুলির মধ্যে জনগণের জাগ্রত আশা-আকাঙ্ক্ষাকে দমিয়ে রাখা হচ্ছে। এই 'গেরিলা' নীতির মূল বিবেচনা, মার্কিনি পুঁজির নিরাপত্তাই সব কিছুর উপরে। ল্যাটিন আমেরিকার বৈদেশিক বাণিজ্যের শতকরা ৫০ ভাগ মার্কিনি বৃহৎ-পুঁজিপতিদের কব্জায়।

ল্যাটিন আমেরিকার জনগণের জাতীয় মুক্তি, গণতন্ত্র এবং শোষণহীণ সমাজের জন্য সংগ্রাম যে আজ প্রধানত মার্কিনি কব্জার বিরুদ্ধে নিয়োজিত, এর মূল কারণ এখানেই।

ল্যাটিন আমেরিকার জাতীয় মুক্তি, গণতন্ত্র এবং শোষণহীন সমাজের জন্য সংগ্রাম বর্তমানে প্রধানত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে কেন নিয়োজিত, সে কথা বুঝতে হলে মার্কিনি পুঁজি এবং তার রক্ষক মার্কিনি শাসক চক্রের চক্রান্তগুলিকে স্পষ্টভাবে চোখের সামনে রাখা দরকার। কারণ, মার্কিনি প্রচারযন্ত্র প্রথমত একটা কথা খুব জোরে শোরে প্রচার করে থাকে যে, সরল সাদাসিদা ল্যাটিন আমেরিকানরা প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের স্নায়ুযুদ্ধে অনেক সময় না বুঝে নিজেদের জড়িত করে ফেলে। একথাও বলা হয় যে, সোভিয়েত ইউনিয়ন অথবা গণচীন অথবা পূর্ব ইউরোপের দেশগুলির দূতাবাসগুলি মাঝে মাঝে উস্কানি দিয়ে নিরুদ্বিগ্ন ল্যাটিন আমেরিকার মানুষকে দিয়ে বলায় যে, তারা কষ্টে আছে। ১৯৫৯ সালে কিউবা যখন সশস্ত্র বিপ্লব ঘটিয়ে মার্কিনি তাবেদারদের শাসন আর মার্কিনি পুঁজির জাল ছিঁড়ে বেরিয়ে এলো ফিদেল ক্যাস্ট্রো এবং চে-গুয়েভারার নেতৃত্বে,

তখন থেকে মার্কিনি প্রচারের মূল ফলক কিউবার উপর আক্রমণেই গিয়ে বর্তেছে। মার্কিনি সাম্রাজ্যবাদের প্রচারকেরা বলতে চেষ্টা করেছে যে মুষ্টিমেয় 'ক্যাস্ট্রো-সমর্থক' সন্ত্রাসবাদী বা ক্যাস্ট্রোটেররিষ্ট আমেরিকার সুখী পরিবারে উৎপাত ঘটাচ্ছে। প্রথমোক্ত এবং দ্বিতীয়োক্ত প্রচারের ধারা কখনো পাশাপাশি, কখনো মিলিয়ে মিশিয়ে চালানো হয়। আন্তঃআমেরিকার সম্মেলনে ল্যাটিন আমেরিকার কাঁচামালের স্বাধীন বাজার দাবি করার অপরাধে ১৯৬৪ সালে ব্রাজিলের বামপন্থি প্রেসিডেন্ট গুলার্টকে জোরজবরদস্তী করে সরিয়ে বশংবদ সামরিক প্রভূদের 'গেরিলা' শাসন কায়েম করার সময় মার্কিনি বৃহৎ পুঁজিপতিচক্রের প্রচারযন্ত্রগুলি উপরিউক্ত দুই ধরণের ধূম্রজালে ল্যাটিন আমেরিকার শুধু নয়, আমাদের মতো দেশগুলির বুদ্ধিজীবীদেরও বিভ্রান্ত করতে চেষ্টা করেছে। ১৯৬৭ সালে চে-গুয়েভারাকে বলিভিয়াতে হত্যা করার পর তারা বুঝতে চেষ্টা করেছে যে, ল্যাটিন আমেরিকাতে জাতীয় মুক্তির দাবি বাইরে থেকে চাপানো ব্যাপার এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে ল্যাটিন আমেরিকার সম্পর্ক ভাই বেরাদরির। এই প্রচার যে কত ভ্রান্ত তা বুঝবার জন্য ল্যাটিন আমেরিকার সামাজিক-অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক জীবনে মার্কিনি নাগপাশের বর্তমান বীভৎস চেহারাটাকে সামনে আনতে হবে অকাট্য তথ্যের উপর। ধনতান্ত্রিক সাম্রাজ্যবাদ তার যুদ্ধজাহাজ কিংবা ট্যাঙ্কের উপর ল্যাটিন আমেরিকার তাঁবেদার সরকারগুলির শক্ত লোকদের নাম অঙ্কিত করে 'দেশি' বানাতে পারে, কিন্তু সে তার ব্যাঙ্কের অর্থপুঁজি আর মুনাফার পাহাড়কে লুকোতে পারে না।

মার্কিনি প্রাধান্যের আমলের জমা-খরচ (১)

ল্যাটিন আমেরিকার চারজন বামপন্থি তাত্ত্বিক এ ফেরবারি, জে.এম. ফরচুনি, পি. মেট্রোলিমা এবং এল ফেররেটো গত ১৯৬৫ সালে একটি নিবন্ধে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তরকালের ল্যাটিন আমেরিকার যে চিত্র দাখিল করেছেন, এখানে তার মূল অংশ উদ্ধৃত করছি:

"দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে এবং বিশেষ করে কিউবার বিপ্লবের পরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শাসকচক্র ল্যাটিন আমেরিকার দেশগুলিতে অর্থনৈতিক অনুপ্রবেশের জন্য নতুন নতুন চেহারা খুঁজছে, রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখার নতুন নতুন উপায়ের খোঁজ করছে। উদ্দেশ্য, এই সব চেহারা এবং উপায় তাদের লুণ্ঠনমূলক খায়েশকে আড়ালে রাখবে এবং কিছু নিম্নবিত্ত অথবা উচ্চমধ্যবিত্ত মহলকে এই প্রক্রিয়ায় বশ করা না গেলেও নিরপেক্ষ ও নিশ্চেষ্ট করে দেওয়া যাবে। এদের একটা উপায়ের নাম হচ্ছে "মিশ্রিত" উদ্যোগ। অর্থাৎ স্থানীয় পুঁজির উদ্যোগে উত্তর আমেরিকার পুঁজির অংশগ্রহণ; রাস্তাঘাট নির্মাণে মার্কিনি যন্ত্রপাতি এবং কখনো কখনো মার্কিনি বিশেষজ্ঞ নিয়োগ; মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে পাওয়া খুচরা যন্ত্রপাতির সাহায্যে মোটরগাড়ি সংযোজন কারখানা তৈরি করা; আগে যা ছিল বিশেষ সুবিধা, সেটাকে বাতিল করে এখন খনিজ তেল অথবা অন্য ধাতুর খোঁজখবর এবং উত্তোলন ও পরিশোধনের জন্য কন্ট্রাক্ট আদায় করা। অনুপ্রবেশের এইসব বিভিন্ন উপায়কে এখন আবরণ দেওয়া হচ্ছে, 'আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডার', 'আন্তঃআমেরিকান উন্নয়ন ব্যাঙ্ক', 'বিশ্বব্যাঙ্ক' প্রভৃতির উদ্যোগে আয়োজিত উন্নয়ন প্রকল্পের। এসব কিছুকে একটাই ধারণার আড়ালে সামনে আনা হচ্ছে এবং

সেটা এই যে, মার্কিনি একচেটিয়া পুঁজির সাহায্য ছাড়া ল্যাটিন আমেরিকার দেশগুলি তাদের অর্থনৈতিক উন্নয়ন সাধিত করতে পারবে না। বলা হচ্ছে যে, ইউরোপের পুঁজির তুলনায় মার্কিনি পুঁজি প্রগতিশীল। কিন্তু এই মার্কিন একচেটিয়া পুঁজির প্রকৃত কার্যকলাপ হচ্ছে ভিন্নরূপ।

ল্যাটিন আমেরিকাতে সমগ্র বৈদেশিক পুঁজির শতকরা ৭৫ ভাগ হচ্ছে মার্কিন পুঁজি। ১৯৬৩ সালে ল্যাটিন আমেরিকাতে প্রত্যক্ষ মার্কিন পুঁজির পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৮৬৫ কোটি ৭০ লক্ষ ডলার। এই সব নিয়োজিত পুঁজি মারফত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ল্যাটিন আমেরিকার শতকরা ২৫ ভাগ শিল্প প্রতিষ্ঠান এবং সমগ্র রপ্তানি বাণিজ্যের শতকরা ৫০ ভাগের উপর নিয়ন্ত্রণ চালাচ্ছে। শতকরা ৫০ ভাগ বৈদেশিক বাণিজ্যের এখতিয়ার মার্কিনিদের হাতে। ১৯৪৫ থেকে ১৯৬৫ সালের মধ্যে মার্কিন পুঁজি ল্যাটিন আমেরিকাতে যে মুনাফা উঠিয়েছে তার পরিমাণ ৪০০০ কোটি ডলার। প্রত্যক্ষ পুঁজির থেকে পাওয়া মুনাফার শতকরা ৮০ ভাগ চালান দেওয়া হয়েছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে। সাম্রাজ্যবাদীরা ভিন্ন রকমের দাবি করলেও এই লুণ্ঠন ল্যাটিন আমেরিকার জনগণের উপর আরও বেশি শোষণ, আরও বেশি দারিদ্র্য চাপিয়ে দিয়েছে।

ল্যাটিন আমেরিকার দেশগুলির বাৎসরিক মাথাপিছু আয় হচ্ছে ১২০ ডলার। এই আয় থাকা অবস্থাতেই নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের দাম বছর বছর বেড়ে যাচ্ছে।

তথাকথিত সুখী পরিবারের একদিকে সম্পদ, আরেকদিকে দারিদ্র্য

মার্কিনি পুঁজি ভেনিজুয়েলাতে শতকরা ৭৫ ভাগ তেল উত্তোলনের মালিক। ভেনিজুয়েলার তেলের খনিশ্রমিকের মজুরি হচ্ছে মার্কিন তেলের খনি-শ্রমিকের মজুরির একপঞ্চমাংশ। বলিভিয়াতে মার্কিন পুঁজি টিন উৎপাদন, প্রধান প্রধান তৈলকূপ এবং সমগ্র রেল লাইনের মালিক। মধ্য আমেরিকার অন্যান্য দেশের মতো গুয়াতেমালাতে মার্কিনি ইউনাইটেড ফ্রুট কোম্পানি লক্ষ লক্ষ একর জমির মালিক এবং রেল লাইন, জাহাজ এবং সমগ্র কলার চাষের নিয়ন্ত্রণকর্তা। গুয়াতেমালাতে জিনিসপত্রের দাম খুব বেশি, কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের তুলনায় এখানকার মাথাপিছু আয় ১৭ ভাগেরও কম। ল্যাটিন আমেরিকাতে কৃষি উৎপাদনে ঘাটতি হচ্ছে, অথচ লোকসংখ্যা বেড়ে যাচ্ছে। ১৯৬৩ সালে আর্জেন্টাইনে কৃষি উৎপাদন শতকরা ৫ ভাগ হ্রাস পেয়েছে, অথচ লোকসংখ্যা বেড়েছে শতকরা ৬.৬ ভাগ। বেকারের সংখ্যাও বৃদ্ধির দিকে। গুয়াতেমালার মতো ক্ষুদ্র দেশে ৫ লক্ষ বেকার মৌসুমী কাজ পায়, আর ১ লক্ষ মজুর সম্পূর্ণ বেকার। আর্জেন্টাইন শ্রমশক্তির শতকরা ৮ ভাগ বেকার। মেক্সিকোর বেকার সমস্যা ভয়াবহ রূপ নিচ্ছে।"

হালআমলের মার্কিনি জমা-খরচ (২)

ল্যাটিন আমেরিকার খনিজ সম্পদে সমৃদ্ধ দেশগুলির অন্যতম ভেনিজুয়েলার আরেকটি চিত্র উপরিউক্ত জমা-খরচকে আরও তীক্ষ্ণভাবে চিহ্নিত করবে। ভেনিজুয়েলার সাম্যবাদী তাত্ত্বিক কার্লোস লোপেজ ১৯৬৪ সালের অক্টোবরে এই হিসাব দাখিল করেন। তিনি এতে বলেছেন:

"আমাদের দৃষ্টিতে ভেনিজুয়েলা এক আধা ঔপনিবেশিক, আধা সামন্ততান্ত্রিক দেশ। এর অর্থনৈতিক কাঠামো বিকৃতভাবে গড়ে উঠেছে। এর নিয়ন্তা হচ্ছে বৈদেশিক পুঁজি। ল্যাটিন আমেরিকাতে নিয়োজিত মার্কিন পুঁজির অর্ধেকেরও বেশি খাটছে ভেনিজুয়েলাতে। বিদেশি পুঁজির শতকরা ৯০ ভাগ খাটছে তৈলখনিতে। এরই দরুন ভেনিজুয়েলার ভূমিকা হয়েছে তেলের যোগনদার হিসাবে তাঁবেদারের ভূমিকা। বিদেশি পুঁজির মুনাফার হার খুব বেশি–অর্থাৎ শতকরা ৩০ থেকে ৪০ ভাগ। শতকরা ৭১.৪ ভাগ তেলের মালিক হচ্ছে মার্কিন স্ট্যান্ডার্ড অয়েল। সমগ্র উৎপাদিত তেলের শতকরা ৯৫ ভাগ রপ্তানি হয়ে যায়। বিশ্বের সেরা তেল রপ্তানিকারকদের মধ্যে ভেনিজুয়েলার জায়গা। কিন্তু কার্যরত শ্রমিকদের সংখ্যা ক্রমেই হ্রাস পেয়ে আসছে। ১৯৪৮ সালে তেল-শ্রমিকদের সংখ্যা ছিল ৬১ হাজার। ১৯৫৭ সালে সেটা দাঁড়ায় ৪৫ হাজার। বর্তমানে ৩৪ হাজারে এসে দাঁড়িয়েছে। মার্কিনি পুঁজি ভেনিজুয়েলার বৈদেশিক বাণিজ্যের প্রায় সর্বনিয়ন্তা। এদের নিয়ন্ত্রণাধীনে ভেনিজুয়েলার শতকরা ৪২.৪ ভাগ তেল, শতকরা ৭৮ ভাগ লৌহ আকর এবং শতকরা ৮২.৩ ভাগ কোকো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে রপ্তানি হয়। ভেনিজুয়েলা বিদেশ থেকে যেসব পণ্য আমদানি করেছে তার শতকরা ৫২.৫ ভাগ আনতে হয়েছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে। এসব কিছু ছাড়াও ভেনিজুয়েলার যে জাতীয় আয় হয়, তার শতকরা ২৫ ভাগ জীবন-বীমা, ব্যাংকজমা, পরিবহন ব্যয় প্রভৃতির মারফত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অর্থভাণ্ডারে গিয়ে জমা হয়। অনুন্নত ভেনিজুয়েলা মার্কিন অর্থনৈতিক ব্যবস্থার অতিরিক্ত রাহা খরচও বহন করে চলেছে।"

ল্যাটিন আমেরিকার বিকলাঙ্গ অর্থনৈতিক কাঠামো

উরুগুয়ে রডনি আরিমেন্দি তাঁর 'ল্যাটিন আমেরিকাতে বর্তমান বৈপ্লবিক প্রক্রিয়ার কয়েকটি দিক' নামক নিবন্ধে ১৯৬৪ সালে উপরিউক্ত সাম্রাজ্যবাদী প্রাধান্যের চাপে বিপর্যস্ত অথচ জনগণের আশা আকাঙ্ক্ষার দরুণ বিকাশেচ্ছুক জাতীয় অর্থনৈতিক ব্যবস্থাগুলির একটা সাধারণ সংকটকে সামনে এনেছিলেন। তিনি দেখিয়েছিলেন যে, "ল্যাটিন আমেরিকার অধিকাংশ দেশে উৎপাদন সম্পর্কগুলি ধনতান্ত্রিক এবং এই ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থাও আবার বিকলাঙ্গ হওয়াতে এবং এর সঙ্গে ল্যাটিফুন্ডিয়ার বৃহৎ ভুস্বামী প্রথা এবং সাম্রাজ্যবাদী আধিপত্য যোগ হওয়াতে সামাজিক অর্থনৈতিক অন্ত র্দ্বন্দ্বগুলি চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছেছে এবং অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে করে রেখেছে অস্থির। ধনতান্ত্রিক শোষণব্যবস্থা, ভূস্বামীদের পরগাছাবৃত্তি এবং সাম্রাজ্যবাদী লুণ্ঠন–এই তিনের চক্রে আবদ্ধ হয়ে রয়েছে ল্যাটিন আমেরিকার জনগণ। ল্যাটিন আমেরিকার বৈদেশিক ঋণের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ১৯৬৩ সালে ৯১০ কোটি ডলার। ১৯৬২ সালে এই ঋণের সুদ বাবদ ১২০ কোটি ডলার পরিশোধ করতে হয়েছে।"

মার্কিন 'অগ্রগতির জন্য মৈত্রী' (এলায়েন্স ফর প্রগ্রেস)

বিপ্লবী কিউবাকে সরাসরি সামরিকভাবে ঘেরাও করে এবং সেখানে তল্পীবাহক সেনাবাহিনী নামিয়ে গণ-সরকারের উচ্ছেদ সাধন করে এই দ্বীপদেশটিকে বাগে আনার জন্য মার্কিনি সাম্রাজ্যবাদী শাসক ও শোষকচক্র ১৯৫৯ সাল থেকেই চেষ্টা চালিয়ে

আসছে। ১৯৬২ সালে কিউবাতে সরাসরি মার্কিন বাহিনী নামাবার হুমকি দিয়ে সামরিক অবরোধ চালিয়ে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ বাঁধাবারও উপক্রম করে তারা। কিউবাতে যে সমাজতান্ত্রিক গণতান্ত্রিক বিপ্লব ঘটেছে, তার সংস্পর্শ ও সহযোগিতা থেকে ল্যাটিন আমেরিকার অন্যান্য দেশকে পৃথক করে রাখার তাগিদ থেকেই বিশেষভাবে এই চেষ্টা চালিয়ে আসছে তারা। মার্কিনি চিনির কলের কোটিপতি মালিকরা কিউবার ইক্ষুসম্পদ ফিরে পাবার খায়েশ এখনও ছাড়েনি। কিন্তু মার্কিনি শাসক ও শোষক চক্রের আসল মাথাব্যথা এই যে, ল্যাটিন আমেরিকার দেশেদেশান্তরে তাদের শোষণ-শাসনের কাঠামোর উপর কিউবার বিপ্লবী ভাবধারার তরঙ্গ গিয়ে অনবরত ঘা মারছে। ল্যাটিন আমেরিকার যে নিপীড়িত মানুষ দেশীয় বৃহৎ ভূস্বামী, দেশীয় তাঁবেদার পুঁজিচক্র এবং মার্কিনি ডলারপতিদের তিনচাকার শোষণে নিস্পিষ্ট হচ্ছে, তারা দারিদ্র্য ও লাঞ্ছনা থেকে স্থায়ী মুক্তির একটি সুস্পষ্ট লক্ষ্যকে কিউবার দৃষ্টান্তের মধ্যে দেখতে পাচ্ছে। মার্কিনি শোষক ও শাসক চক্রের ভাড়াটে পরামর্শদাতারা এই অবস্থায় দাওয়াই উদ্ভাবন করার জন্য গলদঘর্ম হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু দুটো দাওয়াই মাত্র তারা জানে। একটা হচ্ছে, "সামরিক হস্তক্ষেপ"। দ্বিতীয়টি হচ্ছে, "ঢালো ডলার, টাকা দিয়ে মাথা এবং মন কিনে নাও"। সামরিক হস্তক্ষেপের পাশাপাশি তারা ১৯৬১ সালে নতুন খয়রাতির ব্যবস্থা পত্র দেয় এবং 'অগ্রগতির জন্য ঐক্য' (Alliance for progress) নামক পরিকল্পনা এই ব্যবস্থা পত্রেরই ফল।

১৯৫০ সালে কোরিয়াতে মার খাওয়ার পরেই ভিয়েতনামে মার খাওয়ার সূত্রপাতে বিচলিত হয়ে মার্কিনি শাসকচক্র মাঝে মাঝে "ঝোপের দশটা পাখির চেয়ে হাতের একটা পাখির দাম বেশি" প্রবাদ বাক্যের দিকে ঝোঁকে এবং ঘরের কাছে ল্যাটিন আমেরিকাতেই ডলার ঢালাকে বুদ্ধিমানের কাজ মনে করে। এই বুদ্ধি থেকেও "অগ্রগতির জন্য ঐক্য" পরিকল্পনা আংশিকভাবে বেরিয়ে এসেছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালে ধরাকে সরা জ্ঞান করার সময় মার্কিনি একচেটিয়া পুঁজিপতি সাম্রাজ্যবাদী চক্র যে মার্শাল সাহায্য পরিকল্পনা করে, তারপরে তাদের বৃহত্তম খয়রাতি পরিকল্পনা হচ্ছে এই "অগ্রগতির মৈত্রী" পরিকল্পনা। এই পরিকল্পনা অনুযায়ী মার্কিনি দপ্তর থেকে ঘোষণা করা হয় যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সরকারি তহবিল থেকে ল্যাটিন আমেরিকার দেশসমূহে ১৯৬১ থেকে শুরু করে ১৯৭০-এর মধ্যে সাহায্য বাবদ দুই হাজার কোটি ডলার (দশ হাজার কোটি টাকা) ঢালবে। এ ছাড়া ঋণ এবং ব্যক্তিগত মার্কিনি পুঁজির নিয়ন্ত্রণ তো থাকছেই। ব্যাপারটাকে যাতে একতরফা মনে না হয় সেজন্য তথাকথিত সার্বিক উন্নয়নের স্বার্থে এবং দারিদ্র্য দূর করার লক্ষ্যে ল্যাটিন আমেরিকার সরকার সমূহকেও একটা মোটা অংকের অর্থভাণ্ডার তৈরি করার জন্য বলা হয়। একটি শর্তও বেরিয়ে আসে এই খয়রাতি বন্টনের সাংগঠনিক ব্যবস্থার জন্য আহূত ও মার্কিনি উদ্যোগে গঠিত এতাবৎকালের আমেরিকান রাষ্ট্র সংঘ বা ও. এ. এস-এর বৈঠকে। এই বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় উরুগুয়ের পণ্টা ডেল এস্তে ১৯৬১ সালের আগস্ট মাসে। একমাত্র কিউবা ছাড়া ল্যাটিন আমেরিকার অন্যান্য দেশের সরকারসমূহ এই বৈঠকে রচিত মৈত্রী সনদে স্বাক্ষর দেয়। এই সনদে বলা হয় যে, ল্যাটিন আমেরিকা এবং শিল্পোন্নত দেশসমূহের অর্থনৈতিক অবস্থায় যে ব্যবধান রয়েছে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তা দূর করার জন্য সাহায্য

করবে, ল্যাটিন আমেরিকার মাথা পিছু জাতীয় উৎপাদন বার্ষিক অন্তত পক্ষে শতকরা ২.৫ ভাগ বৃদ্ধি করা হবে, সামাজিক অর্থনৈতিক সংস্কার সাধন করা হবে এবং আমদানি রপ্তানির মূল্য বৈষম্যের ক্ষতিকর উঠতি পড়তি রোধ করা হবে ইত্যাদি। সামাজিক অর্থনৈতিক সংস্কার সাধনের মধ্যে থাকে সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা, ক্ষুধামুক্তি, জীবনযাপনের মানবৃদ্ধি প্রভৃতি এবং ভূমি সংস্কারেরও সুপারিশ। কিন্তু পর্বত মুষিক প্রসব করেছে। ১৯৬৭ সালের একটি হিসাবে দেখা যায় মাথাপিছু বার্ষিক উৎপাদন বৃদ্ধি পাওয়া দূরে থাকুক, আগের থেকে কমেছে। ১৯৫০-৬০ সালে ল্যাটিন আমেরিকার মাথাপিছু বার্ষিক উৎপাদন শতকরা ২.২ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে আসছিল। ১৯৬১-৬৫ সালে সাধারণভাবে মাথাপিছু উৎপাদন বৃদ্ধির হার দাঁড়ালো শতকরা ১.৪ ভাগ। ল্যাটিন আমেরিকার কোন কোন দেশে বার্ষিক উৎপাদন বৃদ্ধির হার আরও কম হল। আর্জেন্টিনাতে দেখা গেলো, উৎপাদন বৃদ্ধির হার মাত্র শতকরা ০.২ ভাগ।

যে দারিদ্র্যের পংকে ল্যাটিন আমেরিকার জনগণ মার্কিনি অভিভাবকত্বে বিশেষ করে প্রায় এক শতাব্দিকাল নিমজ্জিত রয়েছে, তা থেকে তাদের বের করে আনতে পারেনি "মৈত্রীর জন্য অগ্রগতি" প্রকল্প।

এক কারণ কি? যে হাজার হাজার কোটি ডলার খয়রাতি ঢালা হলো, তা গেলো কোথায়?

এর একটি উত্তর আছে। খয়রাতি গেলো বৃহৎ ভূস্বামী, তাঁবেদার দেশীয় পুঁজিপতি আমলা এবং মার্কিনি বৃহৎ পুঁজিপতিদের শোষণ ও মুনাফার ত্রিচক্র যানের পেটে।

ধনতান্ত্রিক সাম্রাজ্যবাদী পদ্ধতিতেই ধনতান্ত্রিক সমাজের বিষচক্রের গণদারিদ্র্যকে দূর করার চেষ্টা যে ব্যর্থ হতে বাধ্য, তা ল্যাটিন আমেরিকাতে 'মৈত্রীর জন্য অগ্রগতি' প্রকল্পের আমলে প্রমাণিত। এক্ষেত্রেও তথাকথিত ভূমিসংস্কার বৃহৎ-ভূস্বামীদের গায়ে হাত দেয়নি, কারণ মার্কিনি বৃহৎ পুঁজিপতিচক্র ল্যাটিন আমেরিকার দেশে দেশে বিরাট বিরাট ভূমিখণ্ডের ইজারা নিয়ে বসে আছেই। তাছাড়া সবসময়েই ভারি শিল্পস্থাপনের প্রকল্পকে এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে। যেসব দ্বিতীয় স্তরের শিল্পপ্রকল্প মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বৃহৎ শিল্পের যোগানদার হতে পারে, তাদেরই উৎসাহিত করা হয়েছে। এই কারণে অর্থনৈতিক উন্নতির অন্তরায়গুলি বহাল থেকে গিয়েছে। খয়রাতির টাকা দুর্নীতির আখড়াগুলিকে এবং কাঁচা মুনাফার মুষ্টিমেয় ভাগীদারদের ফাঁপিয়ে তুলেছে। ধনতন্ত্রের প্রসারে গরিব যে আরও গরিব হয়, তার জলন্ত প্রমাণ জারী হয়েছে ল্যাটিন আমেরিকায়। যারা কিউবাকে বর্জন করে কাঁচা টাকার লোভে এবং উন্নয়নের ব্যাপারে রাতারাতি বাজিমাতের খেলা দেখিয়ে রাজনৈতিক ক্ষমতা স্থায়ী করার উদ্দেশ্যে খয়রাতির সনদে দস্তখত দিয়েছিল, আজ তারা চিহ্নিত হয়ে গিয়েছে জনগণের দুশমন হিসাবে আরও নগ্নভাবে।

সামরিক সাহায্যের পরিণতি

সাম্রাজ্যবাদী মার্কিনি বৃহৎ পুঁজিপতি চক্র, দেশীয় তল্পীবাহক পুঁজিপতি গোষ্ঠী এবং বৃহৎ ভূস্বামীরা ল্যাটিন আমেরিকার জনগণকে ধনতান্ত্রিক সামন্তবাদী রাজনৈতিক ও সামাজিক কাঠামোর মধ্যে আবদ্ধ রাখবার জন্য অস্ত্রবলের উপরেই প্রধানত নির্ভর করে

আসছে। এই কারণেই তারা যে শাসন চালিয়ে আসছে তার মূল ভিত্তিটা হচ্ছে সামরিক। ল্যাটিন আমেরিকার দারিদ্র্য-পীড়িত এবং অনিশ্চিত জীপনযাপনে বাধ্য বাসিন্দাদের মধ্য থেকে ভাড়াটে সৈন্য জোগাড় করা তাদের পক্ষে কঠিন হয়নি। এই সামরিক বাহিনীগুলি হয়েছে শোষণের কাঠামোটাকে বজায় রাখার লক্ষ্যেই নিয়োজিত ও প্রসারিত। এদের মূল চরিত্র হচ্ছে ভাড়াটে চরিত্র। এদের পরামর্শদাতা ও মূল সংগঠক হচ্ছে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী সমরবাদীরা। অস্ত্রের যোগানদারও তারাই। সামরিক সাহায্যের খাতে প্রচুর অর্থ খয়রাত করে সাম্রাজ্যবাদীরা সেনাবাহিনীগুলিকে একদিকে আয়েশী ও পরজীবী এবং অন্যদিকে খামখেয়ালিপনায় রপ্ত করে তুলেছে। এই সেনাবাহিনী-সমূহ মার্কিনি অর্থানুকূল্যে ল্যাটিন আমেরিকার সীমাহীন দারিদ্র্যের মধ্যে বিশেষ সুবিধা ভোগ করছে; সুতরাং মাঝে মাঝে মার্কিনি অভিভাবকদের সঙ্গে খিটিমিটি বাঁধলেও এরা বিশেষ সুবিধা বহাল রাখার স্বার্থেই জনগণের রাজনৈতিক সংগ্রামকে উঠতির মুখে রক্তবন্যায় ডুবিয়ে দিতে কসুর করে না। যখনই ল্যাটিন আমেরিকার কোন দেশে বাঁধভাঙ্গা গণ-অভ্যুত্থানের মুখে সাধারণ নির্বাচনের মারফত জনপ্রতিনিধিদের নিয়ে গঠিত সরকার স্থাপিত হয়েছে এবং এই সরকার যখনই জনগণের স্বার্থে কোন ব্যবস্থা অবলম্বনে প্রবৃত্ত হয়েছে, তখন কায়েমি স্বার্থবাদী এবং সাম্রাজ্যবাদীদের গায়ে হাত পড়তেই তার কল টিপে দিয়েছে। অপসারিত হয়েছে নির্বাচিত সরকার। সামরিক কর্তাদের সরাসরি কর্তৃত্বে চলে গিয়েছে দেশ শাসনের ভার। সামরিক চক্র কখনো প্রত্যক্ষ সরকার গঠন করেছে এবং কখনো শিখণ্ডী দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। আর্জেন্টিনা ও ব্রাজিল যে সামরিক অভ্যুত্থানের দেশ বলে পরিচিত, তার মূল কারণ এই পরিস্থিতিতেই নিহিত। এই পরিস্থিতির জন্য প্রকৃতপক্ষে যদি কেউ দায়ী হয়ে থাকে, তাহলে সে হচ্ছে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী বৃহৎ পুঁজিপতিচক্রের যুদ্ধবাদী নীতি নির্ধারকেরা। 'ইন্টারন্যাশনাল এফেয়ার' নামক পত্রিকার ১৯৬৮ সালের ডিসেম্বর সংখ্যায় জনৈক ভাষ্যকার প্রধানত নিউইয়র্ক থেকে প্রকাশিত এডুইন লীউয়েনোর 'অস্ত্রশস্ত্র ও রাজনীতি' নামক গ্রন্থের ভিত্তিতে দেখিয়েছেন যে, ল্যাটিন আমেরিকাতে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থরক্ষার জন্য মার্কিনি নীতিনির্ধারকরা নিম্নোক্ত পদ্ধতিগুলি গ্রহণ করেছেঃ যথা (১) ল্যাটিন আমেরিকার দেশগুলিকে পরস্পরের সঙ্গে অস্ত্র-প্রতিযোগিতায় প্রবৃত্ত করা; (২) ল্যাটিন আমেরিকার অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে সামরিক ভিত্তিতে দাঁড় করানো; (৩) এই সব দেশে এমন সব সামরিক সংস্থা এবং সামরিক বাহিনী গড়ে তোলা যেগুলি জাতীয় আয়ত্তের বাইরে থাকবে; (৪) পুলিশ এবং অন্যান্য নিবর্তনমূলক বাহিনীর উপর কর্তৃত্ব স্থাপন; (৫) গোয়েন্দা সংস্থার জাল বিস্তার, এবং (৬) শ্রমজীবী জনগণকে দাবিয়ে রাখার জন্য সামরিক ব্যবস্থাকে পাকাপোক্ত রাখা।

এই ষষ্ঠবিদ উদ্দেশ্যে মার্কিনি শাসকচক্র ইদানিং "অকৃপণ হস্তে" বছরের পর বছর সামরিক সাহায্য বৃদ্ধি করে এসেছে সরাসরি সরকারি খাতে বরাদ্দ ধার্য করে। ১৯৫২ সালেও ল্যাটিন আমেরিকাতে মার্কিনি বাহিনী 'সরাসরি সরকারি' সামরিক সাহায্যের পরিমাণ ছিল মাত্র দুই লক্ষ ডলার। ১৯৫৮ সালে সেটা দাঁড়িয়ে গেল ৪ কোটি ৫০ লক্ষ ডলার। ৬২ সালে দাঁড়ালো ১৩ কোটি ২০ লক্ষ ডলার।

১৯৫৩ সাল থেকে ১৯৬৭ সাল পর্যন্ত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এইভাবে ল্যাটিন আমেরিকার বিভিন্ন দেশকে দিয়েছে ১১০ কোটি ডলার। এর মধ্যে ৯০ কোটি ডলার একেবারে পুরো খয়রাতি। ল্যাটিন আমেরিকার বিভিন্ন দেশের সেনাবাহিনীকে নিজেদের এক্তিয়ারে রাখার জন্য মার্কিনি কর্তৃপক্ষীয়েরা তাদের উপর মার্কিনি সামরিক শিক্ষা পদ্ধতি চাপিয়ে দিয়েছে। ১৯৫০ সাল থেকে ১৯৬৫ সালের মধ্যে প্রায় ৩২ হাজার সামরিক অফিসারকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এবং পশ্চিম গোলার্ধের বিভিন্ন মার্কিন সামরিক ঘাঁটিতে 'রিট্রেন' করা হয়েছে, অর্থাৎ শিক্ষিত অফিসারদেরও নতুন করে তালিম দেওয়া হয়েছে।

সামরিক খয়রাত এবং ব্যয়ভার বহন করার উদ্দেশ্য হচ্ছে ল্যাটিন আমেরিকার অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে বিপ্লবের ঝড়ঝাপটা থেকে নিরাপদ রাখা। যে মার্কিন পুঁজি ল্যাটিন আমেরিকাতে খাটছে, তার থেকে আসছে বাঘা মুনাফা। ল্যাটিন আমেরিকা থেকে মার্কিনি শাসক ও শোষকচক্র পাচ্ছে সমরাস্ত্র নির্মাণেরও কাঁচামাল। ল্যাটিন আমেরিকার পানামা খাল আটলান্টিক ও প্রশান্ত মহাসাগরের যোজক-পথ। এই যোজক পথের উপর কবজা বজায় রাখার জন্যও "অকৃপণ হস্তেই" তাদের খরচ করতে হবে বৈকি! তাছাড়া ফরাসি, ব্রিটিশ এবং জার্মেন অস্ত্রব্যবসায়ীদের প্রতিযোগিতার ক্ষেত্র থেকে সরিয়ে রাখাও এই খয়রাতির উদ্দেশ্য। এটা কি একতরফা ব্যয়? তা নয়। শুধু কি বেসামরিক দিক দিয়েই মার্কিনি বৃহৎ পুঁজিপতিচক্র সামরিক খাতের দান খয়রাতকে পুষিয়ে নিয়ে আসছে? তা নয়। ইলিশ মাছের তেল দিয়েই তারা ইলিশ মাছ ভাজবার ব্যবস্থা করেছে।

মার্কিনি সমরাস্ত্র-নির্মাণকারীরা ল্যাটিন আমেরিকাতে অস্ত্র ব্যবসাকেও কুক্ষিগত করেছে এং অস্ত্রবিক্রয় থেকে প্রচুর মুনাফা সংগ্রহ করে আসছে। মার্কিনি দলিলপত্রেই প্রকাশ যে, ১৯৬১/৬২ সালের আর্থিক বছরে ল্যাটিন আমেরিকাতে মার্কিন সামরিক উপকরণ বিক্রি হয়েছিল ২ কোটি ৩৪ লক্ষ ডলার মূল্যের। ১৯৬৩-৬৪ সালে এই বিক্রির পরিমাণ দাঁড়ায় ৪ কোটি ৭৭ লক্ষ ডলার মূল্যের। ১৯৬৫-৬৬ সালের আর্থিক বছরে এই পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৫ কোটি ৬০ লক্ষ ডলার। ১৯৬১-৬২ থেকে ১৯৬৭-৬৮ সাল পর্যন্ত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ল্যাটিন আমেরিকাতে ২৬ কোটি ডলার মূল্যের সমরাস্ত্র ও উপকরণ বিক্রি করেছে। একই সঙ্গে প্রথমত দান-খয়রাতের মারফত সামরিক খাঁই বাড়িয়ে ল্যাটিন আমেরিকাতে সামরিক কর্তৃত্ব ও প্রাধান্য প্রসারিত করা এবং দ্বিতীয়ত ক্রমপ্রসারমান সামরিক বাহিনীর প্রয়োজন মেটাবার নামে সমরাস্ত্র বিক্রি করে মুনাফা অর্জন করার দ্বিবিধ উদ্দেশ্য-সাধনের ব্যাপারেই মার্কিনি বৃহৎ পুঁজিপতিরা ব্যাপৃত। অস্ত্র সজ্জা যে ল্যাটিন আমেরিকার অধিবাসীদের উপর ক্রমবর্ধমান বোঝা হিসেবে চেপে বসে তাদের দারিদ্র্যের পঙ্ককুণ্ডে আরও গভীর তলায় নিয়ে যাচ্ছে, সেদিকে দৃকপাত করার প্রয়োজন পড়ে না পুঁজিপতিদের। ল্যাটিন আমেরিকার বিভিন্ন দেশের বাজেটে যত বেশি সামরিক ব্যয়ভার থাকবে, ততই এই অস্ত্রব্যবসায়ীদের দৃষ্টিতে বেশি সুখকর হবে। বাজেটে জনকল্যাণমূলক বরাদ্দ বৃদ্ধি করার অবকাশ এদের নেই। ইদানিং মাথা প্রতি যেটুকু বার্ষিক উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে, তার অর্ধেক অংশ ক্রমবর্ধমান সামরিক ব্যয়বরাদ্দে শুষে গিয়েছে। সুতরাং সামান্য মাথা প্রতি উৎপাদন বৃদ্ধিও জীবন ধারণের অবস্থার উন্নতি বিধানে কাজে লাগেনি।

১৯৬৮ সাল পর্যন্ত এক শত বছরে ল্যাটিন আমেরিকার বিভিন্ন দেশ (কিউবা ছাড়া) বছরে গড়ে সামরিক খাতে ব্যয় করেছে ১৭০ কোটি ডলার। সুতরাং যা এসেছে তার থেকে বেরিয়েছে বেশি। তথা-কথিত "অগ্রগতির জন্য মৈত্রীর" ডলার খয়রাতি প্রকল্পে এর পেয়েছে গড়ে বছরে ১১০ কোটি ডলার।

যারা এভাবে খয়রাতি করে ল্যাটিন আমেরিকাতে বংশবদদের খাঁই বাড়াচ্ছে, তারাই যে ব্যবসার দিকটাতে কিরকম সজাগ, তার প্রমাণ পাওয়া যায় অস্ত্রবিক্রয়ের অর্থ আদায়ের ব্যবস্থাপনায়। অস্ত্র-সরবরাহ চুক্তি করার সময় নগদ ডলারে যাতে মূল্য পরিশোধ করা হয়, তার জন্যে খত লিখিয়ে নেওয়া হয়েছে এবং আদায়ও করে নেওয়া হয়েছে নগদ শতকরা অন্তত ৬০ ভাগ। এবং সেটাও ডলার মুদ্রায়।

॥ ৪॥

জাতীয় গণমুক্তি সংগ্রামের অব্যাহত ধারা

গত একশত বছর ধরে সাম্রাজ্যবাদী পশ্চিমী শক্তিগুলি এবং বিশেষ করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক শৃঙ্খলে ল্যাটিন আমেরিকাকে আষ্টেপৃষ্টে বাঁধলেও জাতীয় মুক্তিসংগ্রাম অব্যাহত থেকেছে এবং এক সময়ের শুধুমাত্র স্পেনিশ ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যবাদীদের বিরুদ্ধে নিয়োজিত সংগ্রাম অন্যান্য ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যবাদীর হস্তক্ষেপের বিরোধিতা করতে গিয়ে নতুন নতুন রূপ পরিগ্রহ করেছে। মেক্সিকোর উদাহরণে আমরা দেখেছি, কিভাবে গত শতাব্দিতে বৈদেশিক হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে সে লড়াই করেছে। বর্তমান শতাব্দিতে প্রথম মহাযুদ্ধ থেকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পর্যন্ত একটানা প্রায় ত্রিশ বছর মেক্সিকো ল্যাটিন আমেরিকার বিপ্লবী পতাকাকে বহন করেছে। বিশেষ করে ১৯৩৫ থেকে ১৯৪০ পর্যন্ত যিনি প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন, সেই লাজারো কার্দেনাস কৃষক, শ্রমিক এবং গণ-সেনাবাহিনীকে নিয়ে গঠিত 'মেক্সিকো বিপ্লবী পার্টি'র নির্দেশে এবং বিশেষ করে বিশ্ববিখ্যাত ট্রেড ইউনিয়ন নেতা লম্বার্দো তলেদানোর সহায়তায় দুটি সুদূরপ্রসারী আইন প্রণয়ন করে গণতন্ত্রের দুই প্রধান শত্রুকে ধরাশায়ী করেছিলেন। এই দুই শত্রু হচ্ছে ভূস্বামী-ধনবান জুটি এবং বিদেশি অর্থপুঁজির মালিক মার্কিনি এবং ব্রিটিশ ও অন্যান্য সাম্রাজ্যবাদীরা। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ডামাডোলে মেক্সিকো কোনঠাসা হয়ে পড়ে। এই সময়ে পশ্চিম গোলার্ধে মার্কিনি আধিপত্য একচ্ছত্রভাবে বৃদ্ধি পাওয়ার দরুণ মার্কিনি কোটিপতিরা ডলারের শক্তিতে মদমত্ত হয়ে প্রবলতর উৎসাহে দেশে দেশে ডলারখোর তল্পীবাহক সরকার খাড়া করার ফলে মেক্সিকোর অভ্যন্তরীণ প্রতিক্রিয়াশীলদের শক্তি বৃদ্ধি পায়। কিন্তু বিপ্লবী অগ্নিশিখা কোনদিন নেভেনি। ল্যাটিন আমেরিকার দেশ থেকে দেশান্তরে সে যাত্রা করেছে। সাধারণ নির্বাচনের মারফৎ রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল করার জন্য মাঝে মাঝে বামপন্থি শক্তিগুলি একত্রিত হয়েছে। মাঝে মাঝে সশস্ত্র গণঅভ্যুত্থান ও সাধারণ ধর্মঘটের পথও নিয়েছে তারা। সামরিক শাসকচক্রগুলি কর্তৃক বারংবার ক্ষমতা দখল এবং সামরিক আইন জারী করে সমস্ত বামপন্থি রাজনৈতিক দলকে নিষিদ্ধ করে দেওয়ার ঘটনা পরম্পরার মধ্য দিয়ে একথাই বার বার প্রমাণিত হয়ে আসছে যে, জনগণ কখনো কোন অবস্থাতেই সাম্রজ্যবাদী ও দেশি ধনপতি-ভূস্বামীচক্রের নির্দেশকে মেনে নেয়নি।

বামপন্থি রাজনৈতিক দলগুলি সাধারণভাবে নিজেদের মধ্যে যতই বিবাদ করুক না কেন, শাসক চক্রের হাতে পার্টি অফিসগুলির চাবি তুলে দেয়নি। এই কারণেই সাম্রাজ্যবাদীদের আকাঙ্ক্ষিত তথাকথিত রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা কখনোই কায়েম রাখা সম্ভব হয়নি। বিস্ফোরণের পর বিস্ফোরণ ঘটে এসেছে অপ্রত্যাশিত এলাকাগুলিতেও। উদাহরণস্বরূপ পানামার কথা বলা যেতে পারে। ক্ষুদ্র পানামাতে ১৯৬৪ সালে পানামা খাল ফিরে পাওয়ার দাবিতে যে শক্তিশালী বিক্ষোভ শুরু হয়, তার চাপে পানামা সরকার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করতে বাধ্য হয়। শেষ পর্যন্ত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং পানামার মধ্যে চুক্তি সাধিত হয়েছে, যার একটি ধারা অনুসারে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পানামা খালের উপর পানামার সর্বস্বত্বের দাবি স্বীকার করেছে। অবশ্য এখনও সেখানে মার্কিনি সামরিক ঘাঁটি রয়ে গিয়েছে।

কিউবার সর্বাত্মক বিপ্লব

সাম্রাজ্যবাদীরা ঠিকমতো ঠাহর করতে না করতেই কিউবার বিপ্লব ঘটে গিয়েছে। বিশ্ববাসীর কাছেও আকস্মিক মনে হয়েছে এই ঘটনা। মার্কিনি ডলার চক্রের তাঁবেদার ব্যাটিস্টার সেনাবাহিনী কর্তৃক সুরক্ষিত কায়েমি স্বার্থবাদী তল্পীবাহক সরকারের উচ্ছেদ সাধন করে সংগ্রামী জনগণ এবং মুক্তিবাহিনী কিউবাকে সমাজতন্ত্রবাদী দেশ বলে ঘোষণা করে বসবে, এই ধারণা শত্রুমিত্র অনেকেই করতে পারেনি। অন্য সমস্ত দিক দিয়ে অনুন্নত রেখে শুধু চিনির কাঁচামালের উৎপাদক-দেশে পরিণত করে কোটিপতি মার্কিনি চিনিওয়ালারা কিউবাকে ডলারের উপর একান্তভাবে নির্ভরশীল বলেই ভেবে এসেছিল। কিউবার রাজধানী হাভানা ছিল মার্কিনি ধনী ভ্রমণকারীদের বিলাস-নগরী। আর্নেস্ট হেমিংওয়ের উপন্যাসে এই বিলাসী-লীলার পাশাপাশি কিউবাবাসীদের তিমিরাবৃত জীবন চিত্রিত রয়েছে। কিউবার একপ্রান্তে মার্কিনি সামরিক ঘাঁটির অবস্থান এই দ্বীপ-দেশটিকে মার্কিনি প্রত্যক্ষ খবরদারির আওতাতেই রেখে আসছিল। সুতরাং কিউবা যে সামান্তবাদী-পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদী ব্যবস্থাকে রাতারাতি নাকচ করে দিতে পারে, এটাই মার্কিনি শাসকচক্র প্রথমে অনুধাবন করতে পারেনি; কিউবা যে সামজতন্ত্রী দেশে পরিণত হতে পারে, এ চিন্তা তো দুরের কথা। কিউবার বিপ্লবী নেতৃত্বের অসামান্য কৃতিত্ব এই যে, তাঁরা এই অভাবনীয় কাজটাকে নিখুঁতভাবে সম্পন্ন করেছেন।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তরকালে কিউবার সংগ্রামী পদক্ষেপগুলি বিশ্ববাসীর কাছে এখনও অনেকাংশে অজানা রয়ে গিয়েছে। এখানে এ সম্বন্ধে একটা সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্তই তুলে ধরা যায় শুধু।

১৯৫৩ সালের ২৬ শে জুলাই কিউবার সরকারি সেনাবাহিনীর মোনচাদা দুর্গের উপর এক উৎসবের রাত্রিতে ঝাঁপিয়ে পড়ল একদল মুক্তিসেনা। চট্টগ্রাম অস্ত্রাগারের উপর সূর্য সেনের বিপ্লবী বাহিনীর ঝাঁপিয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে এই ঘটনাটি অনেকাংশে তুলনীয়। কিউবার এই মুক্তিবাহিনীর নেতৃত্ব করেন তরুণ আইনজীবী ডক্টর ফিদেল ক্যাস্ট্রো। তাঁর বয়স এই সময়ে ২৯। গত শতাব্দির শেষের দিকে জোস মার্তির নেতৃত্বে কিউবাতে স্পেনের ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যবাদী দখলের বিরুদ্ধে যে মুক্তি সংগ্রাম আয়োজিত হয়েছিল, তারই পরবর্তী পদক্ষেপ হিসাবে জোস মার্তির আমলের

গণমুক্তিসেনাদের আকস্মিক আঘাত হানার পদ্ধতি তথা গেরিলা কায়দাকে আদর্শ হিসেবে সামনে রেখে ৫৩ সালের ২৬ শে জুলাই মুক্তিসেনাদের অসমসাহসিক অভিযাত্রা পরিচালিত হয়। সেই রাত্রীতে মোন্‌চাদা দুর্গে সরকারি বাহিনীর অফিসার ও সৈন্য সংখ্যা ছিল পাঁচ হাজার। অন্য পক্ষে বিপ্লবী মুক্তিসেনাদের সংখ্যা ছিল মাত্র ১৬৫। মুক্তিসেনাদের অনেকেই ছিল বয়সে তরুণ। মুক্তিসেনারা দুর্গ অধিকার করতে সমর্থ হননি। তাঁরা 'মুক্তিসঙ্গীত' গাইতে গাইতে দুর্গের মধ্যে এগিয়ে গিয়েছিলেন, বেশ কয়েকজন শহীদ হয়েছিলেন এবং ধরা পড়েছিলেন। এরপরে সারা কিউবাতে শুরু হয় তল্লাশী। বিপ্লবী অভিযাত্রীদের অনেকে ধরা পড়েন। এদের মধ্যেই ছিলেন ডক্টর ফিদের ক্যাস্ট্রো এবং তাঁর ভাই রাউল ক্যাস্ট্রো। মোনচাদা দুর্গের উপর আক্রমণ করার অভিযোগে ডক্টর ফিদেল ক্যাস্ট্রো এবং তাঁর সাথীরা নিক্ষিপ্ত হলেন পিনোস দ্বীপের কারাগারে, যাকে এককালের আন্দামানের সঙ্গে তুলনা করা যায়। এর পরে শুরু হয় বিচার। ফিদেল ক্যাস্ট্রো "ইতিহাস আমাকে নির্দোষ সাব্যস্ত করবে" নাম দিয়ে আদালতে এক জবানবন্দী দাখিল করলেন নিজেই নিজের পক্ষ সমর্থন করতে গিয়ে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কোন ব্যক্তিগত সাফাই-এর দলিল হিসাবে তিনি এই জবানবন্দি দাখিল করেননি। এতে দেখানো হলো যে, শাসক ও শোষকচক্র বঞ্চনা ও দারিদ্র্যের যে চূড়ান্তত্ব পর্যায়ে কিউবার জনসাধারণকে নামিয়েছে, তার কবল থেকে মুক্ত হবার পথ খোলা আছে বিদ্রোহ। এই জবানবন্দীতে কিউবার জনসাধারণের সংগ্রামী নীতি, অধিকার এবং আশা আকাঙ্ক্ষাকে তুলে ধরে শোষণমুক্ত সমাজব্যবস্থার একটা রূপরেখা তুলে ধরা হয় দুর্গ

বিচারের রায়ে ফিদেল ক্যাস্ট্রো এবং তাঁর সাথীদের সাজা হয়ে যায়। ফিদেল ক্যাস্ট্রোকে দেওয়া হয় তেরো বছরের কারাদণ্ড।

কিউবার শাসকচক্র এবং তাদের মার্কিনি অভিভাবকেরা মনে করেছিল, ল্যাটিন আমেরিকার বিভিন্ন দেশে ইতোপূর্বেকার আরও অনেক অভ্যুত্থানের মতো ২৬ শে জুলাই তারিখের ঘটনারও এখানে পরিসমাপ্তি ঘটবে। কিন্তু ফল হলো বিপরীত। মোন্‌চাদা দুর্গের উপর শতাধিক তরুণের সশস্ত্র আক্রমণ কিউবার জনগণের মধ্যে গভীর আত্মবিশ্বাস ও সাড়া এনে দিয়েছিল; ফিদেল ক্যাস্ট্রোর জবানবন্দী এই আত্মবিশ্বাস আর সাড়াকে আগামী দিনের ঠিকানা দিয়ে দিল। কিউবার রাজনৈতিক জগতে তোলপাড় শুরু হয়ে গেল। কায়েমি স্বার্থবাদীদের মুখপাত্রদের মনে দুশ্চিন্তা দেখা দিল। একই নীতির ঝুড়িতে সমস্ত ডিম রেখে যাতে পস্তাতে না হয়, সে ভাবনায় ভাবিত হলো কিউবার হর্তাকর্তারা। সুতরাং, শিথিল করতে হলো দমননীতির বজ্র আটুনিকে। ১৯৫৬ সালে সাধারণভাবে রাজবন্দীদের মুক্তি দেওয়ার কথা ঘোষণা করা হল। এরই ফলে ফিদেল ক্যাস্ট্রো এবং তাঁর সাথীরা মুক্তি পেলেন। মুক্তি পাবার পরে ফিদেল ক্যাস্ট্রো মেক্সিকো চলে গেলেন। কিউবার হর্তাকর্তারা ভাবলো, মাথা ঠাণ্ডা হয়ে গিয়েছে তরুণদের; পরিস্থিতি আয়ত্ত্বাধীন।

কিন্তু ফিদেল ক্যাস্ট্রো এবং তাঁর সাথীরা মেক্সিকোতে বসে বৃহত্তর বিপ্লবী অভিযানের পরিকল্পনা নিলেন। এখানে তাঁদের সঙ্গে যোগ দিলেন আর্জেন্টিনার আর্নেস্টো চে গুয়েভারা। চে গুয়েভারা ল্যাটিন আমেরিকার অশান্ত সন্তান। তাঁর জন্ম

১৯২৮ সালে ১৪ জুন। তাঁর পিতা খ্যাতনামা স্থপতি; মা সিলিয়া দ্য লা সেরমা খ্যাতনাম্নী কমিউনিস্ট। জন্মলগ্নেই চে গুয়েভারা পেয়েছিলেন গণমুক্তি-সংগ্রামের ভাবধারায় পরিবেশ। ছাত্রজীবনেই তিনি বিপ্লবী ছাত্র আন্দোলনে যোগদান করেন। বুয়েনস এয়ারেস বিশ্ববিদ্যালয়ের চিকিৎসা বিভাগ থেকে স্নাতক হবার পরে তিনি নগরীর আশেপাশে দরিদ্র এলাকার চিকিৎসকের কাজে নামেন, শহুরে ডাক্তারের আরামপ্রদ ব্যবসাতে না গিয়ে। এরপরে তিনি ল্যাটিন আমেরিকার অন্যান্য দেশে ডাক্তারি করতে গিয়ে দেখতে পান ব্রাজিলের রিও দা জেনারিও, পেগুর লিমা এবং ভেনিজুয়েলার রাজধানী কারাকাসের বস্তিবাসীদের এবং আন্ডিস পর্বতমালা ও আমাজান অরণ্যের বাসিন্দাদের আদিবাসীদের চূড়ান্ত দারিদ্র্যকে। ১৯৫৪ সালে (তাঁর বয়স তখন ২৬ বছর) তিনি গুয়াতেমালায় যান। এখানে সে সময়ে সাধারণ নির্বাচনের রায়ে প্রতিষ্ঠিত বামপন্থি আরবেঞ্জ সরকারকে মার্কিনি সি আই এ গোয়েন্দা চক্রের ভাড়াটে সেনাবাহিনীর ক্ষমতাচ্যুত করে স্বৈরাচার কায়েম করেছে। জনসাধারণ এই ভাড়াটিয়াদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছে। চে গুয়েভারা এই প্রতিরোধ-সংগ্রামে যোগ দিলেন। মার্কিনি ভাড়াটিয়ারা এই প্রতিরোধকে অস্ত্রের জোরে দাবিয়ে দেবার পরে চে গুয়েভারা মেক্সিকোতে চলে যান। গুয়াতেমালায় থাকাতেই তিনি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হন যে, ল্যাটিন আমেরিকার জনগণের সমস্ত দুঃখের মূলে রয়েছে যে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ, তার উচ্ছেদ সাধনের জন্য তিনি নিজেকে উৎসর্গীকৃত করবেন। মেক্সিকোতে থাকার সময় চে গুয়েভারার সঙ্গে দেখা হয়ে গেলো ফিদেল ক্যাস্ট্রোর। এরপরে ১৯৬৫ সালের ডিসেম্বর মাসে ফিদেল ক্যাস্ট্রো এবং তাঁর আরও কয়েকজন সাথীর সঙ্গে মিলে চে গুয়েভারা একটা ছোট জাহাজে চড়ে নামলেন কিউবার ওরিয়েন্ট প্রদেশের উপকূলে গোপনে। এই ছোট জাহাজটার নাম গ্রানমা?

এখানেই চে গুয়েভারা এবং তাঁর সাথীরা সায়েরা মায়েস্ত্রা পর্বতে গড়ে তুললেন গেরিলা বাহিনীর কেন্দ্র। তাঁরা এই সময়ে সকলেই দাড়ি রাখেন এবং আশেপাশে কৃষক ও গ্রামাবাসী সাধারণের কাছে বারবুদোস বা দাড়িওয়ালা নামে পরিচিত হন। এই পর্বত-কেন্দ্র থেকে বেরিয়ে তাঁরা কিউবার বিভিন্ন প্রদেশের অভ্যন্তরে স্বৈরাচারীদের আস্তানার উপর হানা দিতে শুরু করেন।

কিউবাতে সশস্ত্র মুক্তি সংগ্রামের মধ্য দিয়ে চে গুয়েভারা এবং ফিদেল ক্যাস্ট্রো এই দুটি নাম চিরকালের জন্য যুক্ত হয়ে যায়। ১৯৫৯ সালের পহেলা জানুয়ারি তারিখে মার্কিনি ডলারচক্রের তাঁবেদার বাহিনীর ব্যূহগুলিকে ভেদ করে গণসেনাবাহিনী চে গুয়েভারার নেতৃত্বে কিউবার রাজধানী হাভানাতে প্রবেশ করে। তল্পীবাহক সরকারের পতন ঘটে। ফেব্রুয়ারি মাসে যখন ফিদেল কাস্ট্রোকে প্রধানমন্ত্রী করে স্বাধীন কিউবা প্রজাতন্ত্রের সরকার গঠিত হয়, তখন গুয়েভারার উপর গণবাহিনী গড়ে তোলার ভার দেওয়া হয়। ১৯৬১ সালে চে গুয়েভারা কিউবার জাতীয় ব্যাংকের প্রধান এবং পরে শিল্পমন্ত্রী নিযুক্ত হন। ১৯৬৫ সালে আর্জেন্টিনার এই অশান্ত সন্তান কিউবা এবং ফিদেল ক্যাস্ট্রোর কাছ থেকে বিদায় নেন একটি চিঠি রেখে। এই চিঠিতে তিনি লেখেন: "পৃথিবীর অন্যান্য জায়গা এখন আমার সাধ্যমতো কাজের দাবিদার। ... নতুন নতুন রণক্ষেত্রে আমি আমার সেই দায়িত্ব পালন করে যাবো যাতে আমি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। আমি

প্রতিজ্ঞাবদ্ধ যে, সাম্রাজ্যবাদকে যেখানেই পাবো সেখানেই তার বিরুদ্ধে লড়বো।" দক্ষিণ আমেরিকার একেবারে মাঝখানে অবস্থিত বলিভিয়াতে মার্কিনি তাঁবেদার সরকারের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রাম পরিচালনা করতে গিয়ে ১৯৬৬ সালের অক্টোবরের প্রথম সপ্তাহে রক্তাক্ত, আহত ও অসুস্থ অবস্থায় চে গুয়েভারা ভাড়াটিয়া সেনাবহিনীর হাতে ধরা পড়েন। তারা তাঁকে ৮ই অক্টোবর গুলি করে হত্যা করে এবং গোপনে তাঁর গুলিবিদ্ধ মৃতদেহকে মাটিচাপা দেয়।

চে গুয়েভারা কিউবার বিপ্লবের সাফল্যের পরে ল্যাটিন আমেরিকার বিপ্লব সমাপনের জন্য যে নিরন্তর সংগ্রামীর ভূমিকা বেছে নেন, সেই ভূমিকায় কিউবার উপরে বর্তেছে তার নব জন্মলগ্নেই। প্রথমত ১৯৫৯ সালের পহেলা জানুয়ারির পর থেকে কিউবা হয়ে দাঁড়িয়েছে স্বৈরাচারমুক্ত গণতন্ত্র এবং শোষণহীণ সমাজের দৃষ্টান্ত স্বরূপ। ল্যাটিন আমেরিকার জনগণের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক মুক্তি কোন্ পথে সম্ভব কিংবা দারিদ্র্যজর্জরিত অনুন্নত দেশে উদ্দীপনা ও সুখসমৃদ্ধির স্রোত বইয়ে দেওয়াও যে কত তাড়াতাড়ি সম্ভব, সেকথা কিউবা হাতে কলমে দেখিয়েছে।

দ্বিতীয়ত কিউবা হয়েছে সেই মুক্ত এলাকা যেখানে ল্যাটিন আমেরিকার মুক্তিকামী জনগণ স্থাপন করেছে তাদের সংগ্রামী সদর দপ্তর।

বিপ্লবী কিউবা প্রধানত তিনটি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে সামন্তবাদ, পুঁজিবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের শোষণ-শাসনের ছায়া থেকেও মুক্ত হবার উদ্দেশ্যে। এই তিনটি ব্যবস্থা হচ্ছে (ক) সমস্ত শিল্প ও ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান জাতীয়করণ, (খ) স্বৈরাচারী দুর্নীতিবাজ ও আমলাতন্ত্রের হাত থেকে সমস্ত সামাজিক ও সরকারি সম্পত্তি উদ্ধার করা, (গ) ভূমিসংস্কার ব্যবস্থা দ্বারা ল্যাটিফুন্ডিয়া বা বৃহৎ ভূস্বামীপ্রথার বিলোপ সাধন।

১৯৬০ সালের মাঝামাঝি সময়ে মার্কিনি পুঁজি সমন্বিত শিল্প ও ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানগুলিকে কিউবা সরকার বাজেয়াপ্ত করে নেন। ঐ বছরেরই অক্টোবর মাসে ব্যক্তিগত মালিকানাধীন বড় বড় শিল্প ও ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের জাতীয়করণ ঘোষিত হয়। চিনি শিল্পের জাতীয়করণ, ব্যাংকগুলিকে রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণে এনে সমাজসেবায় নিয়োজিত করা, রাষ্ট্রীয় উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ করে প্রশাসনিক ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন সাধন, এইগুলি জাতীয়করণ নীতির প্রধান কার্যকরী দিক হিসাবে বেরিয়ে এসেছে। স্বৈরাচারের আমলের দুর্নীতিবাজদের হাত থেকে সামাজিক ও সরকারি সম্পত্তি উদ্ধার সাধন কায়েমি স্বার্থ ও সম্রাজ্যবাদের তল্পীবাহক মেরুদণ্ড ভেঙ্গে দিয়েছে। বৃহৎ ভূস্বামী প্রথার বিলোপ সাধন করে গ্রামাঞ্চলের শোষণের সমস্ত ব্যবস্থার উচ্ছেদ সাধন করা হয়েছে। ভাগচাষী এবং ভূমিহীন চাষীরা জমি পেয়েছে। এর ফলে গ্রামাঞ্চলে বিরাট অর্থনৈতিক প্রাণচাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে।

উপরিউক্ত তিনটি মূল বৈপ্লবিক ব্যবস্থার সঙ্গে সঙ্গে কিউবাতে আরও দুটি সুদূরপ্রসারী ব্যবস্থা গৃহীত হয়েছে। একটি হচ্ছে নিগ্রো এবং শ্বেতাঙ্গদের মধ্যে সমস্ত রকমের বৈষম্যের বিলোপ সাধন। আরেকটি হচ্ছে, মেয়েদের জন্য শিল্প ও কৃষি উৎপাদনের ক্ষেত্রে ব্যাপক কর্মক্ষেত্র উন্মুক্ত করে দেওয়া। এই দুটি ব্যবস্থাই কিউবার নতুন সমাজ ব্যবস্থায় জনগণের নবজীবন বোধকে দিয়েছে সুদূরপ্রসারী অনুপ্রেরণা। প্রথমত বর্ণ বৈষম্যের দরুণ কিউবার গণজীবনে যে বিষক্রিয়ার সৃষ্টি হতো, তাকে মূল

সমেত উপড়ে ফেলায় কিউবার মেহনতী মানুষের ঐক্য পেয়েছে গভীরতা ও ব্যাপ্তি দুইই। দ্বিতীয়ত নারীসমাজের ব্যাপক কর্মসংস্থানের ফলে কিউবার সমাজ দেহ থেকে একটা পুরাতন ব্যাধিকে বিতাড়িত করা সম্ভব হয়েছে। কিউবার বিপ্লবের আগে হাভানার 'লালবাতি এলাকা' বা পতিতালয় ছিল পশ্চিমী দুনিয়ার বিলাসীদের অন্যতম সেরা আকর্ষণ। কিউবাবাসীদের দারিদ্র্যই ছিল এর মূলে। দারিদ্র্য-জর্জরিত মেয়েদের পাপ-ব্যবসায়ে লিপ্ত করে কায়েমি স্বার্থবাদী এবং সাম্রাজ্যবাদীদের দালালরা বিরাট মুনাফা অর্জন করত। কিউবার বিপ্লব এই ঘৃণ্য শোষণ-ব্যবস্থাকে উপড়ে ফেলে দিয়েছে। সুতরাং কিউবার বিপ্লব দেশের নারীসমাজের মনে এনে দিয়েছে গভীর আশ্বাস। সবকিছু মিলিয়ে নারীমুক্তি সম্পর্কিত বিপ্লবী ব্যবস্থা কিউবার সামগ্রিক সমাজ-জীবনে এনেছে নতুন মানবিক মূল্যবোধ।

জনগণের সর্বাঙ্গীন মুক্তিই হচ্ছে বিপ্লবের সমাজতান্ত্রিক কর্মসূচি। অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক বিপ্লবের সঙ্গে রয়েছে সাংস্কৃতিক বিপ্লবের কর্মসূচিও। এই সাংস্কৃতিক বিপ্লবের মূলভিত্তি হলো সর্বজনীন শিক্ষা। যে নারীসমাজ এবং বিশেষ করে গ্রামীণ জনসাধারণ বর্ণমালা চোখে দেখেনি বিপ্লবের আগে, তারা রাতারাতি হাতে পেয়েছে শিক্ষার আলোকবর্তিকা। তারা নিজেরা পড়ছে, অপরকেও পড়াচ্ছে।

কিউবার সর্বাত্মক বিপ্লব সম্ভব হয়েছে, সকল মেহনতী ও বিপ্লবী বুদ্ধিজীবীর ঐক্যে। এই ঐক্যের মূলে কাজ করেছে সর্বস্তরের দেশপ্রেমিকদের সংহতি। এই দেশপ্রেমিদের পুরোভাগে রয়েছে কিউবার কমিউনিস্ট পার্টি। কিউবার কমিউনিস্ট পার্টি ফিদেল ক্যাস্ট্রোর গেরিলাবাহিনী এবং শিল্পাঞ্চলের শ্রমিকদের মধ্যে স্থাপন করেছিল সেই সম্মিলন যার দুর্বার অভিযাত্রার মুখে ভেঙ্গে পড়েছিল সাম্রাজ্যবাদীদের তল্পীবাহকদের শোষণ-শাসনের কাঠামো। কিউবার বিপ্লবের আরও কাজ আছে সত্তরের দশকে। তাছাড়া সমগ্র ল্যাটিন আমেরিকার জনগণের মুক্তিসংগ্রামকে সফল করে তোলাও কিউবার বিপ্লবীদের দায়িত্ব।

যে মার্কিনি বৃহৎ পুঁজিপতি-সাম্রাজ্যবাদী চক্র নয়া ঔপনিবেশিক স্বার্থ উদ্ধারের মানসে সাতসমুদ্র পেরিয়ে আফ্রো এশিয়াতে চড়াও হয়ে চলেছে, তাদেরই নাকের ডগায় কিউবার এই বৈপ্লবিক উপস্থিতি ও বিকাশ যে বিষময় ঠেকেছে, এতে আশ্চর্যের কিছু নেই। বিপ্লবী কিউবাকে ধ্বংস করার উদ্দেশ্যে মার্কিনি শাসকচক্র ষাটের দশকে আছাড়ি-পিছাড়ি করেছে।

একেবারে প্রথম দিকে মার্কিন চিনিওয়ালারা ফিদেল ক্যাস্ট্রোর সাধারণ যুবা অনুসারীদের এবং কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যে একটা মতান্তর ঘটাবার চেষ্টার মাধ্যমে কিউবার বিপ্লবকে দ্বিধাবিভক্ত ও দ্বিধান্বিত করার প্রয়াস পায়। ফিদেল ক্যাস্ট্রোর তরফ থেকে খোলাখুলিভাবে মার্কসবাদী হিসাবে নিজেকে ঘোষণা করা এবং কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বের সঙ্গে তাঁর মিশে যাওয়াটাকে 'এমন তো কথা ছিল না' বলে প্রতিপন্ন করে '২৬ শে জুলাই' অভ্যুত্থানের সঙ্গে জড়িতদের মধ্যে একটা বিভ্রান্তি সৃষ্টির প্রয়াস করে সাম্রাজ্যবাদীরা। তারা এই ব্যাপারে স্নায়ুযুদ্ধ চালিয়ে ১৯৫৩ সালের "২৬ জুলাই" অভ্যুত্থানের সমর্থক কিছু ধনতান্ত্রিক মনোভাবাপন্ন লোককে ভাগিয়ে নিতে সক্ষম হয়। কিন্তু কিউবার যে প্রায় এক কোটি অতি দরিদ্র বাসিন্দা ২৬ শে জুলাই-এর অভ্যুত্থানকে

অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক বিপ্লবের সূচনা হিসাবে দেখেছিল, তারা ফিদেল ক্যাস্ট্রোর মার্কসবাদী ঘোষণাকে স্বাভাবিক চিন্তা বলে মনে করে। এই কারণেই সাম্রাজ্যবাদী বিভেদের চাল চালাবার পরে পরেই মার্কিনি শাসক ও শোষক চক্র চিরাচরিত পথে ভাড়াটিয়া বাহিনীর সাহায্যে কিউবাকে ফিরে দখল করার জন্য সচেষ্ট হয়। মার্কিনি রণতরী বহরের রক্ষণাধীনে ১৯৬১ সালে কিউবার "বে অব পিগস' নামক উপসাগরের কুলে কতকগুলি জাহাজ থেকে বিরাট একদল ভাড়াটিয়াকে নামিয়ে দেওয়া হয়। কিন্তু কিউবার গণসেনাবাহিনী তাদের নির্মূল করে দেয়। এখানে উল্লেখ করে রাখা দরকার যে, কিউবা-বিপ্লবের একটা বড় কীর্তি হচ্ছে এই যে, এর মাধ্যমে ডলার নির্ভর সেনাবাহিনীর সম্পূর্ণ বিলুপ্তি ঘটে। স্বৈরাচারী ব্যারিস্টার পতনের সঙ্গে সঙ্গে তার সেনাবাহিনীরও পতন ঘটে। ডলারী সেনাবাহিনীর সাইনবোর্ড পাল্টে কিউবার গণসেনাবাহিনী গঠিত হয়নি। এই কারণেই 'বে অব পিগসের' হামলার সময় কিউবাতে অবতরণকারী ভাড়াটিয়াদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে গণবাহিনীর মধ্যে বিন্দুমাত্র বিভ্রান্তি দেখা যায়নি। বিপ্লবী কিউবা ডলারের ফাঁসমুক্ত জাতীয় গণসেনাবাহিনী গড়ে তুলেছে।

উপরিউক্ত "পরোক্ষ" হামলা ব্যর্থ হয়ে যাওয়ার পরে মার্কিনি শাসকচক্র খোলাখুলি যুদ্ধের ময়দানে নামে কিউবাকে খতম করে দেবার উদ্দেশ্যে। ১৯৬২ সালের অক্টোবর মাসে কিউবা সরকার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে আক্রমণ করার জন্য সোভিয়েত পারমানবিক অস্ত্র জমা করেছে এই অভিযোগ উত্থাপন করে মার্কিনিরা কিউবাকে রণতরী দিয়ে বেষ্টন করে এবং পারমানবিক অস্ত্রসমূহ অপসারিত না হলে জোর করে সেগুলি সরাবার হুমকি জারি করে। কিউবাকে দমন করার উদ্দেশ্য নিয়ে মার্কিনি সাম্রাজ্যবাদীরা সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে যুদ্ধ করারও ঝুঁকি নেয়। তারা সোভিয়েত অস্ত্রবাহী জাহাজকে কিউবা অভিমুখে যেতে দেওয়া হবেনা বলে ঘোষণা জারী করে। সাম্রাজ্যবাদীরা যে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ বাঁধাবার জন্য সাজসজ্জা করে এসেছে, তা কিউবাকে কেন্দ্র করেই বাঁধবে, এরকম একটা ধারণা দেখা দেয় বিশ্ববাসীর মনে। কিন্তু কিউবার বিপ্লবী নেতৃত্বের দৃঢ়তা, সোভিয়েত ইউনিয়নের ধৈর্য্যশীলতা, শান্তির সংগ্রামী মনীষী বার্ট্রান্ড রাসেলের মধ্যস্থতা এবং কিউবার স্বাধীনতার স্বপক্ষে বিশ্বজনমতের দরুণ মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীরা পিছু হটতে বাধ্য হয়। তারা একটা ব্যবস্থায় আসতে বাধ্য হয়, যাতে কিউবা থেকে যেমন সোভিয়েত পারমাণবিক অস্ত্র সরানো হয়, তেমনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সরকারকেও কথা দিতে হয় যে, তারা কিউবাতে হস্তক্ষেপ করবে না। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট কেনেডী কিউবাতে আর হস্তক্ষেপ করবেন না বলতেই কি পুঁজিপতি সাম্রাজ্যবাদীদের দালালদের হাতে নিহত হয়েছেন? এ প্রশ্নের জবাব হয়তো ভবিষ্যতে সঠিকভাবে পাওয়া যাবে।

॥ ৫॥

স্বাধীনতা সংগ্রামীদের শিবিরে তাত্ত্বিক পরিস্থিতি

জাতীয় মুক্তি, গণতন্ত্র এবং শোষণহীন সমাজ প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম শত বাধা বিপত্তিসত্ত্বেও জয়ের দিকে মুখ করেই এগিয়ে চলেছে। কিন্তু একথাটাও আমরা প্রতিনিয়ত শুনছি যে, স্বাধীনতা-সংগ্রামীদের শিবিরে সর্বশেষ পর্যায়ে পৌঁছাবার ব্যাপারে পথ নির্ণয়ের ক্ষেত্রে

তীব্র তাত্ত্বিক বিতর্ক দেখা দিয়েছে। সাম্রাজ্যবাদীদের বিভিন্ন মুখপত্র এবং তাদের পরোক্ষ প্রচার যন্ত্রগুলি এই বিতর্কের মতান্তরকে উষ্কিয়ে খুব বড় করে দেখাবার জন্য চেষ্টা করছে। সবচেয়ে কৌতুকজনক কাণ্ড এই যে, যে সশস্ত্র সংগ্রামে রয়েছে সাম্রাজ্যবাদীদের মৃত্যুবান, তাকেই তারা বিতর্কের মূল বিষয় বলে প্রচারিত করে ল্যাটিন আমেরিকার দেশে দেশে মুক্তি সংগ্রামের অগ্রণীশক্তি কমিউনিস্ট পার্টিসমূহকে এ প্রশ্নের ফয়সালায় অপরাগ বলে প্রতিপন্ন করতে চাইছে। দেখা যাচ্ছে, এই ধরণের প্রচারের টোপ গেলার লোকাভাব হচ্ছে না। ল্যাটিন আমেরিকার ভেতরে এবং বাইরে সাম্রাজ্যবাদী প্রচার কিছুটা ধোঁয়া সৃষ্টিও করছে। এই কারণেই জানা দরকার স্বাধীনতা সংগ্রামীদের শিবিরে আজ যে মতান্তর ও মতৈক্য, তাদের তাত্ত্বিক সূত্রগুলি কি?

প্রাগ থেকে প্রকাশিত "বিশ্ব মার্কসবাদী পর্যালোচনা" নামক পত্রিকার কয়েকটি সংখ্যায় এই সূত্রগুলি সম্বন্ধে ল্যাটিন আমেরিকার বামপন্থি ও সাম্যবাদী তাত্ত্বিকদের উদ্যোগে বিস্তারিত আলোচনা চলে আসছে গত এক দশক ধরেই। এই আলোচনার দুটি প্রশ্ন সংক্ষেপে নিম্নরূপ:

(১) লেনিন যাকে "বিপ্লবী পরিস্থিতি" বা জনগণের ক্ষমতা দখলের ক্ষণ বলে নির্দিষ্ট করেছিলেন, তার আলোকে দেখতে গেলে কি বর্তমান মুহূর্তকে বিপ্লবী পরিস্থিতি বলা যায় না? যদি সেই মুহূর্ত না এসে থাকে তবে তাকে আনার জন্য কি করতে হবে?

(২) দেখা যাচ্ছে, সাধারণ নির্বাচন মারফত কিংবা সাধারণ ধর্মঘটের মধ্য দিয়ে এ পর্যন্ত যতবার ক্ষমতায় যেতে চেষ্টা করেছে, ততবারই ব্যর্থতা এসেছে। সুতরাং এখন একমাত্র সশস্ত্র সংগ্রামের পথেই ক্ষমতায় যাবার ব্যবস্থা করতে হবে। এই সশস্ত্র সংগ্রামের রূপ কি হবে?

এই দুটি প্রশ্নে যেভাবে ল্যাটিন আমেরিকার মুক্তিসংগ্রামীরা জবাব বার করেছেন, তাতে আমরা দেখতে পাব যে, মতপার্থক্যমূলক পরিস্থিতিটা শুধুমাত্র সময়োচিত ও স্থানোচিত কর্মপন্থা প্রয়োগেই নিবদ্ধ। মূলনীতিগত পার্থক্যকে প্রধানত ল্যাটিন আমেরিকার কমিউনিস্ট পার্টিগুলি মিলিয়ে এনেছে অনেকটা। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে, আর্নেস্টো চে গুয়েভারার মত ছিল এই যে, বিপ্লবী পরিস্থিতি সৃষ্টি করতে হবে গ্রামাঞ্চলে শাসকচক্রের ঘাঁটির উপর গেরিলা পদ্ধতিতে আঘাত হেনে হেনে। মতান্তরের ক্ষেত্রে একথাগুলিকে তিনি মিষ্টি করে বলেননি। কিন্তু তিনি তাঁর লেখা "গেরিলা যুদ্ধ" গ্রন্থের প্রারম্ভেই বলে নিয়েছিলেন যে, একমাত্র গেরিলাদের দ্বারা বিপ্লবের সমস্ত প্রস্তুতির কাজগুলি সম্পন্ন হবে না।" যাদের সঙ্গে মত বিরোধ হয়েছে তাঁরা বলেছেন, সমস্তগুলি প্রস্তুতিরই প্রয়োজন এবং সেজন্য সব কাজ একসঙ্গে চালাতে হবে। অর্থাৎ সশস্ত্র সংগ্রামের ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট পার্টিগুলি একমত হয়েছে। ল্যাটিন আমেরিকার সমস্ত কমিউনিস্ট পার্টিই বলেছে যে, সশস্ত্র সংগ্রামই হচ্ছে সর্বোচ্চ পর্যায়; তবে অবশ্যই এই পর্যায়ে যাবার পথগুলি তৈরি করে নিতে হবে। অর্থাৎ মূল সামগ্রিক নীতিতে বা লক্ষ্যে বিরোধ নেই, বিরোধ আছে কর্মকৌশলে। এই কর্মকৌশলগত মতপার্থক্যই কর্মপন্থায় এনেছে সাময়িক বিরোধ, যার ধূলিজাল মাঝে মাঝে মূল সামগ্রিক নির্ধারিত নীতি ও লক্ষ্যকে আবৃত করেছে। বিপ্লবের মূল শক্তি কৃষক না শ্রমিক, এই অহেতুক বিতর্কও বেশকিছু সংগ্রামীকে লিপ্ত করেছে। যেখানে "শ্রমিক শ্রেণির নেতৃত্বে শ্রমিক-কৃষক

মৈত্রীর" মার্কসীয়-লেনিনীয় বক্তব্য বহু পরিচিত বৈজ্ঞানিক তথ্য, সেখানে কখনো কখনো দেখা দিয়েছে এর নতুন করে সংজ্ঞা নির্ধারণের প্রয়াস। সামগ্রিকভাবে যেখানে নীতি নির্ধারিত হচ্ছে, সেখানে ঐক্যমতে পৌঁছাতে পারা যে সম্ভব, তার প্রমাণগুলিকে লক্ষ্য করা হয়নি। এতেই সাম্রাজ্যবাদীরা বিভেদের বীজকে ব্যাপকতর ক্ষেত্রে বপন করার স্বপ্ন দেখেছে। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীরা ইতোপূর্বেও ল্যাটিন আমেরিকার বিভিন্ন দেশকে সাম্রাজ্যিক শৃঙ্খলে বাঁধবার সঙ্গে সঙ্গেই অভ্যন্তরীণভাবে গণশক্তির ক্ষমতা ও উদ্যোগ হ্রাসের উদ্দ্যেশ্যে বিভিন্ন বিভেদমূলক অস্ত্র প্রয়োগ করেছে। তারা বিভিন্ন দেশের সীমানা নির্ধারণ ও পুনর্নির্ধারণের হানাহানি বাধিয়ে ল্যাটিন আমেরিকার মুক্তিকামী জনগণের ঐক্যকে বিপর্যস্ত করতে চেষ্টা করেছে। ইদানিং তারা নিগ্রো-অনিগ্রোদের মধ্যে দাঙ্গাফ্যাসাদ বাধিয়ে গুইয়ানাতে প্রগতিবাদীর শিবির ভেঙ্গে দেবার চেষ্টা করেছে। এধরণের প্রয়াস তারা আরও করবে। তবে ল্যাটিন আমেরিকার জনগণ এর মোকাবেলা করার জন্য প্রস্তুত। এই প্রস্তুতিরই অঙ্গ হিসাবে স্থাপিত হয়েছে মুক্তিসংগ্রামীদের ল্যাটিন আমেরিকা রাষ্ট্র সংঘ ও.এল.এ.এস।

প্রথম ও.এল.এ. এস. সম্মেলন

১৯৬৭ সালের ৩০ শে জুলাই কিউবার রাজধানী হাভানাতে ল্যাটিন আমেরিকার মুক্তিসংগ্রামীদের সংহতি সংঘের যে প্রথম সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়, তাতে ২৭ টি প্রতিনিধি দল যোগদান করে। এই সাতাশটি দলের মধ্যে ছিল ২০টি প্রজাতন্ত্র এবং সাবেক ব্রিটিশ উপনিবেশ এবং উপনিবেশিক এলাকাগুলির বিপ্লবী প্রতিনিধিবৃন্দ। কিউবার প্রেসিডেন্ট ডর্টিকস এই সম্মেলনের প্রতিনিধিদের স্বাগত জানান। এই সম্মেলনের আলোচ্যসূচি ছিল নিম্নরূপ :

(১) ল্যাটিন আমেরিকাতে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী বিপ্লবী সংগ্রামের মুখ্য দিকগুলিকে নির্ণয় করা।

(২) সাম্রাজ্যবাদী সামরিক এবং রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ ও অর্থনৈতিক এবং ভাবাদর্শগত অনুপ্রবেশের বিরুদ্ধে সংযুক্ত সংগ্রাম পরিচালনা করা।

(৩) বিশ্বের অন্যান্য এলাকার মুক্তিসংগ্রামের সংগে ল্যাটিন আমেরিকার সংহতি স্থাপন।

(৪) ল্যাটিন আমেরিকার মুক্তিসংগ্রামীদের সংহতি সংঘের গঠনতন্ত্র নির্ধারণ।

দশদিন ধরে এই আলোচ্যসূচির ভিত্তিতে যে আলোচনা চলে, তাতে একটা সাধারণ ধারণায় সকলেই পৌঁছাতে সক্ষম হয় এবং সেটা এই যে, ল্যাটিন আমেরিকার প্রায় সমস্ত দেশেই সশস্ত্র সংগ্রামের প্রয়োজন হবে। কেউ কেউ শুধুমাত্র গেরিলা পদ্ধতির লড়াইয়ের উপর জোর দেন, অন্যান্যরা অন্যান্য পদ্ধতিকেও সামনে আনেন। তবে এ ব্যাপারে কোনো জেদাজেদি হয়নি। সর্বোপরি ঐক্যের উপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়।

সম্মেলনের শেষ অধিবেশনে আলোচিত ও নির্ধারিত সাধারণ ঘোষণা এবং প্রস্তাবাবলি গৃহীত হয়। এই সম্মেলনে কোন ফাটল ধরেনি যদিও সাম্রাজ্যবাদীরা এবং তাদের শৃগালেরা চিৎকার শুরু করে দিয়েছিল যে, ফাটন অনিবার্য। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, ১৯৬৬ সালের ৩রা জানুয়ারি থেকে ১৫ই জানুয়ারি হাভানাতে যে আফ্রো-

এশিয়া-ল্যাটিন আমেরিকা সম্মেলন হয়েছিল, সেখানেও ঐক্যের শক্তিরই জয় হয়েছিল। ১৯৬৭ সালের জুলাই মাসে ও.এল.এ.এস আরও একধাপ এগিয়ে এসেছে। ও.এল.এ.এস-এর সিদ্ধান্তগুলি আগামী ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ দিনগুলিতে ল্যাটিন আমেরিকার জনগণের জাতীয় মুক্তি, গণতন্ত্র এবং শোষণহীন সমাজপ্রতিষ্ঠার সংগ্রামকে শক্তি জোগাবে এবং জয়ের পর জয়ে পৌঁছে দেবে।

॥ ৬॥

ত্রিমহাদেশীয় সম্মেলন

১৯৬৬ সালের ৩রা জানুয়ারি থেকে ১৫ই জানুয়ারি পর্যন্ত প্রায় দুই সপ্তাহ ধরে কিউবার রাজধানী হাভানাতে যে আফ্রো-এশিয়া-ল্যাটিন আমেরিকা তথা ত্রিমহাদেশীয় (ট্রাই-কন্টিনেন্টাল) সম্মেলন বসে, তাতে তিন মহাদেশের অধিকাংশ দেশের মুক্তিসংগ্রামী প্রতিনিধিরা যোগদান করেন। এই ত্রিমহাদেশীয় সম্মেলন সাবেক ও নয়া ঔপনিবেশিকতাবাদী ধনতান্ত্রিক সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে ল্যাটিন আমেরিকার মুক্তি সংঘের সঙ্গে আদর্শগত ও সংগঠনগতভাবে একত্রিত হয়ে যায়। আটলান্টিক ও প্রশান্ত মহাসাগরদ্বয়ের বিরাট বিস্তার বিংশ শতাব্দিতেও ল্যাটিন আমেরিকা এবং আফ্রো-এশিয়ার মধ্যে সংযোগের ব্যাপারে যে বাধা সৃষ্টি করে এসেছে, তার পরিসমাপ্তি ঘটাবার ব্যাপারে দৃঢ় পদক্ষেপ করা হয় এই সম্মেলনে। ল্যাটিন আমেরিকার মুক্তিসংগ্রামের যেমন একটা বিশেষ ধারা আছে, তেমনি আফ্রো-এশিয়ার মুক্তিসংগ্রামের সঙ্গে এর মূলগত মিলও আছে। ল্যাটিন আমেরিকার মুক্তিসংগ্রামের বিশেষ ধারাকে পরিপুষ্ট করে তোলার জন্য ও.এল.এ.এস সম্মেলনের মারফত একটা আঞ্চলিক সহযোগিতা সংস্থা কাজ শুরু করেছে। সঙ্গে সঙ্গে ল্যাটিন আমেরিকা এবং আফ্রো-এশিয়ার মুক্তিসংগ্রামের ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টার ধারাকে পরিপুষ্ট করে তোলার জন্য গড়ে উঠেছে ত্রিমহাদেশীয় বা ট্রাই কন্টিনেন্টাল সম্মেলন। এই দুটি সম্মেলনই পরস্পরের পরিপুরক। ত্রিমহাদেশীয় সম্মেলনের প্রস্তুতি থেকে শুরু করে এর অধিবেশনের প্রস্তাবাবলি ও বিভিন্ন সিদ্ধান্ত ল্যাটিন আমেরিকার মুক্তি সংগ্রামের মঞ্জিলে পৌঁছাবার ব্যাপারটাকে বুঝে নিতে সাহায্য করবে।

ত্রিমহাদেশীয় সম্মেলন অনুষ্ঠানের তাগিদটা আনুষ্ঠানিকভাবে আসে ল্যাটিন আমেরিকা থেকেই। ১৯৬১ সালে যখন মেক্সিকোতে ল্যাটিন আমেরিকার বিভিন্ন দেশপ্রেমিক মুক্তিসংগ্রামী সংস্থা একটি সম্মেলনে একত্রিত হয় সাম্রাজ্যবাদবিরোধী কর্মসূচি গ্রহণের জন্য, তখন সেখান থেকেই প্রস্তাব আসে আফ্রো-এশিয়ার সঙ্গে একত্রিত হয়ে একটা সম্মেলন করার। ১৯৬৩ সালে আফ্রিকার টাঙ্গানিয়াকার মশি নগরে অনুষ্ঠিত আফ্রো-এশীয় সংহতি সম্মেলনে এই প্রস্তাবকে স্বাগত জানানো হয়। এর পরে ১৯৬৫ সালে বসন্তকালে আকরাতে অনুষ্ঠিত আফ্রো-এশীয় সম্মেলনে ত্রিমহাদেশীয় সম্মেলনের তারিখ নির্দিষ্ট হয় এবং আফ্রিকা, এশিয়া আর ল্যাটিন আমেরিকার উনিশটি দেশের প্রতিনিধি নিয়ে একটি প্রস্তুতি কমিটি গঠন করা হয়। ঐ বছরেই সেপ্টেম্বর মাসে কায়রোতে এই প্রতিনিধিদের নিয়ে একটি প্রস্তুতি কমিটির সভায় ত্রিমহাদেশীয় সম্মেলনের আলোচ্যসূচির প্রাথমিক খসড়া তৈরি হয় এবং একটি আবেদন-পত্র প্রকাশ করা হয়, যার নিম্নলিখিত বক্তব্য উল্লেখযোগ্য:

"আফ্রো-এশীয় সংহতি আন্দোলন সব সময়েই ঐক্যের প্রয়োজন অনুভব করে এসেছে। সাম্রাজ্যবাদীরা ষড়যন্ত্র করে এসেছে ল্যাটিন আমেরিকাকে আফ্রো-এশীয় সংহতি আন্দোলন থেকে দুরে রাখতে। আমাদের আন্দোলন অবিশ্রান্তভাবে সংগ্রাম করে এসেছে আফ্রো-এশিয়া এবং ল্যাটিন আমেরিকার সাধারণ আকাঙ্ক্ষাকে বাস্তবায়িত করার জন্য। ত্রিমহাদেশীয় সম্মেলন সাম্রাজ্যবাদ, ঔপনিবেশিকবাদ এবং নয়া ঔপনিবেশিকবাদের বিরুদ্ধে আমাদের সাধারণ সংগ্রামের ক্ষেত্রে যেমন, তেমনি পূর্ণ জাতীয় স্বাধীনতা, সামাজিক অগ্রগতি এবং বিশ্বশান্তি আনায়নের ব্যাপারেও এক নুতন অধ্যায় রচনা করবে।"

সম্মেলনের জন্য স্থান নির্ধারিত হয় কিউবার রাজধানী হাভানা। হাভানা সম্মেলনের খসড়া কর্মসূচিতে একদিকে যেমন এশিয়ার ভিয়েতনাম, আফ্রিকার রোডেশিয়া এবং ল্যাটিন আমেরিকার ডোমিনিকান প্রজাতন্ত্রে সাম্রাজ্যবাদীদের সশস্ত্র হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ ব্যবস্থা গ্রহণের প্রস্তাব করা হয়, তেমনি তিনমহাদেশীয় বিভিন্ন দেশের জনগণের মধ্যে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে সংহতি বিধানের তাগিদকে সামনে রাখা হয়।

প্রস্তুতি কমিটিতে সিদ্ধান্ত করা হয় যে, আফ্রিকা এবং এশিয়ার বিভিন্ন দেশে যে আফ্রো-এশীয় সংহতি কমিটি রয়েছে, তারা হাভানা সম্মেলনে প্রতিনিধি পাঠাবে এবং ল্যাটিন আমেরিকার বিভিন্ন দেশের সেই সব রাজনৈতিক দল ও সংস্থা প্রতিনিধি পাঠাবে যারা নয়া ঔপনিবেশিকবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামী কর্মকাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত। এছাড়া আরও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় যে, বিশ্ব ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশন (ডবিস্নউ.এফ.টি.ইউ), বিশ্ব শান্তি পরিষদ এবং নারী ও যুব ফেডারেশনকেও সম্মেলনে যোগদানের জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়।

ইতোপূর্বে ১৯৬৫ সালের বসন্তকালে আলজিয়ার্সে আহূত আফ্রো-এশীয় শীর্ষ সম্মেলন অভ্যন্তরীণ মতভেদের দরুণ অধিবেশন বসবার মুখেই ভেঙ্গে যাওয়ায় সাম্রাজ্যবাদীরা প্রচার করতে শুরু করে যে, বৃহত্তর পরিমাপের ত্রিমহাদেশীয় সম্মেলন হয় বসবেইনা, নয়তো ভেঙ্গে যাবে। তাছাড়া হাভানায় যাতায়াতের পথে নানারকম প্রতিবন্ধকতা খাড়া করে এসেছে মার্কিনি বৃহৎ পুঁজিপতি গোষ্ঠী। কিউবাকে তারা পশ্চিম গোলার্ধে নিষিদ্ধ দেশ হিসাবে নানাদিক দিয়ে অবরুদ্ধ করার চেষ্টা করেছে। ইউরোপ থেকে দূর পাল্লার বিমানে চড়ে একটানা আটলান্টিক পাড়ি দিয়ে আফ্রো-এশিয়ার প্রতিনিধিদের কিউবাতে পৌঁছাতে হবে, এটাই একটা ঝুঁকি নেওয়ার মতো কাজ। সাম্রাজ্যবাদীরা ভেবেছিল, লোকও হবেনা হাভানা সম্মেলনে শেষ পর্যন্ত সেরকম।

কিন্তু হাভানা সম্মেলন বসলো যথাসময়ে ১৯৬৬ সালের ৩রা জানুয়ারি। বিরাশিটি দেশের ৫১২ জন প্রতিনিধি যোগদান করলেন সম্মেলনে। প্রাথমিক হিসাবে ধরা হয়েছিল, মোটামুটি শত-খানেক দেশের প্রতিনিধি হাভানা পৌঁছাবেন। এদিক দিয়ে বিরাশি দেশের যোগদান যথেষ্ট সাফল্য বই কি।

হাভানা সম্মেলনে যে সব প্রশ্ন আলোচিত হয়, তাদের চারটি ভাগে ফেলা যায়: (১) ঔপনিবেশিকবাদ, নয়া ঔপনিবেশিকবাদ এবং সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের সাধারণ সমস্যাবলি; (২) ভিয়েতনাম, ডোমিনিকান প্রজাতন্ত্র, কিউবা, কঙ্গো, পর্তুগীজ-

অধিকৃত আফ্রিকা এবং রোডেশিয়া প্রমূখ দেশে সাম্রাজ্যবাদী হামলা ও হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে প্রচার অভিযান চালাবার ব্যাপারে আবশ্যকীয় সিদ্ধান্তগুলিকে নির্ধারিত করা; (৩) অর্থনৈতিক মুক্তি এবং সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অগ্রগতির প্রশ্নাবলি (৪) সাংগঠনিক প্রশ্নাবলি।

সম্মেলনে শেষ পর্যন্ত প্রায় একশত প্রস্তাব গৃহীত হয়। কোন কোন প্রশ্নে তুমুল তর্ক হয় বটে, কিন্তু সম্মেলন সমস্ত প্রশ্নেই ঐক্যবদ্ধ সিদ্ধান্ত গ্রহণ সমর্থ্য হয়।

হাভানাতে সাময়িকভাবে সদর দপ্তর স্থাপন করে আফ্রো-এশিয়া-ল্যাটিন আমেরিকার সংহতি সংসদ" প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রতিটি মহাদেশ থেকে চারজন প্রতিনিধি নিয়ে গঠিত হয় এই সংহতি সংসদের সম্পাদকীয় দপ্তর।

হাভানা সম্মেলনে যে সাধারণ ঘোষণাপত্র রচিত হয়, তাতে বিশ্বপরিস্থিতির কথা আলোচনা করে তিনটি মহাদেশের মধ্যে ঐক্য ও সংহতি সাধনের প্রয়োজনের উপর চূড়ান্ত গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। এই সাধারণ ঘোষণায় সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী শক্তিসমূহকে তিন মহাদেশের বিভিন্ন দেশের বাস্তব অবস্থা অনুযায়ী প্রয়োগযোগ্য করে সাধারণ সংগ্রামী কর্মসূচি নির্ধারিত করা হয়েছে। হাভানা সম্মেলনের এই সাধারণ ঘোষণাপত্রের একটি গুরুত্বপূর্ণ তাগিদ হচ্ছে, সমাজতান্ত্রিক দেশসমূহ এবং আন্তর্জাতিক শ্রমিক ও গণতান্ত্রিক আন্দোলনের সঙ্গে সংযোগ ও ঐক্যবদ্ধ পদক্ষেপের প্রয়োজনীয়তার উপর গুরুত্ব আরোপ ।

সাধারণ ঘোষণাপত্রে বলা হয়েছে যে, জাতীয় মুক্তিসংগ্রাম, সমাজতান্ত্রিক দেশসমূহ এবং আন্তর্জাতিক শ্রমিক আন্দোলনের ঘনিষ্ঠ ঐক্য হচ্ছে ঔপনিবেশিকবাদ ও নয়া ঔপনিবেশিকবাদকে পরাভূত করার জন্যে সিদ্ধান্তকারী শক্তি।

সাধারণ ঘোষণাপত্রের বক্তব্য আলোচনা করার সময় শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থানের প্রস্তাবটি নিয়ে আলোচনা চলে। একটি বিশেষ প্রস্তাবে শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থানের নীতির প্রতি সমর্থন জানিয়ে বলা হয় যে, শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থানের নীতি ভিন্ন ভিন্ন ধরণের সমাজব্যবস্থা সম্পন্ন বিভিন্ন রাষ্ট্রের সম্পর্কের ক্ষেত্রেই শুধুমাত্র প্রযোজ্য। শ্রেণিসংগ্রাম কিংবা সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সংগ্রামকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে এই নীতি প্রযোজ্য নয়।

সম্মেলন শেষে অনুষ্ঠিত এক বিরাট গণ সমাবেশে কিউবার প্রধানমন্ত্রী ফিদেল ক্যাস্ট্রো ভাষণ দিতে গিয়ে সম্মেলনের সাফল্যের দিকটিকে বিশেষভাবে সামনে আনেন এবং বলেন যে, এই সম্মেলন সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে বিশ্বের জনগণকে বিজয়ী করবে।

ত্রিমহাদেশীয় সম্মেলনের প্রস্তাব এবং সিদ্ধান্তসমূহকে সামনে রেখে মুক্তিসংগ্রামীদের শক্তিকে ক্রমাগত প্রসারিত করে ল্যাটিন আমেরিকা এবং আফ্রো-এশিয়ার জনগণ আজ ১৯৫৫ সালের বান্দুং সম্মেলনের পরে অনেকখানি এগিয়ে এসেছে।

কোথাও কোথাও সাময়িক বিপর্যয়েরও সম্মুখিন হতে হয়েছে ত্রিমহাদেশের মুক্তি অভিযাত্রী মানুষকে। যেমন, ভিয়েতনামে এবং কিউবাতে মার খেয়ে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীরা আরব জাহানে প্রগতিবাদী শক্তিসমূহের উপর এবং বিশেষ করে

ত্রিমহাদেশীয় সংহতির অন্যতম প্রাণকেন্দ্র কায়রোর উপর খড়গ উত্তোলন করেছে ইসরাইলি সামরিক চক্রমারফত।

সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের পরিস্থিতি দাবি করছে ত্রিমহাদেশীয় সম্মেলনের সাধারণ ঘোষণা-পত্রের দ্রুত বাস্তবায়ন।

ত্রিমহাদেশীয় সম্মেলনের গুরুত্ব যেমন সুদূরপ্রসারী, এর দায়িত্বও তেমনি প্রতি পদক্ষেপে অনুধাবনীয়। করণীয় রয়েছে অনেক। সাম্রাজ্যবাদীদের চালগুলিকে মুখে উড়িয়ে দেওয়া যাবে না। ল্যাটিন আমেরিকাতে তারা কিভাবে জমিয়ে বসতে চেষ্টা করে আসছে, সেটা ইতোপূর্বে আলোচনা করে দেখানো হয়েছে। তারা এখনো একদিকে যেমন আরো জোরে ল্যাটিন আমেরিকাকে দমন করে রাখবার চেষ্টা করছে, তেমনি নানরকম বিভেদাত্মক মিথ্যা প্রচারণা দ্বারা ত্রিমহাদেশীয় সংহতির মূল বুনিয়াদে চিড় ধরাতে চাইছে। মহান বিপ্লবী চে গুয়েভারাকে বলিভিয়াতে হত্যা করার পরে তারা পৈশাচিক উল্লাস প্রকাশ করেছে। এদিক দিয়ে দেখতে গেলে ত্রিমহাদেশীয় সম্মেলনের সাফল্য এখনও অবিশ্রান্ত সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়ার উপরেই প্রধানত নির্ভর করছে। তবে ত্রিমহাদেশীয় সম্মেলন অনুষ্ঠান মার্কিনি সাম্রাজ্যবাদীদের মনরোনীতিকে হেনেছে মরণ আঘাত।

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, গত শতাব্দিতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অন্যতম প্রেসিডেন্ট জেমস্ মনরো ১৮২৩ সালে ইউরোপিয় শক্তিবর্গকে জানিয়ে দেন যে, পশ্চিম গোলার্ধের তথা আমেরিকা মহাদেশের রাজনৈতিক ক্রিয়াকাণ্ডে ইউরোপিয় শক্তিবর্গ যেন নাক না গলায়। তিনি দাবি করেন যে, আমেরিকা মহাদেশে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রই যা প্রয়োজন তা করবে। এই ঘোষণাতেই তিনি অবশ্য জানিয়ে দেন যে, পূর্বগোলার্ধে তথা আফ্রো এশিয়াতে ইউরোপিয় শক্তিবর্গের উপনিবেশগুলিতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কোন রকম হস্তক্ষেপ করবেনা। এই মনরো-নীতি মারফত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উঠতি বৃহৎ শিল্পপতি ও ব্যবসায়ী শাসকচক্র আমেরিকা মহাদেশকে তথা ল্যাটিন আমেরিকাকে নিজেদের সাম্রাজ্য হিসাবে নির্ধারিত করে নেয় এবং সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বের অন্যত্র ইউরোপিয় ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যকে জানিয়ে দেয়, "চালিয়ে যাও শোষণ।" মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শাসকচক্র এই মনরো-নীতিকে সব সময় সাম্রাজ্যিক নীতির দাবাখেলার মন্ত্রীর চাল হিসাবে সচল রেখেছে। তবে স্বভাবতই সাম্রাজ্যবাদী সম্প্রসারণের তাগিদে তাদের অন্য চালও দিতে হয়েছে। তারা যদিও আমেরিকা মহাদেশে নিজেদের এখতিয়ার সম্বন্ধে অত্যন্ত সজাগ, তবু তারা এশিয়া এবং আফ্রিকাতে প্রবেশ করেছে ইউরোপিয় ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যবাদীদের প্রতিদ্বন্দ্বী হিসাবে। অপরদিকে ইউরোপিয় সাম্রাজ্যবাদীরা যখনই সুযোগ পেয়েছে তখনই পশ্চিম গোলার্ধে অনুপ্রবেশ করেছে। গত শতাব্দিতেই আফ্রো এশিয়া ও ল্যাটিন আমেরিকার উপর অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক দখলী স্বত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য সাম্রাজ্যবাদীদের মধ্যে হুড়াহুড়ি পড়ে যায়। ধনতান্ত্রিক সাম্রাজ্যবাদের অন্তর্দ্বন্দ্বের দরুণ প্রথম বিশ্বযুদ্ধ সংগঠিত হয়েছিল। সুতরাং মনরো সাহেবের "ভদ্রলোকের এক কথা" কার্যক্ষেত্রে উভয় দিক দিয়েই টেকেনি। শেষ পর্যন্ত

অবশ্য যেটা দাঁড়িয়েছিল, সেটা এই যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শাসকচক্র ল্যাটিন আমেরিকাতে এখতিয়ার রাখতে চেয়েছে মনরো-নীতি অনুযায়ী এবং আফ্রো-এশিয়াতে নয়া ঔপনিবেশিকবাদের প্রবক্তা হয়ে পশ্চিম ইউরোপিয় সাম্রাজ্যবাদীদের ছোট শরিকে পরিণত করেছে। ছোট শরিক হোক আর বড় শরিক হোক, মার্কিন এবং পশ্চিম ইউরোপিয় সাম্রাজ্যবাদীরা একটা ধারণা নিয়ে হয়তো এখনও চলতে চাইছে যে, আফ্রো এশিয়া এবং ল্যাটিন আমেরিকার হর্তাকর্তা বিধাতা তারাই, এবং ত্রিমহাদেশের জনগণের কোন বক্তব্য থাকবে না।

কিন্তু বিশেষ করে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অবসানের পরে পর্যায়ক্রমে কিংবা খণ্ড খণ্ডভাবে এশিয়া, আফ্রিকা এবং ল্যাটিন আমেরিকা সাম্রাজ্যবাদীদের উপরিউক্ত ধারণার উপর মারাত্মক আঘাত হেনেছে। এই তিন মহাদেশেই জাতীয় মুক্তিসংগ্রাম দেশে দেশান্তরে ঔপনিবেশিক আমলের সাম্রাজ্যবাদীদের পিছু হঠতে বাধ্য করেছে। বিশ্বের দুই গোলার্ধেই আজ শুধু যে বেশ কিছু সংখ্যক দেশে স্বাধীন জাতীয় গণতান্ত্রিক সরকারই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তা নয়, সমাজতন্ত্রও প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বিশ্বের এক তৃতীয়াংশে। সারা বিশ্বে সমাজতান্ত্রিক গণতান্ত্রিক বিপ্লবের তরঙ্গরাশি উদ্বেলিত হয়ে উঠেছে। এই পটভূমিতেই ত্রি-মহাদেশীয় সম্মেলন মার্কিনি মনরো-নীতিকে ঘরে বাইরে অচল বলে সাব্যস্ত করে দিয়েছে। দেওয়া হবে না বখরাদারির কোন সুযোগই আর এখানে পশ্চিম ও পূর্ব গোলার্ধের কোন এখতিয়ার ভাগাভাগির ব্যাপার থাকবে না। মনেরো-নীতির মৃত্যুবাণ হচ্ছে ত্রিমহাদেশীয় গণমুক্তি সংগ্রাম। ত্রিমহাদেশীয় সম্মেলনে যে সর্বাত্মক সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংগ্রামের বিভিন্ন ধারার সংযোজন হয়েছে, তাদের আঘাতে মার্কিনি ধনতান্ত্রিক কাঠামোতো ষাটের দশকের শেষের দিক থেকে এমন এক সংকটের সূত্রপাত হয়েছে, যার কাছে তিরিশের দশকের মার্কিনি আভ্যন্তরীণ অর্থনৈতিক সংকটই হার মেনে গিয়েছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এই ক্রমবর্ধমান সমূহ সংকট একই সঙ্গে রাজনৈতিক, সামরিক ও অর্থনৈতিক সংকট। বিশেষ কারণে এই সমূহ সংকট দ্রুত গভীরতর হতে বাধ্য।

বর্তমান ল্যাটিন আমেরিকা এবং আফ্রো এশিয়ার মুক্তিসংগ্রাম এক অখণ্ড সংগ্রামে পরিণত হওয়ার ফলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বৃহৎ পুঁজিপতিচক্রের পক্ষে কোন একটি এলাকাকে মূলতবী রেখে আরেকটি অপেক্ষাকৃত 'নিরাপদ' এলাকাতে সংকট সমাধানের চেষ্টা করা দুঃসাধ্য হয়ে পড়েছে। এখন আর শত ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষে সব ছেড়েছুড়ে দিয়ে সাবেক মনরো-নীতির অপেক্ষকৃত ছোট গণ্ডীতে টিকে থাকা সম্ভব নয়। বিপ্লবী চে গুয়েভারা বলিভিয়াতে মার্কিনি সাম্রাজ্যিক কাঠামোর উপর যে আঘাত হানতে গিয়ে নিহত হয়েছেন, সে আঘাত ব্যর্থ হওয়া দূরে থাকুক, খাস মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রই প্রচণ্ড আভ্যন্তরীণ গণবিক্ষোভের মধ্য দিয়ে আত্মপ্রকাশ করছে। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীরা যত বেশি কোণঠাসা হবে, তত প্রচণ্ডতর হয়ে উঠবে এই আভ্যন্তরীণ গণসংগ্রাম। ল্যাটিন আমেরিকার গণমুক্তিসংগ্রামের প্রসারের মধ্য দিয়ে শোষণহীন সমাজব্যবস্থার দাবি নিয়ে গুয়াতেমালা থেকে শুরু করে কলম্বিয়া ব্রাজিলের সমস্ত

অবনত স্তরের মানুষ উপরে উঠে আসছে। তারই সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করেই যেন খাস মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেরও অবনত স্তরের মানুষ আগ্নেয়গিরির অভ্যুত্থান ঘটাবার প্রস্তুতি নিচ্ছে। খাস আমেরিকার নিগ্রো-সমাজ আজ ল্যাটিন আমেরিকার বিভিন্ন দেশের জাগ্রত নিগ্রোদের কাছ থেকে সংগ্রামের এক নতুন নিশানা পাচ্ছে। এই নয়া নিশানা কালা-ধলার বৈষম্য ঘুচাবার সঙ্গে সঙ্গে এমন এক সাম্যবাদী সমাজের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করছে, যেখানে দারিদ্র্য এবং অনিশ্চয়তা থেকে স্থায়ী মুক্তি অবধারিত। এই মুক্তি সংগ্রামে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কালাধলা নির্বিশেষে সমস্ত গণ মানুষই একদিন নেমে পড়বে। এর আভাষ পাওয়া গিয়েছে খাস ডলারের দেশে সংগ্রামী গণ-শক্তির মিছিলে এবং যুদ্ধবিরোধী বিক্ষোভে।

॥ ৭॥

সাংস্কৃতিক বিপ্লবের ইশারা

ল্যাটিন আমেরিকা আমাদের সামনে একটি অগ্নিগর্ভ মহাদেশ হিসাবেই উপস্থিত। শুধু বর্তমান এবং ভবিষ্যতের পরিপ্রেক্ষেতেই নয়, অতীত সম্পর্কেও একথা বলা চলে এবং বলা দরকার। শুধু নিকট অতীত নয়, সুদূর অতীতও এখানে বিচার্য।

মধ্য ও দক্ষিণ আমেরিকার স্পেনের ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যকে ভেঙ্গে সাধারণভাবে স্পেনিশভাষী বসবাসকারীদের উদ্যোগে বিভিন্ন এলাকায় স্বাধীন ও স্বতন্ত্র প্রজাতন্ত্র গঠিত হয়। এদিক দিয়ে বিবেচনা করলে অধিক সংখ্যক স্পেনিশ, আংশিকভাবে পর্তুগীজ অথবা ফরাসি এবং সমগ্রভাবে ল্যাটিনভাষী বাসিন্দাদের আশাআকাঙ্ক্ষাকেই ল্যাটিন আমেরিকার আশা আকাঙ্ক্ষা হিসাবে অভিহিত করাটা অস্বাভাবিক নয়। গির্জার নির্দেশাবলি এবং ল্যাটিন ইউরোপিয় মধ্যযুগীয় সংস্কৃতির প্রভাব ল্যাটিন আমেরিকার জনসমষ্টির উপর পড়েছিল। কিন্তু এটা কখনও সম্পূর্ণ চিত্র ছিল না। আজও থাকবে না।

স্পেনিশ সাম্রাজ্য স্থাপিত হওয়ার আগে মধ্য এবং দক্ষিণ আমেরিকা জনবসতিহীন ছিল না—বরং এই এলাকা ছিল বিশ্বসভ্যতার অন্যতম সূতিকাগার। দক্ষিণ আমেরিকার পেরু কিংবা মধ্য আমেরিকার মেক্সিকো এবং গুয়াতেমালাতে আদিবাসীরা যে রীতিতে জীবনযাপন করত, তা কতকগুলি দিক দিয়ে তদানীন্তন মধ্যযুগীয় ইউরোপের বাসিন্দাদের জীবনযাপন পদ্ধতি থেকে উন্নততর ছিল। ইনকা, মায়া এবং আজটেক জাতির সভ্যতা ও সংস্কৃতির চিহ্নগুলি বিংশ শতাব্দিতেও ধরাপৃষ্ঠ থেকে মুছে যায় নি। শুধু ইমারতের ভগ্নস্তূপে নয়, বর্তমান ল্যাটিন আমেরিকার বিভিন্ন আদিবাসীগোষ্ঠীর ভাষায়, রীতিতে, রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক-সামাজিক আশাআকাঙ্ক্ষায় আদিবাসী সভ্যতা-সংস্কৃতির ফল্গুধারা নতুন প্রাণের তাগিদে কখনো কখনো বিস্ফোরিত হয়েই বেরিয়ে আসছে। শুধু আদিবাসী গোষ্ঠীগুলির মধ্যে নয়, আদিবাসী আর স্পেনিশ মিশ্রিত যে মেস্টিজো জনসমষ্টি, তারও সংস্কৃতিতে তলায় তলায় কিংবা কোন কোন ক্ষেত্রে প্রকাশ্যেই ইনকা-আজটেক এবং মায়া সভ্যতাও সংস্কৃতির উপাদান কাজ করে চলেছে।

এই আদিবাসী অথবা মেষ্টিজোরাই ল্যাটিন আমেরিকার মূল মেহনতী সমাজ। এরাই ল্যাটিন আমেরিকার মুক্তি সংগ্রামে প্রথম সারির বৈপ্লবিক শক্তি হিসাবে কাজ করছে বা করবে। সুতরাং বর্তমান সত্তরের দশকে কিংবা পরবর্তীকালেও ল্যাটিন আমেরিকার গণজীবনে যে সাংস্কৃতিক বিপ্লব রূপায়িত হতে যাচ্ছে, তাতে উপরিউক্ত অতীত সভ্যতা-সংস্কৃতির উপাদান বৈপ্লবিকভাবে আত্মপ্রকাশ করবে, এটা সুনিশ্চিত। চিলির গণকবি পাবলো নেরুদার লেখায় রয়েছে এই আত্মপ্রকাশেরই অগ্নিশিখা।

ইতোপূর্বে বিশেষ করে মেক্সিকোর গণমুক্তিসংগ্রামের বিভিন্ন পর্যায়ে ল্যাটিন আমেরিকার প্রাক-স্পেনিশ ঐতিহ্য নতুন সৃজনশীলতায় উদ্বেলিত হয়েছে। মেক্সিকোর আধুনিক চিত্রকলা এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। চিত্রশিল্পী দিয়েগো রিভেরা এবং সিকুয়েরিয়স বিশ্ববিশ্রুত। তাঁরা মেক্সিকোর বিভিন্ন ভবনের প্রাচীরে ছবি এঁকেছেন। এই সব ছবির মধ্যে স্পন্দিত হচ্ছে ল্যাটিন আমেরিকা, তার একটি নির্ঝর হচ্ছে মায়া সভ্যতা, যা নতুনভাবে বাঁচবে, নতুন সমাজব্যবস্থার মধ্যে বাঁচবে। রিভেরা ছিলেন চির অশান্ত সাম্যবাদী। সিকুয়েরিয়সও সাম্যবাদের পতাকাই বহন করে নিয়ে চলেছেন। এই পতাকা একই সঙ্গে মেক্সিকোর সমস্ত রকমের নিপীড়িত স্তরের অভ্যুত্থানের পতাকা।

এইভাবে ল্যাটিন আমেরিকার সর্বত্র বিপ্লবের যেসব চিহ্ন পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে, সেগুলি শুধু গণ-স্পেনিশ কিংবা মায়া-ইনকা-আজটেক সভ্যতা ও সংস্কৃতির উপাদানগুলিকে সামনে নিয়ে আসছে না। এই সাস্কৃতিক বিপ্লবে আফ্রিকা এবং এশিয়া থেকে আনীত ক্রীতদাসদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের উপাদানগুলিও বিপ্লবাত্মকভাবে আত্মপ্রকাশ করেছে। এখানে ল্যাটিন আমেরিকাতে বিশেষ করে আফ্রিকান বা নিগ্রোদের অবস্থান সম্পর্কে দুয়েকটা দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে। হাইতি প্রজাতন্ত্র বর্তমানে আফ্রিকান বংশোদ্ভূত মুক্ত ক্রীতদাস অধ্যুষিত প্রজাতন্ত্র। ব্রাজিলেও তথাকথিত নিগ্রোদের অবস্থান চূড়ান্ত গুরুত্বপূর্ণ। আজ তারা অধিকাংশই দরিদ্র বস্তিবাসী হিসাবে অন্ধকারে রয়েছে। কিন্তু একটা ঘটনাকে নিশ্চয় তারা ভবিষ্যতে ভুলবেনা। ব্রাজিলকে গত শতাব্দির শেষের দিকে প্রজাতন্ত্রে পরিণত করেছিল বিদ্রোহী কৃষকেরা এবং নিগ্রো ক্রীতদাসেরা মহান গণঅভ্যুত্থানে একত্রিত হয়ে। ছিঁড়ে ফেলে দিয়েছিল তারা রাজকীয় শাসনতন্ত্রকে। সুতরাং আগামী দিনে জনগণের ব্রাজিলে নিগ্রো সংস্কৃতিও স্থান করে নেবে বৈপ্লবিক গণ সংস্কৃতির শতদলে।

ল্যাটিন আমেরিকার সাংস্কৃতিক বিপ্লবের যে কোন কর্মকাণ্ডে অবশ্য প্রথমে জোর পড়বে সর্বজনীন সর্বতমুখী শিক্ষাবিস্তারের উপর, যার ভিত্তি হবে বিজ্ঞান, যার সঞ্চালক শক্তি হবে শোষণমুক্ত সমাজব্যবস্থা ও লোকসাধারণের গণতন্ত্র। বিপ্লবী কিউবার সামগ্রিক কার্যক্রমে শিক্ষার প্রসারকে একটি মূল বিপ্লবী করণীয় হিসাবে সামনে এনে উদাহরণ সৃষ্টি করা হয়েছে। বিপ্লবের পরেই এই দ্বীপদেশে ১৯৬১ সালে রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে যে বার্ষিক কর্মসূচি কার্যকরি করা হয়, তাতে নিরক্ষরতাকে শতকরা ৩৪ থেকে শতকরা ৪ এ নামিয়ে আনা হয়। এক বছরে এভাবে প্রায় রাতারাতি নিরক্ষরতা দূর করার ঘটনা থেকেই বুঝতে পারা যাবে, কিউবাতে শিক্ষার প্রসার-সাধনের কাজকে কি ধরণের প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে।

সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব বিশ্বের যে সব দেশে অনুষ্ঠিত হয়েছে, সেখানে শিক্ষা বিপ্লব হয়েছে সাংস্কৃতিক বিপ্লবের প্রাথমিক ও অপরিহার্য শর্ত স্বরূপ। লেনিনের নেতৃত্বে এইভাবেই সোভিয়েত ইউনিয়নে সমগ্র লোকসাধারণের প্রতিটি ব্যক্তির মানসিক বিকাশ ও সৃজন-প্রতিভাকে পুরোপুরি সার্থক করে তোলার উদ্দেশ্যে সাংস্কৃতিক বিপ্লবের সূত্রপাত হয়। কিউবা যেহেতু সমাজতন্ত্রের পথই নিয়েছে, সেহেতু এখানেও শিক্ষাবিপ্লব দিয়ে সাংস্কৃতিক বিপ্লবের কর্মসূচিতে অগ্রাধিকার দিয়েছিলেন, সে কারণেও কিউবাতে ফিদেল ক্যাস্ট্রো, চে গুয়েভারা এবং তাঁদের সাথীরা গণশিক্ষার আয়োজনে তড়িৎগতি প্রয়োগ করেছেন। সোভিয়েত বিপ্লবের আগেকার রাশিয়ার বাসিন্দাদের মতো কিউবাতেও শিক্ষার অভাব এবং ব্যাপক নিরক্ষরতার দরুণ অজ্ঞতা কুসংস্কার এবং অদৃষ্টবাদ জনমনে নানারকমের বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে বিপ্লবী চিন্তাধারার প্রসারে বাধা সৃষ্টি করছিল। বিপ্লবী কিউবাতে তাই নিরক্ষরতা দূরীকরণ এবং শিক্ষার প্রসারণকে গণসরকারের প্রথম কর্মসূচিতেই অন্যতম প্রধান করণীয় হিসাবে স্থান দিতে হয়েছে। ধনতান্ত্রিক সাম্রাজ্যবাদীরা ল্যাটিন আমেরিকার দেশে দেশে মানুষের মনে শতাব্দিকাল ধরে যে বিষ ছড়িয়ে এসেছে, তাকে সম্পূর্ণ উৎখাত করেই এই শিক্ষাবিপ্লব এগিয়ে যাবে। কিউবার নিরক্ষরতা দূরীকরণের ব্যাপারটাকে মুক্তিসংগ্রাম ও বিপ্লবী চিন্তার গণপ্রসার থেকে বিচ্ছিন্ন করে সমাজকল্যাণ বা সমাজসেবার প্রচেষ্টা বলে মনে করে নিলে মারাত্মক ভুল করা হবে। কিউবাতে ১৯৬১ সালের পর থেকে যুবসমাজ এবং নারীশ্রমিকসহ সমস্ত মেহনতী উচ্চশিক্ষার কর্মকাণ্ডে শরিক করে তোলার জন্য যে নীতি নির্ধারিত হয়েছে তাতেও আনা হয়েছে তড়িৎগতি। এই তড়িৎগতির সার্থক প্রয়োগের জন্য সারা দেশে একটা গণবিপ্লবের আবহাওয়া গড়ে তোলা হয়েছে।

এধরনের ঘটনা ল্যাটিন আমেরিকার অন্যান্য দেশেও গণসরকার কায়েম হওয়ামাত্র ঘটবে। প্যারাগুয়ে কিংবা কলম্বিয়া কিংবা সালভাদরের মতো বিভিন্ন দেশের সংগ্রামী জনগণের মুখপত্রগুলিতে দেখা যায়, বিক্ষোভ-ধর্মঘট অথবা সশস্ত্র সংগ্রাম যাঁরা পরিচালনা করছেন, তাঁরা নারীসমাজসহ জনগণের সমস্ত নিপীড়িত স্তরের মানুষের নিরক্ষরতা দূর করার কথা তো বটেই, তাদের উচ্চতর শিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলার কথাও বিশেষ করে ভাবছেন। এ বিষয়ে সংগ্রামী মহিলা সংঘগুলিও অত্যন্ত সজাগ। পিছিয়ে থাকার মূলে শিক্ষার অধিকার থেকে বঞ্চিত থাকাটাও যে বড় কারণ, সে সম্বন্ধে মুক্তিসংগ্রামী জনগণ সচেতন হয়ে উঠেছে। সুতরাং ল্যাটিন আমেরিকার বিভিন্ন নিপীড়িত চাপা পড়া স্তরের কোটি কোটি মানুষ, সে আদিবাসী হোক, নিগ্রো কিংবা এশীয় বংশোদ্ভূত জনসমষ্টি হোক অথবা খাঁটি স্পেনিশ ইউরোপীয় কিংবা মিশ্রিত মেস্ট্রিজো মেহনতী মানুষ হোক, সকলে মিলে যখন সাংস্কৃতিক বিপ্লবের প্রদীপ্ত দিগন্তে উপনীত হবে, তখন তারা কিউবার মতোই বলিভিয়া, গুয়াতেমালা কিংবা প্যারাগুয়ের দুর্গম অঞ্চলগুলিতেও সাংস্কৃতিক বিপ্লবের অন্যতম প্রধান করণীয় হিসাবেই শিক্ষাবিপ্লব ঘটাবে। উদাহরণ-স্বরূপ এখানে বলা যেতে পারে যে, ১৯৬৮ সালের হিসাবে যে গুয়াতেমালাতে শতকরা ৮২ জন বাসিন্দাই হচ্ছে নিরক্ষর, সেখানে একদিকে যেমন

আদিবাসী সংস্কৃতির পুনরভ্যুদয় ঘটবে সাংস্কৃতিক বিপ্লবের মধ্য দিয়ে, তেমনি শিক্ষাবিপ্লবও পাবে প্রাধান্য। দারিদ্র্য, নিপীড়ন, শোষণ, বিকৃতি ও পরশাসন থেকে মুক্ত হওয়া মাত্র গুয়াতেমালার মতো সমস্ত দেশের আদলই যাবে বদলে। সারা দুনিয়ার সঙ্গে চলবে সাংস্কৃতিক লেনদেন। এই সম্ভাবনার দোলা ইতোমধ্যেই সমস্ত প্রতিবন্ধকতা পেরিয়ে আমাদের গায়ে লাগছে।

মুক্তিধারা

বাংলাদেশের জাতীয় মুক্তি-সংগ্রামের গতিপ্রকৃতি

১. উপক্রমণিকা

পূর্ববাংলা তথা বাংলাদেশের জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের গতিপ্রকৃতি নিরূপণের ব্যাপারটিকে পাঁচ অংশে ভাগ করে নেয়া যেতে পারে।

প্রথম অংশ ১৯৪৭ থেকে ১৯৭১ পর্যন্ত চব্বিশ বছরের ঘটনাবলির একটা চুম্বক। পর্যায়ের পর পর্যায়ে যে ঘটনা-ধারা দ্বন্দ্বাত্মক গতিপথে অগ্রসর হয়ে ১৯৪৭-৪৮ সালের নিয়মতান্ত্রিক গণতন্ত্র ও প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের অধিকার আদায়ের আন্দোলন থেকে বৈপ্লবিক গণতন্ত্রের সংগ্রামে এবং সার্বভৌম স্বাধীনতা ঘোষণায় উপনীত হলো ১৯৭১ সালে, এখানে তার ক্রমাত্মক দিকগুলি ধরা পড়বে।

দ্বিতীয় অংশ হচ্ছে পূর্ব বাংলাকে যে বিশেষ ঔপনিবেশিক শোষক ও শাসকচক্রের বিরুদ্ধে উপরিউক্ত চব্বিশ বছর ধরে লড়াই করে আসতে হয়েছে এবং ১৯৭১ সালের যে চক্রের বিরুদ্ধে পূর্ব বাংলাকে সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধে নিয়োজিত হতে হলো, তার চরিত্র-বিচার তথা শ্রেণি-নির্ণয় ও গোষ্ঠী-চিহ্নিত। পূর্ব বাংলার মুক্তিসংগ্রাম যে প্রথমাবধি সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী মুক্তিসংগ্রাম এবং ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ ও যে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী মুক্তিযুদ্ধ, সেটিও এখানে মূল বিবেচ্য।

তৃতীয় অংশ হচ্ছে বৈপ্লবিক দৃষ্টিভঙ্গিতে জাতীয় মুক্তিসংগ্রামে সঞ্চালক শক্তিগুলির শ্রেণিগত ভূমিকা ও গুণাগুণ বিচার এবং সে দিক থেকে মুক্তিসংগ্রামের চরিত্র নির্ণয়। সে পরিপ্রেক্ষিতেই এই সব শক্তির ভবিষ্যৎ গতি পরিণতিও এই অংশে আলোচ্য।

চতুর্থ অংশ হচ্ছে, পূর্ব বাংলার জাতীয় মুক্তিসংগ্রামের সংগ্রামী অতীতের এবং বিশেষ করে নিকট অতীতের যে উপাদানগুলি কাজ করছে কিংবা করতে যাচ্ছে, তার মূল্যায়ন।

পঞ্চম অংশ হচ্ছে, পূর্ব বাংলার মুক্তিসংগ্রামের আন্তর্জাতিকতা নির্ণয়।

২. পূর্ব বাংলার ঘটনাধারার চুম্বক

১৯৪৭ থেকে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত ঘটনা-ধারাকে প্রাথমিকভাবে নিম্নোক্ত পর্যায়গুলিতে সাধারণভাবে সাজিয়ে নেওয়া যেতে পারে;

(১) ১৯৪৭-৪৮: তথাকথিত ক্ষমতা হস্তান্তর। সাম্রাজ্যবাদী শাসনযন্ত্রের রূপান্তর। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের কাছ থেকে শিক্ষাপ্রাপ্ত মাথাভারি তথাকথিত দেশি সামরিক ও বেসামরিক আমলাতন্ত্রের হাতে রাজদণ্ড। এই আমলাতন্ত্রের অধিষ্ঠান পশ্চিম পাকিস্তানে। সত্যকার স্বাধীনতার দাবিতে এগিয়ে আসে মেহনতী সমাজ। রাষ্ট্রভাষার প্রশ্নে আমলাতান্ত্রিক দণ্ড-পরিচালনার বিরুদ্ধে পূর্ব বাংলার ছাত্র-সমাজের প্রতিরোধ ও প্রতিবাদের সূচনা। ন্যায্য বেতনের দাবিতে নিম্নপদস্থ কর্মচারী ও পুলিশ ধর্মঘট। শাসকচক্রের জবাব জেল, লাঠি, টিয়ার গ্যাস, গুলি।

(২) ১৯৪৯-৫১: আমলাতান্ত্রিক প্রভুত্বের বিরুদ্ধে নিয়মতান্ত্রিকতা আর নিয়ম-ভাঙ্গার আওতায় গণবিক্ষোভ। সরকারি-বিরোধী গণতান্ত্রিক দল ও মত গঠন। গণতন্ত্র, প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন, প্রজাতান্ত্রিক সার্বভৌমত্বের রূপরেখা নির্ণয়। জমির অধিকারের এবং খাজনা-হ্রাসের দাবিতে ব্যাপক দরিদ্র ও নিঃস্ব কৃষকদের বিক্ষোভ।

অপরদিকে পশ্চিম পাকিস্তানের বাইশ পরিবারের ভিতপত্তন, মার্কিন নয়া ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে এই কায়েমি স্বার্থবাদী পুঁজিপতি জমিদার গোষ্ঠী ও সামরিক-বেসামরিক আমলাদের গাঁটছড়া। দমননীতি ও সরকারি সন্ত্রাসের রাজত্ব।

(৩) ১৯৫২-৫৩: বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে পূর্ব বাংলার গণবিদ্রোহ। ছাত্রজনতার বৈপ্লবিক রূপ। বাংলাভাষা আন্দোলনে সরকারি বেসরকারি কর্মচারীদের যোগদান। বিকল্প সরকারের ঝলক। পূর্ব বাংলার জাতীয় মুক্তিদিবস ২১-এ ফেব্রুয়ারির সূচনা। হাজার হাজার ছাত্র-জনতা-বুদ্ধিজীবী কারাগারে নিক্ষিপ্ত। শ্রমিকদের মধ্যে নতুন সংগঠনের তৎপরতা।

(৪) ১৯৫৪-৫৭: প্রাদেশিক সাধারণ নির্বাচন, শাসকদল মুসলিম লীগ তথা আমলাতন্ত্রের বিপর্যয়। গণতান্ত্রিক যুক্তফ্রন্টের নৌকার জয়। একুশ দফা। আমলাতন্ত্রের প্রত্যাঘাত। বেসামরিক আমলাতন্ত্রের সামরিক সাজ। গণতান্ত্রিক শিবির-রক্ষায় ছাত্রসমাজ। আমলাতন্ত্রের আক্রমণ ও পশ্চাদপসরণ কৌশল। ১৯৫৬ সালের নিয়ন্ত্রিত শাসনতন্ত্রের টানা-পোড়েন। পূর্ব বাংলার মোকাবিলায় পশ্চিম পাকিস্তানে সরকারি এক ইউনিট। পূর্ব বাংলায় প্রাদেশিক সীমাবদ্ধ স্বায়ত্তশাসনের পরীক্ষা ও ব্যর্থতা। ক্ষমতার রাজনীতির খেসারত। পুলিশ ধর্মঘট।

রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সরকার কর্তৃক বিভেদ-সৃষ্টি এবং শ্রমিক সমাজে সাম্প্রদায়িকতা সৃষ্টির প্রয়াস। কমিউনিস্ট পার্টিকে বেআইনী ঘোষণা।

(৫) ১৯৫৮-৬১: সামরিক স্বৈরাচারী শাসনের প্রবর্তন। জেলজুলুম লাঠি টিয়ার গ্যাস বেত্রদণ্ড। ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যবাদী শোষকচক্রের ধারক আইয়ুবশাহী। মার্কিন ও ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের সমর্থনে রাওয়ালপিন্ডিভিত্তিক ঔপনিবেশিক কেন্দ্রীয় শাসনের নব পর্যায়। প্রত্যক্ষ নির্বাচন বাতিল।

(৬) ১৯৬২-৬৫: সামরিক স্বৈরাচারবিরোধী গণ-অভ্যুদয়ের প্রথম পর্ব। ছাত্র-অভ্যুদয়। গণতান্ত্রিক শিবির ও গণতান্ত্রিক দলগুলির পুনঃপ্রতিষ্ঠা।

(৭) ১৯৬৫-৬৬: সামরিক স্বৈরাচারী আইয়ুবশাহীর দ্বিতীয় পর্যায়ের সূচনা। নির্বাচনে পরাজিত। গণশিবিরে বিভ্রান্ত। যুদ্ধ উপলক্ষে জরুরি স্বৈর-কানুন।

(৮) ১৯৬৬-৬৭: সামরিক স্বৈরাচারবিরোধী গণ-অভ্যুদয়ের দ্বিতীয় পর্ব। ছয় দফা।

জরুরি কানুন প্রত্যাহারের দাবিতে সংগ্রাম। খণ্ড খণ্ড দাবি আদায়ের জন্য শ্রমিকদের খণ্ড খণ্ড সংগ্রাম। ভুট্টা খাবো না। সামরিক শাসকচক্রের প্রত্যাঘাত ও অস্ত্রের ভাষা। বাঙালি সামরিক ও বেসামরিক কর্মচারীদের বিরুদ্ধে তথাকথিত আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার পত্তন। শেখ মুজিবুর রহমান অভিযুক্তদের প্রধান।

(৯) ১৯৬৮-৬৯: সামরিক স্বৈরাচারবিরোধী গণ-অভ্যুদয়ের তৃতীয় পর্ব। পূর্ণ গণতন্ত্র, পূর্ব বাংলার স্বাধিকার এবং রাজবন্দীদের মুক্তির দাবিতে গণবিপ্লবী অভ্যুত্থান।

জনগণ-কর্তৃক কারফিউ-ভঙ্গ। গণতান্ত্রিক বিপ্লবে শামিল পূর্ব বাংলার শ্রমিক কৃষক ছাত্র মেহনতী জনতা, নারী সমাজ। এগারো দফা। সামরিক স্বৈরশাহী শাসকচক্রের পশ্চাদপসরণ। সমস্ত রাজবন্দীদের মুক্তি। প্রত্যক্ষ নির্বাচনের স্বীকৃতি।

(১০) ১৯৬৯-মার্চ থেকে ডিসেম্বরঃ আবার সামরিক শাসন। সামরিক শাসনচক্রের নয়া নাম ইয়াহিয়া-শাহী। শাসকচক্র-কর্তৃক বদ্ধঘরের রাজনীতি জারীর প্রয়াস। অপরদিকে গণজীবনে ধুমায়িত চাপা বিক্ষোভ ছাত্র সমাজ ও শ্রমিক-সমাজ-কর্তৃক সামরিক আইন লঙ্ঘনের সূত্রপাত। সামরিক শাসক-চক্রের নয়া প্রস্তুতি। ধর্মের আবরণে প্রতিক্রিয়ার সাজগোজ। বেত্রাঘাত জেলজুলুম লাঠি-গুলির সামরিক শাসন।

(১১) ১৯৭০-জানুয়ারি থেকে ডিসেম্বরঃ শাসকচক্রের পশ্চাদপসরণ খোলা ময়দানের রাজনীতির পুনঃপ্রবর্তন। গণ-অভ্যুত্থানমূলক প্রগতিবাদী ও বিপ্লবী তত্ত্বের খোলা বিতর্ক। ভাত ও ভোট। সাধারণ নির্বাচনের প্রস্তুতি এবং অনুষ্ঠান। তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণির সরকারি কর্মচারীদের ধর্মঘট। প্রলয়ঙ্কর সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাস। পূর্ব বাংলা থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন সামরিক স্বৈরাচারী চক্রের ঔপনিবেশিক অধিকার রক্ষার জন্য নয়া ষড়যন্ত্র জাল ও ক্ষমতা-রক্ষার প্রত্যক্ষ হুমকি। সাধারণ নির্বাচনে আওয়ামী লীগের নৌকার জয়।

(১২) ১৯৭১ঃ পূর্ব বাংলার বিরুদ্ধে পশ্চিম পাকিস্তানভিত্তিক বাইশ পরিবারের সমরসজ্জা। সাধারণ নির্বাচনের গণরায় কার্যকরীকরণে শাসকচক্রের অস্বীকৃতি। পূর্ব বাংলার জনগণের তরফ থেকে পাল্টা প্রতিরোধ ব্যবস্থা। গণ-অসহযোগ। দীর্ঘস্থায়ী সংগ্রামের প্রস্তুতি। শাসকচক্র-কর্তৃক নির্বাচনী গণভোট বানচাল ও জনগণের বিরুদ্ধে সামরিক বাহিনী নিয়োগ। গণঅসহযোগ থেকে মুক্তিযুদ্ধ।

ঘটনাধারার বিশ্লেষণ থেকে দশটি সত্য

উপরিউক্ত পর্যায়গুলি থেকে যে প্রথম সত্য বেরিয়ে আসে সেটা এই যে, পূর্ব বাংলার গণ-অসহযোগ এবং সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধ কোন হঠকারী বিপ্লবী অথবা সংগ্রামীর সৃষ্টি নয়। যে বৈপ্লবিক ঘটনার ধারায় অনিবার্যভাবে পূর্ব বাংলার মুক্তিসংগ্রাম সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের রূপ পরিগ্রহ করেছে, তা পূর্ব বাংলার সর্বস্তরের নিপীড়িত ও বঞ্চিত মানুষের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ও অংশগ্রহণ মারফতই ঘটেছে।

দ্বিতীয় সত্য এই যে, পূর্ব বাংলার ছাত্র-সমাজ জনগণের পুরোগামী হিসেবে পূর্ব বাংলার মুক্তিসংগ্রামের পতাকাকে প্রথমাবধি বহন করে নিয়ে এসেছে এবং বারংবার গণশিবির-নির্মাণের দায়িত্ব বহন করেছে।

তৃতীয় সত্য এই যে, পূর্ব বাংলার মুক্তি সংগ্রাম বরাবরই একটা না একটা নির্দিষ্ট লক্ষ্যমাত্রাকে সামনে পেয়েছে। পূর্ব বাংলার মুক্তিসংগ্রাম নিছক জাতীয়তাবাদী ভাবপ্রবণতাময় সংগ্রাম বলে কোন কোন মহলে যে-ধারণা রয়েছে সেটা ভুল। পূর্ব বাংলার মুক্তিসংগ্রাম বরাবরই বৈপ্লবিক সংগ্রামী কর্মসূচিভিত্তিক। ১৯৫৪ সালে তৈরি হয়েছিল একুশ দফা। ১৯৬৬ সালে ৬ দফা। ১৯৬৮-৬৯ সালে ১১ দফা। সংগ্রামের পর্যায়-অনুযায়ী এই দফাগুলির তারতম্য ও বিকাশ ঘটেছে।

চতুর্থ সত্য এই যে, ১৯৭১ সালে ই.পি.আর, বেঙ্গল রেজিমেন্ট এবং পুলিশ বাহিনী যে সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের পুরোভাগে এসে দাঁড়ালো, সেটা ঘটনাচক্রে আকস্মিকভাবে ঘটে নি। ১৯৪৮ এবং ১৯৫৫ সালের পুলিশ ধর্মঘট এবং ১৯৬৭-৬৮ সালে বাঙালি সামরিক কর্মচারীদের বিরুদ্ধে তথাকথিত আগরতলা মামলার ঘটনা অনুসরণ করলে আমরা বুঝতে পারব ই.পি.আর, পুলিশ এবং বেঙ্গল রেজিমেন্ট কেন শেষ পর্যন্ত একটা গণ বৈপ্লবিক ঝুঁকি নিতে দ্বিধা করল না।

পঞ্চম সত্য এই যে, গণতান্ত্রিক শিবিরে নবনব পর্যায়ের পুনর্গঠন এবং তার মারফত পূর্ব বাংলার সাড়ে সাত কোটি বাসিন্দার যে ঐক্য শেষ পর্যন্ত গণ-অসহযোগের মধ্য দিয়ে আত্মপ্রকাশ করল, তার মধ্যে গণশিবির সংগঠিত হওয়ার একটা অব্যাহত ধারা রয়েছে। মাঝে মাঝে গণ-ঐক্যের ক্ষেত্রে বিভ্রান্তি দেখা দিলেও গণশিবিরের ঐক্য তাকে কাটিয়ে উঠেছে। সংগ্রামী, প্রগতিশীল ও বিপ্লবী দলগুলির মধ্যে বারবার মতদ্বৈততা আত্মপ্রকাশ করলেও নির্দিষ্ট লক্ষ্যমাত্রার সংগ্রামে এই সব দলে অনেকাংশে মতদ্বৈততা কাটিয়ে উঠতে পেরেছে।

ষষ্ঠ সত্য এই যে, পূর্ব বাংলার সরকারি ও আধা-সরকারি কর্মচারীরা প্রথমাবিধি রাজদণ্ডধারীদের বিরুদ্ধে জনগণের বৃহত্তর আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। ১৯৭১ সালের মার্চ মাসে সার্বিক সাধারণ ধর্মঘটে সরকারি কর্মচারীদের যোগদান গণচাপ বা হুমকি থেকে আসে নি। এর মূলে রয়েছে সরকারি কর্মচারীদের নিজস্ব উদ্যোগ ও চিন্তা।

সপ্তম সত্য এই যে, একদিকে যেমন ঔপনিবেশিক শোষণ ও শাসনের বিরুদ্ধে পূর্ব বাংলার বৃহৎ থেকে বৃহত্তর সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়েছে এবং পূর্ব বাংলার মুক্তিসংগ্রাম যে অদম্য সে কথা প্রমাণিত করেছে, তেমনি আরেক দিকে করাচি, লাহোর, রাওয়ালপিন্ডিভিত্তিক বাইশ পরিবারের রক্ষক সাম্রাজ্যবাদী সামন্তবাদী-পুঁজিবাদী শাসকচক্র পূর্ব বাংলাকে উপনিবেশ হিসেবে বহাল রাখার জন্য নির্যাতন নিপীড়নমূলক প্রশাসনিক ও সামরিক ব্যবস্থার মাত্রা চড়িয়ে এসেছে। ছয় দফার ব্যাপারে শেখ মুজিবুর রহমানের অনমনীয়তা কিংবা ছাত্র জনতা ও বিপ্লবী দলসমূহ-কর্তৃক পূর্ব বাংলার স্বাধীনতা-ঘোষণাই ইয়হিয়া-ভুট্টো চক্রকে পূর্ব বাংলার যুদ্ধাভিযানে প্ররোচিত করেছে বলে যে-কথা বলা হয় কোন কোন মহল থেকে, সেটা হয় ইচ্ছাকৃত অপপ্রচার নয়তো অজ্ঞানতাপ্রসুত দায়-সারা রায়। সংশ্লিষ্ট শাসকচক্র গত চব্বিশ বছরে প্রধানত মার্কিন ও ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের সহায়তায় যে যুদ্ধযন্ত্র গড়ে তুলেছে, তার প্রধান উদ্দেশ্য হয়েছে প্রথমত পূর্ব বাংলাকে উপনিবেশ হিসেবে সুরক্ষিত রাখা এবং দ্বিতীয়ত পশ্চিম পাকিস্তানের দরিদ্র জনগণকে দাবিয়ে রেখে তাদের সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধরথচক্রে বেঁধে রাখা। সামরিক বাহিনী যে ঔপনিবেশিক স্বার্থরক্ষার বাহিনী হিসেবেই লালিত পালিত হয়েছে তার দু'টি প্রমাণ। একটি প্রমাণ হচ্ছে সংশ্লিষ্ট সাম্রাজ্যবাদী সামন্তবাদী পুঁজিবাদী শাসকচক্র যে সরকার খাড়া করেছে, তা সামরিক সরকার। দ্বিতীয়ত, সামরিক বাহিনীতে পূর্ব বাংলার লোক কার্যত নেওয়া হয় নি এবং পূর্ব বাংলার সামরিক বাহিনীর সদর দফতর স্থাপন, পূর্ব বাংলায় প্রধান নৌ-ঘাঁটি স্থাপন প্রভৃতির দাবিকে অগ্রাহ্য করা হয়েছে।

অষ্টম সত্য এই যে, শাসকচক্র মাঝে মাঝে গণ-অভ্যুদয়ের চাপে পশ্চাদপসরণ করলেও, মূলগতভাবে পূর্ব বাংলার জনগণের উপর আক্রমণের মাত্রা বৃদ্ধি করে এসেছে। ক্ষমতা হস্তান্তরের বিপরীত ব্যবস্থাই করেছে তারা।

নবম সত্য এই যে, পূর্ব বাংলার জনগণের উপর পর্যায়ের পর পর্যায় সামরিক শাসন জারী হলেও এবং স্বৈরাচারী ব্যবস্থার জৌলুষ ক্রমাগত বৃদ্ধি পেলেও জনগণ কখনও গণতন্ত্রের অবশ্যম্ভাবী জয় সম্বন্ধে মনোবল হারিয়ে ফেলে নি। জনগণ বরং বৃহত্তর বৈপ্লবিক শক্তি এবং প্রেরণা নিয়েই বিরতির বলয়গুলিকে অতিক্রম করে এসেছে। সাধারণ নির্বাচনেই হোক অথবা বৈপ্লবিক অভ্যুত্থানগুলিতেই হোক অথবা খণ্ড খণ্ড ভাবে স্থানীয় দাবি দাওয়ার ভিত্তিতে হোক জনগণ যেখানে তাদের উদ্যোগ প্রকাশের অবকাশ পেয়েছে, সেখানেই প্রমাণিত হয়েছে যে, স্বৈরাচারী সামরিক শাসনের গণবিরোধী নিষ্পেষণ-যন্ত্র জনগণের মনোবলকে বিন্দুমাত্র ভাঙ্গতে পারে নি। জনগণ প্রতিক্রিয়ার পর্যায়গুলিকে পেরিয়ে এসেছে ছোটখাট প্রশ্নে সংগ্রাম শুরু করে কিংবা খণ্ড খণ্ড দাবি আদায়ের সংগ্রামের সোপানে আরোহণ করেছে গণবৈপ্লবিক অভ্যুত্থান।

চব্বিশ বছরে স্বৈরাচারী আইয়ুব-শাহী কিংবা ইয়াহিয়া-শাহীর জগদ্দল পাথরকে পূর্ব বাংলার বুকের উপর সমাসীন দেখে যারা পূর্ব বাংলার জনগণের পরাজয়ের কথা চিন্তা করেছে, তারা যে ভুল করেছে সেটা বারবার ধরা পড়েছে।

পূর্ব বাংলার উপেক্ষিত বঞ্চিত সাড়ে সাত কোটি মানুষ এক অপরাজেয় জাতিসত্তা। ১৯৪৭ থেকে ১৯৭১ পর্যন্ত ঘটনাধারার বৈপ্লবিক প্রামাণ্যতা এখানেই যে, এই অপরাজেয় জাতিসত্তার মধ্যে আত্মপ্রকাশ করেছে ছাত্র, শ্রমিক, কৃষক ও অন্যান্য মেহনতী জনতার নির্মীয়মাণ বিপ্লবী শক্তি। শাসকচক্রের জোরজলুম একে নিবৃত্ত করতে পারে নি।

দশম সত্য এই যে, পর্যায়ের পর পর্যায়ে অধিকতর ক্রুর এবং প্রতিহিংসা পরায়ণ ঔপনিবেশিকতাবাদী পাকিস্তানি শাসকচক্রের বিরুদ্ধে পূর্ব বাংলা তথা বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রাম জনগণের গভীরতম স্তরগুলি থেকে নতুনভাবে শক্তি সঞ্চয় করে এবং নতুনতর চেতনা নিয়ে সংগ্রামে নিয়োজিত হয়েছে বলেই নেতৃত্বের বৈপ্লবিক সম্প্রসারণ অনিবার্য ঐতিহাসিক সত্য। গণতন্ত্রের সঙ্গে অচ্ছেদ্যভাবে জড়িয়ে বেরিয়ে এসেছে সমাজতন্ত্রের দাবি।

৩. ঔপনিবেশিক শোষক ও শাসক গোষ্ঠীর শ্রেণিচিহ্ন:

যে নিপীড়ক ঔপনিবেশিক শাসক ও শোষকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে পূর্ব বাংলার মুক্তিসংগ্রাম শেষ পর্যন্ত মুক্তিযুদ্ধে পরিণত হলো, তাদের সাধারণভাবে বুঝে উঠতে পূর্ব বাংলার জনগণের বেশি সময় লাগে নি। তবে এই শাসকগোষ্ঠীকে সঠিকভাবে চিহ্নিত করার ব্যাপারটা মূলত বিশেষজ্ঞ ও তাত্ত্বিকদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রয়েছে।

পূর্ব বাংলার মুক্তিসংগ্রাম পশ্চিম পাকিস্তানের জনগণের বিরুদ্ধে পরিচালিত হয় নি কখনও। তবে আপাতদৃষ্টিতে এবং ঢালাও প্রচারের ক্ষেত্রে কোন কোন ক্ষেত্রে মনে হয়ে থাকতে পারে যে, ব্যাপারটা পূর্ব বাংলার ও পশ্চিম পাকিস্তানের দ্বন্দ্ব। পূর্ব বাংলা ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে যে অর্থনৈতিক বৈষম্য গড়ে উঠেছে গত চব্বিশ বছরে তাকে

এই বৈষম্যের ফলভোগকারী যারা তাদের নির্দিষ্ট করে দেখানোর কাজটাও তাত্ত্বিকদের মধ্যে নিবদ্ধ রয়েছে।

তবে তত্ত্বের ক্ষেত্রেও উপরিউক্ত শাসক ও শাসকগোষ্ঠীর শ্রেণিচিহ্নণ এবং চরিত্র-পরিচয় সহজ হয় নি এ কারণে যে, এই গোষ্ঠীর বিন্যাসের মধ্যে তারতম্য ও অন্তর্দ্বন্দ্ব ঘটে এসেছে অবিশ্রান্তভাবে। শোষক ও শাসক-চক্রের মধ্যে এই অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব প্রাসাদ-ষড়যন্ত্র, হত্যাকাণ্ড এবং রাজনৈতিক অচলাবস্থা ও অস্থিরতার মধ্যে বার বার বিস্ফোরিত হয়েছে। পশ্চিম পাকিস্তানের বড় বড় সামরিক কর্তাদের নিজেদের মধ্যে, সামরিক ও বেসামরিক আমলাদের নিজেদের মধ্যে, সামরিক আমলা পুঁজিপতি জায়গীরদের এবং বেসামরিক আমলা পুঁজিপতি জায়গীরদারদের মধ্যে ক্ষমতার কাড়াকাড়ি চলছে কখনও খোলাখুলিভাবে এবং কখনও আড়ালে আবডালে। এর কারণ এই যে, পশ্চিম পাকিস্তান এবং পূর্ব বাংলার সম্পদের উপর একচেটিয়া মালিকানা প্রতিষ্ঠার জন্য শাসক ও শোষকগোষ্ঠীর চক্রগুলি একে অপরকে ঘায়েল করতে চেষ্টা করেছে।

পূর্ব বাংলাকে উপনিবেশ করে রাখার ব্যাপারে এরা সবাই একযোগ থাকলেও মুনাফার পাহাড়ের মালিকানা ষোল আনা পাওয়ার জন্যে উপরিউক্ত শোষক ও শাসকগোষ্ঠীর চক্রগুলো পরস্পরকে ছাড়িয়ে ওঠে একাধিপত্যের চেষ্টা করে এসেছে।

এটা মধ্যযুগীয় সামন্তবাদী ভূম্যধিকারীদের চরিত্রানুগ যেমন তেমনি পুঁজিবাদী একচেটিয়া মালিকানা ব্যবস্থার সম্প্রসারণের অনিবার্য পরিণতিও বটে।

এই সঙ্গে যোগ হয়েছে সাবেক এবং নয়া ঔপনিবেশিক পুঁজিবাদী সাম্রাজ্যবাদের দ্বন্দ্ব। ব্রিটিশ বা স্টার্লিং সাম্রাজ্যবাদের অভিভাবকত্ব থেকে সরিয়ে উপরিউক্ত শাসক ও শোষকগোষ্ঠীকে রেহাত করে নিয়েছে মার্কিন বা ডলার সাম্রাজ্যবাদীরা। এটা নিয়েও ভিতরে ভিতরে বহু রকমের আকর্ষণ বিকর্ষণ খাণ্ডব তাণ্ডব ঘটেছে। ক্ষমতার দ্বন্দ্বের দরুন প্রকাশ্যভাবেও উপরতলাতে ঘাত-প্রতিঘাতের সৃষ্টি হয়েছে, রদবদল হয়েছে সরকারের, রাষ্ট্র-ব্যবস্থার, কর্ণধারির ও দল উপদলের। এই কারণেই পূর্ব বাংলার শত্রু-জোটকে চিহ্নিত করার কাজটা সহজ হয় নি। কোন কোন সময় ঠিক করে বলা যায় নি, শাসকগোষ্ঠী ঠিক কাদের নিয়ে গঠিত।

প্রগতিবাদী তাত্ত্বিকরা পূর্ব বাংলার শত্রুগোষ্ঠী হিসেবে চিহ্নিত করেছেন সামন্তবাদ, পুঁজিবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের জোটকে। পশ্চিম পাকিস্তানের বনেদী বৃহৎ ভূম্যধিকারী পরিবারগুলি, আঙ্গুল ফুলে দুই দশকে কলাগাছ হয়ে ওঠা কোটিপতি ব্যবসায়ী ও পুঁজিপতি পরিবারগুলি এবং এদের অভিভাবক ও সহায়ক ব্রিটিশ ও মার্কিনসহ পশ্চিমী বৃহৎ পুঁজিবাদী সাম্রাজ্যবাদীরা এবং প্রধানত মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীরাই হচ্ছে পশ্চিম পাকিস্তানে অবস্থানকারী সেই শাসক ও শোষকগোষ্ঠী, যারা পূর্ব বাংলাকে উপনিবেশ করে রাখতে চেয়েছে। যেহেতু ইঙ্গ-মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের আশ্রিত উপরিউক্ত বৃহৎ জমিদার ও বৃহৎ পুঁজিপতিগোষ্ঠীর অবস্থান পশ্চিম পাকিস্তানের করাচি-লাহোর এবং রাওয়ালপিন্ডি-ইসলামাবাদে, সেজন্য স্বাভাবিক এবং যুক্তিসঙ্গতভাবেই একে পশ্চিম পাকিস্তানি নামে অভিহিত করা হয়েছে, যদিও এ সম্বন্ধে সতর্ক না থাকার দরুন কোন কোন সময়ে পূর্ব বাংলার জনচেতনার ক্ষেত্রে অস্বচ্ছতা ঘটে থাকতে পারে এবং পশ্চিম

পাকিস্তানের বিভিন্ন নিপীড়িত জাতিসত্তা ও মেহনতী শ্রেণির প্রতি ভাবগতভাবে অবিচার করা হয়ে থাকতে পারে। কিন্তু একুশ দফা, ছয় দফা এবং এগারো দফার মতো সংগ্রামী কর্মসূচি লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে, পূর্ব বাংলার মুক্তিসংগ্রামের নেতৃত্ব এ সম্পর্কে সতর্ক থেকেছেন।

শুধু বিপ্লববাদী প্রগতিপন্থী তাত্ত্বিকরাই যে পশ্চিম পাকিস্তানে অবস্থানকারী এক বিশেষ গোষ্ঠীকে সামগ্রিকভাবে পূর্ব বাংলার এবং বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে পশ্চিম পাকিস্ত ানের জনগণের শোষক-শাসক তথা শত্রু হিসেবে চিহ্নিত করেছেন তা নয়। হার্ভার্ড কেম্ব্রিজ ফেরত বিভিন্ন পশ্চিমী বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতিবিদরা এবং এমনকি পশ্চিমী তালিম-প্রাপ্ত ইসলামাবাদের অর্থনৈতিক পরিকল্পনার ভারপ্রাপ্ত অর্থনীতিবিদরাও দেখিয়েছেন, পূর্ব বাংলার এবং পশ্চিম পাকিস্তানের সম্পদের শতকরা ৮০ ভাগ জমা হয়েছে ২২টি পরিবারের হাতে, যারা লাহোর, করাচি, রাওয়ালপিন্ডি, ইসলামাবাদে সমাসীন থেকে রাষ্ট্রযন্ত্রের ধারণ বহনেরও মালিক হিসেবে ক্ষমতার চক্রে আরোহণ-অবরোহণের খেলায় অভ্যস্ত। ডালপালা মিলিয়ে এই ২২ পরিবারকে ২০০ পরিবারে চিহ্নিত করেছেন অর্থনীতিবিদরা। বড় বড় ব্যাঙ্ক ও বীমা কোম্পানির পুঁজি এদের হাতে। সুতরাং, আর্থিক চাবিকাঠিও থেকেছে এদের হাতে। পূর্ব বাংলাকে এরা শুধু পণ্যদ্রব্যের একচেটিয়া বাজারে পরিণত করতে চায় নি। আর্থিক দিক দিয়ে পূর্ব বাংলাকে অধমর্ণ করে তুলতে এবং করে রাখতে চেয়েছে এরা। পূর্ব বাংলা গত ২৪ বছরে মাত্র দু'টি ব্যাংক গড়ে তুলতে পেরেছে, যাদের স্থানীয় চরিত্র রয়েছে কিছুটা।

দুই দশক আগে পশ্চিম পাকিস্তানের ব্যবসায়ী শিল্পপতিরা অনধিক দশ কোটি টাকা মুল্যের পণ্য রফতানী করত পূর্ব বাংলায়। ১৯৭০ সালে এই পণ্য রফতানীর মূল্য দাঁড়ায় ১৩০ কোটি টাকা। পূর্ব বাংলাকে নিংড়ে নিংড়ে শোষণ করার মাত্রা এভাবে বাড়াবার সঙ্গে সঙ্গে উপরিউক্ত শোষক ও শাসকগোষ্ঠী যে পূর্ব বাংলার উপর ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যবাদী সামরিক কবজাকে কেন প্রসারিত ও অনবরত শক্ত করার চেষ্টা করে এসেছে, তা বুঝতে দেরি হবার কথা নয় কারও পক্ষে এ হিসেব সামনে রাখলে। পশ্চিম পাকিস্তানের বাইশ বা দুইশত পরিবার বহির্বিশ্বে পশ্চিম পাকিস্তান এবং পূর্ব বাংলার পণ্য রফতানী করে বৈদেশিক বাণিজ্যে বছরে ২৫০ কোটি টাকা নগদ আদায় করেছে। এর মধ্যে পূর্ব বাংলার পণ্য প্রথম দিকে ছিল অর্ধেকেরও বেশি অর্থাৎ প্রায় শতকরা ৬০ ভাগ। দুই দশক ধরে এই রফতানীর মারফত প্রাপ্ত টাকায় করাচি, লাহোর, মূলতান প্রভৃতি জায়গায় দ্রুত মুনাফা অর্জনকারী হালকা ভোগ্যদ্রব্য-উৎপাদনকারী শিল্প কারখানা গড়ে তুলে তার সাহায্যে বৈদেশিক বাণিজ্যে পশ্চিম পাকিস্তানে উৎপাদিত পণ্যের রফতানী বৃদ্ধি করলেও ১৯৬৭ সালের হিসেবেও বৈদেশিক বাণিজ্যে পূর্ব বাংলার পণ্য প্রায় আধাআধি দেখাতে হয়েছে। গত চব্বিশ বছরে পূর্ব বাংলা থেকে রফতানী-করা পণ্যের আয়ের উপরেই দাঁড়িয়ে থেকেছে পশ্চিম পাকিস্তানে অবস্থানকারী বৃহৎ ব্যবসায়ী পুঁজিপতিদের সমস্ত জারিজুরি। এই রফতানীর টাকাতে ফুলে ফেঁপে ঢোল হয়ে উঠেছে পশ্চিম পাকিস্তানের সেই ফড়িয়া বা মুৎসুদ্দী ব্যবসায়ী ও পুঁজিপতি সাম্রাজ্যবাদীদের সামান্য বখরা মাত্র পেয়ে দারিদ্র ভারতীয় উপমহাদেশে পুঁজি সঞ্চয় করেছিল।

পূর্ব বাংলার পাট, চা ও চামড়ার কাঁচা টাকায় গত চব্বিশ বছরে উপরিউক্ত মুৎসুদ্দীদের অংশীদার হয়ে উঠে-বড় বড় জায়গীরদারদের একটি অংশ যারা জ্যামিতিক হারে টাকা বাড়াবার একটা যন্ত্র খুঁজে পায় এতে এবং এই কারণেই বড় বড় জমির মালিকানা বজায় রেখে বৃহৎ বাঁধা আয়ের ব্যবস্থা রাখার সঙ্গে সঙ্গে কোটি কোটি অলস টাকা নিয়োগ করেছে শিল্প কারখানায় এবং বৈদেশিক বাণিজ্যে ও আমদানী রফতানীতে। এইভাবেই পশ্চিম পাকিস্তানের বৃহৎ ভুস্বামীদের একাংশ পূর্ব বাংলাকে উপনিবেশ করার ব্যাপারে বিশেষভাবে উৎসাহী হয়ে ওঠে মুৎসুদ্দী ব্যবসায়ী ও পুঁজিপতিদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে আফ্রো-এশিয়া কিংবা ইউরোপের বিভিন্ন দেশে, মায় সামরিক মিত্র তুরস্কে অথবা ইরানে যেখানে এক কোটি টাকা রফতানী বৃদ্ধি করা গলদঘর্ম হওয়ার ব্যাপার, সেখানে পূর্ব বাংলায় জ্যামিতিক হারে পশ্চিম পাকিস্তানের উৎপাদিত পণ্য রফতানী বৃদ্ধি একটা অস্বাভাবিক স্ফীতি দিয়েছে পশ্চিম পাকিস্তানের উপরিউক্ত বনেদী এবং নয়া ব্যবসায়ী পুঁজিপতিদের। নিদারুণ প্রতিযোগিতাময় আন্তর্জাতিক বাজারে এই ফেঁপে ওঠা ব্যবসায়ী পুঁজিপতিরা দুই দশক ধরে একটা দরজাই খোলা চেয়েছে এবং সেটা হচ্ছে পূর্ব বাংলা।

এভাবে দ্রুত মুনাফা অর্জন করে সম্পদ গড়ে তোলার পথ খোলা পাওয়ার মুৎসুদ্দী ব্যবসায়ী পুঁজিপতি এবং বৃহৎ ভুস্বামীদের চক্র যোগদান করেছে ক্রমবর্ধমান হারে পশ্চিম পাকিস্তানের সামরিক এবং বেসামরিক বড় বড় আমলারা। পূর্ব বাংলাকে উপনিবেশ হিসেবে রক্ষা করার জন্য এই সামরিক ও বেসামরিক বড় বড় আমলা যে শেষ পর্যন্ত সমগ্র যুদ্ধ-যন্ত্র নিয়ে পূর্ব বাংলার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল, এর মূলসূত্র এখানেই। কোন এক সময়ে পূর্ব বাংলার মানুষ যে সামরিক বাহিনীকে রক্ষক মনে করত এবং যাদের উপর দেশরক্ষার দায়িত্ব অর্পণ করতেও রাজি হয়েছিল, তারা শুধু বাজেট বরাদ্দের সিংহভাগ নিয়ে খুশি না থেকে পূর্ব বাংলার পশ্চিমী ভক্ষকদের হিস্সাদার হয়ে উঠলো উপনিবেশিক লুটেরা হিসেবে। এই সামরিক এবং বেসামরিক কর্তৃমণ্ডলী শুধু সামন্তবাদ পুঁজিবাদ সাম্রাজ্যবাদের ঔপনিবেশিক বাহিনীর পরিচায়ক রইল না, তারা ভাগীদারও হয়ে উঠল। এই কারণেই এক সময়ে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক আমলে যে সেনাবাহিনী অন্যতম নিয়মানুবর্তী ও করিৎকর্মা সেনাবাহিনী হিসেবে তকমা পেয়েছিল, তাকে দেখা গেল পূর্ব বাংলায় খোলাখুলিভাবে লুণ্ঠণরত। যে সেনাবাহিনীকে ছয় দফার প্রণেতারাও পূর্ব বাংলা রক্ষার দায়িত্ব দিতে রাজি ছিলেন, তাদেরই দেখা গেল পূর্ব বাংলার নিরস্ত্র জনসাধারণের উপর আধুনিকতম মরণাস্ত্র নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়তে এবং পূর্ব বাংলার মা-বোনদের ইজ্জত নাশ করতে। এখানে একটা কথা এ প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখ করে রাখা দরকার। ভারতীয় উপমহাদেশ বিভক্ত হয়ে যাবার পর পাকিস্তান হিসেবে পরিচিত অংশে দ্বিজাতিতত্ত্বে প্রভাবিত হলেও সেনাবাহিনী সরাসরি সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা করে নি। একথা বরং জোর দিয়েই বলা যায় যে, পাকিস্তানি সেনাবাহিনী ছিল সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা দমনের সর্বশেষ উপায়। কিন্তু ১৯৭১ সালের ২৫-এ মার্চের পরে পশ্চিম পাকিস্তানের সেনাবাহিনীকে পূর্ব বাংলায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় লিপ্ত করা হয়েছে। এই ঘটনা ঘটতে পেরেছে এই কারণে যে পূর্ব বাংলাকে উপনিবেশ হিসেবে রক্ষা করার একটা শেষ চেষ্টার জন্যে সংশ্লিষ্ট সামরিক কর্তৃপক্ষ একমাত্র

মুনাফার হিসেব এবং নীতিবোধ ছাড়া অন্য যে কোন হিসেব ও নীতিবোধকে ঝেড়ে মুছে ফেলে দিয়েছে।

অবশ্য এখানেও একটা শ্রেণিবিন্যাস কাজ করেছে। সমরকর্তাদের মধ্যে সকলেই যে পূর্ব বাংলার উপনিবেশ হিসেবে শোষণ করার চক্রের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে তা নয়। সমরকর্তাদের মধ্যে যারা বিশেষভাবে পশ্চিম পাকিস্তানের বড় বড় জায়গীরদার জমিদার এবং অভিজাত পুঁজিপতিদের পরিবারভুক্ত হিসেবে পশ্চিম পাকিস্তানের সামন্তবাদী পুঁজিবাদী সাম্রাজ্যবাদী শোষকগোষ্ঠীর শ্রেণি বিন্যাসে জায়গা করে নিয়েছে, উপরে বর্ণিত অংশীদার হওয়ার পদ্ধতিক্রমে তারাই সামরিক বাহিনীকে প্রত্যক্ষভাবে পূর্ব বাংলাতে ব্যাপক নরহত্যা ও লুটতরাজ চালানোর অভিযানে নিয়োজিত করেছে এবং বেশ কিছুকাল ধরে তার প্রস্তুতিও চালিয়ে এসেছে। এই বিশেষ সামরিক কর্তারাই শাসক ও শোষকচক্রের অন্যান্য শরিকদের সঙ্গে একত্রিত হয়ে সামরিক বাহিনীর নীতিবোধসম্পন্ন অথবা 'বিবেকবান' অথবা বিভিন্ন জাতিসত্তার স্বাধীনতায় বিশ্বাসী অথবা (এ কথাটা বর্তমান বিশ্বে অবিশ্বাস্য নয়) শোষণ-বিরোধী অংশকে কোণঠাসা করে দিয়েছে অথবা বিতাড়িত করেছে। পূর্ব বাংলার বিরুদ্ধে সামরিক প্রস্তুতির কালে এবং বিশেষ করে ১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চের মুখে এই ঘটনা ঘটেছে।

সাম্রাজ্যবাদের ভূমিকাকে উপরিউক্ত সামরিক শোষকচক্রের রক্ষক হিসেবে পেশ করা যেতে পারে। ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যবাদীরা যখন মুসলিম লীগের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করেছিল, তখন বড় বড় জায়গীরদার জমিদার এবং বড় বড় ব্যবসায়ী ও পুঁজিপতিদের নির্বাচিত প্রতিভূ হিসেবে যাঁরা সরকার গঠন করেছিলেন, তাঁরা ছিলেন 'রাজনীতিক'। এই রাজনীতিক'দের যোগাযোগ ছিল প্রধানত ব্রিটিশের সঙ্গে। এই 'রাজনীতিক'রা অবশ্য যে প্রশাসনিক কাঠামো এবং সামাজিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে ওয়ারিস সূত্রে পেয়েছিলেন তাকে অনুগত ওয়ারিসের মতোই অক্ষুণ্ন রেখে সরকারি কার্যকলাপ চালিয়ে যাওয়ার পক্ষপাতী ছিলেন। এই কারণে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক আমলের সামরিক ও বেসামরিক বড় আমলারা দেশরক্ষা ও প্রশাসন-যন্ত্রের নিয়ন্ত্রণকর্তা থেকে যায়। গণবিরোধী ও গণ-বিচ্ছিন্ন সামরিক ও বেসামরিক আমলাতন্ত্র শাসনযন্ত্রের তত্ত্বাবধায়কের ভূমিকাতে পশ্চিম পাকিস্তানের জায়গীরদার ও পুঁজিপতিদের কাছ থেকে উৎসাহিত হয়ে পূর্বাপেক্ষা আরও বেশি ক্ষমতাগ্রাসী হয়ে ওঠে। এই অবস্থায় মার্কিন নয়া ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যবাদ যখন পশ্চিম পাকিস্তানে ব্রিটিশের জায়গায় জমিয়ে বসার জন্যে থাবা বিস্তার করে, তখন তারা রাজনীতিকদের জালে টানবার জন্যে যত না চেষ্টা করেছিল তার থেকে বেশি চেষ্টা করেছিল আমলাতন্ত্রকে বাগাবার। এ কাজটা সহজতরও হয়েছিল, কারণ প্রশাসনিক যন্ত্র এবং সামরিক বাহিনীর ব্যয়ভার বহনের বাৎসরিক বাজেট বরাদ্দ সমস্যার সমাধান করে দিয়েছিল মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীদের ডলার বরাদ্দ। সামরিক ও বেসামরিক আমলাতন্ত্রের উপর ভর করে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীরা মধ্যপ্রাচ্য ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াতে সোভিয়েত-বিরোধী ও চীনবিরোধী যুদ্ধ-জোট তৈরির জন্যে রাতারাতি শাসকগোষ্ঠীর মধ্যে ঢুকে পড়েছিল। উপরিউক্ত আমলাতন্ত্র পশ্চিম পাকিস্তান কেন্দ্রিক হওয়ায় মার্কিন সাম্রাজ্যবাদও হয়েছিল পশ্চিম পাকিস্তানভিত্তিক। পূর্ব বাংলাকে শিল্পের দিক দিয়ে বঞ্চিত রেখে বাজার হিসেবে

ব্যবহার করার জন্যে পশ্চিম পাকিস্তানের জায়গীরদার জমিদার পুঁজিপতি আমলাতন্ত্র যে কার্যক্রম গ্রহণ করেছিল তাতে শরিক হয়েছিল মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ। পশ্চিম পাকিস্তানের কায়েমি স্বার্থবাদী চক্র যেমন ব্রিটিশ ও অন্যান্য পশ্চিমী পুঁজিবাদী সাম্রাজ্যবাদীদের সঙ্গে যোগসাজস রেখে মূলত মার্কিনি ডলার-চক্রের সঙ্গে নিজেদের অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত করার ব্যবস্থা করেছিল, তেমনি মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থও উপরিউক্ত কায়েমি স্বার্থবাদীদের সঙ্গে নিজেকে অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত করেছিল। এই কারণেই মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীরা পশ্চিম পাকিস্তানের কায়েমি স্বার্থবাদী চক্রকে শুধু যে অর্থনৈতিক ও সামরিক সাহায্য দিয়েই পরিপুষ্ট করে তুলেছে তা নয়, সঙ্গে সঙ্গে সাধারণভাবে গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে এবং বিশেষভাবে পূর্ব বাংলার মুক্তির সংগ্রামের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক সমর্থন জুগিয়েছে। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ চেয়েছে পশ্চিম পাকিস্তানের সামরিক ও বেসামরিক ব্যবস্থার স্থায়িত্ব ও সম্প্রসারণ। পূর্ব বাংলার শিল্প স্থাপনে অথবা অর্থনৈতিক আত্মনির্ভরতা প্রতিষ্ঠা করার জন্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের তরফ থেকে যে-মৌখিক প্রতিশ্রুতি এসেছে নানা সময়ে, সেগুলি মৌখিকই থেকে গিয়েছে। মার্কিনি ও অন্যান্য পশ্চিমী সাম্রাজ্যবাদীরা যে পশ্চিম পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠীর অঙ্গ, যে সত্যটা চূড়ান্তস্বভাবে ধরা পড়েছে ১৯৭১ সালে ২৫শে মার্চের পরে।

পূর্ব বাংলার বুদ্ধিজীবীদের একাংশ পশ্চিমী দেশে উচ্চশিক্ষা লাভ করেছেন। এই কারণেও এঁদের মধ্যে যারা মনে করেছিলেন, পূর্ব বাংলার পক্ষে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থাকবে অন্তত মুখরক্ষার জন্যে, তারা হতাশ হয়েছেন। কিন্তু আশা করাটাই হয়েছিল অবাস্তব, কারণ গত ২৪ বছরের ভিতরের সত্য এই যে, মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ পশ্চিম পাকিস্তানের কায়েমি স্বার্থবাদী চক্রের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত থেকেছে এবং সেই চক্রকে ক্রমাগত শক্তিশালী করে এসেছে কোটি কোটি ডলার বরাদ্দ করে। পূর্ব বাংলার যে কোন সুদূরপ্রসারী অর্থনৈতিক শৈল্পিক উন্নয়ন প্রকল্পের জন্যে এদের কাছ থেকে ডলার বরাদ্দ পাওয়া যায় নি, যদিও সমগ্রভাবে ডলার বরাদ্দ এবং ঋণের দায় পূর্ব বাংলার ঘাড়ে চাপানো হয়। (পূর্ব বাংলা নিশ্চয় এই ঋণের দায়দায়িত্ব স্বীকার করবে না।) যাই হোক দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, পশ্চিম পাকিস্তানে সিন্ধু অববাহিকা প্রকল্পে ১৯৬০-৭০ সালে দুই পর্যায়ে মার্কিনি মুরুব্বীরা দু'হাজার কোটি টাকা দিয়েছে। কিন্তু ১৯৭০ সালেও পূর্ব বাংলার বন্যা প্রতিরোধ মহাপ্রকল্পের কাগজপত্র দাখিল করে এদের কাছ থেকে ২৫০ কোটি টাকার প্রতিশ্রুতিটা পর্যন্ত পাওয়া যায় নি।

তাছাড়া মার্কিন এবং ব্রিটিশ তথা পশ্চিমী সাম্রাজ্যবাদীদের সাহায্যের ধারাই হচ্ছে ব্যক্তিগত বৃহৎ পুঁজির সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধা এবং তথাকথিত 'স্বাধীন' অর্থনীতিকে উৎসাহিত করা। অর্থাৎ ধনীকে আরও ধনী এবং গরিবকে আরও গরিব করার এদের স্বভাব নীতি। এরা পশ্চিম পাকিস্তানের পুঁজিপতিদের খুদে পুঁজিপতি থেকে বৃহৎ পুঁজিপতিতে পরিণত হতে সাহায্য করেছে। এরা পশ্চিম পাকিস্তানি বৃহৎ পুঁজিপতিদের তথাকথিত 'স্বাধীন' অর্থনীতির স্টিম রোলারে পূর্ব বাংলার মেহনতী মানুষদের নিষ্পিষ্ট করে দিতে সাহায্য করেছে এবং সঙ্গে সঙ্গে পূর্ব বাংলার নিজস্ব পুঁজি গড়ে উঠার ব্যাপারটাকে দমিয়ে রাখার জন্যেও পশ্চিম পাকিস্তানের কায়েমি স্বার্থবাদীদের নগদ অর্থ, যন্ত্রপাতি, অস্ত্রশস্ত্র জুগিয়েছে। এদের 'স্বাধীন অর্থনীতি' পূর্ব বাংলাকে পরাধীন

করে রাখারই কায়েমি ব্যবস্থা হিসেবে কার্যকরী হয়ে এসেছে গত চব্বিশ বছর ধরে। এ অবস্থায় পূর্ব বাংলার জনগণ পশ্চিম পাকিস্তানের কায়েমি স্বার্থবাদী চক্রের কবল থেকে মুক্ত হবার জন্যে যে সংগ্রাম চালিয়ে এসেছে, তাকে বার বার বিশেষ করে মার্কিন এবং সাধারণভাবে ব্রিটিশ ও অন্যান্য সাম্রাজ্যবাদী শক্তির বিরুদ্ধে নিয়োজিত হতে হয়েছে। অবশ্য এই সাম্রাজ্যবাদী শক্তি সাধারণত অদৃশ্য থাকে বলেই সব সময় এর সঙ্গে প্রত্যক্ষ মোকাবিলা হয় নি।

৪. মুক্তিসংগ্রামের পক্ষভুক্ত শক্তিসমূহের শ্রেণি ভূমিকা

১৯৪৭-৪৮ থেকেই, অর্থাৎ প্রথমাবধি, পশ্চিম পাকিস্তানের জমিদার জায়গীরদার পুঁজিপতি সামরিক-বেসামরিক বড় আমলা ও সাম্রাজ্যবাদী কায়েমি স্বার্থের জোট পূর্ব বাংলাকে উপনিবেশ হিসেবে দেখেছে এবং সেইভাবেই চূড়ান্তভাবে শোষণ করার ব্যবস্থা পাকাপাকি করতে চেয়েছে।

সুতরাং একটা উপনিবেশের জাতীয় মুক্তিসংগ্রামের যে ব্যাপক সামাজিক ভিত্তি থাকে, বা যে সংগ্রামী বহুশ্রেণী-ভিত্তিকতা থাকে, পূর্ব বাংলার মুক্তিসংগ্রামের ক্ষেত্রে সে ব্যাপারটা ঘটেছে।

পশ্চিম পাকিস্তানের কায়েমি স্বার্থবাদী ঔপনিবেশিক চক্রের বিরুদ্ধে ১৯৪৮ সাল থেকেই পূর্ব বাংলার জনগণের যে সংগ্রামের সূচনা, সেখানে শ্রেণিসত্তা অপেক্ষা জাতিসত্তা প্রবলতর থেকেছে। শুধু তাই নয়, জাতীয় মুক্তিসংগ্রামকে ভিত্তি করে বাঙালি জাতিসত্তার বৈপ্লবিক বিকাশও ঘটেছে। বাংলা ভাষার মর্যাদা প্রতিষ্ঠার জন্যে সংগ্রামে পূর্ব বাংলার মুক্তিসংগ্রামের সূত্রপাত এবং বাংলা ভাষা এখানে পূর্ব বাংলায় জাতিসত্তার মূল প্রাণোপকরণ হিসেবে সামনে এসেছে। যে কোন ভাষার জাতিগত রূপটাই প্রধান, এর শ্রেণিরূপ গৌণ থাকে। এই কারণে বাংলা ভাষার সংগ্রাম ঔপনিবেশিকতাবিরোধী সংগ্রামে নিয়োজিত বিভিন্ন নিপীড়িত শ্রেণিকে একত্রিত রাখার ব্যাপারে একটা বিশেষ ভূমিকা পালন করেছে।

তবু পূর্ব বাংলার বিশেষ বিশেষ শ্রেণি মুক্তিসংগ্রামে বিশেষ বিশেষ ভূমিকা পালন করেছে শ্রেণিগত ভাবেও। মুক্তিসংগ্রামের পর্যায়ে পর্যায়ে পূর্ব বাংলার শ্রেণি-সজ্জা কিছুটা নতুন করে বিন্যস্ত হয়েছে এবং আগামী দিনে এ দিকটা আরও স্পষ্ট হয়ে বেরিয়ে আসবে। বৈপ্লবিক মুক্তিসংগ্রামে ব্রতী মানুষের কার্যকারিতা তার শ্রেণিসত্তার তীব্রতা এবং সংগঠন শক্তির মাধ্যমে চূড়ান্তরূপে প্রকাশ পেতে পারে। সামগ্রিকভাবে অন্যান্য সংগ্রামী শ্রেণির সঙ্গে মিলিত হয়ে সংগ্রাম করার ক্ষেত্রেও এটা সত্য। শ্রমিক ও কৃষকরা নিজ নিজ শ্রেণি সংগঠনের মারফত সংগ্রামে না নামলে সেই সংগ্রামকে সম্মিলিত করার ক্ষেত্রেও সঠিক ও পূর্ণ শক্তি জোগাতে পারে না। শ্রমিক ও কৃষকের নিজস্ব সচেতন শ্রেণিসংগঠন মুক্তিসংগ্রামে ব্রতী জাতিকে দুর্বল না করে শক্তিশালী করে। পূর্ব বাংলার ক্ষেত্রেও এ সত্য প্রযোজ্য। খুব বেশি করেই প্রযোজ্য এবং প্রমাণিত।

সামগ্রিকভাবে দেখতে গেলে দেখা যাবে, পূর্ব বাংলার মুক্তিসংগ্রামের লক্ষ্য নিরূপণ করতে গিয়ে যখনই এক একটি দফা রচিত হয়েছে তখনই জনগণের বিভিন্ন শ্রেণির বিশেষ বিশেষ চাহিদাগুলোকে বিন্যস্ত করা হয়েছে এসব দফায়। কারণ, এই বিন্যাসের

মধ্য নিয়ে জাতীয় মুক্তিসংগ্রামের সনদে প্রত্যেকটি সংগ্রামী শ্রেণির অংশীদারিত্বকে দেবার চেষ্টা হয়েছে স্বীকৃতির একটা সুস্পষ্ট রূপরেখা।

১৯৫৪ সালে পূর্ব বাংলায় তদানীন্তন সমস্ত সরকার-বিরোধী দলকে নিয়ে সাধারণ নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতার জন্যে যে যুক্তফ্রন্ট গঠিত হয়েছিল, তার সনদ হিসেবে রচিত হয়েছিল একুশ দফা। এই একুশ দফার দিকে নজর দিলেই আমরা দেখতে পাব, কিভাবে সামগ্রিকভাবে পূর্ব বাংলার সমস্ত নির্যাতিত মানুষের এবং বিশেষভাবে বিভিন্ন সংগ্রামী শ্রেণির অধিকার ও প্রয়োজন-সংক্রান্ত দাবিকে সন্নিবেশিত করা হয়েছিল।

একুশ দফার মূল ছকটিকে নিম্নোক্ত চুম্বকে সাজিয়ে দেওয়া যায়ঃ

(১) পূর্ণ প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন। দেশরক্ষা, পররাষ্ট্র দফতর এবং মুদ্রা বাদে অন্যান্য সকল বিষয় প্রাদেশিক দায়িত্বে।

(২) সেনাবাহিনীর পরিচালকমণ্ডলী এবং নৌ-দফতরের অবস্থান করাচি থেকে পূর্ব বাংলায় স্থানান্তরিত হবে এবং পূর্ব বাংলায় অস্ত্র কারখানা স্থাপন করা হবে।

(৩) বাংলা হবে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা। প্রাথমিক শিক্ষা হবে বাধ্যতামূলক। শিক্ষার মাধ্যম হবে মাতৃভাষা।

(৪) বিনা ক্ষতিপুরণে জমিদারি স্বত্বের উচ্ছেদ করা হবে। বাড়তি জমি ভূমিহীন কৃষকের মধ্যে বণ্টন করা হবে। যুক্তিসঙ্গত হারে খাজনার পরিমাণকে নামিয়ে আনা হবে। সার্টিফিকেট প্রথা (অর্থাৎ ঋণের দায়ে জমি নিলাম) রহিত করা হবে।

(৫) কৃষি সমবায় স্থাপন। জলসেচ ব্যবস্থার উন্নয়ন। কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি করে খাদ্য সমস্যার সমাধান। দুর্ভিক্ষের চিরন্তন ভীতি দূর করা।

(৬) পাট ব্যবসা জাতীয়করণ। পাটচাষীদের পাটের ন্যায্যমূল্য প্রদান। ফটকাবাজারী বন্ধ করা।

(৭) পূর্ব বাংলার শিল্পায়ন। লবণ উৎপাদন বৃদ্ধি। ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের অবস্থার উন্নতি সাধন।

(৮) প্রশাসনযন্ত্রের গণতন্ত্রীকরণ। মৌলিক অধিকারের নিশ্চয়তা বিধান। নিরাপত্তা আইন প্রত্যাহার। রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি, বিচার বিভাগ ও শাসন বিভাগের পৃথককরণ। শরণার্থীদের (মোহাজের) পূর্ণ অধিকার প্রদান এবং তাদের অবস্থার উন্নতি সাধন।

(৯) দুর্নীতি উচ্ছেদ।

(১০) উচ্চপদস্থ এবং নিম্নপদস্থ সরকারি কর্মচারীদের বেতনের হারের পুনর্বিন্যাস এবং তারতম্য হ্রাস।

(১১) মন্ত্রীদের বেতন এক হাজার টাকার বেশি হবে না।

(১২) আই.এল.ও-এর বিধান-অনুযায়ী শ্রমিকদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক অধিকারসমূহের নিশ্চয়তা বিধান।

উপরিউক্ত সনদে দফাগুলি থেকে বুঝতে পারা যায়, মোটামুটি চারটি শ্রেণির দাবিকে এতে বিশেষভাবে সামনে রাখা হয়েছিলঃ যথা (১) কৃষক, (২) জাতীয় বুর্জোয়া বা উদীয়মান স্থানীয় শিল্পপতি ও ব্যবসায়ী, (৩) শ্রমিক, (৪) মধ্যবিত্ত। এই শ্রেণিগুলির ভূমিকার একটা বিশ্লেষণ এই সূত্রে করা যেতে পারেঃ

(১) কৃষক-প্রধান বাংলাদেশের বিশেষ করে দরিদ্র ও ভূমিহীন চাষীরাই যে কৃষক-সমাজের অপরিমেয় অধিকাংশ এবং পূর্ব বাংলার মুক্তি আন্দোলনে বৈপ্লবিক গতিবেগ সৃষ্টি করার ব্যাপারে দরিদ্র এবং ভূমিহীন চাষীরাই যে গ্রামাঞ্চলে মূল রাজনৈতিক শক্তি, এ সত্য একুশ দফার একাধিক ধারায় প্রকাশ পেয়েছিল। ঔপনিবেশিক শাসকচক্রের প্রবঞ্চক ভূমিহীন বা কৃষকনীতির বিরুদ্ধে সংগ্রাম একুশ দফায় দরিদ্র ও ভূমিহীন চাষীর পক্ষপাতী প্রস্তাব প্রণয়নে সহায়ক হয়েছিল। ঔপনিবেশিক শাসকচক্রের মধ্যে প্রাধান্য ছিল বৃহৎ জায়গীরদারদের ও জমিদারদের। পূর্ব বাংলায় ১৯৫০ সালে মধ্যস্বত্ব বিলোপের আইন জারী করে যে জমিদারি স্বত্ব ক্রয়ের ব্যবস্থা হয় তাতে ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থার সঙ্গে ১০০ বিঘা পর্যন্ত সর্বোচ্চ মালিকানা নির্ধারিত করা হয়েছিল। এ আইন ছিল ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগ সরকারের। অপরদিকে সরকার-বিরোধী দলগুলির মধ্যে ধনী কৃষক ও জোতদারদের প্রতি নির্দিষ্ট শত্রুতা না থাকলেও তারা প্রধানত মুসলিম লীগের জোতদার-প্রবণ মনোভাবের বিপরীত মেরু থেকেই কৃষক সমস্যাকে দেখতে চেষ্টা করে। এই কারণেই তারা দরিদ্র ও ভূমিহীন চাষীদের দাবিকে সামনে আনে।

এখানে প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করে রাখা যেতে পারে যে, কায়েমি স্বার্থবাদী চক্রের মুখপাত্র মুসলিম লীগ সরকার ১০০ বিঘা পর্যন্ত সর্বোচ্চ মালিকানার দফা-সমন্বিত জমিদারি স্বত্ব ক্রয় আইনের প্রয়োগকেও স্থগিত রেখেছিল এবং পরবর্তীকালে সামরিক শাসনের আমলে ১০০ বিঘাকে ৩০০ বিঘাতে উন্নীত করে নিয়েছিল।

ঔপনিবেশিক কায়েমি স্বার্থবাদী শাসক ও শোষকচক্র এভাবে গ্রামাঞ্চলে একটা বিশেষ ভূমিস্বার্থবাদী (সামন্তবাদী) গোষ্ঠীকে বাঁচিয়ে রাখতে চেষ্টা করেছে নিজেদের অবস্থানকে পূর্ব বাংলার গ্রামাঞ্চলে শক্ত করে রাখার উদ্দেশ্য নিয়ে। পরবর্তীকালে আইয়ুব খানের আমলে বিশেষ ভূম্যধিকারী স্বার্থবাদীদের পোষণ করার ব্যবস্থা মৌলিক গণতন্ত্রের পরগাছা প্রথা দ্বারা পাকাপাকি করার চেষ্টা হয়। আইয়ুব খানের আমলে বিত্তহীন চাষীর সংখ্যা এই কারণেই বেড়ে যায় এবং বিত্তবান ধনী কৃষক ও জোতদারের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। উপরিউক্ত সামন্তবাদী শোষণ ব্যবস্থারই আরেকটি দিক, পূর্ব বাংলার কৃষকের গায়ের রক্ত জল করে তৈরি পাটের উপর লাহোর করাচি রাওয়ালপিন্ডির ঔপনিবেশিক চক্রের পুঁজিবাদী খপ্পর। কাঁচা পাটের ব্যবসা এবং পাট শিল্পে পুঁজি নিয়োগ করে শতকরা দুই শতাংশ মুনাফা লুণ্ঠনের ব্যবস্থা করেছে এবং শাসক-শোষক সাম্রাজ্যবাদী চক্র তাদের ইঙ্গ-মার্কিন পৃষ্ঠপোষকদের সাহায্যে।

ঔপনিবেশিক চক্রের পুঁজিবাদী সামান্তবাদী বিধিব্যবস্থার বিরুদ্ধে পূর্ব বাংলার অপরিমেয় অধিকাংশ নিঃস্ব রিক্ত দরিদ্র কৃষকের সুদূরপ্রসারী বৈপ্লবিক অভ্যুত্থানের প্রাথমিক মৌলিক সনদ হিসেবে রচিত হয়েছিল একুশ দফা।

পরবর্তীকালে পূর্ব বাংলার মুক্তিসংগ্রাম আরও কয়েকটি সনদ রচনা করেছে। যেমন, ১৯৬২-৬৩ সালে আইয়ুব-বিরোধী জাতীয় গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট বা এন.ডি.এফ-এর ১৭ দফা, ১৯৬৬ সালে শেখ মুজিবুর রহমানের ৬ দফা এবং ১৯৬৮-৬৯ সালে সংগ্রামী ছাত্র-সংস্থাসমূহের ১১ দফা। এই তিনটি সনদের প্রথমটিতে পূর্ণ গণতান্ত্রিক বিধিব্যবস্থার দাবি, দ্বিতীয়টিতে পূর্ব প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন দাবি এবং তৃতীয়টিতে সামন্তবাদী পুঁজিবাদী সাম্রাজ্যবাদী শাসনের অবসান করে পূর্ব বাংলার জনগণের

শোষণমুক্তির একটি ছোটখাট পূর্ণাঙ্গ কর্মসূচির প্রাথমিক খসড়া দাখিল করা হয়। পরবর্তী দু'টি সনদই একুশ দফা সনদের একার্থে পরিপূরক। যেমন দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, একুশ দফার মধ্যে সরাসরিভাবে মার্কিন কিংবা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করার কথা লিপিবদ্ধ হয় নি, যদিও সাম্রাজ্যবাদী কবজা থেকে বেরিয়ে আসার জন্য একুশ দফার পাশাপাশি বিভিন্ন সংগ্রামী দলিলপত্র তৈরি হয়েছিল। শেষ পর্যন্ত ১১ দফা সনদে সরাসরি সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী কর্মসূচি অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

একুশ দফার ভিত্তিতেই পূর্ব বাংলার মুক্তিসংগ্রামের পক্ষভুক্ত বিভিন্ন সংগ্রামী দলের কর্মসূচি প্রণীত হয়েছে একাধিক্রমে। সুতরাং, নিঃস্ব রিক্ত দরিদ্র কৃষক শ্রেণি ১৯৪৮ থেকে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত মুক্তিসংগ্রামের প্রতিটি পর্যায়ে ঔপনিবেশিক শাসক ও শোষকচক্রের বিরুদ্ধে পুঞ্জিভূত বৈপ্লবিক শক্তি হিসেবে কাজ করে এসেছে, এর মধ্য দিয়ে ক্রমাগত প্রসার লাভই করে এসেছে। এই বিরাট কৃষকশক্তি শত বঞ্চনালাঞ্ছনার মধ্যেও নিঃশেষিত হয়ে যায় নি। বরং কৃষক-শক্তি একদিকে যেমন পূর্ণ গণতন্ত্র এবং পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের সংগ্রামের মূল শক্তিভাণ্ডার বা রিজার্ভ হিসেবে কাজ করে এসেছে, তেমনি সঙ্গে সঙ্গে পুঁজিবাদ-সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী কার্যক্রমে ও চিন্তা চেতনায় অংশীদার হওয়ার দরুণ সাম্যবাদী ও সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবী কার্যক্রমেরও মূল সম্ভাব্য সহযোগী হিসেবে গড়ে উঠেছে। অর্থাৎ কৃষক বিপ্লব যে জাতীয় মুক্তিসংগ্রামে জাতীয় বুর্জোয়া বা স্থানীয় পুঁজিপতি ও ব্যবসায়ীগোষ্ঠীর হাতকে শক্তিশালী করেই ক্ষান্ত থাকে নি, বরং জাতীয় মুক্তি সংগ্রামকে শ্রমিক কৃষকের পূর্ণাঙ্গ মুক্তির দিকেই অগ্রসর করে নিয়ে এসেছে, ১৯৪৮ থেকে ১৯৭১ সালের ঘটনাবলিতে তারই গতিধারা পরিস্ফুট।

এখানে আরও একটা কথা মনে রাখলে ভাল হয়। পূর্ব বাংলার ১৯৪৭ সালের পূর্বেকার বহু সংগ্রামের ঐতিহ্য নিয়ে গড়ে উঠেছিল কৃষক আন্দোলন ও সংগঠন। সাম্রাজ্যবাদ-সামন্তবাদ পুঁজিবাদের সাবেক প্রতিভু ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের শৃঙ্খল ছিন্ন করার সংগ্রামে পূর্ব বাংলার নির্যাতিত কৃষক সমাজ যে বৈপ্লবিক অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিল, তা পূর্ব বাংলার মুক্তিসংগ্রামে নিয়োজিত হয়েছে।

(২) পূর্ব বাংলার উঠতি জাতীয় বুর্জোয়া বা স্থানীয় শিল্পপতি ব্যবসায়ী অথবা সম্ভাব্য শিল্পপতি ব্যবসায়ীরা পূর্ব বাংলার মুক্তিসংগ্রামের প্রতিটি পর্যায়ে সনদ নির্ণয়ে কমবেশি উদ্যোগী ভূমিকা নিয়ে এসেছে। যে বিরোধ এর মূলে কাজ করেছে তা একই সঙ্গে শ্রেণিগত ও দেশগত। পূর্ব বাংলার তথা বাংলাদেশের শিল্পায়নকে স্তব্ধ করে রেখে দিয়েছে রাওয়ালপিন্ডি-করাচি-লাহোরের ঔপনিবেশিক শোষক ও শাসকচক্র। প্রধানত, পূর্ব বাংলার পাট রপ্তানির টাকায় অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রায় করাচি-লাহোর-রাওয়ালপিন্ডি-ইসলামাবাদের আওতায় গড়ে তোলা হয়েছে আধুনিক শিল্পব্যবস্থা। এই বঞ্চনা এবং সম্পদ অপহরণের বিরুদ্ধে পূর্ব বাংলার সম্ভাব্য শিল্পপতি ও ব্যবসায়ীরা শ্রেণিগতভাবে বিক্ষোভ প্রকাশ করেছে এবং এই বঞ্চনা আর শোষণের অবসান করে পূর্ব বাংলার শিল্পায়নের দাবিতে শ্রেণিগত তাগিদে এগিয়ে এসেছে দেশগত মুক্তির সংগ্রামী কার্যক্রমে। পূর্ব বাংলার তথা বাংলাদেশের শিল্পায়নের তাগিদ পূর্ব বাংলার মুক্তিসংগ্রামের সমস্ত কার্যক্রমের অন্যতম মৌলিক তাগিদ। নিপীড়িত জনগণের সমস্ত শ্রেণি ও স্তরের তথা কৃষক, শ্রমিক আর মধ্যবিত্তেরও দারিদ্রের চক্র থেকে বেরিয়ে

আসার পথ হিসেবেই শিল্পায়নের তাগিদ চিহ্নিত হয়েছে বিভিন্ন সংগ্রামী সনদে। পূর্ব বাংলার শিল্পায়নের কার্যক্রম একুশ দফার অন্যতম দফা, ছয় দফার কেন্দ্রীয় দফা, এগারো দফার অন্যতম দফা। জাতীয় মুক্তির এই বিকাশমান দফাগুলিতে স্বাধীনতার উপকরণগত ভিত্তি তৈরির ব্যাপারে পূর্ব বাংলার জনগণের বিভিন্ন শ্রেণি ও স্তর একটা সম্মিলিত কার্যক্রমে দাঁড়াতে পেরেছে। পূর্ব বাংলার জাতীয় বুর্জোয়ার অবস্থান রয়েছে এর মধ্যে।

পূর্ব বাংলার শিল্পায়নকে ঔপনিবেশিক দখলদাররা সরকারিভাবে ঠেকিয়ে রেখে এসেছে। অপরদিকে পূর্ব বাংলার স্থানীয় শিল্পপতি ও ব্যবসায়ীরা ব্যক্তিগত উদ্যোগে বিভিন্নভাবে সুযোগ সৃষ্টির চেষ্টা করেছে স্থানীয় পুঁজির ভিত্তিতে মিল কারখানা গড়ে তুলে। এই স্থানীয় পুঁজি-নিয়োগকারী জাতীয় বুর্জোয়ারা পূর্ব বাংলার পরনির্ভরতা কাটিয়ে ওঠার অর্থনৈতিক ভিত্তি স্থাপনের তাগিদের ব্যাপারে এদিক দিয়ে সহায়ক শক্তি হিসেবেই কাজ করে এসেছে। এবং এই কারণেই মুক্তিসংগ্রামের সনদ তৈরির ব্যাপারে জাতীয় বুর্জোয়ারা সামগ্রিকভাবেও কথা বলতে চেষ্টা করেছে এবং বিভিন্ন পর্যায়ে গণ-অভ্যুদয়গুলিতে শরিক হয়েছে।

(৩) তৃতীয় যে শ্রেণিশক্তি পূর্ব বাংলার মুক্তিসংগ্রামের অন্যতম মূলধারা হিসেবে কাজ করে এসেছে, সে হচ্ছে সংগ্রামী শ্রমিকশ্রেণী।

পূর্ব বাংলার সংগ্রামী শ্রমিকশক্তির বিকাশকে দু'টি পর্যায়ে ভাগ করে নেয়া যায়।

১৯৪৭ সালের পূর্বেই গড়ে উঠেছিল পূর্ব বাংলায় একটা শক্তিশালী শ্রমিক আন্দোলন, যা প্রধানত ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসন থেকে দেশকে মুক্ত করার সংগ্রামে নিয়োজিত ছিল। সুতাকল, রেল, চা বাগান ও স্টিমারের শ্রমিকেরা গড়ে তুলেছিল শক্তিশালী সংস্থা।

কিন্তু প্রথমত ১৯৪৭ সালে দেশবিভাগের টানাপোড়েনে এইসব সংস্থার ভিতগুলি বেশ কিছুটা নড়ে গিয়েছিল। দ্বিতীয়ত, পশ্চিম পাকিস্তানের ঔপনিবেশিকগোষ্ঠী পশ্চিমে পূর্বে তাদের প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠার জন্যে এবং পূর্ব বাংলার অর্থনৈতিক বুনিয়াদ ভেঙ্গে দেবার জন্যে শ্রমিক শক্তির উপর হেনেছিল প্রচণ্ড আঘাত।

ইতিহাসের দ্বন্দ্বাত্মক গতিধারায় পূর্ব বাংলার মুক্তিসংগ্রামের ক্ষেত্রে একটা বিচার্য সত্য এই যে, পশ্চিম পাকিস্তানের লাহোর-করাচি-রাওয়ালপিন্ডির পুঁজিপতি-জায়গীরদার-সাম্রাজ্যবাদীগোষ্ঠীর প্রতিপক্ষ হিসেবে পূর্ব বাংলায় জাতীয় বুর্জোয়া সংগঠিত হওয়ার পূর্বে সংগ্রামী সংগঠিত কৃষকদের মতো শ্রমিকরাই ছিল সংগঠিত সংগ্রামী শক্তি। এই কারণে পূর্ব বাংলার সংগ্রামী শ্রমিকশক্তি উপরিউক্ত নয়া ঔপনিবেশিক শাসক ও শোষকচক্রের বিষ নজরে পড়েছিল। সংগ্রামী শ্রমিকদের উপর নেমে এসেছিল প্রচণ্ড দমননীতি।

শ্রমিকশ্রেণী অবশ্য হাল ছাড়ে নি। শ্রমিকশ্রেণী পূর্ব বাংলার মুক্তিসংগ্রামের প্রত্যেকটি পর্যায়ে ক্রমবর্ধমান শক্তি নিয়ে এগিয়ে এসেছে। ১৯৫৪ সালেই শ্রমিকশ্রেণী তার সংগ্রামী সংগঠিত শক্তি নিয়ে মুক্তিসংগ্রামের পুরোভাগে এসে দাঁড়িয়েছিল। একুশ দফায় শ্রমিক-সংক্রান্ত দফাতেই এর প্রমাণ পাওয়া যায়। পরবর্তী এগারো দফায় রয়েছে এই প্রমাণেরই ফলশ্রুতি।

শ্রমিকশ্রেণী তার নিজস্ব শ্রেণিগত দাবি বা অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক দাবির সংগ্রাম চালিয়েও পূর্ব বাংলা তথা বাংলাদেশের সাধারণ মুক্তিসংগ্রামকে শক্তি জুগিয়ে এসেছে।

পূর্ব বাংলার শ্রমিকশ্রেণীর সঙ্গে কৃষক সমাজের নির্যাতিত স্তরগুলির সে সংযোগ রয়ে গিয়েছে, সেটি তার বৈপ্লবিক শ্রেণিগত ভূমিকা পালনের ব্যাপারে বিশেষ ভূমিকা পালন করতে বাধ্য।

পূর্ব বাংলা অতীতে তাঁতের দেশ ছিল। ইংরেজের আমলেও মোটা কাপড় বোনা হতো। ১৯৪৭ সালে পূর্ব বাংলা সামান্যই যন্ত্রশিল্প পেয়েছিল, তবে তাঁতে সে সমৃদ্ধ ছিল। পশ্চিম পাকিস্তানের কায়েমি স্বার্থবাদী চক্র তাদের মিলের কাপড় পূর্ব বাংলায় চালান দেবার জন্যে তাঁতগুলির সুতা সরবরাহে বিঘ্ন সৃষ্টি করে। এর ফলে ক্রমান্বয়ে গ্রাম ছেড়ে তাঁতিরা শহরের বস্তিতে শ্রমিক হয়েছে। জমি হারিয়েও ছোট ছোট চাষীরা ভিড় করেছে পশ্চিমী টাকার তৈরি পাটকলে। পূর্ব বাংলার শ্রমিকশ্রেণীর অধিকাংশই ১৯৫০-৫১ সালের পর গ্রামীণ সমাজ থেকে এইভাবে বেরিয়ে এসেছেন। কৃষি-কাজের সঙ্গে এঁদের সম্পর্ক ১৯৭১ সালেও নিকট থেকেছে। এদিক দিয়ে যন্ত্রশিল্পে জীবনের অভিজ্ঞতা এখনও পূর্ব বাংলার শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে গভীরভাবে বসতে পারে নি এবং এই কারণে শ্রমিক শ্রেণির ঐতিহাসিক বৈপ্লবিক সচেতনতা গড়ে ওঠার ব্যাপারে অসম্পূর্ণতার দরুণ অসুবিধা থেকে যাবার কথা। অপরদিকে অবশ্য কৃষক-শ্রমিক মৈত্রীর ব্যাপারে শ্রমিক-শক্তির সামাজিক নৈকট্যের দরুন সুবিধা হবারই কথা।

পূর্ব বাংলার মুক্তিসংগ্রামে ছড়িয়ে থাকা কোটি কোটি কৃষকের সমাজকে একটা সংগ্রামী অগ্রফলক জোগানোর ব্যাপারে শ্রমিকশক্তি বিভিন্ন সময়ে উদ্যোগ নিয়ে কাজ করেছে এবং আগামীকালেও করতে পারবে।

ঔপনিবেশিক শাসক ও শোষকচক্রের বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে পূর্ব বাংলার শিল্পায়নের সংগ্রামে শ্রমিকশ্রেণী জাতীয় বুর্জোয়ার সহযোগী। কিন্তু পুঁজিপতি ব্যবসায়ী বুর্জোয়ার সঙ্গে শ্রমিকশ্রেণীর একটা সহজাত ঐতিহাসিক বিরোধকেও হিসেবের মধ্যে রাখতে হবে ভবিষ্যৎকে বোঝাবার ব্যাপারে।

লাহোর-করাচি-রাওয়ালপিন্ডির ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যবাদী চক্রের বিরুদ্ধে আপোষহীন মুক্তিসংগ্রামের পটভূমিতে এ বিরোধ পূর্ব বাংলার মুক্তিসংগ্রামে, প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে নি এবং করবে না। কিন্তু পূর্ব বাংলার মুক্তির অর্থই হবে সর্বপ্রকার শোষণ থেকে মুক্তি এবং এ কারণেই শ্রমিকশক্তি জাতীয় বুর্জোয়ার তুলনায় পূর্ব বাংলার মুক্তিসংগ্রামের নেতৃত্ব করতে এবং মুক্তিসনদ রচনায় অধিকতর উদ্যোগী এবং সচেষ্ট হবে এটা অনিবার্য।

(৪) মধ্যবিত্তশ্রেণীর মধ্যে ফেলা যেতে পারে, কৃষক শ্রমিক এবং জাতীয় বুর্জোয়া ছাড়া সমাজের বাকি অংশের মধ্যে শহর ও গ্রামাঞ্চলের নিম্নবিত্ত ও মাঝামাঝি ধরনের বিভিন্ন বৃত্তিজীবীদের এবং প্রধানত বুদ্ধিজীবীদের।

পূর্ব বাংলার জনগণের মধ্যবিত্ত বা নিম্নবিত্ত বুদ্ধিজীবী অংশ শ্রমিকশ্রেণীর মতো ১৯৪৭ সালের অনেক আগেই নিজেদের শ্রেণিগত বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে সচেতন হয়ে উঠেছিল। মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবীদের একাংশ প্রথম মহাযুদ্ধোত্তরকালে মুসলিম হিসেবে নিজেদের একটা স্বতন্ত্র অস্তিত্বের চেতনায় রূপরেখা ধরে এগিয়ে আসতে আসতে

অবশেষে লাহোরের পাকিস্তান প্রস্তাবে উপনীত হলেও সেখানে ভারতীয় উপমহাদেশের মুসলিম আবাসভূমির রাষ্ট্রীয় সংজ্ঞা নিরূপণ করতে গিয়ে পূর্বাঞ্চল বা বাংলাদেশের একটা স্বতন্ত্র সার্বভৌমত্বের ছকও নির্ধারিত করেছিল।

এখানে প্রমাণিত হয় মুসলিম মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবীদের দূর চিন্তার সক্ষমতা অথবা সম্ভাব্যতা।

১৯৪৮-৪৯ সালে পূর্ব বাংলার মুক্তিসংগ্রামের রূপরেখা নির্ণয়ের প্রাথমিক দায়িত্বভারও গ্রহণ করে উপরিউক্ত মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবীগোষ্ঠী।

মুক্তিসংগ্রামের প্রথম পর্যায়ে মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবী-শ্রেণি থেকেই আসে পূর্ব বাংলার নয়া ইতিহাস সৃষ্টিকারী ছাত্রসমাজ, যারা '৪৮ এবং '৫২ সালের ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে '৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের সূত্রপাত পর্যন্ত প্রত্যেকটি গণ-অভ্যুদয়ে কার্যকর নেতৃত্ব দিয়েছে। ইতোমধ্যে ক্রমে ক্রমে পূর্ব বাংলার ছাত্রসমাজের শ্রেণিসজ্জার কাঠামোর পরিবর্তন রয়েছে বলেই ছাত্র-ছাত্রীরা মুক্তিসংগ্রামের বৈপ্লবিক নেতৃত্বে অধিষ্ঠিত রয়েছে প্রতিটি ধাপে অনায়াসেই। ছাত্রসমাজে কৃষক ও অন্যান্য মেহনতী ঘরের ছেলেমেয়েদের অনুপাত বৃদ্ধি পাওয়াতেই ঘটনাটা ঘটেছে।

কিন্তু শ্রেণিকাঠামোর দিক দিয়ে পরিবর্তন এলেও ছাত্র সমাজের নেতৃত্বে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবীদের ছেলেমেয়েদেরই প্রাধান্য রয়েছে নীতিগত ও কর্মসূচিগত রূপরেখা নির্ণয়ের ক্ষেত্রে। শ্রমিক কৃষকের মতো বুকের রক্ত ঢেলেই মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবীদের ছেলেমেয়েরা এই প্রধান্যের দাবিদারও হতে পেরেছে।

মধ্যবিত্তশ্রেণীর বুদ্ধিজীবী অংশ থেকেই এসেছে, পূর্ব বাংলার আরেকটি উদ্যোগী সংগ্রামী ধারার বাহক-সরকারি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের কর্মচারীবৃন্দ, যাঁরা একদিকে যেমন ১৯৪৮ সালেও যথাযোগ্য বেতন ও মর্যাদার দাবিতে ধর্মঘট করে পথে নেমেছিলেন, তেমন ১৯৭১ সালের ঐতিহাসিক মার্চ মাসে অসহযোগ সংগ্রামে সর্বস্ব পণ করে শরিক হতে দ্বিধা করেন নি। বিশেষ করে ১৯৬৮ সালের জানুয়ারি, ফেব্রুয়ারির বৈপ্লবিক গণ-অভ্যুদয়ে ঢাকা নগরীর গণ-উত্থানগুলিতে ছাত্রসমাজ এবং শ্রমিকদের সঙ্গে সঙ্গে সরকারি বেসরকারি কর্মচারীরা এমনভাবে শরিক হয়েছিলেন যে, দেখে মনে হয়েছে, তারাও সর্বহারা শ্রমিকশ্রেণীরই অংশ, "শৃঙ্খল ছাড়া তাঁদের আর কিছু হারাবার নেই।"

মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবীদের মধ্য থেকেই বেরিয়ে এসেছেন পূর্ব বাংলার মুক্তিসংগ্রামের মধ্য দিয়ে গড়ে ওঠা বিভিন্ন সংগ্রামী রাজনৈতিক দলের সংগঠকবৃন্দ। এই মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবী অংশ থেকেই বেরিয়ে এসেছেন পূর্ব বাংলার মুক্তিসংগ্রামে নব নব দিগন্তের সন্ধানী ও সৃজনশীল সংগ্রামী লেখক-লেখিকা ও শিল্পীরা। এই মধ্যবিত্তরাই সৃষ্টি করেছে পূর্ব বাংলার সংগ্রামী সাহিত্য শিল্পকলা, রাজনৈতিক তত্ত্ব। এই মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবী অংশেই বাংলায় নারী-সমাজকে দিয়েছে সর্বাঙ্গীন মুক্তির ছাড়পত্র, যে-কারণে পূর্ব বাংলার মুক্তিসংগ্রামের সমস্ত পর্যায়ে নারী সমাজ একটি বিশিষ্ট সহায়ক ভূমিকা গ্রহণ করতে পেরেছে।

মধ্যবিত্ত শ্রেণির দোদুল্যমান-চিন্তা একটি ঐতিহাসিক সত্য। একদিকে চরম আত্মত্যাগে মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত শ্রেণির ছেলেমেয়েরা ঝাঁপ দিতে দ্বিধা করে নি,

অপরদিকে প্রতিক্রিয়া যখন বাসা বেঁধেছে তখন মধ্যবিত্তদের একাংশ গতানুগতিক জীবনে আবদ্ধ থাকতে কিংবা আপোষরফার হাত ধরতে সাময়িকভাবে হলেও ইতস্তত করে নি। অন্তত এ ধরনের বুদ্ধিজীবীদের মনের কথা যাই থাক, বাইরে থেকে সে কথাই মনে হয়েছে। কিন্তু পূর্ব বাংলার মুক্তিসংগ্রামের চরিত্র হচ্ছে এই যে, কোন সংগ্রামী শ্রেণিরই দ্বিধা-সঙ্কোচ দীর্ঘস্থায়ী হয় নি। মধ্যবিত্ত শ্রেণির দ্বিধা-সঙ্কোচও দীর্ঘস্থায়ী হয় নি। বস্তুত পূর্ব বাংলার মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবীশ্রেণী একটি সম্প্রসারণশীল সমাজ। এর সংখ্যাবৃদ্ধি ঘটে এসেছে কোন কোন সময়ে জ্যামিতিক হারে। শিল্পায়নের দ্বার রুদ্ধ থাকার দরুন, শিক্ষার বিস্তারের দুর্নিবার তাগিদ নিয়ে গ্রামীণ সমাজের মধ্য থেকে মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবী সমাজ শ্রমিকশ্রেণীর তুলনায় পরিমাণগতভাবে অনেক বেশি বেড়েছে। এ অবস্থায় পূর্ব বাংলার মুক্তিসংগ্রামে মধ্যবিত্ত শ্রেণির ভূমিকা বরাবরই প্রাধান্য বিস্তার করে এসেছে। আগামী দিনেও মুক্তিসংগ্রামকে পুরোপুরি সার্থক করে তোলার কাজে মধ্যবিত্ত শ্রেণি তার এযাবৎকালের বৈপ্লবিক উপাদানগুলিকে রক্ষা করতে পারলে শ্রমিক ও কৃষকদের সহযোগী হিসেবে নেতৃস্থানীয়দের মধ্যেই থেকে যাবে।

অবশ্য এ ভূমিকা বজায় রাখার জন্য মধ্যবিত্ত শ্রেণির প্রগতিশীল অগ্রফলককে সর্বদাই সজাগ ও উদ্যোগী থাকতে হবে এবং চিন্তাচেতনাকে অবিকৃতভাবে প্রসারিত করে নিয়ে যেতে হবে।

৫. জাতীয় মুক্তিসংগ্রামে জাতীয় ঐতিহ্যের উপাদান

পূর্ব বাংলার জাতীয় মুক্তিসংগ্রামের বাংলাদেশ তথা পূর্ব বাংলার জাতীয় ঐতিহ্যের উপাদান সম্পর্কিত প্রশ্নটি মূলত বাঙালিত্বের প্রশ্ন।

একে বাংলাদেশের অথবা বাঙালি জাতির সংস্কৃতির প্রশ্ন হিসেবেও উপস্থিত করা যেতে পারে। এখানে দুই বাঙালি জাতির সংস্কৃতি পূর্ব বাংলার মুক্তিসংগ্রামের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত হয়েছে।

প্রথমত, বাংলাভাষা এবং এই ভাষায় রচিত হাজার বছরের সাহিত্য পূর্ব বাংলার বাসিন্দাদের পৃথক রাজনৈতিক জাতীয় সত্তা দেবার ব্যাপারে তৈরি উপাদান হিসেবে কাজ করেছে।

দ্বিতীয়ত, একটি বিশেষ এলাকায় বিশেষ জাতিগত বৈশিষ্ট্য দাখিল করার ব্যাপারে হাজার হাজার বছরের পরিশীলিত সঞ্চয় এবং ভুবন-বিদিত ঐতিহাসিক স্মৃতি-বিজড়িত জাতিগত ঐক্যের উৎস হিসেবে কাজ করেছে বাঙালি সাংস্কৃতিক চেতনা।

প্রথমোক্তটি অর্থাৎ বিশেষ করে বাংলাভাষা ১৯৪৮ সালেই রাষ্ট্রনৈতিক সংগ্রামের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গরূপে সামনে এসেছে।

দ্বিতীয়টি, অর্থাৎ সংস্কৃতি-সংক্রান্ত বিষয়টি প্রথম দিকে তথাকথিত সাংস্কৃতিক মহলেই আবদ্ধ থেকেছে। পূর্ব বাংলার কোনো কোনো সংগ্রামী মহল থেকেও বেশ কিছুদিন পর্যন্ত সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকারের ব্যাপারটিকে রাজনৈতিক মুক্তিসংগ্রামের বাইরে রাখার প্রবণতা ঘটেছে। কিন্তু যে ঔপনিবেশিক শাসক ও শোষকচক্র পূর্ব বাংলাকে অর্থনৈতিক শোষণ ও রাজনৈতিক শাসনের জোয়ালে আবদ্ধ রাখার চেষ্টা করে এসেছে, তারাই যেমন বাংলাভাষাকে দমন করার এবং খর্ব করার চেষ্টা করে এসেছে,

তেমনি বাঙালি সংস্কৃতিকে দমন ও খর্ব করার চেষ্টা করে এসেছে এবং নিছক রাজনৈতিক মুক্তিসংগ্রামী মহলগুলিকে সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার রক্ষারও দায়িত্ব গ্রহণে বাধ্য করেছে।

বস্তুত, বাঙালি সংস্কৃতির চেতনা সুপ্ত অথবা স্বতঃস্ফূর্তভাবে প্রবাহিত হয়ে আসছিল গণ-মনে। এর মধ্যে অধিকাংশই ছিল চর্চার অভাবে বিস্মৃতির অন্ধকারে নিমজ্জিত। কিন্তু পূর্ব বাংলার মুক্তিসংগ্রাম যত বেশি এগিয়ে এসেছে, সংগ্রামী তত বেশি আত্মসচেতন হবার সঙ্গে সঙ্গে সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকারের প্রয়োজনীয়তা রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও দেখা দিয়েছে। তবে, আসল কথা পূর্ব বাংলার অধিবাসীবৃন্দের জাতিসত্তার স্বাধীন বিকাশের সংগ্রামে সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকারের বৈপ্লবিক উপকরণ হিসেবে কাজ করার সম্ভাবনাকে আঁচ করেছে প্রথমে বিপক্ষ ঔপনিবেশিক চক্র। তারা হামলা চালিয়েছে বাঙালি সংস্কৃতির যে-কোন রকমের অভিব্যক্তির উপর। উৎখাত করতে চেয়েছে তারা একান্ত বাঙালি জীবনযাপনের রীতিপদ্ধতিগুলিকে। ডলার সাম্রাজ্যবাদের সহযোগী ঔপনিবেশিক-চক্র ইসলামকে বাঙালি সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকারের বিরুদ্ধে দাঁড় করানোর চেষ্টা করেছে। ঔপনিবেশিক চক্র দুভাবেই এ চেষ্টা চালিয়েছে। প্রথমত পূর্ব বাংলার সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে ছাঁটাই করে রাওয়ালপিন্ডি লাহোর করাচির পোশাক পরানোর চেষ্টার মাধ্যমে এবং দ্বিতীয়ত পূর্ব বাংলার সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে গায়ের জোরে ধ্বংস করে দেওয়ার চেষ্টার মাধ্যমে। পূর্ব বাংলার মুক্তিসংগ্রামে ব্রতী সমস্ত স্তর ও শ্রেণি স্বাভাবিকভাবেই ঔপনিবেশিক চক্রের এই প্রচেষ্টাদ্বয়কে প্রতিহত করার জন্যে এগিয়ে এসেছে এবং এর মধ্যে দিয়ে সংস্কৃতির জন্যে সংগ্রাম এবং রাজনৈতিক মুক্তির জন্যে সংগ্রাম একই কার্যক্রমে অবিচ্ছেদ্যভাবে শরিক হয়েছে।

এখানে একটা কথা পরিষ্কার করে রাখা দরকার। বাঙালি সংস্কৃতির উত্তরাধিকারের ব্যাপারে পূর্ব বাংলার সাংস্কৃতির কর্মীরা হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে সচেষ্ট। ঔপনিবেশিক দখলদারেরা প্রচার করতে চেয়েছে যে, এটা হিন্দু বুদ্ধিজীবীদের সৃষ্টি অথবা কলকাতা বা ভারতের কাছ থেকে ধার করা জিনিস। কিন্তু বিগত যে ষাটের দশকে ভারত এবং পূর্ব বাংলার মধ্যে যে-কোন প্রকার চিন্তার লেনদেন পর্যন্ত প্রাচীর খাড়া করা হয়েছিল, সেই দশকেই বাঙালি জাতীয় সংস্কৃতির উত্তরাধিকারের বিষয়টি পেয়েছে পূর্ব বাংলাতে গভীরতম ও ব্যাপকতম চর্চা। দ্বিতীয়ত, বাঙালি সংস্কৃতির অভ্যুদয়ের প্রশ্নে বাইরের হিন্দু বুদ্ধিজীবীদের তৈরি করা কোন ফর্মার কথা উঠতেই পারে না, কারণ, যাঁরা খোলাখুলি বাঙালি সংস্কৃতির অনুশীলন করেছেন এবং 'ধর্মে মুসলমান এবং সংস্কৃতিতে বাঙালি' বলে নিজেদের দাখিল করতে বিন্দুমাত্র ইতস্তত করেন নি, তাঁরা পূর্ব বাংলার সেরা বুদ্ধিজীবী হিসেবে নিজ উদ্যোগেই এ কাজ করেছেন।

পূর্ব বাংলার বাঙালি জাতির যে নিজস্ব মনোজগতে দাঁড়াবার জায়গা রয়েছে, সেকথাটা সত্য হয়ে উঠেছে একদিকে যেমন রবীন্দ্রনাথের 'সোনার বাংলা' কিংবা জীবনানন্দ দাসের 'রূপসী বাংলা'তে, তেমনি হাজার বছরের ইতিহাসের হাঁড়িকুড়ি তৈজসপত্র অস্ত্রশস্ত্র আসবাব অলঙ্কারের সজীব উদ্ধারকার্যে। মুক্তিসংগ্রামের মনোজগত অনুভূতিগত ও উপকরণগত উভয় দিক দিয়েই সত্য হয়ে উঠেছে। আবেগ থেকে প্রমুক্ত

মহাস্থানগড় কিংবা ময়নামতী কিংবা সোনারগাঁর নিদর্শনগুলি গণ-রাজনীতির উপাদানও পূর্ব বাংলার মুক্তিসংগ্রামীদর হাতে তুলে দেবে নিশ্চয়।

স্বাধীন স্বার্বভৌম বাংলাদেশের রাজনৈতিক সামাজিক বিকাশ এর ফলে আরও বেশি গভীরতা পাবে ঐতিহ্যগতভাবে।

৬. পূর্ব বাংলার মুক্তিসংগ্রামে আন্তর্জাতিকতা

১৯৪০ সালে লাহোরে গৃহীত পাকিস্তান প্রস্তাবের ফলশ্রুতি হিসেবে ইতিহাসের দ্বন্দ্বাত্মক গতিপথে স্থাপিত পাকিস্তান রাষ্ট্রের অংশ হিসেবে পূর্ব বাংলা চিহ্নিত হয়েছিল ১৯৪৭ সালে। ইসলাম ও আরবের নাম করলেও প্রকৃতপক্ষে পশ্চিমী সাম্রাজ্যবাদীদের ধনবাদী সভ্যতার ধারক বাহক ছিল পশ্চিম পাকিস্তানের কায়েমি স্বার্থবাদী চক্র, কিন্তু মধ্যপ্রাচ্যের ইসলামিক দেশসমূহের প্রতি মুখে অন্তত ভ্রাতৃত্ব জানাতে হয়েছিল এই চক্রকে, সেদিক দিয়ে পঞ্চাশের দশকে উক্ত চক্র দাবার ঘুঁটি হিসেবে পূর্ব বাংলাকে দাখিল করেছিল মুসলিম মধ্যপ্রাচ্যে একটি মুসলিম অঞ্চল হিসেবে। পূর্ব বাংলার প্রাথমিক আন্তর্জাতিক সংযোগ ঘটেছিল এভাবেই।

কিন্তু এর মধ্যেই পূর্ব বাংলা সবচেয়ে বেশি ঘনিষ্ঠ হয়েছিল মোসাদ্দেকের ইরানের সঙ্গে। মধ্যপ্রাচ্যে ইরানের সেদিন সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী অগ্নি প্রজ্জলিত হয়েছিল। মোসাদ্দেক বিদেশি তেল কোম্পানিগুলিকে জাতীয় সম্পত্তি বলে ঘোষণা করেছিলেন। ইরানের জায়গীর-জমিদার পুঁজিপতিরা এতে প্রমাদ গুণেছিল। তারা হাত মিলিয়েছিল তেল কোম্পানির বিদেশি সাম্রাজ্যবাদী ইঙ্গ মার্কিন মালিকদের সঙ্গে। মোসাদ্দেকের ইরানের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছিল ইঙ্গ-মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীরা। বিশেষ করে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীরা প্রায় একই সময়ে পশ্চিম পাকিস্তানের ঔপনিবেশিক শাসক ও শোষক-চক্রের সঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধে পূর্ব বাংলাকে উপনিবেশ বানাবার ব্যাপারে পশ্চিম পাকিস্তানের জায়গীরদার জমিদার পুঁজিপতি সামরিক বেসামরিক বড় আমলাদের দোসর হয়ে বসেছিল।

মধ্যপ্রাচ্যের মুসলিম দেশসমূহের প্রতি সত্যিকারভাবে ভ্রাতৃত্ব জানাতে গিয়েই পূর্ব বাংলা প্রথম দিকে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রতি সমর্থন জানাতে শুরু করে। এরপরেই সুয়েজ জাতীয়করণের পরে নাসেরের মিশরকে যখন সাম্রাজ্যবাদী হামলার সম্মুখীন হতে হয়, তখন পূর্ব বাংলা ছিল সারা এশিয়ার মধ্যে একটি বিশেষ দেশ যেখানে জনগণ সক্রিয়ভাবে মিশরের উপর হামলার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছিল।

অপরদিকে যে পশ্চিম পাকিস্তানের কায়েমি স্বার্থবাদী চক্র মুসলিম দেশসমূহের প্রতি ভ্রাতৃত্ব জানিয়েছে দিনে একবার এবং রাতে একবার করে, তারা মোসাদ্দেকের পতন ঘটাবার রক্তাক্ত ষড়যন্ত্রে জড়িত ইঙ্গ-মার্কিন নায়কদের সঙ্গে পূর্বের তুলনায় আরও বেশি শক্ত করে জোট বাঁধে এবং মিশর আক্রান্ত হলে সাম্রাজ্যবাদীদের সঙ্গে দেন দরবার অক্ষুণ্ন রাখে।

এই অভিজ্ঞতার আলোকে পূর্ব বাংলার মুক্তিসংগ্রামে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী ও ধর্মনিরপেক্ষ আন্তর্জাতিকতার যে বিকাশ ঘটেছে তার মধ্যে দিয়েও পূর্ব বাংলা পশ্চিম

পাকিস্তানের কায়েমি স্বার্থবাদী ও ঔপনিবেশিক চক্রের খপ্পর থেকে বেরিয়ে আসার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেছে। পূর্ব বাংলাকে সমাজতন্ত্রী দেশসমূহের প্রতি আকৃষ্ট ও ঘনিষ্ঠ করেছে ইরান ও মিশর প্রভৃতি দেশের জাতীয় মুক্তিসংগ্রামে সমাজতন্ত্রী দেশসমূহের সক্রিয় সাহায্য ও সমর্থন।

পশ্চিম পাকিস্তানের করাচি-লাহোর-রাওয়ালপিন্ডির শাসক ও শোষকচক্র পূর্ব বাংলাকে দুইভাবে আন্তর্জাতিক যোগাযোগ থেকে বিচ্ছিন্ন রাখার জন্যে যাবতীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করে এসেছে। প্রথমত, পূর্ব বাংলাকে যেহেতু তারা একটি উপনিবেশ করে রাখতে চেয়েছে, সেজন্যে বিশ্বের সঙ্গে যোগাযোগের সামান্যতম কূটনৈতিক সুযোগসুবিধাগুলি থেকে তারা পূর্ব বাংলাকে বঞ্চিত করে রেখেছে। সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং গণ-চীনের কূটনৈতিক প্রতিনিধি দফতর স্থাপিত হয়েছে ১৯৬০ সালের পরে যখন করাচি-লাহোর-রাওয়ালপিন্ডি গং-শাসকচক্র সামরিক শাসন জারী করে পূর্ব বাংলার সামান্যতম জনপ্রতিনিধিত্ব ব্যবস্থাকে ধ্বংস করে এই কথা মনে করে নিশ্চিন্ত হয়েছিল যে, পূর্ব বাংলার বক্তব্য বিভিন্ন দেশের কূটনৈতিক দফতরে কোন ক্রমেই কার্যকরী সংযোগ স্থাপন করতে পারবে না। আটঘাঁট বেঁধেই পূর্ব বাংলায় 'নিষিদ্ধ' দেশ সমূহের কূটনৈতিক দফতর স্থাপনের বিরুদ্ধে বাধা-নিষেধ তুলে নেওয়া হয়েছিল।

দ্বিতীয়ত, রাওয়ালপিন্ডি গং-শাসকচক্র পূর্ব বাংলাকে ইঙ্গ-মার্কিন দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া চুক্তি সংস্থা বা সিয়াটো সামরিক জোটের হাতে তুলে দিয়েছিল ১৯৫৩-৫৪ সালেই। বস্তুত, পূর্ব বাংলা এর পরে বিশেষ করে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীদের এখতিয়ারে চলে যায় এবং বিশ্বের কোন্ দেশের কূটনৈতিক দফতর পূর্ব বাংলায় স্থাপিত হবে কিংবা পূর্ব বাংলার বাসিন্দারা কখন কোন্ দেশে সফরে যাবেন সেটি ঠিক করার এখতিয়ার চলে যায় মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীদের ছায়া-কর্মচারীদের হাতে।

এইভাবে রাওয়ালপিন্ডি গং শাসনচক্রের উপনিবেশ এবং মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীদের সামরিক রাজনৈতিক ঘাঁটি হিসেবে নিগৃহীত হওয়ার দরুন সাড়ে সাত কোটি মানুষের বাসভূমি পূর্ব বাংলা বিশ্বের বিভিন্ন দেশের সঙ্গে সরাসরি পরিচয়ের সূত্র স্থাপন করতে পারে নি। এর ফলে বৈপ্লবিক সংযোগ দূরে থাকুক, নিতান্ত বৈষয়িক সংযোগগুলিও স্থাপিত হতে পারে নি। বন্যা-নিরোধ প্রকল্পের ব্যাপারে পূর্ব বাংলাকে রাওয়ালপিন্ডি গং-ঔপনিবেশিক শাসকচক্র পুরো দুটো দশক একেবারে অসহায় করে রেখেছে। এ ব্যাপারে রাওয়ালপিন্ডি চক্র নিজেরা তো কিছুই করেই নি, পূর্ব বাংলাকেও কিছু করতে দেয় নি। কূটনৈতিক সম্পর্কের সমস্ত তারগুলি রাওয়ালপিন্ডি আর ইসলামাবাদে বাঁধা থাকার ফলে পূর্ব বাংলার প্রতি শুভেচ্ছা থাকলেও বিশেষ করে সমাজতন্ত্রী দেশসমূহ এ ব্যাপারে কোন কিছু করতে পারে নি।

রাওয়ালপিন্ডি গং-এর শাসকচক্র ইসলামের নামে এবং পাকিস্তানের অখণ্ডতার অজুহাত দিয়ে পূর্ব বাংলাকে পাকিস্তানের পূর্ব অঞ্চল হিসেবে বিশ্বের দরবারে জাহির করলেও, সাড়ে সাত কোটি লোকের বাসভূমি পূর্ব বাংলাকে পাকিস্তানের একটা জেলা হিসেবে দেখাবার চেষ্টা করে আসছিল। গত দুই দশকে রাওয়ালপিন্ডির নিমন্ত্রণ পেয়ে বছর বছর বিভিন্ন দেশের যেসব রাষ্ট্র নায়ক অথবা প্রতিনিধিদল ইসলামাবাদ করাচি লাহোর সফরে এসেছেন, তাঁদের অনেকেই পূর্ব বাংলায় পদার্পণ করেন নি এবং

করলেও প্রায় উড়ে চলে গিয়েছেন পূর্ব বাংলার উপর দিয়ে। পাছে পূর্ব বাংলার দারিদ্র্যের হৃদয়বিদারক ছবি রাওয়ালপিন্ডি গং-এর 'গোমর ফাঁস' করে দেয়, পাছে বিভিন্ন দেশ থেকে আগত সফরকারীদের সঙ্গে কোন ফাঁক দিয়ে পূর্ব বাংলার মুক্তিসংগ্রামী জনগণের সংযোগ স্থাপিত হয়ে যায়, এই আশঙ্কায় পূর্ব বাংলার দারিদ্র্য ও বঞ্চিত জীবনের জন্যে দায়ী ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যবাদী গোষ্ঠী পূর্ব বাংলাকে অবরোধ করে রেখেছিল।

বৈদেশিক মুদ্রার খাতিরে এই ঔপনিবেশিক বেনিয়ারা পশ্চিমী সাম্রাজ্যবাদের চৌহদ্দির বাইরে যে কুটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করেছে, তার ফল যাতে পূর্ব বাংলায় সামান্য মাত্র তোলপাড় সৃষ্টি করতে না পারে, তার জন্যেও সমস্ত আটঘাঁট বেঁধে রেখেছিল তারা।

মুক্তিযুদ্ধে নিয়োজিত স্বাধীন স্বার্বভৌম বাংলাদেশ এই অবরোধকে চিরকালের মতো ভেঙ্গে দিয়েছে।

পূর্ব বাংলার মুক্তিসংগ্রাম আন্তর্জাতিক সংযোগের ব্যাপারে বরাবর স্বাধীনতার কার্যসূচিকে সামনে রেখে এগিয়ে চলে এসেছে:

(১) বিশ্বের সমস্ত দেশের সঙ্গে বন্ধুত্বের জন্যে প্রয়োজন পড়েছে রাওয়ালপিন্ডি গং-এর ঔপনিবেশিক কর্তৃত্বের অবসান করার। স্বাধীন স্বতন্ত্র সার্বভৌম বাংলাদেশ হিসেবে ১৯৭১ সালে পূর্ব বাংলার অবির্ভাব এই কার্যসূচিরই একটি অনিবার্য পরিণতি।

(২) বিশ্বের সমস্ত দেশের সঙ্গে বন্ধুত্বের জন্যেই ইঙ্গ-মার্কিন এবং বিশেষ করে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের খপ্পর থেকে পূর্ব বাংলার বেরিয়ে আসা অপরিহার্য হয়েছে।

রক্তাক্ত বাংলা, মুক্তধারা, কলিকাতা, ১৯৭১

শ্রেণিদৃষ্টিতে বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামের চিত্তভূমি

জনগণের যে বিভিন্ন স্তর ও শ্রেণি বাংলাদেশ তথা পূর্ব বাঙলার মুক্তি সংগ্রামে ব্রতী, তাদের চিন্তা চেতনার গতিধারা সম্পর্কে একটি সঠিক ধারণা বৈপ্লবিক শ্রেণিদৃষ্টিতে যাচাই করে দুইভাবে পাওয়া যেতে পারে। প্রথমত, বিগত চব্বিশ বছরে পর্যায়ে পর্যায়ে যে লোক-অভ্যুদয় হয়েছে, তার ঘটনাবলির মধ্যেকার চেতনার উত্তরণগুলিকে বিশ্লেষণ করলে বিভিন্ন স্তর ও শ্রেণির চিন্তার নব নব উপাদানকে বার করে আনা যেতে পারে। দ্বিতীয়ত, গত চব্বিশ বছরে রাজনৈতিক নিবন্ধ রচনা এবং যেসব সাহিত্যচর্চা ও সাহিত্য সৃষ্টি হয়েছে তার হিসাব-নিকাশ করলেও মুক্তিসংগ্রামের চেতনার উপাদানগুলির সাক্ষাৎ পাওয়া যেতে পারে।

এখানে লোক-অভ্যুদয়ের ব্যাপারটিকে প্রাথমিকভাবেই যাচাই করে নিতে গেলে দেখা যাবে, কয়েকটি নির্দিষ্ট বিষয়ে লক্ষ্য অর্জনে ব্রতী গণ-আন্দোলন শ্রেণিসজ্জার দিক দিয়ে পরিমাণগতভাবে বৃদ্ধি পেয়ে আসছে। জনগণের একটি বিশেষ অংশ ছাত্রসমাজ বরাবরই এই আন্দোলনের উদ্যোক্তা হিসেবে রয়েছে। ছাত্রসমাজ উনিশ'শ বাহান্নোর বাঙলা ভাষার সংগ্রামের স্রষ্টা ছিল। তারাই উনিশ'শ উনসত্তরের গণতান্ত্রিক অধিকারের দাবি সমন্বিত এগারো দফা আন্দোলনের স্রষ্টা হয়েছে। গণ আন্দোলনের উদ্যোগ

গ্রহণকারী ছাত্রসমাজের সঙ্গে ক্রমবর্ধমান হারে সংগ্রামী জনতার সংযোগ স্থাপিত হয়েছে গত চব্বিশ বছরে। স্বাধীন পূর্ব বাঙলার ঘোষণাটিও এসেছে ছাত্র সমাজের মধ্য থেকে।

শ্রমিকশ্রেণী বসে থাকে নি। ১৯৬৪ সালে আইয়ুব-বিরোধী সংগ্রামে পূর্ব বাঙলার সাধারণ ধর্মঘট প্রমাণ করেছিল যে, মূলত গণতন্ত্র ও স্বাধীনতা সংগ্রামের নেতৃত্ব শ্রমিকশ্রেণীর হাতেই যাওয়া উচিত। কিন্তু এ ঘটনা পারম্পর্য রক্ষা করতে পারে নি। এই কারণেই সংগ্রামী ছাত্রসমাজকে শ্রমিকশ্রেণী বরং লালন করারই দায়িত্ব নিয়েছে। পূর্ব বাঙলার গণমুক্তি ছাত্রসত্তাকে জনৈক বুদ্ধিজীবী পূর্ব বাঙলার একটি ছাত্র সম্মেলনে কাব্যিকভাবে উপস্থিত করেছিলেন। তাঁর বক্তব্য: নদীমাতৃক পূর্ব বাঙলার একটি নতুন ধরনের নদী হচ্ছে ছাত্র আন্দোলন। এই নদী পূর্ব বাঙলার মুক্তি আন্দোলনের প্রাণ।

হৃদয়গ্রাহী হলেও এটা নৈসর্গিক ব্যাখ্যা-বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা নয়। এতে ছাত্রসমাজের চরিত্রের পরিবর্তমান রূপটি অথবা ছাত্রসমাজের সঙ্গে সংযুক্ত পূর্ব বাঙলার ব্যাপকতম জনগণের সক্রিয় ও সচেতন ভূমিকা বেরিয়ে আসে না। তবু, এই ধরনের ব্যাখ্যা যে সামনে আসে, তার কারণটিও ইতিহাসের দিক দিয়ে সত্য। ছাত্রসমাজের পতাকাতেই পর্যায়ে পর্যায়ে শহীদের বুকের রক্ত ঢেলে আঁকা হয়েছে পূর্ব বাঙলার মুক্তি-সংগ্রামের লক্ষ্যমাত্রাগুলি।

এই ঐতিহাসিক সত্যটিকে সামনে রেখে কিছুটা গভীরে যাবার চেষ্টা করলে দুটি বিষয় আমাদের চোখে পড়বে। প্রথমত, ছাত্রসমাজের চেতনার বৃত্তটি ক্রমাগত প্রসারিত হয়ে এসেছে, অর্থাৎ ছাত্রসমাজের চিন্তাধারাতে নতুন নতুন লক্ষ্যমাত্রা লাভ করেছে। দ্বিতীয়ত, ছাত্রসমাজের নেতৃত্বে পূর্ববাঙলার জনগণও মুক্তি-সংগ্রামের আদর্শকে প্রসারিত করে নিয়ে এসেছে।

কিন্তু গভীরে যাবার চেষ্টা থেকেই স্বাভাবিকভাবে একটা প্রশ্ন বেরিয়ে আসতে বাধ্য। এই যে চিন্তাধারার বৃত্তের অপসারণ, এই যে মাতৃভাষা বাঙলাকে রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করার সংগ্রাম থেকে পূর্ব বাঙলার স্বাধীনতা যুদ্ধে উত্তরণ, এতে কি ছাত্রসমাজ এবং জনগণের সম্পর্কের মধ্যে ভিতরে ভিতরে কোন গুণগত পরিবর্তন ঘটে নি? নিপীড়িত শ্রমিক শ্রেণি এবং কৃষকদের সঙ্গে কি ছাত্রসমাজের চেতনাগত সম্পর্ক স্থাপিত হয় নি? এই প্রশ্নের কিনারা করতে গিয়ে প্রথমত যদি ছাত্রসমাজের দিকে তাকানো যায়, তবে চোখেও একটি ছবি নজরে পড়বে। সেটি এই যে, ছাত্র-সমাজের কাঠামোটা গত চব্বিশ বছরে বদলে গিয়েছে ভিতরে ভিতরে। এবং এই পরিবর্তনে শ্রমিকশ্রেণী ও কৃষকদের চেতনার ঘনিষ্ঠ সংযোগ রয়েছে। দ্বন্দ্বাত্মক বস্তুগতিবাদের দর্শনের আলোকে বিষয়টি আলোচনাযোগ্য। এই প্রসঙ্গে একটা ঘটনার উল্লেখ করা দরকার। পাকিস্তানের শাসক ও শোষকচক্র পূর্ব বাঙলা তথা বাংলাদেশকে দমন করে রাখার জন্যে যেসব ব্যবস্থা করে এসেছে, তার মধ্যে শিক্ষা-সংকোচন নীতি অন্যতম। আয়ুব খানের আমলের প্রথম দিকে গত দশ বছরের মধ্যে একটা সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা 'মহাপরিকল্পনা'কে বাস্তবায়িত করার জন্যে যে বাদশাহী 'হুকুম' জারী হয়েছিল, তা দু'তিন বছর পরেই পরিত্যক্ত হয়। কায়েমি স্বার্থবাদী শাসক ও শোষকরা অচিরেই বুঝতে পারে যে, যে কোটি কোটি ছেলেমেয়ে প্রাথমিক শিক্ষালাভ করতে পারে, তারা শুধু মাধ্যমিক শিক্ষার জন্য নয়, উচ্চশিক্ষার জন্যেও আগ্রহী হয়ে উঠবে। প্রাথমিক

শিক্ষার মহাপরিকল্পনা লাটে ওঠে। কিন্তু শিক্ষার প্রসারের জন্যে পূর্ব বাঙলার জনসাধারণের তাগিদাকে লাটে ওঠানো যায় নি। পূর্ব বাঙলার গণমুক্তিসংগ্রামে বৈষয়িক লক্ষ্যমাত্রাগুলি অর্জিত হয় নি বলেই অবৈষয়িক বা আত্মিক লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের দিকে জোর পড়েছে বেশি।

পূর্ব বাঙলার মুক্তিসংগ্রামের এটি বৈশিষ্ট্য। লোক-অভ্যুদয়ের তরঙ্গরাশি যখন প্রশমিত হয়েছে, তখনও শূন্যতার সৃষ্টি হয়নি। আপাতদৃষ্টিতে যখন ব্যর্থতা এসেছে, তখন প্রস্তুতি চলেছে নতুন অভ্যুত্থানের। এই প্রস্তুতি যতটা বাস্তব উপকরণজাত (অবজেকটিভ), তার চেয়ে বেশি মানসিক উপকরণজাত (সাবজেকটিভ)। যা সাধ্য, তার চেয়ে সাধনা বেশি। যা করণীয় তার চেয়ে ভাবনা বেশি। শিক্ষার ক্ষেত্রে জনগণের নিজস্ব উদ্যোগ-আয়োজনের আপেক্ষিক ব্যাপকতা এই কারণেই সম্ভব হয়েছে। পূর্ব বাঙলার জনগণ খালি হাতে পায়ে বন্যা নিরোধের ব্যবস্থা করতে পারে নি। পারে নি ভারি শিল্প স্থাপন করতে। অথচ নতুন বিজ্ঞানের জগতের দিকে এগিয়ে চলার তাগিদ নষ্ট তো হয়ইনি, বরং প্রত্যেকটা বড় বড় লোকঅভ্যুদয় এই তাগিদকে উস্কে দিয়েছে। একারণেই শাসকচক্রের শিক্ষা সংকোচনের নীতিকে অগ্রাহ্য করে নিদারুণ লাঞ্ছনা আর উপেক্ষা এবং অসহনীয় দারিদ্র্যের মধ্যেও পূর্ব বাঙলার শিক্ষা বিস্তার ঘটেছে। গ্রামে গ্রামেও স্থাপিত হয়েছে মহাবিদ্যালয় বা কলেজ।

এই শিক্ষা বিস্তারের মধ্য দিয়ে ছাত্রসমাজের ভিতরে শ্রেণিসজ্জার পরিবর্তন ঘটেছে।

পূর্ব বাঙলার ছাত্রসমাজে নাগরিক উচ্চ বা নিম্ন মধ্যবিত্তের যে প্রাধান্য ছিল ইতোপূর্বে, তা অক্ষুণ্ন থাকলেও কৃষকসমাজ থেকে সোজাসুজি আসা ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় ছাত্র আন্দোলনে কতকগুলি নতুন চিন্তার উপকরণ যোগ হয়েছে। এখানে উল্লেখ্য এই যে, পূর্ব বাঙলার অধিকাংশ ছাত্রসম্মেলনে ছাত্র-সমস্যার প্রতিকারের দাবির অনুপাতে বিশ বছর আগেও জাতীয় সমস্যাবলির সমাধানের প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়েছে অনেক বেশি। ছাত্রসমাজই যেখানে ভাষা থেকে শুরু করে খাদ্য এবং স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের দাবিতে আয়োজিত গণ-বিক্ষোভের জাতীয় হোতা, সেখানে এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু ইতোপূর্বে বিভিন্ন নির্যাতিত শ্রেণি ও স্তরের বক্তব্য বিচারে ছাত্রসমাজ যে-পরিমাণ সহানুভূতির পরিচয় দিত, তার তুলনায় বাস্তবায়নের তাগিদে ধারাবাহিকতা রক্ষা করা তাদের পক্ষে সম্ভব হতো কম। ছাত্রসমাজের নতুন চরিত্র গড়ে ওঠায়, অর্থাৎ ছাত্রসমাজে বিশেষ করে দরিদ্র কৃষকের সংখ্যানুপাতিকতা বৃদ্ধি পাওয়ায় নির্যাতিত শ্রেণি ও স্তরের বক্তব্যগুলি একটা বিশেষ ধারাবাহিকতা ও কার্যকারিতা লাভ করেছে।

কথাটা এইখানেই শেষ নয়। ছাত্রসমাজের অভ্যন্তরেই নয়, ছাত্রসমাজ এবং জনগণের বিভিন্ন শ্রেণি ও স্তরের মধ্যেকার সংযোগের ক্ষেত্রেও ছাত্রসমাজের নতুন চরিত্রের প্রতিফলন প্রণিধানযোগ্য।

গত দুই দশকে এ-ব্যাপারে দুটি ঘটনা ঘটেছে। ১৯৫২ সালে বাঙলা ভাষার মর্যাদা প্রতিষ্ঠার আন্দোলন পূর্ব বাঙলার ছাত্রসমাজে একটি আদর্শবাদী সাধনার প্রবর্তন করে। কিন্তু ছাত্র আন্দোলনে যারা আত্মনিয়োগ করে, তাদের পক্ষে ছাত্রসমাজের সঙ্গে সম্পর্ক বজায় রাখা পাঁচ-ছ বছরের বেশি সম্ভব হয় না। অত্যন্ত কর্মঠ ও বৈপ্লবিক চেতনা সম্পন্ন ছাত্র-ছাত্রীদের জন্যেও ছাত্রোত্তরজীবনে আসে অসংলগ্নতার সমস্যা।

এ সমস্যা অত্যন্ত প্রকট ছিল প্রথম দিকে, যখন ছাত্রজীবন শেষ করে কৃষক বা শ্রমিক আন্দোলনে অবিলম্বে অবতীর্ণ হওয়ার ব্যাপারটা পরিষ্কার হয় নি ছাত্রসমাজে।

সে-সময়ে ছাত্র-আন্দোলনের অনেক সেরা কর্মী পাকিস্তান সিভিল সার্ভিসে যোগদান করেছিল। জন-বিচ্ছিন্ন এই সার্ভিসের কৃত্রিমতার খোলসের মধ্যে অনেক তাজা এবং বিপ্লবী মন অবরুদ্ধ হয়ে কোন কোন ক্ষেত্রে শেষ হয়ে গিয়েছে। তবে এবার যখন ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে এই সার্ভিসের জিঞ্জির ভেঙে গেল, তখন দেখা গেল, অনেক অবরুদ্ধ মন মুক্তি পেয়েছে এবং অতীতের সংগ্রামী সূত্র তুলে ধরেই যেন জেলায় জেলায় মহাকুমায় মহাকুমায় মুক্ত এলাকার দায়িত্ব গ্রহণ করেছে বিনা দ্বিধায়। এই মুক্তি-বিহঙ্গেরা যে-দিগন্ত স্থাপন করেছে তাদের চোখের সামনে সেটা বৈপ্লবিক শ্রমিকশ্রেণীর দৃষ্টিভঙ্গীর সঙ্গে একটা স্বাভাবিক আত্মকথা স্থাপনেরই প্রয়াস।

তবে এতে পূর্ব বাঙলার মুক্তিসংগ্রামের ছাত্রসত্তার প্রমাণ পাওয়া যায় নতুন ভাবে। ছাত্র সমাজের আদর্শবাদ আজও প্রাক্তন ছাত্রদের মনে কাজ করে চলেছে।

দুই দশকের দ্বিতীয় ঘটনা: ছাত্রআন্দোলনের কর্মীরা ছাত্রজীবন শেষ হওয়া ছাত্র, শ্রমিক এবং কৃষকদের মধ্যে বিপ্লবী সংগঠক হিসেবে কাজ করার রেওয়াজ গড়ে তুলেছে একটা।

প্রগতিবাদী প্রত্যেকটি ছাত্রদলের মধ্যে একটা শ্রমিকমুখী ও কৃষকমুখী প্রবণতা কম-বেশি গড়ে উঠেছে। অর্থাৎ, ছাত্রসমাজের মধ্যে শ্রমিক-কৃষক সংযোগ স্থাপনের একটা সূত্র স্থাপিত হয়েছে। গত দুই দশকের প্রথম দশকে যত ছাত্র-শ্রমিক-কৃষক আন্দোলনে বিপ্লবী সংগঠক হিসেবে কাজে নেমেছিল, তার তুলনায় এবারকার দশকের ছাত্রসমাজের মধ্য থেকে বিপ্লবী সংগঠক বেরিয়ে এসেছে তুলনামূলকভাবে বেশি। এর একটা কারণ নিশ্চয়ই যে, শ্রমিক এবং কৃষক আন্দোলনের ভূমিকা স্বাধীনতা ও গণতান্ত্রিক অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে পূর্বের তুলনায় অনেক বেশি সক্রিয় এবং প্রভাবশালী। শুধু ছাত্রদের একটি অংশেই নয়, কিছু সংখ্যক ছাত্রীও যে লাল নিশান নিয়ে কিংবা লালটুপি পরে কৃষক সমাবেশ যোগ দিয়েছে, তাতে আনুষ্ঠানিকতা অনেকখানি অতিক্রান্ত হয়েছে নিশ্চয়। কৃষক বিক্ষোভে কোন কোন ক্ষেত্রে লাল নিশানধারী কিংবা লালটুপি পরিহিত ছাত্র-ছাত্রীরা কৃষকদের তুলনায় সংখ্যায় বেশি এ-অভিযোগ এসেছে নিন্দুক এবং শুভার্থী উভয়ের কাছ থেকেই। এতে হয়তো কৃষক আন্দোলনের দুর্বলতা প্রকাশ পেয়েছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এর মধ্যে দিয়ে প্রকাশিত হয়েছে পূর্ব বাঙলার মুক্তিসংগ্রামের বিশেষ সত্যটি। ছাত্রসমাজই এখনও চূড়ান্ত পদক্ষেপের প্রধান উদ্যোক্তা থেকে গিয়েছে।

অবশ্য ছাত্রসমাজের কাঠামোর যে-চরিত্র বদল হয়েছে গত এক দশকে এবং ছাত্র ও ছাত্রীদের উভয়েরই মধ্যে শ্রমিক ও কৃষকদের সঙ্গে বৈপ্লবিক সম্পর্ক স্থাপন করার যে ধারা প্রবর্তিত হয়েছে, তাতে জনগণের ছাত্রসত্তা একটি গণমুখী রূপ নিয়েছে, এ-কথা নিঃসংশয়ে বলা যায়। এই পটভূমিকে চোখের সামনে রাখলে পূর্ব বাঙলার বর্তমান সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের বিপ্লবী মর্মভূমিকে অনুধাবন করা সহজ হবে।

যে-ছাত্রসমাজ স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা নির্দিষ্ট করেছে, তারাই যে সমাজতন্ত্রকে এগিয়ে নিয়ে যাবার ব্যাপারে উদ্যোক্তা হবে, এ-বিশ্বাসকে উপরিউক্ত বিশ্লেষণ একটা সঙ্গতি দিতে সক্ষম।

গত চব্বিশ বছরে পূর্ব বাঙলার ছাত্রসমাজ এবং তারই পাশাপাশি শ্রমিক, কৃষক এবং অন্যান্য মেহনতী মানুষের চিত্তভূমি যে-বৈপ্লবিক সমৃদ্ধি লাভ করেছে, সেটা একটা পরম্পরার মধ্য দিয়ে প্রসারিত হয়ে এগিয়ে এসেছে।

বৈপ্লবিক শ্রমিকশ্রেণীর দৃষ্টিতে একে দেখার অর্থ, একে ভেঙে ভেঙে টুকরো করে দেখা নয়। যে-বাঙালি জাতীয়তাবাদী বাতাবরণের মধ্যে শ্রমিক-কৃষক ও অন্যান্য মেহনতী মানুষের মুক্তির অনিবার্যতা রয়েছে, তাকে ভেঙে ফেলে দেবার ব্যাপার নয়। বাঙলার মুক্তির সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত মেহনতী মানুষের মুক্তিকে অনিবার্য করে তোলাই একে বৈপ্লবিক শ্রেণি-দৃষ্টিতে দেখা।

ছাত্রসমাজের বিকারে ধারাটিকে পুরোপুরি বুঝতে পারলে পূর্ব বাঙলার মুক্তিসংগ্রামের বিপ্লবী চিত্তভূমিকে অনুধাবন করা যাবে অনায়াসেই। পূর্ব বাঙলার শ্রমিকশ্রেণী ও কৃষকরা ইতোমধ্যে যে বৈপ্লবিক চিত্তভূমি গড়ে তুলেছে, তাকে সরাসরি বিশ্লেষণ করারও একটা পথ আছে এবং সেটা হচ্ছে প্রথাসিদ্ধ পথ। তবে ছাত্রসমাজে যখন চরিত্র বদলে গিয়েছে, তখন এদিক থেকে বিশ্লেষণে এগিয়ে শেষ পর্যন্ত একই সিদ্ধান্তে উপনীত হবো।

স্বাধীন শোষণমুক্ত বাঙলা-ছাত্রসমাজ এবং মেহনতী মানুষের উভয়েরই চিন্তা চেতনার ফসল।

পরিচয়। বাংলাদেশ সংখ্যা। ১৯৭১

দুই পর্বে একুশে ফেব্রুয়ারি, বাংলাদেশ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক অন্ত র্কাঠামোর গতিপ্রকৃতির বিন্যাসে বাহান্ন সালের মাতৃভাষা বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে একুশে ফেব্রুয়ারির ছাত্র জনতার বিপ্লবী অভ্যুদয় এবং তার পরবর্তী তিন দশক পেরিয়েও এই অভ্যুদয়ের অব্যাহত তরঙ্গমালার ভূমিকা ও অবদান আমাদের বিচার্য বিষয়।

উপক্রমণিকা হিসেবে দু-এক কথায় বলতে গেলে বলতে হয় যে, বাংলাদেশের নিয়ামক ও নিয়ন্তা হবার দাবি যদি কেউ করতে পারে, সে একুশে ফেব্রুয়ারি। অমর বীর শহীদ সালাম বরকত রফিক শফিক জব্বারের প্রাণোৎসর্গে মহিমান্বিত ফাল্গুনের এই দিনটি গত পঁয়ত্রিশ বছরে ফিরে এসে কুহেলিকা সরিয়ে সরিয়ে প্রচণ্ড বাধাবিপত্তি বিপর্যয়কে ভেদ করে বাংলাদশের জনগণের মুক্তি ও সমৃদ্ধির আকাঙ্ক্ষা ও প্রয়াসকে নিরন্তর বৈপ্লবিক কার্যক্রম, প্রেরণা ও দায়িত্ববোধ জুগিয়ে আসছে। এই তিন দশকের কিছু বেশি সময়ে উপনিবেশিক যুদ্ধবাজ, সাম্রাজ্যবাদ ও তার তল্পীবাহকেরা বাংলাদেশকে নামে বেনামে দখলে রাখার জন্য যে চক্রান্ত ও নগ্ন প্রয়াস চালিয়ে আসছে, সেই ঘের থেকে বাংলাদেশের জনগণের বেরিয়ে আসার অবিরত অভ্যুদয়ের চাবিকাঠি হিসেবেই কার্যকর রয়েছে একুশে ফেব্রুয়ারির গড় বাংলাদেশের বৈপ্লবিক অন্ত র্কাঠামোটি ও তার প্রসারণ। বিভিন্ন ধরনের প্রতিবিপ্লবী প্রচেষ্টার দরুন এবং সাময়িক

অবসাদের ব্যাপারটা মাঝে মাঝে বড় হয়ে পড়ায়, এই অন্তর্কাঠামো অনেক সময় দৃষ্টির আড়ালে পড়ে যায়। তখন প্রয়োজন পড়ে একে উদ্ঘাটিত করার আত্মসমীক্ষার। এই প্রেক্ষিতটিকে সামনে রেখে আমরা এখানে একুশে ফেব্রুয়ারির সৃষ্টি, সাফল্য, তাগিদ, করণীয় এবং নতুনতর প্রশ্ন ও সমস্যা সমাধানের সম্মুখীন হবার ব্যাপার দুটি পর্বে ভাগ করে নিয়ে সংক্ষেপে সূত্রাকারে উপস্থিত করছি। প্রথম পর্বটি বাহান্ন থেকে বাহাত্তর পর্যন্ত। বাহান্নের প্রস্তুতির চার বছরকে অর্থাৎ ৪৮-৫২ কে বাহান্নের মধ্যেই ধরে নিচ্ছি। দ্বিতীয় পর্বটি বাহাত্তরে পরবর্তী দুই দশক। প্রথম পর্বে থাকছে মৌল বৈপ্লবিক অন্তর্কাঠামোর বিন্যাসের বিভিন্ন দিক। দ্বিতীয় পর্বে এই অন্তর্কাঠামোকে রক্ষা করে প্রসারিত করার অভ্যুদয় ও দায়িত্বের ধারা। এই দুটি পর্বেই শামসুর রাহমানের কবিতার ভাষায় বাংলা ভাষার 'দুঃখিনী বর্ণমালা'র আত্মপ্রতিষ্ঠাকে অশেষ দুঃখ পার হতে হয়েছে এবং আজও হচ্ছে। সুতরাং সাফল্য ও আশাবাদকে দুঃখ, রক্ত, অশ্রু, যন্ত্রণা ও পরিতাপের জ্বালার কথা মনে রেখেই সামনে আনছি। এই সঙ্গেই সাফল্য অথবা অগ্রগতির মূলে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের গানের ভাষার এক সাগর রক্তের বিনিময়ে বাংলায় স্বাধীনতা আনতে পারার যে গভীর ও সুদূরপ্রসারী অবদান রয়েছে তার কথাটা মনে মনে থাকছে।

১.

প্রথম পর্ব সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য এই যে, এই সময়েই বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের অন্তর্কাঠামো গড়ে উঠেছে। এই অন্তর্কাঠামোটি নিম্নরূপ:

(১) ২১ ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশের জনমণ্ডলির অপরিমেয় অধিকাংশের মাতৃভাষা বাংলাকে হাজার হাজার বছরের জনজীবনযাপন-ধারার ঐতিহাসিক মহিমায় স্থাপন করে তাকে জনমানসে অক্ষয় অমর যৌথ সম্পদের মর্যাদার সিংহাসনে বসিয়েছে। যেহেতু গণঅভ্যুদয়ের ঝলকে ঝলকে পাওয়া ব্যাখ্যার আলোকে পরিষ্কার হয়ে গিয়েছে যে, একেবারে অন্তস্থলের সমস্ত খেটে খাওয়া নারীপুরুষের আটপৌঢ়ে অতি সাধারণ কাজকর্মের সামাজিক সম্পর্কের মধ্য থেকে আরও পাঁচটা আশেপাশের মাতৃভাষার মতো বাংলাভাষার উদ্ভব ঘটেছে, সেজন্য সামান্যতম নারী ও পুরুষেরা নিজেদের অন্তরের কথাকে নির্ভয়ে নিঃসঙ্কোচে ব্যক্ত করতে পারার উপাদান ও উপায় সম্বন্ধে সচেতন হয়ে উঠতে পেরেছে একুশে ফেব্রুয়ারির আবহে।

(২) আমাদের উপমহাদেশের মাতৃভাষাকে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদায় অভিষিক্ত করার এই প্রথম গণঅভ্যুদয় ও গণউদ্যোগ ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক অধিকারের বৈপ্লবিক বিন্যাসের প্রয়োজনবোধ ও ধ্যানধারণাকে সরাসরিভাবে ব্যাপক জনগণের এখতিয়ারের অন্তর্ভুক্ত করে দিয়েছে।

(৩) এই গণতান্ত্রিক অধিকারের সংগ্রামে নবনবীনদের নেতৃত্বে বিপুল কৃষকসমাজ, অন্য সমস্ত শ্রমজীবী এবং বিশেষ করে শিল্পশ্রমিকদের পাশাপাশি নারীসমাজের ব্যাপক অংশগ্রহণ ঘটেছে প্রচণ্ড ঝড়ের বেগে। নারীসমাজ বাংলাদেশে বলতে গেলে এবং নিমেষে সামন্ততান্ত্রিক মধ্যযুগীয় অবরোধ ব্যবস্থাকে ভেঙে ফেলে দিয়েছে এবং নতুন মর্যাদাবোধ ও দায়িত্ববোধ নিয়ে মাতৃভাষিণী হিসাবে শিক্ষায় সমঅধিকারে বাস্তবায়ন শুরু করে দিয়েছে এবং বৈপ্লবিক নির্মাণের কাজে পুরুষের পাশাপাশি সমভাবে উচ্চতর

স্তরে প্রস্তুতি নিচ্ছে। এ যেন নবারুণের 'সাম্যের গান'কে প্রতি অক্ষরে বাস্তবে ফলিয়ে তোলা। ব্যাপারটাকে বুঝিয়ে বলার জন্য আরও একটা উদাহরণ দেয়া যেতে পারে। ভাষা আন্দোলনের অগ্রণী প্রবক্তা ও ভাষাকারদের অন্যতম, বাংলাদেশের বিশিষ্ট কবি, অধ্যাপক, সাংবাদিক-সম্পাদক হাসান হাফিজুর রহমানের একটি কবিতার ভাষায় 'বিপ্লবিনী লতা'রা নির্মাণের ক্ষেত্রে নিজেদের পায়ে ভর করে ব্যাপকভাবে কাজ করার ছাড়পত্র পেয়েছে।

(৪) ভাষা-সাহিত্য-সংগীত ও বর্ণমালার সজ্জায় এবং সেইসঙ্গে সামগ্রিক সাংস্কৃতিক প্রয়াসে অবিভাজ্যভাবে যুক্ত চিত্র চলচ্চিত্র স্থাপত্য ও ভাস্কর্যে অবিরত পরীক্ষা-নিরীক্ষায় নিয়োজিত কর্মী লেখকলেখিকা শিল্পীদের মনে একুশে ফেব্রুয়ারি একটা প্রবল গণমুখিতা নিয়ে এসেছে। এরই পাশাপাশি একুশে ফেব্রুয়ারির লোক-অভ্যুদয়ের বস্তুতপক্ষে স্বতঃস্ফূর্ত রূপকার হিসাবে লোক-সংগীত, লোকশিল্পকলা ও লোককাব্যের সমস্ত বিভাগে বিপুল উৎসাহ ও উদ্যমের সঞ্চার ঘটেছে। তারা তাদের আত্মিক এবং এমনকি আধ্যাত্মিক সম্পদগুলিকে, আধুনিক সামাজিক ও রাজনৈতিক বৈপ্লবিক অভ্যুদয় ও নির্মাণের কাজে নিয়োজিত করেছে সরাসরিভাবেই। ভাষা ও সাহিত্যের ঐতিহ্যের পারম্পর্যকে নতুনভাবে প্রতিষ্ঠিত করে একুশে ফেব্রুয়ারি রবীন্দ্রনাথকে এবং সেই সঙ্গে উনিশ ও বিশ শতকের অগ্রসর ধারার সমস্ত ধারক বাহকদের যুক্ত করে দিয়েছে বাহান্নতে। বাংলাদেশের এগিয়ে আসা নতুন প্রজন্মের লেখক লেখিকাদের বিশিষ্ট ও কিছুটা স্বতন্ত্র কাজের ধারায় যাকে বাংলাদেশের সাহিত্য বলেও অভিহিত করা হয়ে থাকে।

(৫) একুশে ফেব্রুয়ারি বাংলাভাষাকে মাতৃভাষারূপে একেবারে প্রাথমিক থেকে উচ্চতম স্তরের শিক্ষার মাধ্যমরূপে প্রতিষ্ঠিত করেছে ব্যবহারিকভাবে এবং মৌলনীতিরূপে উভয়ত। এইভাবে আধুনিকতম বিজ্ঞান সমেত যাবতীয় জ্ঞানচর্চায় মাতৃভাষাকে মাধ্যমরূপে জারী করে আন্তর্জাতিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের সমস্ত সম্পদকে একুশে ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশের সাধারণ শ্রমজীবীদের আয়ত্তের মধ্যে এনে দিয়েছে এবং বুদ্ধিজীবী সমাজ ও তার মানসকে পূর্বাপর সমস্ত উপনিবেশিক আমলে বিচ্ছিন্নতা ও আত্মম্ভরিতা থেকে মুক্ত করে ব্যাপক জনমানস ও জনসমাজে মিশে যাবার পথ করে দিয়েছে।

(৬) একুশে ফেব্রুয়ারি সাম্রাজ্যবাদ ও তার তল্পীবাহক কায়েমি স্বার্থের ধারকবাহকদের মুখাপেক্ষী শতাব্দিকাল ধরে চলে আসা বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের মধ্যে এমন একটা জনসমাজমুখী বিপ্লবী বুদ্ধিজীবী-অংশের উদ্ভব ঘটিয়েছে, যাতে তারা মুক্তিসংগ্রামের সমস্ত অভ্যুদয়ের পুরোভাগে এসে দাঁড়িয়েছে এবং মুক্তিযুদ্ধে লাখো নরনারী শহীদ সংগ্রামের মধ্যে ঐতিহাসিক আত্মোৎসর্গে নিজেদের বিশেষভাবে চিহ্নিত করেছে। একুশে ফেব্রুয়ারি সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে রাজনৈতিক ও অরাজনৈতিকদের পার্থক্য ও গণ্ডীবদ্ধতা মোচনের পথে এগিয়ে চলবার একটা মানসিকতাও গড়ে তুলেছে।

(৭) সর্বোপরি একুশে ফেব্রুয়ারি ৭১ সালে জাতীয়তা, গণতন্ত্র, ধর্ম নিরপেক্ষতা ও সমাজতন্ত্রকে জাতীয় মুক্তিসংগ্রামের চার আদর্শ বা মূলনীতি রূপে গড়ে তুলেছে এবং এদের ভিত্তিতে মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীন স্বতন্ত্র সার্বভৌম বাংলাদেশ কায়েম করে

যুদ্ধবাজ ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যবাদীদের ও তাদের তল্পীবাহকদের সাময়িক জোট সিয়াটোর অবরোধকে ভেঙে বেরিয়ে এসেছে। একুশে ফেব্রুয়ারির নিরন্তর অভ্যুদয়ের প্রথম পর্বের শেষে বাংলাদেশ বিশ্ব রাষ্ট্রমণ্ডলিতে এই শতাব্দিতে ঝড়ের বেগে স্বাধীনতা সংগ্রামে জয়ী ভ্রাতৃউপম দেশসমূহের এবং সাধারণভাবে আন্তর্জাতিক ভ্রাতৃ সমাবেশ বিশ্বদায়িত্ব পালনেও শরিক হয়েছে।

মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীন বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠার এই ঘটনাটি ৬৮-৬৯'র সামরিক স্বৈরাচারী শাসনবিরোধী গণঅভ্যুত্থান থেকে ৭১ এর ফেব্রুয়ারিতে সাম্রাজ্যবাদ ও তার তল্পীবাহকদের বিরুদ্ধে গণঅসহযোগ-বিদ্রোহের বহু ঘাতপ্রতিঘাতময় টানাপোড়েনের ভিতর দিয়ে ঘটেছে। ৭১-এর মার্চে বাংলাদেশের পুলিশবাহিনী, সীমান্তরক্ষী, রাইফেলধারী ই. পি. আর বাহিনী, বাঙালি সৈনিকরা তাদের অফিসাররা, রেডিও-টেলিভিশনের কর্মীরা এবং সরকারি কর্মচারীদের অধিকাংশ ও রেলশ্রমিক কর্মচারিরা গণঅসহযোগে শরিক হওয়ায় মুক্তি সংগ্রামী রাজনৈতিক দলসমূহের নেতৃত্ব সংযুক্ত ছাত্র জনতার গণঅভ্যুদয় একটা ঐতিহাসিক বহুমাত্রিক রূপ নেয়। এই সমস্ত আয়োজন ও সমাবেশ কেন্দ্রীয়ভাবে ঢাকায় কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারের চত্বরে ঘটেছে। বিপ্লবের উৎস সুতরাং কোথায়, সে ব্যাপারটা শত্রু মিত্র সকলের কাছেই পরিষ্কার ছিল। ২৫ মার্চ রাত্রিতে তাই পাকিস্তানের দখলদার সেনাবাহিনী যখন স্বাধীনতার উত্থানকে দমন করার উদ্দেশ্য নিয়ে ঢাকায় সামরিক অভিযান চালায়, তখন তারা কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারকে কামানের গোলা মেরে ভেঙে দেয়। তারা একে রাষ্ট্রদ্রোহের গোড়াঘর বলে সাব্যস্ত করেছিল। এর বিপরীতে বাংলাদেশের হৃদয় হতে বেরিয়ে এসেছিল যেন এই কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার। ৫৪ সালে সাধারণ নির্বাচনে তদানীন্তন পাকিস্তানের প্রদেশ পূর্ববাংলায় জয়ী বাম গণতান্ত্রিক যুক্তফ্রন্টের একুশ দফার কর্মসূচি অনুযায়ী বাংলা একাডেমী স্থাপনের পাশাপাশি ঢাকায় ভাষা আন্দোলনের শহীদদের স্মরণে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারটির চত্বর নির্মিত হয়েছিল জনসমাবেশের উপযোগী করে। কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার সেই থেকেই বাংলাদেশের উন্মুক্ত বিপ্লবমঞ্চ। বাংলাদেশ স্বাধীন ও মুক্ত হবার পরেই কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার আগে যেভাবে ছিল ঠিক সেভাবেই পুনর্নির্মিত হয়েছে।

একুশে ফেব্রুয়ারির আদর্শে অনুপ্রাণিত বাংলাদেশের গণমুখী স্থাপত্য, ভাস্কর্য ও চিত্রশিল্পীদের সমবেত পরিকল্পনায় এবং প্রয়াসে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার তৈরি হয়েছিল।

॥ ২ ॥

দ্বিতীয় পর্বেও একুশে ফেব্রুয়ারির নিরন্তর অভ্যুদয় ও অবিরত দায়িত্বের ব্যাপারটা হচ্ছে প্রথম পর্বের সম্পন্ন করা অথবা অগ্রসর করে দেয়া-কাজগুলিকে একই সঙ্গে রক্ষা ও প্রসারিত করা এবং এদের অবলম্বন করেই মুক্তিযুদ্ধে অর্জিত স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বকে জাতীয়তা, গণতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা ও সমাজতন্ত্রের নীতি ও আদর্শ অনুসারে জনজীবনে বাস্তবায়িত ও ফলপ্রসূ করে তোলার নির্মাণ প্রকল্পে কর্মসূচি ও প্রেরণা জোগানো। একুশে ফেব্রুয়ারি এই দুটো বিষয়েই দ্বিতীয় পর্বে ঐতিহাসিক ভুমিকা পালন করে আসছে। প্রধানত রক্ষামূলক হলেও একুশে ফেব্রুয়ারি এই পর্বে জনগণকে নতুন নতুন পরীক্ষা-নিরীক্ষাতে ব্রতী করেছে।

দ্বিতীয় পর্বে প্রথম পর্বের সাফল্যগুলিকে রক্ষা করার ব্যাপারে একুশে ফেব্রুয়ারিকে ফিরে ফিরে এসে প্রধান যে কাজটা করতে হচ্ছে, সেটা হলো, স্বাধীনতা-উত্তরকালে যুদ্ধবাজ সাম্রাজ্যবাদের নয়া ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে মোকাবেলার লড়াইতে গণউদ্যোগ ও গণঐক্যকে নতুন বেশে নতুন করে নিয়োজিত করা। দশ কোটি জনসংখ্যার ৫৪ হাজার বর্গ মাইলের ভূমিখণ্ডে অসমাপ্ত অর্থনৈতিক বিগ্রহের পরিস্থিতিতে জনগণের স্বনির্ভরতা অর্জনের প্রয়াসকে প্রতিক্রিয়াশীল ও কায়েমি স্বার্থের প্রতিহারী সাম্রাজ্যবাদী মুরুব্বিদের সহায়তায় ব্যাহত করার জন্য বাংলাদেশের বৈপ্লবিক অন্তর্কাঠামোর উপর যে আক্রমণ চালিয়ে আসছে একুশে ফেব্রুয়ারি তাকে শুধু প্রতিহত করেই যে ক্ষান্ত হচ্ছে তা নয়। একুশে ফেব্রুয়ারি জনগণকে এগিয়ে চলারও পথ দেখাচ্ছে। পথ করে দিচ্ছে। এই ৮৭'তেও একুশে ফেব্রুয়ারিতে যে বাংলাদেশব্যাপী গণসমাবেশ হয়েছে, তার রূপটি এগিয়ে চলবারই। দেখা গিয়েছে, অন্তর্কাঠামোটি জখম হলেও প্রবলভাবেই প্রাণবন্ত রয়েছে।

অবশ্য একুশে ফেব্রুয়ারিকে তার সাফল্যের ধারাটিকে রক্ষা করার সঙ্গে সঙ্গেই স্বাধীনতা-উত্তর পরিস্থিতিতে বৈপ্লবিক দায়িত্বের প্রসারণের দিক থেকেই উদ্ভুত নতুন নতুন প্রশ্ন ও সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে। কথাটা সংক্ষেপে এই যে, স্বাধীনতা বাংলাদেশের জনগণকে আভ্যন্তরীণভাবেই হোক অথবা আন্তর্জাতিকভাবে হোক বিস্তৃততর সম্পর্ক ও মেলবন্ধন স্থাপনের ক্ষেত্রে কিছু কিছু নতুন দিককে উন্মোচিত করে দিতে হচ্ছে।

এখানে শুধু একটি বিশেষ করণীয় বা দায়িত্বের কথা উল্লেখ করছি। বিষয়টি হল এই যে, বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পরে আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে অথবা আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে শুধু নিজের মাতৃভাষাই নয়, অন্য মাতৃভাষা ও মাতৃভাষীদের সঙ্গে সম্পর্ককে দেশের বৈপ্লবিক অবস্থানের সহযোগী করে নিতে হচ্ছে। বাংলাদেশের বিপ্লবকে পূর্ণতর রূপ দেবার জন্য।

এজন্য নিশ্চয় বিস্তারিতের দিকটাতে নতুন নিয়োজন ও আয়োজনের দরকার হচ্ছে। তবে বাংলাদেশের বৈপ্লবিক অন্তর্কাঠামোর মধ্যেই এমন একটা বস্তু বা সূত্র তৈরি রয়েছে, যা এই সম্পর্ক বিন্যাসের ক্ষেত্রে কাজ করার জন্য যেন তৈরি হয়েই অপেক্ষা করছিল। সুতরাং এক্ষেত্রেও একুশে বড় কাজ দেখাবে। এই সূত্রটি একুশে ফেব্রুয়ারির গণ অভ্যুদয়ে শ্রমজীবী-সূত্র। মাতৃভাষাকে ভিত্তি করে শুরু হয়েছে বলে এই উত্থান প্রথম থেকেই ব্যাপক শ্রমজীবী-ভিত্তিক গণ-অভ্যুদয়ের রূপ নিয়েছিল। অন্যান্য মাতৃভাষা ও মাতৃভাষীদের সঙ্গে বৈপ্লবিক সম্পর্ক প্রসারণের কাজে একুশে ফেব্রুয়ারি তার আয়ত্তের মধ্যে রয়েছে এমন তিনটি সত্যকে সামনে রেখে এগিয়ে যাবে। সত্য তিনটি নিম্নরূপ:

(১) শ্রমজীবীদের সাধারণ ও মৌল স্বার্থ সমস্ত এবং ভিন্ন ভিন্ন ভাষাভাষী দেশ, জাতি ও গোষ্ঠী নির্বিশেষে এক এবং অভিন্ন, যদিও বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠী ও দেশ বৈচিত্র্য, বৈশিষ্ট্য ও চরিত্রে নানারূপের ও স্বকীয়তার অধিকারী। এই স্বকীয়তার সম্পদের লেন-দেন সমস্ত শ্রমজীবী জাতি ও গোষ্ঠীই সমৃদ্ধ হয়ে এসেছে। সুতরাং শ্রমজীবী সূত্রে কোন মাতৃভাষাই দেশ-দেশান্তরের মধ্যে কোন দেয়াল তুলবার অথবা অহঙ্কারের কিংবা ছুৎমার্গের দেয়াল তুলতে পারে না। দেয়াল থাকলে বরং সেগুলোকে ভেঙে ফেলাই কাজ যে কোন মাতৃভাষার।

(২) ঔপনিবেশিক, সাম্রাজ্যবাদী অথবা সামন্তবাদী শাসন ও শোষণে চাপা পড়া কোন দেশের জনগণ অবনত স্তরের মানুষ হিসেবে যখন উঠে আসছে, তখন সেই অভ্যুত্থানের সঙ্গীরূপে সমস্ত সংযুক্ত চাপা পড়া স্তরেও উঠে আসছে। এই ক্ষেত্রে কার্যক্রমের অগ্রাধিকারের প্রশ্ন নিয়ে কিছু জটিলতার সম্ভাবনা রয়েছে। জটিলতা এবং সমস্যা দেখা দিয়েছে। কিন্তু এই সমস্যা কিংবা জটিলতার সমাধানেরও পথ তৈরি হয়ে রয়েছে শ্রমজীবী ঐক্যের সূত্রে। ভ্রাতৃপ্রতিম অথবা ভগ্নীপ্রতিম এই ধরনের সংখ্যালঘু অথবা আদিবাসী মাতৃভাষা ও শাখা মাতৃভাষা স্বচ্ছন্দে পরস্পরের হাতে হাত রাখতে পারে এই ঐক্যের সূত্রটিকে বড় করে তুলে ধরে।

(৩) বাংলাদেশের অভ্যন্তরে যেসব জাতিগোষ্ঠীর মাতৃভাষা আলাদা, তারা প্রকৃতপক্ষে মাতৃভাষাগতভাবেও আত্মীয় বা জাতিগোষ্ঠী। ইতিহাস বলছে যে, বাংলাভাষা ও বাঙালি জাতি গঠনে আজকের বাংলাদেশের বিভিন্ন আদিবাসী গোষ্ঠীর বাসিন্দারা বড় রকমের ভূমিকা গ্রহণ করেছে। এই দিক দিয়ে বিভিন্ন আদিবাসী জাতিগোষ্ঠী বড় রকমের ভূমিকা গ্রহণ করেছে। এই দিক দিয়ে বিভিন্ন আদিবাসী জনগোষ্ঠী যেমন স্বতন্ত্র ও বিশিষ্ট, তেমনি একটা ঐতিহাসিক নির্মাণের সূত্রে তারা আত্মীয়। শ্রমজীবী ঐক্যসূত্র তাই ইতিহাসিক নির্মিতির ভিত্তিতে বাংলাদেশের শোষণহীন সমাজতান্ত্রিক সমাজ গড়ার একটা বৈপ্লবিক সহযোগিতায় আবহ পাবে।

আগামী দিনগুলিতে একুশে ফেব্রুয়ারি কার্যক্রম এই তিনটি সত্যকে নিয়ে চিন্তাভাবনাকে বিশেষভাবে প্রধান্য দেবে। আমরা এটাই আশা করব।

শারদীয় পরিচয়, ১৯৮৭

স্বাধীনতা দিবসে হিসাবের খাতায় জমা-বিপ্লব

স্বাধীনতার ১৭তম বার্ষিকীতে আজ ২৬শে মার্চ বরাবরের মতো বছরের পর বছরের বহু অগ্নিপরীক্ষায় যাচাই করা হিসাবের খাতাখানি এসে গিয়েছে যাতে সুকান্তের ভাষায় রয়েছে রক্তখরচ। যে লাখো নারী ও পুরুষের বুকের খুনে স্থাপিত হয়েছে ৭১-এ স্বাধীন স্বতন্ত্র সার্বভৌম গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ, মুক্তিসংগ্রাম আর মুক্তিযুদ্ধের সেই শহীদদের সালাম জানাতে গিয়ে আজও দেখেছি হিসাবের খাতায় তোলা রয়েছে সাগর পরিমাণ রক্ত খরচেও পাশে বড় রকমের জমা। এই জমা হচ্ছে একাত্তরের গণবিপ্লব, যাকে বিশ শতকের জাতীয় মুক্তির, সমাজতন্ত্রের ও গণতন্ত্রের বিপ্লবের তরঙ্গরাশির মধ্যে চিনে নিতে পারা যায় একটি সফল বিপ্লব বলে। বাংলাদেশ বিশ্বমানবের ইতিহাসের ধারায় দাখিল করেছে একাত্তরে একটি সফল গণবিপ্লব। জয় বাংলার জনগণ।

অবশ্যই আমাদের এই দাবিটির মূলে রয়েছে আবেগ আর ভালবাসার পাশাপাশি যুক্তি। এখানে এই প্রযুক্তিটিকে নিবেদন করেছি বাংলাদেশের জনগণের বৈপ্লবিক চিন্তার গড়াপেটার প্রয়াসের সমবেত ও যৌথ সম্মুখগামী অপ্রতিরোধ্য যাচাই এর ধারায়।

আমাদের মূল বক্তব্যটি এই যে, যে ঐতিহাসিক করণীয়টি ৫২'র একুশে ফেব্রুয়ারির পর থেকে একটা বিপ্লবের অপেক্ষায় ছিল, সেই সম্পাদটি একাত্তরের

মার্চের গণবিপ্লবী অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে সম্পাদিত রয়েছে। এই জন্যেই এই অভ্যুত্থান সফল গণবিপ্লব।

ইতিহাসে অবশ্যই যুগে যুগে দেশে দেশে সফল বিপ্লব যেভাবে বিপুল করণীয়ের দায়িত্বভার তুলে দিয়েছে বিপ্লবের সম্পাদনকারীদের কাঁধে, এ ক্ষেত্রেও সেটা ঘটেছে। ইতিহাসে ছোট ছোট আকারের তো কথাই নেই, বড় বড় বিপ্লবের ক্ষেত্রেও প্রতিবিপ্লবী আক্রমণে যা ঘটেছে, বাংলাদেশেও তা ঘটেছে। সেটাও এই ১৭ বছরের খাতায় এসেছে। সেই হিসাবে এক ফোঁটা রক্ত, এক ফোঁটা ঘাম, এক ফোঁটা অশ্রুর কথা বাদ যায় নি। কিন্তু সেটা আরেকটা প্রসঙ্গ। চূড়ান্তত্ম গুরুত্বপূর্ণ, আরেকটা। এখানে একাত্তরের বিপ্লবকে কেন সফল বিপ্লব বলছি আমরা, সেটাই বুঝে নেবো। একাত্তরের মার্চের বাংলাদেশের মহান গণঅভ্যুত্থানকে বিপ্লবের রাষ্ট্রীয় বৈজ্ঞানিক পরিভাষা কেন বিপ্লব বলে চিহ্নিত করা যায়, সেটাই শুধু সংক্ষেপে উপস্থিত করছি।

প্রথমত, যাকে লেনিনের ভাষায় বিপ্লবী পরিস্থিতি বলা যেতে পারে, সেটা একাত্তরে বাংলাদেশে এসেছিল। দ্বিতীয়ত, সঙ্গে সঙ্গেই এই পরিস্থিতি সেভাবে মুক্তিযুদ্ধে রূপান্তরিত হয়েছিল, সেটা ছিল বিপ্লব এবং সফল বিপ্লব। সাম্রাজ্যবাদের তল্পীবাহক তদানীন্তন শাসকচক্র ঝাড়ে-বংশে জনগণ থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল। তারা তাদের মনিবদের কড়া প্রহরায় সুরক্ষিত প্রশাসনের সমস্ত ব্যবস্থাপনা থেকে পুরোপুরি বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল। এরই পাশাপাশি বিপ্লবী পরিস্থিতিতে সমস্ত গণতান্ত্রিক মুক্তিসংগ্রামী ধারাগুলি একটি কেন্দ্রবিন্দুর অভিমুখী হয়েছিল এবং বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সামগ্রিক অসহযোগের কর্মপন্থাকে বাস্তবায়িত করার ব্যবস্থা করে এবং স্বাধীনতা ঘোষণা করে বাংলাদেশের শ্রমিক-কৃষক-যুব-ছাত্র-ছাত্রী-বুদ্ধিজীবী ও নারীসমাজসহ জনগণের সকল অংশের, সমাজ বিপ্লবী ও প্রগতিবাদী রাজনৈতিক পার্টি, গণসংগঠন এবং ব্যক্তি ও সংস্থার অভিমত ও আকাঙ্ক্ষার ঈপ্সিত পদক্ষেপটি নিয়েছিলেন, বিপ্লব সম্পাদিত হয়েছিল।

বাংলাদেশের সম্পাদিত বিপ্লবের সেই মুহূর্তের কৃতিত্বগুলি ছিল নিম্নরূপ :

(১) চার নীতি গণতন্ত্র, জাতীয়তাবাদ, ধর্ম-নিরপেক্ষতা ও সমাজতন্ত্রভিত্তিক স্বাধীন স্বতন্ত্র সার্বভৌম গণপ্রজাতন্ত্রী রাষ্ট্রের ভিত্তি স্থাপন। এরপরে রচিত সংবিধান আমাদের উপমহাদেশে প্রথম গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের পত্তন করে।

(২) সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী ও সামরিক জোট বিরোধী অবস্থান গ্রহণ। বাংলাদেশের একাত্তরের এই গণবিপ্লবের অবস্থানের দরুণ সমগ্র দক্ষিণ-পূর্ব এশীয় অঞ্চলে সাম্রাজ্যবাদী সামরিক জোটের বেষ্টনীর জোড়টা ভেঙ্গে যায়। শুধু যে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের নেতৃত্বাধীন সামরিক জোট সিয়াটোর খুঁটিটা উপড়ে যায় তা নয়, সমস্ত বেষ্টনীই নড়বড়ে হয়ে যায়।

(৩) সমস্ত জোটনিরপেক্ষ ও প্রগতিশীল, গণতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের আন্তর্জাতিক ভিত্তি বা অন্তর্ভিত্তি রচিত হয় বাংলাদেশের বিপ্লব হয় বিশ্ববিপ্লবের অন্তর্কাঠামোর সঙ্গে যুক্ত।

(৪) স্বাধীন স্বতন্ত্র সার্বভৌম গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠা পাকিস্তানের উপর সাম্রাজ্যবাদের কবজার বেষ্টনিকে সাময়িকভাবে হলেও বিপর্যস্ত করে দিয়ে

সাম্রাজ্যবাদের খপ্পর থেকে পাকিস্তানের জনগণের সম্মিলিতভাবে বেরিয়ে আসার পথ তৈরি করে দেয়। সাম্রাজ্যবাদের খপ্পর সমগ্র দক্ষিণ এশিয়াতে বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের জন্য নড়বড়ে হয়ে যাওয়ায় পাকিস্তানের সকল ভাষাভাষী জনগণ ১৯৭২ সালে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে মাথা তুলবার যে সুযোগটি পেয়েছিল, সেটি আবার আসতে বাধ্য।

উপরিউক্ত কৃতিত্বগুলির ভিত্তিতে আমরা বাংলাদেশের একাত্তরের সফল বিপ্লবের বিশুদ্ধ রূপটিকে হিসাবের খাতা থেকে তুলে ধরলাম।

৭২ এর পরবর্তীকালে যেসব বিপর্যয়কর ঘটনা ঘটেছে তাদের সঙ্গে বিপ্লবের উপরিউক্ত মূল সম্পাদন বা সাফল্যকে জড়িয়ে ফেলে এর সম্ভাব্যতা ও ভবিষ্যতের মূল্যায়ণ করাটা ভুল হবে।

তবে প্রথমত আমরা তাই একাত্তরের বিপ্লবকে অবশ্যই একটা চমকপ্রদ কোন ঐতিহসিক অপ্রত্যাশিত ঘটনা হিসাবে দেখবো না। একে আমরা বাহান্নর একুশে ফেব্রুয়ারির বৈপ্লবিক কর্মসূচি নিয়ে জনগণের নিরন্তর অভ্যুদয়ের পরিণতি রূপেই দেখবো।

দ্বিতীয়ত আমরা দেখবো যে, বাংলাদেশের জনগণের হৃদয়ের গভীরে এই বিপ্লব তার সমস্ত যাত্রাগুলি নিয়ে সুরক্ষিত ও লালিত। সুতরাং একাত্তরের বিশুদ্ধ বিপ্লবের থেমে থাকার অথবা পথভ্রষ্ট হবার ব্যাপারটা আল্‌গা ও সাময়িক। জনগণ যে কোন প্রশ্নে বৈপ্লবিকভাবে আলোড়িত হয়ে এগিয়ে যেতে চাইলেই একাত্তরের বিশুদ্ধ বিপ্লবকে নতুন করে তুলে আনবেন। এই বিপ্লব জনগণের রক্ত খরচে অর্জিত সম্পদ। এই বিপ্লব যে কোন সাময়িক ভ্রষ্টাচারের এখতিয়ারের বাইরে। জনগণের হিসাবের খাতায় শহীদদের বুকের রক্ত খরচের পাশে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িয়ে আছে জমা-বিপ্লব।

সাপ্তাহিক একতা, ২৬ মার্চ, ১৯৮৮

২৪ শে এপ্রিলের শহীদদের স্মরণে

আজ ৩৮ বছর হল। ১৯৫০ এর ২৪শে এপ্রিল পূর্ব বংলায় তথা বাংলাদেশে তদানীন্তন পাকিস্তানি আমলে রাজশাহী কেন্দ্রীয় কারাগারে রাজনৈতিক বন্দীদের উপর গুলি চলে। এতে সাতজন বন্দী শহীদ হন। এই শহীদেরা হলেন কম্পরাম সিং, বিজন সেন, সুধীন ধর, মোহাম্মদ হানিফ, দিলওয়ার হোসেন, আনোয়ার হোসেন, সুখেন ভট্টাচার্য। যে খাপড়া ওয়ার্ডে এই গুলি চলে; সেখানে আটক অন্যান্য বন্দীরা গুলিতে এবং এরপর লাঠির ঘায়ে সাংঘাতিকভাবে জখম হন। তাছাড়া জেলখানায় নানা অংশে ছড়িয়ে থাকা বিভিন্ন কুঠরিতে অন্যান্য রাজনৈতিক বন্দীদের উপরেও প্রচণ্ড হামলা চলে। তাতেও অনেকে জখম হন। এই রক্তাক্ত ও যন্ত্রণার্ত দিনটিকে আমরা আজ তার সমগ্রতায় স্মরণ করছি। অমর শহীদদের হাজার সালাম জানাচ্ছি। যে রাজনৈতিক বন্দীরা সেদিন অগ্নিপরীক্ষার মুখোমুখি হয়েছিলেন, তাঁদের বৈপ্লবিক অবদানকে স্মরণ করছি। সঙ্গে সঙ্গেই স্মরণ করছি বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামের সেই প্রথম বছরগুলিকে যখন জেলখানাগুলি ভরে গিয়েছিল কৃষক, শ্রমিক, ছাত্র, যুবা তথা সাধারণভাবে গণতান্ত্রিক

আন্দোলনের নারী ,ও পুরুষ নির্বিশেষে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও সংগঠনের কর্মীদের ব্যাপক ধরপাকড়ের ফলে। স্মরণ করছি সেই সমস্ত কর্মী ও নেতৃবৃন্দকে যাঁরা জেল-জুলুমের পরোয়া না করে বহন করে নিয়ে এসেছিলেন শোষণ ও শৃঙ্খল থেকে মুক্তির পতাকাকে। সালাম জানাচ্ছি, সফল সংগ্রামের উৎস ও ধারক বাহক বীর জনগণকে।

৪৮ এর মাতৃভাষার দাবির উন্মেষের পরে বাহান্নর একুশের গণঅভ্যুদয় পর্যন্ত চার বছরের বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামের বিশেষ পর্বের স্মারক ২৪ শে এপ্রিল। সেই সময় যুদ্ধবাজ সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে পুরানো গাঁটছড়ার পাশাপাশি নতুন করে গাঁটছড়া বেঁধে পাকিস্তানের শাসক ও শোষকচক্র গণতন্ত্রকে খতম করার উদ্দেশ্যে একদিকে যেমন পশ্চিমাঞ্চলে খান আব্দুল গাফ্ফার খান অন্যান্য গণতন্ত্রীদের এবং সেই সঙ্গে কমিউনিস্টদের কারারুদ্ধ করেছিল, তেমনি তার খাস তালুক সাব্যস্ত করে পূর্ব বাংলায় জারি করেছিল জেলজুলুমের রাজত্ব। এখানে কমিউনিস্ট ও অন্যান্য গণতন্ত্রীরা কারাগারে নিক্ষিপ্ত হয়েছিলেন। শুধু তাই নয়। শাসকচক্র রাজনৈতিক বন্দীদের রাজনৈতিক মর্যাদা দিতে অস্বীকার করে জেলখানায় চাপিয়ে দিয়েছিল দুঃসহ দুঃশাসন। ৪৮ সাল থেকেই তাই পূর্ব বাংলার অন্যান্য জেলখানার মতো; রাজশাহী জেলে রাজনৈতিক বন্দী ও বন্দিনীরা মুখোমুখি হয়েছিলেন শ্বাসরোধকর অবস্থার। সারা পূর্ব বাংলায় এই দমননীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ও অনশন ধর্মঘট করতে গিয়ে বাইরের লড়াইয়ের মতো জেলের ভিতরে লড়াইতে প্রাণ ডালি দিতে হয়েছিলে বেশ কয়েকজনকে। রাজশাহী জেলের ঘটনা এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি প্রাণঘাতী। কিন্তু শহীদদের রক্ত বৃথা যেতে পারে না। বৃথা যায় নি। রাজশাহী জেলের গুলিচালনার ঘটনাও বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামের শুধু প্রথম পর্বে নয়, পরবর্তীকালে সকল পর্যায়ে জুগিয়েছে সংগ্রামী প্রেরণা। ২৪শে এপ্রিলের শহীদেরা রয়েছেন বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামের '৪৮ থেকে ৭১'এর লাখো শহীদের কাতারের পুরোভাগে। সেদিন যে বন্দীরা অগ্নিপরীক্ষার সম্মুখীন হয়েছিলেন, তাঁরা সম্মানিত মুক্তি সংগ্রামের পতাকাবাহীরূপে। আদৃত তাঁরা মুক্তিসংগ্রামী জনগণের প্রজন্মের পর প্রজন্মের কাতারে।

২৪ এপ্রিলের শহীদ স্মরণ দিবসে এবার আমরা বিশেষ করে তিনটি বিষয়কে উপস্থিত করছি।

প্রথমত, বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামে শুরু থেকেই বিভিন্ন সামাজিক স্তরের উৎসর্গিত কর্মী ও জনগণের ধর্মনিরপেক্ষ সমাবেশ ঘটেছিল। ৭১ এর মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত স্বাধীন ও স্বতন্ত্র সার্বভৌম গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের চারনীতি গণতন্ত্র, জাতীয়তা, সমাজতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতার মধ্যেকার ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শ গোড়া থেকেই মুক্তি সংগ্রামের অন্যতম প্রধান প্রাণ সঞ্চারক বৈশিষ্ট্যরূপে কাজ করে এসেছে। রাজশাহী জেলের ২৪শে এপ্রিলের শহীদেরা এর ঐতিহাসিক স্মারক।

দ্বিতীয়ত বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামের সর্বস্তরের জনগণ, কর্মী সমাবেশ ঘটেছে। ২৪শে এপ্রিলের শহীদদের পরিচয়ের এই সত্য উৎকীর্ণ। কম্পরাম সিং এসেছেন, ঐতিহাসিক কৃষক আন্দোলন তেভাগার লড়াই থেকে। মোহাম্মদ হানিফ ও দিলওয়ার হোসেন এসেছেন শ্রমিক আন্দোলন থেকে। বিজন সেন ও সুধীন ধর এসেছেন অগ্নিযুগের বিপ্লবী স্বাধীনতা সংগ্রামীদের প্রতিনিধিরূপে। সুখেন ভট্টাচার্য ও আনোয়ার হোসেন এসেছেন ছাত্র আন্দোলন থেকে।

তৃতীয়ত বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক অধিকার অর্জন ও স্বাধীনতার সংগ্রামে কমিউনিস্ট পার্টি তথা কমিউনিস্ট আন্দোলন শুরু থেকেই সর্বাংশে শরিক থেকেছে। ২৪শে এপ্রিলের শহীদেরা এই সত্যের স্মারক। যে সাতজনকে আমরা আজ বিশেষভাবে স্মরণ করছি তাঁরা প্রত্যেকেই মার্কসবাদী-লেনিনবাদী চিন্তাধারাকে জীবনের আদর্শরূপে গ্রহণ করেছিলেন। তাঁরা বাংলাদেশের কমিউনিস্ট আন্দোলনের সংগ্রামী ও বিপ্লবী ঐতিহ্যের ধারক। তাঁদের এবং তাঁদের সেদিনের সমস্ত সাথীর অবদানকে তথা ২৪শে এপ্রিলের ঐতিহাসিক দিকটিকে জনগণের মনে সদাজাগ্রত রাখার উদ্দেশ্যে বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি ৪০ বছর পুর্তি উপলক্ষে পার্টি বিশেষ উদ্যোগ নিয়েছে।

পরিশেষে আমাদের নিবেদন এই যে, ২৪শে এপ্রিলের শহীদেরা আমাদের উপমহাদেশের সামগ্রিক স্বাধীনতা সংগ্রাম ও সমাজ বদলের লড়াইয়ের মধ্য থেকে বেরিয়ে এসেছেন। তাঁরা বিশ্ববিপ্লবের অংশ এবং সেই দিক থেকেও আদরণীয় ও স্মরণীয়।

দৈনিক কালান্তর, কলকাতা, ২৪ এপ্রিল, ১৯৮৮

বলি বলি করি, বলিতে না পারি

কবি ফয়েজ আহমেদ, ফয়েজের মৃত্যু হয়েছে ৮৪'র ২৭শে নভেম্বর। আমাদের উপমহাদেশের এই বরেণ্য মুক্তিসংগ্রামী উর্দুভাষী কবির শেষ বইটির নাম 'প্রিয়জন নগরীর সদ্যা' (শামে শহরে ইয়ারা)। এতে একটি কবিতা রয়েছে ৭৪-এর নভেম্বরে লেখা। নাম 'ঢাকা থেকে ফিরে' (ঢাকা সে ওয়াপসী পর) ফয়েজ স্বাধীন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠিত হবার পরে একবার ঢাকায় এসেছিলেন লাহোর থেকে। দেখা সাক্ষাৎ করেছিলেন পূর্বপরিচিতদের অনেকের সঙ্গে। 'ঢাকা থেকে ফিরে'র বিষয়বস্তুই হচ্ছে এই সফর। এই স্বল্পভাষী কবি অল্প কথাতেই গভীর ও দুরন্ত আবেগ ভরে রেখে গিয়েছেন তাঁর অধিকাংশ কবিতায়। 'ঢাকা থেকে ফিরে'তেও সেটা রয়েছে। বন্ধুদের সঙ্গে মিলিত হওয়াতে আনন্দিত। কিন্তু একটা আক্ষেপ দিয়ে শেষ করেছেন তিনি। তাঁর শেষ কথা। যা বলার ছিল, তা না বলাই রয়ে গেল। বলি বলি করে বলা হলো না। কবির এই বক্তব্যের ভাবটা হলো এই যে, যেন উপমহাদেশের দুটি প্রান্তের বাসিন্দারা পরস্পরের কাছে পরস্পরের অন্তর মেলে ধরতে গিয়ে মেলতে পারল না। অন্তরে জমানো জ্বালা যন্ত্রণা রয়ে গেলো অন্তরেই জমানো।

শুধু ফয়েজের কবিতার কাছ থেকে নয়, আমরা সাধারণভাবেই অবশ্য কবিতার কাছে অর্থের চেয়ে বেশি চাই ব্যঞ্জনা। ব্যাখ্যার চেয়ে বেশি চাই ইঙ্গিত। সেদিক থেকে আমরা ফয়েজের আক্ষেপের মধ্যেই তাঁর বক্তব্যের পুরোটা দেখতে পেয়েছি। তবু এই আক্ষেপের মধ্য দিয়ে আমরা একটা সাধারণ সত্যের ব্যাপারে সজাগ হতে পারি বলে আমাদের মনে হয়েছে।

বলি বলি করে বলতে না পারা হচ্ছে এমন একটা আক্ষেপ যা আমাদের কাব্যের বাইরের ব্যবহারিক জীবনকে এমনভাবে বিড়ম্বিত করে যে আমরা অনেক সময় শূন্যতার মধ্যে পড়ে যাই। অতি উচ্ছ্বাস ও অতি কথনের মধ্যেও আমাদের অন্তর যেন

নিজেকে তুলে ধরতে পারে না। প্রণয়ী ও প্রণয়িণীর ক্ষেত্রে ব্যাপারটা কি রকম নিদারুণ যন্ত্রণাদায়ক হয় তবে একটা ধারণা পেতে পারি কবিতার মাধ্যমে। দৃষ্টান্ত রবীন্দ্রনাথের 'মানসী' কাব্যের বহু কবিতা। আমাদের লোকসমাজের সহযোগী কাজকর্মে বলি বলি করে না বলতে পারার ব্যাপারটাও ঘটায় 'পরমাদ'।

এই 'পরমাদ'কে আরো দেখে আসছি বহু ভ্রাতৃত্বমূলক ডায়ালগ বা কথাবার্তায়। একই পন্থার অনুগামীদের মধ্যেও ডায়ালগ একটা আক্ষেপ রেখে যায় যে, মূলকথাটাই বলা হয়নি। রথী মহারথী থেকে শুরু করে একেবারে সর্বসাধারণ স্তরের মানুষ আমরা এই আক্ষেপের ঘেরে বারবার পড়ছি। ফয়েজের 'ঢাকা থেকে ফিরে' কবিতার আক্ষেপের মধ্যেও যে সার্থকতাটিকে পেয়েছিলাম, সেটি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আমাদের নাগালের বাইরে থেকে যায়। এ বিষয়ে দৃষ্টান্তের জন্য সাহিত্যের চৌহদ্দিতেই ফিরে আসা যাক একটু ভূমিকা করে।

ইদানিং হাতে এসেছিল প্রায় বছর পাঁচেক আগেকার একটি শারদীয় সাময়িক পত্রিকা। এতে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও সুভাষচন্দ্রের মধ্যে বিশ ও তিরিশের দশকের গভীর পারস্পরিক সৌহার্দ্য ও শ্রদ্ধার কাহিনি পড়লাম। এতে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার উল্লেখ রয়েছে, যেখানে দুজনকে কাছাকাছি বসে কথাবার্তা বলার অবস্থায় পাওয়া যায়। যদিও যাকে ডায়ালগ বলে তার অবকাশ লেখাটিতে নেই। এই কাহিনিতে লেখক জানিয়েছেন, দুয়েকটা ব্যাপারে ভিন্ন মত ছিল।

এই লেখাটি থেকে জানা যায়, শরৎচন্দ্রের মৃত্যুসংবাদ পাবার পরে সুভাষচন্দ্র কংগ্রেস প্রেসিডেন্ট হিসাবেই কংগ্রেস অধিবেশনে শরৎচন্দ্রের মৃত্যুতে শোক প্রস্তাব উপস্থাপন করেন। লেখক বেশ স্বাভাবিকভাবেই বলেছেন যে, শরৎচন্দ্র যদি চল্লিশের দশকে বেঁচে থাকতেন, তবে তিনি সুভাষচন্দ্রকে 'পথের দাবি'র নায়ক সব্যসাচীর সঙ্গে তুলনা করতেন।

'পথের দাবি' উপন্যাসটির কথা তুলেই লেখক আমাদের জন্যে একটা আক্ষেপের জমি তৈরি করে দিয়েছেন। আক্ষেপটা 'পথের দাবি' উপন্যাসের মর্মকথা নিয়ে দুজনের মধ্যে বলি বলি করি বলতে না পারি'র ঘটনাটা ঘটেছে। ১৯২৬ সালে 'পথের দাবি' প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে নিষিদ্ধ হয়ে যাবার দরুন সাম্রাজ্যবাদী শাসনের সদা উদ্ধত খড়্গের তলায় পত্রপত্রিকায় বইটি নিয়ে খোলাখুলি কথা বলার সুযোগ প্রায় ছিলই না। কিন্তু অন্ত রঙ্গভাবে আলাপ তো হতে পারত। সেটা কি হয়েছিল? মনে হয়, হয় নি। খাপছাড়াভাবে রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের মধ্যে একটা আলাপ শুরু হয়ে আর অগ্রসর হয় নি। শরৎচন্দ্র রাহুর গ্রাসকে সাময়িকভাবে মেনে নিয়ে 'শেষের পরিচয়' ও 'শেষ প্রশ্ন' উপন্যাসের পরিকল্পনায় মন দিয়েছিলেন। আমাদের উপমহাদেশে 'পথের দাবি' উপন্যাসের সামগ্রিক বৈপ্লবিক, সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী জাতীয় মুক্তিসংগ্রামী, সমাজতন্ত্রবাদী, বিশ্বমুখী, ধর্মনিরপেক্ষ ও ফ্যাসিবাদবিরোধী সত্তাটিকে শরৎচন্দ্রও কথাবার্তায় উপস্থিত করলেন না। বইটি যখন তিরিশের দশকের শেষের দিকে প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের বিধিবৈচিত্র্যের দৌলতে নিষেধাজ্ঞা মুক্ত হয়ে বেরিয়ে এলো, তখন যে দারুণ একটা হৈ চৈ হয় নি 'পথের দাবি'কে ঘিরে তার কারণ বইটির মূলমর্ম নিয়ে উচ্চবাচ্য হয় নি শরৎচন্দ্রের একান্ত অনুরাগীদের মধ্যেও। এর পরে চার দশক

চলে গিয়েছে। আমাদের উপমহাদেশের উপর দিয়ে গণ-অভ্যুত্থানের পাশাপাশি বিভেদ ও ভ্রাতৃহননের পালা চলে এসেছে পাল্লা দিয়ে। 'পথের দাবি' একই সঙ্গে গণ-অভ্যুত্থানের প্রবক্তা এবং বিভেদ ও ভ্রাতৃহননের বিরুদ্ধে নিয়েজিত হলেও আমরা একে কাজে লাগাইনি মুক্তি সংগ্রামকে অগ্রসর করার লক্ষ্যে। বইটিকে যে আমরা কিভাবে 'অনির্বচনীয়' করে রেখে দিয়েছি, তার একটি প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে ৮৫ সালের প্রথম দিকে একটি ঘটনায়।

অর্থাৎ, ঘটনার ব্যাপারে আমাদের প্রতিক্রিয়ায়। অর্থাৎ আমাদের ইতস্ততায়। ঐ বছরের শেষের দিকে দৈনিক গণশক্তির কোন রবিবারের সাহিত্যের পাতায় প্রকাশিত একটি তথ্য নিশ্চয় বহু পাঠক পাঠিকাকে চমৎকৃত করেছিল। তথ্যটি 'পথের দাবি'র উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ সংক্রান্ত। সংগ্রাহক সরকারি নথিপত্র ঘেঁটে গত ৬০ বছর ধরে চাপা পড়ে থাকা একটা নথিকে উদ্ধার করে কোন ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ ছাড়াই ছেপে দিয়েছেন। কিন্তু কোন রকম ভূমিকা ছাড়াই তথ্যটি বিশের দশকের সমগ্র সাম্রাজ্যবাদবিরোধী গণ-অভ্যুত্থানকে আমাদের চোখের সামনে হাজির করে দিয়েছে।

দশ বারো লাইনই যথেষ্ট। তদানীন্তন ভারত সরকারের আইন ও উপদেষ্টার একটি পত্র। এতে 'পথের দাবি' উপন্যাসের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপের জোর সুপারিশ করে বলা হয়েছে, 'পথের দাবি'তে যা রয়েছে তা বিশুদ্ধ 'বোলশেভিকবাদ'। বলা হয়েছে লেখক তাঁর এই উপন্যাসের মধ্য দিয়ে শ্রমিকশ্রেণীকে ক্ষেপিয়ে তুলে সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের উস্কানি দিয়েছেন।

'পথের দাবি' সম্বন্ধে এরকম একটা তথ্য উদ্ধার করে পরিবেশক যে কাজটি করেছেন, সেটিকে কিন্তু আমরা নিঃশব্দে হজম করে নিয়েছি। এরকম গুরুত্বপূর্ণ একটা উদ্‌ঘাটনকে নিয়ে আমরা হয়তো কিছু বলবো বলে মনস্থ করলেও বললাম না।

নৈরাশ্যবাদী একাকীত্ব সম্পর্কে

নৈরাশ্যবাদী ব্যক্তির বিচ্ছিন্নতাবাদ একটি আধুনিকতম দর্শন হিসেবে আমাদের দেশেও ঢেউ তুলছে। বিশ্বজগতে একাকীত্ব, দেশের ও দশের মধ্যে একাকীত্ব, কর্মে ও চিন্তারাজ্যে একাকীত্ব, পরিবার পরিজনের মধ্যে একাকীত্ব একটা কালাতিক্রমী বাস্তব সত্য নামে চিহ্নিত হচ্ছে। মায়াবাদী দর্শনের 'একেলা এসেছে তবে, একেলাই যেতে হবে' প্রভৃতি প্রতিজ্ঞা থেকে এই আধুনিক নৈরাশ্যবাদী একাকীত্বের দর্শন সম্পূর্ণ ভিন্নরূপ। পার্থিব জগতের সমস্ত রূপরসকে নিংড়ে বাদ দেয় নি এর কারবার। যে বুর্জোয়া বিষয়বাদী অহংবোধ দেশ ও দশের উপর প্রধান্যের দাবিদার, তার একটা ঝাঁজ বা রেশ বেরিয়ে এসেছে এই দর্শনের সংজ্ঞায়। এর মধ্যে আবার বুর্জোয়া অবক্ষয়ী ব্যবস্থার বিরুদ্ধে একটা ব্যক্তিসত্তার বিদ্রোহের সারসত্তাও যোগ হয়েছে। ক্রোধ হচ্ছে এর একটা লক্ষণ। কিছু না পারার ক্ষোভ। এদিক দিয়ে এই দর্শন রাগীর দর্শন। সেই ক্রোধের বা ক্ষোভের দর্শন যা ব্যক্তির মধ্যেই বুকজ্বলা দ্বীপের শিখা। বিষয়টিকে সাময়িক বুদবুদ বলে উড়িয়ে দেয়া যেত যদি এই দর্শনে সমস্ত জীবন ও জগতকে নিরর্থক বলে প্রতিপন্ন করে নৈরাশ্যকে একটা সুউচ্চ সত্যের ভান না দেয়া হতো।

বিশেষ করে ফ্রান্সে এবং এই সংস্পর্শে আরও অনেক দেশে শিল্পকলা সাহিত্যে নৈরাশ্যবাদী রাগী বিচ্ছিন্নবাদী একাকীত্বের দর্শনের গ্রাহক আছে।

বেশ কিছু আধুনিক বাংলা নাটকে এই একাকীত্ববোধ একটা তীব্র তীক্ষ্ণ সত্য বলে উপস্থাপিত হওয়ার দরুন মনে হচ্ছে, ইতোমধ্যেই বাংলা সাহিত্যেও এই বোধটাকে গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে জীবন নিয়ে যাঁরা খুব বেশি ভাবেন তাঁদের তরফ থেকে। প্রথম প্রথম মনে হতো, এইসব নাটকের কাঠামোর মধ্যে যা কিছু আসছে সেগুলো ধার করা। কিন্তু ইদানিং মনে করার কারণ ঘটেছে যাতে বলা যেতে পারে, বাংলাদেশের জীবনের বাস্তব উপকরণকে জড়িয়েও এই ধরনের চিন্তার প্রক্ষেপণ হচ্ছে। বাংলাদেশের স্বাধীনতা উত্তর সংকটের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় সম্মিলিত মোকাবেলার পটে এই একাকীত্বের দর্শন নেতিবাচক।

সুতরাং এখন পর্যন্ত শিল্পকলার কিছু কিছু অংশে এর প্রকোপ বৃদ্ধি পাওয়াটাকে লঘুভাবে উড়িয়ে দেয়ার নয়। এই একাকীত্বের নৈরাশ্যবাদী দর্শন ঘনীভূত ও সংক্রমিত হতে হতে নৈরাশ্যবাদের জন্য পাকাপাকি ঘাঁটি তৈরি করতে পারে। পশ্চিম ইউরোপের কোন কোন দেশের তরুণ সমাজে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর পঁচিশ বছরে এই ঘাঁটি এত শক্ত হয়ে বসেছিল যে, এককালের প্রথম সারির বিচ্ছিন্নতাবাদী লেখক শিল্পীরাই আজ যখন একাকীত্ববোধের বলয় থেকে বেরিয়ে আসতে চাইছেন তখন বুঝতে পারছেন, জমাট বেঁধে যাওয়া অবস্থাটাকে গলাতে সময় লাগবে। বিচ্ছিন্নতাবোধ বা একাকীত্ববোধকে তাই উপেক্ষা করাটা হচ্ছে নৈরাশ্যবাদের বিরুদ্ধে সময়মত পদক্ষেপ গ্রহণ করার প্রয়োজনীয়তাকে খাটো করে দেখা।

তবে বিচ্ছিন্নতাবোধের সংক্রমণরোধ অথবা প্রতিষেধক ব্যবস্থা যাতে লোহাপেটা হাতুড়ি দিয়ে ঘড়ি সারাই এর ব্যবস্থা হয়ে না দাঁড়ায় সেটা অবশ্যই দেখা প্রয়োজন।

নৈরাশ্যবাদী একাকীত্ববোধের বিস্তারের মূল কারণ যে জাগতিক সামাজিক-অর্থনৈতিক সংকট তার মূলোচ্ছেদের চেষ্টা না করলে একটি দর্শন হিসেবে বিচ্ছিন্নতাবাদী একাকীত্ববোধকে অহরহ চৌকি দেয়ার উদ্দেশ্যে নিছক সন্দেহবায়ু নিয়ে এমন লোককে উত্যক্ত করা হবে যে এমনিতে ভাল। তার সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করা দরকার ভিন্ন পদ্ধতিতে। কারণ এ ধরনের ব্যক্তি ব্যতিক্রম নয়। বেশ কিছু সংখ্যক সৎ ও অবিনষ্ট বিক্ষুব্ধ ব্যক্তি একাকীত্বের দর্শনের পরিপোষক হয়েছে ঘটনাচক্রে। ব্যক্তিগতভাবে ঝুনো অহংসর্বস্বদের পিছনে ছোটার তো প্রশ্নই ওঠা উচিত নয়। এটা পণ্ডশ্রম।

বিশেষ করে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তরকালে বৈজ্ঞানিকভাবে অগ্রসর ও সমৃদ্ধ ইউরোপ-আমেরিকার পুঁজিবাদী দেশগুলোতে সামাজিক-রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক বিপ্লব অসমাপ্ত থেকে যাওয়ায় যে অনির্দিষ্টতা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে প্রাধান্য বিস্তার করেছে, তার একটি পরিণাম সার্বিক জীবন থেকে নিজেকে ছিঁড়ে নিয়ে নিজের মধ্যে নিবদ্ধ করা। যদি কিছু করতে হয় একা একাই করতে হবে, এই প্রবণতা যুক্তিমাত্রিক চিন্তা হিসেবে অতি দ্রুত দানা বাঁধতে পেরেছে উপরিউক্ত অবস্থাতে।

এই প্রবণতা পোয়াবারোকামী পুঁজিবাদী সাম্রাজ্যবাদের অবক্ষয়ী প্রবক্তরা তো একপায়ে খাড়া রয়েছে তাদের প্রভাবের বলয়ের মধ্যে নিরপেক্ষ লোকদের হেঁচকাটানে

টেনে নিতে। এই হেঁচকাটানের বিরুদ্ধে একটা প্রতিরোধ আছে একাকীত্ববাদীদের মধ্যে। প্রগতির পক্ষ থেকে যাতে টানটা হেঁচকা না হয়, সেটা তাই অবশ্য বিবেচনীয়।

আমাদের মতো যে সব দেশে বহুকাল ধরে ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলোর সঙ্গে বাধ্যতামূলক আদান প্রদানে সংশ্লিষ্ট থাকায় মানসক্ষেত্রে বহু ধরনের প্রভাব ঘটেছে, সেখানে আধুনিক একাকীত্ববাদী পশ্চিমী দর্শনের ঢেউ এসে দোলা দেবে, এটা অস্বাভাবিক কিছু নয়। উপরন্ত নানা রকম অমীমাংসিত অন্তর্বর্তীকালীন সংকটের দোলাতে রয়েছেই। বিচ্ছিন্নতাবাদী দর্শন দ্বারা সৃষ্ট নৈরাশ্যকে প্রশমিত ও উৎখাত করতে হলে তাই চাই একটি বহুদর্শী ও অন্তর্দর্শী সার্বিক দৃষ্টিভঙ্গী। এই দৃষ্টিভঙ্গীকে অবশ্যই যান্ত্রিকতাবর্জিত হতে হবে।

বিচ্ছিন্নতা আর স্বার্থপরতা দুটো একার্থক নয়। বিচ্ছিন্নতা স্বার্থপরতা সৃষ্টি করতে পারে আবার স্বার্থপরতা বিচ্ছিন্নতাবোধকে চড়িয়ে দিতে পারে উনপঞ্চাশ ডিগ্রিতে। কিন্তু বিচ্ছিন্নতা স্বার্থপরতার মতো ষোলআনা সমাজবিরোধী না-ও হতে পারে। যারা স্বার্থপর নয় কিংবা দেশ ও দশ নিয়ে যারা মাথা ঘামায় তারাও তাদের মাথা ঘামানোর ব্যাপারটা নিয়ে ব্যর্থতার দরুন বিচ্ছিন্নতাবোধে আক্রান্ত হতে পারে। এই ধরনের মানুষ ব্যক্তিস্বাধীনতার মতাদর্শকে স্বয়ম্ভুর মর্যাদা দিতে গিয়েও বিচ্ছিন্নতার প্রবক্তা হয়ে উঠতে পারে। এই কারণেই, কেউ বিচ্ছিন্নতাবোধে সংক্রমিত হয়েছে জানতে পারলেই তাকে প্রতিক্রিয়াশীল বলে ছাপ না মেরে বুঝবার চেষ্টা করা দরকার।

দেশের বৈপ্লবিক রূপান্তর সাধনের লক্ষ্যে আশাবাদী ধ্যান-ধারণা ও কর্মকাণ্ডকে সফল করার জন্য প্রয়োজন বিপুল সামাজিক শক্তি, যার মেরুদণ্ডের কাজ করবে শ্রমিকশ্রেণী। এই সামাজিক শক্তির মধ্যে তারাও আসতে পারে যারা নিছক ব্যক্তি স্বাধীনতার জন্যও অতি-ঔৎসুক্যের দরুন অথবা সামাজিক ও জাগতিক মঙ্গল সাধনের জন্য ব্যর্থ হয়ে একাকীত্ববোধের নৈরাশ্যের চক্রে গিয়ে পড়েছে। ব্যক্তি স্বাধীনতার জন্য অতি-ঔৎসুক্য একটা পরিমাণগত বিচ্যুতি হতে পারে। স্বাধীনচেতা মানুষেরা এ ধরনের বিচ্যুতির পাকে আটকে না পড়লে দেশের বৈপ্লবিক রূপান্তর সাধনে সামাজিক শক্তির অপরিহার্য কর্মী হবে। জাগতিক মঙ্গল সাধনের ব্যর্থতা যদি তাদের কারণ হয় নৈরাশ্যবাদী। একাকীত্বের অবস্থান নেবার, তাহলে সেখান থেকে সমষ্টির বৈপ্লবিক বলয়ে ফিরে আসার নিশ্চয়তা নির্ভর করবে আশাবাদী দিকটাকে তাদের সামনে উজ্জ্বল ও অনিবার্য করে তোলার ওপর। কোথায় বাস্তব প্রয়োগের মধ্যে আমাদের দেশেও আশাবাদী দিকটা বাস্তবায়িত হচ্ছে, তার পরিষ্কার ছবি তুলে ধরা চাই এই প্রকরণেই।

সাপ্তাহিক একতা, ২১শে ফেব্রুয়ারি, ১৯৭৫

সাম্যবাদী প্রত্যয়ের প্রশ্নে

কোন একটি আকাঙ্ক্ষিত জগৎ অনিবার্য বললেই যারা সে জগৎকে চায় তাদের মনে আত্মসন্তুষ্টি জাগতে পারে। কিন্তু প্রত্যয় আত্মসন্তুষ্টিকে সহ্য করে না। প্রত্যয়ের সঙ্গে জড়িত সংগ্রাম। এখানে এই সংগ্রামী সাম্যবাদী প্রত্যয়কে সামনে রেখে এর নিরীক্ষায় প্রবৃত্ত হওয়া যেতে পারে।

॥ ১ ॥

উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময় থেকে বর্তমান শতাব্দির শুরু পর্যন্ত সাম্যবাদী প্রবক্তারা বৈজ্ঞানিক সাম্যবাদ বা কমিউনিজমের অনিবার্য সফলতা সম্বন্ধে যেসব সংগ্রামী সূত্র দাখিল করেছিলেন, শতাব্দির দ্বিতীয়ার্ধে সেগুলি শুধু তথ্যে নয় তত্ত্বেও স্বাভাবিকভাবেই প্রসারিত হয়েছে। ১৯১৭ সালে রুশ অক্টোবর সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পর থেকে বিশ্বের দিকে দিগন্তে তরঙ্গে তরঙ্গে বৈজ্ঞানিক সাম্যবাদের যে বৈপ্লবিক প্রয়োগক্ষেত্র রচিত হয়েছে, সেখানে বাস্তব জীবনের নব নব বিন্যাস চেয়েছে জীবন সত্যের ব্যাখ্যার ব্যাপারেও সম্প্রসারিত বক্তব্য। এ জন্যে মার্কস-এঙ্গেলস-লেনিনের রচনাবলির মধ্য থেকে যেমন ভবিষ্যতের ইঙ্গিতময় সূত্রগুলিকে প্রাধান্য দেয়া দরকার হয়ে পড়েছে, তেমনি প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার শিক্ষা নিয়েও মার্কসবাদের ধারাবাহিকতার নতুন নতুন সূত্রের সংযোজন হয়েছে। বৈজ্ঞানিক সাম্যবাদের প্রয়োগে প্রাথমিক ধাপ যে সমাজতান্ত্রিক বিন্যাস তা থেকে সাম্যতন্ত্রে উপনীত হবার কাজ এখন একটা বাস্তব কর্মকাণ্ড। সুতরাং এর অভিজ্ঞতা সাম্যবাদের সত্যকে বিস্তারিত নিতে বাধ্য। মার্কস এবং এঙ্গেলসের আগে ভাববাদী সাম্যবাদের প্রবক্তারা মানব সমাজের অতীত ও বর্তমানের বিকাশের সংঘাতময় ধারাকে এড়িয়ে গিয়ে যেসব বিচ্ছিন্ন ভবিষ্যৎবাদী কল্পস্বর্গের সুপারিশ করেছিলেন, সেগুলি থেকে বৈজ্ঞানিক সাম্যবাদকে পৃথকভাবে চিহ্নিত করার জন্য মার্কস এবং এঙ্গেলস ভবিষ্যতের রূপরেখাকে সাধারণভাবে ভবিষ্যতেই নিহিত রাখতে চেয়েছিলেন সংক্ষিপ্ত ইঙ্গিত আর ইশারা মারফত। এই জন্যেও সাম্যবাদী সমাজের রূপরেখাকে স্পষ্ট করতে হয়েছে বর্তমান শতাব্দির সাম্যবাদী বিপ্লবের প্রয়াসী ও প্রযোজকদের। সাম্যবাদের বিরোধীরা আপত্তির খড়কুটো করে তিলকে তাল করে কিংবা চোখে ঠুলি এঁকে সূর্যের মত উজ্জ্বল সত্যকেও দেখতে অস্বীকার করে বৈজ্ঞানিক সাম্যবাদের অনিবার্যতাকে রোধ করার জন্য যেসব যুক্তি উপস্থিত করে আসছে, সেগুলিকে খণ্ডন করার জন্যেই হোক অথবা সাম্যবাদেরই প্রয়োগের ক্ষেত্রে জটিলতার দরুন অভ্যন্তরীণ ঘাত-প্রতিঘাতের দরুন যে সব সংশয়ের সৃষ্টি হচ্ছে সেগুলিকে দূর করার জন্যই হোক, মার্কসীয় প্রত্যয়ের বৈপ্লবিক সংযোজনগুলি বেরিয়ে আসছে বিপ্লবকে এগিয়ে নিয়ে চলার তাগিদেই।

তবে মার্কসীয় প্রত্যয়ের এইসব বৈপ্লবিক সংযোজনকে নিরন্তর অভ্যন্তরীণ বিতর্কের প্রশ্নাবলিতে প্রবৃত্ত হতে হয়েছে। বৈজ্ঞানিক সাম্যবাদী বিপ্লবের জয় যেমন অবধারিত বলে প্রমাণিত, তেমনি এর প্রসারের পথে বিতর্কমূলক অভ্যন্তরীণ প্রশ্নের উদ্রেকও অবধারিত বলে দেখা গিয়েছে।

বিতর্কমূলক প্রশ্নাবলিকে এড়িয়ে গিয়ে সাম্যবাদী বিপ্লবীরা এদের মীমাংসা করতে পারেন নি।

এইসব বিতর্কের মধ্যে অভ্যন্তরীণভাবেও সাম্যবাদী বিপ্লবীদের স্বতঃস্ফূর্তভাবে অথবা সচেতনভাবে শরিক হতে হয়েছে।

বৈপ্লবিক কাজের ব্যাপারে যতই না কেন শ্রমবিভাগ থাকুক, চেতনার দায়িত্বের ব্যাপারে কোন শ্রমবিভাগকে বৈজ্ঞানিক সাম্যবাদীরা মেনে নিয়েছেন কি কখনও?

চেতনার দায়িত্ব অবিভাজ্য। বৈজ্ঞানিক সাম্যবাদ কোন একটি মানুষের মুক্তির জন্যে নয়, সমস্ত মানুষের জন্যে নিয়োজিত। সমস্ত মুক্তিকামী মানুষকে প্রত্যেক মুক্তিকামী মানব মানবীকে যতক্ষণ না পর্যন্ত বৈজ্ঞানিক সাম্যবাদ তার চেতনায় শরিক করে নিতে পারছে, ততক্ষণ এর স্বস্তি নেই।

॥ ২ ॥

বৈজ্ঞানিক সাম্যবাদের আন্তর্জাতিক প্রয়োগ ক্ষেত্রের অভ্যন্তরীণ মতপার্থক্য এবং বিশেষ করে চীন-রুশ মতপার্থক্যের দরুন সত্য নির্ধারণ ও প্রমাণের ক্ষেত্রে যে দুরূহ সমস্যার উদ্ভব হয়েছে, তাতে সাম্যবাদী প্রত্যয়ে নতুন কিছু সংযোজনের প্রামাণ্যতা খুবই কঠিন কাজ হয়ে পড়েছে সন্দেহ নেই। যার যার দেশ তার তার মাথাব্যথা বলে এই দুরূহ সমস্যা থেকে রেহাই পাওয়ার চেষ্টাও কোন কোন সাম্যবাদী বিপ্লবী করেছেন।

কিন্তু বৈজ্ঞানিক সাম্যবাদের উদ্ভব ও গতিপরিণতির এতাবৎকালের ইতিহাস আমাদের দেখিয়ে দেয় যে, মার্কস-এঙ্গেলসের জীবিত থাকাকালেও বৈজ্ঞানিক সাম্যবাদের অভ্যন্তরীণ বিতর্কে ফুল ছড়ানো ছিলনা।

কার্ল মার্কসের 'ক্রিটিক অব গোথা প্রোগ্রাম' নিবন্ধ এ প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কার্ল মার্কসের এই নিবন্ধের সূত্রগুলি তাঁর সেই সাথীদের বিভ্রান্তির বিরুদ্ধে উচ্চারিত, যাঁরা প্রয়োগ ও চিন্তার ক্ষেত্রে মার্কস-এঙ্গেলসের ঘনিষ্ঠ সহচর্য সত্ত্বেও একটি বিশেষ দেশে (জার্মানিতে) সমাজতান্ত্রিক লক্ষ্য প্রণয়ন করতে গিয়ে কল্পনা বিলাসিতায় প্রবৃত্ত হয়েছিলেন।

কার্ল মার্কস তাঁর অত্যন্ত প্রিয় সাথীদের ভুলের সমালোচনা করেছিলেন নির্মমভাবে। বৈজ্ঞানিক সাম্যবাদকে যেমন তিনি ঐতিহাসিকভাবে অনিবার্য ও অবধারিত বলে প্রমাণিত করেছিলেন, তেমনি তিনি একথাও বুঝিয়ে দিয়েছিলেন যে, বৈজ্ঞানিক সাম্যবাদ একটি বাস্তবতা-প্রসূত প্রস্তাব, একটি ক্রমফলপ্রসূ পর্যায়ভিত্তিক প্রক্রিয়া।

এ কথাগুলি অত্যন্ত রূঢ়ভাবেই বলেছিলেন কার্ল মার্কস। 'ক্রিটিক অব গোথা প্রোগ্রাম' হচ্ছে বৈজ্ঞানিক সাম্যবাদের অভ্যন্তরীণ বিতর্কের একটি তীক্ষ্ণতম দলিল।

কিন্তু এ কথাও উল্লেখ করা দরকার যে, কার্ল মার্কস যে সাথীদের সমালোচনা করেছিলেন, তাঁদের সাথী হিসেবেই সামনে রেখেছিলেন। সমগ্র সত্য সব সময় চোখের সামনে থাকে না, এ সত্য তিনি মর্মে মর্মে জানতেন, কারণ তিনি এবং তাঁর সাথী এঙ্গেলসই দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের প্রবর্তক। জ্ঞানের ক্ষেত্রেও এই দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদকে প্রমাণিত করেছিলেন তিনি এবং এঙ্গেলস। সমগ্র সত্য সব সময় চোখের ওপর ভেসে না ওঠার ব্যাপারটা শুধু বিচ্যুতির কারণেই ঘটে না। সত্যকে যেমন জানতে পারে উদ্যোগী বিপ্লবীরা, তেমনি একে জানায় সময়, অভিজ্ঞতা, ইতিহাস। সুতরাং না বুঝতে পারাটা অনতিক্রমণীয় নয়। সত্য বা তথ্য যখন উদ্‌ঘাটিত হয়, তখন যদি তাকে পাশ কাটিয়ে যাওয়ার চেষ্টা হয়, তবে সেটাই হয় বিচ্যুতি, সেটাই হয় ভুল। এমনকি আগেকার বৈজ্ঞানিক প্রতিপাদ্যের যদি সংযোজনের প্রয়োজন হয়, তবে তাই করে নিতে হয়। চিরকালের জন্য উচ্চারিত সত্যেরও উনিশ-বিশ করে নিতে হয়।

এটা হচ্ছে বৈজ্ঞানিক সাম্যবাদীর নিজেকে শিক্ষা দেবারও দিক।

কোন কিছুতে কল্পনাবিলাসিতা ও আত্মতুষ্টি যেমন ভ্রান্ত, তেমনি কোন কিছুকে নিখাদ বিপ্লবের নামে আঁকড়ে ধরতে যাওয়াটাও সেই বিপ্লবকেই ব্যাহত করে, কারণ এই 'আঁকড়ে ধরার' প্রবণতা সমগ্র সত্যকে ক্ষুণ্ন করে।

কার্ল মার্কসের এবং এঙ্গেলসের মর্মে মর্মে জাগরুক ছিল এই শিক্ষা। জীবন চিরবিকাশমান। বৈজ্ঞানিক সাম্যবাদ তারই অনিবার্য নির্দেশ। জ্ঞানে, কর্মকাণ্ডে, তত্ত্বে, তথ্যে, সাধনায়, সংগ্রামে, বিপ্লবের ভাঙায় গড়ায়।

যান্ত্রিক পৌনঃপুনিকতা এবং আপ্তবাক্যের অখণ্ডনীয়তা এখানে অগ্রাহ্য সাথীরা যত বড় সাম্যবাদী বিপ্লবীই হোক না কেন, তারা যাতে একটা সিদ্ধান্ত বা প্রস্তাব গ্রহণ করে সেগুলিকে অনড় বলে নির্দিষ্ট করে না বসতে পারে, তারই তাগিদ হচ্ছে মার্কসীয় আত্মসমালোচনা।

কার্ল মার্কস এবং এঙ্গেলস নিজেদের উচ্চারিত বক্তব্যকে (সে বক্তব্য যতই না কেন চিরকালের জন্যে উচ্চারিত সত্য হোক) আঁকড়ে ধরে থাকতে চান নি। কমিউনিস্ট ইস্তাহারের প্রথম প্রখ্যাত পঙ্‌ক্তিরই সংযোজন দিতে দ্বিধা করেননি তাঁরা–কমিউনিস্ট ইস্তাহার রচনার দুই দশক পরে।

কার্ল মার্কস ও এঙ্গেলস এই প্রথম পংক্তিতে লিখেছিলেন "এতাবৎকাল পর্যন্ত চলে-আসা সমস্ত সমাজের ইতিহাসটাই হচ্ছে শ্রেণি সংগ্রামের ইতিহাস।" কিন্তু হেনরি সুইস মরগ্যান তাঁর, 'প্রাচীন সমাজ' গ্রন্থ মারফত যখন জানলেন যে, প্রাগৈতিহাসিক যুগে ট্রাইব্যাল সমাজে আদিম সাম্যবাদী ব্যবস্থা ছিল, তখন এই সংযোজনটিকে মার্কস এঙ্গেলস গ্রহণ করলেন এবং কমিউনিস্ট ইস্তাহারের পরবর্তী সংস্করণে এই সংযোজনটিকে লিপিবদ্ধ করলেন।

মার্কস ও এঙ্গেলস সত্যের স্বার্থে নিজেদের উদ্ভাবিত সূত্রগুলিকে এইভাবে ক্রমাগত যাচাই করে নিতে দ্বিধা করেন নি বলেই সাথীদের প্রণীত সূত্রগুলিকে যাচাই করার ব্যাপারে কোন রকম দ্বিধা-দ্বন্দ্ব জাগে নি তাঁদের মনে।

মার্কসের বিখ্যাত উক্তি 'শিক্ষাদাতাদের শিক্ষিত করতে হবে'–এই প্রসঙ্গেও বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। জগৎ ও জীবনের উন্মোচনে বস্তুবাদকে যারা যন্ত্রবাদে পর্যবসিত করে ভাবের সক্রিয় ভূমিকাকে নাকচ করে দেয়, তাদের ভ্রান্তি দেখাতে গিয়ে জগতের পরিবর্তনের সঞ্চালক শক্তি হিসেবে ভাবের প্রয়োজনকে সামনে এনে মার্কস উপরিউক্ত উক্তি করেছিলেন।

জীবনের কাছ থেকে অবিশ্রান্তভাবে বিপ্লবীকে শিক্ষা নিতে হবে জীবনের বিপ্লবাত্মক উপাদানগুলিকে–চেতনার উপাদানগুলিকে–বাস্তবের উপাদানগুলিকে বিজ্ঞানসম্মত সাম্যবাদী জগৎ গড়ে তোলার কাজে লাগানোর জন্যে।

এই চিরবিপ্লবী সচল দর্শনই হচ্ছে মার্কসীয় বৈজ্ঞানিক সাম্যবাদী দর্শন।

১৯১৭ সালের অক্টোবর মাসে রুশ সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সারা বিশ্বে যে বৈজ্ঞানিক সাম্যবাদী সমাজের বৈপ্লবিক প্রসারশীল ভিত্তি স্থাপন করে, সেটা সেই মুহূর্তে যে, যতটা কীর্তি তার চেয়ে বেশি সম্ভাবনা ছিল, একথাটা আমরা সব সময় খোলাখুলি বলতে পারি নি বলেই, যখন এই কীর্তির ক্ষেত্রে সংকটের সৃষ্টি হয়েছে, তখনই বাইরে একটা 'বুঝ' বুঝিয়ে দিতে চেষ্টা করলেও অন্তরে অন্তরে কাঁটা হয়ে উঠেছি।

অথচ আমাদের বুঝে নেওয়া উচিত ছিল এবং আজও বুঝে নেওয়া উচিত যে, সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব শুরুতেই এমন কতকগুলি কর্মকাণ্ডে হাত দিয়েছিল, যেগুলি হাজার হাজার বছরের দেশ ও সমাজব্যবস্থার, দেশ ও সমাজচিন্তায় এবং বিশ্ব ও মানবচিন্তায় একই সঙ্গে সর্বাত্মকভাবে আমূল পরিবর্তনের সূচনা করেছে। গত পঞ্চাশ বছরে এই পরিবর্তনের প্রাথমিক অধ্যায়গুলির উন্মোচন হয়েছে মাত্র। জগতের এই সম্পূর্ণ নতুন পথে চলার ব্যাপারে বিচ্যুতি ঘটা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। (অবশ্য, বিচ্যুতি ধরা পড়া মাত্র তাকে কাটিয়ে ওঠায় অবশ্য করণীয় বলে বিবেচিত হতে বাধ্য।)

সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব তথা বৈজ্ঞানিক সাম্যবাদী বিপ্লব তথা মার্কসবাদী লেনিনবাদী বিপ্লব বর্তমান শতাব্দির শুরুতে একই সঙ্গে যে সর্বাত্মক যুগান্তকারী পরিবর্তনগুলির সূচনা করে, সেগুলি মূলত মানুষে মানুষে বৈষম্য ও ভেদাভেদের অবসান করার তাগিদকে একই সঙ্গে অনেকগুলি কর্মকাণ্ডে নিয়োজিত করেছে। এই কর্মকাণ্ডগুলি হচ্ছে :

(১) এক জাতির উপর আরেক জাতির আধিপত্যের অবসান এবং জাতিতে জাতিতে বৈষম্যের অবসান।

(২) কায়িক ও মানসিক পরিশ্রমের বৈষম্যের অবসান

(৩) নগর ও গ্রামের পার্থক্যের অবসান

(৪) কৃষি ও শিল্পর উৎপাদনগত বিষমতার অবসান

(৫) নারী ও পুরুষের কর্মগত ও মানবতার বৈষম্যের অবসান

(৬) শ্রমিকশ্রেণীর বৈপ্লবিক একনায়কত্ব মারফত শ্রেণিহীন সমাজ স্থাপন ও রাষ্ট্রের অবলুপ্তি-সাধন

(৭) সমষ্টি ও ব্যক্তিগত দ্বন্দ্বের অবসান

অর্থনৈতিক উপরকণগুলিকে ব্যক্তিগত মালিকানা থেকে মুক্ত করার পরে সামাজিক মালিকানা ব্যবস্থায় যার যেমন কাজ তার তেমনি পারিশ্রমিকের সমাজতান্ত্রিক নীতি দ্বারা প্রতিটি ব্যক্তিকে এমন একটা সাম্যবাদী মনোভাবে পৌঁছে দেওয়া যেখানে ব্যক্তিগত সম্পদের তাগিদ তো দূরের কথা, পারিশ্রমিক ছাড়াই প্রতিটি মানুষ অপরের জন্যে সানন্দে কাজ করবে।

সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব 'ডিক্রী জারী' করে জানিয়ে দেয় যে, এ কাজগুলি বৈপ্লবিকভাবে শুরু হয়ে যাক।

কিন্তু লেনিন 'ক্রিটিক অব গোথা প্রোগ্রামের' কথা প্রথমেই স্মরণ করেছিলেন। এই সমস্ত কাজগুলি যে একটা অবিভাজ্য কর্মসূচির ক্রমবিকাশমান প্রক্রিয়া এ সম্বন্ধে 'রাখঢাক' করার লোক ছিলেন না তিনি।

রাশিয়ার বাইরের এবং ভিতরের শ্রেণিশত্রুদের প্রচণ্ড মরণ কামড়ে ক্ষত-বিক্ষত ও ধ্বস্ত-বিধ্বস্ত হয়েছে প্রাথমিক বিপ্লবী-নির্মাণের বিন্যাসগুলি। সোভিয়েত বিপ্লবীরা এইসব আঘাতকে প্রতিহত করেছে। তবে জীবনের এই মৃত্যুঞ্জয়ী সংগ্রামের দরুন বিপ্লবী বিন্যাসের পর্যায় পরম্পরা নির্ধারণে সময়সূচির রদবদল করতে হয়েছে।

বিপ্লবী শক্তিগুলির অভ্যন্তরীণ বিচ্যুতি ও বিভ্রান্তি কাটিয়ে ওঠার সংগ্রাম ও সময়সূচি রক্ষা করার কর্মকাণ্ডের প্রতিবন্ধকতা ঘটিয়েছে। কিন্তু এতে বিপ্লবী নির্মাণকার্যে সেরকম

কোন অপহ্নব ঘটেনি, যে রকমটি ঘটেছিল ফরাসি বিপ্লবের "সাম্য মৈত্রী স্বাধীনতার" সামাজিক রাজনৈতিক বিন্যাসের ক্ষেত্রে।

এর কারণ বৈজ্ঞানিক সাম্যবাদ ইতিহাসের কাছ থেকে জীবনের কাছ থেকে সেই প্রত্যয় আর শিক্ষা নিয়েছে যাকে ফরাসি বিপ্লবের নায়কেরা আয়ত্তের মধ্যে পান নি ঐতিহাসিক কারণেই।

প্রথমত, সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের নীতি নির্ধারকেরা একটি সামগ্রিক বিপ্লবী সামাজিক ও রাজনৈতিক বিন্যাসকে তার অনিবার্য প্রক্রিয়াতে অব্যাহতভাবে চলার গতি সঞ্চার করে দিতে পেরেছেন।

দ্বিতীয়ত, তাঁরা বৈজ্ঞানিক সাম্যবাদের প্রত্যয়ের জীবনভিত্তিকতাকে পেয়েছেন মার্কসীয় আত্মসমীক্ষার মূল শ্রোতধারায় লেনিনের সামগ্রিক জীবনদর্শিতার সূত্রসমূহ মারফত।

॥ ৩ ॥

পরবর্তীকালে, সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের অনুরূপ কর্মকার্যের সর্বাত্মক প্রাথমিক বিন্যাস নিয়ে আরও কয়েকটি দেশে বৈপ্লবিক সাম্যবাদী সমাজ সূচিত হয়েছে।

এতে বৈজ্ঞানিক সাম্যবাদী বিপ্লবের বিশ্বব্যাপী সাফল্যের অনিবার্যতা যেমন প্রমাণিত হয়েছে, তেমনি এর অভ্যন্তরীণ বিচ্যুতির সম্ভাবনার ক্ষেত্রেও প্রসারিত হয়েছে। একদিকে কল্পনাবিলাস ও আত্মতুষ্টি এবং অন্যদিকে নিঠুর দরদীর জোর করে ফুলফোটানোর প্রচেষ্টার মাঝখানে জীবনের বৈপ্লবিক উন্মোচনের কাছ থেকে ছাড়পত্র নিয়ে কর্মকাণ্ড ও সঠিক নির্মাণনীতি নিয়োজনের জন্যে বিতর্কের মধ্যে হলাহলও উপচে পড়েছে।

সাম্যবাদী প্রত্যয়কে এই হলাহল থেকে মুক্ত করার জন্যে নীলকণ্ঠ বিপ্লবীর অভাব হবে না। হয় নি কোনদিন। এই বিতর্ক বিভিন্ন দেশের বিভিন্নতা অনুযায়ী স্বয়ম্ভরতার দাবি নিয়ে হয়তো বা আন্তর্জাতিক জটিলতাকে এড়িয়ে যেতে পেরেছে অথবা পারার চেষ্টা করেছে। কিন্তু বৈজ্ঞানিক সাম্যবাদ একটি বিশ্বব্যাপী বিপ্লব প্রক্রিয়া, যদিও দেশকে জাতিকে কখনও অস্বীকার করা হয় নি এতে। 'কমিউনিস্ট ইস্তাহার' বৈজ্ঞানিক সাম্যবাদের এই দ্বৈত সত্য তথা একই সঙ্গে বিশ্ব ও দেশ নিয়ে কর্মকাণ্ড রচনার তাগিদকে ব্যাখ্যা করেছিল। ব্যাখ্যা করেছিল শোষণহীন সমাজ কিভাবে আসবে প্রাথমিক বিন্যাস সমাজতন্ত্রকে পূর্ণ সাম্যতন্ত্রে উন্নীত করে।

সুতরাং, সাম্যবাদী প্রত্যয়কে যাচাই করে নিতে হবে আন্তর্জাতিক সাম্যবাদী সহযোগিতার মারফত।

যে সব দেশে এখন বৈজ্ঞানিক সাম্যবাদী বিপ্লব প্রাথমিক সাফল্যের বিন্যাস রচনাতেও ব্রতী হতে পারে নি, তারাও আন্তর্জাতিক সাম্যবাদী বিপ্লবের বিতর্কে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত থাকছে, কারণ, বর্তমান শতাব্দির মুক্তি সংগ্রামের সমস্ত অগ্রসর ও অনগ্রসরধারা বৈজ্ঞানিক সাম্যবাদী বিপ্লবের অনিবার্য গতিধারায় প্রভাবিত। তবে স্বয়ন্ত রতার দাবি এবং দেশ এখন করতে না পারায় কোন কোন ক্ষেত্রে এদের পরমুখাপেক্ষী হতে হচ্ছে। এই কারণে এইসব দেশে অভ্যন্তরীণ বিচ্যুতি কম না হয়ে যদি কোথাও বেশি হয়ে থাকে সেটা অস্বাভাবিক হয় নি।

কিন্তু, সাম্যবাদী প্রত্যয় অবিভাজ্য। সুতরাং এ সব থেকেও বেরিয়ে আসবে অপরাজিত জীবনের উন্মোচন থেকে সত্যের চির উপচীয়মান নির্ঝর ধারা।

বুদ্ধিজীবী ও নানা প্রশ্ন, কলিকাতা, ১৯৭১

মার্কসবাদ কি অপ্রস্তুত?

॥ ১ ॥

আমাদের তৃতীয় বিশ্বের বেশির ভাগ দেশে মার্কসবাদ এই মুহূর্তে মনুষ্যত্বের সার্বিক বিকাশের ভাবাদর্শ হিসেবে বিশেষ সঙ্গীন পরিস্থিতি ও প্রচণ্ড দায়িত্বের সম্মুখীন। মার্কসীয় তত্ত্বের মূল চিন্তাগুলিকে গুছিয়ে নিয়ে পরিস্থিতিকে জয় করতে হবে। পরিস্থিতিটা নিম্নরূপঃ

ধ্বসে যেতে থাকা পুঁজিবাদী বিশ্বের অবস্থাকে সালাম দিতে যুদ্ধবাজ সাম্রাজ্যবাদ বিভিন্ন দেশের পুঁজিপতিগোষ্ঠী ও তাদের তল্পিবাহকদের উপর ভর করে জনমানসের ভারসাম্যকে ধ্বংস করে দেবার জন্য পরিকল্পিত ও ব্যাপক অভিযান শুরু করেছে। জনগণকে বিভ্রান্ত, দিকভ্রান্ত ও বিভক্ত রাখাই মতলব। তাহলে এরা নির্বিবাদে স্বাধীনতা, সমাজতন্ত্র ও শান্তির সংগ্রামকে স্তব্ধ করে দিতে পারবে, বেড় দিয়ে রাখতে পারবে পুঁজিবাদী সাম্রাজ্যবাদী শাসন ও শোষণের কাঠামোকে, জ্বেলে রাখতে পারবে দ্বিতীয় যুদ্ধের আগুন। এই আগুন দিয়ে এরা একটা বিশ্বযুদ্ধ ঘটাতে চায়।

জনমানসকে উদভ্রান্ত করার এই প্রচণ্ড প্রচার অভিযানের ফলগুলোকে সাম্রাজ্যবাদ ও তার ধারকবাহকেরা বিশেষ করে মার্কসবাদের বিরুদ্ধে নিয়োজিত করেছে। এই আক্রমণ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকেই চলছে। তবে প্রচারের ধারা দেখে মনে হয় আশির দশকে মার্কসবাদের মূল চিন্তাধারাকে এরা টেনে ছিঁড়ে ফেলতে চায়। জনমানসে ব্যবহারিকভাবে মার্কসবাদের যে আবেদন দীর্ঘ মুক্তিসংগ্রামের মধ্য দিয়ে গড়ে উঠেছে, তাকে বিনষ্ট করার চেষ্টার সঙ্গে সঙ্গে মার্কসবাদী ভাবাদর্শের মৌল আবেদনকেও উৎখাত করার জন্য এরা উঠে পড়ে লেগেছে। এই উদ্দেশ্য নিয়ে মনুষ্যত্বের এই শত্রুরাই ভাড়াটে বুদ্ধিজীবীদের জবানীতে মার্কসবাদকে মানবতাবিরোধী, স্বাধীনতাবিরোধী, ধর্ম ও ন্যয়বিরোধী, নৈতিকতাবিরোধী, জড়বাদী যান্ত্রিক, স্বৈরাচারী, ঐতিহ্যবিরোধী ইত্যাদি বানোয়াট সাজে সাজিয়ে জনগণের সামনে দাঁড় করাচ্ছে। জনমানসকে একেবারে নিরাশ্রয় করে দিতে চায় এরা। ইতোপূর্বে এরা জনজীবনে জাতীয় বুদ্ধিজীবীদের মূল্যবোধগুলিকে খর্ব করেছে।

এই অবস্থায় মার্কবাদের শুদ্ধনীতি ও আদর্শের আলোকে নির্ধারিত মৌল বিপ্লবী মানবতাবাদী মূল্যবোধগুলিকে জনমনে নতুন করে গুছিয়ে তোলাটা একটা বড় রকমের তাত্ত্বিক লড়াইয়ের রূপ নিতে বাধ্য। সাময়িক ছোটখাট কৌশল দিয়ে এই লড়াইয়ের কিনারা করা যাবে না। লড়াই মূল চিন্তার, প্রয়োগকে অবশ্যই বাদ দিয়ে নয়।

নানাকারণে, ইতোপূর্বেও ঘটেছে এবং আজও সেটা ঘটছে। মার্কসবাদী পরিচয়কে খারিজ না করেও কোন কোন মহল না বুঝে শুনে কিংবা জেনেশুনেই মার্কসবাদের মূল চিন্তা ও নীতিগুলিকে পরিহার করতে কিংবা একেবারে গৌণ করে রাখতে চাইছে।

অর্থাৎ এরা প্রয়োগের যে মাত্রাকে প্রয়োজনীয় মনে করছে তাকেই সর্বেসর্বা করে তুলছে। সংগ্রামী জনগণের মনে প্রয়োগের যে আবেদন রয়েছে, তাতে সাময়িকভাবে এরা কিছুটা আত্মপ্রসাদও লাভ করছে। কিন্তু এতে মার্কসবাদ মার খেতে বাধ্য। এটা নিশ্চয় মূল চিন্তার দিক দিয়ে উদ্বেগজনক। এখানেই প্রশ্নটা ফিরে আসতে পারে, মার্কসবাদ কি অপ্রস্তুত? না, ব্যাপারটা, সেরকম নয়। মার্কসবাদের মূল চিন্তায় খোঁজ চলছে অবিরাম। সারা বিশ্বে কাজ হবেই এই নিয়ে। সমস্ত মূল প্রশ্নেই মার্কসবাদ সাম্রাজ্যবাদের হামলার বিরুদ্ধে পাল্টা প্রচার অভিযান চালাবার জন্য তৈরি। লেনিনের ভাষায় মার্কস-এঙ্গেলস-মার্কসবাদ এর মানবতাবাদী সমাজতান্ত্রিক উৎস ধ্যান-ধারণাগুলি পুনর্জাগরিত। এখানে তারই কয়েকটি দৃষ্টান্ত দাখিল করছি। দৃষ্টান্ত একাধিক। সমস্তই হাল আমলের, যখন মার্কসবাদের বয়স শতাব্দি ছাড়িয়ে গেছে।

॥ ২ ॥

আমাদের উপমহাদেশের ইতোপূর্বে রাহুল সাংকৃত্যায়ন মার্কসবাদের মূল চিন্তা নিয়ে যে বিস্তারিত কাজ করেছেন, সেগুলি চল্লিশ ও পঞ্চাশের দশকের। তবে রাহুলের 'মানব সমাজ' ও 'বস্তুবাদ' কিংবা 'ভল্গা থেকে গঙ্গা' আমাদের উপমহাদেশের নিজস্ব আবহে মার্কসবাদের মূল চিন্তাকে যে সুদূরপ্রসারী মাত্রায় উপস্থিত করেছে, তাতে আমাদের জনগণ আশির দশকেও প্রাণবন্ত প্রত্যয় পেতে পারে।

ষাটের দশকে আমরা পেয়েছি অধ্যাপক ডি.ডি. কোসাম্বীর 'পুরাণ ও বাস্তবতা।' অধ্যাপক কোসাম্বী এই গ্রন্থে ভগবদগীতা এবং উর্বশী প্রভৃতি পৌরাণিক বিষয়ে মার্কসীয় ঐতিহাসিক বস্তুবাদ প্রয়োগ করেছেন। এই বইটি পড়ার পরে কেউ কি বলতে পারে, মার্কসবাদ যান্ত্রিক জড়বাদী?

সত্তরের দশকে আমরা পেয়েছি উর্দু ভাষায় 'মুসা থেকে মার্কস' গ্রন্থ। লেখক পাকিস্তানের কমিউনিস্ট বুদ্ধিজীবী সিবতে হাসান, বিষয়ঃ আদিম সাম্যবাদ থেকে মার্কস-এঙ্গেলস-মার্কসবাদ পর্যন্ত বিশ্বইতিহাসে সমাজতন্ত্রবাদের ধারায় সাম্যবাদী চিন্তা ও প্রয়াসের গতি-পরিণতি ফরাসি বিপ্লব হয়ে মার্কস ও এঙ্গেলসের যুগান্তকারী মৌল চিন্তার সূত্রে ও যোজনায় বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের রূপ পেয়েছে। লেখক তারই তথ্য ও তত্ত্বভিত্তিক আলেখ্যমালা পেশ করেছেন।

বইটির বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, প্রত্যেকটি পর্বেরই চিন্তার মূলসূত্র এবং মাত্রাযোজনাকে যথাযথভাবে সামাজিক গতি-পরিণতি ও তত্ত্বের সম্পর্কে দেখিয়ে উপস্থিত করা। লেখক প্লেটো কিংবা বেকনের দর্শন-চিন্তা এবং ইরানের কৃষক বিদ্রোহের সাম্যবাদী ভাবধারার বাহক সুফীদের বক্তব্য হাজির করেছেন। এইভাবে বিষয়টিকে উপস্থিত করার কারণ বুঝতে অসুবিধা হয় না। হাজার হাজার বছরের মানবতা, স্বাধীনতা, ন্যায়ধর্ম, শান্তি, সম্প্রীতি, সংহতি প্রভৃতি সম্পর্কিত চিন্তা ও প্রয়াসের কাঠখড় পুড়িয়ে, প্রত্যক্ষ বিপ্লবী সংগ্রামের ধারায় জনগণের সম্মতি নিয়ে, নেতি-নেতি ইতি-ইতি করে গড়ে উঠেছে মার্কস-এঙ্গেলসের চিন্তার মূল সূত্রগুলি।

মার্কসবাদের মুল চিন্তার সূত্রগুলিকে চূড়ান্তত্ম গুরুত্ব দেবার জন্যই সিবতে হাসান মার্কস ও এঙ্গেলসেই থেমেছেন। ভূমিকাতে সিবতে হাসান উর্দু কবিতার দুটি লাইনের

উদ্ধৃতি দিয়েছেন, যার মর্মার্থ হলো, 'পেয়ালা গেলাস তো ভরা আছে, কিন্তু ভাঁড়ার খালি' (ভরে হ্যাঁয় জাম ও সবুলেকিন ম্যায় খানা খালি হ্যায়)। লেখকের তাগিদ হলো, ভাসাভাসাভাবে নয়, টুকরো টুকরো করে নয়, সমাজতন্ত্রবাদ ও মার্কসবাদকে জানতে হবে মূল ভাণ্ডারে মূল তত্ত্বে।

সিবতে হাসান তাঁর মাতৃভাষায় ঢেলে-ঢেলে অসাধারণ পরিশ্রম করে সাজিয়ে দিয়েছেন মার্কস ও এঙ্গেলসের চিন্তার তিনটি মূলসূত্র: (১) দ্বন্দ্বাত্মক ও ঐতিহাসিক বস্তুবাদে বিশ্বপ্রকৃতি, মানবসমাজ ও মানবজীবনের দ্বন্দ্বাত্মক অবিশ্রান্ত বিকাশ, (২) শ্রমজীবীকে বেশি খাটিয়ে অতিরিক্ত মূল্য তছরুপের ভিত্তিতে গড়া পুঁজির বিশ্বগ্রাসী কাঠামোর অবধারিত সংকট ও ধবংস এবং পুঁজিবাদী ব্যবস্থার ভিতরে সমাজীকৃত উৎপাদনের ভিত্তিতে সমাজতান্ত্রিক সমাজের অবধারিত অভ্যুদয় এবং (৩) বিপ্লবের পথ শ্রেণিসংগ্রামের পথ।

সিবতে হাসান পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ বিরুদ্ধ পরিবেশে কোন শর্টকাট করতে চান নি। তিনি নিছক তাত্ত্বিকও নন। বইটি তিনি উৎসর্গ করেছেন উপমহাদেশের কমিউনিস্ট আন্দোলনের অন্যতম প্রবর্তক ফিরোজউদ্দীন মনসুরকে, যিনি সিবতের ভাষায়, সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রাম করতে করতে নিজের জীবন ব্যয় করেছেন।

॥ ৩ ॥

আমাদের দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত জাঁপল সাঁত্রের সর্বশেষ বই 'দ্বন্দ্বাত্মক মুক্তির পর্যালোচনা' (The Critique of Dialectical Reason) ফরাসি ভাষায় লেখা বইটির ইংরেজি অনুবাদ হালে বেরিয়েছে। ৮০০ পৃষ্ঠার এই গ্রন্থ সাঁত্রের 'অস্তিত্ব ও নাস্তিত্ব' (On Being and Nothingness) গ্রন্থের একই সঙ্গে পুনরুত্থান ও খণ্ডন। সাঁত্রে তাঁর অস্তিত্ববাদী দর্শনের ছক বদলে দিয়েছেন—তিনি যে মার্কসীয় দর্শনের কত কাছাকাছি তা দেখাবার জন্য।

এই বই লেখার মূলে যে নিবন্ধটি রয়েছে সেটি এতে নেই। তবে নিবন্ধটি কি ছিল সে সম্বন্ধে বইয়ের ভূমিকায় সাঁত্রে বলেছেন। এর প্রসঙ্গটি আমাদের আলোচ্য বিষয়কে সাহায্য করতে পারে। সাঁত্রে যেভাবে বলেছেন, সেইভাবেই কথাটাকে রাখছি।

১৯৫৭ সালে সমাজতন্ত্রী পোল্যান্ডের একটি পত্রিকা সমসাময়িক ফরাসি জীবন নিয়ে 'মতবিনিময়' এর আয়োজন করে। সাঁত্রের উপর ভার দেওয়া হয়েছিল 'অস্তি ত্ববাদ' নিয়ে লিখতে। আরেকজন ফরাসি অধ্যাপকের উপর ভার দেওয়া হয়েছিল ফ্রান্সে মার্কসবাদের পরিস্থিতি নিয়ে লিখতে। সাঁত্রে অস্তিত্ববাদ নিয়ে লিখতে চান নি, তবে তিনি নিবন্ধটি লিখলেন 'অস্তিত্ববাদ ও মার্কসবাদ' নাম দিয়ে। একটি সমাজতন্ত্রী দেশ কর্তৃক আয়োজিত মতামত বিনিময়কে তিনি ছাড়তে চাননি। পরে প্যারিসে এই লেখাটি সাঁত্রের পত্রিকায় ছাপা হয় 'পদ্ধতির সমস্যা' নাম দিয়ে। আসলে এই নিবন্ধটি ছিল তার সর্বশেষ বই 'দ্বন্দ্বাত্মক যুক্তির পর্যালোচনা' বইটির পদ্ধতি। এই জন্যেই গ্রন্থাকারে এই দুটিকে একত্রিত করে উপরিউক্ত ভূমিকা দিয়ে সাঁত্রে প্রকাশ করেছেন। বইটি ফরাসি ভাষায় লেখা। ফরাসি বিপ্লবের ধারা এর মূল পটভূমি। আমরা ইংরেজি বইয়ে যে-ভূমিকা পেয়েছি তাতে সাঁত্রে মার্কসবাদ সম্বন্ধে যে-কথাগুলি বলেছেন, সেগুলি থেকেই বুঝতে পারা যায়, মার্কসের মূল চিন্তাকে তিনি তাঁর জীবনের শেষ পর্বে কত গভীরভাবে

গ্রহণ করেছেন। সাঁত্রে লিখেছেন যে তিনি মার্কসকে শতকরা শতভাগ মানেন, তবে তিনি তাঁর দার্শনিক বক্তব্যে মার্কসবাদ থেকে সামান্য সরেছেন।

সাঁত্রে বলেছেন, "মার্কসবাদ হচ্ছে আমাদের সময়ে অনতিক্রমণীয় দর্শন" (Marxism is the untranscendable philosophy of our time) সাঁত্রের পুরো বক্তব্যটি হচ্ছে "আমার অভিপ্রায় হচ্ছে একটি প্রশ্ন উত্থাপন করা। একটি মাত্র প্রশ্নই। একটি সংস্থাগত ঐতিহাসিক নৃতত্ত্ব (Structural historical anthropology) তৈরির জন্য আমাদের যথেষ্ট মালমসলা রয়েছে। এই প্রশ্নটি মার্কসীয় দর্শনের আওতার মধ্যেই অবস্থিত। কারণ এরপরে এটা পরিষ্কার হয়ে যাবে যে, আমি মার্কসবাদকে আমাদের সময়ের অনতিক্রমণীয় দর্শন বলে মনে করি। এবং আমি বিশ্বাস করি যে অস্তিত্ববাদের ভাবাদর্শ তার সর্বসমন্বিত পদ্ধতিসহ মার্কসবাদেরই একটি খোঁচ (Clave)। এই বক্তব্যটিকে হেগেল ও মার্কসের মূলের সঙ্গে যুক্ত করে ব্যাখ্যা দেবার পরে তিনি বলেছেন: "অস্তিত্ববাদ মার্কসবাদ থেকেই বেরিয়ে এসেছে এবং মার্কসবাদ কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হয়েছে।" সাঁত্রে বইয়ের এক জায়গায় বলেছেন যে দ্বন্দ্বাত্মক যুক্তি রচনার ক্ষেত্রকে মানবসমাজে পরীক্ষা করে এর সামগ্রিকতাকে সম্প্রসারিত করাটাকেই তাঁর কর্তব্য মনে করেছেন। তিনি মনে করেন মার্কসও তাই করেছেন। মার্কসের একটি উক্তির উদ্ধৃতি দিয়ে সাত্রে বলেছেন, "মানুষেরাই তাদের ইতিহাস গড়ে ... তবে সেই অবস্থানগুলিতেই, যেগুলি তখনই পাওয়া যায় এবং অতীত থেকে আহৃত হয়েছে।" (অষ্টাদশ ব্রুমেয়ার, মার্কস)। এই উক্তিটি যদি সঠিক হয়ে থাকে তবে সংকীর্ণবাদ এবং বিশ্লেষণমূলক যুক্তির মতবাদকে ইতিহাসের পদ্ধতি ও বিধানরূপে প্রত্যাখ্যান করতে হবে। দ্বন্দ্বাত্মক যুক্তিতত্ত্বের সমগ্রটাই মার্কসের এই বাক্যে ব্যক্ত হয়েছে, তাকে স্বাধীনতা ও নিয়মশৃঙ্খলার চিরস্থায়ী এবং দ্বন্দ্বাত্মক ঐক্য হিসেবে দেখতে হবে।"

এখানে আমরা মূল বইটির মধ্যে সামান্যই যাবো। দুই একটা কথা শুধু বলে রাখবো। সাঁত্রে সামাজিক ও ব্যক্তিক অস্তিত্বের বিকাশের ব্যাপারে মার্কস ও এঙ্গেলসের যুগ্ম রচনা 'জার্মান ভাবাদর্শ (The Greman Ideology)' গ্রন্থকে ব্যবহার করেছেন।

সাঁত্রে তাঁর এই গ্রন্থে আধুনিকতম রাজনীতি, অর্থনীতি, বিজ্ঞান ও দর্শনের ও দর্শনের তত্ত্ব ও তথ্যের সমাবেশ ঘটিয়ে বিচার করেছেন যুক্তির প্রশ্নকে। বিজ্ঞানের প্রসঙ্গে তিনি এঙ্গেলসের 'প্রকৃতির দ্বন্দ্বাত্মকতা' গ্রন্থের মূল সূত্রগুলি নিয়ে বিচার করতে গিয়ে এঙ্গেলসের বক্তব্যকে আইনস্টাইনের চেয়ে নিউটনের তত্ত্বের সঙ্গে তুলনা করেছেন। সাঁত্রে বলেছেন যে তিনি যেমন মানুষের সম্পর্কে কোন ঐশ্বরিক বিধান মানতে রাজি নন, তেমনি প্রকৃতির বিধান মানতেও রাজি নন। তাঁর ধারণা এঙ্গেলস প্রকৃতিতে দ্বন্দ্বাত্মক যুক্তির ক্ষেত্রে বড় করে বলেছেন, কিন্তু সাঁত্রে আবার বলেছেন, অর্থনীতির ক্ষেত্রে এঙ্গেলস সঠিক।

এখানে আমাদের মনে হয়েছে, এঙ্গেলসের 'সমাজতন্ত্র: কাল্পনিক বইটি পড়ে প্রকৃতি ও মানুষের সম্পর্কের ব্যাপারে এঙ্গেলসের মূল চিন্তাকে ভাল করে বুঝে নেওয়া দরকার। বইটি এঙ্গেলস বিশেষ করে ইংরেজ শ্রমিকদের জন্য লিখেছিলেন। মূল মার্কসীয় চিন্তার একটি শ্রেষ্ঠ নিদর্শন এই বইটি। তত্ত্ব জনগণেরই, তবে তত্ত্ব তত্ত্বই। তত্ত্ব ছাড়া প্রয়োগ হয় না, যেমন প্রয়োগ ছাড়া তত্ত্ব হয় না। এটা মৌলিক মার্কসীয় বক্তব্য।

সাঁত্রের প্রসঙ্গে এখানে একটি কথা বিশেষভাবে বলা দরকার। তিনি বইটিতে বিনয় প্রকাশ করেছেন, অনেকটা মার্কস, 'পুঁজি' রচনার পর যেমন করেছিলেন তেমনিভাবেই। মার্কস বলেছিলেন, 'পুঁজি' বা ডাস ক্যাপিট্যাল লিখে ফেলেছেন, এখন তাঁর মৃত্যু হলে দেহটা যদি শেয়াল-শকুন খায়, তাতে কিছু যাবে আসবে না।

সর্বোপরি যে কথাটা সাঁত্রের গ্রন্থে বেরিয়ে এসেছে, সেটা হলো মার্কসীয় চিন্তার মানবিকতা।

এই মানবিকতার খোঁজে আমরা মার্কসের 'অর্থনৈতিক ও দার্শনিক পাণ্ডুলিপি'তে যেতে পারি। এটা তাঁর যৌবনের রচনা। এখানে তার বক্তব্য 'সবার উপরে মানুষ সত্য'। এই মার্কসীয় মানবতার সঙ্গে রয়েছে মার্কসীয় অ্যালিয়েনেশান বা বিচ্ছিন্নতার তত্ত্ব। মার্কসের বক্তব্য হচ্ছে সামাজিক উৎপাদনে ব্যক্তিগত সম্পত্তিপ্রথা মানুষকে দাসত্বে জড়িয়েছে, তাকে বিভক্ত করেছে, যে সামাজিক জীবন বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে।

মূল অস্তিত্ববাদী দর্শনে এই বিচ্ছিন্নতাকে স্বাধীনতা বলা হয়েছিল। সাঁত্রে অস্তিত্ববাদ গ্রহণ করে এই স্বাধীনতাকে বড় করে দেখেছিলেন।

সাঁত্রের সর্বশেষ বইয়ে দেখা যায়, তিনি মার্কসের অ্যালিয়েনেশান তত্ত্বকে মূলত গ্রহণ করেছেন। মূলত বলছি এই কারণে যে, মার্কস তাঁর উপরিউক্ত গ্রন্থে প্রকৃতি, মানুষের সমাজ ও মানুষকে যেভাবে একটা metabolic relation বা রাসায়নিকভাবে জারিত সম্পর্কে বিকশিত হতে দেখেছেন, সাঁত্রে তাতে উৎসুক নন, তিনি তাঁর দর্শনকে মানুষের ইতিবৃত্তে যাঁচাই করতে চান।

সাত্রেঁকে কোনভাবে ছোট না করে আমরা এখানে মার্কস-এঙ্গেলস-মার্কসবাদের চিন্তার বিস্তীর্ণতাকে লক্ষ্য করব।

যৌবনের চিন্তা ধারার দুজনেরই পরিণত বয়সে আরও পরিণত হয়েছে। প্রমাণ 'পুঁজি' গ্রন্থটি। 'পুঁজি' গ্রন্থেরই প্রথম খসড়ার নাম 'গ্রুন্ডরিসে' (Grundrisse)। এই খসড়াটি রচিত হয়েছিল ১৮৫৭-৫৮ সালে। জার্মান ভাষায় স্বভাবতই হয়েছিল।

এক শতাব্দিকালেরও পরে এই খসড়ার ইংরেজি অনুবাদ নয়াবামপন্থিদের উদ্যোগে পেঙ্গুইন কোম্পানির দৌলতে প্রকাশিত হয়েছে হালের সত্তরের দশকে।

॥ ৪ ॥

'গ্রুন্ডরিসে' গ্রন্থটি প্রায় হাজার পৃষ্ঠার বই। এর মধ্যে সমগ্র তিনখণ্ড 'ডাস ক্যাপিটাল' ছাড়াও রয়েছে একটি মুখবন্ধ এবং ফরাসি ও মার্কিন দুই অর্থনীতিবিদের তত্ত্বের উপর দুটি নিবন্ধ। বিশেষ করে মার্কিন অর্থনীতিবিদের বুর্জোয়া অর্থনীতির প্রস্তাবনার বিশ্লেষণে মার্কস জুড়ে দিয়েছেন শ্রমিক শ্রেণির পাল্টা অর্থনীতির প্রতিপাদ্য। মুখবন্ধটি হচ্ছে মূলত নন্দনতত্ত্ব বিষয়ক। বিশেষ করে গ্রিক কাব্যে নাটকে পৌরাণিক কল্পনার প্রয়োগের মূলে প্রকৃতি ও মানুষের বিশেষ সম্বন্ধটি আদিম অর্থনৈতিক ব্যবস্থার সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে কিভাবে কাজ করেছে, সেটি এখানে বিবেচনা করা হয়েছে।

'গ্রুন্ডরিসে' মূলত অর্থনীতির পর্যালোচনা। অর্থনীতি মানবজীবনের ভিত্তি। কিন্তু ভিত্তির উপর রয়েছে উপরিকাঠামো। ভাবাদর্শের কাঠামো। এই দুটোকে নিয়ে মানবজীবন। এই সমগ্রতা হচ্ছে মার্কসবাদী মূল চিন্তার একটি পরিচায়ক।

'গ্রুন্ডরিসে'র ইংরেজি অনুবাদক নিকোলাউস তাঁর ভূমিকার একজায়গায় লিখেছেন যে, 'গ্রুন্ডরিসে' সর্বাত্মক বিশ্ববিপ্লবের এমন একটি ভাষ্য যা 'ডাস ক্যাপিটাল' গ্রন্থের মূল ভাণ্ডার অবশ্যই, কিন্তু এর মধ্যে অনাগত ভবিষ্যতের আরও হদিস পাওয়া যাবে।

নিকোলাউস নয়াবামপন্থি। সেই জন্য স্বভাবতই সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে নিজেকে কিছুটা আলগা রাখতে কিংবা দেখাতে চেয়েছেন। 'গ্রুন্ডরিসে' কার্ল মার্কসের সামগ্রিক চেতনার বাহক এবং এই কারণেই এর মধ্যে রয়েছে মার্কসীয় দ্বন্দ্বাত্মকতার তত্ত্ব। নিকোলাউস এই দর্শন প্রসঙ্গে লেনিনের 'দর্শনের কড়চা' গ্রন্থের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। পাশাপাশি এই নয়াবামপন্থি মাও-সেতুং-এর 'বিরোধী প্রসঙ্গে (On Contradiction)' বইটির উচ্চ প্রশংসা করেছেন। তাঁর পক্ষে এটাই স্বাভাবিক।

'গ্রুন্ডরিসের' এই ইংরেজি অনুবাদটি অবশ্য মার্কসবাদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকলেরই কাজে লাগবে।

বইটির মূল জার্মান পাঠ সোভিয়েত ইউনিয়নেই চল্লিশের দশকে মার্কস-এঙ্গেলস-লেনিন ইনস্টিটিউট মুদ্রিত করে প্রকাশ করে। পঞ্চাশের দশকে গ্রুন্ডরিসের এই মুদ্রিত জার্মান পাঠ জার্মান গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রে পুনঃপ্রকাশিত হয়। একজন জার্মান নয়াবামপন্থি এই জার্মান পাঠটির সঙ্গে একটি টীকা যোগ করেন পশ্চিম জার্মানিতে প্রকাশ করে। নিকোলাউস এইসব জার্মান পাঠকে সামনে রেখে অনুবাদের কাজটি করেছেন।

মস্কো থেকে সত্তরের দশকে ইংরেজি ভাষায় কার্ল মার্কসের যে জীবনী প্রকাশিত হয়েছে, তাতে 'গ্রুন্ডরিসে'র সারমর্ম ও আংশিক পাঠ রয়েছে।

'গ্রুন্ডরিসে' ডাস ক্যাপিট্যালের খসড়া হলেও এর মধ্যে এমন কতকগুলি বিষয় আছে, যেগুলি ডাস ক্যাপিট্যালে মার্কস আনেননি। এই অংশগুলিতে মার্কসের মূল চিন্তাসূত্রগুলির ব্যাপ্তি ও গভীরতার নতুন করে পরিচয় পাওয়া যায়।

অবশ্য ডাস ক্যাপিট্যালের তিনটি খণ্ড এবং সঙ্গে উদ্বৃত্ত মূল সম্বন্ধে পৃথক গ্রন্থের দুটি খণ্ড অনেক অনেক বেশি সামগ্রিক। অনেক বেশি এদের মাত্রা। 'গ্রুন্ডরিসে' ও 'ডাস ক্যাপিট্যাল' বিশ্ব-সাম্যবাদী সমাজের ধারণাকে পৃথিবীজোড়া ভিত্তি দিয়েছে। দক্ষিণ আমেরিকায় পেরু কিংবা তদানীন্তন ভারতের যে ছবি এতে আছে, তার বাস্তবতা আধুনিকতম গবেষককেও চমৎকৃত করবে।

'গ্রুন্ডরিসে'র বৈশিষ্ট্য হলো এই য, অর্থনীতির নামে হলেও এই বইটি যাকে বলে একের মধ্যে দশ। মার্কসীর মূল চিন্তাধারার খনি। নন্দনতত্ত্ব, স্বাধীনতা, নিয়মশৃঙ্খলা, মানবিক সম্পদ প্রভৃতি বিষয়গুলির বিশেষ হদিস এখানে পাওয়া যাবে। এই 'গ্রুন্ডরিসে'র সূত্রেই আমরা গিওর্গি লুকাচের সর্বশেষ বই 'সামাজিক অস্তিত্বের বিকাশ-তত্ত্ব'-এ (দি অন্টোলচি অফ সোস্যাল বিইং) মার্কসবাদের মূল চিন্তার শুদ্ধ সূত্রগুলিকে নতুন করে পাই। সমাজতান্ত্রিক হাঙ্গারীর অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা, কমিউনিস্ট তৃতীয় আন্তর্জাতিক জার্মানির জন্য ভারপ্রাপ্ত প্রতিনিধি এবং মার্কসীয় নন্দনতত্ত্বের প্রখ্যাত ভাষ্যকার এই গিওর্গি লুকাচ তাঁর সর্বশেষ বইটিতে মার্কস এবং সেই সঙ্গে এঙ্গেলসকে পূর্বসূরী হেগেল ও উত্তরসূরী অস্তিত্ববাদী ও অন্যান্য দার্শনিকদের পাশাপাশি রেখে বিচার করেছেন। তাঁর বিপুল মালমসলার বিশ্লেষণ থেকে লুকাচ দেখিয়ে দিয়েছেন মার্কসবাদ

মানবজাতির আজ ও আগামীর পথ-প্রদর্শক। ব্যাপারটার বস্তুতপক্ষে মাত্র প্রথম অঙ্ক চলছে।

লুকাচ তাঁর প্রতিভা ও পরিশ্রমকে তাঁর ভাষায় 'মার্কসীয় পুনর্জাগরণে' (Marxist Renaissance) নিয়োজিত করেছেন। তিনি জীবনের শেষের দিকে এই বিষয়ে তিনটি বই লিখতে মনস্থ করেন 'নন্দনতত্ত্ব' 'অর্থনীতি' ও 'নৈতিকতাতত্ত্ব'। ষাটের দশকের শুরুতে বেরিয়েছে তার 'নন্দনতত্ত্ব'। ১৯৮০ সালে প্রকাশিত হয়েছে অর্থনীতি- 'সামাজিক অস্তিত্বের বিকাশতত্ত্ব' নাম দিয়ে। নৈতিকতাতত্ত্ব বইটি তিনি লিখে উঠতে পারেন নি। তবে ১৯৭১ সালে মৃত্যুর কয়েক মাস আগে মাত্র কয়েক পৃষ্ঠায় সূত্রের আকারে লুকাচ যে সংক্ষিপ্ত আত্মজীবনী লিখেছেন, সেটি প্রধানত মার্কসীয় নৈতিকতাবোধের বিশ্লেষণ। ব্যক্তি সমাজের পারস্পরিক নির্ভরতাবোধ এবং দায়িত্ববোধ ও তার বিকাশে অসংখ্য ব্যক্তির স্বাধীনতা ও সামাজিক সহমর্মিতার নৈতিকতাবোধের মার্কসীয় চিন্তার আবশ্যিক সূত্র রয়েছে এই বিশ্লেষণে। লুকাচের এই আত্মজীবনীর মূল নায়ক মার্কস। ১৯৮৩ সালে মার্কস-শতবার্ষিকীকে হাঙ্গারির একটি ত্রৈমাসিকে এই নিবন্ধটির ইংরেজি অনুবাদ বেরিয়েছিল।

লুকাচ তাঁর অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক লেখায় ইতোপূর্বে বারবার মার্কসীয় পুনর্জাগরণের পুরোধা হিসেবে বিশেষ করে লেনিন ও রোজা লুক্সেমবুর্গের লেখা যথাক্রমে 'সাম্রাজ্যবাদ' ও 'পুজির সঞ্চয়' গ্রন্থ দুটির বিশ্লেষণ করতে গিয়ে মার্কসীয় অর্থনীতি নিয়ে আলোচনা করেছেন। তিনি তাঁর সর্বশেষ বইটিতে আরও অনেক বেশি মালমসলা ব্যবহার করেছেন এবং আমরা দেখবো, এই বইটিতে মার্কস-অধ্যায়ে যে কয়েকটি উৎসগ্রন্থের নাম দিয়েছেন সেগুলি সবই মূল মার্কসীয় সাহিত্য। এই বইগুলো হচ্ছে: (১) অর্থনৈতিক দার্শনিক ও পাণ্ডুলিপি (২) কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো (৩) অর্থনীতির পর্যালোচনার ভূমিকা (৪) গ্রুন্ডরিসে (৫) ডাস ক্যাপিট্যাল (৬) গোথা কর্মসূচির পর্যালোচনা।

এইভাবে লুকাচের মারফত আশির দশকে নতুন করে বিশ্বের জনগণের সামনে মার্কসবাদের চিন্তা ও প্রয়োগের সুদূরপ্রসারী সমগ্রতা পরিবেশিত হয়েছে নিকট ও দূর ভবিষ্যতের জন্য সমাজতন্ত্র থেকে সাম্যতন্ত্রে উত্তরণের যে ছক মার্কস গোথা কর্মসূচির পর্যালোচনায় দিয়েছিলেন, সেটিকে গ্রুন্ডরিসের পাশাপাশি রাখলে স্বাধীনতা, সমাজতন্ত্র ও শান্তির সংগ্রামে ব্রতী দেশের সকল ধর্মের সকল বর্ণের, সকল জাতির জনগণের বিশেষ করে ভবিষ্যতে উত্তরণের পথের রেখা স্পষ্ট হয়ে যায়। অন্যান্য বিষয়ের পুনরাবৃত্তি না করে আমরা এখানে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের গণতান্ত্রিকতা এবং প্রকৃতি ও মানুষের অবিচ্ছেদ্য সম্পর্কের দিক দুটিকে লক্ষ্য করব। লুকাচই গোথা কর্মসূচির পর্যালোচনা ও গ্রুন্ডরিসেকে মার্কসের যৌবনের রচনার সঙ্গে সম্পৃক্ত করে মার্কসবাদের চিন্তার ঐক্যের ধারাটিকে নতুন করে সামনে এনে দিয়েছেন। সাম্যের পথ থেকে জনগণকে সরিয়ে দেবার জন্য পুঁজিবাদ, সাম্রাজ্যবাদ ও ফ্যাসিবাদের সমস্ত মার্কসবাদ-বিরোধী প্রচারণার জবাব রয়েছে উপরিউক্ত সমস্ত দৃষ্টান্তে অবশ্য এরা কয়েকটি দৃষ্টান্ত মাত্র। সেজন্যই সংক্ষিপ্ত ও আরেকটি দৃষ্টান্ত দিয়েই বক্তব্য শেষ করব।

ইন্দোচীনের জাতীয় মুক্তিযুদ্ধের প্রবর্তক ও নায়ক, ফরাসি কমিউনিস্ট পার্টির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা এবং কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের অন্যতম প্রতিনিধি কমরেড হো চি মিন কবি হিসেবে প্রসিদ্ধ। তাঁর তাত্ত্বিক চেহারাটি আমাদের অজানা। তিনি মুক্তিযুদ্ধের প্রয়োগের সেরা শিল্পী হিসেবেই প্রখ্যাত। আমাদের মার্কসবাদী চিন্তার মূল তত্ত্বের খোঁজখবর নিতে গিয়ে আমরা কিন্তু তাঁর কাছ থেকে বড় রকমের একটা তাত্ত্বিক হদিস পেয়ে যাই। কমরেড হো চি মিন তাঁর একটি ছোট লেখায় বলেছেন, "ভিয়েতনামের লোকশ্রুতিতে এক জরির থলের উল্লেখ রয়েছে, যার ক্ষমতা জাদুকরের মতো। এর মধ্যে হাত ঢুকিয়ে যা চাওয়া যায়, তাই পাওয়া যায়। আমাদের কাছে মার্কসবাদ হচ্ছে এই জাদুকর থলে।"

অবশ্যাই এই প্রচণ্ড ধৈর্যশীল, দৃঢ় এবং সঙ্গে সঙ্গে নমনীয় কোমল মহান বিপ্লবী মার্কসবাদের সূত্রগুলিকে যখনই চেয়েছেন তখনই হাতে পেয়েছেন কঠোর সাধনার ফল হিসেবে।

মাসিক মুক্তির দিগন্ত, ঢাকা. মার্চ ১৯৮৬

প্রসঙ্গ রলাঁ : শান্তি স্বাধীনতা কাম্য

॥ ১ ॥

শুরুতে রলাঁর সামগ্রিক পরিচয়কে সামান্য ঝালিয়ে নেবার উদ্দেশ্যে পিছনে তাকিয়ে নিচ্ছি। অবশ্য খুব বেশি পিছনে নয়। বর্তমানে শতাব্দিরই প্রারম্ভপর্বে। পরপর দুটো বিশ্বযুদ্ধের 'সাম্রাজ্যবাদী-পুঁজিবাদী' আয়োজনের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক সংহতি, শান্তি ও মানবতার পতাকা নিয়ে বিঘোষিত সংগ্রামী কার্যক্রমের পুরোভাগে এসে দাঁড়িয়েছিলেন ফরাসি মনীষী, সঙ্গীতাচার্য, জাঁ'ক্রিস্তফ উপন্যাসের বিশ্ববিশ্রুত লেখক এবং যুদ্ধের গণহত্যার বিরুদ্ধে মানবতাবাদী নৈতিকতাবোধের প্রণেতা রোমাঁ রলাঁ। বিশ ও তিরিশের দশকে তিনি হয়েছিলেন আমাদের উপমহাদেশের জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের সর্বপ্রধান আন্তর্জাতিক ভাষ্যকার ও আমাদের ঐতিহ্যিক অন্তরাত্মার পরিচায়ক। ঐ দুটি দশকে সাধারণভাবে বিশ্বের দেশে দেশে জাতীয় মুক্তি আন্দোলন, সমাজতন্ত্রী বিপ্লবী অভ্যুত্থান এবং গণতান্ত্রিক মুক্ত মোর্চা গঠন ও শক্তির পক্ষে শ্রমজীবীদের পাশে বুদ্ধিজীবী সমাবেশের প্রবক্তারূপে রলাঁ বিশ্ববিপ্লবের অন্যতম পুরোধায় জায়গা নিয়েছিলেন, বিশেষ করে মানবিকতাবাদী নৈতিকতাবোধের অপরিহার্যতাকে বড় করে সামনে রেখে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ফয়সালা হবার শেষ প্রহরে ১৯৪৪ এর ৩০ শে ডিসেম্বর রলাঁর মৃত্যু। পৃথিবীর দিক দিগন্ত তখনও রক্তাক্ত। আমরা যুদ্ধমুক্ত ইউরোপে কিংবা বিশ্বে এরপর শান্তির সমাবেশে তাঁকে পেলাম না। আমাদের উপমহাদেশের জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের মুহূর্তে তিনি আমাদের খবর নিতে পারলেন না।

অবশ্য রলাঁ অন্তরালে চলে গেলেও তিনি হারিয়ে গেলেন না। গত চার দশকের বেশি সময়ে শান্তি, স্বাধীনতা, সাম্য ও মানবিকতাবাদী নৈতিকতাবোধের সমাবেশে বিভিন্ন কার্যক্রমে নানাদিক দিয়ে রলাঁর কথা উঠছে। তাঁর সজীব ও উজ্জ্বল উপস্থিতি

আমাদের চিন্তাভাবনার সূত্রগুলিকে নতুনভাবে প্রথিত করেছে। অন্তরালের দরুন এই উপস্থিতি ঠেকে থাকে নি।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে রলাঁর জীবিতাবস্থাতেই অন্তরালে বা অলক্ষ্যে থেকে যাওয়াটা তাঁর ধাতসহ্য ছিল। এইভাবে থেকেই তিনি বড় বড় বৈপ্লবিক কাজগুলিও করেছেন। একটা ঘটনা স্মরণ করা যেতে পারে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তরকালের প্রখ্যাত অস্ট্রীয়-জার্মান কথাশিল্পী স্তেফান সোয়াইগ (Stefan Zweig) যখন প্যারিসে ১৯১৩ সালে আকস্মিকভাবে জাঁ ক্রিস্তফ উপন্যাসের একটি খণ্ড পড়ে রলাঁর সঙ্গে দেখা করার জন্য খোঁজখবর নিতে থাকেন, তখন ঐ বিদগ্ধ নগরীর লেখাজোখার মহলও তাঁর সঠিক ঠিকানা দিতে পারেন নি। অথচ সেই মুহূর্তে রলাঁ বিশ্বখ্যাত হতে যাচ্ছেন। সোয়াইগ শুধু জেনেছিলেন, রলাঁ নামের লোকটি সংগীত জগতে বিচরণ করেন, বীটোফেনের একটি জীবনী লিখেছেন এবং সমাজতন্ত্রীদের গণনাট্যভবনের জন্য একটি নাটক লিখে দিয়েছেন। দেখা হলো অবশ্য। রঁলা সোয়াইগকে জানালেন যে জাঁ ক্রিস্তফ উপন্যাস রচনার মধ্য দিয়ে তিনি তিনটি কর্তব্য পালন করছেন। কর্তব্য তিনটি হচ্ছে, সংগীতের প্রতি তাঁর কৃতজ্ঞতা, ইউরোপিয় ঐক্যে বিশ্বাস স্থাপনের প্রস্তাবনা এবং সচেতনতায় জাগ্রত হবার জন্য সকল জাতির প্রতি আহবান, যেখানে প্রত্যেকটি ব্যক্তিকে নিজ দেশ নিজ ভাষায় এবং আপন জগতে কর্তব্যনিষ্ঠ হতে হবে। অর্থাৎ রলাঁ সেই সময়ে কিছুটা অন্তরালে থেকেই পুরোপুরিভাবে তাঁর বইটিকে সর্বসাধারণের কাজে লাগিয়ে দিয়েছিলেন।

আজ লোকান্তরিত রলাঁকে আমরা বিশ্বের এবং আমাদের একান্তভাবে ঘরের কাছের লোকজীবনে পাচ্ছি জাঁ ক্রিস্তফের পাশাপাশি বেশ কিছু প্রসঙ্গে।

সম্প্রতি দুতিন দশকের মধ্যে রলাঁ তাঁর সামগ্রিকতা নিয়ে বিশেষভাবে প্রাসঙ্গিক হয়েছেন কয়েকটি বিষয়ের মধ্যে। আমরা এবার সংক্ষেপে তিনটি বিষয়কে এখানে সামনে রাখছি।

॥ ২ ॥

আমাদের বিবেচ্য প্রথম বিষয়টি আশির দশকের শেষার্ধে চূড়ান্তত্ম গুরুত্বে পৌঁছেছে। পারমাণবিক যুদ্ধ যাতে না বেঁধে যায়, সেজন্য বিশ্বব্যাপী মানবসমাজকে সজাগ, উদ্যোগী ও আত্মনিয়োজিত হতে হবে, এটাই হচ্ছে আজকের প্রধান আন্তর্জাতিক, জাতিগত ও ব্যক্তিগত কর্তব্য। যুদ্ধনিবারণের এই কর্তব্যের মূলে স্থাপিত হয়েছে মানবতাবাদী নৈতিকবোধ। যুদ্ধের বিরুদ্ধে রলাঁর কাজ ও চিন্তার আনুপুর্বিক ধারার মধ্যে এই নৈতিকতাবোধ জাগ্রত ছিল। একে তিনি সঞ্চারিত করে রেখে গিয়েছেন বিশ্ব শান্তির জন্য আজ ও আগামী দিনের ব্যাপক থেকে ব্যাপকতর সংগ্রামের প্রয়োজনবোধে।

আমাদের বিবেচ্য দ্বিতীয় বিষয়টি হচ্ছে আমাদের উপমহাদেশের মুক্তি সংগ্রামকে পুরোপুরিভাবে সফল ও সার্থক করার জন্য চিন্তাভাবনার নির্দেশকগুলিতে এবং বিশেষ করে বৈপ্লবিক আনুপুর্বিকতা রক্ষার রলাঁর বিশ্লেষণ ও সমীক্ষা। সম্প্রতি প্রকাশিত একটি গ্রন্থে এই বিশ্লেষণ ও সমীক্ষা সামগ্রিক ও বিস্তারিতভাবে উপস্থিত হয়েছে সমাধিকভাবে। ১৯৬৯ সালে প্যারিস থেকে মিসেস রলাঁর উদ্যোগে রলাঁর চিঠিপত্র,

নিবন্ধ-বাণী, দিনলিপি ও যোগাযোগের দলিলের উনবিংশ খণ্ড হিসেবে ফরাসি ভাষায় যে 'রোমাঁ রলাঁ গান্ধী করেসপন্ডন্‌স গান্ধী জয়ন্তী উপলক্ষে প্রকাশিত হয়, তার ইংরাজি অনুবাদ ভারত সরকারের প্রকাশনা বিভাগ বার করেছেন ১৯৭৬ সালে। ৬০০পৃষ্ঠার এই বইটিতে গান্ধী ও তাঁর চিন্তা ও সংগ্রাম সম্বন্ধে রলাঁর বক্তব্য বিস্তৃতভাবে সামনে এসেছে। সেই সঙ্গে আমাদের উপমহাদেশের মুক্তিসংগ্রামের জানা-অজানা অসংখ্য চূড়ান্তত্ম গুরুত্বপূর্ণ তথ্য রলাঁর চিন্তার আলোকে এমনভাবে উদ্ভাসিত করেছে যে সংগ্রামের অন্তর্জগতটিকে ও তার দ্বান্দ্বিক অগ্রগতিকে আমরা তলিয়ে দেখতে পারি ভবিষ্যতে পথ পাবার জন্য। আমাদের একটা বড় লাভ এই যে, রলাঁর সামগ্রিক শিল্পীচিত্ত ও সংগ্রামী কর্মসত্তার গভীর ও সামগ্রিক চেহারাটিকে আমরা একসঙ্গে পেয়ে যাই।

গত দশ বছরে বইটি নিয়ে কোন ঝড়ের সৃষ্টি কেন হয় নি, সেটা একটা আশ্চর্য হবার ব্যাপার। এর মধ্যে আমাদের উপমহাদেশের মুক্তিসংগ্রামী ও দেশপ্রেমিক চিন্তাবিদদের চিন্তাভাবনা ও কাজকর্ম-জীবন সম্বন্ধে যেসব মালমশলা রয়েছে, সেগুলো অতীতের আত্মজিজ্ঞাসা ও আজকের এবং ভবিষ্যতের পথের ইঙ্গিতস্বরূপ। রবীন্দ্রনাথ, গান্ধী, সুভাষচন্দ্র, লালা লাজপত রায়, আব্দুল গফফার খান প্রমুখের যেসব প্রাণবন্ত ছবি এতে রয়েছে, তাদের পাশে শিল্পী রলাঁকে সমভাবেই জাগরুক পাওয়া যায়। ১৯২৫ সালে কল্লোলের সম্পাদক দীনেশ রঞ্জন দাশের কাছে রলাঁর লেখা চিঠিখানি আজও আমাদের উপমহাদেশের বহুভাষী সাহিত্য-সৃষ্টির দিকদর্শকরূপে বিবেচিত হতে পারে। এবার ৮৭ সালে সীমান্ত নেতা খান আব্দুল গফফার খান যখন আমাদের সামনে নতুন করে উপস্থিত, তখন রলাঁর কলমের কয়েকটি আঁচড়ে আমাদের আলোচ্য গ্রন্থে সীমান্ত নেতার যে জীবনলেখাটি রয়েছে, সেটি রলাঁকেও নতুনভাবে দেখায়। সুদূর ইউরোপে বসে ডা. আনসারির কাছ থেকে শুনে রলাঁ তাঁর দিনলিপিতে গফ্‌ফার খানের চরিতকথাটি ধরে রাখেন। বইটিতে আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের বিষয়ে রলাঁর আলোচিত অসংখ্য ঘটনার একটি দৃষ্টান্ত হচ্ছে মীরাট ষড়যন্ত্র মামলায় দণ্ডিত বন্দীদের জন্য তাঁর চিন্তাভাবনা, উদ্বেগ। রলাঁ যে মহাত্মগান্ধীর জীবনচরিত রচনা করেছিলেন গান্ধী রবীন্দ্রনাথ উভয়কেই এর মধ্যে বৈশিষ্ট্য ও স্বাতন্ত্র্যে চিহ্নিত করে, তার 'কাঠখড়' পাওয়া যাবে আলোচ্য বইটিতে। দেখতে পাওয়া যাবে বিভিন্ন চিঠিপত্রে ও দিনলিপিতে তন্নতন্ন করে তথ্য পরীক্ষার পদ্ধতি। কিভাবে পরম্পরাসূত্রে রলাঁ বিবেকান্দ জীবনী লিখলেন, সেটি আমাদের জীবনচরিত চর্চায় অনুসরণীয়। সুভাষচন্দ্রের ব্যাপারটাও একই পদ্ধতিতে উপস্থাপিত হয়েছে। সুভাষচন্দ্রের জীবন ও চিন্তার আলেখ্য রচনার মালমশলা দিয়েছেন রলাঁ, যে যেমন বিশ্লেষক, তেমনি সহানুভূতিতে ভরা। রলাঁর রীতি, তিনি যাদের সংস্পর্শে এসেছেন, তাঁদের অন্তরকে দেখে নিতে চেয়েছেন এবং দেখিয়েছেন। নিজেকেও তিনি অন্তরালে রাখেন নি। আমরা যেমন অসংখ্য বিভিন্ন ব্যক্তিকে গভীরভাবে বুঝতে পারি, তেমনি রলাঁকেও গভীরভাবে দেখতে পাই। এই সূত্রেই আবার বলতে চাই, রলাঁ গান্ধী করেসপন্ডন্‌স বইটিতে আমরা রলাঁর সামগ্রিক জীবন ও মনন এবং সৃষ্টির হদিস পাই। আমরা রলাঁর আদর্শ ও নীতিনিষ্টচরিত্রের কোমল ও ইস্পাত কঠিন দিকগুলিকে দেখতে পাই এখানে। মহাত্মা গান্ধীর জীবনচরিত রচয়িতা গান্ধীর প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ও অনুরাগ নানাভাবে জানবার সঙ্গে সঙ্গে যেখানেই

সুযোগ পেয়েছেন সেখানে গান্ধীর সঙ্গে তাঁর রাজনৈতিক-আত্মিক পার্থক্যকে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় জানিয়ে দিয়েছেন। তাঁর চিন্তার একটি বিশেষ দিক ছিল লেনিন ও সোভিয়েত ইউনিয়ন সম্বন্ধে। বিপ্লবের হিংসার দিকটিকে বিবেচনায় রেখে গান্ধী যখন সোভিয়েত ইউনিয়নের সমাজতান্ত্রিক জীবনধারার সার্থকতা সম্বন্ধে সংশয় প্রকাশ করেছেন, রলাঁ তখন বলশেভিক বিপ্লবের হিংসার তথা সশস্ত্র উত্থানের দিকটিকে অনিবার্য বলে এর পক্ষে যুক্তি দেখিয়েছেন। গান্ধীর অহিংস অসহযোগকে তিনি খুবই বড় করে দেখিয়েছেন নীতি ও কার্যকারিতার উভয় দিক দিয়েই, কিন্তু সেই সময়ে মুক্তিসংগ্রামের অপর ধারাগুলিকে তিনি ছোট করে দেখেন নি। তিনি বরং লেনিন, সুন ইয়াত-সেন ও গান্ধীকে পাশাপাশি রেখে পরস্পরের পরিপূরক ও সহায়ক বলে প্রতিপন্ন করতে চেয়েছেন। মুক্তিসংগ্রামের এই তিনটি ধারা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তরকালে যে বিশাল ব্যাপ্তি ও বৈচিত্র্যে উত্তরিত হয়েছে, তা তিনি দেখে যান নি এবং স্বাভাবিকভাবে দেখতে পারেন নি। কিন্তু রলাঁর মুক্তিসংগ্রামের তথা বিপ্লবী অভ্যুদয়ের সমন্বয় সাধনের পদ্ধতিটিকে আমাদের আলোচ্য বইটিতে রলাঁর যে শত শত চিঠি রয়েছে সমসংখ্যক ব্যক্তির কাছে, সেগুলি থেকে আজকের প্রয়োজনীয় ব্যাপক বৈপ্লবিক সমন্বয়ের সূত্র উদ্ধার করতে পারি।

এই প্রসঙ্গে একটা দিকের কথা ভেবে দেখতে পারি আমরা। আলোচ্য বইটিতে আমরা দেখতে পাই, রলাঁর কতকগুলি বিষয়ে যেমন গোঁড়ামি ছিল, তেমনি তিনি ক্রমে ক্রমে এগুলিকে কাটিয়ে উঠেছিলেন অন্যান্য মত ও তাদের পরিপোষকদের যাচাই করে গ্রহণ-বর্জন দ্বারা নিজেকে পরিবর্তিত ও প্রসারিত করে। তাঁর সঙ্গে যাঁদের যোগাযোগ হয়েছে, তাঁদের কাছ থেকেও তিনি এটা প্রত্যাশা করেছেন। তাগিদ দিয়েছেন গোঁড়ামি দূর করার জন্য। এই পদ্ধতিটি রলাঁকে আমাদের আজকের বৈপ্লবিক সমাজতান্ত্রিক, মুক্তিসংগ্রামী, গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক ফ্রন্ট গঠনে স্মরণীয় ও বরণীয় করে রেখেছে। রলাঁর এই একান্ত সাম্প্রতিক উপস্থিতির রয়েছে সুদূরপ্রসারী সম্ভাবনা।

উপরিউক্ত বিষয়টির বিস্তারিত আর না গিয়ে এবার আমরা আমাদের বিবেচ্য তৃতীয় প্রাসঙ্গিক বিষয়টিতে এসে পড়ছি। এটি হচ্ছে ফরাসি বিপ্লবের সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতার গণ-অভ্যুত্থানের সেই ধারা, যা আজও সক্রিয়, ফলপ্রসূ ও সম্ভাবনাময়। এই ধারা থেকে একদিন তরুণ হেগেল ১৯ বছর বয়সে বার করে এনেছিলেন প্রচণ্ড বিপ্লবের মধ্য দিয়ে পরিবর্তনের যৌক্তিকতাকে ইতিহাসসিদ্ধ আখ্যা দিয়ে এবং এরপর তরুন মার্কস ও এঙ্গেলস বার করে এনেছিলেন সর্বহারা শ্রমিকশ্রেণীর বৈপ্লবিক অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে রাষ্ট্র ও সমাজের নির্দেশক হয়ে ওঠার ইতিহাসসিদ্ধ যৌক্তিকতাকে হেগেলের দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গিতে রদবদল করে। রলাঁর একটা বড় কাজ ১৭৮৯ থেকে ১৭৯৪ পর্যন্ত ফরাসি বিপ্লবের বিপুল ও ব্যাপক আবেগের ও চিন্তাভাবনার ঝড়ঝঞ্ঝাকে তিনি উপস্থিত করেছেন পরপর কয়েকটি নাটকের মধ্য দিয়ে। "১৪ই জুলাই" এর ব্যাস্টিল কারাগার ভেঙ্গে দেবার ঘটনা থেকে "রবেসপীয়র" পর্যন্ত নাট্যশালায় রলাঁ তুলে ধরেছেন একই সঙ্গে গণশক্তি ও বিপ্লবী নেতৃত্বের প্রত্যেকটি বড় বড় স্তবককে। এরা আজ রলাঁকে বিশেষভাবে প্রাসঙ্গিক করে তুলেছে একটা বিশেষ কারণে। সেটা এই যে, ১৯৮৯ সালে ফরাসি বিপ্লবের দুশো বছর পূর্ণ হতে যাচ্ছে। রলাঁকে, তাঁর নাট্যগুলিকে আমরা এবার নতুন করে বুঝতে চাইব। এই সূত্রেই হাঙ্গেরির বিশ্ববিশ্রুত মার্কসবাদী নন্দনতত্ত্ববিদ গিওর্গি লুকাচের তিরিশের দশকের শেষের দিকে মস্কোতে বসে লেখা 'ঐতিহাসিক

উপন্যাস' গ্রন্থটির রোমাঁ রলাঁ অধ্যায়টি উল্লেখ্য। বইটি ষাটের দশকে বহু দেশে প্রচারিত হয়েছে লুকাচের ভূমিকাসহ। রোমাঁ রলাঁ অধ্যায়টিতে লুকাচ রলাঁর লেখক এবং বিশের দশকে প্রকাশিত ঐতিহাসিক উপন্যাস 'কোলাস ব্রিউগ্ন' 'Colas Breugon' নিয়ে আলোচনা করেছেন। লুকাচ প্রাসঙ্গিকভাবে রলাঁর সামগ্রিক সাহিত্যের কাজগুলি সম্বন্ধে এতে আভাস ইঙ্গিত ও তথ্য দিয়ে যে সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা করেছেন, সেরকম পরিপূর্ণ বক্তব্য ও এত অল্পের মধ্যে রলাঁ সম্বন্ধে বহু বিস্তারিত বর্ণনা ও জীবন কথাতে খুব কমই পাওয়া যাবে। এতে ফরাসি বিপ্লব নিয়ে লিখিত রলাঁর নাটমালা সম্বন্ধে লুকাচ ট্রাজেডি নাটক রচনায় রলাঁর কৃতিত্বকে খুবই উঁচুতে স্থান দিয়েছেন। অন্যত্র ব্রেখটের নাটক সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে তিনি ব্রেখটকে একালের শেকসপীয়র নামে অভিহিত করলেও নাটকের শর্ত পুরণের দিক দিয়ে যে ঘাটতির উল্লেখ করেছেন, রলাঁকে তা থেকে রেহাই দিয়েছেন।

লুকোচের আলোচনায় ফরাসি বিপ্লবের আজকের এবং আগামীর প্রাসঙ্গিকতাটি লক্ষণীয়। লুকাচ তাঁর 'ঐতিহাসিক উপন্যাস' বইটিতে ফরাসি বিপ্লব সম্বন্ধে নাটক রচনায় রলাঁর আগ্রহের উল্লেখ করে বলেছেন, রলাঁ ফরাসি বিপ্লব নিয়ে লেখার যুক্তি দেখিয়েছিলেন এই বলে যে, "১৭৯৩ এর ঘূর্ণিঝড় আজও পৃথিবীর চারদিকে চক্রাকারে ঘুরছে।" এখানে বিস্তারিত ব্যাখ্যায় না গিয়ে শুধু এইটুকু তথ্যেই আমরা সন্তুষ্ট থাকতে পারি যে, ১৭৯৩ সালে ফরাসি বিপ্লব তার প্রজাতান্ত্রিক গণবিপ্লবের চূড়ান্তত্ম ফয়সালায় পৌছতে চেয়েছিল।

আমরা রলাঁর ঐতিহাসিক উপন্যাস 'কোলাস ব্রিউগ্ন' প্রসঙ্গ ফরাসি বিপ্লব নিয়ে নাটকের আজকের সাম্প্রতিকতায় পৌছতে চেয়েছি। এখানে উল্লেখ করে রাখা যেতে পারে, সম্প্রতি সত্তরের দশকে এই ঐতিহাসিক উপন্যাসটি মস্কো আর্ট থিয়েটারে নাটকাকারে উপস্থাপিত হয়েছে।

শারদীয় কালান্তর, কলিকাতা, ১৯৮৮

রহ্‌মানের মা ও অন্যান্য

রহমানের মা

একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশ সবেমাত্র স্বাধীন হয়েছে। যারা মুক্তিযুদ্ধে প্রাণ দিয়েছে তাদের স্মৃতি তখন উড়তে শেখা পাখির বাচ্চার মতো, বুঝি তা অনন্ত ভবিষ্যতের অভিসারী। দখলদার পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর বাছাই করা খুনেরা যে হাজার হাজার মেয়ের ইজ্জত নষ্ট করেছিল তাদের বীরাঙ্গনা বলা হচ্ছে এবং তারা সামাজিকভাবে সমাদর পাচ্ছে। পথে প্রান্তরে ছড়িয়ে থাকা কঙ্কাল আর করোটি সরিয়ে ফেলা হলেও সেগুলো কারও মন থেকে সরে যায়নি। ঢাকায় শহীদ মিনারের চত্বর থেকে শুরু করে বুড়িগঙ্গার বাঁধ পর্যন্ত রাস্তার আশেপাশে দখলদার বাহিনী আগুন লাগিয়ে যেসব এলাকা পুড়িয়ে দিয়েছিল সেগুলোর অঙ্গার তখন যেন কালো কালো আঙুলে শহরের আকাশকে বিঁধছে। এই অবস্থায় ৭২ এর ২৬শে মার্চের স্বাধীনতা দিবসের সমস্ত অনুষ্ঠানে ঐকান্তিকতার সঙ্গে মুক্তিযোদ্ধা আর বীরাঙ্গনাদের সম্মানিত করা হচ্ছে। শহীদদের নামে এলাকায় এলাকায় জয়-জয়কার করা হচ্ছে। একই সঙ্গেই বিশেষভাবে সম্মান জানানো হচ্ছে শহীদদের আত্মীয়-স্বজনকেও।

মহানগরীতে সভা-সমিতির একটা বড় আকর্ষণ শহীদের কোন প্রিয়জনকে উপস্থিত করা। এই রেওয়াজ সামনে রেখে ঢাকার শহরতলিতে একটা মহল্লার অনুষ্ঠানের আমন্ত্রণলিপিতে জানানো হয়েছিল সভায় রহমানের মা উপস্থিত থাকবেন। '৭১ এর ২৬শে মার্চের রাতে মহল্লার চব্বিশ-পঁচিশ বছরের জোয়ান ছেলে আব্দুর রহমান ইয়াহিয়া খানের সাঁজোয়া বাহিনীর বিশাল ঢলের সামনে রাইফেল নিয়ে দাঁড়িয়েছিল বড় রাস্তায় ভাঙ্গাচোরা নানারকম জিনিসপত্র দিয়ে তৈরি একটা ব্যারিকেডের পেছনে। বলা বাহুল্য, প্রাণ দিয়েছিল। তার প্রৌঢ়া মাকে এতদিন মহল্লার সবাই চুপি চুপি সান্ত্বনা জানিয়ে আসছিল। স্বাধীনতার পরে আর সান্তনা নয়। এবার সম্মান বীরের মা হিসেবে পাওনা।

একটা স্কুল বাড়ির আঙিনায় চেয়ার পেতে সভা। স্কুলের বারান্দায় মঞ্চ। তার সামনের চেয়ারগুলোতে মহল্লার গণ্যমান্য পুরুষেরা। মঞ্চে প্রধান অতিথি হিসেবে একজন নাম করা লোকের চেয়ারের পাশে সভাপতির চেয়ার, তার পাশেই রহমানের মায়ের জন্যে চেয়ার। মঞ্চে টেবিলে একটা সদ্য ধোয়া সুজনির ওপর হারমোনিয়াম আর ফুলদানি। মহল্লার যে সব জোয়ান ছেলে রহমানের সঙ্গে একত্রে নানা রকম সামাজিক রাজনৈতিক কাজ করেছে, তারা ঘোরাফেরা করছে। উনিশ কুড়ি বছরের দুটি মেয়ে রয়েছে এদের সঙ্গে।

সভা শুরু হল। মহল্লার একজন বৃদ্ধ কোরান থেকে পাঠ করলেন। এরপর জাতীয় সংগীত সোনার বাংলা গাইলো স্কুলের ছেলেমেয়েরা। সভাপতি ঘোষণা করলেন

রহমানের মা আসছেন। সবাই দেখলো কয়েকজন যুবক ছেলের আগুপিছুতে রহমানের মা সভায় ঢুকছেন। এক ঝলকেই সবাই দেখলো তাঁকে। আপাদমস্তক বোরকায় মোড়া। পায়ে পাতলা চটি, তাদের মধ্যে শীর্ণ দুটি পা। বোরকার বাইরে দুদিকে দুটি নিরলঙ্কার হাত মাঝে মাঝে রহমানের সাথী যুবক ছেলেদের কাধে ভর করা। গতি ক্ষিপ্র, বারান্দায় উঠলেন কয়েক লহমার মধ্যে আঙ্গিনায় ঠাসাঠাসি করে বসানো চেয়ারের ফাঁকগুলোকে পেরিয়ে। তাকে তরুণীরা চেয়ারে বসিয়ে ধরে দাড়িয়ে রইল। প্রধান অতিথি ভাষণ দিলেন সমস্ত বাংলাদেশের পক্ষ থেকে শহীদ আব্দুর রহমানের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে। সভাপতি মহল্লার বনেদী সমস্ত বাসিন্দার পক্ষ থেকে রহমানের মায়ের গৌরবের কথা বললেন একেবারে ঘরোয়া ভাষায়।

বোরকায় আপাদমস্তক ঢাকা রহমানের মা কাঠের পুতুলের মতো চেয়ারে আড়ষ্ট হয়ে বসে বক্তৃতা শুনলেন। ডান হাতে ধরা রইলো মুখের ওপর দুচোখের দুটো ছ্যাঁদাওয়ালা আবরণীর ফালিটি। এরপরে যথারীতি গান ও কবিতা আবৃত্তি হল। আব্দুর রহমানের যুবক সাথীরা দুচার কথা বলে চাচী-আম্মাকে সান্ত্বনা জানাল। অবশেষে কিছু বলার জন্য অনুরোধ করা হলো রহমানের মাকে।

রহমানের মা কোনরকম ভূমিকা না করে বললেন, "রহমাইন্যা চাইছিল দ্যাশটারে স্বাধীন করতে। দ্যাশ স্বাধীন হইছে। এহন আপনারা দ্যাশের দশজনে যদি দ্যাশের মাইনষেরে খাওন পরন থাকন দিবার পারেন, তাইলে আপনারা আপনেগো কাম করবেন। মহল্লার মাইয়্যা ছ্যাওয়ালগো লেহাপড়া শিখানোর এই ইস্কুলটার লাইগ্যা রহমান খাটছে। এই ইস্কুলটা যেন থাহে। আমি আমার রহমানইন্যারে দিছি। অরে কোলে কইরা বেওয়া হইছিলাম। এতটা ডাগর করছিলাম। আমার আর কিছু নাই। তবু কই। দ্যাশের লাইগ্যা যদি কাজে ডাকেন, আমু। আমি শহীদের মা। আমি রহমানের মা।"

হাততালিতে সভা জমজমাট হয়ে উঠল। এরপরেই রহমানের মা একটা অঘটন ঘটালেন। তিনি তার মুখের উপর নেমে আসা বোরকার একফালি আবরণীকে এক ঝটকায় মাথার ওপর তুলে দিয়ে সমস্ত সভার দিকে দৃপ্ত নয়নে তাকালেন। তাঁর দারিদ্র্য ও শোকে-দুঃখে শীর্ণ মুখ খানিতে অপূর্ব গর্বের দীপ্তি। মহল্লার প্রবীণতমদেরও প্রতি তিনি আজ আর সংকোচ পোষণ করলেন না। পরমুহূর্তেই তিনি তাঁর পাশের তরুণী দুটিকে দুহাতে টেনে নিয়ে বারান্দা থেকে লাফিয়ে নিচে নেমে কয়েক লহমার মধ্যে ঠাসাঠাসি চেয়ার আর লোক ভেদ করে সভা থেকে বেরিয়ে গেলেন। মুখের আবরণীটি মাথার ওপরেই তোলা রইল।

দাগী

ঢাকার বাজার ঠাঠারি বাজার।

ঠাঠারি বাজারই বটে। কানে তালা লেগে যেতো এখানে। পিতল কাঁসার বাসন তৈরি হতো। ঠন ঠন ঠাঁইঠাঁই ঠনাঠন। এই ঠনাঠন-ঠনের সঙ্গে তাল দিতেই বুঝিবা ঢাকা শহরের এই এলাকায় গোটা কয়েক স্টীল ট্রাঙ্ক তৈরির ছোট ছোট কারখানা ঘর চালু হয়েছিল। ঠাঁইঠাঁই ঠনাঠনের সঙ্গে একটা বাড়তি শব্দ যোগ হয়েছিল। চড় চড় চড়াৎ।

হারমোনিয়মের চড়াপর্দার রীড টেপার মতো গলা চড়িয়ে কথা বলার অভ্যেস হয়ে গিয়েছিল কারখানাগুলোর তাবৎ কর্মীদের। এই ছড়া পর্দাতেই হরদম কথা বলার রেওয়াজ এমনকি খরিদ্দারদেরও। ঠন ঠন ঠাঁইঠাঁই। চড় চড় চড়াৎ। সামনের ঘরটিতে বসে মহাজন আর তার সহকারী। খরিদ্দারেরা এখান থেকে কেনে স্টীল ট্রাঙ্ক। কয়েকটা ছোট বড় নমুনা দেয়ালের গায়ে সাজানো। পিছনের ঘরে পাহাড়ের মতো থাক করা। তারপর খোলা আঙ্গিনা। সেখানেই তৈরি হয় ট্রাঙ্কগুল। রং করা হয়। কোন ছিটার দাগ না থাকে তা দেখে দেখে পরখ করে ঘরের ভেতর পাঠানো হয়।

দশজন কারিগর উদয়াস্ত খাটছে। কারও হাতে ছেনি, কারও বাটালি, কারও হাতুড়ি। কারও বার্নিশ রং। নানান রং। দুহাতের কুড়িটা আঙ্গুলের বাহাদুরি। কারও খাকি সার্ট, কারও ছেঁড়া গেঞ্জি। লুঙ্গি নয়তো খাটো ধুতি পরনে। পনেরো ষোল বছর বয়সের জোয়ানদার থেকে ষাট বছর বয়সের দক্ষ কারিগর। আট জন পুরুষ। দুই জন নারী। নারীরা দুজনই বৃদ্ধা। নারায়ণগঞ্জে সুতাকলে কাজে ঢুকেছিল। সেখানে ববিনে সুতো পরাতে পারে না চোখের দৃষ্টি কমে আসায়। সেজন্যে ট্রাঙ্কের কারখানায় কাজ জুটিয়ে নিয়েছে। একজন পরানের মা। আরেকজন রাধিকার মা। গাল তোবড়ানো। চোখ বসা। কিন্তু দুহাতের কুড়িটা আঙ্গুল লোহার সাঁড়াশীর মতো মজবুত। ওদের কাজ ট্রাঙ্কের গায়ে কোন ছিটা দেখা গেলে সেগুলো শিরিষ কাগজ দিয়ে ঘষে তুলে দেয়া। বারো আনা, এক টাকা রোজ পুরুষদের দক্ষতা অনুসারে। আট আনা রোজ মেয়েদের।

মহাজন তিরিশ বছর কারবারে দুটো দালান দিয়েছিল–একটা ঢাকা শহরে, আরেকটা গ্রাম দেশে। চৌকস লোক। পরনে নিমা আর ধুতি। পুরুষ্টু মুখে একটা বড় আঁচিল। মাঝারি বয়সের কারিগর শ্রীপদ ঠন ঠন ঠাঁইঠাঁইর মধ্যেও রসিকতা করে। রুক্ষ আঙ্গিনাটার সরস করবী গাছটার মতো তার কথাবার্তা। মাঝে মাঝে বলে, রাধিকার মা পোর্টমেন্টোর দাগ তুইলা দাও তুমি। মহাজনের আঁচিলাটারে ঘইসা তুইলা দিতে পারো না? আঙ্গিনার সবাই এই শত শত বার বলা ফরমায়েশটা শুনে হেসে ওঠে হো হো করে। রাধিকার মা কিন্তু মাতেনা। তার একটা কারণ মহাজন মনিব। দ্বিতীয় কারণ রাধিকার মুখেও আছে ছিটা। হবু বর এসে দেখে মুখ ফিরিয়ে যায়। রাধিকার মায়ের তৃতীয় মুশকিলটা হলো তামাক পাতা খেয়ে দাঁতগুলো কালো করেছে। হাসতে গেলে দাঁতের ওপর ঠোঁট দুটো চেপে হাসে। শ্রীপদ একবার রসিকতা করে তার কাছে তেতুল বীচি চেয়েছিল।

আঙ্গিনার সবাই জানে, তাদের মুখে না থাকলেও গায়ে পায়ে অসংখ্য ছিটা ছিটা দাগ। কিন্তু সুটকেস আর ট্রাঙ্কগুলোর গায়ে ছিটা থাকলে চলবে না। যদি থাকে তাহলে মহাজনের গঞ্জনার আগুন অষ্টপ্রহর ছেঁকা দেবে শরীরে। মহাজনের ঢাকাইয়া খিস্তি মেয়ে মরদ বাছে না। খাটনির কোন মাফ নেই। 'নাগা' হলে মজুরিও 'নাগা'। খাটনি বিহান থেকে রাত।

ঠন ঠন ঠাঁই ঠাঁই ঢন ঢন। চড় চড় চড়াৎ। সাতদিন পর কারও তিন টাকা। কারও সাত টাকা পুরো। দক্ষ কারিগর কালকেতু তিরিশ বছর ধরেই রয়েছে এখানে। তিরিশ বছর আগে সে যেমন অবস্থায় ছিল আজও তেমনি আছে। তবে মালিক মহাজন ফুলে ফেঁপে ঢোল। এইটেই নিয়ম। জন্মালে যেমন মরতে হয়, তেমনি। যার বেশি পয়সা,

সে বেশি পয়সা টানবে। এইটেই আইন। তবে কয়েক বছর ধরে একটা রব উঠেছে। পুরনো আইনগুলো চলবেনা না। রাজার, না টাকার। ঠাঠারি বাজারের চড় চড় চড়াৎ-এর কারখানাগুলোতেও গুনগুনিয়ে উঠছে একটা নতুন সুর। সারাটা দেশে যে একটা টানাপোড়েন চলছে সেটা বুঝতে পারা গিয়েছে ঢাকা শহরে। গান্ধীর লোকেরা হাটবার দোকান বন্ধ রাখে। ছাত্রেরা সাহেব ম্যাজিষ্ট্রেট পুলিশদের গুলি করে মারছে। একটা নতুন জিগীর উঠেছে, ইনকিলাব জিন্দাবাদ, গরিব রাজা হবে।

ব্যাপারটার পত্তন হলো একদিন যখন মুরারি মিস্তিরি কামিজের নিচে কোমরে বাঁধা একটা লাল তেনা খুব ওড়াতে ওড়াতে বলল, লাল ঝাণ্ডা জিন্দাবাদ। দুনিয়ার মজদুর এক হও। হাল সনে পয়লা মে-তে আমরাও সামিল হমু এই ফেলাগ নিয়ে।

যাদব মিস্তিরি ফ্ল্যাগটা মুরারির হাত থেকে নিয়ে নাকের কাছে নিয়ে বলল, এক্কেরে নয়া মালুম হইতেছে। ঐ বিড়ি মজদুররা দিছে বুঝি? অরা এই ফেলাগ নিয়া স্টাইক করল, জিতল। আমরাও স্টাইক করুম নাকি মুরারি?

—আগে এককাট্টা হও।

—তার আগে মহাজন যেন টের না পায়।

—ফেলাগটারে সাইরা রাখ।

শ্রীপদ এতসব মন্তব্যের মধ্যে হঠাৎ বলে উঠলো, দেখতো রাধিকার মা, ছিটার দাগ আছে নাকি এই ফেলাগে। রাধিকার মা ফ্ল্যাগটা হাতে নিয়ে বলল, 'কাগজ কাইটা কাইটা চিত্র খাড়ছে। কিসের? মুরারি বলল, 'হাতুড় আর কাচির। মজুর আর চাষীর রাজত্ব করুম আমরা।'

মহাজনের সাড়া পাওয়া গেল। রাধিকার মা যে ট্রাঙ্কটাকে শিরিষ কাগজ দিয়ে ঘষছিল তার ঢালা খুলে ফ্ল্যাগটাকে ঢুকিয়ে রাখল। আবার বেরিয়ে এলো ফ্ল্যাগ। রাধিকার মা তন্ন তন্ন দেখলো, না, দাগ নাই। ছিটা নাই। আমরা যেমন বাক্স বানাই, ফেলাগটাও সেইরকম। কোন কলঙ্ক নাই।

পয়লা মে'র আগেই অবশ্য একটা ঘটনা ঘটে গেল। মহাজনরা এক হয়ে পরামর্শ করে ঠিক করল ব্যবসায় মন্দা, মালপত্র পাওয়া যায় না, অতএব মজুরি কমিয়ে দেয়া হবে। মাস পয়লার মজুরি নিতে গিয়ে কমলা ট্রাঙ্ক ফ্যাক্টরির কর্মীরা দেখলো, দুচার আনা করে মজুরি কমিয়েছে। না নিয়ে উপায় ছিল না। কিন্তু সাতদিনের মধ্যে দেখা গেলো ঠাঠারি বাজারের রাস্তায় বেরিয়ে এসেছে এককাট্টা সমস্ত ট্রাঙ্ক ফ্যাক্টরির মজুররা, সঙ্গে কয়েকজন মজুরনী। একজনের হাতে লাল ঝাণ্ডা। দেখতে দেখতে সাব্যস্ত হলো, মালিক মহাজনদের বাড়ি ঘেরাও করতে হবে। দুদিন পরেই মিছিল করে সবাই উয়ারী পাড়ার মহাজনদের বাড়ি ঘেরাও করল। তারপর একটা আওয়াজ ঠাস্ ঠাস্ ঠাস্। ঠাস্ ঠাস্ ঠাস্। গুলি করতাছে, গুলি করতাছে, গুলি করতাছে। ঠাস্ ঠাস্ ঠাস্।

অন্ধকার।

সূর্য অস্তলোকে। আবার ভোর হল।

কয়েকটা দিন চলে গেল।

হাসপাতালে শুয়ে আছে জনদশেক মজুর। সবাই স্টীল ট্রাঙ্কের কারখানার কর্মী। ছররা লেগেছে সারা গায়ে। হাতে পায়ে গায়ে সর্বাঙ্গে ছিটা ছিটা কালো দাগ।

এদের মধ্যে রয়েছে শ্রীপদ। শীর্ণ হয়ে পড়েছে কয়েকদিনেই। রাধিকার মা তার সামনে বসেছিল গম্ভীর মুখে। একবার সে শ্রীপদ'র একটা হাত নিজের হাতে তুলে নিয়ে বিলি কাটতে কাটতে বলল, 'কত ছিটা, ঈস!'

শ্রীপদ বত্রিশ পাটি দাঁত বার করে রসিকতা করে বলল, 'কিগো, দাগীরে মনে ধরব না।' রাধিকার মা বলল, 'ফেলাগটাতে ছররার ছিটা লাগছে। দাগী না হইলে লড়াই করন যায়?' শ্রীপদকে প্রবোধ দেবার জন্যে আজ রাধিকার মা দাঁত বার করে হাসে।

জাত কুট্টি

ঢাকার বয়োবৃদ্ধ দিলওয়ার হোসেন মজলিশী মানুষ। তিনি শুরুতেই বলেন, আমি হালায় জাত কুট্টি।

এই শহরের হিন্দু মুসলমান মূল বাসিন্দারা কয়েকশ বছর ধরে একটা লোকভাষায় কথা বলে আসছে। এই ভাষায় যারা কথা বলে তাদের কুট্টি বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। বিশেষ করে ঘোড়ার গাড়ির গাড়োয়ানদের স্থান কুট্টিদের মধ্যে সেরা বিবেচিত হয়েছে। ঘোড়ার গাড়িগুলো উঠে গেলেও গাড়োয়ানদের চিনে নেয়া যায় কথা শুনেই। দিলওয়ার হোসেনও এক সময় ঘোড়ার গাড়ি চালাতেন। তিনি আজ ডালের তেজারতি করেন। তবে তাঁর গর্ব, তিনি জাত কুট্টি।

এই দিলওয়ার একদিন গল্প করতে করতে বললেন, আরেক জাত কুট্টি আছিল এলবার্ট লাইব্রেরির গোপাল বসাক। আমরা ঢাকায় গাড়োয়ানরা একবার ইউনিয়ন করছিলাম। গোপাল বসাক হইছিল প্রেসিডেন্ট। 'দুনিয়ার মজুর এক হও' কথাটা তার কাছে পেরথম শুনছিলাম হেইদিন। মীর্জা কাদের সর্দার লায়ন সিনেমা করছিল। হেয় ভি আছিল। গোপাল বসাক ভাষণ দিছিল কুট্টি ভাষায়। কাদের সর্দারভি দিছিল। কারে ছাইড়া কারে রাখি। দুনিয়াটারে চিনতে আরম্ভ করি এই দুই ভাষণ শুইনা। ফজলুল হক তখন কৃষক প্রজা পার্টি করছে, মীর্জা আছিল তার সঙ্গে। গোপাল বসাক করছিল লাল ঝাণ্ডার পার্টি, কমিউনিস্ট পার্টি। জেল খাইটা বাইরে আইছে। তার দুই বছর পরে আমাগো ইউনিয়নে নামায়।

দিলওয়ার হোসেন বললেন, বাপের বেটা এই গোপাল বসাক। কইলজাটা আছিল হাতির থ্যাকান বড়। দিলওয়ার হোসেন গোপাল বসাকের গল্প বললেন। ঢাকার ইতিবৃত্তের সঙ্গে গাছের শিকড়ের মত গাঁথা গোপাল বসাকের গল্প। দিলওয়ার হোসেন উপমা দিয়ে বললেন, মানুষের মৌত আছে, মরতে হইব। দেশভাগের পর ঢাকা ছাড়ছিল গোপাল বসাক। সে নাকি বাঁইচা নাই। শুনছি, মরছে ব্যারাম হইয়া। কিন্তু কুড়াল দিয়া গাছ ফালাইয়া দিলেও শিকড় থাকে। কুট্টিগো মধ্যে গোপাল বসাকেরও শিকড় রইছে। একদিন মাটি ফুইড়া জাগতে পারে, পাতা মেলতে পারে। এই ঢাকা শহরেই। বাপের বেটার লাহান কাম কইরা গেছে। একটা ঘটনার কথা বলি।

দিলওয়ার হোসেন ঘটনাটাকে দু এক কথাতেই শেষ করতে পারতেন। কিন্তু তিনি গোপাল বসাকের সঙ্গে ঢাকার চরিত্রের যে ব্যাখ্যা দিলেন, সেটা ছাড়া এই ঘটনাকে পুরোপুরি বুঝতে পারা যাবে না। গোপাল বসাকের গল্প ঢাকা শহরেরও গল্প। দিলওয়ার সাহেবের বিবরণের কুট্টি ভাষাকে চলতি বাংলায় সাজিয়ে লিখছি।

আমাদের সারা উপমহাদেশে হিন্দু আর মুসলমান অন্যান্য আরও কত ধর্মের মানুষের সঙ্গে ঢাকাই শাড়ির মত বোনা রয়েছে। একটু খোসটা লাগলেই শাড়িটা নষ্ট হতে পারে। হিন্দু আর মুসলমানকে ভাগ করে আলাদা বানাবার কথাটা কোনদিন ভাবা যায়নি। কিন্তু ৪৭ সালে ইংরেজরা ভাগ করল, তখন মন্দের ভাল বলে অনেকে মেনেও নিল। প্রকৃতপক্ষে যমুনা যেমন ভাঙ্গে, ঠিক সেই রকম তলায় তলায় ভাঙ্গতে শুরু করেছিল। তখন ফাটল দেখেও আন্দাজ করা যায়নি, এই পর্যন্ত বলা যায়। এই ফাটল একটার পর একটা দাঙ্গা। ক্লাইভের বংশের লোকেরা যেসব জায়গা বেছে নিয়েছিল হিন্দু মুসলমানে ফাটল ধরাবার জন্যে, ঢাকা শহর হলো সেগুলোর একটি। ৪০ সালে বিশ্বযুদ্ধের সময় খড়কুটো জড়ো করে আগুন ধরানো হলো ঢাকাতেই। তৈরি হলো হিন্দু এলাকা আর মুসলমান এলাকা। '৪০ থেকে '৪৬ সালের মধ্যে ঢাকা শহরটা গোটা পঁচিশেক টুকরোয় ভাগ হয়ে গেল। রেসকোর্স, কোর্ট কাচারি, ইউনিভার্সিটি আর রোজকার বাজার রইল সাধারণ এলাকা। মাত্র কয়েক বছর আগে ঘোড়ার গাড়ির গাড়োয়ানরা যে ইউনিয়ন করেছিল, তার কথা মনে করিয়ে দেবার চেষ্টা করলেন গোপাল বসাকের মত লোকেরা। মাঝে মাঝে জিন্দাবাহারের মইজুদ্দিন ডাক্তার আর নবাবপুরের গোপাল বসাকের দল শহরে পঁচিশ টুকরোর সীমান্তগুলোতে ছুরি মারামারির বিরুদ্ধে প্রতিরোধ খাড়া করতে চেষ্টা করতেন। ঘোড়ার গাড়িতে লাল ঝাণ্ডা উড়িয়ে সাম্প্রদায়িক মৈত্রীর প্রচার চলতো। কিন্তু সেই সময়েই ঢাকার ঘোড়ার গাড়ির ওপর উচ্ছেদের নোটিশ জারি হয়েছিল। আমদানি হয়েছিল রিক্সার। ঘোড়ার গাড়ির আরগরাগুলো আর রিক্সার স্ট্যাণ্ডগুলো হিন্দু আর মুসলমান বসতির ভিতরের দিকে ঢুকে গেল। বাজারগুলো মোটামুটি ভাগাভাগি হয়ে গেল। মুসলমান মহল্লায় কালী মন্দির আর হিন্দু মহল্লায় যেসব মসজিদ ছিল তাদের সরানোর প্রশ্ন ওঠেনি। কারণ এইসব মন্দির আর মসজিদের দালান আর প্রতিপত্তি কমপক্ষে একশ বছরের ইতিহাস বয়ে নিয়ে আসছে। এগুলো যে যেখানে রয়ে গেল। সাধারণ একটা অলিখিত সন্ধিচুক্তি অনুযায়ী ওরা রইল দাঙ্গা হাঙ্গামার ধরাছোঁয়ার বাইরে। এদের ওপরেও যখন হাত পড়েছে, তখন বুঝতে পারা গিয়েছে, দাঙ্গার প্রচণ্ডতা ভয়ানক! জ্বর একেবারে ১০৬ ডিগ্রি। ম্যালেরিয়ার মতোই অবশ্য ছাড়ে। নেমে গিয়ে একেবারে ১৭ ডিগ্রি।

সাচী বন্দর আর মালিটোলার বেশ্যাপল্লী ছিল হিন্দু মুসলমান জৈন খৃস্টানের সাধারণ বাজার। তখন বিশ্বযুদ্ধ চলছিল। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দালান তখন মিলিটারী হাসপাতাল। শ্বেতাঙ্গ কৃষ্ণাঙ্গ সৈনিকদের মধ্যে দেশ বিদেশের মাস্তান মার্কারা বেশ্যাপল্লীকে হাঙ্গামামুক্ত চাইতো। তবু এইসব বেশ্যাপল্লীতে মাতাল হিন্দু মুসলমানরা ছুরি মারামারি করত এবং সেগুলো হতো দাঙ্গার সূচনা।

অবশ্য '৪০ থেকে '৪৬ -এর মধ্যে ঢাকায় শুধু ভাগাভাগি চলেনি। '৪২ সালের ৯ই আগস্ট সারা শহরে 'ব্রিটিশ ভারত ছাড়' বিক্ষোভ হয়েছে–গুলি চলেছে। '৪৩ সালের দুর্ভিক্ষে মহল্লা কমিটি হয়েছে হিন্দু মুসলমান মিলে। ৪৬ সালে রশীদ আলী দিবসে সারা ঢাকায় পূর্ণ হরতাল হয়েছে। লাল ঝাণ্ডা নিয়ে এবং এখনো-বা কংগ্রেস আর মুসলিম লীগের ঝাণ্ডা একত্র বেঁধে ভলাণ্টিয়াররা বিবেকের কাজ করেছে। কিন্তু এগুলো জোয়ারের মতো। ভাটির টান লাগতেই বেরিয়ে পড়েছে ঢাকায় গড়ে ওঠা শয়তানের

লেবরেটরি। সমস্ত উপমহাদেশটাকে হাঁক দিয়ে বলছিল, হিন্দু মুসলমানেরা যার যার রাজনৈতিক হাঁড়ির জন্যে আলাদা চালা তৈরি করে ফ্যাল জলদি। জলদি, জলদি। আবাগীর পুতেরা।

শয়তান প্রত্যেকবার দাঙ্গায় হিন্দু মুসলমান তল্লাটগুলোকে আঁটসাট করার জন্যে দশ বারো পনেরো কুড়ি জনের প্রাণ নিয়েছে। এদের মধ্যে আমওয়ালা ছিল, আবার কলেজের প্রফেসরও ছিল। রক্তের রেখা খানিকটা মুছে আসতেই আবার রক্তের রেখা টেনেছে। ঢাকার বাইরের মানুষই ঢাকায় এসে বেঘোরে প্রাণ দিয়েছে। গ্রামে গ্রামান্তরে কিংবা দূরে দূরান্তরে যখন কেউ ঢাকা শহরে মারা গিয়েছে বলে খবর পৌঁছেছে তখন মৃতের আত্মীয় স্বজন একটা কথা বলে মনকে বুঝ দিয়েছে 'ঢাকা শহরের কোন কাজে গেলে, প্রাণটা হাতে নিয়ে যেতে হয়।' অবশ্য ঢাকার পুতেরাও যে একেবারে রেহাই পেয়েছে তা নয়। এমনি এক ঢাকার পুতের কথা বলার জন্য লেবটেরির বৃত্তান্ত।

গোপাল বসাক ঢাকার প্রথম কমিউনিস্ট। ব্যবসায়ীর ছেলে যোগ দিয়েছিল ঢাকার একটা বিপ্লবী দলে। এমন কাণ্ড কিন্তু কেউ শোনেনি এর আগে। যুবক গোপাল বসাক ধরা পড়ল মীরাট ষড়যন্ত্র মামলায়। মারকুটে একহারা শরীর। একটা চোখ পাথরের। দুপাটি দাঁতই বাঁধানো। কিন্তু পড়াশোনা করেছে প্রচুর। আর মাথার মধ্যে ঝুড়ি ভরতি তথ্য আর তত্ত্ব। অগ্নিযুগের বাঘা বাঘা নেতারা গোপাল বসাককে তর্কে ঘাঁটাতে সাহস করে না। সংসার করেনি এমন নয়। বরং বেশ কয়েকটি ছেলেমেয়ে। নবাবপুরের বসাক বাড়ির ছেলে। কৈশোরেই বিয়ের পাট চুকে গিয়েছিল। অনটন সংসারে এখন চব্বিশ ঘন্টা। পৈতৃক ব্যবসা লাটে উঠিয়ে রেখেছে গোপাল বসাক। তবে সেকরার খুটখাটের মতো ঢাকা শহের অনেকগুলি শ্রমিক ইউনিয়ন দাঁড় করিয়ে ফেলেছিল। খুলেছিল পার্টি অফিস। ঢাকা জেলায় তাঁতী সমবায় সমিতি স্থাপন করেছিল। জবরদস্ত সমিতি। ঘটনাটা ঘটেছিল এই তাঁতী সমবায়ের সূত্রে।

৪৬ সালে ১৪ই আগস্টের দাঙ্গা খানিকটা ঝিমিয়ে এসেছে। অক্টোবর মাস। একদিন গোপাল বসাকের বাড়ি ঘেরাও হয়ে গেল। দাবি 'বাইর কইরা দাও। মুসলমান ঘরের ভিতরে।' গোপাল বসাকের কাছে এসেছিল সাতজন তাঁতী–ঢাকা জেলার গ্রামাঞ্চল থেকে। এর মধ্যে চারজন মুসলমান।

গোপাল বসাক ছাদের ওপর দিয়ে বাইরে লোক পাঠিয়ে টেলিফোন করিয়ে পুলিশ কাচারিতে খবর পাঠালো 'সশস্ত্র পুলিশ পাঠাও।' ততক্ষণে সমস্ত নবাবপুর রাস্তা হিন্দু মাস্তানে ভরে গিয়েছে। যারা গোপাল বসাকের বাড়ি ঘেরাও করেছিল তারা বাড়িতে আগুন ধরাবে বলে ঘোষণা জারি করেছিল।

গোপাল বসাকের বাড়ির লোকেরা ছাদ টপকে পাশের বাড়ির ছাদে যাবার জন্যে তৈরি। শুধু অপেক্ষা কখন শুনবে, 'আগুন, আগুন, আগুন'।

হঠাৎ দেখা গেলো দৌড়াদৌড়ি লেগে গিয়েছে। পুলিশের গাড়ি এসেছে। পুলিশের গাড়ি নির্জন নবাবপুর রোডে দাঁড়িয়ে। গোপাল বসাক সঙ্গে করে এসে তাঁতীদের সমস্ত দলটাকে গাড়িতে তুলে দিল। গাড়ি স্টার্ট দিয়ে চলে গেল। গাড়ি চলে যেতেই আবার ভরে গেল নবাবপুর রোড।

ঢাকার পুত গোপাল বসাক। বয়স ৪৫। ভয় পাবার ছেলে নয়। এসে নিচের ঘরেই বসল। রাস্তার পাশে এই ঘর।

কড়া নাড়ার শব্দ।

আবার কড়া নাড়ার শব্দ।

স্ত্রী ছেলেমেয়ে এসে বলল, 'দরজা খুইলো না'। আবার কড়া নাড়ার শব্দ। তারপর দরজায় লাথি। অনবরত লাথি। গোপাল বসাক উঠে দরজা খুলে দরজায় টান হয়ে দাঁড়াল।

কি চাই?

এই হচ্ছে ঢাকার বড় গোপাল বসাক। মারকুটে শরীর। একটা পাথরের চোখ। আরেকটা সজীব উজ্জ্বল চোখ সূর্যের মতো জ্বলজ্বল করছে। ছোট করে চুল ছাঁটা। পরনে একটা লুঙ্গি আর গেঞ্জি। খালি পা। মুখখানা ভাঙ্গাচোরা। ঠোঁটের দুকোণে কষের মতো। গোঁফদাঁড়ি কামানো হাতে একটা ফাউন্টেন পেন।

মাস্তানরা একটু পিছিয়ে গেল। কিন্তু তৈরি হয়েই এসেছিল ওরা। ওদের একজন খানিকটা পিছিয়ে চেঁচিয়ে বলল, শালা কমিউনিস্ট। তারপর একটা এসিড ভর্তি বালব ছুড়ে মারল গোপাল বসাকের মুখের ওপর।

গালের দুদিকটা কেটে গেছে। রক্ত ছুটছে। এসিডে পুড়ে কালো হয়ে গিয়েছে বেশ খানিকটা। গেঞ্জিতে লুঙ্গিতে খানিকটা এসিড ছিটকে ছিটকে পড়েছে।

এক মুহূর্ত বোধ হয় চোখে অন্ধকার দেখেছিল। কপাল ধরে সামলে নিয়েছে।

স্ত্রী ছেলে-মেয়ে চিৎকার করে কেঁদে তাকে বলছে, 'দরজা দাও! দরজা দাও'।

গোপাল বসাক দরজা না দিয়ে একচোখে বিজয়ীর হাসি হেসে কপাট না ধরে দাঁড়িয়ে রইলেন।

গিরিধারী প্রসাদ

সময়টা ছিল ১৯৪২ সাল। ঢাকা শহরের এক সামান্য দারোয়ান ছিল দ্বারভাঙ্গার গিরিধারী প্রসাদ। পটুয়াটুলির গলিতে সে কতকগুলো দোকান আর অফিসের রক্ষণাবেক্ষণ করত। পটুয়াটুলিতে রাস্তার দুপাশে দোকান আর ছোট ছোট অফিস ছিল সে সময়। জনবসতি ছিল না। দারোয়ানরা ছিল জিম্মাদার। গিরিধারী প্রসাদ ছিল এদের একজন। অত্যন্ত দায়িত্বশীল ও সৎ কিন্তু সামান্য মাইনের লোক ছিল সে।

সময়টা ছিল কিন্তু সঙ্গীন। অনেক হিসেব করে ভারতের কংগ্রেস নেতৃত্ব '৪২ সালের ৯ই আগস্টের "ইংরেজ ভারত ছাড়ো" প্রস্তাব পাশ করেছিলেন। নৈতিক দিক দিয়ে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ফ্যাসিবাদী হিটলার মুসোলিনী তোজোর নিন্দা করেছিলেন তারা; কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজের অধীনে ফ্যাসিবাদীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নামাও সম্ভব নয় বলে জানিয়েছিলেন। ৯ই আগস্টের পূর্বাহ্নে কংগ্রেস নেতারা গ্রেপ্তার হয়ে যাওয়ায় লক্ষ লক্ষ নরনারী রেল লাইন উপড়ে ফেলা, টেলিগ্রাফের তার কাটা কিংবা পোস্ট অফিস জ্বালিয়ে দেওয়ার সারা উপমহাদেশব্যাপী লড়াইয়ে নেমে পড়েছিল। গান্ধীজী জেলে ঢুকবার আগে ধ্বনি দিয়ে গিয়েছিলেন, করেঙ্গে ইয়া মরেঙ্গে। অবশ্য এই ধ্বনিটিকে

আক্ষরিক অর্থে স্বয়ং নেতৃত্বও যেমন আঁকড়ে ধরেননি, তেমনি অনুগামীদের অনেকেই মরিয়া হয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েননি। আন্দোলনের আটঘাট নেতারাও যেমন বেঁধেছিলেন, কর্মীরাও এবং সেইসঙ্গে জনতার বড় অংশও তেমনি আঠঘাট বেঁধেছিলেন। যারা প্রাণ হাতে নিয়ে বিদ্রোহে অবতীর্ণ হয়েছিলেন, তাদের মধ্যে যার যা-কিছু জিম্মাদারি ছিল, সেগুলোকে তারা পেছনের সারির লোককে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন। এ ব্যাপারটা যেমন সংঘের, তেমনি ব্যক্তিগত জিম্মাদারিতে প্রযোজ্য ছিল। অবশ্য কংগ্রেস নেতৃত্ব তাদের অন্যান্যবারের আন্দোলনের তুলনায় আটঘাট কম করে বেঁধেছিলেন সংঘগত ও ব্যক্তিগত উভয় ক্ষেত্রেই। সেজন্যেই বোধ হয় "ইংরেজ ভারত ছাড়ো" আন্দোলনে সাধারণ মানুষ গ্রামে গঞ্জে বিদ্রোহে নিজস্ব উদ্যোগ বেশি নিয়েছিলেন।

ঢাকা শহরেও ঘটনাটা ঘটেছিল এই ধারাতেই। কংগ্রেসের নেতাদের গ্রেপ্তার হবার খবর পেয়ে বিক্ষুব্ধ জনতা ১০ই আগস্ট কোর্ট-কাচারির ওপর চড়াও হয় এবং শহরের টেলিগ্রাফের তারগুলোকে কিছুক্ষণের মধ্যে কেটে দেয়। শহরের একটা দিকে রাস্তায় রাস্তায় তার ছড়িয়ে থাকে।

শহরটা বস্তুতপক্ষে জনতার দখলেই চলে গিয়েছিল। সেনাবাহিনীর একটা দল আর সশস্ত্র পুলিশ কোর্ট-কাচারি রক্ষায় ব্যস্ত ছিল। তবে তারা তার কাটায় নিয়োজিত বিক্ষুব্ধ জনতার ওপর নজর রাখতো এবং বড় রাস্তায় গুলি ছুঁড়েছিল বেধড়ক।

তারা ঘনবসতিতে ঢুকতে চেষ্টা করেনি। বিক্ষুব্ধ জনতা নানাভাবে বাধা সৃষ্টি করেছিল। ইট আর পাথর ছিল জনতার বড় অস্ত্র।

আগের রাতে অঝোর ধারায় শ্রাবণের ধারা ঝরে পড়েছিল পূবে গ্যান্ডারিয়া ফরিদাবাদ থেকে পশ্চিমে নবাবগঞ্জ পর্যন্ত বুড়ীগঙ্গার অববাহিকা বরাবর লম্বাটে ঢাকা শহরের অসংখ্য মহল্লায়। যখন তার কাটা হচ্ছিল, এবং যখন বিক্ষুব্ধ জনতার ওপর সেনাবাহিনী ও পুলিশ গুলি চালাচ্ছিল, তখনও মাঝে মাঝে শ্রাবণের ধারা ঝরে পড়ছিল। কিন্তু জনতার বিদ্রোহী মনের আগুন তাতে মোটেই নেভেনি। গুলি করেই সেনাবাহিনী ও পুলিশের লোকেরা চলে যাচ্ছিল, সেইজন্যে যারা গুলিতে মারা যাচ্ছিল, তাদের লাশ থেকে যাচ্ছিল জনতার অধিকারে।

জনতা একেক জায়গায় চারজন পাঁচজন নানাবয়সী লোকের লাশ সনাক্ত করছিল। পরিবার পরিজনের কাছে পৌছে দিচ্ছিল। কারও না কারও চেনা শোনার মধ্যেই ছিল এইসব লাশ।

পটুয়াটুলির গলিতে প্রচন্ড বিক্ষোভ হয়েছিল। গুলিও চলেছিল নিদারুণ। তবে এই গলিটা ছিল জনবসতির বাইরে। সেইজন্যে এখানে লাশ সনাক্ত করতে অসুবিধা হচ্ছিল। লড়াই থেমে যাবার পরে যাঁরা দলবেঁধে লাশগুলোকে জড়ো করছিলেন এবং সনাক্ত করছিলেন তাঁরা এক জায়গায় কয়েক মুহূর্ত ভাবলেন, এর কি করা যায়?

দেখা গেলো, দারোয়ান ধরনের একটি লোক চিৎ হয়ে মরে পড়ে আছে। পরনে খাটো ধুতি আর ফতুয়া। আর হাতের মুঠোয় তখনও একটা ঝামা ইটের বড় টুকরো। তার কোমরে বাঁধা এক গোছা চাবি।

সমস্ত দোকান-পাট তখন বন্ধ। বুঝতে পারা গেল, কাছাকাছি অনেকগুলি অফিস আর দোকানের দরজা খুলে ঝাট দেওয়ার দায়িত্ব ছিল এই দারোয়ানের ওপর। অর্থাৎ এই লোকটির ওপর জিম্মাদারি ছিল বেশ কয়েকজনের।

কিন্তু লড়াইয়ে নেমে যাওয়া এই লোকের তখন কাউকে চাবির গোছা বুঝিয়ে দেবার কথা মনে হয়নি। দোকানগুলো আগেই বন্ধ হয়ে গিয়েছিল হরতালের ডাকে। সুতরাং সামান্য মাত্রও পিছুডাক ছিল না তার জন্যে।

কোমরের ধুতির গিটে আট করে বাঁধা চাবির গোছাটাকে খুলে ফেলতে হলো গিরিধারী প্রসাদের সৎকারের প্রস্তুতির জন্যে। চাবির গোছাটা তার ঘরের অন্যান্য জিনিসপত্রের সঙ্গে একটা বেতের সুটকেসে রেখে দেওয়া হল। এই সুটকেসেই নাগরী অক্ষরে লেখা একটি চিঠি পাওয়া গেল। প্রাপকের নাম গিরিধারী প্রসাদ।

গিরিধারীর এক দেশের লোককেই তার জিনিসপত্রের জিম্মাদারি দেয়া হল। সে তখন চিঠি পড়তে বসেছে। চিঠিখানির মর্ম যা বেরিয়ে এল তা হচ্ছে এই। গিরিধারী চাকরীর জিম্মাদারিকে পরিবারের জিম্মাদারির থেকে বড় করে ভাবছে কেন? সে কেন দুবছরের মধ্যে একবারও তার স্ত্রী আর বাল-বাচ্চাদের দেখতে আসছে না? অফিস ঘরের চাবির গোছাটা কি স্ত্রীর আঁচলের চাবির চেয়ে বড় হলো?

চিঠিখানা গিরিধারী প্রসাদের স্ত্রীর লেখা।

সিন্দুরের ফোঁটা

'৪০ সালে ঢাকা শহরে হিন্দু মুসলমানে যে দাঙ্গা বেধেছিল, তা বছরের পর বছর তুষানলের মতো জ্বলছিল। মাঝে মাঝে সৃষ্টি হচ্ছিল দাবানলের। ধুতি আর লুঙ্গি, সিদুরের ফোঁটা আর বোরকাই হয়ে উঠছিল পুরুষ কিংবা স্ত্রীর পরিচয়। দুই তরফের বিত্তশালীদের সঙ্গে সঙ্গে একান্ত গরিবদের মধ্যেও এই সরঞ্জামগুলো মনের মধ্যে পরিচয়ের চিহ্ন হয়ে উঠছিল।

কলেরা আর বসন্তে অবশ্যম্ভাবী মৃত্যুর মতোই শেষ পর্যন্ত দেশভাগের চিন্তা দেশের মানুষের মনে বাসা করল। ভাইয়ে ভাইয়ে এবং ভ্রাতৃবধূতে ভ্রাতৃবধূতে মন-কষাকষি ও মুখ-দেখা বন্ধের নাটকে পৃথক হবার যে পরামর্শ বিষ-ফোড়ার মত সকলের মনকে টনটনিয়ে দেয় সেই পরামর্শে কান পাতলো দেশের বড় বড় বুঝদার নেতারাও। শেষ পর্যন্ত হাড়ি আলাদা হলো, মাঝখানে দেয়াল উঠল। '৪৭ সালে উপমহাদেশ ভাগ হয়ে গেল।

সবাই ভাবলো, যাক একটা হেস্তনেস্ত হয়ে গেল। দুদিকে যার ভাগে যা পড়বে সে একটা আস্ত টুকরা। কিন্তু দেখা গেল, রাতারাতি পাঞ্জাবে যা হলো কলকাতা কিংবা ঢাকায় তা রাতারাতি সম্ভব হলো না। যা হবার নয় তা হবে কি করে? কিন্তু এই প্রশ্নকে ধামাচাপা দিতে আবার সেই পন্থা; এই সমস্যার গায়ে হাত দিতে যাওয়া পণ্ডশ্রম। যা হবার তা সময়ে আপনি হবে। সুতরাং কলকাতায় যেমন দেশভাগের পর বারবার সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হয়েছে, ঢাকাতেও তেমনি বারবার দাঙ্গা হয়েছে।

১৯৬৪ সালের জানুয়ারিতে এইভাবেই আবির্ভূত হলো দাঙ্গার অনিবার্যতা। পৌষ-সংক্রান্তিতে ঢাকার সব চেয়ে বড় হিন্দু চাকলায় যখন শত শত ছাদ থেকে হাজার হাজার উৎসাহীর উল্লাসের চীৎকারের সঙ্গে সঙ্গে ঘুড়ি উড়ছিল একটাই আকাশে ঢাকার 'হাংক্রাইনের' হিন্দু মুসলমানের একই দিনের ঘুড়ি ওড়ানোর পাল্লাপাল্লির জের হিসেবে

বহুকালের, তখন ভোর বেলাতেই ঢাকা থেকে পনেরো মাইল দূরে মিল এলাকায় হত্যাকাণ্ড আরম্ভ হয়ে গিয়েছে। সন্ধ্যার পর ঢাকা শহরে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাবাজরা তাদের আগুন দেয়া, লুটপাট আর হত্যালীলা শুরু করে দিল। ঢাকায় মনে হলো '৪৭ সালে যা হয়নি আজ রাতেই সেই ফয়সালা হয়ে যাবে।

ঢাকায় কয়েকটা খবরের কাগজ দিন কয়েক আগে একটা সংক্ষিপ্ত আবেদন জানিয়েছিল, যেখানে যাই হোক না কেন, ঢাকায় যেন দাঙ্গা না হয়। এই কাগজগুলো ছিল প্রধানত তখনকার গণতান্ত্রিক আন্দোলনের মুখপত্র। এই রকম একটা কাগজের অফিসের দোতলায় ১৪ই জানুয়ারির রাতে একটা টেবিলের চারদিকে জড়োসড়ো হয়ে বসেছিলেন বুদ্ধিজীবীরা। এদের মধ্যে ছিলেন এক মহিলা অধ্যাপিকা। ছিলেন একজন ডাকসাইটে সাংবাদিক। এদের মধ্যে কয়েকজন সকালবেলায় গ্রামাঞ্চলে মিল এলাকায় যেখানে হাঙ্গামা শুরু হয় সেখানে জীপ নিয়ে সংখ্যালঘুদের আশ্বাস দিতে গিয়েছিলেন। ফিরে এসেছিলেন তাঁরা পঙ্গুত্বের প্রমাণ দিয়ে। অসহায় নর-নারী-শিশুর চীৎকার আর আগুন আর রক্ত আর লাশের ছবি চোখে নিয়ে ফিরে এসেছিলেন জীপে চড়ে। সেই জীপটা তখন কাগজের অফিসের দরজায়। সাংবাদিক কাঁদতে লাগলেন। বললেন, আমরা ব্যর্থ।

কেউ তার কান্নায় বাধা কিংবা প্রবোধ দিলেন না।

রাত দশটায় জানা গেল যথারীতি ১৪৪ ধারা জারী হয়েছে, কার্ফিউ জারীর সম্ভাবনা রয়েছে। সুতরাং এবার ঘরে ফেরার পালা। টেলিফোনে জানা গেল মহিলার ভাই গাড়ি নিয়ে আসছেন। ঢাকায় মুসলমানরাই দাঙ্গা করেছে, কলকাতায় যেমন হিন্দুরা করেছে। মহিলা এবং তার ভাই মুসলমান। সুতরাং দাঙ্গায় তাঁদের কোন ভয় নাই।

মহিলার ভাই আসার পরে অন্য সকলেও সেই গাড়িতে পাড়ি দেবার জন্য উঠে পড়ল। হঠাৎ একজন বুদ্ধিজীবী আর্তনাদ করে ওঠার মতো করে বলে উঠলেন, এটা কি? তিনিই মহিলার কপালের দিকে আঙ্গুল তুলে বললেন, এ-যে সিঁদুরের ফোঁটা। এ চলবে না।

এই মহিলা অধ্যাপিকা অবশ্যই সিঁথিতে সিঁদুর দেন না, দেন কপালে। খুব বড় করে দেন। সবাই জানে তাঁকে। অত্যন্ত একরোখা। জাদরেল। অনায়াসে বড় বড় মোটর গাড়িকে দক্ষ ড্রাইভারের মতো চালান। আত্মগোপনকারী কমিউনিস্ট নেতাদের তিনি পৌঁছে দিয়েছেন সেল্টার থেকে সেল্টারে। পাকিস্তানি গোয়েন্দারা সন্দেহ করতে পারেনি মহিলার চলাফেরায় আধুনিকতা আর প্রসাধনের ঘটায়। খবরের কাগজের অফিসে বসে প্রকাশ্যে তিনি সিগারেট টানেন। সিঁদুরের ফোঁটাটা তার প্রসাধনের অঙ্গ। ছোটখাট কোন কিছু করার অভ্যেস তার নেই। তাই সিঁদুরের ফোঁটা ক্রমেই বড় হয়ে উঠেছে।

দাঙ্গার রাতে সবাই স্তম্ভিত হয়ে তাকিয়ে রইল মহিলার কপালের প্রকাণ্ড সিদুরের ফোঁটার দিকে। সেই জাদরেল সাংবাদিক পর্যন্ত বললেন, মোছ এই সিঁদুরের ফোঁটা ম্যাডাম। তা না হলে তোমাকে সঙ্গে নিয়ে আমরাও রাস্তায় সব কোতল হয়ে যাব।

উপস্থিত সকলের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে রুমাল দিয়ে মুছে ফেললেন সিঁদুরের ফোঁটা। কিন্তু বললেন, একটা কিছু করতেই হবে এই দাঙ্গার বিরুদ্ধে দাঁড়াবার

জন্যে। গণতান্ত্রিক কাগজগুলোর তরফ থেকে যে আবেদন বেরিয়েছিল দাঙ্গা থেকে বিরত থাকার জন্যে, তার সূত্রের মুসা বিদায় ইনি ছিলেন আরেকজন উদ্যোক্তা।

পরদিন সকালে তোপখানা রোডের একটা ব্যবসায়িক দপ্তরে সবাই মিলবেন, এই কথা বলে জ্বলন্ত রাতের ঢাকা শহরের রাস্তায় ভাঙ্গা কাচ আর লুটপাটের পর ছড়িয়ে দেয়া নানারকমের জিনিসপত্রকে গুঁড়িয়ে চলা মোটরে যার যার বাড়ি ফিরলেন।

পরদিন দেখা গেল একটা অভাবনীয় কাণ্ড। তোপখানা রোডের সেই নির্দিষ্ট দপ্তরে শান্তির জন্যে লড়াই-এর বৈঠক বসলো সমস্ত গণতান্ত্রিক দলের। ঢাকায় যে বুদ্ধিজীবীরা বাংলা ভাষা আন্দোলনের পতাকাবাহী তাঁরা সবাই সমবেত। শেখ মুজিবুর রহমানকে সামনে নিয়ে মিছিল করার জন্যে তৈরি সবান্ধব রাশেদ খান মেনন। এই ব্যবসায়িক দপ্তরের অন্যতম অধিকর্তা সাঈদুল হাসান, যাকে ৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের সময় ক্যান্টনমেন্টে নিয়ে হত্যা করা হয়, তিনি সবাইকে বসাতে ব্যস্ত।

গত রাতে ঠাঠারি বাজারে একটি হিন্দু পরিবারকে বাঁচাতে গিয়ে শাহজাহান প্রাণ দিয়েছিলেন হাঙ্গামাকারীদের ছোরায়। '৬২ সালে গণতান্ত্রিক দলগুলো মিলেছিল, তারপর যথারীতি বহুবারের মতো ছিঁড়ে খুড়ে গিয়েছিল নিম্নতম কর্মসূচি ঠিক করতে না পেরে। এবারকার দাঙ্গায় আবার তারা একত্র হয়েছে।

বিরাট মিছিল বের হলো পুরোভাগে ট্রাকে শেখ মুজিবকে নিয়ে দাঙ্গাকারীদের জটলার মোকাবেলা করে রক্তাক্ত নগরীতে একটা সামগ্রিক দাঙ্গা প্রতিরোধ ঘটাবার জন্যে।

ট্রাকে উঠতে চাইলেন সেই মহিলা। তাঁকে বলা হলো, এখন লড়াই। এখন মেয়েরা পেছনে। মানবেন না তিনি। জেদ করতে লাগলেন। ভারি জেদী মহিলা তো।

সবাই তাকিয়ে দেখল। তাঁর কপালে প্রকাণ্ড সিঁদুরের ফোঁটা। সকালেই এসেছিলেন। কিন্তু তাঁর আধুনিক সাজপোষাক ছিল না। একটি সাধারণ শাড়ী গায়ে জড়িয়ে এসেছিলেন। তখন কপাল নিষ্প্রভ।

হঠাৎ করে ঘুরে দাঁড়িয়েছেন তার স্বাভাবিক ধরনে। ভ্যানিটি ব্যাগ থেকে সিঁদুরের কৌটা বের করে তারই আরশিতে মুখ রেখে সিঁদুরের ফোঁটা পরেছেন।

শেখ মুজিব বললেন, আচ্ছা আসেন। তবে পিছনের জীপে। সেখানে সব মহিলা। মহিলা আরও কয়েকজন মহিলাকে নিয়ে জীপে উঠলেন। বসলেন ড্রাইভারের পাশে।

দুপাশে উৎসাহী জনতাকে রেখে মিছিল এগিয়ে চলল। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার বিরুদ্ধে প্রথম গণবিদ্রোহ ঢাকায়।

জীপ গাড়িতে মহিলারা। তাদের মধ্যে যিনি ড্রাইভারের পাশে তার কপালে প্রকাণ্ড সিঁদুরের ফোঁটা।

মাল্যদান

বাংলাদেশের '৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের জয়ের পরে দেশের বাইরে চলে যাওয়া প্রায় ৮০ লক্ষ এবং দেশের ভিতরে এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে ধাবমান আরও ৮০ লক্ষ শরণার্থী নর-নারী-শিশুর নিজের নিজের ঘরে ফেরার পালা। হিসেব করতে গিয়ে দেখা

গেলো, যারা ফিরবে না তাদের সংখ্যা কয়েক লক্ষ। যারা ঘরে ফিরে এলো তারা দেখলো যাদের রেখে গিয়েছিল, তাদের মধ্যেও অনেকে নেই।

পাকিস্তানি দখলদার সেনাবাহিনীর মধ্যে থেকে বাছাই করা হিংস্র লোকদের নিয়ে গঠিত হানাদারদের বাহিনী ও স্থানীয় মুসলীম লীগ আর জামাতের বন্দুকধারী রাজাকাররা গ্রামের পর গ্রামে মুক্তিযোদ্ধা সমেত অসংখ্য নর-নারী-শিশুকে নদীর ধার ঘেঁষে গড়ে ওঠা চরগুলোর বিরান এলাকায় জড়ো করে খুন করেছিল। প্রায় প্রত্যেকটা মহাকুমায় কয়েকটা করে বধ্যভূমি তৈরি হয়েছিল।

স্বাধীনতার ঠিক পরেই এই বধ্যভূমিগুলোতে নিখোঁজদের চিহ্নের খোঁজ করা হল। পরে এই বধ্যভূমিগুলো হলো শহীদভূমি।

যে ঘটনাটার কথা এখানে বলছি, সেটা এই রকমের একটা বধ্যভূমি নিয়ে। ঘটনাটা অবশ্য স্বাধীনতার পরের বছরের। ঝালকাঠিতে একটা ছাত্র সম্মেলনে যোগ দিতে গেলেন ঢাকা থেকে অধ্যাপক কামাল। প্রধান অতিথি হিসেবে। স্টিমারে ঢাকা থেকে লম্বা পথ।

মুক্তিযুদ্ধের সময় স্টেনগান কাঁধে তুলে নিয়েছিলেন এবং ছিলেন ধলেশ্বরীর ধার ঘেঁষে এক গণ্ডগ্রামে। মাঝে মাঝে লঞ্চ নিয়ে দখলদার বাহিনীর লোকেরা গঞ্জে গঞ্জে হানা দিতো। তাদের সঙ্গে দু-একটা খণ্ডযুদ্ধ করেছিলেন অধ্যাপক কামাল। কিন্তু কলেজ ও স্কুলের কয়েকটি ছেলেকে দখলদার বাহিনীর লঞ্চের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ার ঝোঁক থেকে ঠেকিয়ে রাখতে হয়েছে তাকে। কয়েকটি ছেলে মুক্তিযোদ্ধাদের এই ছোট দলটিকে সাহায্য করত। দরকার হলে নৌকা বাইত। এদের সবাইকে নিয়ে বিচ্ছিন্ন গ্রাম এলাকায় একটা সংসারের মতো পেতেছিলেন তিনি। বিপ্লবের দর্শন নিয়ে আলোচনা করতেন। বই পড়াতেন!

ঝালকাঠির পথে স্টিমারের লম্বা নদীপথে ডেকে দাঁড়িয়ে দুর-দুরান্তরের গাছপালায় ঢাকা অসংখ্য গ্রামকে কল্পনার চোখে দেখে অধ্যাপক কামালের মনে হচ্ছিল, মুক্তিযুদ্ধের রণাঙ্গনটা খুব দীর্ঘ। ধলেশ্বরীর কিনারা থেকে এতটা বুঝতে পারা যায়নি। এবার ফিরে গিয়ে রণাঙ্গনের বিস্তৃতির ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলা যাবে গ্রামের সবাইকে, এমনকি ঢাকাতেও বলা যাবে। ছেলেমেয়েরা কোথায় কি করেছে তার একটা হিসাব পেশ করা যাবে।

ঝালকাঠি সন্ধ্যা নদীর ধারে একটা বন্দর। এখানে একটা কলেজ আছে। খুলনা আর বরিশালের যোগসূত্র এখানে। ছাত্র আন্দোলনের নাম আছে। নদীর ধারের কলেজে নদীর কোলে আশৈশব লালিত ছেলেদের গুঞ্জনে ঝড়ো ঢেউ ওঠে, উর্মিলতাও রয়েছে। হাজার খানেক তরুণ তরুণীর সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচয়ের সুযোগ পেয়েছেন অধ্যাপক কামাল।

গভীর রাতে জেটিতে স্টিমার ঠেকলে সিঁড়ি নামানোর পরে ছাত্ররা তাঁকে প্রায় শুণ্যে তুলে নামাল। তাদের ধারণা, ঢাকার অধ্যাপক আর বুদ্ধিজীবীরা ঝালকাঠিকে গেঁয়ো মনে করে। স্টিমারটার ব্যবহারও অনেকটা নৌকার মতো। ওঠানামা করার সমস্ত দায়িত্ব যাত্রীদের।

সুতরাং সেই রাতে অধ্যাপক কামাল ঝালকাঠির আর কিছু দেখতে পেলেন না।

সকাল আটটায় বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা উত্তোলন করতে হলো তাঁকে। একটি ছোট বক্তৃতা করলেন। এরপরে ছাত্র-ছাত্রীরা সবাই লাইন করে দাঁড়াল। অধ্যাপক কামালকে লাইনের মাথায় গিয়ে দাঁড়াতে হল।

একটি ছেলে বিনীতভাবে বলল, স্যার, এখন আমরা বধ্যভূমিতে যাবো। সেখানে একটি স্মৃতিফলক আছে। তাতে আপনি মালা দেবেন। মুক্তিযুদ্ধের সময় লঞ্চ থেকে নেমে হানাদার বাহিনী বন্দরে যাকে সামনে পেত পুরুষ, মেয়ে ও শিশু নির্বিশেষ ধরে নিয়ে এই বধ্যভূমিতে দাঁড় করিয়ে গুলি করে মারত। '৭২ এর প্রথম দিকে কঙ্কাল আর খুলির মধ্যে পাগলের মতো বন্দরের মানুষ তাদের আপনজনকে খুঁজেছে। নিয়েও গিয়েছে অনেকে আন্দাজ করে মাথার খুলি! আজ একেবারে পরিষ্কার।

ঝালকাঠি বন্দরটাকে প্রায় সর্বাংশে পেরিয়ে দীর্ঘপথ ধরে অধ্যাপক কামাল গিয়ে পৌঁছলেন বধ্যভূমিতে। দেখলেন সন্ধ্যা নদীর ধারে একটা চর। হু হু হাওয়া। এরই ধার ঘেঁষে একটি বাঁধানো ইটের উঁচু বেদীতে শহীদদের নামে একটি স্মৃতিফলক। সংক্ষিপ্ত লেখা, কিন্তু তীক্ষ্ণ।

অধ্যাপক কামালকে এই উঁচু ছিমছাম বেদীটির পাশে দাঁড়িয়ে বক্তৃতা করতে হল। খানিকটা দুরে দীর্ঘ মিছিল দাঁড়িয়ে রয়েছে। অধ্যাপক কামাল ধলেশ্বরীর ধারের বাসিন্দা ও মুক্তিযোদ্ধাদের কথা বললেন। বললেন, ঝালকাঠির বাসিন্দা ও মুক্তিযোদ্ধাদের কথা। বধ্যভূমির ওপর দিয়ে তখন বয়ে চলেছে উদ্দাম বাতাস। অধ্যাপক কামালের কথাগুলোকে সেই বাতাস যেন লুফে লুফে নিয়ে যাচ্ছিল।

এরপরেই মালা দেবার পালা। অধ্যাপক কামাল দুটি মালা দুই হাতে উঁচুতে তুলে সমবেত জনতাকে দেখালেন। তারপর মালা দুটি স্মৃতিফলকের ওপর সন্তর্পণে রাখলেন। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বাতাস এসে এক ঝটকায় মালা দুটিকে ফেলে দিল। আবার সন্তর্পণে রাখতে গেলেন। আবার ব্যর্থ হলেন। মালা দুটিকে স্মৃতিফলকের কোথাও গোঁজার উপায় ছিল না। বেদীর ওপর একটা শ্বেতপাথরের পাটাতন। তাতে শহীদদের উদ্দেশ্যে একটা লেখন।

অধ্যাপক কামাল দুটো ইট আনতে বললেন, মালা দুটিকে চাপা দিতে। সেই শূন্য প্রান্তরের মতো বধ্যভূমির চরের জোর হাওয়ায় ভারি জিনিস না হলে মালা রাখা যাবে না, একথা জানালেন। একটি ছেলে চরের মধ্যে খোঁজাখুঁজি করতে করতে হঠাৎ এসে দাঁড়াল অধ্যাপকের সামনে। তার হাত দুটি পেছন দিকে।

—স্যার।

—বল।

—পেয়েছি চাপা দেবার ভারি জিনিস। কিন্তু এগুলো যে মাথার খুলি।

অধ্যাপকের বিস্মিত চোখের সামনে তুলে ধরল সে দুটি মাথার খুলি। নিজেকে সামলে নিয়ে অধ্যাপক বললেন, আশ্চর্য। যাদের মালা দেওয়া হচ্ছে তাদেরই হয়ে দুজন কি তোমার হাতে উঠে এসেছে! কিন্তু এদের নিশ্চয়ই নাম ছিল। কি নাম? খুলি দুটো হাতে নিয়ে খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে তিনি খুলি দুটো তুলে চিৎকার করে উঠলেন, এদের একজনের নাম যেন চারু, আরেকজনের নাম সিতারা। চারু আর সিতারার জন্য রইল মালা।

তারপর অধ্যাপক কামাল ঐ দুটি মাথার খুলি দিয়েই মালা দুটি চাপা দিলেন সেই স্মৃতিফলকের ওপর। মালা দুটিকে দেখে মনে হলো মালা গলায় চারু আর সিতারা বেদীর ওপর উঠে দাঁড়িয়েছে। অধ্যাপক তাড়াতাড়ি চলে এলেন মিছিলের মাথায়। ঘটনাটা তখনই কারুর কাছে ভাঙলেন না। বধ্যভূমিতে যাদের প্রাণনাশ করা হয়েছিল, তাদের নিকট আত্মীয়রা দ্বিধায় পড়বেন এই খুলি নিয়ে। তার চেয়ে বরং সকলের তরফ থেকে মালা দিয়ে তাঁদের স্মৃতিপটে বাঁচিয়ে রাখা যাক।

লোহা লাল হবার সময়

'৬৮ সালের একেবারে শেষের দিকে সারা পাকিস্তানের গণতন্ত্রের দাবিতে সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে ১৪৪ ধারা ভেঙ্গে যে মিটিং-মিছিলের আন্দোলন শুরু হলো তা' চরমে উঠলো '৬১-এর জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারিতে গণঅভ্যুত্থানে। শহীদের রক্তের রেখায় বাংলাদেশের মানচিত্র আলাদা করে আঁকা হয়ে গেল।

২০শে জানুয়ারি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ছাত্রীদের মিছিলের ওপর গুলি চললে আসাদ শহীদ হল।

এই হত্যার বিরুদ্ধে ২৪শে জানুয়ারি হরতাল, মিছিল, জমায়েত করার জন্য সারা বাংলাদেশে সংযুক্ত ছাত্র সংগ্রাম কমিটি জনসাধারণকে আহ্বান করল। সামরিক শাসক আইয়ুব খানের বশংবদ গভর্ণর মোনায়েম খাঁ ব্যবসায়ীদের কেন্দ্রে কেন্দ্রে হরতালের বিরুদ্ধে হেঁটে হেঁটে বললেও ২৪শে জানুয়ারি সমস্ত দোকান-পাট বন্ধ হল। গাড়ির চাকা ঘুরল না। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী তরু আহমেদ কালো পতাকা সামনে নিয়ে রাস্তার পুলিশ বেষ্টনি ভেদ করল। সেই যে বেষ্টনি ভাঙলো, তারপরেই লাখ লাখ লোকের ঢল নেমে এলো পল্টন ময়দানের দিকে। এই ঢলকে ঠেকাবার জন্যে সামরিক কর্তৃপক্ষ গুলি চালাল। কিশোর মতিউর রহমান শহীদ হল।

গুলি চলেছে শুনে ঢাকা শহরের পনেরো লাখ বাসিন্দার মধ্যে প্রায় সাত-আট লাখ সকল বয়সের লোকে পল্টন ময়দান ভরে গেল। আওয়াজ উঠলো, 'শহীদের রক্ত বৃথা যেতে দেবো না।' মতিউরের লাশকে সামনে রেখে জানাজা পড়ে শুরু হলো লাখ লাখ লোকের মিছিল। আবার এক জায়গায় গুলি চলল। শহীদ হলো বালক রুস্তম। তাকেও কাঁধে তুলে নিল বিদ্রোহী বিশাল জনতা। উড়ে গেলো সামরিক কর্তৃপক্ষের সমস্ত বেষ্টনি। চলল আজিমপুরায় কালো নিশান দুলাতে দুলাতে মিছিলে শোক আর ক্রোধের নিশানা হিসাবে।

সন্ধ্যের সময় যখন পল্টন ময়দান আর রমনার রাস্তাগুলো থেকে জনতা চলে গেলো, তখন কারফিউ জারী হল। কারফিউ পুরনো শহরেও জারী হলো, কিন্তু সামরিক গাড়িগুলো ঢুকলো না। নবাবপুরের চওড়া সড়ক থেকে জালের মতো যে রাস্তা অলিগলি বেরিয়েছে সেখানে বাড়িঘর দোকান-পাট গমগম করতে থাকল। হিসেব নিকেশ চলতে লাগলো বড় বড় বাড়িগুলোর রকে। রিক্সাওয়ালারা আরোহী তুলে নিতে লাগলো ডেকে ডেকে।

একটা খবরের কাগজের অফিসে কর্মীরা সবাই সারারাতের বরাত নিয়ে পৌঁছেছে। কাগজটাকে জানপ্রাণ দিয়ে খেটে হরতালের সমগ্র খবর দিয়ে ভরে দিতে হবে। খুব

ভোরে কাগজ ছাপা হয়ে গেলে কারফিউ-এর মধ্যেই হকাররা এসে নিয়ে যাবে হাজার হাজার কাগজ। কত রক্ত খরচ হলো, এই কাগজ থেকেই সকাল আটটার মধ্যে সারা শহর জেনে যাবে।

সামনের ঘরে টেলিফোন ধরে বসে আছেন বার্তা সম্পাদক। একটা রিক্সা এসে থামলো এই খবরের অফিসের সামনে। রিক্সা থেকে নামলো রেবেকা আর নিহাল। দুজনেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ে।

অফিসের সামনের ঘরে ওরা ঢুকতেই বার্তা সম্পাদক বললেই, রেবেকা তুমি তাহলে আজ রাতে বাসায় ফিরছো না। নিহাল বলল, কেন ফিরবে না? আমি পৌঁছে দেব। আমি না হলে যে কোন রিক্সাওয়ালাও পৌঁছে দেবে।

রেবেকা বার্তা সম্পাদককে বলল, সত্যি বড় ভাই। আজ সমস্ত মানুষের মেজাজ পাল্টে গিয়েছে। এই ঢাকা শহরটাকে গত ঘণ্টাখানেকের মধ্যে ঘুরতে ঘুরতে যতখানি দেখলাম, তাতে মনে হলো, সমস্ত নোংরা কথাকে যেন কোন বিরাট ঝাড়ুদার ঝেটিয়ে সাফ করে দিয়েছে। মেয়েরা যতক্ষণ খুশী যেখানে খুশী একা একা চলতে পারে। যেসব রিক্সাওয়ালা মেয়ে আরোহী নিয়েও খিস্তি খেউড় করতে করতে প্যাডেল মারে তারাও আজ ফেরেশতা হয়ে গিয়েছে। তবু নিহাল যাবে আমার সঙ্গে আমাদের বাড়ির দরজা পর্যন্ত।

বার্তা সম্পাদক বললেন, সেটা হবার উপায় নেই। তোমার মা টেলিফোন করে বলেছেন তুমি আমাদের অফিসে এলে আজ রাতে এখানেই থাকবার একটা ব্যবস্থা করে দিতে। সুতরাং একবার যখন এসে পড়েছ তখন তোমাকে ছাড়তে পারি না। ওপরতলায় চলে যাও। সম্পাদকের ঘরের টেবিলে রাত্রে শোবে। দুটো কম্বল আর বালিশ বরং নিহাল এনে দিয়ে যাক ওর বাসা থেকে। ভাত আর তরকারী আনিয়ে দিচ্ছি পিয়ন দিয়ে। নিহাল তুমি বালিশ আর কম্বল এনে দিয়ে কেটে পড়ো।

বার্তা সম্পাদক রেবেকার মাকে টেলিফোন করার জন্যে ডায়াল করলেন। তারপরে যে কথা–আপনার মেয়েকে ওপরের ঘরে রেখে দিয়েছি। দুশ্চিন্তা করবেন না, ঠাণ্ডা, হ্যাঁ ঠাণ্ডা পড়বে রাতে। সাংবাদিকরা যেভাবে থাকে সেভাবেই থাকবে। সবাই জেগে থাকবে গভীর রাত পর্যন্ত। মেয়ের জন্য ভাববেন না।

ফোন রেখে তিনি রেবেকাকে বললেন, আজ আজিমপুরার কবরখানাও গরম। ওখানেও থাকতে পারতে, অবশ্য যদি গুলি খেয়ে শহীদ হতে। আমাদের অফিসে থাকছো প্রাণ যায়নি বলে। তোমরা আজ দারুণ কাজ করেছো। আট কলাম হরতালের সাফল্যের ব্যানারের নিচে তোমাদের সম্বন্ধে ছ'কলামের হেডিং দিচ্ছি। যাও এখন ওপরে চলে যাও। বাইরের লোকজন আসছে যাচ্ছে। অনর্থক প্রশ্ন করতে পারে তোমাকে এখানে দেখলে। কেউবা দারুণ দুশ্চিন্তা করতে শুরু করবে। আচ্ছা চলো, তোমাকে দিয়ে আসি ওপরে। বালিশ কম্বল দিয়ে গেলে দরজা বন্ধ করে সুইচ অফ করে ঘুম দেবে। তুমি তো দেখতে ছোটখাট। টেবিলটাতে অসুবিধা হবে না।

রেবেকাকে নিয়ে বার্তা সম্পাদক ওপরের সিঁড়ির দিকে যাচ্ছেন। রেবেকা বলল, আজকের রাতে দরজা খোলা রেখেই ঘুমুবো। আজ বিদ্রোহের রাত।

বার্তা সম্পাদক রেবেকাকে পৌঁছে দিয়ে আবার ফিরে এসেছেন। একগাদা কাগজ টেবিলে রেখে গিয়েছে পিয়ন। চেয়ারে বসবার পরে গুছোতে থাকেন। এমন সময় ঢুকলেন বার্তা সম্পাদকের পরিচিত সিটি এস. পি। পরনে পুলিশী পোশাক। শ্যামলা রং। সুঠাম চেহারা। খুব মিষ্টি করে বললেন, ফোনটা একবার ব্যবহার করব। টেলিফোনে অস্ফুট স্বরে কথা বলছেন। এমন সময় নিহাল বালিশ কম্বল নিয়ে ঢুকে বলল, রেবেকার বিছানা। ও গেল কোথায়? ওপরে।

—হ্যাঁ। উপরে রাখো এবং কেটে পড়ো।

সিটি এস. পি ততক্ষণে ফোন নামিয়ে রেখেছেন। বললেন, ব্যাপার কি, মেয়ে কাজ করে নাকি এই রাতের বেলায়? আজকেও রেহাই দেননি?

—সাংবাদিক নয়। ছাত্রী। এম. এ ক্লাশে পড়ে। কারফিউর মধ্যে বাড়ি যাচ্ছিল, আমাদের অফিস হয়ে। ওর মায়ের কথামতো রেখে দিয়েছি। এডিটরের ঘর খালি থাকে। ওখানেই শোবে।

–কি দরকার? ডাকুন। পৌঁছে দিচ্ছি। গাড়ি আছে। সারারাত রাউন্ড দিয়ে চাকরী রাখতে হবে। আপনাদের ভাবীকে ফোন করে দিলাম। রেবেকাকে নিয়ে আসুন। এই শীতের রাতে মেয়েটিকে কষ্ট দেবেন কেন? শহীদ যদি হয় লড়াই করেই হোক। অসুখবিসুখ বাধিয়ে কি লাভ হবে। আর মনে রাখবেন আমরা আজ বাংলাদেশের পুলিশেরা আপনাদের বন্ধু।

রেবেকাকে নিয়ে সিটি এস.পির গাড়ি চলে গেল। পনেরো মিনিট পরে রেবেকার মায়ের টেলিফোন পাওয়া গেল। রেবেকা বাসায় পৌঁছেছে।

একাত্তরের এপ্রিলের কোনো এক তারিখে এই সিটি এস. পির নাম বাংলাদেশের রক্তখরচের হিসেবে জমা পড়ে। খবরের কাগজে একটা টুকরো খবরও তিনি হতে পারেন নি। রাজশাহীতে দখলদার সেনাবাহিনী তাকে গুলি করে মারে। এই সিটি এস. পি বিদ্রোহী পুলিশদের সঙ্গে যোগ দিয়েছিলেন।

বংশীধারী

'৬৮-'৬৯-এ সারা পূর্ববাংলা জুড়ে পাকিস্তানি সাময়িক শাসনের বিরুদ্ধে যে বিদ্রোহী অভ্যুত্থান হয়েছিল তা' যেই মুহূর্তে জয়ী হলো প্রায় সেই মুহূর্তেই পড়ে গেল। আইয়ুব খাঁ গেলো কিন্তু ইয়াহিয়া খাঁ এল। আবার জারী হলো নতুন করে সামরিক শাসন। সভা-সমিতি-সমাবেশ-মিছিল-বিক্ষোভ বন্ধ করে ইসলামাবাদের হুকুমনানা জারী হল। পূর্ব-বাংলায় গণবিক্ষোভগুলো বরাবরই কালবৈশাখীর মতো এসে দপ করে থেমে গিয়েছে। ঝড় থেমে গেলে মনে হয় ঝড় কখনোবা ওঠেনি। আবার আচমকা গণবিক্ষোভ হবেই, কিন্তু যখন হবে তখন হবে। প্রকৃতি কিন্তু দেখতে না দেখতে একটা ঝড় তুলল আচমকা। টর্নাডো, ঘুর্ণিঝড় একটা আগুনের হুঙ্কার মতো ছিটকে বেরিয়ে ঢাকার গা ঘেঁষে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার খানিকটা ছুঁয়ে চলে গেল। শ'দুয়েক গ্রাম ভেঙ্গে গুড়িয়ে তছনছ হয়ে গেল।

ঢাকা শহরে তরুণ-তরুণীরা ইট আর পাথরের টুকরো ছুঁড়ে মিলিটারিকে ঘায়েল করেছিল দু'মাস আগে। তারা আওয়াজ তুলেছিল, 'বীর বাঙালি অস্ত্র ধরো, পূর্ববাংলা স্বাধীন কর'। তারাই টর্নাডোতে ছেঁড়া গাঁগুলোতে স্বেচ্ছাসেবকের শিবির বানাল। গাঁয়ের মানুষ বলল, 'ভলান্টিয়াররা আইয়া পড়ছে। রক্ষা'। এই 'ভলান্টিয়ারদের' একজন কমল বাড়রী ঢাকার জগন্নাথ কলেজে পড়তে এসেছে ফরিদপুরের গোপালগঞ্জ থেকে। সেই সূত্রে ঢাকার সমস্ত রকম আন্দোলনে জড়িয়েছে। জগন্নাথ কলেজেরই একদল ছেলের সঙ্গে এসেছে ত্রিমোহিনী গ্রামের স্বেচ্ছাসেবক শিবিরে। শিবির হচ্ছে একটা ভেঙ্গে পড়া চালাঘরের চালাটাকে কোনরকম ওপরে তুলে তার তলায় থাকার জায়গা।

কমল বাড়রী লম্বা, ঢ্যাঙা। বড় বড় চ্যাটালো পা। নদীতে শৈশব কৈশোর কেটেছে। দিনের বেশির ভাগ সময় নদীতে ডুব দিয়ে থাকতো। কালো গায়ের রং এই জন্যে কিছুটা সাদাটে। হাসলে সদন্ত দাঁত বেরিয়ে পড়েছে। দাঁতগুলো সুগঠিত। লালচে মাড়ি। ছোট নাক। ছোট ছোট চোখ। ভুরু দুটো আকর্ণ বিস্তৃত। চুল ঝাঁকড়া। তার সাথীরা বলে, 'ডাকাইতের বংশ।' কমল অবশ্য হেসে বলতো, 'আমি আইছি গোপালগঞ্জের মাটি ফুইড়া' আমার বাপদাদা চৌদ্দপুরুষ আসছে মাটি ফুইড়া। আমরা জাত চাষা'।

তাদের বংশে সে প্রথম কলেজে এসেছে। শুধু তাই নয়। তার বাবা-মাই তাকে পাঠিয়েছে ঢাকায় পড়তে, ফরিদপুর জেলায় এত কলেজ থাকতে। তারা আবিষ্কার করেছে কমলের মাথা আছে। গ্রামের স্কুলের হেডমাস্টারও তাই বলেছেন। মায়ের আছে আরেকটা সাধ। কমল বাঁশি বাজায়। রেডিওতে তার বাঁশি বাজতে পারে ঢাকায় থাকলে। কমলের বাঁশির ঝোলাটিকে সঙ্গে দিতে তিনি ভোলেন নি।

ত্রিমোহিনী গ্রামের রিলিফ সেন্টারের চালার তলায় সাথীরা আবিষ্কার করল, তার সবচেয়ে বড় গুণ, তার বাঁশির আঙ্গুল আছে। তারা আবিষ্কার করল, তার থলিতে লুঙ্গি আর গামছার সঙ্গে রয়েছে গোটা দশকে বাঁশি। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আর নজরুল ইসলামের গানের দুটো স্বরলিপির বই। একদিন কমল বাঁশি বাজিয়ে শোনাল। বাঁশির ফুটোগুলোতে ওর লম্বা লম্বা আঙ্গুলের খেলা সত্যিই দেখবার মতো। একটা ছোটখাট ভিড়ও জমে গেলো গ্রামের গুড়োগাড়াদের। সুরের চেয়েও কমলের আঙ্গুলের ওঠানামার ওরা তারিফ করল। ওরা বোধহয় এই প্রথম লক্ষ্য করল, দশটা আঙ্গুলের মধ্যে আলগোছে ধরা থাকে বাঁশিটা। ক্ষুদে মেয়ে তর্জনী বাড়িয়ে গুণছিল, 'এক দুই তিন.....। কমল বলল, 'দশটাই লাগে। হারমোনি বাজাইতে লাগে পাঁচটা। বাঁশিতে লাগে দশটাই।'

দেখা গেল ত্রিমোহিনী গ্রামে কমল বাড়রী বাঁশিতে দশ আঙ্গুলের খেলা দেখিয়ে ভিড় জমিয়ে ফেলছে। এই ঢ্যাঙ্গা ছেলেটা। ডাকাতের মতো ঝাকড়া চুল। কিশোর কিশোরীদের ভারি পছন্দ। ওর নাম দিয়েছে, বংশীধারী। এক গ্রামীণ কিশোরী সঙ্গীসাথীদের বলল, 'আঙ্গুলগুলান কী সোন্দর দেখ'। বাঁশি বাজাবার পর কোলের ওপর সেটাকে দু'হাতের আঙ্গুলে আলগোছে ধরে সে যখন আকর্ণ বিস্তৃত হাসি হাসত, তখন কাচ্চাবাচ্চারা কাছে এসে ওর আঙ্গুলগুলোকে নাড়াচাড়া করে। এই আঙ্গুলগুলোকে যে

প্রথম সোন্দর বলেছে সে কিশোরী গিয়ে অবশ্য দূরে দাঁড়িয়ে থাকে। কমল তাকে কাছে ডেকে বলল, 'আমার আঙ্গুলগুলান কামলার আঙ্গুল। ওর আঙ্গুল চম্পাকলি। নিবি একটা বাঁশি? বাজাবি?' মেয়েটি দৌড়ে পালিয়ে গেল। কমল তখন কাচ্চাবাচ্চাদের বলল, 'তোরা কে নিবি?' একটা কাণ্ড হলো, গোটা দশেক কচি হাত এগিয়ে এল। মুহূর্তে তার ঝোলা প্রায় শেষ। মাত্র একটা রইল। আরও যে কয়েকদিন রইল কমল এই বাঁশিটা হরদম বাজাল। ক্ষুদে ছেলেমেয়েগুলো 'বংশীধারীকে' ঘিরে রইল। তারপর সকলের আর্জি আমরা কয়জনা পাইলাম না। কমল শেষ পর্যন্ত বলল—কাজ কাম করতে শেখো। লেখাপড়া শেখো। বাঁশি বাজাইয়া কি পেট ভরব?'

তারপর খুব উঁচু গলায় বলল, 'বীর বাঙালি অস্ত্র ধরো, পূর্ববাংলা স্বাধীন কর'। কয়েকদিন বাচ্চারা সারা ত্রিমোহিনী গ্রামটাকে মুখর করে রাখলো এই শ্লোগানে।

কমলদের সমস্ত স্বেচ্ছাসেবক দলটি একদিন ত্রিমোহিনী গ্রাম ছেড়ে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার সীমানার এক গাঁয়ে রিলিফের কাজ শুরু করল। সারা গাঁটা মাটিতে পড়ে গিয়েছে। সন্ধ্যার পর পৌছে মনে হলো, একটা খালি মাঠ। ঝোলায় একটা বাঁশি। এত দুঃখ এই বাঁশিতে বুঝি ধরবে না। সে সেই রাত্রে বাঁশি ঝোলা থেকে বার করল না।

খোলা আকাশের নিচেই চাটাই পেতে শুয়েছিল সবাই। ভোর বেলায় বেরিয়ে ধসে পড়া গাঁয়ের মধ্যে থাকতেই এক জায়গায় দেখলো, এক বাণ্ডিল বাঁশের বাঁশি পড়ে আছে। তারপর বিস্ময়ের পর বিস্ময়। কমলের সাথীরাও বলল, সে নিজেও দেখতে পেল। সারা গাঁ জুড়ে আস্তো ভাঙ্গা বাঁশি। কোথাও বাণ্ডিল বাণ্ডিল ছিটকে ছড়িয়ে রয়েছে। কমল আবিষ্কার করল সে একটা গাঁয়ে এসেছে যার সমস্ত বাসিন্দার জীবিকাই হলো বাঁশি বানানো। যে বাঁশির সঙ্গে তার শৈশব থেকে পরিচয়, যে বাঁশির সঙ্গে তার আঙ্গুলগুলো যেন জড়িয়ে গিয়েছ, যে বাঁশি সে সংগ্রহ করেছে কখনও মেলায়, কখনো ফেরিওয়ালার কাছে, কখনও আনিয়েছে আফতাবউদ্দিন আর শচীন বর্মণের কুমিল্লা থেকে, সেই বাঁশি তৈরি হয় এই গাঁ জুড়ে। যুগ যুগ ধরে প্রজন্মের পর প্রজন্ম শুধু এই বাঁশি তৈরি করে আসছে। সমাজে রাষ্ট্রে কত ঝড়ঝঞ্ঝা গিয়েছে, গাঁগুলো বাঁশির গাঁ-ই রয়েছে। কিন্তু এবারই কি তছনছ হয়ে যাবে?

যখন নতুন করে ঘর তোলার সরঞ্জাম বিলির ব্যবস্থা শুরু হলো, কাপড়-চোপড় দেওয়ার পালা শেষ হলো, একদিন কমল ঠিক করল, একটা পরিবারের কাছে গিয়ে সে বসবে, তারপর জিজ্ঞেস করবে, টর্নাডোর আগে দেশ ভাঙ্গাভাঙ্গির মধ্যে এরা বাপে-মায়ে-ঝিয়ে পোয়ে মিলে কি করে বাঁশিকে আঁকড়ে ধরে রইলো? এতকাল যখন পেরেছে আজও কেন পারবে না।

দু'সপ্তাহ পরে। একটা দেচালা সদ্য খাড়া হয়েছে। নিচে উঁচু করে তোলা নতুন মাটির দাওয়ার ওপর বসে কমল হাঁক পেড়ে বলল, 'কোথায় গো মায়েরা, বুইন্যেরা, ভাবীরা। আমার ঝোলায় কয়েকটা বাঁশি তুইল্যা দেন। বাছা বাছা বাঁশি। আমি বাঁশি বাজাই।'

কমল তার দু'হাতের আঙ্গুলগুলোকে টান করে মেলে ধরে বলল, 'এই আঙ্গুলে অন্য কোন কাম হইব না। শুধু বাঁশি বাজানো। শুনতে চায়েন তো শুনাইয়া দেই।

এক প্রবীণা তাঁর ঘর থোক এক বাণ্ডিল বাঁশি এনে বললেন, 'লও বাছা ভলাণ্টিয়ার। একখান কি দুইখান, যত মনে লয়। তোমার কাছে বেচুম না। তুমি রিলিফের মানুষ। আমরা পাইকারগো কাছে বেচি। অরা আইল বইল্যা। বাঁশি আমাগো পেট ভরাইব, তোমরা যখন খরিদ কইরা বাজাইয়া বেড়াইবা। আমরা বাঁশি বাজাই না, বানাই। আমরা কারিগরের পরিবার। এই আঙ্গুলগুলান আমাগো ভাত দেয়।' প্রবীণা হাসতে হাসতে দু'হাতের থেতলানো দশটা আঙ্গুল মেলতে গেলেন। পারলেন না। সূক্ষ্ম স্নায়ুগুলোতে টান পড়ায় আঙ্গুলগুলো কুঁকড়ে থাকছে। কয়েক সপ্তাহ ধরে কাজ নেই। বললেন, এইগুলান বাঁশি বানাইবার আঙ্গুল। সুতার মাপে মাপে এই আঙ্গুলগুলান দিয়া ছিদ্র করি। কমল বলল, 'কোনদিন কি নিজেরা বাঁশি বাজাইয়া দেখেন নাই? জোয়ানাকালেও সাধ জাগে নাই?

প্রবীণা বললেন, 'জোয়ানকালে শুনতে ভাল লাগতো। বাজাইবার মানুষ হগল গেরামেই ছিল, আছে এখনও।' বাঁশির বাণ্ডিল থেকে একটা বাঁশি খুলে হাতে নিয়ে কমল ততক্ষণে একটা সুর বাজাচ্ছে। দাওয়ায় যারা বসেছিল তারা সবাই হেসে উঠল। বলল, এইটা কেমন সুর?

কমল বলল, একে বলে বিদ্রোহীর সুর। বিদ্রোহী কবির গানের সুর। সে মুখে মুখে একটু গাইল, কারার ঐ লৌহ কপাট, ভেঙ্গে ফেল কররে লোপাট। পরে বলল, 'এই সব সুর আর গানই এহন বাঁশিতে বাজবো'!

প্রবীণা বললেন, 'স্বাধীন হওনের গান। কইয়্যা রাখি। বাঁশির আকাল হইব না। যদি কখনও ঠেকো, আসবা এই গেরামে। এই পুরা বাণ্ডিল বাঁশিটাই লইয়া যাও।' কমল প্রবীণার কাছ থেকে বাঁশির বাণ্ডিল নিয়ে ঝোলায় রেখে প্রবীণার পা ছুঁয়ে প্রণাম করল।

'৭১ সালের শেষের দিকে কমল ফিয়ে গিয়েছিল ব্রাহ্মণবাড়িয়া এলাকায়। সেখান থেকে সে অবশ্য আর ফেরেনি। তাকে একদল মুক্তিযোদ্ধার লাশের মধ্যে পাওয়া গিয়েছিল। তার একটা আঙ্গুল ছিল স্টেনগানের ট্রিগারে। পাশে পড়েছিল বাঁশিভর্তি ঝোলা।

লুৎফর রহমান

যশোর জেলের নিরাপত্তা বন্দীদের দোতলা ওয়ার্ডের নিচতলায় জানালার কাছে কি যেন ঘটেছে। দূর থেকে দালাল গোছের বিশেষ সুবিধাভোগী কয়েদীরা চীৎকার করছিল। ভরদুপুর। এইমাত্র ছোট যশোর জেলে চৌকার বারান্দায় ডিউটি জমাদার সফদর আলী জুতো-মোজা-জামা ছেড়ে দুই জবরদস্ত চেহারার কয়েদীকে দিয়ে হাত-পা টেপাচ্ছিল। সে আঁতকে উঠে দাঁড়ালো খালি গায়েই কাছে রাখা রুলটা হাতে নিয়ে। যারা পা টিপছিল তারা জমাদার সাহেবকে জামা পরিয়ে দিল।

একটা ছুটোছুটি হচ্ছিল চারদিকে। কিন্তু জমাদারকে বিস্মিত করে সেই দালাল কয়েদীরা কোত্থেকে দৌড়ে এসে সামনেই নিরাপত্তা বন্দীদের ওয়ার্ডের জানালার কাছে গিয়ে উকি দিল। তারপর জানালার নিচে বাইরে বসে পড়া এক ছোকড়া কয়েদীকে

টেনে তুলে তার নাকে মুখে থাপ্পর কষতে কষতে চীৎকার করে জিজ্ঞেস করল, কি ছুঁড়ে দিয়েসি তুই ভেতরে?

জবাবে সেই কয়েদী ছোকরা বলল, কিছুই দেইনি তো। এমনি দেখছিলাম, এরা কারা?

দালাল কয়েদীরা এবারে তাকে হেঁচড়াতে হেঁচড়াতে জমাদারের সামনে নিয়ে এল। বলল, ঝুটবাত বলছে। আমরা দূর থেকে দেখেছি, কি যেন ছুঁড়ে দিল ভেতরে। ততক্ষণে কয়েকজন ওয়ার্ডার এসে পৌছেছে। দালাল ধরনের আরও কয়েকজন কয়েদী।

একজন বলল, গতকাল এই ছোঁড়া চালান এসেছে রাজশাহী থেকে। খালাস পাবে।

জমাদার এবার প্রশ্ন করল, তুই এখানে এসেছিলি কেন এক নম্বর ছেড়ে? নিশ্চয়ই কিছু ছুঁড়ে দিয়েছিস। শালা শুয়োরের বাচ্চা, হারামজাদা।

সেই ছোঁড়া তখনও বলল, কিছু দিইনি। দেখছিলাম এরা কারা।

জমাদার এই ধরনের কয়েদীর রগ জানে। সে দালালদের আর সেই কয়েকজন সিপাইকে বলল, ধোলাই।

তারপরেই দু'জন সিপাইকে নিয়ে নিরাপত্তা ওয়ার্ডের জানালার সামনে গিয়ে দাঁড়াল।

নিচতলায় তিনজন রাজবন্দী। সামনেই লুৎফর রহমানের মুখ। জমাদার জিজ্ঞেস করল, লুৎফর সাহেব, চিঠিউঠি কিছু দিয়েছে?

লুৎফর রহমান বললেন, পাগল। সিপাই সাহেব তো আমাদের দরোজায় দাঁড়িয়েছিল ভেতরের দিকে। জিজ্ঞেস করুন ডিউটি সিপাইকে।

লুৎফর রহমানের রগও ভাল করে জানা জমাদারের। দু'বছর ধরে এই জেলে আছেন। দেশ ভাগ হবার পর পরই জেলে এসে রাজবন্দীর অধিকার চেয়ে 'খানা ছেড়ে' দেওয়ার জন্য ছ'মাসের সাজা হয়েছিল। জাঙ্গিয়াকুর্তা পরতেন। এখন নিরাপত্তা বন্দী। সাদা পায়জামা গেঞ্জি গায়ে দিয়ে জানালায় দাঁড়িয়ে। বছর তিরিশেক বয়স! রোগা লম্বা। কয়েকটা হাড়ের ওপরে একটা বড় মাথা। নাকে ঠোঁটে বেপরোয়া বিদ্রোহীর ছাপ। দাড়ি কামানো। চুল ছোট। যশোর জেলা কৃষক সমিতির সম্পাদক। '৪৬-'৪৭ সালে তেভাগার সময় যশোর জেলায় বিশেষ করে নড়াইল মহকুমায় ছোট ছোট কৃষক অভ্যুত্থান হয়েছিল জোতদারদের বিরুদ্ধে। দেশ ভাগের পরেও তার জের চলছিল। এছাড়া, সর্বোপরি লুৎফর রহমান কমিউনিস্ট। সুতরাং ঢাকায় পাকিস্তান সরকারের এজেন্টরা যাদের ধরার জন্য প্রথম লিস্ট করেছিল তাতে লুৎফর রহমান প্রথম পাঁচজনের মধ্যে ছিলেন।

সেই থেকে জেলে।

জমাদার জেল গেটে যাবার জন্যে উদ্যোগ করছে, এমন সময়ে হন্তদন্ত হয়ে স্বয়ং জেলার জনা-বিশেক জেল সিপাইকে নিয়ে হাজির। ঘর তল্লাসী করা হল। তন্নতন্ন করে। ঘরের বাইরে প্রায় শুকনো গভীর ফাটা ডালাগুলোকে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে দেখা হলো রুল দিয়ে।

জেলার সাহেব ও জমাদারের মধ্যে অতঃপর কথাবার্তা। রাজশাহী থেকে চালান আসা ছোকরা কয়েদীটাকে ধোলাই করে কিছু পাওয়া গেল? একজন জেল সিপাহী এসে বলল, ওকে আমরা পাঁচ ছ'জন মিলে বুট দিয়ে মাড়িয়েছি। কিন্তু ও এই এক কথাই বলছে, কিছু দেইনি।

নিরাপত্তা বন্দীদের ওয়ার্ডের নিচতলায় ডিউটি সিপাহী বলল, লুৎফর রহমান সাহেবকে সে এই চেচামেচির মধ্যে একবার কলসী থেকে গেলাসে পানি ঢেলে খেতে দেখেছে।

রাজশাহী থেকে চালান আসা কয়েদীর নির্জন সেল-বন্দীর হুকুম হল। লুৎফর রহমান সাহেবকে নিয়ে যাওয়া হলো জেল গেটে। জনা-বিশেক জেল সিপাহীর আগে আগে লুৎফর রহমান জেলার সাহেবের পাশাপাশি হেঁটে চললেন। একটা পাঞ্জাবী চড়িয়ে নিয়েছেন আপাতত। বলা যায় না। হয়তো জেল গেট থেকেই রওয়ানা করিয়ে দেবে জেলের কর্তারা অন্য জেলে। এর আগে কয়েকজনের বেলায় হয়েছে।

দু'ঘন্টা পরে ফিরে এলেন লুৎফর রহমান। জেলার সাহেবের বক্তব্য, আপনি কাগজপত্র খেয়ে ফেলেছেন পানি দিয়ে। আপনার পেটের মধ্যে ঐ জিনিস যা ছোকরা কয়েদী এনেছে রাজশাহী জেল থেকে।

লুৎফর রহমান বললেন, এক কাজ করলে হয় না। এক্সরে তে পাঠান, সন্দেহ মোচন হবে। আমার পেটের ব্যামোটারও এই ফাঁকে এক হিল্লে হয়ে যাবে।

জমাদার সাহেব বলল, আপনি ঠাট্টা করছেন। আপনাকে গত বছর পাঠানো হলো বাইরের হাসপাতালে। জ্বর হচ্ছিল। জেলখানার ডাক্তার সাহেব বললেন, টিবি হতে পারে। আপনার কাশিতে রক্ত উঠছিল। আপনি নড়তে চড়তেও পারছিলেন না। কিন্তু আপনি কি করলেন লুৎফর সাহেব? আপনি হাসপাতালের এক সিস্টারকে দিয়ে পার্টির লোকের কাছে চিঠি পাঠালেন। চিঠি আনালেন।

একজন গোয়েন্দা অফিসার এসে বসেছিল অফিসে। সে ফোড়ন কাটলো, লুৎফর সাহেব, আপনি সিস্টারকে পর্যন্ত কি করে বাগিয়ে ফেললেন এতবড় ভয়াবহ বেআইনী কাজে?

এই গোয়েন্দা অফিসার হাসপাতালের ঐ সিস্টারটিকে জিজ্ঞাসাবাদ করেছিল। ডাক্তারদের সঙ্গে সে প্রেম করে বেড়ায়। চটুল, বেহায়া। কে তাকে সন্দেহ করবে যে সে পার্টির কাজ করতে পারে? জিজ্ঞাসাবাদের মধ্য দিয়ে লুৎফর সাহেবের সঙ্গে কথাবার্তা সম্বন্ধে একটা শুধু বেফাঁস উক্তি পাঁওয়া গিয়েছিল। লুৎফর সাহেব নাকি সিস্টারকে বলেছিলেন, সুন্দরের ভূমিকা আছে রাজনীতির কাছেও। কাশতে কাশতে রক্ত উগরোতে উগরোতেও মনে হয়, গুড় আঁধারেও মিঠে লাগে।

একজন অবাঙালি জমাদার বলল, লুৎফর সাহেব তো করেলা আছেন। মিঠাই তো এক বুঁদ ভি নাই তার মধ্যে। সিস্টার ভি জমে গেল? তাজ্জব বেপার।

জেলার সাহেবের মুখে একটা কথাও নেই। দুশ্চিন্তাগ্রস্ত। গোয়েন্দা অফিসার এই মোক্ষম সময়ে হাজির। ঘটনাটা ওপরে চলে যাবে। কেঁচো খুঁড়তে গিয়ে সাপ না বেরোয়। হঠাৎ জমাদারের ওপর হুকুম হলো, লুৎফর রহমানকে নিরাপত্তা ওয়ার্ডে ফিরিয়ে নিয়ে যাবার।

পরদিন ভোরে এক কয়েদীর হাতে ওপরতলার নিরাপত্তা বন্দীদের কাছে এক ছিলতে কাগজ পৌঁছে গেল। 'রাজশাহী জেলে রাজবন্দীদের ওপর গুলি চলেছে। সাতজন মারা গেছে। নাম কম্পরাম সিং, বিজন সেন, দিলওয়ার, আনোয়ার, হানিফ, সুধীন ধর, সুখেন।' লুৎফরের হাতের লেখা।

বিকেল বেলায় নিচতলার আঙ্গিনা থেকে লুৎফর রহমান হাসতে হাসতে হাতের ইশারায় জানালেন, রাজশাহীর পত্র গিলে ফেলেছিলাম পানি দিয়ে। হাসতে হাসতেই আবার বললেন, এবার হয়তো কর্তারা আবার পানির কলসী রাখতে দেবেন না ঘরে।

গোয়েন্দা অফিসার যথাস্থানে রিপোর্ট দিতে কসুর করেনি। ঘটনাটিকে বেশ ফুলিয়ে ফাঁপিয়েই চালিয়েছে। সুতরাং একদিন দুপুরে লুৎফর রহমানের চীৎকার শোনা গেল। নিমতলা থেকে তিনি বলছেন, 'কমরেডরা, লাল সালাম। চালান যাচ্ছি অন্য জেলে। দেখা যাক যশোর জেলেরই মতো আবার কোন খোঁয়াড়ে রাখে।' আধঘন্টা পরে ওয়ার্ডার বেষ্টিত হয়ে জেলগেটের দিকে চলে গেলেন। দুর্গম গিরি কান্তার মরুর দৃপ্ত পদযাত্রীর ভাব তাঁর চলায়।

লুৎফর রহমান এর দু'বছর পরে কাশতে কাশতে রক্তবমি করতে করতে শেষ মুহূর্তে জেল থেকে জানখালাসী হয়ে জেলের বাইরের হাসপাতালে মারা গেলেন। সেখানে টিবি ওয়ার্ডের এক সিস্টার বীণা তাঁর তদারকে ছিলেন শেষদিন পর্যন্ত।

আসন্ন মৃত্যুর বিরুদ্ধে নাকি প্রতিবাদ করতে ছাড়েননি তিনি। তাঁর বিছানার পাশে টেবিলের ওপর কাচের গেলাস রাখা দায় হয়ে উঠেছিল। লুৎফর রহমান কয়েকবারই কাচের গেলাস তুলে জানালার উপর ছুঁড়ে মেরেছিলেন।

কার পায়ের খুন গো

'৭১-এর ২৫শে মার্চ রাতে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী ঢাকার ক্যান্টনমেন্ট থেকে বেরিয়ে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণাকারী শেখ মুজিবুর রহমানকে বন্দী করে কামান বন্দুকের জোরে হত্যা আর অগ্নিকাণ্ড চালিয়ে বিদ্রোহী ঢাকা শহরটাকে দখল করেছিল। তারপর পাকিস্তান সরকারের বিরুদ্ধে গণ অসহযোগী সারা বাংলাদেশকে বাগে আনবার জন্যে এক সপ্তাহ না যেতেই প্রথম পর্যায়ে নরসিংদীতে হানা দিয়েছিল পাকিস্তানি সেবর জেট প্লেনের জঙ্গী বিমান বহর।

দিন পনেরো পরে দিনদুপুরে সেবর জেট প্লেন হানা দিয়েছিল ব্রাহ্মণবাড়িয়া শহরে। ৪০ মিনিট ছিল ব্রাহ্মণবাড়িয়ার আকাশে। দু'তিন মিনিট অন্তর অদৃশ্য হয়ে আবার ঘুরে ঘুরে এসে ডাইভ করে ব্রাহ্মণবাড়িয়া শহরের কেন্দ্রে মেসিনগানের গুলি ছুড়ে ওপরে উঠে যাচ্ছিল।

ব্রাহ্মণবাড়িয়ার চারপাশের কয়েক মাইলের মধ্যে সমস্ত গ্রামে তখন মনে হচ্ছে, প্লেনগুলো এই ঝাঁপিয়ে পড়ল তাদের ওপরেও।

এমনি একটা গ্রামে সেই মুহূর্তে গ্রাম্যপথে কয়েকটা সাইকেল রিক্সার আরোহী আর চালকরা বাঁশবনে আশ্রয় নিয়েছিল। রিক্সাগুলো পড়েছিল পথের ওপর। সামনে একটা বড় পুকুর। গ্রামটা ছোট। গোটা তিরিশেক ঘর। বউঝিরা বাচ্চাকাচ্চা নিয়ে এসে পুকুরের গলা পর্যন্ত ডুব দিয়েছিল। প্লেনগুলো ফিরে ফিরে আসা মাত্র জলে ডুব দিচ্ছিল কোন রকম শব্দ না করে। তারা ভাবছিল, একটু শব্দ হলেই প্লেনগুলো তাদের ওপর ঝাঁপিয়ে গুলি ছুঁড়বে। একটা শিশুর কান্না পর্যন্ত শোনা যাচ্ছিল না। বৃদ্ধরা হাতের ইশারায় অবস্থা সম্বন্ধে জিজ্ঞাসাবাদ করছিল পরস্পরের মধ্যে। কিশোর কিশোরীদের

চোখগুলো আকাশের চারকোণায় ঘুরছিল। ভয়ে একজন রিক্সাওয়ালা ছুটে গিয়ে রিক্সার বেল বাজিয়ে চীৎকার করে উঠলো, গেছে গ্যা। গেছে গ্যা।

সেই মুহূর্তে স্তব্ধতা ভেদ করে পুকুরের মধ্য থেকে বহু কণ্ঠের একটা কান্নার রোল আকাশের মৌনতা চিরে ওপরে উঠে যেতে লাগল।

তার পরেই বেরিয়ে এলো চীৎকার করে কাঁদতে কাঁদতে গ্রামের বৌ-ঝিরা তাদের কাচ্চাবাচ্চা নিয়ে। বৃদ্ধরা পেছনে পেছনে উঠে এলো ক্ষীণ আর্তনাদ করতে করতে। একজন যাত্রী যেন নিজের কাছে মনের কাছে প্রশ্ন রাখলো, 'প্লেনগুলো গেছে গ্যা। অরা কি হেইয়া দেইখ্যা খুশীতে কান্দে?'

আরেক দৃশ্য তখন। ঐ বৌ-ঝিরা কাচ্চা-বাচ্চা নিয়ে মাঠের মধ্যে দিয়ে চলে যাওয়া সাদা ধুলোর পথ ধরে ছুটতে শুরু করেছে। প্রায় চল্লিশ পঞ্চাশজন। ছুটছে তেমনি চীৎকার করে কাঁদতে কাঁদতে। এক ছোকরা রিক্সাওয়ালা এই প্রহেলিকার জবাব দিল।

এই গ্রামের মরদেরা সব প্রাতঃকালের ব্রাহ্মণবাড়িয়া শহরে গেছে কাজে-কামে। হ্যাগো লাইগা ছুটছে এখন।

সামনে ছুটছে গ্রামের বৌ-ঝি কাচ্চা-বাচ্চা। চীৎকার ভেসে আসছে পেছনে পেছনে ধীরে ধীরে চলা রিক্সার আরোহী আর চালকদের কানে। এক সময়ে চোখের আড়ালে চলে গেল ঐ বৌ-ঝি কাচ্চা-বাচ্চারা।

রিক্সাগুলো যখন ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় পৌঁছল, তখন শহরের রাস্তায় এখানে ওখানে জটলা। বিশেষ করে কোর্ট কাচারীর এলাকায় প্লেনগুলো মেশিনগানের গুলি চালিয়েছিল। এর মধ্যে গুজব ছড়িয়ে গিয়েছে। কেউ বলছে, একটা প্লেনকে গুলি করে নামিয়েছে মুক্তিযোদ্ধারা। কেউ বলছে, মুক্তিযোদ্ধাদের অনেক মারা গেছে।

চীৎকার হচ্ছে লাশ কই। হাসপাতালে নিছে নাকি কারোরে? কয়জন গ্যাছে?

ইতোমধ্যে কয়েকটি পরিবার পোটলা পুটলি নিয়ে শহর ছেড়ে বাইরে যাবার জন্যে রাস্তায় রিক্সায় উঠে পড়ে তাড়াতাড়ি চালাবার জন্যে তাগিদ দিচ্ছে।

কিন্তু যেতে হবে ঘুরে। রাস্তায় এবার কিছু লোক বসে পড়েছে। যেসব মরদের খোঁজ করছিল গ্রামগুলোর বৌ-ঝিরা, তাদের দু-একজনের সাক্ষাৎ পাওয়া গিয়েছে।

এমন সময় একটা তীক্ষ্ণ চীৎকার শোনা গেল এক কিশোরের, ইস দেখছো। রক্তের পাড়া। দৌড়াইয়া গেছে কেডা। মনে লয়, পায়ে গুলি লাগছিল।

এই রক্তের দাগ বাঁচিয়ে রিক্সা চালাতে হবে। আরোহীরা নেমে পড়ল। এদের মধ্যেই একজন শান্ত চোখে সব দেখছিল। হেঁটে হেঁটেই চলছিল ব্রাহ্মণবাড়িয়া শহরের ইট বাঁধানো সংকীর্ণ পাকা রাস্তা ধরে, যার অনেকখানি জুড়ে রক্তাক্ত পায়ের ছাপ। এক জায়গায় সবাইকে থামতে হল। বেশ কয়েকটি বৌ-ঝি রক্তাক্ত পায়ের ছাপের একটা কিনারায় বসে পড়ে কাঠি দিয়ে খুব কোমলভাবে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে কি যেন দেখছে।

এদেরই একজন বলল, কার পায়ের খুন?

কার পায়ের খুন গো?

কার পোলার, কার সোয়ামির?

এক বৃদ্ধা তাদের দিকে ছুটে আসতে আসতে রক্তের দাগের উপর বসে পড়া একটি বৌকে ডেকে বলল, ফাতেমা, তর সোয়ামি ধাইয়া আইতাছে।

ফাতেমা ভ্রূক্ষেপ করল না, বলল, মাইনষের পায়ে এত লহু থাকে?

কাঁথা সিলাই হইসে, নিশ্চিন্ত

'৪৮ সালের প্রথম ভাষা আন্দোলনের পরে তখনকার মুক্তিসংগ্রামী রাজনৈতিক কর্মীদের যে ধরপাকড় শুরু হয়, তার ধারাটা '৭১ পর্যন্ত প্রায় একই রকম ছিল। একবার ঢোকালে আর বের করার নাম নেই। দরকার হয়েছে বড় বড় ঠেলার। তবে জেলের দরজা খুলেছে। যেমন '৫২-র ২১শে ফেব্রুয়ারির ঠেলা, '৫৪ সালের সাধারণ নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের জয়ের ঠেলা, '৬২ সালের এন. ডি. এফ-এর ঠেলা, '৬৯-এর এগারো দফার ঠেলা। তারপর '৭১-এর মুক্তিযুদ্ধের শুরুতে কত জেলের রাস্তা তো সদর রাস্তা হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু প্রথম প্রথম জেলবন্ধের সময়টা বেশি হতো। ভেতরে যারা থাকতো তারা মনে করত সারা পৃথিবীটা নিঝুম। কবে জাগবে ছাত্র-জনতা? নোয়াখালির কৃষকনেতা মমতাজ মিঞা গাঁয়ের চেয়ারম্যান, প্রথম চোটেই জেলে এসেছিল। বলতো, নাও ডাঙ্গায় তুইলা রাইখ্যা মাঝি বান্ধবার চাও। এহন ভাটি। জোয়ার আইলে নাও ভাসাইয়া জোয়ার আইবো। আইবোই। ছাড়ন নাই।

এই রকম একটা ভাটির সময় ছিল '৫৫ সালের শুরুর দিকগুল। '৫৪ সালেই যুক্তফ্রন্টের মন্ত্রীসভাকে বরখাস্ত ক'রে জারী হয়েছিল জেনারেল ইস্কান্দার মীর্জার ছোট লাটগিরির ৯৩ ধারা। লাটের শাসন। জেলের ভেতরে মনে হতো, এই লাট যাইতো না, জেলের কপাট খুলতো না।

ঢাকা জেলের পুরানো হাজতে যারা আটক ছিল তারা চার বছর এক নাগাড়ে পুরানো হাজতে ছিল। জেলের সুপার সপ্তাহান্তে একবার এলে একটা দাবি পেশ করা হতো। অন্তত এই জেলেরই অন্যত্র নেয়া হোক। তবে কোন ফল হয়নি।

কিন্তু হঠাৎ ঝড় এল। যেমন করে বার বার এসেছে। '৫৫ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি। ভোরবেলায় সারা জেলখানায় যেখানে রাজবন্দীরা ছিল, সবাই একুশের শপথ নিয়েছিল নিজের নিজের জায়গায় জমায়েত হয়ে। শেষরাতে কানে এসেছিল কাছাকাছি বহু বাসার ছাদ থেকে 'শহীদ দিবস অমর হোক', 'সালাম, বরকত, রফিক তোমাদের ভুলব না', 'একুশে ফেব্রুয়ারি অমর হোক'। ১৪৪ ধারা জারী ছিল। মনে হয়েছিল তাই প্রভাতফেরী বোধহয় হয়নি। সারাদিনের কোন খবর পাওয়া যায়নি বিকেল পর্যন্ত। চাপা চাপা গেছে সারাটা শীতের সকাল দুপুর বিকেল। সন্ধ্যা হয়ে আসছে। লক আপের সময় হয়ে এল। হঠাৎ জেলগেটে আওয়াজ। মনে হতে লাগলো জেল গেট ভেঙ্গে ফেলছে বিরাট জনতা। 'শহীদ দিবস অমর হোক,' 'একুশে ফেব্রুয়ারি অমর হোক,' সালাম বরকত রফিক তোমাদের ভুলবো না'। যেন হাজার হাজার কণ্ঠের আওয়াজ। হঠাৎ মনে হলো একটা নতুন রাগিনী। শত শত ফাল্গুনের কোকিল বসন্তকে ডেকে এনেছে। কোকিল আর কোকিলা। তাইতো! মেয়েদের গলা। অনেক মেয়ের গলা। সঙ্গে অনেক ছেলের গলা।

সন্ধ্যা পেরিয়ে গেল। লকআপ হলো না। পুরানো হাজতের আঙ্গিনায় বন্ধ দরজার ফুটো দিয়ে দেখা গেল, জমাদার, সিপাহী, মেট পাহারা ছুটোছুটি চলছে! থেকে থেকে সেই হাজার কোকিল ও কোকিলার আওয়াজ।

এক সময় দরজাটা হুট করে খুলে গেল। জেলার, ডেপুটি জেলার ও ওয়ার্ডারদের সদলবলে প্রবেশ। একটি কথা ফেটে পড়ল ফুলের সুগন্ধের বোমার মতো। 'চলেন আপনেরা পুরানো বিশ সেলে, সাত সেলে, ছ'সেলে, দেওয়ানীতে। এখানে মেয়েদের রাখতে হবে। ইউনিভার্সিটির মেয়েরা এসেছে। জানানা ফাটকে জায়গা নাই।"

রাত সাড়ে আটটায় যার যার জিনিসপত্র কম্বল ইত্যাদি নিয়ে সেল এলাকায় চলে গেল পুরানো হাজতের বন্দীরা। মাথার মধ্যে একসঙ্গে কয়েকটা আগ্নেয়গিরি জন্ম নিচ্ছে। ১৪৪ ধারা ভেঙ্গে ইউনিভার্সিটিতে কালো পতাকা উড়িয়ে ছেলে মেয়েরা সভা ক'রে মিছিল বের করেছে। জনা তিরিশেক মেয়ে, শ'খানেক ছেলে গ্রেফতার হয়েছে। কালো নিশান নিয়েই মেয়েরা জেলে এসেছে। একদিকে এই ব্যাপার। আরেকদিকে রাত সাড়ে ন'টার সময় জেল এলাকার মুক্ত আকাশের তলায় ফাল্গুনের চাঁদ। সঙ্গে তারাভরা আকাশ। অনেকক্ষণ পরে জেলের গরাদ বন্ধ হ'ল এক এক ক'রে। রাত দশটায় ঘন্টি পড়ল। গিনতি মিলেছে। হাজার ঘটনা ভরা জেলখানাতেও একটি ঐতিহাসিক রাত।

রাত ভোর হল। ঢাকা শহরে সারা পূর্বাবাংলায় এই ভোর কোকিল আর কোকিলাদের পঞ্চম স্বরে দীপক রাগিনীতে জাগার গান। লক আপ খুলে দেওয়ার পরে সাত, ছ, পুরানো বিশ, দেওয়ানীর বন্দীরা বেরিয়ে এসে মিলিত হলো কপি আর ভেণ্ডির বিস্তীর্ণ ক্ষেতের আশেপাশে। সাত সেল থেকে বিশ সেলের এলাকা পর্যন্ত খোলা। সামনে উঁচু জেলের দেয়াল। ঢাকার মতি সর্দারের ভাষায় চৌদ্দ ফুট। এই নামটিকে তিনি নির্বাচনের সময় জেলে এসে চালু করে গিয়েছেন। এই চৌদ্দ ফুটের তলায় দেখা গেল একজন ওয়ার্ডার আর কয়েদী ওয়াল পাহারা।

পুরানো হাজতের বন্দীরা দু'দিন এই খোলা জায়গাতে ঘোরা ফেরার নেশায় মেতে রইল। দেওয়ানীতে আটক কয়েকজন পুরানো বন্দীর সাথে কথা যেন আর শেষ হতে চায় না। পূর্ববাংলার রাজনীতি আর সেই সঙ্গে সেই সময়কার পাকিস্তানের পশ্চিম এলাকার গণতন্ত্রের সংগ্রামীদের কথা যেন আর ফুরোতে চায় না। দুই এলাকাতেই জেলখানায় গণতন্ত্রের সৈনিকেরা বন্দী, জনগণ নির্যাতিত, নয়া উপনিবেশের কয়েদী, যুদ্ধ জোটের কামানের খোরাক! মুক্তির মন্ত্রণা আর শেষ হতে চায় না। তবে সবাইতো আর রাজনীতির সন্ন্যাসী দরবেশ নয়। একটি ডালিয়ার চারদিকে এমনি কয়েকজন রসিক গবেষণা শুরু করে দিয়েছিল পুরানো হাজতে মেয়েরা কে কার খাটে পা ঝুলিয়ে বসে বেণী খুলে গল্প করছে। পুরানো হাজতের বন্দীদের কারও কারও কথা ওরা জিজ্ঞেস করছে কি? জমাদারনীর কাছে জানতে চেয়েছে? কে কেমন দেখতে? একজন বলে ফেলল, আমার লোহার খাটে শুইয়া রইছে একটা আগুনের লতা। হায় আমি দেখলাম না কন্যা তোমারে।

দু'দিন এই করেই যাচ্ছিল চৌধুরী আর সালামেরও। ওদের বয়স বছর পঁচিশ ছাব্বিশ। দেয়ালের কাছাকাছি গিয়েই আবার ফিরে হন হন করে হাঁটতে হাঁটতে ওরা

কথা বলছিল। হঠাৎ নজর পড়ে গেল। ওয়াল পাহারার কেমন যেন রকম সকম। তারপর হাঁটতে হাঁটতেই চোখ খোলা রাখলো ওরা এদিকে।

কালো দাগকাটা কোর্তা পাজামা পরনে রোগাটে মানুষটা। মনে হয় যেন পুতুল। লক্ষ্য করে দেখলো ওকে বিকেলে। পরদিনও দেখলো সারাদিন। এবার বুঝলো ওকে কিছুটা। সন্ধ্যের আগে যখন চৌকার লোকেরা বালতি আর বাক্স করে ভাত, ডাল তরকারী নিয়ে আসে তখন বুঝতে পারা যায়, এই ওয়াল পাহারা পুতুল নয়, মানুষ। থালাবাটি কলসীর জলে ধুয়ে যখন ভাত, ডাল নেয় তখন দুয়েকটা কথা বলে। কথার মধ্যে একটা আঞ্চলিক টান। পূর্ব বাংলার কত অঞ্চলের কত টান দেয়া বাংলা ভাষা। চেনা জানা অথচ মনে হয় অচেনা-অজানা। দেশের মানুষগুলোকে জানাই হলো না, চেনাই হলো না ভাল করে, দুর ছাই।

একদিন একদিন করে আরও চারটে দিন চলে গেল। তারপর ওয়াল পাহারার যেদিন সপ্তাহ শেষ হবে সেদিন হঠাৎ বিকেলের দিকে চৌধুরী আর সালামকে সে হাত নেড়ে কাছে ডাকল। বলল, কাল অন্য ওয়ালে চলে যাবো। তারপর মুষ্টিবদ্ধ হাত তুলে বলল, সালাম। চৌধুরী বলল, লাল সালাম। পাহারা বলল, লাল সালাম। তুই? চৌধুরী বলল, কমরেড। সালামকে দেখিয়ে পাহারা বলল, তুই? সালাম বলল, কমরেড লাল সালাম। বাড়ি?

পাহারা বলল, হালুয়াঘাট। তারপর সেই চৌদ্দ ফুটের দেয়ালের তলায় পরিচয়ের একটা তরঙ্গ বয়ে গেল। চৌধুরী নেত্রকোণার ছেলে। হাজংরা তার অজানা নয়। সালাম শুনেছে এদের অনেক কাহিনি।

জানা গেল, গোলোক গুণের দশ বছরের জেল হয়েছিল '৪৯ সালের হাজং চাষীদের বড় লড়াই-এর সময় ধরা পড়ে।

চৌধুরী আর সালাম বলতে চাইল গত কয়েক বছরে কি কি ঘটেছে। কিন্তু বুঝতে পারল, বলার দরকার করে না। হাজং কমরেড তার শীর্ণ মুখে আকর্ণ হেসে বলল, জানে, সব জানে, সব জানে।

কয়েক বছর ধরে নিজে সে অপরিচয়ের আড়ালে রয়ে গেছে। প্রথমে কয়েদী হিসেবে, তারপর পাহারা হিসেবে, তারপর ওয়াল পাহারা হিসেবে। খুনের সাজানো মামলায় সাজানো সাক্ষীর কথায় আর অনেকের মতো তারও জেল তৃতীয় শ্রেণির কয়েদী। হাজার হাজার কয়েদীর মধ্যে দলে মুচড়ে মিশিয়ে দিয়েছে পাঁচ বছরের জেলজীবন। দু'বছর পরে ছাড়া পাবে। দশ মিনিটের মধ্যে বুঝিয়ে দিল কোন আক্ষেপ নেই। '৫২ দেখেছে, '৫৪ দেখেছে, এবার '৫৫ দেখল। মেয়েরা জেলে এসেছে।

ফিসফিস করে বলল, আমাদের পাহাড়ের দুইটা মাইয়া আছে ঢাকা জেলে জেনানা ফাটকে। আমার শালী, বিনা বিচারে বন্দী। বলল, এই মাইয়াদেরও দুঃখ গেছে। কত মাইয়া আইছে। দেখছি আমি সেদিন গেটে।

এই কথা বলে চৌদ্দ ফুটের দেয়ালের তলায় হঠাৎ সে একটা কাণ্ড করল। ডানহাতটা মুঠো করে উঁচুতে তুলে ঘুরে ঘুরে নাচলো, কীর্তনের সুরে গাইলো, 'লালঝাণ্ডা জিন্দাবাদ, ইনকিলাব জিন্দাবাদ, একুশে ফেব্রুয়ারি জিন্দাবাদ, সালাম বরকত জিন্দাবাদ।'

ওয়ার্ডার এবার চৌধুরীদের বলল কথা শেষ করেন এইবার। ওয়াল পাহারা টুপি লাগিয়ে, কোমরে ঝাড়ন বেঁধে থালাবাটি তুলে নিয়ে যাবার জন্যে তৈরি হল। তারপর বলল, আমার বউ পোস্ট কার্ড লিখছে। খবর চাইয়া। লিখসে, কাঁথা সিলাই হইসে, নিশ্চিন্ত থাকো। আমিও নিশ্চিন্ত। তারপর আকর্ণ হেসে বলল, শহরের মাইয়ারা জেলে আইছে, জেনানা ফাটক ভইরা ফালাইসে, পুরানা হাজত ভইরা ফালাইসে। কাঁথা সিলাই হইসে, নিচিন্ত। লাল সেলাম।

লাল সেলাম।

লাল সেলাম। যাবার সময় হাসতে হাসতে সে ক্ষেত পেরিয়ে আস্তে আস্তে লিকলিকে পা বাড়িয়ে চলে গেল। পরদিন ভোর বেলায় অন্য ওয়াল পাহারা। আবার মিশে গেল গোলোক গুণ হাজার হাজার কয়েদীর মধ্যে।

দিন কয়েক পরে জেল গেটে গিয়েছিল দু'জনেই। ফিরে আসার পথে দুজনেই আশে পাশের কয়েদীদের ভীড়-ভাট্টার মধ্যে তাকাচ্ছিল গোলোক গুণের দেখা পায় কিনা তার আশায়।

একজন কয়েদী খাওয়া-দাওয়া সেরে বন্ধ হতে যাচ্ছে নির্দিষ্ট ওয়ার্ডে। বাটিতে খানিকটা জল, তাতে কয়েকটা বেলফুলের কুঁড়ি।

চৌধুরীকে হেসে জিজ্ঞেস করল, "কারে তাল্লাশ করেন? কে হারাইছে? মানুষ না আর কিছু?" পুরানো হাজতের দিকে তাকিয়ে সে একটু মুচকি হাসল। চৌধুরীর ইচ্ছে হলো বলে, "সুঁই খুঁজতাছি।"

সেদিন সকালে ঢাকায়

সেদিন সকালে ঢাকায়

শ্রাবণের আসার মহড়া চলছে উপরে একফালি আকাশে। কোন প্রচণ্ড অগ্নিকাণ্ডজাত ধোঁয়ার কুণ্ডলির মতো মেঘ গমকে গমকে খুব নিচু দিয়ে দ্রুতগতিতে ধাবমান। পথিকেরা আসন্ন বর্ষণের কথা ভেবে ত্রস্তপায়ে পথ চলছে। গাড়ির মিছিল আর কর্দমাক্ত পথেও এই ত্রস্ততা। হঠাৎ দক্ষিণ-পশ্চিমের আকাশে মেঘের পর্দাকে এক মুহূর্তের জন্য সরিয়ে সকালের সূর্য উঁকি দিয়ে আবার মুখ ঢাকল। আর সেই আলো এসে পড়ল পথচারী আর যানবাহনগুলির ওপর এবং সরেও গেলো সঙ্গে সঙ্গে। এ-কে বিদ্যুতের ঝলকের সঙ্গে তুলনা করা যায়। আর সেই ঝলকে উদ্ভাসিত হলো অনেকের চোখের সামনে একটি বালিকার মুখচ্ছবি। খোলা রিক্সায় বসেছে সে একটা প্রকাণ্ড তানপুরা নিয়ে। এমন ঋজু তার ভঙ্গী যে মনে হয়, সে যেন একটি কঠিন রাগিণীর রেয়াজ করতে বসেছে। মুখে ভারি অদ্ভুত এক নিষ্ঠার হাসি। এত যে ভিড়, এত যে বিচিত্র যানবাহনের গর্জন, তাকে যেন স্পর্শ করতে পারছে না। তার উপস্থিতিটি এ দিক দিয়ে সহজ। মেয়েটির পরনে ফ্রক। উচ্চাঙ্গ সংগীতের সিঁড়ির একেবারে নিচের ধাপে তার থাকার কথা। কোন স্বীকৃতিই সে পেতে পারে না গায়িকা হিসেবে অভিজ্ঞ শহরবাসী পথচারীদের চোখে। সে যেন জানে যে, পথচারীরা ভ্রূক্ষেপই করবে না তাকে দেখে, তবু সেও কিন্তু ভ্রূক্ষেপ করছে না জনাকীর্ণ পথে চলতে চলতে। মৌন রয়েছে সহজ অন্তঃসুরে। চলমান ছবিটা দেখে শেষের এই কথাটাই মনে লেগে রইল অনেকক্ষণ, তারপর মনের মধ্যে পরিপুষ্ট হয়ে উঠল এমন একটি ছবি, যাকে পছন্দ করিনা। এই ছবিটির নির্মাতা হচ্ছে একটি রেওয়াজ। এই রেওয়াজ হচ্ছে শিল্পীর বিচ্ছিন্নতার রেওয়াজ, জনতা থেকে দূরে সরে যাওয়ার রেওয়াজ। এই বালিকাও কি সেই রেওয়াজে আবদ্ধ হয়ে বসবে?

শ্রাবণ, ১৩৭০।

কিশোরী আর করবী গাছ

শ্রাবণ–ভাদ্রের ঘনঘোর মেঘাবৃত তারাহীন আকাশ, দুরন্ত বাতাস, হাজামজা নদীগুলিতেও তরঙ্গসংকুল কলোচ্ছ্বাস, কর্দমাক্ত পিচ্ছিল পথ, এরা সবকিছুই ঘর ছেড়ে পথে বার হবার পক্ষে প্রতিকূলতা করে থাকে বলেই সম্ভবত ভরা বর্ষাতে প্রেমিক-প্রেমিকার অভিসারকে বাঙালি কবিরা তিতিক্ষা আর ক্লেশের বিচারে পুরো নম্বর দিয়েছেন। অভিসারের সঙ্গে ভরা বর্ষার পিছল পথের এই ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের দরুন আমি আমার একটা অভ্যাসের কথা জনসমক্ষে চেপে যাই। আমার এই অভ্যাসটা হচ্ছে বৃষ্টি নামলে ছাতি মাথায় দিয়ে শহরের পথে পথে উদ্দেশ্যহীনভাবে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ঘুরে

বেড়ানো। এর সঙ্গে প্রেম এবং অভিসারের বিন্দুমাত্র সম্পর্ক নেই। আমি একজন অদৃশ্য ভ্রাম্যমান লেখক। সাধারণত সমস্ত লেখকই অবশ্য এইচ. জি. ওয়েলসের 'অদৃশ্য মানুষ' উপন্যাসের নায়ক বৈজ্ঞানিকের মতো অদৃশ্য। তবে বেশিক্ষণ অদৃশ্য থাকা যায় না। আমিও হয়তো পারব না। যাই হোক, অঝোর বর্ষণের মধ্যে যখন ছাতিটা খুলে মাথার উপর শক্ত করে ধরে বাসাবাড়ির রক থেকে পথে নামি, তখন লোকে মনে করে জরুরি কাজে বার হলাম। আমিও একথাই বলি। অপ্রিয় সত্য বললে যে পাপ হয় না, সে আশ্বাস আমি শৈশবেই পেয়েছি।

আজও সকালে আকাশ ভেঙ্গে যখন বৃষ্টি নামলো, তখন আমার পায়ের নিচে যে ঘোড়ার খুর রয়েছে বলে কোন কোন বন্ধু মনে করেন, সেটা উস্‌খুস করতে লাগলো, পথে নামলাম। পুরানো ঢাকা শহরের রাস্তাগুলি চিরকালই যেমন মা-বাপ মরা অনাথ শিশুর মতো ছিল, আজও তেমনি আছে। বর্ষাকালের পুরানো ঢাকা শহরের পথ-ঘাটের একটি রাসায়নিক উপাদানই মাত্র আজ অনুপস্থিত। ঘোড়ার গাড়িগুলি অপসারিত হয়েছে, সুতরাং ঘোড়ারা আর রাস্তা-ঘাট নোংরা করে না। অদৃশ্য ঘোড়ারা রাস্তা নোংরা করতে পারে না। তবুও তিতিক্ষা ও ক্লেশের কঠোর পরীক্ষার পক্ষে এর অপরিসীম বিশৃঙ্খলা আদর্শ স্থানীয় বলে বিবেচিত হতে পারে। আম সাবধানে পা ফেলে ফেলে পথ ভাঙ্গতে লাগলাম। অবশ্য পুরানো ঢাকা শহরের পথের বাসিন্দারা লক্ষ্য করল না আমার নিরুদ্দেশ যাত্রাকে। কারণ, অধিকাংশের জীবনের সারাপথটাই পিছল পথ। কচি কচি ছেলে-মেয়েগুলি ভিজে কাকের মতো রাস্তা পারাপার করে ফাইফরমায়েস খাটছে। একটা ঠেলাগাড়ি রাস্তার পানি ভর্তি খানায় পড়ে গিয়েছে। ঠেলাওয়ালা সেটা উদ্ধার করতে বার বার ব্যর্থ হয়ে অশ্রাব্য খিস্তি করছে। একটা বাড়ির বারান্দায় কয়েকজন দিন-মজুর বসে সামনে আকাশের মেঘভর্তি ফালিটার দিকে তাকিয়ে আছে। একটা বাড়ির দরজায় চটের পর্দা টাঙ্গানো। সেই পর্দার সঙ্গে লজ্জায় প্রায় মিশে গিয়ে একটি কিশোরী মেয়ে বসে আছে। সামনে তার একটা থালি। থালিতে কতকগুলি পেঁয়াজি। না, খাচ্ছে না সে, খেতে পারে না এই বর্ষার দিনেও, কারণ, পেঁয়াজিগুলি বিক্রির জন্য। একটা হিসাব করলাম, কত লাভ পাবে সে এই থালি খালি হয়ে গেলে? আটআনা? দিনে আটআনা হলে মাসে কত? বাড়িটা হয়তো নিজেদের, কারণ ওটা প্রায় ভেঙ্গে পড়েছে এবং সময়মতো 'পথ্যের' অভাবে ওর মৃত্যু আসন্ন। কিন্তু এ সব হিসাবের উপরেও আমার মনে ঘা মারল মেয়েটির কুণ্ঠা, শালীনতা বোধ। স্বভাব ওকে সাজিয়েছে? বর্ষার দিনে গরম পেঁয়াজি খেতে এই কিশোরীর ইচ্ছা জাগে কিনা, সে কথা মনে মেনে ওকে জিজ্ঞাসা করতেও ভুলে গেলাম। জীবনের প্রতি বিশ্বাসকে মেয়েটির ঐ শালীনতা বোধের ছবি দিয়ে নতুন করে সাজিয়ে নিয়ে সামনে এগোতেই দেখি দুটো ট্রাক সামনাসমানি হয়ে একেবারে মুখে মুখ লাগিয়ে ব্রেক কশেছে। ট্রাক দুটোই মজুরে ভর্তি। কয়েকজন মজুর লাফিয়ে নেমে পেঁয়াজির থালির দিকে এগিয়ে গেল। মোষের লড়াইতে দুটো মোষ যেমন শিঙে শিং ঠেকিয়ে জিরোয়, সেই ভাবে ট্রাক দুটো জিরুতে লাগল। এদের পাশ কাটিয়ে পথ ভাঙ্গতে যথেষ্ট বেগ পেতে হলো আমাকে। কিন্তু সত্যিই তো আর ঢাকা শহরের ৪০মাইল জোড়া পথের জালে আটকে রইলাম না। নিজের অজান্তেই দেখি, এসে পড়েছি পুরানো শহরের রেল লাইনের লৌহ-সীমানা ছাড়িয়ে, নির্জন প্রশস্ত পথের বৃক্ষব্যুহের তলা দিয়ে চলছি।

ফুটপাথে উঠতে হল। এক সময়ে নতুন ফুটপাথ তৈরি হওয়ার পরে মনে হতো, শ্বেত পাথরের টুকরো দিয়ে সাজানো পথ। কিন্তু আজ এই ফুটপাথে শ্যাওলা পড়ে গিয়েছে। উপরন্তু সবগুলো ঠক ঠক করে নড়ছে শীতকালে বুড়ো মানুষের হাড়গোড়ের মতো। সুতরাং পুরানো ঢাকা শহরে যত সাবধানে পা ফেলেছি তার চেয়ে বেশি সাবধানে নতুন শহরের ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাস্টের ডিজাইন করা ফুটপাথে পা ফেলে চলতে হচ্ছিল আমাকে। যদিও ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাস্টের মনুমেন্ট মার্কা দালানটা আমাদের সর্বসাধারণের চোখকে উপরে তুলে দিয়েছে, তবু নিতান্ত প্রাণের দায়ে ফুটপাথের উপর দিয়ে চলতে গিয়ে চোখ নামাতে হল। এইভাবে বেশ খানিকটা চলছিলাম। হঠাৎ ছাতিসমেত একেবারে অবরুদ্ধ হয়ে গেলাম। চেয়ে দেখি, একটা করবী ফুলের গাছ। ফুলে ফুলে ছেয়ে গেছে। বৃষ্টির জলে, পাতা আর ফুলের ভারে ও একেবারে নত হয়ে পড়েছে। এই করবী ফুলের গাছটা শুধু আমাকেই বিপর্যস্ত করেনি, ও নিজেও বিপর্যস্ত। এই বিপর্যয়ের কারণ আকাশ ভেঙ্গে পড়া বর্ষণ, দুরন্ত উল্টো পাল্টা বাতাস। কিন্তু এই বিপর্যয়ের মধ্যে ওর গর্বের সীমা নেই। ও যে ফুলে ফুলময়। স্বভাব ওকে সাজিয়েছে?

ভাদ্র, ১৩৭০।

জীবনের সিঁড়ি

সেদিন এক গাউন পরা দেশি মেম সাহেবকে দেখলাম সিনেমা দেখতে গিয়ে। তখনও ছবি শুরু হয়নি। হলের বাইরে কফি'র টেবিলে পাশের চেয়ারে বসেছেন মহিলা। সঙ্গে বোধহয় মেয়ে কিংবা নাতনী। মেম সাহেবের বয়স হয়ে গিয়েছে এবং বয়স লুকোবার জন্য তাঁর কোন প্রয়াস নেই। গালে-ঠোঁটে রং নেই। মাথার চুলে প্রসাধন নেই। গালের চামড়া ঝুলে পড়েছে, মুখের ভাব উদাস। সঙ্গের ছোট মেয়েটি চঞ্চলা। তার মুখ এমনিতেই প্রদীপ্ত। রং-এর বয়সও তার আসেনি। এই মেম সাহেবকে আমি দেখেছি পথে-ঘাটে কখনো সখনো। দেশ স্বাধীন হবার আগে। চোখে ছিল তাঁর গর্ব। রাঙানো ভুরু বাঁকা করে স্পর্ধিত চোখে পথচারীদের দিকে তাকাতেন। নিখুঁত প্রসাধনের মধ্য দিয়ে ব্যক্তিত্বকে জাহির করার প্রয়াসের মধ্যে অবশ্য একটা বলিষ্ঠতাও ছিল। সম্ভবত, সুখ-স্বপ্নে এত বিভোর ছিলেন যে, তিনি যে শাসিত কালো আদমিদের একজন ছিলেন না সে সময়, সে কথা তাঁর মনেই হয়নি, এটা অস্বাভাবিকও ছিল না। সেদিনকার সে শাসিতেরা আজ এখনও শাসক হয়ে উঠতে পারেনি, তাদের মধ্যেও তো এমনি সুখ-স্বপ্নে বিভোর, গর্বিত ও গরবিনীদের দেখা পাওয়া যায়। পথ চলতে মাঝে মাঝে চোখে পড়ে ইদানিং বাঁকা ভুরুর তলায় তির্যক চোখ। ব্যক্তিগত দুরাশা দিয়ে নিজেকে আগাগোড়া মণ্ডিত করে যেকোন হঠকারিতা করতে যেন তৈরি। হয়তো এটা যৌবনের ধর্ম। আর আজ যে মেম সাহেবকে দেখলাম, উদাসিনীর রূপে, এর মূলে রয়েছে হতাশ্বাস? হয়তো প্রৌঢ়ত্ব। হয়তো,

> "বাদল ধারা হলো সারা,
> বাজে বিদায় সুর।"

কিন্তু ঐ ছোট মেয়েটি? মেম সাহেবের চোখে কিন্তু কখনো সখনো আলো ঠিকরে পড়ছিল মেয়েটির দিকে তাকানোর সঙ্গে সঙ্গেই। আর একটি জীবনের ঝরণা উৎস থেকে উপচে পড়ছে? "যে নদী মরূপথে হয়নি হারা" এখনই একে অসঙ্কোচে বলা যায়? হয়তো এই উদাসিনী ভাবছেন, এ এক সুদৃশ্য নদী। আলো থেকে আলো জ্বালিয়ে জীবনের শেষ হীন অভিব্যক্তি। মেম সাহেব যেন ছোট মেয়েটির মুখের আয়নায় নিজের ফেলে আসা দিনের মুখ দেখছেন। ভাবছেন, এই মেয়েটিও আর দুদিন পরে করুণার দৃষ্টিতে তাকাবে পথচারীদের দিকে, সেই অপরিমেয় অধিকাংশের দিকে, যারা হয়তো তখন নবপর্যায়ের শাসিত থেকে যাবে। কিন্তু মেয়েটি সেকথা ভাববেই না মোটে। ব্যক্তিগত দুরাশাতে মণ্ডিত করে নেবে নিজেকে। তারপর হবে উদাসিনী। স্বর্গচ্যুতা।

কফি'র টেবিলের ধারে পাশের চেয়ারে উপবিষ্টা মহিলা এরপরে হয়তো ঔদাসীন্যের একটি নিরেট স্তূপে পরিণত হবেন। হয়তো তাঁর চোখে আজকের আলোর ঝলকটুকুও থাকবে না। এর কারণ কি? আমরা খণ্ড খণ্ড ব্যক্তি? আমরা পুরুষানুক্রমে প্রবহমান নদী নই?

এই প্রসঙ্গে একট ছবি ভেসে উঠেছে মনে। বেশ কয়েক বছর আগে একটা বই পড়েছিলাম। ফটো তুলবার আধুনিক পদ্ধতির উপর লেখা বইটি। যিনি ফটো তুলেছেন তিনি যে শিল্পী, সেকথা প্রমাণ করেছেন বই-এর লেখক। ছবিটির নাম 'জীবন বৃক্ষ'। ছবিটির উপকরণ হচ্ছে মায়ের কাঁধের উপর দাঁড়িয়ে শিশু তার কচি কচি দুটি হাত বাড়িয়ে দিয়েছে আকাশে। সমস্তটি মিলে ছবিটি হয়েছে একটি পত্রহীন বৃক্ষকাণ্ড।

সেদিন হঠাৎ চোখে পড়ে গিয়েছিল আরেকটি দৃশ্য। পাশের বাড়ির একটি ছোট মেয়ে তার ছোট ভাইটিকে নিয়ে এসে দাঁড়িয়েছে আমার ঘরে। আমার ঘরে একটি মাত্র জানালা আছে। ঢাকা শহরের পুরানো বাড়ির গবাক্ষ। বেশ কিছু উঁচুতে। ছোট ভাইটির দুরাশা মাথা চাড়া দিয়ে উঠল। সে বলল, তাকে জানালার আলসেতে বসাতে হবে। তার আবদারে অতিষ্ঠ হয়ে বোনটি তার ভাইকে যথাস্থানে ঠেলেঠুলে বসাতেই সে জানালার ওপারের আম গাছটাকে দেখে হৈ চৈ করে উঠল। ভাবটা, যেন সে আম গাছটাতেই চড়ে বসেছে। ছোট মেয়েটি কিন্তু কিছুই দেখতে পাচ্ছিল না। জানালার নিচে তার মাথা। আমি ওকে বললাম, তুমি দেখবে না খুকী? সে বলল. আমিও একদিন ওর মতো করে দেখেছি। তখন ছোট ছিলাম।

আশ্বিন, ১৩৭০।

বয়সের হিসাব

এক রকম গাছ আছে যেগুলো শীতের শেষের দিকে একেবারে ন্যাড়া হয়ে যায়। তারপর একদিন বসন্তের কোন ভোরে যখন ওর কঙ্কালটার উপর সূর্যকিরণ এসে পড়ে, তখন দেখা যায়, কচি পাতার প্লাবন এসেছে ওর গায়ে। এরপর দেখতে দেখতে ওর কঙ্কালটা লক্ষ লক্ষ পাতার আড়ালে ঢেকে যায়। কিন্তু আবার এমন অনেক গাছ আছে, যারা কোনদিনই ন্যাড়া হয় না। কখন যে এদের পাতা খসে পড়ছে, আর কখন যে এই গাছগুলোতে নতুন পাতা আসছে, সেটা গাছতলায় না গেলে ধরা যায় না। কিংবা তারা

খবর রাখে, যারা কাঠের বদলে পাতার আগুনে ভাত রাঁধে। অবশ্য অনেকেই নিশ্চয় এ খবর রাখে। এ-ধরনের গাছগুলো না থাকলে আমাদের গ্রামাঞ্চলের অনেক ঘরণীরই ভাত রাঁধা দায় হতো।

কিন্তু সে যাই হোক, এরা একদিক দিয়ে দুই তরফই সুখী। বছরে বছরে ন্যাড়া হোক, কিংবা না হোক, মৃত্যুর শেষদিন পর্যন্ত ওদের কঙ্কালে জীবনের বন্যা বয়ে যায়। কিন্তু হায় মানুষ! এদিক দিয়ে প্রকৃতি আমাদের প্রতি কি সৎমায়ের আচরণ করেন না? আমরা যখন মধ্যগগন থেকে অস্তাচলে নামতে শুরু করি, তখন বুঝতে পারি যে, ঐ তথাকথিত স্থবির গাছগুলো আমদের চেয়ে ভাগ্যবান। দাঁত পড়লে আর দাঁত গজায় না। মুখের উপর একবার বলিরেখা দেখা দিলে তার ক্রমবর্ধমান কুঞ্চনকে স্নো-পাউডার দিয়ে ঢাকা যায় না। গাছগুলোর তুলনায় আমাদের আরেকটা অসুবিধা –আমাদের কৃত্রিম দাঁত কিংবা মুখের ফাটল আমাদের মনটাকেও জুড়ে বসে। আমরা মানুষ, আমরা চেতনার অধিকারী। অন্তত অবচেতনার অধিকারী।

এতগুলো কথা বলার পরে, নিশ্চয়ই বুঝিয়ে দিতে পেরেছি যে, আমিও মধ্যাকাশে নেই। জীবনের বন্যা আমার হতের নাগালের মধ্য থেকে হেমন্তের নদীর মতো ঘাটের এক সিঁড়ি থেকে আরেক সিঁড়িতে ক্রমাগত নেমে যাচ্ছে। আমি এ-ব্যাপার সচেতন না হয়ে পারছিনা। মাঝে মাঝে বড় বেশি রকম সচেতন হয়ে পড়ছি। মনটা কখনও কখনও আফসোসে ভরে যাচ্ছে। হায়, আমি কি আঙিনার ঐ অজস্র টিউমার-ওয়ালা বেল গাছটার চেয়েও অধম?

কিন্তু আবার আশ্চর্য হয়ে যাই। মনটাতে নতুন করে জোর ধরে। উপরে যা বলেছি, সেটাই আমার বেলায় একমাত্র সত্য নয়। আরও অনেকের বেলাতেও একমাত্র সত্য নয় নিশ্চয়। আমি যে মানুষ। সমস্ত মানুষের জীবনের সঙ্গে আমার জীবন জড়িত। সমস্ত মানুষের যৌবনের সঙ্গে আমর যৌবন বাঁধা। আমার সামনে ঐ যে জনতা, ওর কি বয়স আছে? ওর কি দাঁত পড়ে, ওর মুখে কি বলিরেখা দেখা দেয়? এ প্রশ্নই অবান্তর। ঐ জনস্রোতের কোন বয়স নেই, ঠিক যেমন গত সপ্তাহের কালোব্যাজ পরা সাংবাদিক আর প্রেস শ্রমিকদের মিছিলের কোন বার্ধক্য ছিল না, বহু বয়োবৃদ্ধ তাতে শামিল থাকা সত্ত্বেও। এ ব্যাপারে গাছগুলোর চেয়ে আমরা বেশি ভাগ্যবান। অনেক বেশি ভাগ্যবান। কারণ, জনতার তো মৃত্যুও নেই।

কিন্তু আমি দুঃখিত যে, আমার আসল লক্ষ্যেই এখনও পৌছতে পারিনি। আচ্ছা এবার সোজাসুজি চলে যাই।

ইদানিং শরীরটা ভিতরে ভিতরে ভেঙ্গে আসছে। মাঝে মাঝে আফসোস আমাকে দংশন করে, বেদনা আমাকে ঘিরে ধরে। কিন্তু আবার পারিপার্শ্বিক আমাকে উৎফুল্ল করে তোলে। ভিড়ের মধ্য দিয়ে যখন উন্মুক্ত কৃপাণের মতো প্রবেশ করে এঁকেবেঁকে কোন দুরন্ত কিশোর তীব্রগতিতে সাইকেল চালিয়ে যায়, তখন মনে হয় এযে আমার সেই পুরনো আমি। এই যে পারিপার্শ্বিক, এই যে আমি, আমার ভাই-বোন, আমার মা, আমার এমনি কত নিকটাত্মীয়, বন্ধু-সাথী, যাদের অনেকে মরেও মৃত্যুহীন। এই মৃত্যুহীন পারিপার্শ্বিকের মধ্যে, মিছিলের মধ্যে, জনতার মধ্যে, আমাদের এই ছোট মহল্লার চৌমাথাতেও।

আমিত্বের পরিধিটাকে আরেকটু বাড়িয়েই বলি। আমার একটা বোন আছে। তাকে অনেক দিন দেখিনি। আমার এই বোনের বয়সও বসে নেই। কিন্তু আশ্চর্য, আমার মনে হয়, যদি দেখা হয়, তবে সেই পুরানো দিনগুলিতেই ফিরে যাব, যেখানে আমার চিরকৈশোরের যাত্রা। কিন্তু কেন বলছি যে দেখা হয়? দিন কয়েক আগে ওরই সঙ্গে দেখা হয়ে গেল নাকি? দেখলাম, একটি ছোট মেয়ে রেশন কার্ড আর ব্যাগ হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। মেয়েটি হিন্দু হতে পারে, মুসলমান হতে পারে। বাঙালি হতে পারে, অবাঙালি হতে পারে। সালোয়ার-কামিজ পরনে। কোন বালিকার বিদ্যালয়ের পোশাক। হয়তো ওরও একই সমস্যা আমার বোনটির মতো। হয়তো ওর বড় ভাই আমারই মতো রেশন কার্ড নিয়ে দোকান থেকে ভাল চাল বাছাই করে ব্যাগে ভরতে অপারগ। চোখের দৃপ্ত ভংগিমা দেখে মনে হয় এই মেয়েটিকেও তার বাড়িতে সবাই ম্যানেজার বলে ডাকে। অবশ্য বেশিক্ষণ দেখা গেল না ওকে। আশ্চর্য কৌশলে রেশনের দোকানের ভিড়ের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল সে, খুব সম্ভব চালের বস্তাগুলোকে যাচাই করে দেখতে। আমার সেই বোনটিও এই রকমটা করত। চমকে উঠলাম। আরে এতকাল পরে কোথা থেকে সেই কিশোরের সাথী। এযে অবিকল সে। আর এযে অবিকল আমি, সেই দর্শক।

কিন্তু পারিপার্শ্বিক সম্বন্ধে কি ভুল করিনি? সেটা ছিল দুর্ভিক্ষের দু'বছর পরের কথা। ১৯৪৫ সাল। তখনও দুর্ভিক্ষের প্রেতচ্ছায়া আমাদের চোখের সম্মুখ থেকে সরে যায়নি। রেশন কার্ডকে তখন শহরের মানুষ বুকের পাঁজর বলে মনে করে। আজ ১৯৬৩ সাল। আজও কি সেই অবস্থা?

লোকে বলুক, পরিস্থিতি বদলেছে কিনা। আকাল আমাদের কাঁধে ভর করে রয়েছে কিনা। ঐ মেয়েটি বলুক। আমার বোনটি মুখরা। সে তিতোকে তিতোই বলতো।

কার্তিক, ১৯৭০।

দোটানা

অফিসে বসে একটা 'নিজস্ব' প্রবন্ধ লিখছিলাম। বাঁকাকে সোজা এবং সোজাকে বাঁকা করে সব রকমের পাঠক-পাঠিকার মনোমত হতে পারে এমন করে লেখাটাকে দাঁড় করিয়ে প্রেসে পাঠিয়ে দেখলাম, ঘড়িতে নটা বাজে। ঠিক করলাম, নাইট শোতে সিনেমায় যাবো।

দৈনিক লেখাও যে একটা হস্ত-শিল্প সেটা হয়তো অনেকে জানেন না কিংবা মানেন না। এতে মাথা যতটা খাটাতে হয়, তার চেয়ে অনেক বেশি কাজ আদায় করতে হয় ডান হাতের কব্জী আর আঙ্গুলগুলোর কাছ থেকে। হাতের মাংসপেশী গুলোতেও অলক্ষ্যে টান পড়ে। যারা কলম পেশে, তাদের ডান হাত ঝুনো কাঠ হয়ে যায় বলেই বোধ হয়, টানটা গায়ে লাগে না। স্বভাবতই এই ঝুনো কাঠের উপর সার্টের পুরো হাতটা ঝুলে থাকলে আস্বস্ত লাগে। কলমজীবীর অজ্ঞাতে সার্টের হাতা কনুই-এর উপর চলে যায়। আমারও তাই হয়েছিল। সার্টের হাতগুলো যখন কব্জি পর্যন্ত নামিয়ে আনলাম, তখন দেখলাম, সেগুলো একেবারেই কুঁচকে গিয়েছে। হয়তো কলমজীবীর

মেহনতেও একটা তৃপ্তি আছে। সে জন্য খেয়ালই করলাম না, কি পোশাকে সিনেমায় যাচ্ছি।

নটা বাজে? তাহলে সময় কোথায়? খানিক আগেই রওয়ানা দিতে হবে। কারণ, নবাবপুরে রেলওয়ে ক্রসিং একটা গ্যাঁড়াকল। সেখানে একবার গেটটা পথ আটকালে সেপথ আর খোলসা হতে চায় না। এই গেটটার কাছ থেকেই সম্ভবত আমাদের আমলাতন্ত্র অগ্রগতির পথ রোধ করতে শিখেছে। সিনেমার আনন্দকে সে যেমন তুড়ি দিয়ে উড়িয়ে দেয় তেমনি হসপিটালের পথে জরুরি কোন ডেলিভারি কেসেও তার মাথা ব্যথা নেই। যাই হোক, শেষ পর্যন্ত ছবিঘরে গিয়ে দেখি নিচের কোন ক্লাসে টিকেট নেই। যাঁহা বাহান্ন তাঁহা তিপ্পান্ন ভেবে একেবারে উপরের ক্লাসের টিকেট কিনতে কিনতে ভাবলাম, ঘরে ফেরার সময় হাঁটলেই একাউন্টস মিলে যাবে। অর্থাৎ মোটেই দমলাম না।

কিন্তু হলঘরে ঢুকেই বুঝলাম, সামনের পর্দাটা ছাড়াও 'আমি' বস্তুটা সশরীরে বর্তমান। বদলাবো বদলাবো করে সাতদিন ধরে পরা সার্ট পায়জামা বদলানো হয়নি। সার্টটার হাতা দুটো ভয়ানকভাবে ময়লা হয়ে গিয়েছে। পাজামাটা চটের থলে। হলঘরে অতগুলি লোকের দশা কি হতে পারে, সে কথা না ভেবেই নেহায়েত স্বার্থপরের মতো মনে মনে বললাম ,"ধরণী, দ্বিধা হও।"

মুসকিলটা হয়েছে এই যে, আজ অফিসে কাজে আসার সময়েও দুদিন মাত্র আগে পরা সার্ট-পাজামা ভয়ানক ময়লা লাগল। না বদলে পারলাম না। অথচ আসতে আসতে যেসব মেহনতী মানুষ চোখে পড়েছে তাদের অনেকেরই গায়ে কাজের জামা, আধময়লা জামা, নোংরা জামা, ছেঁড়া জামা। একজন আমার চেনা। সে একজন ফিটার। তার গায়ে দেখলাম, তেল-কালি মাখা একটা হাফসার্ট। অথচ আমি জানি, উৎসবের দিনে এই লোকটি যে পোশাক-পরিচ্ছদ পরে তা' যেমন রুচি-সঙ্গত, তেমনি প্রদীপ্ত। মানায়ও তাকে। মনে হয়, এ সম্পূর্ণ পৃথক একটি লোক, এর কিন্তু কাজের জামা পরতে মোটেই দ্বিধা জাগে বলে মনে হয় না। স্বাচ্ছন্দে চলে গেলো বুক ফুলিয়ে মহানগরীর ভিড় ঠেলে।

বড় দোটানায় পড়ে গিয়েছি। ভাবছি, পকেটে কলমটার বদলে যদি হাতে একটা হাতুড়ি আর করাত থাকতো তাহলে সম্ভবত এমনভাবে দ্বিধাগ্রস্ত হতাম না। হয়েছি কলমজীবী–না ঘরকা না ঘাটকা। ভাবছি, যদি সেদিন ছবিঘরে হাতদুটো কাজী নজরুল ইসলামের ভাষায় 'শ্রমকিনাঙ্ক' হতো, তাহলে সেখানে ময়লা সার্টটাকে আমার স্পর্ধার পতাকা হিসাবে উড়িয়ে দিতাম। কিন্তু আমার এই প্রার্থিত 'আমিত্ব'-টাকে আবৃত করে রাখে আমার মধ্যেকার কলমজীবী ভদ্রলোকটা। কলম কি এই জন্যই এখন পর্যন্ত হাতুড়ি, বাটালি আর রেঞ্জের দলে জায়গা পেল না, লক্ষ লক্ষ কলমজীবী অফিসে অফিসে খাটতে খাটতে যক্ষ্মা রোগে আক্রান্ত হয়ে মরা সত্ত্বেও? কলম কি জাতে পরজীবী? এইজন্যই কি বিদ্রোহী ইংরেজ কবি শেলী তাঁর কবিতাতে যুদ্ধ, শোষণ ও কুসংস্কার থেকে মুক্ত মানবসমাজের যে ছবি এঁকেছিলেন, তাতে সৈনিকের তরবারিকে ভেঙ্গে লাঙ্গল করা হয়েছিল? কলমের কথাটা শেলীর মাথায় আসা সম্ভব হয়নি?

দোটানায় পড়েছি। কলম আমাকে মজুরে পরিণত করেছে। কিন্তু সমাজ কলমকে হাতুড়ির মর্যাদা দিতে রাজি নয় এখনও। সবচেয়ে কঠিন সমস্যা এই যে, আমার আমিত্বটাও এই সমাজ। ভাবতে ভাবতে অনেক কাল আগে পড়া উনিশ শতকের রাশিয়ান লেখক টুর্গেনিভের একটা ছোট গল্পের আভাস মনের মধ্যে ভেসে উঠল। গল্পটা এই:

তখনও রাশিয়াতে বিপ্লব সফল হয়নি। একজন ভদ্রলোক কয়েকজন শ্রমজীবীকে ডেকে বললেন, "আমি তোমাদের লোক।" শ্রমজীবীরা একবার এই ভদ্রলোকের কোমল দুটি করপল্লবের দিকে এবং তারপর তাদের নিজেদের কর্কশ ও কঠিন হাতগুলির দিকে তাকিয়ে হো হো করে হেসে উঠল। ভদ্রলোক তাঁর দুটি কব্জিতেই নীল দাগ দেখিয়ে বললেন, "তোমাদের জন্যে কাজ করতে গিয়ে আমার হাতের এই দাগ পড়েছে।" শ্রমজীবীরা তাঁর কথা না বুঝেই চলে গেল। কিছুকাল পরে শ্রমজীবীরা শুনলো, একজন বিপ্লবীকে প্রকাশ্য স্থানে ফাঁসি দেওয়া হবে। তারা সেখানে গেল। ফাঁসি হয়ে যাবার পরে তারা মৃতদেহের কাছে গিয়ে হাতের নীলদাগ দেখতে পেয়ে চিনতে পরল সেই লোকটিকে, যিনি বলেছিলেন, "আমি তোমাদের লোক।"

গল্পটা রূপক। টুর্গেনিভ এর কোন ব্যাখ্যা দেননি। তবে সম্ভবত বুদ্ধিজীবী এবং শ্রমজীবীর মাঝখানে যে দেয়ালটা রয়েছে, সেটাকে তিনি তাঁর সমস্ত উপন্যাসেই চিত্রিত করেছেন এবং এই গল্পে এই দেয়ালটাকেই ভাঙবার জন্য তীব্র ও তীক্ষ্ণ রূপকের আঘাত দিয়েছিলেন।

কিন্তু আমার মুস্কিলটা হচ্ছে এই যে, নিজের মনকে এভাবে আঘাত করেও এই দেয়াল ভাঙা কতটা সম্ভব? ভদ্র 'আমি'টা মেহনতী 'আমিত্বটা'কে চিনতে চায় না এবং মেহনতী 'আমিত্বটা' ভদ্রলোক 'আমিত্ব'-কে কাছে ঘেঁষতে দেখলে হো হো করে হেসে ওঠে।

কার্তিক, ১৩৭০।

ইচ্ছার মুহূর্তে

পথ চলতে ঘাসের ফুল নয়। আস্ত একটা প্রাণবন্ত মানুষ। আধা-গ্রামীণ আধা শহুরে। লোকটা ঢাকা শহরের নবাবপুর রোডের এপার ওপার করতে গিয়ে এই সেদিন দিশাহারা হয়ে রিক্সা আর স্কুটারের কাঁচিকলে পড়ে গেল। কাঁচিকলটা যখন ফাঁক হলো তখন দেখা গেলো, রাস্তায় খানিকটা রক্ত গড়িয়ে গিয়েছে। লোকটা যন্ত্রণা-কাতর ভঙ্গীতে বসে আছে। সাধারণত যা করে থাকি এরকম অবস্থায়, এখানেও তাই করলাম। ইতস্তত করতে লাগলাম, লোকটার কাছে ছুটে যাবো কি যাবো না এই ভেবে। এবং সাধারণত যা ঘটে থাকে তাই ঘটল। আমি সিদ্ধান্ত করে উঠবার আগেই দেখলাম, এক হতভাগা চেহারার তৃতীয় ব্যক্তি রক্তাক্ত লোকটার কাছে পৌঁছে গিয়েছে এবং তাকে দাঁড় করিয়ে হাঁটিয়ে নিয়ে চলে আসছে। লোকটাকে এপারে পৌঁছে দিয়ে উক্ত তৃতীয় ব্যক্তি একটা দোকানের দাওয়ায় বসিয়ে দিয়ে এক বিশেষ প্রিয় কুটুম্ব সম্বোধনে আপ্যায়িত করার সুরে ওকে বলল, 'উজবুগ, এবার আরাম করে চার হাত পা ছড়িয়ে মর।' বলেই সে ভিড়ের মধ্যে হাওয়া হয়ে গেল। সেই জনরণ্যের মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকা অবস্থাতেই

আমার মগজের মধ্যে দুটো লোক ঢুকে গেল। আহত রক্তাক্ত লোকটা আমার মস্তিষ্কের স্নায়ুগুলোকে অবোধ শিশুর মতো আঁকড়ে ধরতে চাইছিল। 'তৃতীয়' ব্যক্তিটি কে হতে পারে এবং কি হতে পারে সেটা ছিল একটা প্রশ্ন, যা আমার মগজে বিদ্ধ হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু যা সচরাচর হয়ে থাকে, এ ক্ষেত্রেও তাই হল। বিবেকে রক্তের ছিটা আর মগজে কৌতুহলের কাঁটা নিয়ে হঠাৎ এক সময় মুখ ফিরিয়ে আমার গন্তব্যের দিকে চলতে আরম্ভ করলাম। ভদ্রলোকেরা যাদের 'বেকার' লোক বলেন, সেরকম কিছু চেহারার মানুষ তখন উদাস দৃষ্টি নিয়ে বসে থাকা আহত লোকটাকে ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে। গাড়িগুলো তখন আবার ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে শুরু করেছে। চাকার ঘর্ষণে মুছে যেতে শুরু করেছে রক্তের দলা। একটা শুকনো পাতা যেন এসে পড়েছিল ঘোলা জলের স্রোতে, সেটা তলিয়ে গিয়েছে, কিংবা উৎক্ষিপ্ত হয়েছে, সে খোঁজ আর চলমান দুনিয়া করছে না। আমিও চলেছি, যেমন দিনান্তে নিশান্তে তেমনি এই মুহূর্তে 'পথের সঞ্চয় পথে ফেলে।' বিবেকে শুধু রক্তের ছিটা লেগেছে, যেটাকে মুছতে পারছি না। মগজে কৌতুহলের কাঁটা, যেটাকে তুলে ফেলতে পারিনি। একটা সৎ কাজ করার মহৎ ইচ্ছা জেগেছিল, কিন্তু ইচ্ছাটাকে কার্যকরী করার জন্য পথের ধূলায় বসতে, রাজি হতে পারিনি। তা' কি করা যাবে? দ্বিধাগ্রস্ত মনকে প্রবোধ দিয়ে পোষ মানিয়ে নেবার ব্যাপারে অব্যস্ত হয়ে উঠেছি। এবার গন্তব্যে পৌঁছে জীবিকার কাজ করতে বসবো। আমার বিবেকটাকে চেয়ারে হাতলে ঝুলিয়ে রেখে দেবো গায়ের কোটটার মতো। টুর্গেনিভের কিংবা শরৎচন্দ্রের এক ধরনের উপন্যাসের নায়কের মতো আমি 'বেকুব' নই যে পল্লীগ্রামের অধিবাসীদের উদ্ধার করতে গিয়ে 'গেঁয়ো' হয়ে যাবো, কিংবা প্লেগের রোগীকে আগলাতে গিয়ে মৃত্যুর ফাঁদে আটকে যাবে। এমন কি, আমি শেক্সপীয়রের হ্যামলেটও নই যে, শেষ পর্যন্ত চাপা ইচ্ছার বিস্ফোরণে নিজেও বিস্ফোরিত হয়ে যাবো।

তবু প্রশ্ন থেকে যায়, চলমান জীবনের রুদ্ধগতির মাঝখানে অগণিত অনামী মানুষ মুহূর্তে লাফিয়ে পড়ে ক্ষতবিক্ষত মানুষকে উদ্ধার করার সঙ্গে সঙ্গে জীবনকে বারংবার গতিষ্মান করে দিচ্ছে। এরা কি কিছুই ভাবে না? আর আমি? আমিও কি কার্যকরী কিছুই করব না কোনদিন?

এটা কি একটা ব্যাপার ঘটে গেল। আমি একটা চলন্ত ভিড়ের মুখে পড়ে গেলাম। সামনে চেয়ে দেখি, সম্মিলিত বিরোধী দলের এক প্রার্থী জয়মাল্য পরে এগিয়ে আসছেন, যেন 'বিবাহে চলিলা বিলোচন।' তাঁকে ঘিরে ধরে চলন করে নিয়ে আসছেন আমার কয়েকজন বন্ধু-স্থানীয় লোক। তারপর একটা কাণ্ড ঘটে গেল হঠাৎ আদরের হেচকা টানে। টেনে নিয়ে আমার কয়েকজন পরিচিত ব্যক্তি আমাকে শামিল করে ফেললেন মিছিলে। ভিড়ের মধ্যে পড়ে বা হাতটা যন্ত্রবৎ বুক পকেটের কলমটাকে রক্ষা করার জন্য উঠে গিয়েছিল। ডান হাতটা বুকের উপর রেখে দেখলাম, হৃৎপিণ্ডটা মোটেই বিবৃত হয়নি। মগজটাতে কোন দ্বন্দ্ব নেই। বাঁ হাতে অনেকগুলো নোংরা হাতের চাপ অনুভব করলাম। তাগিদটা হচ্ছে এই যে, এগিয়ে যাও, বন্ধু, এগিয়ে যাও। একজন বলল, 'আমাদের ছেড়ে কোথায় যাবেন?' নোংরা হাতগুলো স্বেচ্ছাসেবকদের। এবং মেহনতী মানুষদের।

কার্তিক, ১৯৭০।

শিল্পীরা কী খেয়ে বাঁচে

লোকটা বিদেশি নয়।' যেখানে সে বাঁশি বাজাচ্ছে, সে জায়গাটাও বন কিংবা উপবন নয়। লোকটা আমাদের দেশেরই একজন নাগরিক। অবশ্য সর্বহারা নাগরিক। যেখানে সে বাঁশি বাজাচ্ছে, সেটা রাজপথ। এই রাজপথ অবশ্য লোকে লোকারণ্য। এদিক দিয়েই এর সঙ্গে বন-উপবনের যাহোক কিছুটা মিল আছে। এই লোক আর তার বাঁশি নিয়ে কোন গান কিংবা কবিতা লেখা সম্ভব কি? এ-যে বাঁশি বেচে খায়। কাঁধে এর একটা ঝোলা, তাতে একগাদা বাঁশি। এযে বাঁশির কারিগর। যে বাঁশিগুলিকে বেচতে চায়, সেগুলিকেই বাজিয়ে শ্রোতাদের বুঝিয়ে দেয়, এরা কেউ বেসুরো নয়। কখনও হাঁটতে হাঁটতে, কখনও বা রাস্তার জনতার খাঁজে দাঁড়িয়ে লোকটা বাঁশি বাজিয়ে তার খরিদ্দারদের ডাকছে।

দিন কয়েক ধরে এর সঙ্গে আমার দেখা হচ্ছে রোজই। নবাবপুর রাস্তার এক মাথা থেকে আরেক মাথা পর্যন্ত সে যাওয়া-আসা করছে। পরনে একটা ময়লা লুঙ্গি আর ছেঁড়া রঙিন সার্ট। মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি। কিন্তু আশ্চর্য নিখুঁত ওর বাজানোর কায়দা। আশ্চর্য নিখুঁত বাঁশীগুল। ওর আঙ্গুলগুলো যেন যন্ত্র-চালিত চাবি। বাঁশির ফুটোগুলো যেন মেশিনের স্কেলের মাপে ফেলে তৈরি। শুধু কি তাই? পথের খানাখন্দে পড়ে, পথচারীর ঠেলা খেয়ে, রিক্সা আর স্কুটারের ধাক্কা খেয়ে চলেছে লোকটা। কিন্তু বাঁশিকে সে ছাড়ে না। লোকটা যেন নিজেই বাঁশি হয়ে গিয়েছে।

আজ বাঁশিটা যেন ওর ঠোঁটের নিচে স্নায়ু আর শিরার সঙ্গে তন্ত্রীতে তন্ত্রীতে বাঁধা। দিন কয়েকের মধ্যে অনেকবার দেখা হয়েছে বলেই লোকটা তার বিশেষত্ব নিয়ে আমার চোখের সামনে জেগে উঠেছে একটা নতুন বিস্ময়ের মতো।

সম্ভবত এই বিস্ময়ের ঘোর চোখে লেগেছে বলেই, গত রাতে ওর সঙ্গে দেখা হবার ছবিটাকে ভুলতে পারছি না। তখন রাত প্রায় এগারোটা হবে। খবরের কাগজের অফিসের টেলিপ্রিন্টারের ঘর্ঘর আওয়াজে মুখরিত ঘর ছেড়ে রাজপথের অপেক্ষাকৃত কম কোলাহলের মধ্যে নেমে রাস্তার মোড়েই দেখলাম, লোকটা একটা ল্যাম্প পোস্টে হেলান দিয়ে বাঁশি বাজাচ্ছে, কোন খরিদ্দার নেই আশে-পাশে। মুগ্ধ কোন বালক শ্রোতাও ধারে-কাছে নেই। কাঁধের ঝোলাটা বাঁশিতে ভর্তি। দাঁড়ানো ভঙ্গীটা ক্লান্তির। কিন্তু বাঁশিতে চলছে অক্লান্ত আলাপ; পাশের একটা পানের দোকানে সিগারেট কিনবার ছলে দাঁড়ালাম। পানও কিনলাম দু'খিলি। বেশ কিছুক্ষণ ধরে মুখে ভরলাম, চুন নিলাম দুদণ্ড বেশি দাঁড়াবার জন্য।

এই ফাঁকে নিজেকে যে প্রশ্নটা প্রথম করলাম, সেটা এই: আচ্ছা লোকটা কি তাহলে একান্তভাবেই শিল্পী?

প্রশ্নটাকে বৈষয়িকভাবে বিশ্লেষণ করতে গেলে বোধ হয় দাঁড়ায় এই রকম: আচ্ছা, লোকটার সত্যিই কি যোগ্যতা রয়েছে রেডিওতে কিংবা আমাদের চারুকলা প্রতিষ্ঠানগুলোতে স্থান পাবার? একে কি দেশের বাইরে পাঠানো যায় আমাদের সাংস্কৃতিক প্রতিনিধি দলের সঙ্গে? কিন্তু প্রশ্নটা এভাবে বিশ্লেষিত হয়ে আমার মনে জাগেনি। আমার মনে হলো, লোকটা কি আসলে আমদের ফাঁকি দিচ্ছে? বাঁশি বিক্রি

করাটা কি ওর ভান মাত্র? কারিগরিটা আসলে ওর ভলোবাসা? বউ ছেলে মেয়েকে একটা বুঝ দেবার জন্যই ওর পিঠে ঐ ফেরীওয়ালার ঝোলা? অর্থাৎ, সুরই কি ওকে পথে বার করেছে? সুরের পাল্লায় পড়েই কি রাজপথের ঘোলাটে ভিড়ের প্রাবহে খড়ের কুটোর মতো ভেসে ভেসে ঠেকতে ঠেকতে চলেছে তো চলেছেই?

দ্বিতীয় একটা প্রশ্ন আমার প্রথম প্রশ্নের কোমল ভাবটাকে রূঢ় আঘাত করে বসল। আচ্ছা, সারাদিনে যে এর দুচারটে ছাড়া বাঁশি বিক্রি হলো না, এখন ঘরে ফিরে এ লোক নিজেই বা খাবে কি, বউ ছেলে মেয়েকেই বা খাওয়াবে কি?

চায়ের পেয়ালায় তুফান? দ্বিতীয় প্রশ্নটা হাস্যকর হলেও একটা আন্তরিক জবাব আমার তরফ থেকে দেবার চেষ্টা করলাম। একটা আড় বাঁশি কিনে। লোকটা আমাকে বাজিয়ে দেখাতে চাইল যে বাঁশির ফুটোগুলো নিখুঁত। আমি তাকে সে সুযোগ না দিয়ে তাড়াতাড়ি পয়সা দিয়ে রিক্সায় চড়লাম। দেখলাম, কী বিবর্ণ তার ঠোঁট দুটো। যক্ষ্মায় মরবে নাকি?

বাসায় ফিরে বাঁশিটাকে লুকিয়ে রেখে দিয়েছি। বাঁশি তো আর আমার বাজানো হবে না। যৌবনের বাঁশি বাজাবার দিনগুলোকে অনেক পিছনে ফেলে রেখে এসেছি। সে সব দিনকে ফেলে এসেছি যেদিন শিল্পী না হয়েও সুর সাধা যায়। যৌবনের সেই অসঙ্গতিতে পূর্ণ দিনগুলোর কথা মনে পড়লে আপন-মনেই হেসে উঠি। সেই যৌবনে একবার প্রায় একই সঙ্গে কিনেছিলাম 'লেনিনের পত্রাবলি' এবং একটা টিপরাই বাঁশি। লেনিনের একটি চিঠি পড়ে প্রচুর হেসেছিলাম। লেনিন যখন ছাত্র জীবন সমাপ্ত করে ওকালতির খাতায় নাম লিখিয়েছেন, তখন তাঁর এক তরুণ প্রতিবেশী ক্লারিওনেট বাজানো শিখছেন। লেনিন এই শিক্ষানবীশের সাধনার দৌরাত্ম্যেও দুদণ্ড ঘরে বসতে পারতেন না। শিক্ষানবীশের দিগ্‌বিদিক জ্ঞান শূণ্যতা হাস্যকর বৈ কি! আমিও শিক্ষানবীশ ছিলাম। আমার প্রতি লেনিনের প্রচ্ছন্ন সাবধান বাণী সত্ত্বেও আমি আমার নতুন কেনা দুরূহ বাঁশিটিকে বাজাতে চেষ্টা করে বাড়ির লোকজনকে এবং প্রতিবেশীদের অতিষ্ঠ করে তুলেছিলাম। যৌবনের ধর্মই এই? তবে এখন তো এ ধরনে কোন কৈফিয়তে কাজ হবে না। আজ অন্তর্দ্বন্দ্বের সমাধান না করতে পারলে অর্ন্তদ্বন্দ্ব পরিহার করার চেষ্টা করি। বয়স হয়েছে। সুতরাং বাঁশিটাকে কিনে এনেও আমি যে শুধু আমার প্রতিবেশীদের দৃষ্টির বাইরে লুকিয়ে রাখতে চেষ্টা করছি তা নয়, আমার নিজের মনের বাইরেও রাখতে চেষ্টা করেছি। কিন্তু বাঁশিওয়ালাকে এড়িয়ে যেতে পারছি না।

আজও আসবার সময় দেখেছি, বাঁশিওয়ালা রাস্তার একটা খাঁজে দাঁড়িয়ে বাঁশি বাজাচ্ছে। পিঠের উপর ঝোলা। বাঁশিতে ভর্তি। ভাল করে চেয়ে দেখতে গিয়ে মনে হলো, শ্যাওলা পড়ে গিয়েছে যেন ওর গায়ে। আসতে আসতে মনের মধ্যে খচ্ খচ করতে লাগলো গত রাতের ছবিটা আর প্রশ্ন। লোকটা কি শিল্পী? কাল কিছু পেটে পড়েছে কি ওর? ওরা কী খেয়ে বাঁচে? এই শিল্পীরা?

কার্তিক, ১৩৭০।

চাপা নির্ঝর

ছেলেবেলায় যখন চোং লাগানো গ্রামোফোনের সামনে বসে কাদের মল্লিক, রাঁইচাদ বড়াল কিংবা অমলা দাসের গান শুনতাম, তখন গানের চেয়েও এবং গানের মানুষের

চেয়েও আমাকে আকৃষ্ট বেশি করত এর বিজ্ঞান। চল্লিশ বছর আগেকার কথা। তখনও রেডিও'র প্রচলন হয়নি। সুতরাং গ্রামোফোনের পিন থকে শুরু করে দম দেবার হাতলটা পর্যন্ত সবই ছিল সন্তর্পণে স্পর্শ করে দেখার বস্তু। যদিও তখন গানের শেষে সময় মতো পিন তুলে না নিতে পারলে রেকর্ড ফেটে যেতে পারত, তবু মনে হতো , রেকর্ড যে তৈরি করেছে সে বিজ্ঞানের শেষ কথাটি জানে। শুধু একটা আক্ষেপ ছিল। রেকর্ডের পরিসরকে কেন এরা বাড়িয়ে দেয় না? কাজী নজরুল ইসলামের একজন নবীন বয়সী ভক্ত হিসাবে তাঁর 'নারী' কবিতা আবৃত্তি আমার খুবই প্রিয় ছিল বলেই বোধ হয় কবিতাটিকে রেকর্ডের দু'পিঠে দু'ভাগ করাতে আমি কিছুটা ক্ষুব্ধ হয়েছিলাম।

কিন্তু এরপরে যখন দীর্ঘকাল চলার রেকর্ড তৈরি হলো, তখন কৌতূহলের ধারা অন্যদিকে বয়ে গিয়েছে। তখন গানের চেয়েও বেশি মুগ্ধ করতে শুরু করেছে গানের মানুষগুল। বিজ্ঞান, শীতের নদীর মতো পায়ের কাছ থেকে অনেক দূরে সরে গিয়েছে। চলার পথের দু'পাশে মানুষের মেলা বসেছে সেদিন। বাস্তবের জাগ্রত জনতা আর কল্পনার প্রেয়সীরা। সেদিনকার রেডিও'র ভূতুড়ে কাণ্ডকারখানাটাও আমাকে আকৃষ্ট করতে পারেনি। মনে আছে, কলেজের পদার্থ বিজ্ঞানের একজন কৃতবিদ্য অধ্যাপকের কথা। তিনি তাঁর বিশ্রামকক্ষে একটা রেডিও বসিয়েছিলেন নিজের হাতে তৈরি করে। কানে টেলিফোনের মতো চোং লাগিয়ে শুনতে হতো। আমরা ছাত্ররা তাঁর কাছে কোন কাজে গেলে তিনি আমাদের বেতার বিদ্যা বুঝিয়ে দেবার জন্য দু'চার মিনিট বক্তৃতা দিয়ে আমাদের এককজনের কানে একেকবার চোংটা লগিয়ে দিতেন। মনে হতো তুফানের মধ্যে বসে কারা যেন গান গাইবার কিংবা সেতার বাজাবার বৃথা চেষ্টা করছেন।

বিব্রত হয়ে অধ্যাপকের হাতে চোঙটা দিলে তিনি প্রথমে হেসে বলতেন, 'মহাসিন্ধুর ওপার হতে কী সংগীত ঐ ভেসে আসে।' তারপর চোঙটা কানে দিয়ে অস্ফুট সেতারের টুংটাং এর তালে মুখ নাড়তেন। আমাদের অধ্যাপকের এই আতিশয্যে কিছুটা আক্ষেপ অনুভব করলেও তাঁকেই নতুন করে বুঝতে চেষ্টা করতাম। মানুষটা কী রকম? এই কৃতি পুরুষের যৌবনের দিনগুলি সম্বন্ধে আমরা ছাত্ররা এমন কিছু শুনেছিলাম, যাকে আমরা মনে করতাম একমাত্র উপন্যাসেই পাওয়া যেতে পারে। শুনেছিলাম, তিনি যখন বি.এস.সি. ক্লাশের একজন ডাকসাইটে ছাত্র, তখন প্রেমে পড়ে যান এক সহপাঠিনীর সঙ্গে। কিন্তু হয়তো তাঁর মনে হয়েছিল যে, বিজ্ঞানের গণিতের সিঁড়ি বেয়ে উঠে চাঁদ ধরতে তিনি পারবেন না। তাই শেষ পর্যন্ত ক্ল্যারিওনেটের সাধনা শুরু করলেন সুরের সিঁড়ি তৈরি করার জন্য। শেষ পর্যন্ত এই সিঁড়ি তিনি রচনা করলেন পুরীর সমুদ্র তীরে, যেখানে তার অণিষ্টা হাওয়া পরিবর্তনের জন্য গিয়েছলেন। যাঁকে তিনি চাইছিলেন, এই তিতিক্ষা দ্বারা তাঁকে পেয়েছিলেন অবশ্য, কিন্তু বি.এস.সি. পরীক্ষায় কোনক্রমে উত্তীর্ণ হতে পেরেছিলেন মাত্র। পরে অবশ্য আবার বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বশেষ পরীক্ষায় শীর্ষস্থান অধিকার করেছিলেন এবং অধ্যাপনার জীবনে ছাত্রদের কাছে তিনি হয়েছিলেন একটি জ্ঞানের চুম্বক। দৈনন্দিন জীবনের এককোণে অনেক অনেক পাথর চাপা পড়েছিল তাঁর যৌবনের সেই উন্মাদনাময় দিনগুলির উপর। আমাদের অনেকে এই পাথরগুলিতে মাথা ঠেকাতো শ্রদ্ধায়। আমি কিন্তু শুনতে পেতাম এইসব পাথরের স্তূপের নিচে চাপা পড়া নির্ঝরিণীর গান। মুগ্ধের মতো অধ্যাপকের দিকে

তাকিয়ে থাকতাম। অধ্যাপকের গলা যাদিও ক্ল্যারিওনট বাজানো দরুন কর্কশ হয়ে গিয়েছিল, তবু মনে হতো তিনি একটি গানের মানুষ, সুরের মানুষ। এই কারণেই কি বেতার যন্ত্রটা আমার কৌতূহলকে আকর্ষণ করতে পারেনি?

আজকের ট্রানজিস্টারের যুগেও কি একথা বলতে পারব?

যে বাসায় আমার এখন আস্তানা তার একটি সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দিয়ে আমি জবাবটা খুঁজবো। যে বাড়িটাতে আমি ভাড়াটে, সেখানে গত পাঁচ বছর ধরে আছি। মাঝখানে স্থানান্তরে যেতে হয়েছিল হাওয়া বদলাতে। সে অন্যকথা। আমাদের বাড়িটাতে লাইট নেই। অর্থাৎ বিজলী বাতির ব্যবস্থা নেই। জানি, এই স্বীকারোক্তির দরুন আমাকে সামান্যতম প্রতিষ্ঠাবান লেখক হিসাবেও অনেকে মেনে নিতে চাইবেন না। তবু আজকের লেখাটাকে মানানসই করার জন্যই এই তথ্য ফাঁস করে দিতে হল। যাই হোক। যেহেতু বিজলী বাতির তার নেই, সেজন্য আমাদের রাস্তার মোড়ে পানের দোকানে রেডিও থাকলেও আমাদের বাড়িতে কোন দিন রেডিওর ট্যা ফ্যাঁ শোনা যায়নি। এই কারণেই গত শ্রাবণ মাসে এক বরিষণ-বিহ্বল রাত্রিতে অফিস থকে পদব্রজে ফিরে যখন ভিজে বিড়ালের মতো বাসায় ঢুকছি, তখন পাশের ঘরে রেডিওর গান শুনে অবাক হয়ে গেলাম। বিস্ময়ের ঘোরটা অবশ্য দুএক পলকেই কেটে গেল। বুঝলাম, পাশের ঘরের ভাড়াটেরা একটা ট্রানজিস্টার রেডিও নিয়ে এসেছেন।

ঢাকা শহরের জনাকীর্ণ পথে চলতে চলতে পাশের লোকটির হাতের চলন্ত টানজিস্টারের ফিসফিসানি শুনে আজ আর অবাক হই না। কিন্তু তবু শুকনো কাপড়-জামা পরে একটু আয়েস করে বসে একটা সিগারেট ধরাতে যাচ্ছি, এমন সময় মনে হলো, ট্রানজিস্টার যন্ত্রটা একটা জায়গায় দুটো হয়ে গেছে। বিস্মিত হয়ে উপরের দিকে তাকাতেই মনে হলো, ছাদটা অনেকখানি উঁচুতে উঠে গিয়ে আলো-বাতাসহীন বৃদ্ধ বাড়িটাকে রূপকথার রহস্যপুরীতে পরিণত করেছে। আমার বিস্ময়ের কারণটা খানিক পরে বুঝলাম। ট্রানজিস্টার একটাই। তবে ট্রানজিস্টারে যে রেকর্ডের গান হচ্ছিল, তার সঙ্গে গলা মিলিয়ে গান করছিলেন প্রতিবেশির গৃহিণী। বেশ কয়েকটি ছেলেমেয়ের মা। সংসারের ঝঞ্ঝাটে পড়ে বেশ কিছুটা কলহপরায়না। কোন দিন শুনিনি তাঁকে গান করতে, একমাত্র ঘুমপাড়ানীর ভাঙা ভাঙা গান ছাড়া। শ্রাবণ রজনীতে আমাকে বিস্মিত করে দিলেন এই মহিলা এই কারণে যে, সমস্ত গানই তাঁর মুখস্থ। সুর ও শব্দ সবই। কোথায় চাপা পড়েছিল এই সুরের নির্ঝর?

সেই রাত্রিতে একা একা ঘরে বসে ভেবেছিলাম, আমি কি শরৎচন্দ্র হতে পারি? কাব্যের উপেক্ষিতদের মহিমাময়ীর মর্যাদায় অভিষিক্ত করার জন্য কলম ধরতে পারব?

কার্তিক, ১৩৭০।

আশ্চর্য

যে নদীস্রোত সমুদ্রের দিকে ধাবমান, তাতেও গভীর গহ্বরের মধ্যে মাঝে মাঝে ঘূর্ণিপাক আছে। যে বায়ুমণ্ডল নিঃসীম নীলিমায় উধাও হয়ে গিয়েছে, তাতেও মাঝে মাঝে অদৃশ্য গহ্বর আছে। আর যে মানুষের মন সংসারের পথে চলতে চলতে যুদ্ধের

ট্যাঙ্কের মতো দুর্দমনীয় হয়ে চলেছে, সেও মাঝে মাঝে এমন আচমকা ভাবের খাদে পড়ে যায় যে, মনের অধিকারী মানুষটা রীতিমত জখম হয়ে পড়ে থাকে বেশ কিছুক্ষণ। সুতরাং আমার মনটাও যে মাঝে মাঝে খামাখা খারাপ হয়ে যাবে, এতে আর অনন্যসাধারণত্ব কি থাকতে পারে?

সুতরাং দিন কয়েক আগে একটি উজ্জ্বল সকালে হাসিমুখ নিয়ে বাসা থেকে বেরিয়ে, সারাদিন চারপাশের কাজকর্মের লোকজনের মধ্যে খুশির তরঙ্গ তুলে দিয়ে, বিকাল বেলার দিকে ছিমছাম হয়ে আবার বাসা থেকে বেরিয়ে আসবার সময় আয়নার দিকে তাকিয়ে মনে হলো আমার চোখে-মুখে অব্যক্ত যন্ত্রণা। নিজেই বেশ খানিকটা অবাক হয়ে গেলাম। একবার ভাবলাম, মুখটা ভাল করে তোয়ালে দিয়ে রগড়ানো হয়নি। কিন্তু তোয়ালেটা দিয়ে মুখটাকে ভাল করে রগড়াবার পর মনে হলো, যন্ত্রণার চিহ্নটা যেন আরও ছড়িয়ে পড়ল। বুঝতে পারলাম, কিছু করার নেই। মনটা চলতে চলতে হোঁচট খেয়েছে অদৃশ্য কোন খাদে। একবার দ্বিধা-দ্বন্দ্ব এলো মনে। এই আহত মনটাকে আর যন্ত্রণাবিদ্ধ মুখটাকে নিয়ে সংসারের পথে এই মুহূর্তে বেরিয়ে পড়া কি যুক্তিসঙ্গত হবে? এখন কি একলা থাকাটাই বুদ্ধিমানের কাজ নয়? কিন্তু এই দ্বিধাকে জয় করলাম। একটা সভায় যাবার কথা ছিল; কথাটা রাখলাম। কিন্তু সেখানে পৌঁছবার পরে যার সঙ্গেই দেখা হলো সে-ই বলল, আমাকে খুব প্রদীপ্ত দেখাচ্ছে। এবার আরও বেশি বিস্মিত হলাম। ভেবেছিলাম, আয়নায় দেখা যন্ত্রণার্ত মুখের দিকে তাকিয়ে কেউ যদি কোন প্রশ্ন করে, তবে তাকে মনের অপ্রত্যাশিত দুর্ঘটনার কথাটা বুঝিয়ে বলতে গিয়ে বেশ বড় গোছের একটা বক্তব্য দাঁড় করিয়ে বসবো। কিন্তু সে সুযোগ পেলাম না। ঠিক করে উঠতে পারলাম না, ওরা আমার মুখের দীপ্তির কারণ জিজ্ঞাসা করলে কি ব্যাখ্যা দেব। পরে বাসায় ফেরার সময় মনে হলো, যে দীপের তেল ফুরিয়ে যায়, তার বুকের সলতেটা শেষজ্বলা জ্বলবার সময় বড় বেশি প্রদীপ্ত হয়ে ওঠে না কি! হঠাৎ মৃত্যুর কথা মনে পড়ল। সে রাত্রে কম্বলটা মুখের উপর টেনে নিয়ে যখন শীতের নিঝুম আর দীর্ঘ রাত্রির অস্থির ঘুমের স্রোতে নিজেকে ভাসিয়ে দিলাম, তখন মাঝে মাঝে চমকে উঠে ঠাহর করতে চেষ্টা করলাম যে, বেঁচে আছি কিনা।

পরদিন সন্ধ্যায় সংবাদপত্রের অফিসে টেলিপ্রিন্টারে এলো একটি মৃত্যু সংবাদ। তার দুদিন পরে আরও একটি। তারপরে আরও একটি। প্রত্যেকটি মৃত্যু একটি অভাবের গহ্বর তৈরি করেছে। হঠাৎ আমার ম্রিয়মান মন রুখে উঠল। ক্রুদ্ধ হয়ে দুর্দমনীয় হয়ে উঠল। বলে উঠলো, এই গহ্বরকে আমি মানবোনা। একে ভরে দেব আমার প্রাণতরঙ্গ দিয়ে-মনে হলো এই মৃত্যু জীবনের প্রতি আহ্বান। যৌবনে এমনিভাবেই মৃত্যুর আহ্বান শুনেছিলাম-আমার জীবনে লভিয়া জীবন জাগরে সকল দেশ। আজকের মৃত্যুর তরঙ্গও ব্যর্থ হবে? চারপাশের হাহাকারের এবং নৈরাশ্যবাদী টিপ্পনীর ঘূর্ণিপাককে ছাড়িয়ে মনটা হঠাৎ সমস্ত বিমর্ষতাকে কাটিয়ে উঠেছে।

অগ্রাণ, ১৩৭০।

শীতের ফুল

আমাদের শহরের ধূলি ধূসরিত রাজপথে যদিও আশেপাশের ড্রেনের ফাটলগুলিতে পর্যন্ত এককণা ঘাসের অস্তিত্ব নেই, তবু এই মৌসুমে ফুলের অভাব নেই। জানি, পৌষের কুহেলিকামুক্ত ভোরের সূর্যের আলোর স্পর্শ পেয়ে অতসী, গাঁদা আর চন্দ্রমল্লিকারা হীরার স্তবকের মতো ঝলমল করে হাসছে, প্রতিদিন কোথাও না কোথাও আমাদের পাশেপাশেই। আর মাটির নিচে লক্ষ লক্ষ ফুলের বীজ বুকের মধ্যে প্রাণের কনাকে কামড়ে ধরে পড়ে আছে মুখ গুঁজে বসন্তের ইশারার জন্য। ফুলের জীবনের এও একটা সংগ্রামী পর্ব নিশ্চয়। সংগ্রাম শুধু মাটি ফুড়ে নিজেকে জাহির করা নয়, সংগ্রাম নিজেকে প্রকাশ করার জন্য প্রস্তুতিও বটে। রাজপথের পাশের ঐযে বীভৎস ফাটলটা ঠেলাগাড়ির চাকার ঘর্ষণে ঘর্ষণে নাস্তানাবুদ হয়ে রয়েছে, ওরই কোন অঙ্গে একরতি পরিমাণ মৃত্তিকায় অণুপরিমাণ ঘাসের বীজ অপেক্ষা করছে সেদিনের জন্য, সেদিন সে দেবদারুর স্পর্ধা নিয়ে সূর্যের দিকে হাত বাড়াবে, ফুল ফোটাবে, তারপর উত্তর পুরুষের জন্য বীজ বুনেও রেখে যাবে। আজকের সে অতসী, গাঁদা আর চন্দ্রমল্লিকারা দীর্ঘ রাত্রির জন্য নিস্প্রভ ছোট ছোট দিনগুলির কাছ থেকে উত্তাপ কেড়ে রাখছে। এই ডানপিটে ফুলগুলোর তুলনায় এ ঘাসের বীজগুলোর গোয়ার্তুমি কম একরোখা নয়। পার্থক্য একটা আছে, তবে সেটা এই যে; কেউ সংগ্রামের আদি পর্বে, কেউ পরবর্তী একটা পর্বে। কিন্তু আজকের এ অতসী, গাঁদা আর চন্দ্রমল্লিকা কিংবা ঘাসের বীজ এদের কেউই আমার নিত্যকার চলার পথের পাশে নেই, আমার চোখে নেই, আমার বাতায়নে নেই। এরা শুধু রয়েছে আমার স্মৃতিতে, আমার চেতনায় সংগ্রামী সহযাত্রীর তাগিদের কাঁটা হয়ে বিঁধে রয়েছে। এই বোবা কিংবা অদেখা ঘাসগুলোই আমার জীবনপথের চড়াইতে উতরাইতে কোন কোন নৈরাশ্য-পীড়িত মুহূর্তে ওদের শরীরের তুলনায় হস্তী-সদৃশ আমার শরীরের ও মস্তিষ্কের দুর্বহ ভার ও মূঢ়তা দেখে বিস্মিত হয়েছে, বিরক্ত হয়েছে। ওরা মুখর হলে আমাকে খোলাখুলি তিরস্কার করত নিশ্চয়। তবু মনে আছে, নৈরাশ্যের মুহূর্তে ওদের প্রচ্ছন্ন ও অপ্রচ্ছন্ন জীবন সংগ্রামের দিকে তাকিয়ে ওদের চাপা তিরস্কারের অঞ্জন চোখে লাগিয়ে নিয়েছিলাম। সে অঞ্জন আজও মুছে যায়নি।

আশ্চর্য! মনে হয়, যদি আজকালকার একটা বিশ্বদর্শনের ফ্যাশানের তাগিদে কোন অসতর্ক মুহূর্তে মৃত্যু ও ব্যর্থতাকে জীবনের কষ্টিপাথর বলে মনে করি, যদি দেহ জ্বরবিকারে আক্রান্ত না হলে নিজেকে প্রাণহীন মনে করি, তাহলে ফুলের দল আমাকে ধিক্কার দেবে। স্কটল্যান্ডের মেহনতী কবি রবার্ট বর্ণিস জমিতে লাঙ্গল চালাতে গিয়ে একটা খুঁদে ফুলকে মাটির বুক থেকে উপড়ে ফেলে যে লজ্জায় পড়েছিলেন আমি তারচেয়ে বেশি লজ্জিত হই আমার হতাশ্বাসে ভরা মুখের দিকে একটা অতসী ফুলকে ভ্রূভঙ্গী করে তাকাতে দেখার কথা মনে এনে।

এই শীতের সন্ধ্যাতেও ফুলের কথাই ভাবছি, যদিও কোন ফুল আশেপাশে নেই। কারণ আশেপাশে অনেক খেদোক্তি শুনছি। এমন সব লোকেরও খেদোক্তি শুনছি, যাদের গলায় গত শীতে জনতার দেওয়া সাদা ফুলের মালা আজও রক্ষিত রয়েছে সযতনে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের নিভৃত নিকেতনে।

পৌষ, ১৩৭০।

নারকেলের চিত্রিত বরফি

আমাদের বাসা বাড়িটার অনেক অংশীদার। পরিবারের কলরব আমার দোতলার কক্ষটির দরজায় করাঘাত করে। কিন্তু বৃহৎ আস্ত মানুষেরা সাধারণত আমাকে এড়িয়ে চলে। কিছু খুদে অতিথি আছে, যারা অনাহূত হয়েও বারবার হানা দিয়ে আসছে আমার ঘরে সিগারেটের বাক্সের রাংতার জন্যে, পুরানো সাপ্তাহিকগুলোর ছবির জন্যে, কিংবা তাদের পরস্পরকে আমার কাছে বোকা বানানোর জন্যে এবং অনেক সময় সকলে মিলে কোন আজগুবি প্রশ্ন করে আমাকে বোকা বানিয়ে উচ্চহাস্যে আমাদের বাসা-বাড়ির দালনটাকে মুখরিত করে তোলার জন্যে। এদের মধ্যেই একটা হাবলা গোবলা মেয়ে আমাকে দেখিয়েছিল, সে শ্লেটে অ আ ক খ লিখতে শিখছে। বছরের হিসাব আমি করিনি। গতকাল নজরে পড়ল, সে একটা ছোটদের স্কুলের বেশ সপ্রতিভ ছাত্রীতে পরিণত হয়েছে। ও আর আমার ঘরে হানা দেয়না। হানা দেয় ওর ছোট বোনটা, যেটা নারকেলের চিত্রিত বরফির মতো একই ছাঁচে ঢালা। এই জন্য হয়তো কোনটা যে আসছে, আর কোনটা সে আসা বন্ধ করেছে, সে হিসাব করা আমার পক্ষে সম্ভব হয় না। হঠাৎ সপ্রতিভ অপেক্ষাকৃত বড় বোনটির চোখে মুখে দেখলাম ব্যক্তিত্বের প্রত্যূষের আধো আধো আভা। কাঁধের উপর মাথাটা একটু উদ্ধত কায়দায় টুপি পরার মতো করে স্থাপিত। যদিও অনেক দেখে দেখে জেনেছি যে, সংসারের যাঁতাকলে এবং দুরাশার ঘূর্ণচক্রে পড়ে ব্যক্তিত্বের কুঁড়ি ফুল হয়ে না ফুটতেই শুকিয়ে ঝুনো হয়ে যায়, তবু এই প্রত্যূষের আভা আমাকে বারবার বিস্মিত ও অভিনন্দিত করে। জীবন পথে চলতে চলতে কর্মক্ষেত্রে আরও অনেক ব্যাপারে বারবার প্রত্যূষের আলোছায়াটুকু দেখি বলেই বোধ হয়, আমার মনটা পরিচিত যে কোন ব্যক্তিও ব্যক্তিত্বের প্রত্যূষটাকে দ্বিধাহীনচিত্তে স্বাগত জানায়। আজও তাই করলাম। স্কুলে যাবার জন্যে ও সেজেগুঁজে ছিমছাম হয়ে তৈরি হয়েছে। পরনে একটা নীল রং-এর কাজিম আর সাদা সালোয়ার। এই পোশাক ওর একজোড়া আছে। মনে পড়ে যায়, প্রায়ই দেখি একটা নীল কামিজ আর সাদা সালোয়ার ছাদের আলসেতে মেলে দেয়া থাকে। মেয়েটি হয়তো পড়া মুখস্থের চেয়ে এই পরিধেয়কে পরিপাটি রাখার জন্য কম সচেষ্ট নয়। আজও ওর পরনের পোশাক ষোলআনা পরিপাটি। যত্নের ছাপ সুস্পষ্ট। এই যত্ন কি ওর ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে সদাজাগ্রত চেতনার উপকরণ?

ওর ডাক পড়ল মিনতি, মিনতি। সিঁড়ির নিচে স্কুলের সঙ্গিনীদের ভিড়। ও তরতর করে নেমে চলে গেল। নামটাতে প্রশ্ন উঠবে, হিন্দু না মুসলিম? সমস্যা আজকাল, ডাকনামটা শুনে বুঝবার উপায় নেই হিন্দু না মুসলিম। কিন্তু আমি এর মধ্যে যাবো না, কারণ আমি কাজী নজরুল ইসলামের কবিতার অগ্নিমালার একজন উত্তরাধিকারী হিসাবে একালের নতুনতর তোরণে পৌঁছে বলতে শিখেছি, "কাণ্ডারি বলো জাগিছে মানুষ, সন্তান মোর মার।"

আর, আজকাল ঢাকা শহরে বাসস্থান সমস্যার দরুনও হিন্দু-মুসলমান একই বাসাবাড়ির বটবৃক্ষের বিভিন্ন খোপে শরিক হতে শুরু করেছে। সুতরাং আমি মিনতির ব্যক্তিত্বটুকু ছাড়া আর কোন পরিচয়ে যাবো না। আমার মনে ওর ব্যক্তিত্বটাই প্রতিবিম্ব

ফেলেছে। আমার শত সমস্যা-জর্জরিত মনের প্রায় বিবর্ণ ও ধোঁয়াটে আয়নাটাতেও এটা ভালভাবেই ধরা পড়েছে। আর, ওর প্রতিচ্ছবিটাকেই সামনে রেখে আমি গত সপ্তাহের শহরের পথের কয়েকটা দৃশ্যকে মনের মধ্যে উল্টে পাল্টে দেখছি। মনে পড়ছে, দ্রুত কয়েকটা মুখ আমার সামনে দিয়ে চলে গিয়েছে। ওরা স্কুলে ভর্তি হবার ছেলে এবং মেয়েরা। পরীক্ষা দেবে। উদ্বিগ্ন মুখ। কিন্তু একটা নতুন দিগন্তে পৌঁছবারও চিহ্ন ইতোমধ্যেই এই সব মুখে ফুটে উঠেছে; ওরা এক ছাঁচের জামার খোলসে ঢুকতে চায় সানন্দে। কিন্তু হয়তো এই জন্যই যে, ওদের উচ্চ শির মুক্ত থাকবে, খোলা থাকবে, খুঁজে নেবে নিজের নিজের আকাশ। এটাই কি আমাদের এই শতাব্দির দ্বিতীয়ার্ধের প্রতিশ্রুতি নয়?

পৌষ, ১৩৭০।

সকালের রোদে পায়রা

প্রথমটাতে অট্টহাস্যে হেসেছিলাম। মনে মনে বলেছিলাম, সাহিত্য করার সখ যদি হয়ে থাকে, তবে বেনামীতে কেন? আর, শুধু বেনামীতে নয়, জনৈকা অন্তঃপুরবাসিনী আত্মীয়ার নামে কেন? কিন্তু মুখে বলিনি। কারণ এক বান্ডিল লেখা ঠিকঠাক করে দেবার জন্য আমার যে পরিচিত লোকটি অসংকোচে আমার হাতে তুলে দিয়েছিল, আমি জানি সে চেষ্টা করলে লিখতে পারে; কিন্তু চেষ্টা করলেও অপরের নামের আড়ালে যেতে পারে না। পরে লেখাগুলির উপরে চোখ বুলাতে বুলাতে মনে হলো, এদের বক্তব্যের সমস্ত আড়ষ্টতাকে ছাপিয়ে উঠতে চাইছে আমাদের দেশের নারীসত্তার একটি প্রতিভু। দারিদ্র্যের জ্বালা আর অভিশাপকে লেখাগুলিতে সহানুভূতি দিয়ে কমনীয় করে তোলা হয়েছে। তাতে এ সিদ্ধান্তে পৌঁছতেই হবে যে, এর পিছনে রয়েছে একটি মাতৃসত্তা। সুতরাং আমি আমার পরিচিত ব্যক্তিটিকে বললাম, আচ্ছা, ঠিক আছে, আমি দেখে দেব। কিন্তু সে যখন লেখাগুলো, পরম নির্ভরতার সঙ্গে সঁপে দিয়ে চলে গেলো, তখন আমি নিজেকে তিরস্কার করতে বসলাম। আমি সর্বপ্রথম নিজের মনকে যে প্রশ্ন করলাম সেটা এই যে, আমার কি অধিকার আছে, অন্যের লেখাকে 'পদস্থ' করবার? লেখাগুলো যার কলম থেকে বেরিয়ে এসেছে, একমাত্র তারই পক্ষে সম্ভব এই লেখাকে নবগুণে গুণান্বিত করা। কারণ, যে কোন সৃজনাত্মক লেখার মূলমর্ম হচ্ছে অভিজ্ঞতা। সে অভিজ্ঞতা কোথাও নিকষিত হেম হতে পারে, কোথাও ধাতব মৃত্তিকার চাঙ। কিন্তু অভিজ্ঞতা নিশ্চয়। অশ্রুতে, দুশ্চিন্তায়, আনন্দে, উল্লাসে, সংঘাতে অর্ন্তদ্বন্দ্বে এই অভিজ্ঞতা লালিত হয়ে উত্তরিত হয়ে থাকে সাহিত্যে। এই লেখাটিতেও সেটাই ঘটেছে। এই মেয়েটি কিংবা বধূটি কিংবা জননীটি আমাকে সেভাবে কোন অনুরোধ করেনি, যেভাবে রবীন্দ্রনাথের 'সাধারণ মেয়ে' শরৎচন্দ্রকে একটি সাধারণ মেয়ের গল্প লিখতে বলেছিল। বরং, আমাকে এই অবগুণ্ঠিত সাধারণ মেয়েটি লেখা পাঠিয়ে বলেছে, আমি গল্প লিখেছি আমার এবং আমার চোখে দেখা জগৎ সম্পর্কে। এর স্বীকৃতি চাই। এর কমা সেমিকোলন বদলানো ছাড়া আমি যদি কোন নতুন ছাঁচে ঢালতে যাই, সেটা কি ধৃষ্টতা হবে না? বড় দোটানায় ফেলে দিল এই লেখাগুল। তবু মাস্টারির অভ্যাস মতো

কিছু রদবদল করে শেষ পর্যন্ত লেখাগুলো উক্ত পরিচিত ব্যক্তির হাতে তুলে দিয়েছি দিনকয়েক আগে।

এই মাস্টারি করার দ্বিমনা ভাবটাকে কিন্তু মন থেকে বরখাস্ত করে দিতে পারিনি। আজ সকালে আমাদের বাসার অশান্ত শিশুদের দাপাদাপি থেকে আমার ঘরের সামান্য আসবাবপত্র বাঁচাবার জন্য আমি যখন দরজা ভেজিয়ে বসে বসে নিদারুন গম্ভীর হয়ে একটি অভিধানের পাতা উল্টাচ্ছিলাম, তখন আবার অন্য দিক দিয়ে একটা প্রশ্নের তাড়নাকে ঠেকাতে হচ্ছিল। বিজ্ঞতার ভান করে কি প্রাণের তরঙ্গকে ঠেকিয়ে রাখা যায়? এ জীবনে অন্যের কাঁধে চড়ে ভবসাগর পার হবার জন্য মরিয়া লোক ছাড়া, সবাইকেই পানিতে নামতে হবে, পাঁকে পা দিতে হবে, অভিজ্ঞতায় জর্জ্জরিত হতে হবে, অভিজ্ঞতায় সঞ্জীবিত হতে হবে। জীবনকে কি কেউ বাইরে রাখতে পারে? জীবনের বাইরে কি কেউ থাকতে পারে? আমরা হয়তো বলতে পারি যে, আমাদের একেক জনের জীবন হচ্ছে একেক জোড়া রেল-লাইন। সমন্তরাল, সংকীর্ণ, বিচ্ছিন্ন। কিন্তু ধরিত্রীকে কি করে বিচ্ছিন্ন করব? আমাদের সবার জীবন যে এক সূত্রে গাঁথা। একজনের অভিজ্ঞতাকে কি আরেকজন এড়িয়ে যাবো?

শীতের সকালের রোদ আমাকে বাইরে ডাকছে, আবজালো দরজার ফাঁক দিয়ে ঘরে স্তিমিত আলোয় একটা অগ্নিতরঙ্গ খেলে গেল। বাইরে একটা পায়রা বসে রোদে পাখা ঝাপটাচ্ছে।

পৌষ, ১৩৭০।

চ্যালা কাঠ আর চিকন চুড়ি

শহরের পথে যখন আস্ত আস্ত কাঠের গুঁড়িতে বোঝাই করা ট্রাকগুলো পথচারীদের গা ঘেসে চলে যায় তখন হয়তো অনেকেরই ফিরে যেতে ইচ্ছা করে মানব সভ্যতার আরণ্যক যুগে। অরণ্য সেদিন মানুষের শত্রুতা করেছিল কিন্তু তার প্রাণবন্ত রূপ মানুষকে মোহমুগ্ধও করেছিল। আজ আমরা তাকে শহরে দেখতে পাই ছিন্ন ভিন্ন মৃতদেহের মতো, যারা নিস্প্রাণ বলেই বোধ হয় লোহার চেয়ে ভারি হয়ে ট্রাকগুলোকে ট্যাঙ্কের মতো ভীষণ-দর্শন করে তোলে। এই চলন্ত ট্রাকগুলোর স্টিয়ারিং হুইল ধরে যারা বসে থাকে, তাদের দিকে তাকিয়ে মাঝে মাঝে বিস্মৃত হয়ে যাই। অতিরিক্ত মেহনতের প্রয়োজন পড়ে এই কাঠের গুঁড়িতে বোঝাই ট্রাক চালাতে। ড্রাইভারের দুটো হাতের দিকে তাকিয়ে মনে হয়, সমস্ত বোঝাটা তার কাঁধের উপরে। সে যেন বোঝা কাঁধে নিয়ে একটা চড়াই বেয়ে উপরে এক পা দু'পা করে করে উঠছে। হয়তো আমার এই সপ্রশংস ভাবের মূলে রয়েছে পথ চলতে চলতে প্রাণে বাঁচবার তাগিদ। ঢাকা শহরের যানবাহনে পরিপূর্ণ ও পথচারীতে আকীর্ণ রাজপথে যে ফাঁকটুকু পাওয়া যায় ড্রেনের ধার দিয়ে চলার, সেখানে একটি মাত্র কামনা উদগ্র হয়ে উঠতে পারে। ঐ ট্রাকের ড্রাইভাররা বিশ্ববাহী হোক, ওদের হাত ইস্পাতের হাতে পরিণত হোক। রাজপথে রক্তের লেখা দেখতে চাই না, চাই না। যখন কাঠের গুঁড়িতে বোঝাই একটা ট্রাক বিসর্পিল গতিতে রিক্সা, ঠেলাগাড়ি আর স্কুটারগুলোকে পাশ কাটিয়ে অনেক দূরের তারার মতো মিলিয়ে যায়, তখন বাহবা না দিয়ে পারি না।

হয়তো এর আরেকটা কারণ এই যে, মেহনতের ভারাক্রান্ত দিকটার প্রতি আরও অন্যান্য উপকরণের সঙ্গে আধুনিক বাঙলা কবিতাও আমাকে কিছুটা পক্ষপাতি করে তুলেছে। একটা কবিতার বাকি সবটাই ভুলে গিয়েছি। মনে আছে শুধু একটা লাইন, "যারা পথ কাটে, গাড়ি টানে, তাড়ি খায়, গায় সারি গান, তাহাদের গান।" মেহনতের স্থূলতার প্রতি বিন্দুমাত্র বিরূপ হলে এই লাইনটা আমাকে যেন একটা চাবুকের আঘাতে সজাগ করে দেয়। হয়তো এই কারণেই অতিরিক্ত ভারি দুধের বালতি মাথায় নিয়ে যখন বাহকেরা নবাবপুর রোডে আমার পিছনে হাঁক দেয়, 'খবরদার', তখন আমি তাদের সামনে পথ ছেড়ে দেই। ছেলেবেলায় পঠিত বিখ্যাত নীতিকথার সুরে সুর মিলিয়ে বলি, তোমার প্রয়োজন আমার প্রয়োজনের চেয়ে বড়। বাহকের ঠিক পিছনে চলার যদি সুযোগ পাই ক্ষাণিকক্ষণ, তাহলে বিস্মিত দৃষ্টিতে তার মাথাটার দিকে তাকিয়ে থেকে ভাবি, ওর মগজেও কি পেশী আছে?

আজ সকালে নবাবপুরের রাস্তা দিয়ে চলতে চলতে হঠাৎ দেখি পথের উপর অনেকখানি জায়গায় দুধ গড়িয়ে গিয়েছে। হয়তো বাহকের মাথাটার পক্ষে দুধের বালতিটা বেশি ভারি হয়ে গিয়েছিল। হয়তো আমার মতো কোনো সুশীল পথিককে সে তার সামনে পায়নি। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবছি একথা। এমন সময় অদ্ভুত একটা ব্যাপার চোখে পড়ল। কয়েকজন প্রবীণা রাস্তার অন্য ধার দিয়ে চলছিল। তারা রাস্তার খাঁজে খাঁজে দুধ জমে থাকতে দেখে এই ধারে ছুটে এসে ফাঁটা ফাঁটা পা-গুলোকে সেই দুধে ভর্তি খাঁজগুলোতে এমনভাবে ঘষতে লাগল যেন ওষুধ লাগাচ্ছে। হঠাৎ চমকে গেলাম। এই প্রবীণারাও মেহনতী। তাই হয়তো এতো অসংকোচ?

আরও এগিয়ে যেতেই নজরে পড়ল তারা, যাদের পাশ দিয়ে রোজ যাওয়া আসা করি। এরা বাজারের কাঠের গোলাগুলোতে কাঠ ফাঁড়ে। এদের দেহগুলোও যেন কাঠের গুড়ি। এদের পেশীবহুল হাতের কুঠার বিদ্যুতের বেগে ইস্পাতের মতো কাঠের গুড়িগুলোকে নিমেষে ছিন্নভিন্ন করে ফেলে। এই মেহনত একেবারেই ভারি মেহনত। এই মেহনত সংগীতের কোন সহযোগিতা যেন অবান্তর। শুধু একটা তীব্র হেচকি বেরিয়ে আসে কুঠারের প্রতিটা প্রক্ষেপের সঙ্গে সঙ্গে।

আজ আরও একটি দৃশ্য নজরে পড়ল। একটি মহিলা পাঁজা করা চ্যালাকাঠ থেকে বেছে বেছে তুলছেন পাল্লার উপর শুকনো চিকন লাকড়ি। হাতে তাঁর গোছা গোছা চিকন চিকন কাঁচের চুড়ি। হাসতে পারলামনা কিন্তু। কারণ উনুনে ফুঁ দিয়ে যারা বর্ষাকালের ভিজে কাঠে আগুন ধরায়, তাদের কি করে সৌখিন মনে করব?

ফাল্গুন, ১৩৭০।

ঝড়ের মৌসুমে

ঢাকা শহরের রাজপথে এবং বিশষ করে পুরনো শহরের অপ্রশস্ত রাজপথে চলতে চলতে মাঝে মাঝে ঠেকে যেতে হয়। মনে হয় তরল লোকস্রোত হঠাৎ জমে বরফ হয়ে গিয়েছে। শুধু দূরে কোথাও একটা আবর্ত। কোন সময়ে এই আবর্তের কেন্দ্রে পৌঁছে

দেখা যায়, যে কারণে পায়ে হাঁটা পথচারী জনতার গতিরোধ ঘটেছিল, তার কোন নাম নিশানা নেই। কোন সময় দেখা যায়, রক্তের দাগ। ভারি ভারি ট্রাকগুলো দিনে প্রায় একজন পথচারীর রক্ত পান করে। সেই রক্তই উপচে পড়েচে। কোন সময়ে দেখা যায়, স্কুটার চালক আর রিক্সা ড্রাইভারের মল্লযুদ্ধের তৃতীয় পর্ব তখনও চলছে, অর্থাৎ ভবিষ্যতের মোকাবিলার ঘোষণার আদান-প্রদান। কখনও বিলীন হয়ে যাওয়া আবর্তের জায়গাটিতে পৌঁছে দেখি, এ যে সেই ঢাকা শহরের বহুপরিচিত কোন কুষ্ঠরোগী, যাকে দেখে লোকস্রোত থমকে দাঁড়াবার পরিবর্তে বরং ছিটকেই বেরিয়ে যায়। কিন্তু হয়তো গ্রাম্য কোন দল তাকে পয়সা দেবার জন্য দাঁড়িয়েছে, আর ব্রেক কষে দিয়েছে লোকস্রোতে। যে কারণেই হোক, থমকে দাঁড়িয়ে যাওয়া সারিবদ্ধ লোকের কোন এক খাঁজে দাঁড়িয়ে কৌতুহল জাগে কারণটাকে জানবার। কিন্তু ঐ কৌতুহল পর্যন্তই। আরো অনেক কৌতুহলী পথচারীর মতো ঘটনাস্থলের কাছে পৌঁছে সারসপাখির মতো গলা বাড়িয়ে দেখতে রীতিতে বাঁধে। ইদানিং আমি বিভীষিকাগ্রস্তও বৈকি! নিজে চোখে দেখিনি। কিন্তু যা শুনেছি, তাতেই সে দৃশ্যের পুনরাবৃত্তি আমি বোধ হয় সহ্য করতে পারব না। শুনেছি, একটি বালিকা গাড়ি চাপা পড়ে একেবারে খণ্ড বিখণ্ড হয়ে গিয়েছে। এই খামোখা মৃত্যু মানুষের জীবনের মূল্যকে অর্থহীন করে দিয়েছিল কিছু দিনের জন্য। যদিও নৈরাশ্যবাদী আধুনিক দার্শনিকদের খাতায় নাম লেখাইনি, তবু এই রক্তাক্ত বালিকার ফরিয়াদ ভরা মুখ দেখবো দুচোখ মেলে, সে সাহস আমার নেই। কারণ, সারাজীবনের ফরিয়াদে পরিপূর্ণ গজিয়ে যাওয়া অশ্রুর পাত্রে একটি তরতাজা বালিকার মৃতদেহের কান্না তুলে নিয়ে নিরুপায় হয়ে বসে থাকবো কি করে? অথচ, বসে থাকা ছাড়া উপায় কি আছে? আমি একজন চিত্রশিল্পীও নই যে তার রক্তের রং-এ তুলি ডুবিয়ে নিয়ে তাকে অমর করে রেখে দেব এই ঢাকা শহরের কোন চিত্র-কক্ষে। আমি তাই 'সাবধানী পথিক?'

সেদিন কিন্তু কিছুটা আনমনা হয়ে গিয়েছিলাম। থমকে দাঁড়িয়ে যাওয়া জনতা আবার চলতে শুরু করেছিল। আবর্তের জায়গাটিতে গিয়ে দেখলাম, অনেকটা জায়গায় পানি গভীর হয়ে জমে গিয়েছে। পথের বাকি অংশেও পানি। কিন্তু অগভীর। হেঁটে যাওয়া যেতে পারে, কিন্তু খালি পায়ে যেতে হবে। থমকে দাঁড়াতে হলো জরিপ করার জন্যে। ইতস্তত করছি, দেখলাম, আমার পিছনে যারা ছিল, তাদের অনেকেই পানির মধ্য দিয়ে ছপ ছপ করে হেঁটে চলে গেল। ওরা নগ্নপদ। আমি ক্রমশই পিছনে পড়ে যেতে লাগলাম। ভদ্রতা আমাকে প্রখরভাবে উপস্থিত আবর্তের কারণকে নিয়ে ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়ল। শেষকালে কয়েকজন সতীর্থ খুঁজে পেলাম এবং এদেরই একজনের নেতৃত্বে একটা সরু গলির মধ্যে ঢুকে খানিকটা হেঁটে পানিতে পা না দিয়েই আবার রাজপথে পড়লাম। কিন্তু এই গলিতেই হুমড়ি খেয়ে পথ জুড়ে পড়েছিল একটা গাছের ডাল। ঢাকা শহরের ইটের স্তূপের মধ্যেই উঠানের ধারে অনেক গাছ আছে যারা অদৃশ্য বলেই বোধ হয়, ঝড়ের নাগালে পড়ে না। কিন্তু এ ডালটা পড়েছিল পরশু দিনের চৈতালি ঝড়ে। তবু আশ্চর্য সজীব মনে হলো এই বিচ্ছিন্ন শাখাকে। বসন্তের রোদ খেয়ে খেয়ে উজ্জ্বল সবুজ-এর পাতাগুলি মনে হলো যেন খিল খিল করে হাসছে। চৈতালি

বৃষ্টির প্রচণ্ড কিন্তু ক্ষণস্থায়ী ঝরণা ধারায় এর প্রাণচঞ্চলতা যেন আরও বেড়ে গিয়েছে। এর স্পর্শে নোংরা গলিটার মধ্যেও নিজেকে নতুনভাবে জীয়ন্ত বোধ করলাম। ভাবলাম, যদি শিল্পী হতাম, তবে এই ভাঙ্গা ডালটার সবুজ হাসিতে তুলি ডুবিয়ে একে চিরস্থায়ী করে রেখে দিতাম ঢাকা শহরের কোন চিত্র-কক্ষে। পরদিন সকালে মিউনিসিপ্যালিটির পুতিগন্ধময় কাঠের গাড়িটাতে করে এর কঙ্কালটা অপসারিত হলেও এর প্রাণের কিশলয়গুলি থেকে যেতো আমার ছবিতে।

কিন্তু এর কথাও শেষ পর্যন্ত মনে রইলো না। ধীরে ধীরে মনে জেগে উঠলো একটা বোধ। এটা ঝড়ের মৌসুম।

চৈত্র, ১৩৭০।

আইসক্রীমের রং

ভরা জৈষ্ঠ্যের ভোরের সূর্যটা দেখতে দেখতে ভেসে উঠল। রাত্রির গুমোট আর দিনের অগ্নিকুণ্ডের মাঝখানে প্রত্যূষের স্নিগ্ধ মুহূর্তগুলির নাম নিশানা খুঁজে পাওয়া যায় না। বেল ফুলগুলিকে দেখেই শুধু অবাক লাগে। মানুষ না হয়ে ফুল হলে মন্দ হতো না। চা খেতে গিয়ে চা খানায় বসলে, পাখার ধারে কাছে ঘেষা যায় না। সেখানে যেসব লোক ভিড় জমিয়ে বসে থাকে, তাদের দিকে তাকিয়ে মনে হয়, এই মাত্র কুস্তি কিংবা সারেগামার তালিম দিয়ে এসেছে। রাস্তায় চলতে গিয়ে পূর্ব কিনারের ছায়ার ফালিটুকুর জন্য ঘেষাঘেষি করতে হয়, স্বদাক্ত হতে হয়। মাথাটা বেরিয়ে আসে রোদের হালকায়। বুদ্ধিজীবীর এই একটি মাত্র সম্বলকে বেশিক্ষণ তাতানো যায় না।

সুতরাং প্রশ্ন? কী হলো আমার কিংবা পারিপার্শ্বিকের, কিংবা সূর্যের? আরও প্রশ্ন? আধুনিক বিজ্ঞানীরা যেমন আলকাতরা থেকে সুগন্ধি বার করে আনেন, তেমন করেই কি এর আগে কাঁঠাল পাকানো জৈষ্ঠ্যের সকালের কাছ থেকে মাধুর্য নিংড়ে নিতে পারতাম? কিন্তু আজ আর পারি না?

জীবনের সকাল তো দুবার আসবেনা জানি। কিন্তু পাখি ডাকা সকাল তো বারবার এসেছে। পাখিরা হয়তো গাছের গায়ের গন্ধ পায় দূর থেকে। তা না হলে আমাদের জীর্ণ দালানের আঙ্গিনায় লুকিয়ে থাকা বেলগাছটাতে হলুদ রং-এর কুটুম পাখি আর পেটে লাল রং-এর টিপ আঁকা বুলবুলি এসেছে কি করে? এদের কাকলিতে ভর্তি সকাল এসেছে বারবার। কারাগারেও এসেছে। কিন্তু আজ যে ঊষার থালি থেকে শিশিরের ফোঁটা তুলে নিতে পারি না। সকালের সূর্যের দাহ থেকে মাথাটাকে বাঁচাতে চাই। এতে কি প্রমাণিত হয় যে, সকাল আর সেভাবে আসে না? কিংবা দোষটা আমারই?

হাফ-বৈজ্ঞানিকের মতো আজ হয়তো আমি প্রকৃতির উপর দোষ চাপিয়ে দিতে পারি। বলতে পারি, পৃথিবীর মেরুদণ্ডটা এদিক ওদিক দুলছে। শীতের সময় বেশি শীত, গরমের সময় বেশি গরম কিংবা আমাদের দেশের ঘূর্ণিবাতাসের প্রকোপে অতিষ্ঠ আমলাতন্ত্রের ঘুরন্ত উক্তির মতো আমার মুখ থেকে বেরিয়ে আসতে পারে, ব্রিটিশ আমলে এ বালাই ছিলনা। কিন্তু মুস্কিল হলো এই যে, নিজের কাছে হাফ বৈজ্ঞানিক

বলে দাখিল করার মুখ আমার নেই। আর আমলাতন্ত্রের ধারে কাছেও ঘেষা যায় না আজকাল। সুতরাং পাখি ডাকা এবারের সকালও যে রোগীর মুখে মিষ্টির মতো বিস্বাদ লাগছে, তার দায়িত্ব পুরোপুরি আমারই নিশ্চয়।

গতকাল দুপুরে একটা আড্ডা থেকে বেরিয়ে মনে হলো, সমস্ত আকাশটাতে যেন আগুন লেগে গিয়েছে। বৃষ্টিতে এক ধরনের জীব যেমন মাথা নীচু করে করে এগিয়ে চলে সেভাবেই চলছিলাম। রোদে নাকি মাথার চুল কাঁচা রাখে। অবশ্য এ চিন্তা মাথায় ছিলনা। জ্বলন্ত উনুনের উপর রাখা কেটলীর পানির মতো মাথাটা চন্ চন্ করছিল। পথ জনশূন্য। বাসও আসছে অনেক পরে পরে। কিন্তু এক জায়গায় দাঁড়াতে হল। একটা মাল বোঝাই ঠেলাগাড়ি আড় করে পথের মাঝখানে রাখা। এর চালক দুজন রৌদ্রতপ্ত পথের উপরেই গ্যাঁট হয়ে বসেছে। ওরা ছেলে মানুষের মতো রঙ্গীন আইসক্রীমের উপর ধারালো জিহ্বা বুলিয়ে যাচ্ছে। আমাকে দেখে পথ রোধের জবাবাদিহির জন্যই যেন হো হো করে হেসে উঠল। একজন বলল, এক ধার দিয়ে চইলা যান।

ওদের ছাড়িয়ে চলে আসতে আসতে কয়েকবার ফিরে তাকালাম। দেখলাম, ওদের জিহ্বাগুলি আইসক্রীমের রংকে ফিকে করে এনেছে।

জ্যৈষ্ঠ, ১৩৭১।

আলোর পিপাসা

ব্যাপারটা 'ঘরেতে ভ্রমর এলো গুনগুনিয়ে'র মতো নয়। একটা পোকা ঢুকেছে ঘরের মধ্যে। একটা বাঘা পোকা। নিঃশব্দ। কিন্তু বারবার লাফ দিয়ে তোলপাড় করে তুলেছে ঘরটাকে। হয়তো টেবিলের উপর বাতিটাই ওর এই চঞ্চলতার কেন্দ্র। কিন্তু বুঝবার উপায় নেই। ওর দুটো ভাটার মতো ঠেলে বেরিয়ে আসা চোখ কটমট করে যখন আমার দিকে চাইছে, তখন আমার মনে হচ্ছে, আমিই বোধহয় ওর লক্ষ্য। অর্থাৎ আমাকে ঘর থেকে বিতাড়িত করাই যেন ওর লক্ষ্য।

অনেক কায়দা করে ওকে জানালা দিয়ে ঘর থেকে বিতাড়িত করে নিশ্চিন্ত হয়ে বসলাম। কিন্তু তারপরেই মনে হলো, আর কয়েকদিন পরে ও আর একা আসবে না। আসবে দল বেঁধে। আজ যেমন ঐ ভীষণ দর্শন উড়চিঙ্গেটা জানালার বাইরে নিঃসীম অন্ধকারে মিলিয়ে গেলো, তখন তা' করবে না। আলোর পিপাসা ওকে বারবার টেনে আনবে ঝলক দেওয়া জানালাটায়। হয়তো ও আসবে না। আসবে আর একটা। কিন্তু মনে হবে আরেকটা নয়। দলের মধ্যে মিশে আসবে।

আর' কয়েকদিন পরেই বর্ষা শুরু হয়ে যাবে। মেঘ ভেঙ্গে পড়বে আকাশ থেকে। তখন মাঠে প্রান্তরে মাটির ফাটল থেকে লক্ষ লক্ষ পোকা বেরিয়ে আসবে। হাজার কিসিমের। কোনটা মখমলের জামা গায়ে। কোনটা সবুজ পত্রপুটের মতো। আগামী চারমাস ওরা প্রতিরাত্রিতে এই ইটকাঠের শহরের ঘরে ঘরে হানা দেবে। তারপর হেমন্তের শিশির-ধোঁয়া রাতে ওরা ঝাঁকে ঝাঁকে জমা হয়ে উড়বে রাস্তার আলোর চারদিকে, ঘরের আলোর চারদিকে। সেটা হবে ওদের উৎসব। তারপর শীতের সঙ্গে সঙ্গে ওরা হয় মরবে, নয়তো অদৃশ্য হয়ে যাবে মাটির ফাটলে ফাটলে। শুধু মাঠের পথে

সন্ধ্যায় ঝিঁ ঝিঁ পোকার একটানা গান মনে করিয়ে দেবে, ওদের মৃত্যু নেই। আলো ছাড়াও ওরা বাঁচতে পারে।

আর ঘুম ভাঙ্গার মৌসুম হলেই ওরা আলোর দিকে ছোটে। দলে দলে জমা হয়। উৎসব করে। মরে। ওরা বাঁচার মতো চেষ্টা করে বাঁচে এবং মরে।

তবু ওরা আমাদের মতো নয়। অর্থাৎ মানুষের মতো নয় নিশ্চয়। আলোর জন্য ওদের পিপাসা আছে, কিন্তু ওরা নিজেরা কোনদিন আলো জ্বালাতে পারে না। লক্ষ লক্ষ বছর চলে গিয়েছে, তবু ওরা পারেনি আলো জ্বালাতে। আরও একদিক দিয়ে আমাদের সঙ্গে ওদের অমিল আছে। জীব-বিজ্ঞানীরা বলেন, ওরা যে দল বেঁধে ঝাঁকে ঝাঁকে আলোর চারদিকে জমা হয়, সেখানে আলোর প্রতি ওদের কোন সমষ্টিগত সামগ্রিক আকর্ষণ নেই। আলোর সঙ্গে ওদের প্রত্যেকের সম্পর্ক পৃথক, একক ওরা ধেয়ে আসে আলো দিকে নিজ নিজ টানে। ভিড়ের মধ্যে আলোর পিয়াসী ওরা একক। ওরা নিছক প্রবৃত্তি চালিত। চেতনার বালাই নেই ওদের। বিজ্ঞানীরা ওদের দিকে এই জন্যই করুণার দৃষ্টিতে তাকান।

কিন্তু আমরা আমাদের মানব সভ্যতার তিন লাখ বছরে নিছক প্রবৃত্তিগত তাড়নাকে ছাড়িয়ে আালোর জন্য সমষ্টিগত পিপাসার চেতনায় কতটুকু উঠতে পেরেছি? মাঝে মাঝে তো মনে হয়, সভ্যতার তৈলাক্ত খুঁটিটাকে বেয়ে বেয়ে আমরা উপরের দিকে যত উঠছি, তার চেয়ে বেশি নেমে যাচ্ছি। আমরা কি আমাদের আলোর উৎসবকে পুরোপুরি সমষ্টিগত করার ব্যাপারে সচেতন থাকি? এই সচেতনাকে বারবার কাজে লাগাই আমাদের পরস্পরের জীবনে?

যদি তাই করতাম, তবে কেন আলো আর বই সামনে নিয়ে মনে হয়, ঐ ভীষণ দর্শন পোকাটার মতো আমিও নিঃসীম অন্ধকারে হারিয়ে যেতে পারি?

আষাঢ়, ১৩৭১।

পাখি সুন্দর কোথায়

'ফুল সুন্দর, কিন্তু ক্ষণস্থায়ী'। বাসি ফুলের মালা দেখে, তাতে ফুলের দুর্দশা দেখে, কত কাঠখোট্টা মানুষকেও এই কথা বলে দুঃখ করতে শুনেছি। আমি নিজে একথা ভেবে মাঝে মাঝে বিষণ্ন হয়ে উঠলেও ফুলের দুদণ্ডের জীবনের আর একটা দিক দেখে মনটাকে আনন্দিত করে তুলতে চেষ্টা করছি। ফুল ক্ষণস্থায়ী ঠিকই, কিন্তু সে ক্ষণস্থায়ী যখন সে একক। তাকে তরঙ্গে তরঙ্গে দেখলে সে অমর। চিরকালের জন্য সে ফুল কুসুমিত। হয়তো এ কথা ভেবেই টেবিলে ফুলদানিতে ফুল রাখি না। এক রাশ ফুলকে তাদের অমরতার মালা থেকে ছিনিয়ে এনে প্রিয়জনের গলার মালা করে পরানোর কল্পনা করতেও আমার বিবেকে বাঁধে। মনে হয়, এর চেয়ে জংলী মানুষের হাড়ের মালায় অনেক বেশি প্রাণের আভা। ফুল সুন্দর, সে মৃত্যুহীনও। কিন্তু আমার টেবিলে নয়। প্রিয়জনের কণ্ঠেও নয়। সে মৃত্যুহীন বাইরে, ভিড়ের মধ্যে, বহুর মধ্যে পথে পথে, বিপথে বিপথে। তাকে এইরূপে পেতে হলে অবশ্য বাইরে যেতে হয়।

হয়তো মনটা নানান কারণের মধ্যে এই কারণেও বহির্মুখী হয়ে বসে আছে। ঘরমুখো মানুষকে বুঝতে পারি না পুরোপুরি, একই কারণে। বিশেষ করে ঘরমুখো মানুষ যখন নিত্য নতুন ফুল যোগাড় করতে না পেরে একদিন সুদূরপ্রসারী সিদ্ধান্ত করে বসে কাগজের ফুল দিয়ে ঘর সাজাবার, তখন তাকে আরও বুঝতে পারি না। কিংবা সত্য কথা বললে বলতে হয়, মনে হয় ঐ ঘরমুখো মানুষগুলো কৃপার পাত্র। কারণ, ফুলকে সে নকল অমরতা দিতে চেষ্টা করে আত্মপ্রতারণা করছে। ঘরমুখো মানুষগুলো কি আসলে আত্মপ্রতারক? স্বভাবের সূর্যকে জীবন থেকে নির্বাসিত করে কৃত্রিমতার অন্ধকার বিবরে প্রবেশ করে বিজলি বাতি জ্বেলে বসে থাকতে চায়?

তবু একথাটাও তো স্বীকার করতে হবে যে, আমার মতের বাইরে অনেক লোক আছে। অনেক অনেক। কারণ, ঢাকা শহরেই দেখছি, মালাকরের ব্যবসা বেশ কিছুকাল আগে উঠে গেলেও ডেকরেটরের ব্যবসা বেশ ফলাও হয়েই গজিয়ে উঠেছে। আমাদের পুরানো শহরে অলিতে গলিতে আজ হঠাৎ হঠাৎ ডেকরেটরের দোকান চোখে পড়ে। চোখে পড়ে রঙ্গীন কাগজের ফুলে বোঝাই হয়ে আছে ছোট দোকানগুল। এবং ক্রেতারা শিশু নয়। ক্রেতারা সাবালক, বয়স্ক, প্রবীণ এবং তারা কেনে নিজের নিজের রুচি অনুযায়ী। এরা অনেকেই অতিথি অভ্যাগতের বসবার ঘরে খালি টেবিলে ফুলদানি বসাবার জায়গা করতে পেরেছে বলেই কাগজের ফুল কিনে নিয়ে যায়।

সুতরাং আমি হয়তো 'বাহিরে বহুর মাঝে জড়িত হৃদয়' নিয়েও ভবিষ্যতে একঘরে হয়ে যাবো। ডেকরেটরের দোকানের দিকে আমি সেই দৃষ্টিতে তাকাই, যে দৃষ্টিতে জামদানী শাড়ির কারিগর তাকায় নাইলনের শাড়ির দোকানের দিকে। মাঝে মাঝে মনে হয় আমি আমার ফুলের সজীব জগৎ সমেত নির্বাসিত, পরাজিত, একক।

ডেকরেটরের দোকানের দিকে এই করণেই হিংসুকের দৃষ্টিতে তাকাই কোন কোন সময়। খুটে খুটে দেখি।

গতকাল একটা আশ্চর্য জিনিস চোখে পড়ল। দেখলাম, একটা পাখির ডানা, পালক, লেজ, ঠোঁট সব ঠিকই আছে। হলুদ পাখাগুলোও অবিকল রয়ে গিয়েছে। কিন্তু বুঝে পারা গেল, ওটা কৃত্রিম। একটা কাঠের টুকরোর উপর ওর পা দুটো আটকানো। পেটের মধ্যে সম্ভবত খড়। চোখ দুটো কাঁচের। বহুত মেহনত করতে হয়েছে, সুতরাং দাম ধরেছে বেশি। তবু পড়ে থাকবে না, ক্রেতা জুটে যাবে। শিশু নয়, প্রাপ্ত-বয়স্ক উঠতি গৃহস্থই কিনে নিয়ে যাবে, নতুন কেনা ফার্নিচারের সঙ্গে খাপ খাইয়ে সাজাবে। ভিড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে ভাল করে দেখলাম এই নকল পাখিটাকে। এখনও ভুলতে পারছিনা ওটাকে।

পাখি সুন্দর, কিন্তু আকাশে। একথা লোকে আজও বলে। এর পরেও বলবে?

আষাঢ়, ১৩৭১।

পিছুপড়া

আষাঢ়ের আকাশে রংধনু। রংধনু দেখতে আরও অনেকের মতো আমার ভালো লাগে। কিন্তু জানি না, উজ্জ্বল সাতরঙা আলোর ধনুকটার পাশাপাশি ধীরে ধীরে জেগে ওঠা

দ্বিতীয় রঙিন ধনুকটা কার মনে কিভাবে দোলা দেয়। ওকে দেখে মায়া হয়। জানি দুটোই ভঙ্গুর। কিন্তু তবু প্রথমটাতে দেখে মনে হয়, ও আনন্দের প্রতীক। দ্বিতীয়টাকে দেখে মনে হয়, ও দুঃখী, তাই ওর মুখে মলিন হাসি। ওরা সমান্তরাল হয়েও সামনে পিছনে পড়ে গিয়েছে।

ওরা যেন একাধিক ঔপন্যাসিকের চোখে দেখা দুই বোন। দুটি কিশোরী। পাশাপাশি দাঁড়ালে হঠাৎ এদের পার্থক্য ধরা পড়ে না। কিন্তু মুখের হাসি দেখলেই বুঝতে পারা যায়, সৌন্দর্যের জগতে এদের একজন পিছনে পড়ে গিয়েছে। মলিন হাসিটি দেখলেই বুঝতে পারা যায়, এ হাসি যার, সে জানে সে পরাজিতা। হয়তো নিস্প্রভ রামধনুটার মতোই এই পরাজিতার জন্য মায়া লাগে।

কিন্তু আকাশের ঐ রংধনুর জুড়ি কিংবা একাধিক উপন্যাসের দুই ভগ্নী পাশাপাশি আমাদের শহরের দুটো রাস্তার পার্থক্য আমার মনে ইদানিং বেশি দাগ কাটছে। কারণ বোধ হয় এই যে, এই দুটো রাস্তা আমার প্রতিদিনের যাওয়া আসার পথ। দুটো রাস্তার দুই পাশে ছোট বড় দোকান আর মাঝে মাঝে বাসাবাড়ি। এমনিতে কাঠামোর দিক থেকে পার্থক্য নেই। দুটোই পুরানো শহরের ঘিঞ্জি রাস্তা। গত ষোল বছরে লোক চলাচল একই অনুপাতে বেড়েছে। কিন্তু একটা পিছনে পড়ে গিয়েছে। রাত্রিতে ওর দোকানে দোকানে নিওন বাতি জ্বলে না। কিংবা দিন অথবা রাত্রিতে ওর বুকের উপর দিয়ে ফ্যাশানের স্রোত বয়ে যায় না। ছাত্র কিংবা মজুরের মিছিলও ওকে এড়িয়ে যায়। দুটো রাস্তা তাই সমান্তরাল হলেও ওদের একটা হেরে গিয়েছে। হয়তো এই জন্যই যখন এই পথে চলি, তখন ওকে দেখে মায়া লাগে। সুতরাং রিক্সাওয়ালা যখন বিজয়ী পথে না গিয়ে পরাজিত পথে গাড়ি চালায়, তখন আপত্তি করি না।

এখানে স্বীকার করব যে, পিছনে পড়ে যাওয়া পথটার প্রতি আমার এই সহানুভূতিতে সৌখিনতা আছে। এই পথ আমার সহানুভূতিকে বাস্তবের কষ্টিপাথরে যাচাই করবার জন্য পীড়াপীড়ি করেনি কোন দিন। আমিও আমার সহানুভূতিকে রেখেছি একটা নীতিগত আদর্শের মতো বুকে পুষে। একে নিয়ে তর্কের ঝড় তুলতে পারি, কিন্তু নিয়ন বাতির আকর্ষণকেও মন থেকে মুছে ফেলে দিতে পারি না। সুতরাং আমার এই অনুরাগকে বলা যেতে পারে ভাববাদী ভালবাসা।

তবু মাঝে মাঝে এই রাস্তা দিয়ে চলতে চলতে মনে ইচ্ছা জাগে এই রাস্তাটাকে আরও ভাল করে বুঝি, গভীরতর করে জানি। মাঝে মাঝে প্রশ্ন জাগে, এ কি চিরকালের জন্য পরাজিত?

গতকালের কথাই বলি। বর্ষার জল আর কাদাকে সন্তর্পণে এড়িয়ে পথ চলছিলাম। দুটো কাঠের ফলক যেন চোখে বিঁধে গেল। দেখলাম, দুটোতেই সতর্কবাণী উৎকীর্ণ। ইংরাজিতে লেখা। একটাতে লেখা 'আস্তা গাড়ি চালাও'। আরেকটাতে শুধু লেখা 'স্কুল', তবে সঙ্গে এক ধাবমান বালকের ছবি। এই সাইনবোর্ড দুটো দেখে এক সারি ছবি চলে গেলো চোখের সামনে দিয়ে।

দোকানঘরগুলোর পিছনে নিশ্চয় কোথাও স্কুল রয়েছে। ছুটির ঘণ্টা বাজলেই দলে দলে ছেলেমেয়ে বেরিয়ে আসে দাপাদাপি করে। এই রাস্তাটায় পাহাড়ী নদীর বন্যার মতো নিমিষের জন্য একটা জীবনের ঢল নেমে আসে। কিন্তু এই প্রাণ-বন্যার চেয়েও

যে কথাটা আমার মনে বড় হয়ে জেগে উঠলো, সেটা হলো, প্রাণের মূল্য সম্বন্ধে এই রাস্তার কোন মানুষের কিংবা কোন একদল মানুষের উদ্বেগের সহজ সরল অভিব্যক্তির কথা। শিশুদের জন্য দরদকে তাঁরা বুকের মধ্যে পুষে রাখেননি। তাঁরা সেই দরদকে একটি প্রতিরোধে রূপায়িত করেছেন। সামান্য হলেও তা' অসামান্য।

এ ছবিকে মনের মধ্যে জমিয়ে রেখেছি। ইংরেজিতে লেখা হলেও আমি এই সাইনবোর্ডের উদ্যোক্তাদের ক্ষমা করতে রাজি আছি। মাইকেল তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ লিখেছিলেন ইংরেজিতে। কিন্তু তাতে সেই বিদ্রোহী মানস ছিল যা শেষ পর্যন্ত মাতৃভাষায় নিজের সার্থকতাকে খুঁজে পেয়েছিল।

আষাঢ়, ১৩৭১।

দুটো ধূমকেতুর ধাক্কা

আমাদের এক বন্ধু আছে। সে ময়লা পায়জামার উপর টেরেলিনের সার্ট পরে কিংবা কেতাদুরস্ত স্যুট পরে পায়ে ছেঁড়া কেড্‌স চাপিয়ে শুধু রাজদ্বারে কিংবা ব্যসনের নয়, উৎসবেও হাজির হয়ে আমাদের বিব্রত করে তোলে। কিন্তু তার সঙ্গে তর্ক করা সম্ভব নয়। সে আমাদের আঁতে ঘা দিয়ে কথা বলে। তার বক্তব্য এই যে, আমাদের নিজেদের এবং পারিপার্শ্বিকের দিকে ভাল করে তাকিয়ে দেখলেই দেখতে পাব, সবকিছুতে রয়েছে বেমিল কিংবা গোঁজামিল। তাকে অবশ্য বিশ্বনিন্দুক বলাটা ঠিক হবে না। কারণ, তার গায়ে সজারুর কাঁটা নেই। বরং উল্টো। সে দুনিয়ার বারোয়ারীতে নিশ্চিহ্ন হয়ে মিশে যেতে পাারে কিংবা অচেনা অজানাকে আপনার করে নিতে পারে। লেজকাটা শিয়ালের গল্পের সঙ্গে তার চরিত কথার মিল এই যে, তার দৃঢ় প্রত্যয়, তার তথাকথিত লেজটা কাটা, সুতরাং ঢাক ঢাক গুড় গুড় করে লাভ নেই। গল্পের সঙ্গে অমিল এই যে, সে মনে করে, সমস্ত শিয়ালের লেজ কাটা। সুতরাং অন্য সকলের লেজ কাটাবার জন্য সে ফন্দি-ফিকির করে না। এটা হয়তো তার মতিভ্রম। কিন্তু সে বেঁচেছে এইদিক থেকে যে বন্ধু-বান্ধবদের অসঙ্গতি দেখে সে ঘৃণা করে না। আমাদেরও এদিক দিয়ে বাঁচিয়েছে অবশ্য।

কিন্তু একটা ব্যাপারে সে আক্রমণাত্মক ভূমিকা গ্রহণ করে থাকে। বর্ষাকালে পূর্ব বাংলার নদীগুলি এলোমেলো হয়ে পড়লে সে ক্ষেপে যায়। সে আমাদের দেশের চলতি উন্নয়ন পরিকল্পনার বেঢপ প্রয়োগকার্য দেখে যেসব মন্তব্য করে, সেগুলো শ্রুতিসুখকর নয়। আর যেহেতু আমাদের এই বন্ধুটি ঢাকা শহরের বাসিন্দা, সেজন্য এর সাম্প্রতিক সম্প্রসারণে যে অসঙ্গতি গড়ে উঠছে, তাতে সে ক্রুদ্ধ মন্তব্য করে থাকে। মাঝে মাঝে তার মন্তব্য শোনা যায়, এই শহরে বাসকরাকালীন সে পোশাক-পরিচ্ছদের অসঙ্গতি তো ঘোচাবেই না, বরং ভবিষ্যতে আরও উদ্ভট কিছু করে বসতে পারে।

কিন্তু আমাদের বন্ধু-বান্ধবদের মধ্যে চাঁদের উল্টো পিঠও আছে এবং সোভিয়েত বিজ্ঞানীরা চাঁদ ডিঙানো লুনিক পাঠাবার আগেই এই উল্টো পিঠ আমাদের চোখে জাজ্জ্বল্যমান। অর্থাৎ আমাদের আরেক বন্ধু আছে যে অতীতে কি রকম ছিল মনে নেই, আজ সাংঘাতিক কেতাদুরস্ত। তার পরিচ্ছদে পান থেকে চুন খসতে পারে না। সে

মুস্কিল করে এই যে, আমাদের ঘরোয়া আড্ডাতেও এমনভাবে সাজ-পোশাক পরে এসে হাজির হয় যে, আমরা বলি, 'হাওয়াই সফরে পিন্ডি যাচ্চ নাকি?' বলি, 'একটু সহজ হও ভাই। একটু বেমিল হোক না একদিন। ক্ষতি কি? দেখছো না চারপাশে?' কিন্তু তার বক্তব্য এই যে, আস্তে আস্তে সব ঠিক হয়ে যাবে। সুতরাং উতলা হয়ে লাভ নেই। তবু চাঁদের দুদিকটাই অর্ধ বৃত্তাকার। অর্থাৎ এদিক দিয়ে অবিন্যস্ত বন্ধুর সঙ্গে আমাদের সুবিন্যস্ত বন্ধু সবসময়েই সৌহার্দ্য বজায় রেখে চলছে। হয়তো উভয়ে উভয়ের আয়না। উভয়েই শুধুমাত্র নিজেকে দেখে অপরের মধ্যে। আমাদের অধিকাংশ মুস্কিল কিন্তু এই যে, আমরা অধিকাংশই নিজেকে ছেড়ে অন্যের গরমিল এবং গোঁজামিলগুলিকে বড় করে দেখি। নিজেরা আলোচনা করে ঠিক করে নেব তার উপায় নাই যদিও প্রাতঃস্মরণীয় দুই ফরাসি বিপ্লবী লেখক ভিক্টর হিউগা এবং স্তাঁদালের মতো 'গলির বিড়ালের ক্রুদ্ধ কলহ' আমরা করি না। কিন্তু আমরা অবুঝ শিশুদেরও হার মানিয়ে দিয়ে থাকি পরস্পরের খুঁত বার করার ব্যাপারে।

গতকাল আমাদের মধ্যে নিতান্ত নিরীহ দুজনের যে বাক্য বিনিময় হয়ে গেল, তাতে মনে হলো, দু'টো ধুমকেতুর যেন কলিশন হয়ে গেল। কথা কিন্তু সামান্য। একজন বলল, তুমি আজকাল বড় বেশি হাসছো। আরেকজন বলল, তুমি আজকাল বড় বেশি গম্ভীর হয়ে পড়ছো।

আষাঢ়, ১৩৭১।

নির্ভর

ভরা শ্রাবণ। বুড়িগঙ্গা এখনও বাঁধের নিচে চলচ্ছল করছে। কিন্তু ঢাকা নগরীতে পানি উঠেছে। বৃষ্টির পানি। কয়েকটা মহল্লাতে ঘরে ঘরে আঙিনাতে হাটুজল। কয়েকটা জনাকীর্ণ রাস্তায় গত দুদিনের খরাতে পানি নেমে গিয়েছে, কিন্তু রেখে গিয়েছে ড্রেনের গলিত আবর্জনা। বুড়িগঙ্গা যদি বাঁধ ছাড়িয়ে উঠে আসে, তাহলে ব্যাপরটা আর মেঘ-রৌদ্রের খেল থাকবে না, একেবারেই পঙ্ক-আলিঙ্গনে পরিণত হবে। কিন্তু এজন্য বাড়তি দুশ্চিন্তা করে লাভ কি? আমাদের কর্তারা আমাদের মুখে উন্নয়নের চুষিকাঠি দিয়ে অবাক করে রেখেছেন। আর, বুড়িগঙ্গা জোর করলেও ঢাকা শহরটাকে তো গিলে খেতে পারবে না। ওর বয়স হয়ে গিয়েছে। ওর উচ্ছ্বাস নিজে থেকেই সংযত হয়ে যাবে? ও কি আমাদের গ্রহণ লাগা ঐতিহ্য নয়? পুরানো শহরের আরও কতকগুলো মাটি আর দরমার ঘর জলস্নাত হবে, সেতো এমনিতেই হচ্ছে। বাচ্চাকাচ্চাসহ নিরাশ্রয় নাগরিকদের দুর্ভোগ চূড়ান্তে পৌঁছবে, সেতো এমনিতেই হতো। গ্রাম ভেঙ্গে শহরে কে আসতে বলেছিল বাছাধনরা? এখানে আসবার জন্য কি দাওয়াত দেওয়া হয়েছিল কাউকে? বন্যার পানি বিনা দাওয়াতেই আসে। কিন্তু তাই বলে কি বলা নেই কওয়া নেই, মানুষের বন্যা আসবে শহরে।

আগামী পক্ষকালের মধ্যে বন্যার পানি ঢাকা শহরে ঢুকবে কি ঢুকবে না, সেকথা বলতে পারছি না। ঢুকলে পায়ের জুতো হাতে নেব হয়তো। কিন্তু এটা নির্ঘাত বলতে পারি যে, ঢাকা শহরে ভালভাবে হোক কিংবা জঘন্যভাবে হোক মাথা গুঁজবার জন্য

লোক এসে ভিড় করতে থাকবেই বৃষ্টির অথৈ জল শহরে কোণাখামচিতে ঢুকে পড়ে অপ্রত্যাশিত লোকালয়ের, সংসারের, ডেরার মানবিক আস্তানার সম্মুখীন হয়েছে। বেনোজল হয়তো অবাক হয়ে গিয়েছে মানববন্যার এই ধরনের তীক্ষ্ণধার অনুপ্রবেশে। আমরাও কিছুটা নতুন তথ্য পেয়েছি দুই বন্যার সংঘাতস্থলে। কিন্তু এতে নতুনত্ব নেই। গ্রামে কাজ নেই অসংখ্য বেকার লোকের। ঢাকা শহরে ঠেলাগাড়ি ঠেলার কাজ মিলে যেতে পারে। অজানা অচেনা কিশোর, জোয়ান, বৃদ্ধ যেভাবে দল বেঁধে ঠেলাগাড়ি চালাতে শুরু করেছে তাতে একথাটাই মনে হয়।

অবশ্য ঢাকা শহরের দশ মাইল চৌহদ্দির মধ্যে তারাও উঠে আসছে, যাদের সঙ্গতি আছে। দূরে দূরান্তরে একটুকরো জমি, একটা বাড়ি যতই বিচ্ছিন্ন হোক না কেন সোনার চেয়ে দামী। চাষের জমি নয়, দালানের জমি। নিজের থাকবার জন্য হোক না হোক, ভাড়াটে বসাবার বাড়ি। পুঁজির বীজ পুতে রাখা, ভবিষ্যতে মুনাফার গাছের ফল পাওয়ার জন্য। এক টাকায় এক লক্ষ টাকা।

ঢাকা নগরীর দূর প্রান্তেও বন্যার পানি বহু বিস্তার করে রয়েছে। মানব-বন্যার সঙ্গে সংঘাত অনিবার্য। মানব-বন্যাকে ঠেকিয়ে রাখতে পারবে না ঢাকা শহরের চার পাশের জলাভূমিগুলি। জলাভূমিগুলিই হয়তো হাত বদল করতে শুরু করেছে। কারণ, চাটগাঁর পাহাড়গুলো সবই বিক্রি হয়ে গিয়েছে।

এই নানা ধরনের স্তর-সজ্জিত মানুষের বন্যাকে ঠিক কিভাবে স্বাগত জানাবো, সেটা বলতে পারছি না। কিন্তু পুরানো ঢাকা শহরের এক মহল্লার একটা দোকানঘরে বসে আলাপ করতে করতে দেখলাম, বিশেষ করে ঘোলা জলের মতো ঢুকে পড়া মেহনতি মানুষের বন্যাকে স্বাগত জানাবার মতো বনেদী লোকও রয়েছে।

এই বনেদী লোকটি হচ্ছে এক বুড়ি। সংসারে একবারে একা। কিন্তু সংসারের সাজ-সরঞ্জাম সবই আছে। রান্নাবান্নার সাজ-সরঞ্জাম। মশলা বাটার শিলনোড়াও আছে। অসংখ্য কৌটোতে অজস্র টুকিটাকি। কিন্তু ডেরা হচ্ছে পথের পাশে যে কোন ঘরে যে কোন দাওয়া। নিজের মাথা গুঁজবার জায়গাটা মাঝে মাঝে অদলবদল হয়। বৃষ্টির কিংবা বাতাসের ঝাপটা কোনদিক থেকে আসছে, সেটা বুঝে। তার সংসারের টুকিটাকি কৌটাগুলোকে সে শুধু আশে-পাশের বিভিন্ন দোকানের কোণাখামচিতে গুঁজে রেখে দিয়ে যায়। ওগুলো বাঁচলে সে নিজে বাঁচবে। এদিকে লাঠি ভর দিয়ে হাঁটে। একেবারে বেঁকে গিয়েছে। মহল্লার বখাটে শিশুগুলি এই অবস্থায় ওর আঁচল খুলে কাঁচা লঙ্কা লুট করে নিয়ে পালাচ্ছে হয়তো। বুড়ি পোকায় খাওয়া দাঁতের মতো জিরজিরে নিচের রাস্তাটার উপর দমাদম লাঠির বাড়ি কসিয়ে যাচ্ছে হয়তো। কুৎসিত অশ্রাব্য ভাষায় গালাগালি দিচ্ছে। মহল্লার বাইরে অবশ্য যায় না।

এই বনেদী বুড়ির কয়েকটা কথা কানে এল সেদিন। বলল, আপনারা তো রাত হলে চলে যাবেন দোকান বন্ধ করে। কিন্তু সারা রাত আজকাল পথে লোক থাকে। ডর লাগে না আমার। মানুষ থাকলে আর ডর কিসের?

আশ্চর্য! রাত হলে বুড়িকে নিশ্চয় লক্ষ্যও করে না কেউ। ভ্রূক্ষেপও করে না। কোথায় যে কোন দাওয়ার উপর ময়লা কাপড়ের পুটলির মতো কুঁকড়ে শুয়ে আছে এই লোমচর্মাবৃতা বৃদ্ধা, কেউ খেয়াল করে না। যারা অন্ধকারে দূর থেকে নারী-মাংসের গন্ধ

পায়, সেই শিকারীরাও ঘেঁষে না। না, ওকে কেউ ছোঁবে না এখন আর। কিন্তু আশ্চর্য! মানব-বন্যাকে ও কিন্তু আপন করে নিয়েছে। আশেপাশে মানুষ থাকতে ডর কিসের?

আষাঢ়, ১৩৭১।

মানুষের চোখে আয়না

রঙিন চশমা চোখে দিয়ে দুনিয়াটাকে রঙিন দেখার চেষ্টা সৌখিন লোকেরা বরাবরই করে আসছেন। কিন্তু আজকাল পথে-ঘাটে এতো বেশি রঙিন চশমা পরা লোক দেখি যে, সৌখিন লোকেরা হয়তো এই বারোয়ারী থেকে কেটে পড়েছেন কিন্তু তবু রঙিন চশমাধারী অথবা ধারিণীদের মধ্যে দু'একজনের ঠোঁটের বাঁকা হাসি দেখে মনে হয়, দৈনন্দিন যেটা অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গিয়েছে সেটার মধ্যেও আলগোছে থাকবার একটা চেষ্টা রয়েছে এবং সে চেষ্টা রঙিন দুনিয়ার গা ঘেঁষে যায়। কখনও কখনও মনে করিয়ে দেয়, চশমা চোখে দেওয়া মাত্র আমার এক অতি চেনা লোকও যেন নিজেকে চেনাতে চাইছে না। চশমা চোখে দিয়ে এই লোকটি নিজে হয়তো এইচ.জি. ওয়েলসের উপন্যাসের অদৃশ্য বৈজ্ঞানিক হয়ে গিয়েছে। সাধারণ জনস্রোতকে দেখে যেন তার চোখে-মুখে কৌতুক ঠিক্‌রে পড়ছে। অবশ্য তা অদৃশ্য, সে জন্য ঠোঁটের কোণের কৌতুকটুকুই পথচারীর চোখে পড়ে। চশমার অধিকারী বা অধিকারিণীর ভাবটা এই যে, নৈর্ব্যক্তিক তাসের মিছিলের মধ্যে তিনি একটি বিচ্ছিন্ন ব্যক্তি। হয়তো এই ব্যক্তিত্বে অহংকার নেই, অহমিকা নেই। হয়তো এই ব্যক্তিত্বের সবই রসিকতা। সে যাই হোক না কেন, যে বাস্তব দুনিয়াতে ছায়ারাও স্বাধিকারের জন্য লড়াই করছে, সেই বাস্তব দুনিয়াটার ঘর্মাক্ত অগ্রগতি বা প্রসারের কোন সার্থকতা বা তাৎপর্য নেই ঐ চশমার পিছনের চোখের কাছে। সুতরাং এটাও এক ধরনের সৌখিনতা নিশ্চয়ই, এক ধরনের 'সাহেবীপনা বা বাবুগিরি'।

তবু, এ কথাটাও বুঝি যে, যে সব লোক পরিবারের মধ্যে হোক কিংবা জনতার মধ্যে হোক, একা একা থাকলে পাগল হয়ে যাবে, তারাই এখন রঙিন চশমার প্রধান পৃষ্ঠপোষক। এই ধরনের পরিচিত কয়েকজনকে দেখি ছায়াঘন ঘরেও রঙিন চশমা ছাড়ার নাম করছেনা। মুস্কিল হয়েছে এই যে এদের এড়িয়ে চলার কোন মানেই হয় না। এরা তো মোটেই আলগোছে থাকার লোক নয়। এরা বরং ঘাড়ে চড়ে বসে ঘনিষ্ঠতা করবে। এদের তাড়িয়ে দিলেও এরা নড়বে না। সুতরাং আমাদের পুরানো একটা শুচিবায়ুকে মন থেকে না তাড়ালে চলছে না দেখছি।

মানুষের চোখ তার দর্পণ, এ কথাটাকে এতদিন ধরে একটি বদ্ধমূল ধারণা হিসেবে পোষণ করে এসেছি। কারও চোখের দিকে না তাকিয়ে যদি কথা বলি, তবে মনে হয়, আমার নিজের চোখেই বাঁধন। তাছাড়া সূর্যকে আমি পেতে চাই তার সারদিনমানের সমস্ত ঐশ্বর্যে। পূর্ব বাংলার শরৎকালের আকাশে স্তরীভূত মেঘে সূর্যের দাবদাহ যে কোমল বিচিত্র বর্ণে কুসুমিত হয় তাকে কি খোলা চোখ ছাড়া দেখতে পেতাম? এই বর্ণনা আর না বাড়িয়ে আর শুধু একটা কথা বললেই সম্ভবত মনের ভাব প্রকাশ পাবে। ছেলেবেলায় চোখ উঠলে রঙিন চশমা পরতাম। সুতরাং ওর মধ্যে যেন আজও পুঁজের

গন্ধ পাই। এ নিশ্চয় একটা মানসিক বিকার তবু বদ্ধমূল বিকার। সহজে একে ছাড়া যায় না। কিন্তু এতো সব কিছু সত্ত্বেও আমাকে সংস্কারমুক্ত হতেই হবে। কারণ কোন রকম শুচিবায়ু নিয়ে জনগণের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা স্থাপন করা যায় না। জনগণ হচ্ছে মুক্তধারা। নতুন নতুন রেওয়াজের প্রতিবিম্ব তাতে পড়বেই, কিন্তু সেই প্রতিবিম্বের দরুন কোন আবিলতা তাকে স্পর্শ করতে পারে না। টেডীর পাতলুন, চূড়া বাঁধা খোঁপা কিংবা রঙিন চশমা যারা পরিধান করে, তাদের অনেককে দেখেছি স্বাধিকারের সংগ্রামে কিংবা সেবার কাজে ব্রতী। শুচিবায়ু এদের কাছ থেকে আলাদা করে ফেলবে।

ভাদ্র, ১৩৭১।

মূল্যবোধের তল্লাশি

জানি, আনমনা হয়ে পথ চলা গ্রামে কিংবা শহরে কোথাও নিরাপদ নয়। গ্রামের পথে লোকের সঙ্গে কিংবা গাছের সঙ্গে ধাক্কা লাগতে পারে, গর্তে পা পড়তে পারে। ব্যাপারটা খুব সুবিধার নয়; কিন্তু শহরে ফ্যাসাদটা অনেক বেশি। যদি ঠেলাগাড়ির তলায় পড়ে ঠ্যাং না-ও ভাঙ্গে, কিংবা ট্রাকের তলায় পড়ে ইহলোকের পালা না-ও চুকে যায়, যদি শরীর অক্ষত থাকে, তবু লাঞ্ছনা আছে। ঢাকা শহরের লোকের মুখ ছুটলে বলতে হবে, ধরণী দ্বিধা হও। খাঁটি ঢাকাইয়ারাই এতোকাল শুধু বসে বসে জিভে ধার দিতো আর অপেক্ষা করত, কখন কোন উজবুক প্রমাণ করে যে সে আস্ত উজবুক। এখন পূর্ব বাংলার সমস্ত জেলার লোক রাজধানীতে এসে জিভে শান দিচ্ছে। এখানে এখন পিনটি পড়তে পারে না। আর ধরুন, আমি যদি এক টাকায় দেড়টা ফজলী আমের খোসায় পা দিয়ে কিছুটা হড়কেও যাই, তাহলে আমার গায়ে ফোস্কা পড়ে যাবে জনাকীর্ণ পথে দশটা চোখে তাক রেখে চললেও। ঢাকাইয়া ভাষায় বলতে গেলে বলতে হয়, একটা কথাও মাটিতে পড়বে না।

তবু মন জিনিসটি এমন যে সে হঠাৎ মুখ লুকিয়ে ফেলে মস্তিষ্কের নিরেট খুলিটার মধ্যে রুদ্ধ কোন অনু-বাতায়নের পিছনে। বিপদে ফেলে দেয় গোটা মানুষটাকে। পাস্তেরনাকের মতো সব জেনে শুনেও জড়িয়ে পড়তে হয় দুর্ঘটনায়। পাস্তেরনাক তাঁর 'ডা. জিভাগো' উপন্যাসে লিখেছিলেন যে, রেলগাড়ি তার সার্চলাইট দিয়ে পথটাকে দেখে দেখে চলে; কিন্তু সে যদি সেটাকে ঘুরিয়ে তার নিজের মধ্যে ফেলতে যায় তাহলে বিপর্যয় ঘটে। পাস্তেরনাক এ কথা বলেছিলেন, মানব-মনে নিছক অন্তর্মুখিতার বিপদ সম্বন্ধে; কিন্তু তিনি নিজেই সেটা করে বসেছিলেন। এতে সোভিয়েত বিরোধীরা খুশী হয়েছিল, কয়েক বছর ঘটা করে ডা. জিভাগো বই কিনে খুব হৈ চৈ করেছিল তাঁকে নিয়ে; কিন্তু পাস্তেরনাক আর সে দুর্ঘটনার দুর্বিপাক থেকে বেরিয়ে আসতে পারেননি। মানুষের মনটাই হয়তো দায়ী। তা না হলে আমার মতো একটা সতর্ক লোক, যে পঞ্চাশের উপর পৌঁছেও জীবনের পিছল সিঁড়িতে পিছলে পড়ে পঞ্চত্ব পেল না, সে কেন বিমনা হতে যাবে?

সে যাই হোক, বিমনা হয়েছিলাম। কাল সকালে আমাদের মহল্লায় সাম্প্রতিক তথাকথিত টাইফয়েডে দু'চারদিন ভুগে একটি ফুটফুটে মেয়ে মারা গিয়েছে। দুদিন

আগে দেখেছি রাস্তার পানির কল থেকে কলসিতে পানি ধরে বড়দের মতো মুখভঙ্গী করে কাঁখে কলসী বসিয়ে বাড়ি নিয়ে যাচ্ছে। ওকে এর আগে দেখেছি মোড়ের মৌসুমী ফলের ঝুড়িগুলোর সামনে ঝুঁকে রয়েছে। মনে হয়েছে, পূর্ব বাংলার রসালো ফলগুলো যথা–তাল শাঁস, জাম, কুল, কামরাঙ্গা, জলপাই, আমড়া ঋতুতে ঋতুতে যেন ওর জন্যই ঝুড়ি বোঝাই হয়ে এসে জমা হয়েছে আমাদের মহল্লার পথের মোড়ে। দামী ফল নয়। সেই জন্য বাধ হয়, বারবার বাড়িতে ছুটে যেত মেয়েটা আর ফিরে আসতো তার ছোট্ট মুঠিতে দু'চারটি পয়সা নিয়ে। চঞ্চলা। মহল্লাটা ওর চেনা জগৎ ছিল। ভ্রূক্ষেপ করতনা কাউকে। কারণ ওর প্রয়োজন ছিল সামান্য। চেতনাও ছিল নিশ্চয় সামান্য। হয়তো বড়জোর রাত্রিতে ঘুমিয়ে পড়ে স্বপ্ন দেখতো, কামরাঙ্গা গাছের তলায় সে শুয়ে আছে আর পাকা সোনালি রং-এর কামরাঙ্গা স্তুপীকৃত হয়ে পড়ে আছে গাছতলায়। কিন্তু নিষ্পাপ বলেই কি কারও নিস্তার আছে কালান্তক যমের কাছে? গরু ছাগল প্রতিনিয়ত ফুল খেয়ে যাচ্ছে। আমাদের উপমহাদেশটাতে আজও সাম্প্রদায়িকতা রাক্ষস গিলে খাচ্ছে শিশুকে মায়ের কোল থেকে কেড়ে নিয়ে। টাইফয়েড তো মস্তিষ্কবিহীন জীবাণু। তার হৃদয়ও নেই। এত কথা অবশ্য রাস্তা দিয়ে চলতে চলতে ভাবিনি। লিখবার আগে ভেবেছি। কিন্তু আনমনা যে হয়ে গিয়েছিলাম, একথা ঠিক। মন বোধহয় তার মানবিক মূল্যবোধের ভাঁড়ারটাকে হাতরে দেখছিল, মেয়েটার জন্য কিছু পাওয়া যায় কিনা। হয়তা দেখছিল, অভিজ্ঞতার আঘাতে আঘাতে বিধ্বস্ত আমার মূল্যবোধের ভাণ্ডারে জমা করে রাখা নোনতা দুফোঁটা চোখের জলও চুঁইয়ে পড়ে গিয়েছে কিনা।

হঠাৎ দেখি, একটা প্রজাপতি। গেরুয়া রং-এর পাখা। নবীন প্রজাপতি। আমার সামনে দিয়ে পথ করে করে চলেছে স্কুটার, ট্রাক, রিক্সা আর পথচারীদের পাশ কাটিয়ে। আমাকে যেন পথ দেখিয়ে নিয়ে চলেছে। ভুলে গেলাম, আমার বয়স পঞ্চাশের উপরে উঠে গিয়েছে। মনে হলো, মেয়েটা যদি বেঁচে থাকতো আর এই প্রজাপতিটাকে দেখতো, তাহলে আমাকে তার চলার পথের সাথী করে নিয়ে ছুটে যেতো ওর পিছন পিছন।

একবার প্রজাপতিটা হারিয়ে গেল ভিড়ের মধ্যে। কিন্তু আমি দমলাম না। ঐ মেয়েটার নিষ্পাপ মুখখানিকে যেন দিগন্তের দিকে তুলে ধরে মনে মনে বললাম, প্রজাপতির মৌসুম আসছে। লাখ লাখ প্রজাপতি পূর্ব বাংলা বন্যায় ভাসা, দারিদ্র্য জীর্ণ গ্রাম-গ্রামান্তরকে লক্ষ রংধনুর রং-এ রঞ্জিত করে ছেয়ে ফেলবে।

শ্রাবণ, ১৩৭৩।

আপেক্ষিক সৌভাগ্য

যে মহল্লাটাতে থাকি, সেটা গাড়িটানা বলদের পিঠের ক্ষতের মতো নোংরা আর থকথকে হলেও এবং সেখানে প্রাচীন ঢাকা শহরের সমস্ত অন্ধকার পুঞ্জীভূত হলেও এবারকার বন্যায় ডোবেনি। মুর্খ গাড়লের মতো বুক ফুলিয়ে সে যেন বনবাদাড়ের বাঘকে দ্বন্দ্বে আহ্বান করছে, এবং বাঘও হক্‌চকিয়ে খানিকটা দূর পর্যন্ত এসে থমকে দাঁড়িয়েছে। ঢাকা শহরটা উন্নয়নের দু'চারটে মাত্র তকমা কোন রকমে এঁটে বন্যার

যন্ত্রণায় মুখ লুকোতে চেষ্টা করছে, তখন আমাদের মহল্লাটার এইভাবে স্পর্ধা ভরে জেগে থাকাটা বাহাদুরি বৈকি! কর্মস্থল থেকে প্রত্যাবর্তনের পথে যখন বিভিন্ন স্থানে জুতো হাতে নিয়ে পানি ঠেলে পার হয়ে শেষ পর্যন্ত মহল্লায় এসে উঠি, তখন ক্ষণিকের জন্য মনে হয় মর্মর প্রাসাদে প্রবেশ করলাম। নিজেকে ভাগ্যবান মনে না করে পারি না। ঘুম থেকে উঠেই যেসব অভিশপ্ত গৃহস্থকে আঙিনার নোংরা পানি পার হয়ে চা পানের জন্য রান্নাঘরে যেতে হয়ে, আমি সেই হতভাগ্যদের একজন নই। আর এই সব অভিশপ্ত গৃহস্থের চেয়েও অনেক অনেক বেশি দুর্গতিতে পড়েছে যে লক্ষ লক্ষ মানুষ, তাদের সঙ্গে নিজের ভাগ্যের তুলনা নাইবা করলাম।

হয়তো আমাদের মহল্লাটা শুকনো খটখটে রয়েছে বলেই এবং আশে পাশে বিভিন্ন বসতি জলমগ্ন রয়েছে বলেই এ ভাঙ্গাচোরা পথের পথচারীর পায়ের আওয়াজ দিনকয়েক ধরে বেশি ধরা পড়ছে। রাত দুটোর সময় যে জুয়াড়ীরা দিনের পালা সাঙ্গ করে ক্লান্ত পায়ে বাড়ি ফেরে তাদের পায়ের আওয়াজ আমার দোতলার ঘরের গবাক্ষ ভেদ করে জানিয়ে দেয়, এ লোকটা অমুক ও লোকটা তমুক। দিনের বেলাতে দিনের বেলাতে যখন সূর্য ঝলমল করে তখনো চেনা পায়ের আওয়াজ শুনে মনে হয়, ঐ চেনা লোকগুলো পায়ে মাইক্রোফোন এঁটেছে।

এদেরই মধ্যে একটা মেয়ে আছে। দুদিন আগেও ও ছিল নিতান্ত শিশু। আজ সে কিশোরী। মাঝে মাঝে মনে হয়, ডাগর চোখ দুটো তুলে দুনিয়াটাকে নতুনভাবে দেখতে চাইছে। কিন্তু তবু পাড়ার লোকের কাছে খুকী নামেই পরিচিত। কিন্তু লক্ষ্য করে আসছি বরাবর, ও যেন জন্ম-গৃহিনী। ছুটে ছুটে বার বার মুদীর দোকানে হাজির হয় তেল নুন লাকড়ির পঁচিশ ত্রিশটা ব্যঞ্জনের সন্ধানে। মুদীর দোকানটা যেন ওর ভাঁড়ার ঘর। পথটা যেন ঘরের বারান্দা। সাধারণত ময়লা জামা গায়ে থাকে। যখন পর্বের দিনে নতুন জামা পরে, তখন মনে হয় রূপথকার রাজকন্যা যেন পথে নেমে এসেছে। মুখের মধ্যে হরদম একটা না একটা তেলেভাজা কিছু চর্বিত হচ্ছে। কিন্তু আসল ব্যক্তিত্ব ওর পথ চলায়। ওর খড়মের খটখটিতে। এবারকার বন্যার দিনে আমাদের শুকনো মহল্লাটার স্পর্ধাকে ওর খড়ম জোড়া যেন আরও চড়িয়ে দিচ্ছে।

কিন্তু গতকাল মহল্লায় ঢুকবার পথে দেখি, মেয়েটা একটা রেশনের দোকানের অদূরে থমকে দাঁড়িয়ে আছে। একহাতে একটা নোংরা চালের ব্যাগ, আরেক হাতে রেশন কার্ড। সিগারেট কিনবার জন্য একটা পানের দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে ওরদিকে চেয়ে মনে হলো কোথাও কিছু ঘটেছে। দেখলাম, মেয়েটা রেশনের দোকানের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে কিন্তু অত্যন্ত সন্তর্পণে। পায়ে ওর কুণ্ঠার পাষাণ চাপা। খড়ম যেন বোবা হয়ে গিয়েছে। পথটাকেও বোবা করে দিয়েছে। ব্যাপারটা কি?

ব্যাপারটা কি জানেন? গত সপ্তাহেও মেয়েটা আটটা রেশন কার্ডের মধ্যে দুটোতে চাল নিতে পেরেছিল। এবারও তাই। মেয়েটা ভাবছে, তার গৃহের এই দারিদ্র্য, তার পিতা-মাতার এই অক্ষমতাকে সে কি করে আবার রেশন দোকানে দশটা লোকের সামনে বেপর্দা করবে?

কাল থেকে আমার আপেক্ষিক সৌভাগ্যের মধ্যেও মন থেকে এই কাঁটাটা তুলে ফেলতে পারিনি।

আশ্বিন, ১৩৭১।

রাজমিস্তিরীর গর্ব

প্রবাদ বাক্যের সেই জ্যোতিষীর কথা ভুলিনি, যে ব্যক্তি আকাশের তারা গণনা করতে গিয়ে কুয়োর মধ্যে কুপোকাত হয়েছিল। তাছাড়া দৈনন্দিন জীবনযাপনে তেল-নুন-লাকড়ির অভাব আজও এমনভাবে সর্বাঙ্গে বিদ্ধ করে যে, কল্পনাবিলাসী হবার অবকাশই পাই না।

কাঁটা কাঁটাই। তবু ওদের সিঁড়ির মাথায় ভাগ্যে থাকলে গোলাপ ফুটে থাকতে পারে হয়তো। কিন্তু আমাদের দেশবাসীর জীবনে আজও কাঁটাটাই সত্য হয়ে রইল। সেজন্য এক যাত্রায় পৃথক ফলের কথা আশা করাটাও নিশ্চয় সামাজিকতা নয়। মনটাকে তৈরি করে রেখেছি, দুরাশাকে প্রশ্রয় না দেবার জন্য। উপদেশও জীবনভর শুনে আসছি যে, গরীবের ঘোড়া রোগ তার পতন ডেকে আনে। যদিও যারা পড়েই আছে, তারা আবার কোথায় পড়বে, এই প্রশ্নটা শিক্ষক ঠকানো ছাত্রের মতো করা যেত। কিন্তু বার বার শুনতে শুনতে ঐ পতনের ভাবনাটা মাথার মধ্যে রিপিট করা গজালের মতো ঢুকে গিয়েছে। তবু মাঝে মাঝে আনমনা হয়ে যাই। হয়তো কারণ এই যে, মানব সমাজের তিন লাখ বছরের মনুষ্যত্বের সাধনার জেদ আমার নিরেট মাথাটার মধ্যেও বিস্ফোরিত হয়।

এই কারণেই, যে ঢাকা শহর আজও নর্দমার পাঁকে প্রোথিত রয়েছে, তার গলির জালের মধ্যে ঘুরতে ঘুরতে একটুখানি খোলা জায়গায় দাঁড়িয়ে মনে হয়, আচ্ছা গত সতেরো বছরে অন্তত ঐ নতুন ছাদের বাসাবাড়িটা তো তৈরি হয়েছে। কংক্রীটের ঐ দানবটার দিকে তাকিয়ে দেখতে পাই, ওর মধ্যে আকাশ আর বাতাস খুব বেশি রকম জায়গা রেখে দিয়েছে। কখনো দেখি আকাশের গায়ে কাত হয়ে রয়েছে, কাঁচের চারতলা দালান। (আসলে সবটা কাঁচের নয়, কিন্তু দেখে মনে হয় ওর মধ্যে নিরেট কিছু নেই)। দুটো চারটা পাঁচটা এরকম নতুন আমদানী দেখে মনে হয়, তাহলে ঢাকার দিগন্ত কি বদলে যাবে একদিন? কবে? কতদিন লাগতে পারে? মনে হয়, ঐ দালানগুলোকে হঠাৎ কোন আলাদীনের সাগরেদ টুক করে বসিয়ে রেখে গিয়েছে সাত সাগরের পার থেকে এনে। এমন কথাতো আমার দেশের বেশ কিছু লোককে দেখেও মনে হয়। মনে হয়, কেউ যেন সাগর পারের সাজ-পোশাক পরিয়ে ছেড়ে দিয়ে গিয়েছে। এ কথাটা ভাবি সম্ভবত এই কারণে যে, যে কোন নির্মাণের ব্যাপারেই যে মেহনতি মানুষের প্রয়োজন পড়ে, সেকথা ছিন্নমূল বুদ্ধিজীবী হওয়ার দরুন শত উদার হৃদয় থাকা সত্ত্বেও বারবার ভুলে যাই। মেহনতের স্বেদাক্ত ছাপ কোন কিছুর গায়ে লেগে থাকে না। যা থাকতে পারে, সে বড়জোর পরিচর্যার ছাপ। সুতরাং আকাশের দিকে চোখ তুলে মাঝে মাঝে তাকাই, তাতে চমক লাগে। কিন্তু সে চমকগুলি পাথরের নুড়ির ঠোকাঠুকিতে জ্বলে ওঠা আলোক শিখার মতো। অস্থায়ী। অগভীর?

তবু সাধ্য কি এড়িয়ে যাবো ঐ আলগা মনে হওয়া দালানগুল। যারা শিকড় তাদের? দিন কয়েক আগে এদের একজনের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল।

এক পরিচিত ব্যক্তির জন্য একটা বাসা-বাড়ির সন্ধানে জনৈক মাতবর শ্রেণির লোকের কাছে গিয়েছিলাম। বসিয়ে চা খাওয়ালেন; কিন্তু বাসা-বাড়িটার সন্ধান দিয়ে যে

ভাড়ার কথা বললেন, তাতে চা-ই জিহ্বায় চিরতা হয়ে গেল। কিন্তু লক্ষ্য করে দেখলাম, ব্যাপারটা এরই মধ্যেই গা সহা হয়ে গিয়েছে উপস্থিত অনেকেরই। এর পরে যে আলোচানা শুরু হয়ে গেল, তাতে স্থাপত্যের অর্থনৈতিক ও শৈল্পিক দিক আর কোন কিছুই বাদ রইল না। একজন শুধু নীরবে দাঁড়িয়েছিল। অত্যন্ত বিনয়াবনত এক বৃদ্ধ। যখন সবাই বিষয়ান্তরে যাচ্ছে, তখন এক ফাঁকে সে শুধু প্রশ্ন করল মাতব্বর স্থানীয় ব্যক্তিকে। তাতে বুঝতে পারা গেল সে একজন রাজ, অর্থাৎ রাজমিস্তিরী। তারপর জিজ্ঞেস করে জানলাম, ঢাকা শহরে গত চল্লিশ বছরে যে বুনিয়াদী কায়দার দালানগুলো গজিয়েছে, তাদের মধ্যে কতগুলো তার নিজের হাতে তৈরি। আরও জানলাম, ইদানিং কংক্রীটের যে কটা অদ্ভুতদর্শন দালান তৈরি হয়েছে, তাদের মধ্যে কোন কোনটাতে তার কর্ণির ঠোকর আছে। তাকে বসতে বললাম আমরা কয়েকজন; কিন্তু সে বসলো না। হেসে বেরিয়ে চলে গেল।

জানতে পারলাম, সে দুমাস আগে অবসর নিয়েছে। কিন্তু রাজের কাজ সে ছাড়তে পারে নি। সে এখন পুরানো শহরের জীর্ণ দালানগুলোর মাঝখান থেকে হাড়গোড় ফেলে দিয়ে নতুন নতুন সাজ পরিয়ে দেবার কাজে হাত দিয়েছে।

গতকাল এর প্রত্যক্ষ পরিচয় পেলাম। একটা জীর্ণ ভূতুড়ে বাড়ির মতো দালানে আমার সেই পরিচিত ব্যক্তির জন্য বাসাবাড়ি খুঁজতে গিয়ে দেখি, একটা লম্বা প্রবেশপথের মাথায় একটা নতুন সিঁড়ি। আর তার গোঁড়ায় দাঁড়িয়ে কর্ণি হাতে আমাদের সেই রাজ। সিঁড়ির মাথায় এক তলার ছাদে একটি মেয়ে, হয়তো নতুন গৃহিনী। সিঁড়ির মাথায় সম্ভবত এই গৃহিনীর স্বর্গ।

এক নিমিষের জন্য মাথার মধ্যে একটা ভাবনা খেলে গেল। ঐ বিনয়াবনত রাজমিস্তিরীর মুখে কি একটা গর্বের ছোঁয়াচ নেই? আরও একটি স্বর্গ সে তৈরি করছে ভগ্নস্তূপে?

আশ্বিন, ১৩৭১।

শহরে আসার পথ

কোন কোন প্রবীণা মহিলা যেমন নাইলনের নতুন শাড়ি পরে বয়সটাকে কমিয়ে ফেলেন, বুড়িগঙ্গাও হয়তো বর্ষার বরিধারার সাজে সেজে তাই করেছে। কিন্তু ঢাকা শহরের লঞ্চঘাটের যা অবস্থা, তাতে এই ভরা নদীর চেহারা ব্যতিব্যস্ত পথিকের চোখে পড়ে না। লঞ্চ যখন মাঝ নদীতে গিয়ে পড়ে, তখন বুড়িগঙ্গাকেও খরস্রোতা বলতে ইচ্ছা হয়। যাত্রীরা লঞ্চের জনাকীর্ণ ডেকের রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে পুরানো শহরটার বুড়ো হাড়গিলে বাড়িগুলোর দিকে তাকিয়ে মনে মনে ভাবে, জীবনের স্রোত ঐ জঙ্গলের মধ্যে যতই না কেন চক্রাকারে ঘুরুক, সে অবাধ্য। সে সাগরমুখী অথচ লঞ্চঘাটে রিক্সা থেকে সপরিবারে নেমে বিত্রস্ত অবস্থায় তার হয়তো মনে হয়েছিল, এখানে নদী কোথায়? এখানে তো লট-বহরের ভিড়ে পা ফেলার জায়গা নেই। নদীটা এত বেশি শৃঙ্খলিত যে, এটাকে পায়ে পায়েই পার হওয়া যায়। মাঝ নদীতে এসে এই ভুল ভাঙ্গে। কোথায় শৃঙ্খল? কোথায় পরস্পরকে কনুই-এর গুতো দিয়ে পরস্পরকে ঘায়েল করার বাটপাড়ি

বৃদ্ধি? নদী, নদী, নদী। নদী থেকে নদী। তারপরে সাগর। জীবনকে কে রাখবে অবরুদ্ধ করে?

অন্যদিকে লঞ্চ থেকে শহরে এসে নামলে যাত্রী তার চোখে মুখে নিয়ে আসে যে অগণিত নদীর ঊর্মিমালার সূর্যজ্বালার অঞ্জন তা তাকে কোন ঘিঞ্জি গলির 'কাকস্য পরিবেদনার' বাসাবাড়িতে পৌঁছবার পরেও স্থবির হতে দেয় না। কৃত্রিম হতে দেয় না। এই কারণেই কি আমাদের পুরানো শহরে অবিন্যস্ত সম্প্রসারণে পুঞ্জীভূত কৃত্রিমতার মধ্যেও জীবনের স্পন্দন কখনও থামে না?

অবশ্য এই প্রত্যয়ের জন্য চাই যাত্রীর মন। যে জনতা শহরে অধোমুখী হয়ে চক্রাকারে ঘুরছে, সেও যে মুক্তিমুখী, সেও যে তপ্ত অঙ্গারের মতো স্ফুলিঙ্গ পাঠাচ্ছে নবনব দিগন্তে, সেকথা জানাবার জন্য চাই যাত্রীর মন। রেল লাইনের যাত্রীর মনকেও নিশ্চয় বাদ দেওয়া যাবে না আমদের এই হিসাব থেকে। পুরানো রেল লাইনের যাত্রীও যাত্রী নয় কি? সে যে গতিস্মান। সে নিয়ে আসে যন্ত্রের স্পন্দন। ঢাকা শহরে আসবার লাইনগুলো এখনো পুরানোই আছে। কিন্তু বহন করছে সে যৌবনকে। তারুণ্যকে। গতিকে।

গতকাল সকালে একটা স্কুটারে বাক্স বিছানাসহ একটি নব-দম্পতিকে দেখলাম। তারা যাচ্ছে না আসছে, বুঝতে পারলাম না। শুধু চোখে পড়ল গ্রামীণ ছেলেটির চোখ। কোন্ দূরে তার দৃষ্টি? হয়তো আরও একটা কথা মনে রাখার মতো। এরকম যত দম্পতি দেখেছি তাদের মধ্যে অন্তত একজনের চোখে সুদূরের তৃষ্ণা, সামনে চলার পথে নদীর উজানে যাত্রা প্রতিজ্ঞা। চলন্ত স্কুটারের দিকে তাকিয়ে এর চেয়ে বেশি হিসাব করা যায় না। বিশেষ করে, হিসাবটা যখন অস্থিরতার।

আশ্বিন, ১৩৭১।

জনতার মন রাখা

কাল সকালে ঘুম ভাঙতেই দেখি, জানালা দিয়ে উজ্জ্বল আকাশটা উঁকি দিচ্ছে। সেটা যেন এলুমিনিয়ামের নতুন কেনা ডেকচি, আর আমি অসুখ থেকে সেরে উঠেছি ছেলেবেলায়, আর রান্নাঘরে পিঁড়ি পেতে বসে নিজের মনকে প্রশ্ন করছি, কোনটা সুন্দর? আগুনের শিখার উপর প্রদীপ্ত এলুমিনিয়ামের ডেকচিটা, না ওর মধ্যকার উপচে পড়া সাদা সাদা ভাত? হঠাৎ বহুদূর থেকে একটা গানের কলি ভেসে এলো 'শারদ প্রাতে আমার রাত পোহাল।' আমার মনপ্রাণও যেন সাড়া দিয়ে উঠলো এই গানে। আর এই গানের প্রবাহে ধৌত হতে হতে এক সময় স্মরণ করলাম, পূর্ব বাংলার ষড়ঋতুর মধ্যবর্তী শরৎ নিশ্চয় বেশ কয়েকদিন আগেই বঙ্গোপসাগর পেরিয়ে এসে পৌঁছেছে। আর শুরু করে দিয়েছে বর্ষায় ধোঁয়া পঞ্চভূতের ঘষামাজা।

প্রভাত এসেছিল এমনিভাবেই। কিন্তু সূর্য যখন অস্তমুখী তখন আকাশে ছেড়া ছেড়া ঝড়ো মেঘ। কিন্তু তবু এ মেঘ শরতের মেঘ। আর তাই মনে হলো সৌরজগতে যত রং আছে, তাদের সবগুলি ঠিকরে পড়ছে ঐ ঝড়ো মেঘের গায়ে গায়ে। পূর্ব বাংলার শরৎ ঋতুর এ কী চঞ্চলতা! একরঙা ভোরটাকে রাঙিয়ে দিল হাজার রং-এ। সকালে কে যেন খালি গলায় রেয়াজ করছিল। সন্ধ্যায় সে সংগীত পরিণতি পেল কোরাসে।

এই কারণেই আমার গান গাওয়ার তাগিদটাকেও আমি নিজে থেকেই চাপা দিয়ে রাখতে পারছি। শরৎ তার কোরাসকে আকাশে আকাশে ছড়িয়ে দিয়ে আমাকে রেহাই দিয়েছে এর সংগীত শরিক হওয়া থেকে।

আপাতত আমি আমার রেহাই পাওয়ার ব্যাপারে একটা মধুর আমেজ অনুভব করছি।

শরৎ যদি তার একরঙা আকাশ নিয়েই আমার কাছে চাইতো দিনের শেষে প্রতিদান, তবে আমাকে তার সুরে সুর মেলাবার জন্য গলা ছেড়ে হেড়ে গলায় হলেও গান করতে হতো। কিন্তু দিনশেষের সঙ্গে সঙ্গে শরৎ তার আকাশে হাজার রং ছড়িয়ে যে কোরাস শুরু করে দিয়েছে তাতে আমার মৌন সংগীতটাই ভাল জমেছে। কৈফিয়ৎ চাইবার মতো শরতের মনের অবস্থাটা নয়। সে নিজেই নিজের কারিগরিতে বিভোর হয়ে গিয়েছে। হয়তো সে আমাদের দেশের নিচতলার গণমানবের কাছ থেকে চেয়েছে এই কারিগরি। আমাদের দেশের গণমানবের মিছিলগুলি যখন স্বাধিকারের দাবি নিয়ে বারবার জোয়ারের মতো ফিরে আসে, তখনও কি একই ধরনে কারিগারি কল্লোলিত হয়ে ওঠে না? মিছিল থেকে সরে দাঁড়িয়ে পথের পাশে জিরোতে জিরোতে দেখি, জনতার সঙ্গে যদি আমি মনে মনেও থাকি, তবু সে উল্লসিত।

আশ্বিন, ১৩৭১।

গানের রেয়াজ

তূরীভেরীতে আমল চলে গিয়েছে। ঢোলকের সঙ্গে তাল দিয়ে দলবদ্ধভাবে গান গেয়ে মিছিলে শরিক হওয়ার রেওয়াজ চাপা পড়েছে। তাই আজ যখন কোন গণমিছিল কোন উপলক্ষে লোকসমাজের পুঞ্জীভুত বক্তব্যকে মহানগরীর কিংবা গ্রামের পথে পথে ঘোষণা করে যায়, তখনও মনে হয়, জনতার কলরোল সত্ত্বেও কিসের যেন একটা অভাব রয়েছে। বিশেষ করে, মিছিলের একেবারে শেষের সারিতে থেকে গেলে সেখান থেকে শুরু হয়তো দেখা যায়, সামনে অনেক দূরে ধূ ধূ করছে কয়েকটা পতাকা আর পোস্টার। পথ যদি উঁচু-নীচু হয়, তাহলে পুরোগামীরা মেঘের ফাঁকে ফাঁকে সূর্যের মতো ঝকমকিয়ে ওঠে। দূর থেকে ভেসে আসে সম্মিলিত ধ্বনি। মানুষের মতো বাঁচতে চাই। রাজবন্দীদের মুক্তি চাই। ইত্যাদি। পিছনের সারিতে হঠাৎ কেউ গলা খাকারি দিয়ে শ্লোগান দিয়ে ওঠে। লোকটি একা পড়ে যাবে বলে কয়েকজন যোগ দেয়। কিন্তু সচরাচর মহামিছিলের পিছনের দিকের লোকেরা নিজেদের সম্মিলিত পদক্ষেপের সংগীতেই মগ্ন হয়ে চলতে থাকে। হয়তো মিছিলের পিছনের সারিতে যারা থাকে তারা মনে মনে মুখর থাকে পুরোবাসী দলের শ্লোগানে। পথের পাশে ভিড় করে দণ্ডায়মান নর-নারী আর শিশুর চোখে মুখে হয়তো তারা খোঁজে পুরোগামীদের রেখে যাওয়া ধ্বনি-তরঙ্গকে। এ ছাড়া উপায় কি? প্রথমেই তো বলেছি, মহামিছিলের তূরীভেরী নেই যে তাদের ভৈরব নিনাদে স্পন্দিত হবে মিছিলের শেষ প্রান্তটুকুও। সারা মিছিলে দলে দলে গান নেই যে অনুরণিত হবে সেই গান সারা মিছিলের কণ্ঠে কণ্ঠে।

সাম্প্রতিক কথাই বলছি। বিশেষ করে এ বছরটা যেন মিছিলের মৌসুম। কিন্তু এই সেদিনের একটা বিক্ষোভ মিছিল সম্বন্ধে বলতে গিয়েই এক বন্ধু মন্তব্য করলেন, বোবা মিছিল। অবশ্য তিনি মিছিলের শেষ দিকটা সম্বন্ধেই এ মন্তব্য করলেন। তাঁর হয়তো মনে হয়েছিল যে, মিছিলে যারা শরিক হয়েছে, তারা কোন এক ভাগেও যদি নীরবে চলে তবে মিছিলের ছন্দ কেটে যেতে বাধ্য।

সম্প্রতি এই ধরনেরই আরেকটা গণমিছিলের তরঙ্গে ভাসতে ভাসতে চলতে চলতে কয়েকবারই মনে হয়েছে, আবার তূরীভেরীর প্রচলন করা দরকার। আবার ঢোলকের তালে তালে দলবদ্ধ সংগীতেরও দরকার। তূরীভেরীর নিনাদের সবটাই উঁচু পর্দাতে চড়ানো। কাজেই, পরোগামীরা মিছিলের মুখে ধূ ধূ করলেও সে নিনাদ সমস্ত মিছিলটাকে মন্দ্রিত করবে। আর ঢোলকের তালে তালে দলবদ্ধ গণসংগীতে শরিক হলে কাউকেই ভাবতে হবে না, সকাল বেলায় সারেগামা সাধা হয়েছে কিনা, কিংবা থ্রোট-পিলটা পকেটে আছে কিনা। কোন নামজাদা সংগীত শিল্পীকে নেতৃত্ব দেবার জন্য সাধ্যসাধনা করতে হবে না। চারটে মাইক্রোফোনের ব্যবস্থা করতে হবে না। যারা সংগীত শিল্পী তারাও পেয়ে যাবেন হাজার হাজার শ্রোতাকে। শ্রোতা সমবেত করে দেওয়ার জন্য তাঁদের করাঘাত করতে হবে না দ্বারে দ্বারে, কিংবা গানের মজলিসে জায়গা পাবার জন্য করতে হবে না তদ্বির।

কার্তিক, ১৩৭১।

নিজের চারদিকে নয়

কয়েকজন মুক্ত রাজবন্দীকে সংবর্ধনা জানানোর জন্যে ঢাকা শহরে দিন কয়েক আগে একটি জলসার আয়োজন করা হয়েছিল। ব্যাপারটা ছিল কিছুটা ঘরোয়া ধরনের। জলসার সমাপ্তির পরে আমরা যারা গুড়ের মাছির মতো উঠি উঠি করে উঠতে পারছিলাম না তারা আলোকিত আঙিনার এখানে সেখানে দুচারজন কর ছড়িয়ে জলসার আমেজটাকে নিয়ে রোমন্থন করছিলাম। একটা আদর্শবাদের সান্নিধ্যেও আমরা নিমগ্ন ছিলাম। এমনভাবে আলাপ করছিলাম যে, সময়-প্রবাহ যেন আমাদের আশে পাশে এসে থেমে গিয়েছিল। কিন্তু খানিকক্ষণ পরেই বুঝলাম আমরা ছাড়াও দুনিয়াতে আরও অনেক কিছুর অস্তিত্ব আছে। রাত এগিয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে আঙিনায় এখানে সেখানে বাঁশের খুঁটি থেকে ঝোলানো বাতিগুলোর চারধারে পোকার বৃত্তগুলো ক্রমেই বড় হচ্ছিল। শেষ পর্যন্ত রাত আরও একটু এগিয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে ওদের ঝাঁকগুলো এত বড় হয়ে উঠলো যে, আমরা বাতির তলা ছেড়ে আঙিনার অন্ধকার কোণগুলিতেও নিরুদ্বেগে বসে থাকতে পারলাম না। এক এক করে আড্ডাগুলো চায়ের কাপে চিনির ডেলার মতো মিলিয়ে যেতে লাগল। তখনও তেমন কিছু রাত হয়নি। তবু এক সময় খেয়াল হলো আমরা শুধু দু'জন বসে আছি। আমার বন্ধুটি হঠাৎ দূর থেকে ভেসে আসা কয়েকটা হাঁচির শব্দে যেন শিউরে উঠল। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে বলল, হেমন্তকাল যে এসে গিয়েছে, সে খেয়াল ছিল না, ওঠা যাক। হেমন্তকালের কথা শুনেই কিন্তু বন্ধুটি চলে গেলেও উঠলাম না। হেমন্তকাল শব্দটা কানে এসে লাগতেই চোখের সামনে

একটা মধুর দৃশ্য ভেসে উঠল। হেমন্তের মৌসুমে পূর্ব বাংলা শরতের শেষ বর্ষণে সিক্ত গ্রাম্য কুটিরে কুটিরে আঙিনা কঠিন হয়ে ওঠেনি এখনও। পায়ে ঠেকছে ঝরা পাতা। ভোর বেলার আকাশে পূর্বাকাশে সূর্যের রক্তবরণ চক্রের উঁকিঝুঁকি, পশ্চিমাকাশে এখনও অস্ত যাওয়া চাঁদ একটা স্তিমিত লণ্ঠনের মতো ঝুলছে। আঙ্গিনার ধারে ঝোপগুলিতে কচুপাতায় শিশির বিন্দুগুলি টলমল করছে। কিন্তু এই মাধুর্য বেশিক্ষণ স্থায়ী হলো না। যে বাস্তবের ধান্দায় পড়ে একালের কবি পূর্ণিমার চাঁদকে ঝলসানো রুটির সঙ্গে তুলনা করেছেন সেই বাস্তবের অঙ্কুশের আঘাতে ফিরে আসতে হলো হেমন্তের এমন একটা রূপে, যার সান্নিধ্যে কবিত্ব করা সম্ভব নয়। বাতির চারদিকে পোকার ঝাঁকগুলো এত বড় হয়ে উঠলো যে, আর বসে থাকা সম্ভব হলো না।

কিন্তু সেদিনকার অভিজ্ঞতার সূত্র আজও ছিন্ন হয়নি। কারণ সেদিনকার আলোর চক্রের পোকার ঝাঁকগুলোকে দেখতে দেখতে হঠাৎ আলোর ঝলকানির মতো মনে পড়ে গিয়েছিল এক প্রখ্যাত প্রিয় সংগ্রামী লেখকের মন্তব্য। মন্তব্যটা গত কয়েকদিন ধরে মনের মধ্যে ওলট-পালট করছে।

এই প্রিয় লেখক কোন বাতির চারদিকে ঝাঁকে ঝাঁকে জমা হতে থাকা পোকাগুলোকে লক্ষ্য করে মন্তব্য করেছিলেন, ওদের ঐ ঝাঁকগুলোকে দেখে আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় যে, ওরা দল বেঁধে ঐ আলোকে লক্ষ্য করে এসে জড়ো হয়েছে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ওরা দল বেঁধে জমা হয়নি। ওরা জমা হয়েছে প্রত্যেকে এককভাবে, জৈবিক প্রবৃত্তির আকর্ষণে আকৃষ্ট হয়ে। ওরা সকলেই ঐ আলোকে ঘিরে আবর্তিত হচ্ছে, কিন্তু ঐ ঝাঁকগুলোর মধ্যেই ওরা প্রত্যেকেই একক, একেবারেই আত্মনিমজ্জিত। আলোর লোভেও ওরা প্রত্যেকে একক। আলোর জন্য আত্মদানেও একক। ওরা জানে না যে, ওদের প্রত্যেকের মনে একই তাড়না, একই প্রেরণা। ওরা মন বিনিময় করতে পারে না।

আমার সেই প্রিয় লেখক অবশ্য এই মন্তব্য থেকে একটি সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিলেন। সেই সিদ্ধান্তটি এই যে, পোকার ঝাঁকগুলোর সঙ্গে মানব-গোষ্ঠীর তফাৎটা একেবারে মৌলিক। মানুষ সেই আদিম যুগ থেকেই জড়ো হতে শুরু করেছে এককেটা লক্ষ্যের চারদিকে দল বেঁধে। মানুষের এই দল বাঁধার মধ্যে জৈবিক প্রবৃত্তির সঙ্গে সঙ্গে কাজ করে আসছে সামাজিকতা, যার মূলে আবার রয়েছে সংঘবদ্ধ মেহনত। এই মূল অবশ্য মাটির তলায় ঢাকা থাকে বলে অনেক সময় নজরে পড়ে না। কিন্তু এই মূল, এই সত্য অখণ্ডনীয়। আদিম মানুষ দল বেঁধে কাজ করেছে আদি যুগে এবং আজ বিংশ শতাব্দিতে আলোকপ্রাপ্ত মানুষ এই দল বাঁধার ব্যাপারটাকে হাজার গুণ সচেতন করে তুলেছে। আমরা পোকার ঝাঁকগুলোকে ছাড়িয়ে এসেছি চারলাখ বছর আগেই। যেমন ছাড়িয়ে এসেছি বলগা হরিণের দলকে কিংবা জেব্রার পালকে কিংবা হস্তীযুথকে। আলোর চারদিকে আমরা যখন ছুটে গিয়ে জমা হই, তখন আমাদের সবাইকে অদৃশ্য বন্ধনে বেঁধে রাখে আমাদের সামাজিকতা। সিনেমার অন্ধকার ঘরে হয়তো আমরা এই কারণেই সামাজিক।

কিন্তু আজ যেমন সমাজতন্ত্রের যুগেও দেখা যায় সামন্ত যুগের মনোবৃত্তি আঁকড়ে ধরে রয়েছে মানুষকে চিনা জোঁকের মতো অনেক সময় অজান্তে, তেমনি হয়তো

আমরাও পোকার ঝাঁকের মতো কোন কোন সময় একত্রিত হই এবং আমাদের একক জৈবিক প্রবৃত্তিগুলি আমাদের ছিন্ন ভিন্ন করে দিতে চায়। সবচেয়ে আশ্চর্যের কথা এই যে আমরা বিস্মিত হই না যখন দেখি আমরা আলোর পোকার মতো আত্মনিবদ্ধ হয়ে পড়েছি এবং আমরা দাবিও করছি যে এটাই নিয়ম।

অবশ্য জনতার মিছিলে বিশাল প্রবাহ তথাকথিত এই নিয়মের দাবির ফানুসগুলিকে ফাঁসিয়ে দিয়ে সব সময়েই সামনে এগিয়ে চলেছে। আমরাও চরকির মতো নিজ চক্রে আবদ্ধ হয়ে ঘুরছি না। আমরাও এগিয়ে চলেছি-দল বেঁধে।

কার্তিক, ১৩৭১।

জনতার মুক্তধারায়

কোথায়! কোথায় তুমি চির-ভরপুর চিরসঙ্গ বা জীবনের নদী। অনেক দিন আগে একটা পাহাড়ীয়া নদীর পাশে বেশ কিছুদিন কাটিয়েছিলাম। আষাঢ় মাসে সেই নদীতে ঢল নামতো। শীতের মৌসুমে নদীর বুক ভরে উঠতো বালিতে। তারই মধ্য দিয়ে নদীর একটা ক্ষীণ ধারা তির তির করে বয়ে যেতো। সে ধারা ক্ষীণ হলেও তা চোখ দু'টোকে স্বচ্ছতায় ভরে দিত। কিন্তু খুব খারাপ লাগতো যখন দেখতাম, মাঝে মাঝে নদীর পানি আলকাতরার মতো চাপ চাপ হয়ে আটকে রয়েছে। দেখতাম, ওদের গতিপথকে আটকে দিয়েছে নদীর মৃত বক্ষ। দূষিত করে দিয়েছে। নদীই এখন তাকে কয়েদ করে বসে আছে। রূপালি ফিতার মতো বিসর্পিত জীবন্ত ধারাটিকে দেখে মন ভরত না তাই। মনে মনে আষাঢ়ের আবাহনী গাইতাম। মনে মনে বলতাম, ঐ দূষিত পঙ্কিলতায় নদীকে মানায় না। এ তার স্বভাব বিরুদ্ধ। নামুক সেই ঢল, যে ঢলে তার খাত তৈরি হয়েছিল, যে জন্য সে নদী নাম পেয়েছিল। হোক সে পাহাড়ীয়া নদী, তবু তো সে নদী। আমাদের আজকের শহরেও কতবার দেখলাম জনতার প্রবাহকে। এর দুই রূপকে দেখতে পেলাম। দেখলাম এ প্রবাহে যখন চেতনার ঢল নামে, তখন এর চেহারা অশান্ত হলেও এর মধ্যে কোথাও আবিলতা স্থির হয়ে দাঁড়াতে পারে না। কিন্তু ঢল যখন নামে না, তখন এর মধ্যে গজিয়ে ওঠে গস্নানি। জনতা হয়েও সে তার সত্তা হারিয়ে ফেলে। তখন তার চেহারা দেখলে বিরূপ হয়ে ওঠে মন। চোখে জল আসে। এই শতাব্দির অন্যতম শ্রেষ্ঠ লেখক-শিল্পী রোমাঁ রোলাঁও 'জা ক্রিস্তফ' উপন্যাসের নায়ককে অনুসরণ করে জনতার বহমান নদীসত্তাকে আবিষ্কার করতে প্রয়াস পাই।

শহরের পথে ভিড় ঠেলে, ভিড়ের মধ্যে গা ভাসিয়ে দিয়ে চলতে চলতেই যেন বুঝতে পারি, এর মধ্যেকার পানি কোনটা আর বালি কোনটা। খাতটাই নদী নয়, ভিড়টাই জনতা নয়। মাঝে মাঝে মনে হয় সে গড়িয়ে চলেছে। কিন্তু জলস্রোত হয়ে নয়, চলছে পাথরের মতো গড়িয়ে। যখন পাথরের মতো গড়িয়ে চলে, তখন মনে হয় আমার পাঁজরটাকে গুঁড়ো করে দিয়ে গেল। আবার এক সময় যখন নিজের মধ্যে নিজেকে ঢুকিয়ে নিয়ে একটা নির্জীব পদার্থের মতো গড়িয়ে চলতে থাকি, তখন হঠাৎ মনে হয় আমার চারদিককার হৃদয়হীন মানুষগুলো কোন এক যাদুর ছোঁয়ায় মুক্তধারা হয়ে গিয়েছে। রবীন্দ্রনাথের 'মুক্তধারা' নাটকের নায়কের মতো তখন আমার মনে হয়, এর কলকণ্ঠে আমার মাতৃভাষা।

যখনই জনতার রুদ্ধ রূপটাকেই সামনে দেখেছি তখন নিজেও নিজের গতিহীনতার গস্নানিতে গলা পর্যন্ত ডুবিয়ে পাঁকের মধ্য দিয়ে গড়িয়ে চলেছি। পথ চলতে চলতে জনতার দিকে তাকাবারও ইচ্ছা হয়নি।

আজ সকালে চোখের সামনে নবাবপুর রোড দিয়ে হঠাৎ করে জেগে উঠলো একটি সাধারণ মেয়ের মুখ। রবিবারের বেলা এগারোটায় উত্তরে বাতাসের ধারালো প্রবাহ ঠেলে রোদে মুখ সেঁকতে সেঁকতে আনমনে পথ চলছিলাম। হঠাৎ দেখি সামনে একটি মধ্যবয়সী মেয়েলোক একহাতে একটি বেডিং আর আরেক হাতে একটা টিনের সুটকেস নিয়ে একটা বন্ধ দোকানের সিঁড়ি থেকে উঠে দাঁড়াল। স্পষ্ট বুঝতে পারলাম, বোঝা দুটো হাত বদল করে মেয়েলোকটি আবার খানিকটা পথ অতিক্রম করার গতিবেগ সংগ্রহ করে নিয়েছে। শ্যামলা রং হলেও অদ্ভুত কমণীয় এর মুখশ্রী। মাথায় একটুখানি ঘোমটা। পরনে সরু পাড় শাড়ি।

মুখে একটা বেপরোয়া ভাব। সঙ্গে সঙ্গে অদ্ভুত শালীনতাবোধ রীতিবিরুদ্ধ কাজ করলাম। ফিরে দাঁড়িয়ে দেখলাম দক্ষিণমুখো মেয়েলোকটির চলে যাওয়াকে। কিন্তু মেয়েটি কোন এক নিমেষে আমার মন থেকে মুছে গেলো এবং আমার মনকে আরেক নিমেষে দখল করে বসলো জনতার বহমান নদীসত্তা। অদ্ভুত ভাল লাগল। পথের কোন লোককে দেখলাম না মেয়েটির দিকে বাঁকা দৃষ্টিতে তাকাতে। কেউ শিস দিল না। দুজন বদখদ চেহারার লোক মেয়েটিকে সসম্ভ্রমে পথ ছেড়ে দিল। জনতার হৃদয় থেকে উপচে পড়ল একটা সহানুভূতি। নিশাচরী নগরীর উম্মত্ততার খোরাকদের কথা কারও মনে এলনা। এ একটি মেহনতি মেয়ে। অন্তত এই মুহূর্তে সে মেহনতি। অবশ্য জনতা এ সম্বন্ধে সচেতন হয়ে উঠলো বলেই এমন হৃদয়বান হয়ে উঠল। আমি আবার উত্তরমুখো হয়ে চলতে চলতে ভাবতে লাগলাম, মেয়েটি কি জনতার এই দরদী রূপকে দেখতে পেয়েছে? আরও ভাবতে লাগলাম, ওর এই উপলব্ধি যদি জেগে থাকে, তবে তাকে পরিপূর্ণ করে তুলবার জন্য জনতার বুকে আজ নতুন করে জোয়ার নামুক। তা না হলে একটি সম্ভাবনার অপমৃত্যু ঘটবে।

পৌষ, ১৩৭১।

তরুণী জননী

আমাদের করতোয়া থেকে সুরমা অধিকাংশ শহর গাছপালা দিয়ে এমনভাবে ঢাকা যে, এদের মর্মভূমিতে না পা দিয়ে বুঝতেই পারা যায় না, নাগরিক জীবন তার সমস্ত আধুনিকতম সাজসরঞ্জামের তাগিদ আর অভ্রভেদী উচ্চাশা বুকে পুষে অপেক্ষা করছে আবরণ ভেদ করে আত্মপ্রকাশ করার জন্য। ঘাটের ধারাধারি গিয়ে নদীর বাঁকের স্টীমার থেকে কিংবা রেল স্টেশনের কাছাকাছি পৌঁছে ট্রেন থেকে মনে হয়, একটা উন্নত ধরনের গ্রামের নিভৃতির ঘুম ভেঙ্গে যাচ্ছে স্টীমারের ভৈরবীতে কিংবা ট্রেনের হুইসেলে। শহরের ভিতরে পা দিয়ে প্রথমে মনে হয়, এতো সেই অতি পুরাতন মফস্বল টাউন, যেখানে বাজারের রাস্তার বাইরেই সন্ধ্যার পরে মানুষের আনাগোনা থেমে যায়। নারকেল গাছ থেকে ডাব পড়লে অনেক দূর থেকে শোনা যায়। পথের কুকুরগুলোও

ঘুমিয়ে পড়ে মাঝরাত্রের অনেক আগে ঘণ্টার পর ঘণ্টা পথচারীর পায়ের সাড়া না পেয়ে; কিন্তু এখানেই নিতান্ত সাধারণ লোকের মনে খোঁচা দিয়ে বুঝতে পারা যায়, ঢাকা নগরীর সজাগ মানুষের তুলনায় আধুনিক সে কোন অংশেই কম নয়। তফাৎ মাত্র এই যে, খবরের কাগজে তার বক্তব্য ছাপা হতে হতে বাসি হয়ে যায়। তফাৎ এই যে, আজকের দুনিয়ার বুকের স্পন্দনকে মফস্বল টাউনের মানুষ বুকের মধ্যে পুষে রেখেছে, আর ঢাকা নগরীর মানুষ প্রকাশ্যে সেই স্পন্দনকে তরঙ্গে তরঙ্গে পাঠিয়ে দিতে পারছে ঊর্ধ্ব আকাশে। দুনিয়ার এদেশ-ওদেশ মহানগরী থেকে যখন নানা ধরনের আধুনিক মানুষ ঢাকায় আসে, তখন তাদের সঙ্গে অনায়াসে মিশবার সুযোগ পাচ্ছে এর নাগরিকরা। জানিয়ে দিচ্ছে ঢাকা নগরীও জেগে আছে। মফস্বল টাউনের মানুষের সে সুযোগই নেই। তারা অন্তঃশীল কিন্তু অপ্রস্তুত নয়। তাদের মনে ঘা মারলেই তারা বলে উঠে, জেগে আছি। রামপালের স্তিমিত দীঘি যেন মাঘী পূর্ণিমার উচ্ছল বারিধি হয়ে ওঠে।

অনেক অনেক বছর বাদে এমনি একটা গাছপালায় ঢাকা শহরে গিয়ে প্রথম দিকে অতীতের মায়াটাকেই এর প্রধান আকর্ষণ বলে মনে হয়েছিল। এর যে সব পুরানো চিহ্নগুলিতে বহুকাল আগেরকার ভাল লাগার স্পর্শ ছিল, সেগুলি আমাকে টানছিল চুম্বকের মতো। মনে হচ্ছিল, আমার চোখ বেঁধে দিলেও এর অগণিত গাছের তলা দিয়ে এবাড়ি ওবাড়ির ফাঁক দিয়ে চলে ফিরে বেড়াতে পারব। কিন্তু দুদিন থাকার পরেই বুঝতে পারলাম, এ শহরের অন্তরে এমন পরিবর্তন হয়েছে যে চোখ বেঁধে চলতে গেলে আমি এর বুকের স্পন্দনে হোঁচট খাব। আমার এই অনেক দিন আগেকার চেনা-জানা শহরের মানুষ আমাকে বলল, ঢাকা নগরী আধুনিক দুনিয়ার সঙ্গে তাল রেখে চলতে পারছে না কেন? সে আমাদের প্রতিনিধি। সে যদি ঝিমিয়ে ঝিমিয়ে এগোতে চায়, তাহলে যে আমাদের অর্থাৎ মফস্বল টাউনগুলোর জাত যায়। আমরা যে অবিশ্রান্ত ভাবে জেগে আছি।

ঢাকায় ফিরে এসে চাপা পড়ে গিয়েছিল মনের মধ্যে এই তাগিদ। গত উনিশ তারিখেরই হরতালের সকালে বুড়ীগঙ্গার ধারে বেড়াতে গিয়ে দেখলাম, মফস্বল শহর থেকে লঞ্চে যারা এসেছে তারা গাড়ির অভাবে নিজেরাই নিজেদের গাড়ি হয়েছে। অবসন্ন কাউকে দেখলাম না। একটি আধুনিকা তরুণী জননীকে দেখলাম, হেঁটে হেঁটে শিশু কোলে নিয়ে শহরের পথে গিয়ে উঠলো নিঃসঙ্কোচে। দেখলাম, আকাশের প্রভাতের মতোই তার মুখে একটি স্মিত হাসি। সে যেন বলে গেলো, বরাবরই তো জেগে আছি।

ফাল্গুন, ১৩৭১।

সাত নদীর মুখে

ফাল্গুন মাস ফুলের মাস, আমের মুকুলের মাস। দখিনা পবনের মাস। আমাদের বসন্ত ফাল্গুন পেরিয়ে চৈত্রে পড়তে না পড়তেই রোদে পুড়ে অঙ্গার হয়ে যায়। ফাল্গুনকে যদি কোনবার ঠাহর করতে না পারি, তবে সেবার ফুলকে হারাই, দখিনা বাতাস অতীতের স্মৃতি হয়েও মনে জেগে থাকে না। এই জন্যই বোধহয় মাঘ মাসের শীতে যখন সুন্দরবনের বাঘও কাঁপে, তখন থেকেই সজাগ হই কবে ফাল্গুন আসবে সেই দিনটির জন্য সজাগ হই সেই মৌসুমের জন্যে, যে আমাদের পুরানো পৃথিবীর জড়তা ঘুচিয়ে দেবার সঙ্গে সঙ্গে আমার প্রৌঢ় মনে 'বিমুখ প্রান্তরে'ও ফুল ফোটায়।

কিন্তু ফাল্গুনের কাছ থেকে কি শুধু ফুলের সুরভি আর দখিনা হাওয়ার ঝলকানি পেয়েই ক্ষান্ত হতে পারি? আমাদের ফাল্গুন আরও এমন সব সওগাত নিয়ে এসে আমাদের সামনে দাঁড়ায়, যাদের ফিরিয়ে দেবার সাধ্য নেই। একথা হয়তো সব সময় সচেতন মন নিয়ে ভাবি না। তবু ফাল্গুনের কাছ থেকে আরও কিছু গ্রহণ করি।

এবার বঙ্গোপসাগরের প্রায় কাছাকাছি একটা পল্লী অঞ্চলে গিয়ে হাজির হয়েছিলাম। সেখানে সাতটা নদী এসে মিলেছে একটা মোহনায়। এর একটা কিনারা দিয়ে যখন আমাদের লঞ্চটা পার হয়ে খালে ঢুকলো, তখন যাত্রীরা সবাই হাফ ছেড়ে বাঁচল। এতগুলো নদী এসে মিলছে, কিন্তু তবু সবাই উদাসী। নিস্তরঙ্গ, কিন্তু মমতাহীন। ফাল্গুনের বিকেল ওকে এতটুকু মধুর করে তুলতে পারেনি। পারেনি এই জন্য যে, ফাল্গুনের কাছ থেকে এই সাত নদীর মুখ যা চায়, তা হচ্ছে ঝড়ের দুলিয়াতি। ফাল্গুনেই এখানে ঝড়ের সঙ্কেত ভেসে আসে। এই সাত নদীর মুখে যে মাঝি-মাল্লারা নৌকা বেয়ে চলে, তারা সজাগ হয়ে ওঠে তাই ফাল্গুনে। ফাল্গুনে যে ঝড়ের সূত্রপাত হবে, তার জের চলবে চৈত্র ছাড়িয়ে বৈশাখ পর্যন্ত। খালের উপর ঝুকে পড়া শিমূল গাছগুলোর রক্তরাঙ্গা ফুলের আড়ালে কালো কোকিল বসে যে ঘরোয়া ডাক ডাকছে, সে ডাক শুনে যদি নরম মন নিয়ে মাঝি গিয়ে পড়ে কাল বদরে অথৈ পানিতে তবে আকাশের কোণে কালো মেঘের অগ্নিঝলক সে দেখতে পাবে না, সে ফাঁদে পড়বে। তাকে একথা মনে রাখতেই হবে যে, ফাল্গুন থেকে শুরু হয়ে যায় ঝড়ের আনাগোনা, মেঘনা থেকে তেঁতুলিয়া পর্যন্ত। আমাদের দক্ষিণে হাওয়া প্রলয় নাচনে মেতে যায় যেকোন মুহূর্তে। এবার সাত নদীর মুখে গিয়ে এ-কথাটা মনে পড়ল। আমাদের ফাল্গুন শুধু ফুলের নয়, উত্তাল তরঙ্গেরও। মনে হলো, ঝড় আসেনি; কিন্তু ঝড় আসছে। মেঘনার উপর দিয়ে গভীর রাতে পাড়ি দিয়ে, ঢাকায় ফিরতে ফিরতেও সে কথা মনে হল। লঞ্চে মিনিট পনেরো বাতি ছিল না, সেই জন্যই বোধ হয় আরও বেশি করে মনে হলো একথা। মনে হলো এই জন্য যে, যাত্রীরা এতটুকু আতঙ্কিত হলোনা। তারা ফিস ফিস করে ঘর-সংসারের কথা বলে যেতে লাগল। আমরা যে ঝড়ের দেশের মানুষ। সাত নদীর মুখের দেশের মানুষ। আমরা ফাল্গুনী।

ফাল্গুন, ১৩৭১।

আশ্বাস

একজন রেলওয়ে ইঞ্জিনের ড্রাইভার যখন ট্রেনের যাত্রী হিসাবে পাহাড়, প্রান্তর এবং অরণ্য ও গ্রাম-গ্রামান্তর ভেদ করে পাড়ি দেয় সূর্যাস্ত থেকে সূর্যোদয়ে, তখন কী যে তার মনোভাব হয়, সেটা জানতে ইচ্ছা করে। জানতে ইচ্ছা করে রিক্সাওয়ালা সপরিবারে রিক্সায় চেপে শহরে জনাকীর্ণ পথে ঠোক্কর খেয়ে চলতে চলতে কি কথা ভাবে। সেদিন ঢাকা শহরের উত্তর প্রান্তে নির্মীয়মাণ একটা পাঁচতলা আধুনিক কায়দার বিরাট দালানের পাশ দিয়ে চলতে চলতে দেখলাম, খানিক দূর দিয়ে আমার এক পরিচিত রাজমজুর সম্ভবত তার ছেলের হাত ধরে দালানটাতে ঢুকছে। দালানটা সমাপ্ত না হলেও নিচ তলায় অফিস বসে গিয়েছে। হয়তো সেই ছেলেটি এই দালানের নীচ তলায় কোন একটি দফতরে চাকরির উমেদার। হয়তো ঢাকা শহরের বস্তির বাসিন্দা রাজমজুরটির

মেহনত সিমেন্টের সঙ্গে এই দালানে গেঁথে গিয়েছে। কিন্তু তার অনুভূতির পল্লবিত রূপটা কি ধরনের সেকথা জানতে ইচ্ছা হয়। এরা কি সবাই সচেতন ভাবেই ব্যাপারটাকে মনে প্রাণে গ্রহণ করে? ইঞ্জিনের ড্রাইভার কি এক মুহূর্তের জন্যও ভাবে যে, ট্রেনটা তার 'স্পীড' বজায় রাখতে পেরেছে কিনা? রিক্সাওয়ালা কি রাস্তার গর্তের সারি এবং ট্রাফিক পুলিশের কথা এক মুহূর্তের জন্যও চিন্তা করে? রাজমজুর কি দালানের আস্তরের মধ্যে কি মসলা দেওয়া আছে সেকথা ভাবে?

আমার মতো আরও অনেকে হয়তো এই সিদ্ধান্তেই পৌঁছেছেন যে, এইসব ভাবনার ধার দিয়েই ইঞ্জিন ড্রাইভার, রিক্সাওয়ালা কিংবা রাজমজুরটি যায়নি, যাবে না। অন্তত আমরা যারা ইঞ্জিন ড্রাইভার নই, রিক্সাওয়ালা এই কিংবা রাজমজুর নই, তারা ট্রেনে, রিক্সায় কিংবা আকাশচুম্বী দালানের ভিতর দিয়ে চলতে চলতে যেমন কৌতুহল নিয়ে দেখি, শুনি, অনুভব করি, সে রকম কৌতুহল এদের থাকে না। ট্রেন যাত্রী একজন ড্রাইভারে সহযাত্রী হিসাবে কোন কোন সময় মনে হয়েছে যে, সে এখন আর ড্রাইভার হিসাবে পাহাড়-প্রান্তর, গ্রাম-গ্রামান্তর এবং নদী-নালাকে দেখছেন। ড্রাইভার হিসাবে সে হয়তো কয়েক লাখ মাইল পথ পার হয়েছে, কিন্তু ট্রেনের তৃতীয় শ্রেণির কামরার একজন যাত্রী হয়ে আজই হয়তো সে লক্ষ্য করল লাইনের পাশে জমে যাওয়া পানিতে শাপলা ফুলগুলোকে। এমনিভাবে হয়তো চেনা রিক্সাওয়ালার মনে এই কৌতুহল জাগলো পথের পাশে কোন দোকানের সাইনবোর্ড সম্বন্ধে, কিংবা প্রকাণ্ড দালানটার পাশে যে মেহগনি গাছটা আজও উচ্ছেদের নোটিশ পায়নি তার দিকে গভীর মমতার দৃষ্টিতে চেয়ে রাজমজুর ছেলের হাত ধরে গমগমে দালানটাতে ঢুকলে সে এই প্রথম শুনতে পেলো হয়তো সিঁড়িতে, প্যাসেজে হাজার হাজার পায়ের শব্দ, দেখলো ব্যস্ত-সমস্ত নর-নারীকে। মেহনত-মেহনতি মানুষের কাছ থেকে যে সতর্ক দাবি করে, যে একাগ্রতা দাবি করে, সেগুলি থেকে যেন অব্যাহতি পেয়ে যায় এরা। এখন এরা আর সমস্ত যাত্রীর মতো, আর সমস্ত নাগরিকের মতো দর্শক হতে পারে, ভোক্তা হতে পারে।

হয়তো এদের প্রত্যেকেরই মনে আছে অগাধ বিশ্বাস। নিজের নিজের লাইনের মেহনতি মানুষদের সম্বন্ধে। ড্রাইভার যাত্রী ঢুলতে ঢুলতেও মনের গহনে তার বিশ্বাসকে বয়ে নিয়ে চলেছে যে, ড্রাইভার-চালক জেগে আছে সার্চলাইট সামনে ফেলে! যে রিক্সাচালক আজ নিজেই রিক্সার যাত্রী, সে অজ্ঞাতসার আশ্বস্ত আছে যে, সপরিবারে সে লঞ্চঘাটে ঠিক সময়ে পৌঁছবেই। রাজমজুর জানে নির্মীয়মান দালানটা সমাপ্ত হবেই কারণ রাজমজুররা আছে পাঁচতলার ছাদে। সেখানে বৈশাখের খরবায়ু বইছে, কিন্তু ছয়তলা সাততলা উঠবে আকাশ ভেদ করে, উঠবেই।

বৈশাখ, ১৩৭২।

সাম্যবাদী উত্থান প্রত্যাশা :
আত্মজিজ্ঞাসা

স্বদেশ জিজ্ঞাসা

বিদ্যাসাগর : আধুনিক বিদ্রোহী রূপরঙ্গী

মাইকেল মধুসূদন দত্ত তাঁর 'বীরাঙ্গনা কাব্য' ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরকে উৎসর্গ করেছিলেন ১৮৬১-তে বিদ্যাসাগরকে 'বঙ্গকূলচূড়া' আখ্যা দিয়ে। ১৯৯১-তে এই বঙ্গকূলচূড়ার মৃত্যুশতবার্ষিকী উদযাপিত হয়েছে দুই বাংলাতেই নবজীবনের প্রত্যাশাকে সামনে রেখে। আবহমান বাংলার যুক্তিসিদ্ধ চিন্তা ও মুক্তবুদ্ধির ধারায় উনিশ শতকের অন্যতম পুরোধা মাইকেল মধুসূদনের উপরিউক্ত ভাবের গুরুস্থানীয় বিদ্যাসাগরের চিন্তা, সৃষ্টি ও নির্মাণ প্রয়াস শতাব্দিকাল পার হয়ে দুই বাংলার লোকসমাজের এবং নারীপুরুষ নির্বিশেষে বুদ্ধিজীবীদের কথায় ও কাজে আজও উপস্থিত। এই উপস্থিতি কিভাবে আরও সক্রিয় ও প্রাণবন্ত হতে পারে তা নিয়ে এবার ভাবনা চিন্তার নতুন করে সূচনা হয়েছে। বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের ক্ষেত্রেই হোক অথবা ধর্মনিরেপক্ষ তথা সর্বধর্মীয় অসাম্প্রদায়িক মনুষ্যত্বের সাধনার অঙ্গ হিসাবে নারী ও পুরুষকে সমান অধিকার ও সুযোগ প্রদানের ভিত্তিতে প্রাথমিক মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষার প্রসার সাধনে হোক, বিদ্যাসাগরকে পাওয়া যাচ্ছে নতুনতর উপলব্ধির মধ্য দিয়ে। ইতোপূর্বে দুই বাংলাতেই বিদ্যাসাগরের সার্ধশত জন্মবার্ষিকী উদযাপনে মার্কসীয় এবং সাধারণভাবে মুক্তবুদ্ধিসম্পন্ন ও বিভিন্ন পদ্ধতির নিরীক্ষায় যেসব বিষয় সামনে আসে। এবার সেগুলি নিয়ে গভীর চর্চা চলেছে, চলবে।

এই সমস্ত প্রয়াসের অঙ্গ হিসাবেই এখানে বিদ্যাসাগরের বিশেষ করে সাহিত্য সৃষ্টির দিকটিকে তুলে ধরছি। এ কালের আত্মিক, সামাজিক, রাজনৈতিক পালাবদলের আধুনিকতর রূপরসস্রষ্টা শিল্পী হিসাবে তাঁর প্রসারমান জনভিত্তিক উপস্থিতি হচ্ছে এই নিরীক্ষার মূল আলোচ্য বিষয়। তাঁর এ দিককার সৃষ্টি ও দৃষ্টি যে তাঁকে অবিরত বিদ্রোহী ও নির্মাতারূপে গত দুটো শতাব্দি জুড়ে জন উত্থানের বিভিন্ন ধারার পুরোভাগে রেখেছে–সেই ব্যাপারটাকে তিনটি ভাগে এখানে দেখানো হচ্ছে।

এই তিনটি ভাগ হলো: প্রথমত, বিদ্যাসাগরের আমল থেকে বিশ শতকের নব্বই এর দশক পর্যন্ত তাঁর শিল্পীরূপকে যেভাবে পর্যালোচনা করা হয়েছে, তার একটি চুম্বক। দ্বিতীয়ত, আরও যেভাবে এই শিল্পীরূপকে বুঝে নেবার প্রয়োজন রয়েছে, সে সম্বন্ধে খোঁজ-খবর। তৃতীয়ত, বিদ্যাসাগর ও মাইকেল মধুসূদন দত্তের মধ্যে আধুনিক নান্দনিকতার হৃদয়ঘটিত বিদ্রোহী কাজ নিয়ে যে বোঝাপড়া ছিল, তার আলোকে বিদ্যাসাগরকে যুক্ত করে আজকের প্রেক্ষাপটে ভূমিকা গ্রহণকারী হিসাবে দেখা।

॥ ২ ॥

প্রথমে দেখা যাক, বিদ্যাসাগরের সমসাময়িক নিরীক্ষক থেকে শুরু করে সাম্প্রতিক পর্যালোচকরা বাংলা সাহিত্যে তাঁর কারিগরিকে কি চোখে দেখেছেন। এখানে এ প্রসঙ্গে তিনজনের অভিমতের উল্লেখ করছি।

প্রথমেই দেখা যাক, বিদ্যাসাগরের সময়ের বাংলা সাহিত্যের দিকপাল এবং বিশেষ করে প্রথম বাংলা উপন্যাস রচয়িতা বঙ্কিমচন্দ্র কি বলেছিলেন। সেদিন বঙ্কিমচন্দ্র উনিশ শতকের মাঝামাঝি নাগাদ বাংলা গদ্যের নবনব বিন্যাসের অন্যতম প্রয়াসী 'আলালের ঘরের দুলাল' প্রণেতা প্যারীচাঁদ মিত্রকে নিয়ে লিখতে গিয়ে বিদ্যাসাগরের সাহিত্যসৃষ্টিকে পাশাপাশি রেখে বিচার করেছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র মন্তব্য করেছিলেন যে, বিদ্যাসাগরের ভাষা সুন্দর ও মনোহর এবং এমন সুন্দর বাংলা ইতোপূর্বে কেউ লেখেন নি, ভবিষ্যতেও কেউ লিখতে পারবেন না। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই বঙ্কিমচন্দ্র মন্তব্য করেছিলেন যে, অক্ষয়কুমার দত্ত এবং বিদ্যাসাগরের সাহিত্য লোকজীবন থেকে আসেনি, সর্বজনবোধ্যও নয়। বঙ্কিমচন্দ্র প্যারীচাঁদ মিত্রকে জনজীবনবাদী শিল্পীদের অগ্রণীরূপে চিহ্নিত করেছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রের মতে বিদ্যাসাগরের সমস্ত লেখাই সংস্কৃত সাহিত্য থেকে উৎসারিত, ঠিক যেমন অক্ষয়কুমার দত্তের সমস্ত কাজের উৎস ইংরেজি সাহিত্য।

আজ আমরা যারা অনেকেই বঙ্কিমচন্দ্রের সৃষ্টিকে আধুনিক লোকমুখী বলতে নারাজ তারা তাঁর উপরিউক্ত বক্তব্যের লোকজীবন ভিত্তিকতার তাগিদে বিস্মিত বোধ করতে পারি। তবে বঙ্কিমচন্দ্রের এই লোকমুখী দিক দিয়েই একটা আগ্রাসী চিন্তা যে তৎকালীন বাংলার নবজাগৃতির সৃষ্টির নান্দনিক আকাঙ্ক্ষাই প্রকাশ ছিল, সেটা আমরা বুঝে নিতে পারি বঙ্কিমচন্দ্রের কথা থেকে। তাছাড়া পূর্বসূরীকে ছাড়িয়ে যাবার চেষ্টাও বিদ্যাসাগরের সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্রের উপরিউক্ত মন্তব্যের মূলে ছিল বলে অনুমান করা যেতে পারে। বস্তুতপক্ষে জনমনোহর সৃষ্টির ধারা এইভাবেই শিল্পীদের স্বাতন্ত্র ও অভিমানের মধ্য দিয়ে দ্বান্দ্বিক মিল-অমিলের পথে এগিয়ে আসে। তবে বিদ্যাসাগরের লোকমুখী সাহিত্য সৃষ্টির রূপ ও রসের ধারা কয়েকটি কারণে স্বাভাবিকভাবেই সেদিন বঙ্কিমচন্দ্রের চোখে পড়েনি। আজও যেটা ঘটে। সেই কারণটা হলো, বিদ্যাসগার ডাকসাইটে পণ্ডিত, শিক্ষক, সমাজ সংস্কারক ও নির্মাতারূপে সেই সময়ে কলকাতা ও বঙ্গসমাজে বিরাজ করছিলেন। তাঁর নারীসমাজের প্রতি শ্রদ্ধার কিংবা নারীর অধিকার নিয়ে আন্দোলনের কার্যক্রমের মধ্যে আধুনিকতাপন্থী মানবিক নান্দনিক দৃষ্টিভঙ্গীয় নারীহৃদয় সম্পর্কিত চিন্তাভাবনা ফল্গুধারার মতো বয়ে যাচ্ছিল। তিনি দাবিদারও ছিলেন না মৌলিক রূপ ও রসসৃষ্টির। তাছাড়া বিধবা বিবাহের ব্যাপারে বিদ্যাসাগরের সেই সময়ের বঙ্গ সমাজে বিদ্রোহী উদ্যোগ ও অবস্থান তাঁকে সামাজিক জীবনধারায় বিতর্কের কেন্দ্ররূপে স্থাপন করেছিল। এই প্রশ্নেই উপন্যাস শিল্পী হিসাবে বঙ্কিমচন্দ্রের স্বাভাবিক নারীচরিত্র ঘটিত বহুমাত্রিক ও মুক্তবিচারী চিন্তাভাবনার স্বচ্ছন্দ ধারা তাঁরই বিধবা বিবাহ-বিরোধী অবস্থানের দরুন আচ্ছন্ন হয়েছিল। বিদ্যাসাগরকে সার্বিকভাবে বুঝবার জন্য বঙ্কিমচন্দ্রের তরফের উদ্যোগ এই কারণেই ব্যাহত হয়ে থাকতে পারে।

বঙ্কিমচন্দ্রের পরে রবীন্দ্রনাথ বিদ্যাসাগরকে নিয়ে বেশ খানিকটা এগিয়ে এলেন নান্দনিক নিরীক্ষায়। তবে তিনি স্থাপন করলেন বিদ্যাসাগরকে প্রধানত বঙ্গসমাজের আদর্শ পুরুষরূপে।

বিদ্যাসাগরের মৃত্যুর চার বছর পরে রবীন্দ্রনাথ 'চরিত্র পূজা' নাম দিয়ে যে নিবন্ধমালা লেখেন, তার প্রথম চরিত-কথাটি হলো বিদ্যাসাগরের। এই নিবন্ধেই তিনি বিদ্যাসাগরকে বাংলাভাষার 'প্রথম যথার্থ শিল্পী' বলে অভিহিত করলেন। দেখালেন যে, বিদ্যাসাগর বাংলা গদ্যকে সাহিত্যে ব্যবহার করেছেন বাকরীতির ভাঙচুর ও পুনর্বিন্যাস ঘটিয়ে।

এই চরিত-কথাটিতে এ ব্যাপারে তিনি আর অগ্রসর হন নি। রবীন্দ্রনাথ সামাজিক ও ব্যক্তিক দিক দিয়ে বিদ্যাসাগরের বিদ্রোহী ও মনুষ্যত্ববাদী অসাম্প্রদায়িকতা ও ধর্মনিরপেক্ষতা, হৃদয়বত্তা ও বুদ্ধিমত্তাকে বড় করে সামনে রাখলেন। রবীন্দ্রনাথের লেখাটির প্রধান সুর হলো, বিদ্যাসাগরকে তদানীন্তন কলকাতা বা বাঙালি সমাজে একটা বিরূপতা ও বিপক্ষতার ঘের থেকে বের করে এনে বাংলা নব-জাগৃতির প্রবল প্রাণবান অপরাজেয় প্রতিভূরূপে দেখানো।

পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথ বিদ্যাসাগরকে নিয়ে আরেকটি নিবন্ধ লেখেন। এতে তিনি বলেন যে বিদ্যাসাগরের আধুনিকতা আগামী দিনেও আধুনিকই থাকবে। অর্থাৎ, গতানুগতিকতা থেকে লেখকসমাজের মুক্ত হওয়া কিংবা থাকার পক্ষে পাওয়া যাবে ভবিষ্যতেও বিদ্যাগারের চিন্তা-ভাবনাকে। রবীন্দ্রনাথ এই আধুনিকতার রূপ-রস বিচার করেন নি।

বিদ্যাসাগরের আধুনিকতার এই দিকটাকে আমরা বড় মাত্রায় দেখতে পাই শ্রীগোপাল হালদারের ইদানীংকালের লেখায়। ১৯৭০ সালে বিদ্যাসাগরের সার্ধশত জন্মবার্ষিকীতে তাঁর নামে কলকাতায় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন উপাচার্য শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ সেনের সভাপতিত্বে জাতীয় স্মারক সমিতি গঠিত হল। এই সমিতির এবং কলকাতার নিরক্ষরতা দূরীকরণ সমিতির যুগ্ম উদ্যোগে প্রকাশিত হলো শিক্ষা, সমাজ এবং সাহিত্য ও বিবিধ নাম দিয়ে তিন খণ্ডে বিদ্যাসাগরের রচনাবলি ১৯৭২ সালে। সম্পাদক শ্রীগোপাল হালদার তিনটি খণ্ডেরই পৃথক পৃথক ভূমিকায় বিদ্যাসাগরের সমগ্র সৃষ্টির যে পর্যালোচনা করলেন, তাতে বঙ্কিমচন্দ্র এবং রবীন্দ্রনাথের উপরিউক্ত বক্তব্যকে নতুন করে জনসমাজে পৌঁছে দেবার সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যাসাগরের রস-রূপ-রাগ সমন্বিত লোকায়ত শিল্পীরূপকে তুলে ধরলেন রচনাবলিতে প্রকাশিত বিদ্যাসগারের দুটি দুস্প্রাপ্য লেখার আলোকে। এই দুটি লেখা হচ্ছে 'বিদ্যাসাগর চরিত' (আত্মজীবনী) ও 'প্রভাবতী সম্ভাষণ'।

এই দুটি লেখাই অবশ্য বিদ্যাসাগরের জীবিতকালে প্রকাশিত হয়নি। হয়তো বিদ্যাসাগর নিজেই এদের খুব বেশি রকমভাবে নিজের জীবনের সঙ্গে জড়িত বলেই এদের সম্বন্ধে কিছু বলেও যাননি। বঙ্কিমচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মৃত্যুর পরে মাত্র চার মাস বেঁচে ছিলেন। তাঁর চোখে এই দুটি লেখা পড়ার প্রশ্নই ওঠে না। এই দুটি লেখা পড়লে হয়তো তিনি নতুন করে ভাবতেন বিদ্যাসাগরের মাধুর্য সম্বন্ধে। রবীন্দ্রনাথেরও অগোচরে থেকে যায় এই লেখা দুটি। এই লেখা দুটি পেলে তিনি বিদ্যাসাগরের আধুনিকতাকে রূপরসের অধিকারী আধুনিকতা বলে দেখাতেন নিশ্চয়ই।

১৯৭২'এর বিদ্যাসাগর রচনাসমগ্র প্রকাশের একটি বড় সার্থকতা এই দুটি লেখাকে সমগ্র লোকসমাজের গোচরে আনা।

শ্রীগোপাল হালদার তাঁর ভূমিকাতে বিদ্যাসাগরের বিদ্রোহী নির্মাতা হিসাবেও বিভিন্ন কাজের দিকটিকে গত শতাব্দির ও সমসাময়িক বিশ শতকের বিদ্যাসাগর নিরীক্ষায় আলোআঁধারিতে রেখে বিচার করেছেন। বিদ্যাসাগরের সীমাবদ্ধতা ও সীমানা লঙ্ঘনের দ্বান্দ্বিকতার প্রতিও তাঁকে অবহিত থাকতে হয়েছে। তার এই ধরনের বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের মধ্যেও শ্রীগোপাল হালদার মাঝে মাঝে আবেগের রাশ ছেড়ে দিয়েছেন। উপরিউক্ত লেখা দুটি নিয়ে তাঁর বক্তব্য এই আবেগ প্রধান বিশ্লেষণের মধ্যে পড়ে। তবু রচনা সমগ্রর ভূমিকা লেখক হিসাবে তিনি এই বিষয়টি নিয়ে দুবার কথাই বলতে পেরেছেন।

এখানে আমরা তাঁর বক্তব্যকে সূত্র করে বলতে পারি, 'বিদ্যাসাগর চরিত' এমন একটি লোকায়ত আত্মকথা, যাকে ম্যাক্সিম গোর্কির 'শৈশব' বইটির পাশাপাশি রাখা দরকার। আর, 'প্রভাবতী সম্ভাষণ' বাংলা গদ্যকবিতার একটি আদি সৃষ্টি।

আমরা আশা করব, শ্রীগোপাল হালদারের উপস্থাপিত এই দুটি লেখাই যে শুধু ব্যাপকতর আলোচনার মধ্য দিয়ে আজ ও আগামীতে লোকসমাজের কাছ থেকে সমাদর আদায় করবে তা নয়। বিদ্যাসাগরের সাহিত্য সংক্রান্ত অন্যান্য সমস্ত সৃষ্টিরও চাপা পড়ে থাকা রূপরসের এবং মৌলিকতা ও আধুনিকতার পুনর্বিবেচনার তাগিদ সৃষ্টি করবে বড় মাত্রায়। দৃষ্টান্ত হিসাবে এখানে বলবো, আশা করব বিদ্যাসাগরের 'শকুন্তলা' ও 'সীতার বনবাস' নতুন করে ব্যাপকতরভাবে পঠিত হবে এবং সংস্কৃত কাব্য সাহিত্যের আস্বাদনের সঙ্গে সঙ্গে এদের মধ্যে শুধু উনিশ শতকের নয়, চলতি বিশ এবং আসন্ন একুশ শতকেরও "মনুষ্যজীবন ও স্বভাবের অনন্ত ভাণ্ডারের রস ও রূপ এবং আনন্দ বেদনার খোঁজ" পাওয়া যাবে। বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ ও শ্রীগোপাল হালদারের উপরিউক্ত নিরীক্ষার প্রসঙ্গটি এখানে এই বলে শেষ করব যে, বিগত এক শতাব্দিকাল বিদ্যাসাগরের রসাবিষ্ট লোকমুখী শিল্পীরূপকে কেন্দ্র করে আরও অনেকে বেশ কিছু কথা বলে থাকবেন। এইসব নিরীক্ষক এবং এঁদের বক্তব্যের তেমন কোন উত্তরণ হয় নি। বিদ্যাসাগরের শিল্পীরূপকে আজ যেমন লোকসমাজের পক্ষ থেকে ব্যাপকভাবে সামনে নিয়ে আসা কাম্য হয়ে দাঁড়িয়েছে, তেমনি এই রূপরস বিচারের যে সব সূত্র চাপা পড়ে রয়েছে, তাদেরও সামনে নিয়ে আসার জন্য খোঁজখবর জরুরি হয়ে দাঁড়িয়েছে।

॥ ৩ ॥

এবার আমাদের প্রস্তাবনার দ্বিতীয় ভাগটিতে আসা যাক। এখানে আমরা বিষয়টির দুটো দিকের কথা বলবো।

একটা দিক হলো, বিদ্যাসাগরের রচনাতে রয়েছে বাংলাভাষীদের কাছে সহজ করে বলা সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের সারমর্ম অথবা সংস্কৃত কাব্যের সমস্ত উপাদানকেই বড় করে সামনে রেখে 'সীতার বনবাস' ও শকুন্তলার মত বাংলা উপাখ্যান। এই ধরনের পরিবেশনার মধ্যে রয়েছে বাংলার লোকসমাজকে প্রাচীন কাব্য সাহিত্যের দুঃখিনী নায়িকাদের প্রতি ভাবে ও অনুভবে সমব্যথী করে তোলা। লেখাগুলিতে পাণ্ডিত্যের অভিমানের ছায়ামাত্রও নেই। এদের মধ্যে এনেছে একটা বাঙালি ঘরানাও। ধ্রুপদী বা পৌরাণিক সংস্কৃত কাব্য-সাহিত্যকে বিদ্যাসাগর বাংলার লোকায়ত উপাখ্যানের

ধারাতেই ফেলেছেন। অবশ্য গদ্যে। এখানে যদি কোথাও আড়ষ্টতা এসে থাকে, তবে সেটা ঘটেছে একটা নতুন পথ করার চেষ্টার দরুন। পৌরাণিক ও ধ্রুপদী সংস্কৃত কাব্য-সাহিত্যকে এইভাবে বাংলার লোক-পাঠক-পাঠিকাদের উপযোগী করে বাংলা গদ্যে ঢালার কাজটাও ছিল এক ধরনের মৌলিক আধুনিক সৃষ্টি। সংস্কৃত ভাষা ও বাংলা ভাষাতে বিস্ময়কর যুগপৎ দখল থাকার জন্যেই এই কাজটা সম্ভব হয়েছিল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আশ্চর্য লাগে বিদ্যাসাগরের আরও একটা কৃতিত্বের কথা ভেবে। বিদ্যাসাগর সেদিন প্রাচীন আধুনিক ও ভাবীকালের নারীচিত্রের মনুষ্যত্ববাদী মর্যাদার দাবি ও আশা-আকাঙ্ক্ষাকে এক সহজ সরল ধারাবাহিকতা দিতে পেরেছিলেন।

বিদ্যাসাগরের এই উপাখ্যান রচনার রীতি সম্বন্ধে আরেকটা কথা। বিদ্যাসাগর সংস্কৃত কাব্য-সাহিত্যের পণ্ডিত রত্নাকর হিসাবে বেশ কয়েকটি সংস্কৃত কাব্যের মূল পাঠের প্রকাশনায় সম্পাদনা ও বিজ্ঞাপন রচনা করেন। এখানে তিনি একজন শিক্ষক হিসাবে মূল পাঠককে বড় করে উপস্থিত করেছেন। কিন্তু যখন এদের নিয়ে তিনি উপাখ্যান রচনা করেছেন তখন বিজ্ঞাপন কিংবা ভূমিকাতে একটা কথা বারবার বলেছেন। সেটা হচ্ছে, তিনি আশা করেছেন, যাঁরা তাঁর রচিত এই উপাখ্যান পড়বেন তাঁরা এতে 'প্রীত' হবেন। অর্থাৎ জ্ঞানের পাশাপাশি এখানে আহলাদের ভাবটিকে বড় করেই দেখাতে চেয়েছেন। একমাত্র মহাভারতের আদি পর্বের যে বাদানুবাদ করেছেন তিনি, সেখানে বলেকয়েই বিশেষজ্ঞদের উপর জোর দিয়েছেন।

আমাদের দ্বিতীয় ভাগের দ্বিতীয় দিকটি হলো এই যে, বিদ্যাসাগরের রচনাবলিতে দেখা যায়, তিনি 'শব্দসংগ্রহ' নাম দিয়ে একটা ছোটখাটো 'চলন্তিকা' তৈরি করেছিলেন। তাঁর এই সংগ্রহে রয়েছে বাংলার লোক-সমাজের বিভিন্ন কাজে কর্মে ব্যবহৃত কয়েক হাজার চলিত শব্দ। বাংলা বর্ণমালা অনুসারে এরা সাজানো। এদের আভিধানিক অর্থ অবশ্য তিনি বসান নি। তবে এই শব্দভাণ্ডারে প্রবেশ করলে বাংলার লোক-সমাজের কাউকেই অর্থের জন্য হাতড়াতে হবে না।

'বিদ্যাসাগর চরিত' রচনার অথবা বিশেষ করে বিভিন্ন প্রশ্নের বিতর্কে জবাব দেবার সময় লোকভাষার আশ্রয় নিতে গিয়ে উপরিউক্ত ভাণ্ডারের কিছু শব্দ তিনি ব্যবহারও করেছেন।

প্রথমত, এই শব্দগুলো ব্যবহার করে রসাবেশ ঘটানো হয়েছে। দ্বিতীয়ত, বিদ্যাসাগর যে লোকভাষা ব্যবহারের ব্যাপারে ছুৎমার্গের ধার ধারতেন না, তার প্রমাণ তিনি শব্দভাণ্ডারে রেখে গিয়েছেন।

॥ ৪ ॥

এবার আমাদের প্রস্তাবনার তৃতীয় অংশ। অর্থাৎ বিদ্যাসাগর ও মাইকেল মধুসূদন দত্তের সহমর্মিতা ও সহযোগিতার আবেগ-রূপ-রাগ সম্বলিত ঘটনা ধারা।

'মেঘনাদ বধ' গ্রন্থের মহাকাব্যিক রচয়িতা মাইকেল তাঁর 'বীরাঙ্গনা' কাব্য গ্রন্থটিকে যে বিদ্যাসাগরকে উৎসর্গ করেছিলেন, তার উল্লেখ শুরুতেই করেছি। এই কালে শকুন্তলা, দ্রৌপদী, সূর্পণখা প্রমুখ এগারো জন পৌরাণিক নারীর আত্মমর্যাদাবোধ, মর্মবেদনা ও ক্ষোভ প্রকাশ পেয়েছে একালের শুধু উনিশ শতকেরই নয়, বিশ ও আসন্ন একুশ শতকের উপেক্ষিতা ও নিপীড়িতা নারীর অধিকার সচেতনতার বিস্ফোরিতধারায়।

এই 'বীরাঙ্গনা' কাব্যের উৎসর্গের বয়ানটি নিম্নরূপ :

"মঙ্গলাচরণ...বঙ্গকূলচূড়া শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের চিরস্মরণীয় নাম এই অভিনব কাব্যশিরে শিরোভূষণরূপে স্থাপন করিয়া কাব্যকার ইহা উক্ত মহাপুরুষের নিকট যথোচিত সম্মানের সহিত উৎসর্গ করিল ইতি ১২৬৮ সালের ১০ই ফাল্গুন"।

এখানে আমরা শুধুমাত্র একটি কথাই বলে রাখবো যে, পৌরাণিক কাহিনির ভিত্তিতে গদ্যে রচিত শকুন্তলার উপাখ্যানের সঙ্গে মাইকেলের পৌরাণিক কাহিনির ভিত্তিতে রচিত 'বীরাঙ্গনা' কাব্যের শকুন্তলার কথার মধ্যে একটা মিল রয়েছে। নারী সমাজকে উপেক্ষার ঘের থেকে বের করে আনার প্রয়াসের দিক থেকে এই দুটো ব্যাপারই ছিল সেই মুক্ত চিন্তার জাগৃতির প্রকাশ, যা আধুনিকতার ধারাকে আশ্রয় করে একটি শতাব্দি অতিক্রম করে ক্রমেই লোকমুখী হয়েছে বেশি বেশি করে।

আজ এ কথা মনে হতে পারে যে, দুজনে যেন যুক্তি করে আধুনিক নান্দনিক লোকায়ত ধারার বাংলাকাব্যে পৌরাণিক ও ধ্রুপদী সংস্কৃত কাব্যসাহিত্যের নায়িকাদের বাংলার লোকসমাজে উপস্থিত করেছিলেন। আসলে তো এটা ঘটেনি। অর্থাৎ তাঁদের 'যুক্তি করার' জন্য বলতে হয়নি। সেদিনকার ব্রিটিশ সাম্রাজ্যিক শাসন ও শোষণের পাকাপোক্ত বুনিয়াদ গড়ে ওঠার জাঁতাকলের মধ্যেই ইউরোপের তদানীন্তন গণতান্ত্রিক বিপ্লবী উত্থান পরম্পরার সঙ্গে যুক্ত বুদ্ধিজীবীদের মুক্তচিন্তার নবজাগৃতির বিদ্রোহী স্ফুলিঙ্গগুলি কলকাতার তথা তদানীন্তন যুক্ত বাংলার নব্যবিত্ত শিক্ষিতদের চিন্তাভাবনায় এসে পড়েছিল সমস্ত অবরোধ ভেঙ্গে। এতে বাংলার বুদ্ধিজীবী মহলে যে সাধারণভাবে সমতার অর্থে সাম্যমুখী পরিবেশ গড়ে উঠেছিল, তারই আবহে বিদ্যাসাগর ও মাইকেল পরস্পরের আত্মার আত্মীয় হয়েছিলেন দুজনেই সামাজিক দিক দিয়ে বিদ্রোহী অবস্থান নেয়ার ফলে। ভাষায় এই বিদ্রোহকে রূপ দেয়ার ক্ষেত্রে দুজনের নিজস্বতা প্রকাশও ছিল স্বাভাবিক। নিজস্বতা অবশ্যই ছিল শৈলীতেও। দুজনের একজন ছিলেন মানসিকতার দিক থেকে বস্তুবাদী দর্শনের যুক্তি ও বুদ্ধির স্থিতধী প্রস্তাবক। আরেকজন ছিলেন আবেগে উন্মথিত অশান্ত ও অস্থির রূপকার। জীবন চর্চার ধারা ছিল দুজনের দুরকম। দুজনেই বৃত্তির দিক থেকে সরকারি প্রতিষ্ঠানের কর্মীরূপে জীবিকা নির্বাহ করলেও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এক নাগাড়ে প্রায় শেষ পর্যন্ত সরকারি পদের প্রতি কোন মোহ না থাকলেও শিক্ষা সংক্রান্ত দায়বদ্ধতার কারণে চাকরীতে টিকে গিয়েছেন। অপরদিকে মাইকেল মাঝে মাঝেই উল্কার মতো ছুটে বেড়িয়েছেন এক চাকরী থেকে অন্য চাকরীতে। বিদ্যাসাগর ছিলেন সাংসারিক দিক থেকে ধ্রুবতারার মতো স্থির, মাইকেল ছিলেন সমুদ্রের জাহাজের মত ভ্রাম্যমাণ। কিন্তু দু'জনের মেল-বন্ধন ঘটেছিল একেবারে খাঁটি বাঙালি ও বঙ্গভাষার সেবকরূপে, উনিশ শতকের বাংলার বহুমুখী জাগরণের দুই কর্ণধাররূপে।

আজ আমরা উনিশ শতকের বাংলার রেনেসাঁ বা নবজাগৃতি বা বুদ্ধির মুক্তির সমগ্র ঘটনাকেই শিক্ষিত মধ্য বিত্তদের কাণ্ডকারখানা বলে সচরাচর চিহ্নিত করি। কোন কোন সময়ে আমরা বিশেষ করে বর্তমান বিশ শতকের বিশের দশক থেকে অবিশ্রান্তভাবে চলে আসা অভ্যুত্থানের কতকগুলি দাবি, কর্মসূচি ও তাগিদের উনিশ শতকের জাগৃতিতে একেবারেই অথবা পুরোপুরি না পেয়ে ক্ষুব্ধ হয়ে পুরো জাগৃতিটাকেই জন-সম্পর্কহীন বলে ধরে বসি। আমরা বিশেষ করে গত এক শতাব্দির বিশ্ব জোড়া

সমাজতান্ত্রিক বৈপ্লবিক উত্থানের সারবত্তা দিয়ে পরিমাপ করে বিদ্যাসাগর ও মাইকেলকেও কিছুটা সেকেলে বলেই ধার্য করে বসি। এটা একটা রেওয়াজও হয়ে ওঠে। কিন্তু ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর সার্ধশত জন্মবার্ষিকীর অথবা মৃত্যুশতবার্ষিকীর নব পর্যায়িক পর্যালোচনার মধ্য দিয়ে বিদ্যাসাগর মাইকেল এবং অন্যান্য সবার সৃষ্টি ও কর্মকাণ্ডের ধারাকে আজকের লোকজীবনের প্রেক্ষাপটে রাখতে গিয়ে আমরা দেখতে পাচ্ছি, তাঁরা আজকের আধুনিক বিজ্ঞানী পর্যায়েরও অন্তর্ভুক্ত।

এদিক থেকে এই মুহূর্তে আমরা বিদ্যাসাগর ও মাইকেলকে এবং রবীন্দ্রনাথ ও স্বামী বিবেকানন্দ, মীর মোশাররফ হোসেন এবং এমনকি বঙ্কিমচন্দ্রকে ও দীনবন্ধু মিত্রকে আজকের ধর্মনিরপেক্ষ তথা সর্বধর্মীয় মানবতাবাদী সাম্যবাদী প্রয়াস ও ভাবনা চিন্তাতে একাত্ম করে নেবার যুক্তি খুঁজে পাচ্ছি।

এই সূত্রেই সেদিনকার প্রশান্ত বিদ্যাসাগরের মধ্যে যে ঝড় ছিল বিশেষ করে শিল্পীরূপে, তাকে বুঝে নেবার তাগিদেই আমাদের শরণাপন্ন হতে হবে বিশেষ করে মাইকেল মধুসূদন দত্তের।

সাহিত্যের যে কাজকে মৌলিক সৃষ্টি বলা হয়, তার প্রাচুর্যের কথা ভাবতে গেলে মাইকেলের পাশে সাধারণ ওজন দরে বিদ্যাসাগরকে বুঝতে গেলে মাইকেল-বিদ্যাসাগরের জুটির ধারণাটাকে জোরাজুরি বলে মনে হতে পারে। কিন্তু গভীরভাবে এই বিষয়টাকে তলিয়ে দেখলে দেখা যাবে, মাইকেলের বড় মাপের কাব্যে কাজের একটা দিক বিদ্যাসাগরকে জড়িয়ে রয়েছে। বিদ্যাসাগরকে মৌলিক সাহিত্য সৃষ্টির রত্নাকর রূপেই দেখেছিলেন মাইকেল।

মাইকেলের দুটি চতুর্দশপদী কবিতা বিদ্যাসাগরকে নিবেদিত। 'বীরাঙ্গনা কাব্য' বিদ্যাসাগরকে উৎসর্গ করার কথাটি তো কিছুটা বিস্তারিত ভাবেই বলা হয়েছে। মাইকেলের চতুর্দশপদী কবিতাসমূহের মধ্যে রয়েছে 'সীতার বনবাসে' ও 'শকুন্তলা'। এরা একদিক থেকে যেমন মাইকেলের বিশিষ্ট চিন্তাভাবনাকে উদ্ভাসিত করেছে, তেমনি বিদ্যাসাগরের সঙ্গে তাঁর সহযোগী সৃষ্টির ভাব ও অনুভবের অন্তরঙ্গ প্রক্রিয়াটিকেও ব্যক্ত করেছে।

অর্থাৎ, মাইকেলকে বুঝবার জন্য বিদ্যাসাগর এবং বিদ্যাসাগরকে বুঝবার জন্য মাইকেল প্রতিনিয়ত আমাদের জীবনচর্চায় উপস্থিত হয়েছেন।

স্বামী বিবেকানন্দ : সহযাত্রী সাম্যবাদী

একশ বছর হতে চলল। উনিশ শতকের শেষ দশকে এবং বিশ শতকের শুরুর মাত্র দেড় বছরে যখন স্বামী বিবেকানন্দের বয়স তিরিশ থেকে চল্লিশ, তখন তিনি একটানা হাজার কাজ আর স্বপ্নকল্পনা নিয়ে কখনো মাতৃভূমির একপ্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে এবং কখনো সাত সাগরের পারের দেশে দেশান্তরে আত্মিক ও বৈষয়িক উভয়দিক থেকেই 'সনাতন শৃঙ্খল' ছিন্ন করে একটা নতুন মুক্ত জগত স্থাপন করার প্রয়াসে ব্রতী হয়েছিলেন। মৃত্যু তাঁকে আর সময় দেয়নি। কিন্তু এত কর্মকাণ্ডের মধ্যেই তিনি ঝড়ের বেগে লোকমুখী বাংলা গদ্যে একজন বৈদান্তিক হিসাবে রাজযোগ জ্ঞানযোগ কর্মযোগের আধুনিক ভাষ্য রচনার পাশাপাশি চলিত ও ধ্রুপদী উভয় ধারার একজন দক্ষ

কারিগররূপে স্বদেশ ও বিশ্বের সেই সন্ধিক্ষণের জীবনধারা নিয়ে লিখেছিলেন 'ভাববার কথা', 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য', 'বর্তমান ভারত' ও 'পরিব্রাজক' নাম দিয়ে বড় বই। এই শেষোক্ত লেখাগুলি উনিশ শতকের বাংলা রেনেসাঁ বা নবজাগৃতির বহুমুখী বিদ্রোহী ভাবনা ও সৃষ্টির ধারাকে বিশ শতকের মুখে একটা ব্যাপক লোকপাঠ্য ও লোকাশ্রয়ী আধুনিকতায় উৎসারিত করেছিল। এদিক থেকে তাঁর মৌলিকতা সমসাময়িক রবীন্দ্রনাথের পরীক্ষা নিরীক্ষার পাশাপাশি উল্লেখ্য। এই পর্বেই স্বামী বিবেকানন্দের এইসব লেখায় পাওয়া যায় বিশ্ব ও স্বদেশের সমাজের দরিদ্র, অবনত ও শোষিত শ্রমজীবী সর্বসাধারণের এবং বিশেষ করে বঞ্চিত ও নিপীড়িত নারীসমাজের বিপ্লবী উত্থানের ও আয়োজনের সাম্যবাদী সমাজতন্ত্রী প্রকল্পকে। প্রাথমিক খোঁজখবর হলেও এই সাম্যবাদী, সমাজতন্ত্রী চিন্তাভাবনা ছিল গভীর ও সুদূরপ্রসারী। বস্তুতপক্ষে একজন পথিকৃত হিসাবে তিনি আধুনিক বৈজ্ঞানিক সাম্যবাদী চিন্তাকে আমাদের উপমহাদেশে বুদ্ধিজীবীদের সামনে রেখেছিলেন। আন্তর্জাতিক সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের উনিশ শতকের চিন্তাভাবনাকে তিনি মাতৃভূমির লোক সমাজের বাস্তবতা ও ঐতিহাসিকতার আবহে উত্থানের কর্মসূচিতে নিয়োজিত করেছিলেন। এখানেও রবীন্দ্রনাথের চিন্তাভাবনা পাশাপাশি উল্লেখ্য। রবীন্দ্রনাথের 'ছিন্নপত্রাবলি' দ্রষ্টব্য।

স্বামী বিবেকানন্দ রেনেসাঁ বা নবজাগৃতি সংক্রান্ত উপরিউক্ত লোকমুখী মৌলিক সৃষ্টি যেমন রস রূপ রাগ সৃষ্টির দিক থেকে বিশ শতকের শেষ দশকেও বড় মাত্রায় বোঝা-পড়ার অপেক্ষায় রয়েছে, তেমনি সাম্যবাদী সমাজতন্ত্রী চিন্তাধারা ও কর্মসূচি নিয়ে তাঁর প্রবর্তনাগুলিও আজকের ভাবনা ও কাজের অঙ্গরূপ বিবেচ্য। ইতোপূর্বে এদিক দিয়ে অনেক বড় কাজ হয়েছে। এই সমস্ত কাজকে লোক সমাজে আজ বৈপ্লবিক মাত্রায় নতুন করে উপস্থিত করার সঙ্গে সঙ্গে মার্কসীয় ভাষ্যের দিকটাকে বিশেষভাবে পরিচ্ছন্ন করা দরকার। আমাদের প্রস্তাবনার শুরুতে এই মার্কসীয় সাযুজ্যকে প্রাথমিকভাবে উপস্থিত করে দিচ্ছি।

স্বামী বিবেকানন্দের বিশেষ করে 'বর্তমান ভারত' গ্রন্থটির উল্লেখ করছি এই প্রসঙ্গে। এই বইটিতে যে বৈপ্লবিক চিন্তার প্রকাশ ঘটেছে, তার মধ্যে আমরা পাবো বিস্ময়কর মার্কসীয় চিন্তার সাযুজ্য।

'বর্তমান ভারত' বইটির একটি বৈশিষ্ট্য, এর সঙ্গে ১৮৪৮ সালে কার্ল মার্কস ও এঙ্গেলসের প্রায় একই বয়সে রচিত কমিউনিস্ট মেনিফেস্টোর একটি বড় মাত্রার যোগ রয়েছে। 'বর্তমান ভারত' গ্রন্থে আমাদের উপমহাদেশের আগাগোড়া ইতিহাস তুলে ধরে রাজনৈতিক অর্থনৈতিক সামাজিক বিবর্তন ও বিকাশে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রজাতের শ্রেণিভিত্তিক যুগবিভাগ করা হয়েছে, তার সঙ্গে কমিউনিস্ট মেনিফেস্টোর ঐতিহাসিক শ্রেণিভিত্তিক যুগবিভাগের কোন পার্থক্য নাই। এই বিস্ময়কর সমভাবনার পাশাপাশি দেখা যায়, চিরলাঞ্ছিত ও চিরবঞ্চিত অথচ সভ্যতার সমস্ত বৈভব ও সম্পদের স্রষ্টা নারী ও পুরুষ নির্বিশেষে শ্রমজীবী জনগণের ঐতিহাসিক নবযুগের সূচনাকারী রাজনৈতিক অভ্যুদয়ে সমাজতন্ত্রকে লক্ষ্যরূপে দেখে স্বামী বিবেকানন্দ যেভাবে পাশ্চাত্যের সঙ্গে প্রাচ্যকেও বিশশতকের মুখে একই আন্তর্জাতিক বিপ্লবের অভিমুখী করেছেন, তাতেও কমিউনিস্ট মেনিফেস্টোর বিশ্ব প্রেক্ষাপটের সঙ্গে একটা একাত্ম

প্রকাশ পেয়েছে। এই সঙ্গে উল্লেখ্য যে, 'বর্তমান ভারত' গ্রন্থে ইংরেজ রাজত্বের শ্রেণিচরিত্রের যে আনুপূর্বিক বর্ণনা ও বিশ্লেষণ রয়েছে, তাকে কার্ল মার্কসের 'ভারতে ব্রিটিশ শাসনের ফলাফল' এবং এই প্রসঙ্গেরই উপর লেখা আরও বেশ কিছু নিবন্ধের বক্তব্যের সমার্থক বলে চিহ্নিত করা যায়।

এই সহযোগ বা সাযুজ্য মূলত ঘটেছে মার্কসবাদীদের সঙ্গে কোন রকমের সংস্পর্শ ছাড়াই, বাস্তব পরিস্থিতির বৈপ্লবিকতাকে বৈজ্ঞানিক ও ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখার দরুন। ১৮৯৪-৯৫ তে যখন স্বামী বিবেকানন্দ লন্ডনে ও নিউইয়র্কে, তখন মার্কসবাদী ও তাদের সহযোগীরা অন্ততপক্ষে ইউরোপে ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সমাজতন্ত্রকে ধনবাদের বিকল্প হিসাবে সামনে এনে যে সাম্যবাদী হাওয়া বইয়ে দিয়েছিলেন সেটাও তাঁকে গভীরভাবে নাড়া দিয়েছিল। তবে ব্যক্তিগত কিংবা সাংগঠনিক সম্পর্কের প্রমাণ পাওয়া যায় না। সম্ভবত, সিস্টার নিবেদিতা'র 'দি মাস্টার এজ আই স হিম' গ্রন্থে যেমন তাঁকে দেখেছি সেই অনুসারে স্বামী বিবেকানন্দ লন্ডনে শুধু বেদান্ত ব্যাখ্যাতেই ব্যস্ত ছিলেন। তিনি দেশে ফেরার পরেই প্রকাণ্ডভাবে জনবাদী কর্মীরূপে আত্মপ্রকাশ করেন। সেই সময়ের চিঠিপত্রে অবশ্য দেখা যায়, প্রতীচ্যের শ্রমজীবীদের উত্থানকে তিনি চিহ্নিত করেছেন শূদ্রদের মহাজাগরণের ছাঁচে। ১৯০০ সালে তাঁর সঙ্গে প্যারিস দেখা হয়েছিল বিশিষ্ট রুশ নৈরাষ্ট্রবাদী চিন্তাবিদ ও গ্রন্থকার ক্রপোটকিনের সঙ্গে। এই সাক্ষাৎকারের কথাবার্তার বিবরণ কিছুই আমরা জানতে পারিনি। তবে ক্রপোটকিনের চিন্তাধারারই অন্যতম পুরোধা বিপ্লবী বাকুনিনই সর্বপ্রথম কমিউনিস্ট ম্যানিফিস্টোর রুশ অনুবাদটি করেছিলেন। সেদিক থেকে দেখলে নৈরাষ্ট্রবাদী চিন্তা ও মার্কসীয় চিন্তাকে পুরোপুরি পৃথক করা যায় না। সুতরাং ক্রপোটকিনে মার্কসীয় ছায়া পড়ে থাকতে পারে কোন কোন মূল বিষয়বস্তুতেও। স্বামী বিবেকানন্দকেও তা স্পর্শ করে থাকতে পারে।

গত একশ বছরে আমাদের উপমহাদেশেও এবং বিশেষ করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে, ব্রিটেনে, ফ্রান্সে এবং সোভিয়েত ইউনিয়নে বিভিন্নভাবে বিভিন্নজন স্বাধীনতা, গণতান্ত্রিকতা, সমাজতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা বা ধর্মসাম্যর প্রেক্ষিতে স্বামী বিবেকানন্দের চিন্তাভাবনা, কাজকর্ম ও লোকউত্থানমূলক অবস্থানের উপর আলো ফেলেছেন। দৃষ্টান্ত হিসাবে বলা যায়, বিশের দশকে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে এবং সমাজতন্ত্রের পক্ষে বিশেষ করে শ্রমজীবী জনগণের বিপ্লবী ভূমিকার ভাষ্যকার রোঁমা রলাঁ যে শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দের পূর্ণাঙ্গ জীবনীগ্রন্থ লেখেন মাইকেল এঞ্জেলো, তলস্তয়, মহাত্মা গান্ধীর জীবনী রচনার ধারা রক্ষা করে, তাতে উপরিউক্ত মার্কসীয় সাযুজ্যটি প্রকাশ পেয়েছে ধর্ম-জিজ্ঞাসার মুক্ত ধারার একটি বিশেষ আবহে। ১৯৬৭ সালে মস্কোতে প্রকাশিত 'দর্শনের অভিধান' গ্রন্থে দেখা যায়, রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ ধর্মীয় আবহে বিশেষ বৈদেশিক শাসন বিরোধী দেশশ্রেষ্ঠমিকতার লোকায়ত ছাপা সামনে আনেন। সত্তরের দশকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে তিরিশের দশকের প্রখ্যাত মার্কসবাদী কবি ও নাট্যকার ক্রিস্টোফার ইশারউত্তের ভূমিকাসহ বিশেষ করে শিক্ষাবিদদের উদ্যোগে প্রকাশিত হয়েছে 'বেদান্ত ভয়েস অব ফ্রিডম' নামের বিবেকানন্দ রচনা সংকলন। পরাবিদ্যার উপর জোর দেয়া লেখার এই সংকলনটিতেও আমরা মার্কসীয় সাযুজ্যের জোরালো ছাপ পেতে পারি।

এছাড়া সিস্টার নিবেদিতার 'দি মাস্টার এ্যাজ আই স হিম' (গুরুকে যেমন করে দেখেছি) বইটির খ্রিষ্টীয় ও পাশ্চাত্যের উনিশ ও বিশ শতকের সন্ধিক্ষণের আধুনিক দর্শনের বিশ্লেষণের প্রেক্ষাপটে স্বামী বিবেকানন্দের চিন্তাভাবনার ঘাত প্রতিঘাত ও সমন্বয় প্রয়াসকে যেভাবে উপস্থিত করা হয়েছে, তাতে স্বামীজীর জনমুখী বৈপ্লবিকতা বিশেষভাবে প্রচারিত হয়েছে।

আমাদের উপমহাদেশে এই বিষয়টি নিয়ে উদ্যোগী চর্চার বিস্তার স্বাভাবিকভাবেই বড় মাত্রার। এতে মার্কসপন্থী নন এমন বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী জ্ঞানীগুণীরা স্বামী বিবেকানন্দকে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় জনবাদী, সমাজতন্ত্রী, সাম্রাজ্যবাদবিরোধী, জাতীয় মুক্তিসংগ্রামী বিপ্লবীরূপে উপস্থিত করেছেন। বিশিষ্ট মার্কসপন্থীরাও প্রধানত স্বামী বিবেকানন্দের এই দিকটাকে নিয়েই যথেষ্ট লেখালেখি ও গবেষণা করেছেন। চিন্মোহন সেহানবিশ তাঁর 'রুশবিপ্লব ও প্রবাসী ভারতীয় বিপ্লবী' গ্রন্থে স্বামী বিবেকানন্দ স্বাধীনতা ও সমাজতন্ত্রের অভ্যুত্থানে রাশিয়া ও চীনের বিশিষ্ট ভূমিকা নিয়ে যে ভবিষ্যত বাণী করেন, তার তথ্য দাখিল করেছেন। ১৯৭৭ সালে কলকাতার 'বইপত্র' প্রকাশনীর উদ্যোগে মার্কসপন্থীদের অন্যতম পুরোধা অধ্যাপক গোপাল হালদার ও তাঁর সহযোগী অধ্যাপক রবীন্দ্রগুপ্ত'র সম্পাদনায় পাঁচখণ্ডে "বিবেকানন্দ রচনাসমগ্র" প্রকাশিত হয়েছে।

আমরা আমাদের প্রস্তাবনাতে মার্কসীয় সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গির বৈশিষ্ট্যের কথা পরবর্তী পরিচ্ছেদে বিশেষভাবে এনেছি। উপরিউক্ত সম্পাদনায় এই দিকটি পাওয়া যাবে। তবে এতেও প্রথমদিকে জোর দেয়া হয়েছে জনবাদী বিপ্লবী বিবেকানন্দের উপর। এই সঙ্গেই উল্লেখ্য, বিনয়কুমার রায় ইংরেজি ভাষায় স্বামী বিবেকানন্দের উপর স্বাধীনতা ও সমাজতান্ত্রিক গণমুখিনতা নিয়ে বিস্তারিত তথ্য দিয়ে যে পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ রচনা করেছেন, সেটি প্রকাশ করেছে দিল্লীর কমিউনিস্ট প্রকাশনী সংস্থা পিপি এইচ। এই সমস্ত কাজের মধ্যে জ্বলজ্বল করছে সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার ও ড. ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের রচিত জীবনীগ্রন্থ দুটি। বাংলার অগ্নিযুগের স্বাধীনতা ও সাম্যবাদী সমাজ সংক্রান্ত চিন্তাভাবনাকে এঁরা পৌঁছে দিয়েছেন আজকের নবীন-নবীনাদের ভেবে দেখার জন্য।

এছাড়া অন্যান্য বড় উদ্যোগও অব্যাহত রয়েছে স্বামী বিবেকানন্দের জনগণমুখিনতাকে সমসাময়িক চিন্তাভাবনার পুরোভাগে রাখার জন্য। শ্রীশঙ্করী প্রসাদ বসু ও তাঁর কয়েকজন সহযোগীর সম্পাদনায় এবং অখিল ভারত বিবেকানন্দ যুগ মহামণ্ডলের উদ্যোগে 'জনগণের অধিকার' নাম দিয়ে বিবেকানন্দ বাণী সংগ্রহটি প্রকাশিত হয়েছে। রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন কনভেনশন ১৯৮০ তে 'রিবিল্ড ইন্ডিয়া' নাম দিয়ে যে বিবেকানন্দ বাণী সংকলন প্রচার করেছেন সেটিও মার্কসীয় সাযুজ্যের বক্তব্যকে জোরদার করেছে। এই পরিপ্রেক্ষিতকে সামনে রেখে আমাদের উপমহাদেশে আন্তর্জাতিক ও স্থানীয়ভাবে বিভিন্ন ভাষায় আরও অনেক কাজ হয়েছে। এরা সার্বিক বিবেকানন্দ নিরীক্ষায় মার্কসীয় সাযুজ্যে উপস্থাপিত হবার জন্য অপেক্ষা করছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যেতে পারে, প্রেমচন্দ তাঁর প্রস্তুতিপর্বে মাতৃভূমি-চিন্তায় আবেগ ও স্বপ্নকল্পনার পর্যায়ে ইতালির স্বাধীনতা সংগ্রামী গ্যারিবল্ডিকে নিয়ে লেখার পাশাপাশি স্বামী বিবেকানন্দেরও একটি আলেখ্য রচনা করেন। এবং শুধুমাত্র উল্লেখ রয়েছে ১৯৮০-তে মস্কোতে মদনলাল রচিত 'গোর্কি অউর প্রেমচন্দ' গ্রন্থে। এই লেখাটিকে আজ খুঁজে বার করতে হবে।

জনগণের উত্থানকে কেন্দ্র করে স্বামী বিবেকানন্দের অবস্থানের উপরিউক্ত উপস্থাপনকে সামনে রেখেই মার্কসীয় দৃষ্টিভঙ্গির তরফ থেকে আয়ত কিছু কথা বলা দরকার বলে মনে করছি। মার্কসীয় সূত্রের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে নবনব যুক্তিই হোক, অথবা মূল মার্কসীয় ভাবনাচিন্তার কিছু চাপাপড়া দিক থেকেই হোক, এরা আজ মার্কসপন্থীদের এবং সেইসঙ্গে সহযোগীদেরও কর্মসূচিতে জরুরি হয়ে পড়েছে। এর বড় কারণ, সমাজতন্ত্রের ক্ষেত্রে সাম্প্রতিক বিপর্যয়কর বিভ্রান্তি।

এই পরিস্থিতিতে বিশ শতকের শেষ দশকে আমরা সমস্ত মহলেরই মার্কসপন্থীরাসহ তাত্ত্বিক দিক থেকে বিপন্ন সহযোগীরাও বিপন্ন বোধ করছেন।

আমাদের মার্কসপন্থীদের আজকের বিপন্ন অবস্থাকে কাটিয়ে ওঠার প্রয়াসে সহযোগীদের কথাও ভাবতে হবে এবং সেই অনুযায়ী ভাবনাচিন্তা ও কর্মধারাকে নতুন করে বিন্যস্ত করতে হবে।

আমাদের প্রস্তাবনাটি এই জরুরি বিন্যাসেরও ভাষ্য। মার্কসীয় তত্ত্বকে সাধারণভাবে তার বৈপ্লবিক প্রাণবন্তা ও সৃজনশীলতায় সমস্ত বাধাবিপত্তি কাটিয়ে নতুনভাবে দেশ দেশান্তরে উত্তীর্ণ করার জন্য যেসব প্রয়াস চলে এসেছে কিংবা চলা দরকার তার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে স্বামী বিবেকানন্দের স্বাধীনতা, গণতান্ত্রিকতা, সমাজতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতা বা ধর্মসাম্যর কর্মধারা ও নির্দেশনাগুলির সঙ্গে আমাদের মার্কসীয় সাযুজ্য-চিন্তাকে সংজ্ঞা প্রকরণেও দরকার হলে নতুন করে গুছিয়ে নিতে হবে।

॥ ২ ॥

এই 'গুছিয়ে নেয়ার' কাজটা সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার জন্য খুব সংক্ষেপে হলেও বলে নিতে চাই, আমরা ইতোপূর্বেও বহুবার নিজেরা দারুণভাবে অপ্রস্তুত হয়েছি এবং আমাদের সহযাত্রী ও সহযাত্রিনীদের অপ্রস্তুত করেছি। সঙ্গে সঙ্গেই ইতোপূর্বে বহুবার বিপর্যয় থেকে বেরিয়ে এসেছি তাত্ত্বিক দিক দিয়ে নতুন ভাবনা চিন্তা উপস্থিত করে। এতে সহযোগিতাও পেয়েছি আন্তরিকতার সঙ্গে সঙ্গে। এই ক্ষেত্রে মার্কসীয় চিন্তা ভাবনা ও কর্মসূত্রকে একদিকে যেমন যান্ত্রিকতা, জ্ঞানবদ্ধতা ও অপপ্রয়োগ থেকে মুক্ত করা হয়েছে, তেমনি এদের মুক্ত ধারারূপে উৎসারিত রাখতে গিয়ে মার্কসীয় ভাবনা ও প্রয়োগে এসেছে সত্যের নতুন নতুন আবিষ্ক্রিয়া। আমাদের আজকের সমূহ সংকটের একটা কারণ এই যে, নব নব আবিষ্ক্রিয়ার প্রয়োজন অনেক সময়েই স্বীকৃতি পায়নি, বেশ কিছু ক্ষেত্রে প্রত্যাখ্যাত ও বর্জিত হয়েছে। বর্তমান শতকে বিশ্বজুড়ে যেসব দেশে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র গঠিত হয় এবং যে অধিকাংশ দেশেই তেমন কোন রাষ্ট্র গঠিত হতে পারেনি সেখানেও মার্কসীয় তত্ত্বের পুনর্বিন্যাস ও রক্ষণের পালা চলেছে প্রবল ও দুরূহ টানাপোড়নের মধ্য দিয়ে। এর মধ্য দিয়েই শোষণমুক্ত পৃথিবী গড়ার যুগযুগান্তরের তাগিদ ও প্রয়াসকে সার্থক করার দায় শোধ করতে হবে আজকের ও আগামীর প্রজন্মকে। এই দায়বদ্ধ কাজে এগিয়ে চলতে গিয়ে মার্কসপন্থীরা ভেবে দেখবেন স্বামী বিবেকানন্দ দারিদ্র্য নিবারক সমাজতন্ত্রের আদর্শকে তুলে এনেছিলেন বিশ্বজোড়া সাম্যবাদী সংগ্রামের সেই বাস্তবতা ও সম্ভাবনাময় ঐতিহাসিক ধারা থেকে, যার ফরাসি বিপ্লবের পর্যায়ে কার্ল মার্কস ও এঙ্গেলস সর্বহারাদের সহযোগিতায় গড়েছিলেন

বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র ও পূর্ণ সাম্যবাদী সমাজ নির্মাণের প্রাথমিক ছক। উনিশ শতকের শেষ দশকে রবীন্দ্রনাথ মাতৃভূমির দরিদ্র জনগণের দিকে চেয়ে সমাজতান্ত্রিক চিন্তাধারা নিয়ে এসেছিলেন ইউরোপ থেকে। সমাজতন্ত্রের এই ঐতিহাসিকতার দিকে তাকিয়ে আমরা এখানে শুধু একটা কথা বলে রাখবো। সমাজতন্ত্র ফরমায়েসী ব্যাপার নয়। আবার কারও দোষে কিংবা ধর্মকে কিংবা গাফিলতিতে সমাজতন্ত্র খেলনার বেলুনের মতো ফুঁয়ে উড়ে যাবার নয়।

এই প্রসঙ্গেই বলা যেতে পারে, মার্কসীয় দ্বান্দ্বিক সিদ্ধান্ত বা গত দেড়শত বছরের বহুকালের মধ্যেও জীর্ণ হয়নি। বরং অগ্নিপরীক্ষার মধ্য দিয়ে পরিশুদ্ধ হয়েছে। এরকম দুটি তাত্ত্বিক ব্যাপার একদিকে যেমন আমাদের মার্কসপন্থী চিন্তাভাবনা ও কর্মকাণ্ডকে সংকীর্ণতা ও যান্ত্রিকতা এবং দাম্ভিকতা ও গাফিলতির চক্র থেকে উদ্ধার করবে, তেমনি স্বাধীনতা ও সমাজতন্ত্র এবং ধর্ম ও ধর্মনিরপেক্ষতার বহুমুখী ও পরিব্যাপ্ত মুক্তিধারার সমস্ত সহযাত্রী ও সহযোগিনীদের নিকটতর করবে।

এই দুটি মার্কসীয় তাত্ত্বিক সূত্র হচ্ছেঃ

১. সমস্ত বিকাশ ও পরিবর্তনের মধ্যে রয়েছে দ্বান্দ্বিক ও সমন্বয়ী গতিধারার সমগ্রতা

২. ধর্মনিরপেক্ষ মুক্তিসংগ্রামের গণউত্থানে কাজ করেছে ধর্মের ঐতিহাসিকতা

। ৩ ॥

উপরিউক্ত দুটি মার্কসীয় নির্দেশনা কিছুটা ব্যাখ্যার দাবিদার। এখানে তা দৃষ্টান্ত দিয়ে সংক্ষেপে উপস্থিত করেছি।

প্রথমে সামগ্রিকতা। বর্তমান শতকের গোড়ার দিকে রাশিয়াতে অক্টোবর সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের ঠিক পরেই হাঙ্গেরীতেও প্রজাতান্ত্রিক বিপ্লবের সঙ্গে সঙ্গেই সোভিয়েত ধরনের গণউত্থান ঘটে। প্যারী কমিউনের মতই এই উত্থান স্বল্পকাল স্থায়ী হয়। তবে সবকিছু মিলিয়ে প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর কয়েক বছরে সারা বিশ্বে একটা সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র ও জাতীয় মুক্তির লক্ষ্যে গণচিন্তা ও আশা-উদ্দীপনার একটা জোয়ার বয়ে যায়। তারই প্রেক্ষাপটে ১৯২২ সালে ভিয়েনাতে প্রকাশিত হয় হাঙ্গেরি'র প্রখ্যাত মার্কসপন্থী লেখক, দার্শনিক ও বিপ্লবী গিওর্গি লুকাচের রচিত গ্রন্থ 'ইতিহাস ও শ্রেণিচেতনা'। এই বইটির অন্যতম নিবন্ধ 'মার্কসীয় গোঁড়ামি বলতে কোন্ চিন্তাকে বুঝবো'? লুকাচের ১৯১৯ সালের গণউত্থানের আবহে লেখা এই নিবন্ধটিতে খুব অল্পকথায় সেই সময়ের আশু ও দূরগামী লক্ষ্যকে উপস্থিত করা হয়। লুকাচ নিবন্ধটি শেষ করেছিলেন নিম্নোক্ত বক্তব্য দিয়ে :

"মার্কসীয় গোঁড়ামি কতকগুলি ঐতিহ্যিক রীতির অভিভাবকত্ব করে না। তার অবস্থান হচ্ছে সেই চিরসজাগ ভবিষ্যৎদ্রষ্টার যে আশু বা বর্তমানের করণীয় এবং ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ায় সমগ্রতার মধ্যেকার সম্পর্কটিকে তুলে ধরে।

এই কারণেই মার্কসীয় গোঁড়ামির অবস্থান এবং তার প্রতিভূ প্রতিনিধি কমিউনিস্টদের করণীয় সম্বন্ধে কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টোর একটা নির্দেশনার মূল্য কখনও ফিকে হয় না। এই নির্দেশনা হলো, কমিউনিস্টরা শ্রমিকশ্রেণীর অন্যান্য দল থেকে নিম্নোক্ত বিষয়ে পৃথক :

(১) বিভিন্ন দেশের শ্রমিকশ্রেণীর সংগ্রামে কমিউনিস্টরা শুধু দেখিয়ে দেয় সমগ্র শ্রমিকশ্রেণীর সাধারণ স্বার্থকে; (২) ধনিকশ্রেণীর বিরুদ্ধে সংগ্রামে শ্রমিকশ্রেণী উন্নয়ন ও বিকাশের যেসব পর্যায় বা স্তর পেরিয়ে আসছে, তাতে কমিউনিস্টরা সব সময়েই আন্দোলনের স্বার্থকে সামগ্রিকভাবে রক্ষা করে চলে।"

লুকাচ তাঁর এই বক্তব্যের মধ্য দিয়ে শ্রমজীবীদের সাধারণ স্বার্থের ধারক বাহক হিসাবে কমিউনিস্টদের শ্রমজীবীদের অন্যান্য দলের বিরুদ্ধে অবস্থান নেয়াকে কমিউনিস্ট মেনিফেস্টোর নির্দেশনা অনুসারেই নাকচ করে দিয়ে তাঁর 'ইতিহাস ও শ্রেণিসংগ্রাম' গ্রন্থে বৈপ্লবিক সামগ্রিকতার দিকটিকে দ্বান্দ্বিক সমন্বয়ী বা ডায়েলেকটিক দর্শনের ভাষাতেও ব্যাখ্যা করেছেন। এই সঙ্গেই তিনি মার্কসীয় বিপ্লবী গণবাদী চিন্ত াভাবনার বিশ শতকীয় নবজাগৃতি বা রেনেসাঁর দুই তাত্ত্বিক রোজা লুক্সেমবার্গ ও লেনিনকে সামগ্রিক চিন্তার উদ্যোক্তারূপে উপস্থিত করেছেন।

দ্বিতীয়, ধর্মজিজ্ঞাসা। এই চিন্তাটি হচ্ছে ধর্ম থেকেও ধর্মনিরপেক্ষ বিপ্লবী উত্থান ও সংগ্রামে শরিক হওয়ার ব্যাপারটাকে সঙ্গতি প্রদানের ভাবনা। এই ক্ষেত্রে ইতালির কমিউনিস্ট নেতা গ্রামচির মার্কসীয় চিন্তাভাবনার ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ ধর্মীয় সহযোগকে বড় মাত্রায় সামনে এনেছে।

বিষয়টি অবশ্য একেবারে সহজ সরল যোগ বিয়োগের অঙ্ক নয়। বস্তুতপক্ষে, প্রথমত, মার্কসীয় ঐতিহাসিক বস্তুবাদী দর্শন ধর্মবিশ্বাসের অতিপ্রাকৃতিকতা ও আধ্যাত্মিকতাকে আশ্রিত নয়। তাছাড়া তার বিশ্বমানবসমাজের সাম্যবাদী উত্থানের কর্মসূচিতে রয়েছে সমস্ত ধর্মের শ্রমজীবীদের একত্রিত করা। সুতরাং মার্কসীয় ভাবনার অবস্থান ধর্মনিরপেক্ষ। কিন্তু এই উত্থানেই জনসাধারণের সামগ্রিক মুক্তিধারা, সমস্ত জনস্রোতের মিলিত মোহনা।

এই প্রেক্ষাপটে, জনগণ ধর্মবোধ বা ধর্মীয় নীতি ও আদর্শেরও পতাকা নিয়ে এসেছে যুগে যুগান্তরে। আগামীতেও আসতে পারে। মার্কস ও এঙ্গেলস এই কারণে স্বাধীনতা, গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের আয়োজনের কর্মসূচিতে ধর্ম নিয়ে ছোঁয়াছুঁয়ি করতে রাজি হননি। তাঁরা দুজনেই ছিলেন ১৫২৫ সালের জার্মান কৃষকদের বিপ্লবী অভ্যুত্থানের গুণগ্রাহী এবং উনিশ শতকেও তাঁরা গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের জন্যই এর পুনরুত্থান চেয়েছেন। এই অভ্যুত্থান ঘটেছিল বিশিষ্ট ধর্মযাজকদের ধর্মীয় দাবির আশ্রয়ে। এঙ্গেলসের 'জর্মানির কৃষকযুদ্ধ' গ্রন্থটি দ্রষ্টব্য।

গ্রামচি আরও খানিকটা এগিয়েছেন। তাঁর বক্তব্য, নিপীড়িত ও শিক্ষাদীক্ষা থেকে বঞ্চিত জনগণ ধর্মীয় চিন্তার মধ্য দিয়েই বিশ্বদর্শন করে আসছে। মার্কসীয় বিশ্বদর্শনের সঙ্গে জনসাধারণের চিন্তার সাযুজ্য স্থাপিত হতে পারে ধর্মীয় চিন্তার সংজ্ঞাপ্রকরণের সংযোগে।

সামগ্রিকতা ও ধর্মসম্বন্ধে মার্কসীয় চিন্তা-সূত্রের আপাতত উপরিউক্ত ব্যাখ্যাই যথেষ্ট বলে সাব্যস্ত করে এবার আমরা স্বামী বিবেকানন্দের মার্কসীয় সাযুজ্যটিকে বুঝে নিতে চেষ্টা করব। তবে তার আগে সমাজতন্ত্র নির্মাণে এবং তারই সঙ্গে যুক্ত হয়ে স্বাধীনতা, গণতন্ত্র ও জাতীয় মুক্তির ক্ষেত্রে তাত্ত্বিক দিক দিয়েও যে বিরাট বিপর্যয়ের মোকাবেলা করে আজ মুক্তিধারাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে, তার দায়দায়িত্ব নিয়ে মার্কসপন্থী

হিসাবে দুয়েকটা কথা পরিষ্কার হয়ে থাকলে আমাদের সমস্ত ধরনের মহাপথিকের সঙ্গে কাজ করার ব্যাপারটাকে বুঝতে পারা সহজ হবে। এখানে মার্কসপন্থী তথা সমাজতন্ত্রী তথা কমিউনিস্টদের আজকের বিচ্ছিন্নতার একটি কারণকে দেখতে ও বুঝতে পারা যাচ্ছে। প্রতিকারের পথটিও পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। লুকাচ কমিউনিস্ট মেনিফেস্টো থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে যে ইশারা দিয়েছিলেন, আমাদের আজ সে সম্বন্ধে অবহিত হতে হবে। সঙ্গে সঙ্গেই সংকীর্ণ সাম্প্রদায়িকতার ভেদবুদ্ধিকে কাটিয়ে সমস্ত ধর্ম যাতে পরস্পরকে সঙ্গে নিয়ে একযোগে দাঁড়াতে পারে, সেদিকে আমাদের প্রয়াসকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার উদ্দেশ্যেই জনচেতনার সমস্ত অভিব্যক্তিকে কর্মসূচিনিরূপণের কেন্দ্রবিন্দুতে রাখার কথা ভাবা দরকার। এখানেও তাই সমগ্রতা হবে বিচার বিচেনার ভিত্তি। যেসব সুবিধাবাদী চক্র ইদানীং স্বামী বিবেকানন্দকে রাতারাতি গোঁড়া হিন্দুধর্মের ধারক বাহক এবং হিন্দু জাতীয়তাবাদের স্তম্ভরূপে দেখানোর চেষ্টা করছে, তারা সংকীর্ণ সাম্প্রদায়িক ও কায়েমি স্বার্থবাদী মতলবের দরুন স্বামীজীর সমগ্র মহাবিপ্লবী সমাজতন্ত্রী পরিচয়কে কি করে বুঝবে? অপরপক্ষে মার্কসীয় সমগ্রতা ও গণবিপ্লবী উত্থানের চিন্তা এ পর্যন্ত আমাদের ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীদের স্বামী বিবেকানন্দকে সংকীর্ণ মতাদর্শী দিক থেকে দেখার বিপদ থেকে পর্যায়ের পরে পর্যায়ে বাঁচিয়ে এসেছে। কিন্তু এটা ঘটেছে বেশ কিছুক্ষেত্রে স্বতঃস্ফূর্তভাবে। আজ এ বিষয়ে পুরোপুরি সচেতন হওয়া দরকার।

॥ ৪ ॥

আমাদের তরফ থেকে স্বামী বিবেকানন্দকে পুরোপুরি সচেতনভাবে সমগ্রতায় রাখতে হবে। আজকের ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতায় প্রচণ্ড ভেদবিভেদ বিভিন্ন ধর্মের গোঁড়াপন্থী কায়েমি স্বার্থরক্ষকদের পরিকল্পিত প্রচেষ্টায় আমাদের উপমহাদেশকে তার লাখো শহীদের স্মৃতিতে মণ্ডিত স্বাধীনতা, গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের গণউত্থানের যে মহাবিপ্লবী ধারা থেকে সরিয়ে দিতে চাইছে, তার ধর্মীয় আবেদনের কথা মনে রেখেও আমরা বৈদান্তিক স্বামী বিবেকানন্দকে বড় মাত্রায় সামনে আনতে ইতস্তত করব না।

স্বামী বিবেকানন্দ শ্রীরামকৃষ্ণের ব্যবহারিক বেদান্তের 'যত মত তত পথ' এবং 'যত্র জীব তত্র শিব'–ভাবনার ধর্মসমন্বয় তথা ধর্মসাম্য ও দরিদ্র-উত্থানের দায়িত্ব কাঁধে তুলে নিয়েছিলেন। তিনি তাই একদিক থেকে বৈদান্তিক হিসাবেই ১৮৯৩ সালে আমেরিকায় চিকাগো নগরীর ধর্ম মহাসভায় ধর্মীয় পরিভাষায় মানব জাতির ঐক্যের বক্তব্য উপস্থিত করেছিলেন। তিনি এরপরে হিন্দুধর্মের বেদান্ত দর্শন নিয়ে প্রতীচ্যের দেশে দেশান্তরে বক্তৃতা দিয়েছিলেন। এটা বাস্তব সত্য। তবে পাশাপাশি এটা সত্য যে, তিনি ও তাঁর সাথীরা রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন প্রতিষ্ঠা করেছিলেন ধর্মসম্প্রদায় নির্বিশেষে পীড়িতের সেবা করার লক্ষ্যে। বিশেষভাবে লক্ষণীয় যে, চিকাগোতে ধর্ম মহাসভায় সমবেত সকল ধর্মের প্রতিনিধিদের সামনে বক্তব্য উপস্থিত করেছিলেন তিনি 'প্রতিটি ধর্ম যেখানে যেমনভাবে আছে সেইভাবেই সেখান থেকেই' সহযোগিতায় এগিয়ে আসার জন্য। এই মর্মে তিনি নির্দিষ্ট প্রস্তাবও উপস্থিত করেছিলেন। অর্থাৎ ধর্মকেই তিনি উপস্থিত করেছিলেন সমস্ত ধর্মকে সমমর্যাদা দেবার উৎসারকরূপে। বিশিষ্ট ধর্মমত কোন বাধা

হয়নি সর্বধর্মীয় ঐক্যের আবেদনে। এইভাবেই বিশিষ্ট ধর্মীয় মত সমাজতন্ত্র, স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের বিশ্বজোড়া গণবিপ্লবী অভ্যুত্থানের ধর্মনিরপেক্ষ ধারায় ঝাঁপিয়ে পড়া থেকে তাঁকে নিরস্ত করেনি।

মার্কসীয় সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখলেই এই ঘটনাগুলিকে একান্তভাবে সঙ্গত বলে বুঝতে পারা যাবে।

স্বামী বিবেকানন্দ যে প্রাচীন বেদান্ত দর্শনের রচয়িতা ও রচয়িত্রীদের পরাকাব্যিক উপলব্ধি ও জ্ঞানের সর্বোচ্চ চূড়ায় আরোহণ করতে এবং সঙ্গে সঙ্গেই লোককাব্য তথা বাউল ও অন্যান্য সহজিয়ার গাওয়া গানের সমঝদারিতে স্বাচ্ছন্দে চলাফেরা করতে পেরেছিলেন, তার মূলে ছিল মার্কস এঙ্গেলস লেনিন রোলাঁ লুক্সেমবার্গ লুকাচের সমগ্র সুচিন্তাধারার একটা ব্যাপার। এই সমগ্রতাকে নিয়ে চলা সহজসাধ্য ছিল না। বিরাট তোলপাড় ও যন্ত্রণা ও একাগ্র সাধনা ও প্রয়াস দিয়ে এই অবস্থানকে রক্ষা করে এগোতে হয়েছে। সিস্টার নিবেদিতা তাঁর স্বামী বিবেকানন্দ সম্বন্ধে বইটিতে-এর গ্রিক নাটকীয় মর্মবিদারক ধারার আভাস দিয়েছেন। সিস্টার নিবেদিতার এই 'গুরু যেমন তাঁকে দেখেছি' বইটিকে আমাদের উপমহাদেশের এবং বিশেষ করে দুই বাংলার সমস্ত ধর্মের অনুসারী ও অনুসারিনীদের পড়া উচিত। ধর্মের মধ্য দিয়েই স্বামী বিবেকানন্দ যে বিদগ্ধ ও সহজিয়া ধারায় ধর্মসাম্য বা ধর্মনিরপেক্ষতায় নিজেকে ধাতস্থ করেছিলেন, তার অজস্র দৃষ্টান্ত টুকরো টুকরো গানের মাধুর্য নিয়ে এই বইতে ছড়িয়ে আছে।

সিস্টার নিবেদিতার লেখা এই বইটির সামগ্রিকতাও এখানে বিশেষভাবে প্রাসঙ্গিক। এই বই নতুন করে পড়তে গিয়ে আজকের পাঠকপাঠিকাদের মনে হতে পারে, গৌতম বুদ্ধ ও শ্রীরামকৃষ্ণের শিষ্য মহাবিদ্রোহী জনকল্যাণবাদী স্বামী বিবেকানন্দকে নিয়ে এমন পূর্ণাঙ্গ বই কোন মার্কসপন্থীই লিখতে পারেন নি। এখানে এ সমস্ত কথাকে অবশ্য ইঙ্গিত ও ইশারা হিসাবেই উপস্থিত করতে পারছি।

স্বামী বিবেকানন্দ ধর্ম প্রচার করতে গিয়ে ধর্মনিরপেক্ষতারও পথ দেখিয়েছেন, দরিদ্রের সেবা করতে গিয়ে যেমন দরিদ্রদের স্বাধীনতা ও সাম্যবাদী মহাবিদ্রোহের ভিতপত্তন করেছেন, সন্ন্যাসী ও রাজযোগী হয়েও যেমন নারীসমাজকে কর্মক্ষেত্রে ও শিক্ষায় পুরুষের সমকক্ষ ও উদ্যোগী করে তুলতে চেয়েছেন, উচ্চশিক্ষিত হয়েও যেমন নিরক্ষর জনগণের উত্থানে সাথী হয়েছেন, তেমনি মায়া থেকে আত্মার মুক্ত অবস্থানের বৈদান্তিক ভাষ্যকার শঙ্করাচার্যের অদ্বৈতবাদী ধারাকে নিয়ে কাজ করলেও তাতে যুক্ত করেছেন নারী ও পুরুষ নির্বিশেষে সাংসারিক জীবনযাপনে সাম্য ও গণতন্ত্র ও স্বাধীনতার বিষয়গত কর্মসূচি। এখানে তাঁর অদ্বৈত বেদান্তের এই শেষোক্ত ধরনের একটি ভাষ্য উপস্থিত করছি। প্রতীচ্যে বেদান্তের ব্যাখ্যা করতে গিয়েই একবার তিনি বলেছিলেন:

"বিশেষ সুবিধাভোগের চিন্তা হচ্ছে মানুষের জীবনের একটা ভোগান্তির ব্যাপার। এক্ষেত্রে দুটো শক্তি সব সময় সক্রিয়। একটা তৈরি করেছে জাতপাত, আরেকটা জাতপাতকে ভেঙ্গে ফেলছে। কথাটাকে আরও একভাবে বলা যায়। একটা শক্তি বিশেষ সুবিধাভোগের পক্ষে কাজ করছে, আরেকটা শক্তি এই বিশেষ সুবিধাভোগের ব্যবস্থাকে

ভেঙ্গে চলেছে। আর, যখনই বিশেষ সুবিধাভোগের ব্যবস্থা ভেঙ্গে যাচ্ছে, তখনই একটা জাতির জীবনে বেশি বেশি করে আলোর ছটা এবং অগ্রগতি দেখা দিচ্ছে।"

– স্বামী বিবেকানন্দ, 'বেদান্ত, ভয়েস অফ ফ্রিডম'।

॥ ৫ ॥

উপরিক্ত 'বেদান্ত, ভয়েস অফ ফ্রিডম' গ্রন্থটি ১৯৮৭ সালে কলকাতার অদ্বৈত আশ্রম থেকে প্রকাশিত হয়েছে। প্রকাশক স্বামী অনন্যানন্দ। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থিত বেদান্ত সেন্টারের কর্মকর্তা স্বামী চেতনানন্দ স্বামী বিবেকানন্দের রচনাবলি থেকে বেদান্ত সম্পর্কিত বক্তব্য চয়ন করে এই গ্রন্থ প্রণয়ন করেছেন। এর ভূমিকা লিখেছেন তিরিশের দশকের প্রখ্যাত ব্রিটিশ বামপন্থি লেখক ও পরবর্তীকালের আমেরিকা প্রবাসী ও বেদান্ত বাদী ক্রিস্টোফার ঈশার উড। এই গ্রন্থে মানুষ ও জগতের অস্তিত্ব ও সম্পর্ক নিয়ে বিশেষ করে 'মায়া ও স্বাধীন মানুষী সত্তার প্রশ্নে স্বামী বিবেকানন্দের যে চিন্তাভাবনাকে উপস্থিত করা হয়েছে, তাতে মার্কসীয় দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদী দার্শনিক চিন্তা ও মানুষ মাত্রের দৃষ্টি ও সৃষ্টির বিপুল সম্ভাবনাময় সংগ্রাম ও প্রস্তাবনার বিরুদ্ধতার পরিবর্তে সমর্থন ও সহযোগিতার নির্দেশনা রয়েছে।

আমরা এখানে দেখবো, স্বামী বিবেকানন্দ উপনিষদ তথা বেদান্তের ইতোপূর্বেকার হাজার হাজার বছরের 'মায়া' সম্পর্কিত বিভিন্ন সূত্রের জায়গায় একটি সহজ সরল নিত্য নিত্য অস্তিত্বের সূত্র দাখিল করেছেন। এতে জগত সংসারে মানুষের কর্মকাণ্ড পরিচালনায় বাস্তবমুখিতা উৎসাহিত হয়েছে। এতে জগৎটাকে শুধু ব্যাখ্যা করা হয়, তাকে বদলে দেবার অর্থাৎ একটি নতুন শোষণমুক্ত পৃথিবী গড়ার মার্কসীয় ভাবনার প্রতি সায় রয়েছে।

তাছাড়া এই নতুন পৃথিবী গড়ার যে সাম্যবাদী প্রয়াস যুগে যুগে এগিয়ে এসেও মাঝে মাঝে বিপর্যস্ত হয়ে গিয়েছে, সেই অবস্থাটা থেকে বেরিয়ে আসার ব্যাপারটিও যে বাস্তব সত্য, সে কথাটাও মার্কসীয় ভাবনার মতই স্বামী বিবেকানন্দের যে উক্তিটি বিশেষ সুবিধাভোগীদের প্রসঙ্গে আমরা উপরে তুলে দিয়েছি, তাতে জোরালোভাবেই বলা হয়েছে।

বর্তমান সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের মধ্য দিয়ে নতুন পৃথিবী গড়ার প্রয়াস কতকগুলো সাংঘাতিক চিন্তাভাবনা ও কর্মকাণ্ড ও পরিচালনাগত ভ্রান্তি ও বিভ্রান্তির দরুন যে নিদারুণ হতশ্বাসের সৃষ্টি করেছে পরীক্ষিত সমাজতন্ত্রীদের মনেও, তাকে কাটিয়ে উঠবার চেষ্টায় স্বামী বিবেকানন্দের চিন্তাভাবনা সমাজতন্ত্রীদের পক্ষেই কাজ করবে।

সাম্যবাদী সহযাত্রী স্বামী বিবেকানন্দের চিন্তাভাবনার এই সহযোগিতাকে মার্কসীয় চিন্তা ও কর্মকাণ্ডের ধারক বাহকেরা যথাসত্বর সমাজতন্ত্রের পনুরুত্থানের তথা নতুনতর প্রয়াসের ক্ষেত্রে বড় রকমের সহায়করূপে গ্রহণ করবেন, এটা আমরা কায়মনোবাক্যে প্রত্যাশা করব। এই সূত্রেই স্মরণ করব, স্বামী বিবেকানন্দের সমকালীন সমব্যয়ী রবীন্দ্রনাথও যৌবনের বহুমুখী ভাবনা চিন্তা ও কাজের মধ্যে সমাজতন্ত্রের প্রতিও আকৃষ্ট হয়েছিলেন এবং তিনি বেদান্ত তথা উপনিষদে লালিত ভাবনা অনুসারে ব্রহ্মকে সত্য বলেছেন কিন্তু জগৎ সংসারকে মিথ্যা বলেন নি। তাঁর এই দিককার ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ–তাঁর নিজস্ব ধরনেরই ছিল অবশ্য। তবে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে 'মানুষের ধর্ম' বক্তৃতামালায় তিনি যে বক্তব্য রেখেছেন, তাতে মানুষমাত্রের অস্তিত্ব ও অধিকার

নিয়ে উপনিষদ ও বাংলার লোকসংগীতকার এবং বিশেষকরে বাউলদের সহঅবস্থান ঘটিয়ে তিনি যে ভাবনা উপস্থিত করেছেন, সেটা স্বামী বিবেকানন্দের 'তত্ত্বমনি' সূত্রভিত্তিক সার্বভৌম মনুষীসত্তার তথা উচ্চনীচ নির্বিশেষে ও নারী পুরুষ নির্বিশেষে মানুষমাত্রের ব্রহ্মত্বের পক্ষেই যুক্তি জুগিয়েছে। জাঁ পল সার্ত্রে তাঁর সর্বশেষ গ্রন্থ 'দ্বান্দ্বিক যুক্তির নিরীক্ষাতে' মার্কস ও এঙ্গেলসের গ্রন্থ 'জার্মান মতাদর্শ' থেকে মানুষের সার্বভৌম ব্যক্তিসত্তার যে জয়গান তুলে নিয়ে এসেছেন, তাকেও আমরা এখানে বিবেচনার জন্য রাখতে পারি। এই সঙ্গেই রবীন্দ্রনাথ ১৯৪০ সালে তাঁর 'সভ্যতার সংকট' নিবন্ধে সাম্রাজ্যবাদী পুঁজিবাদী আগ্রাসী সমাজব্যবস্থার অবশ্যম্ভাবী পতনের কথা যে শ্লোক মারফত উত্থাপিত করেছেন, তার সঙ্গে বিশেষ সুবিধাভোগীদের সম্পর্কে স্বামী বিবেকানন্দের উল্লেখিত বক্তব্য এবং সাধারণভাবে সর্বজনবিদিত মার্কসীয় বক্তব্যের বিস্ময়কর হলেও সহজ সরল মিল পাওয়া যাবে।

অতিসম্প্রতি সমাজতন্ত্রীদের দেশ দেশান্তরের বহু বিশিষ্ট প্রবক্তার মনেও গত দুই দশকে ঘটনাবলির দরুন যে আক্ষেপ ও বিভ্রান্তি দেখা দিয়েছে, তাকে কাটিয়ে উঠতে স্বামী বিবেকানন্দ-রবীন্দ্রনাথের অনুসারী ও মার্কসপন্থীদের সহায়তা করবেন, এই প্রত্যয় আমরা ব্যক্ত করতে পারি। স্বামী বিবেকানন্দ ও রবীন্দ্রনাথ যেমন মৌলবাদী ছিলেন না, মার্কসপন্থীরাও নিশ্চয় তেমনি কোন রকমের গোঁড়ামি করে চলবেন না, এটা আশা করা যায়। কারণ গত এক শতাব্দিতে মার্কসীয় চিন্তাভাবনার প্রয়োগের ক্ষেত্রে প্রকাশ পেয়েছে লেনিন ও রোজা লুক্সেমবুর্গের মতো মার্কসপন্থীরা মার্কসীয় সূত্র সমূহকে দিয়েছেন নব নব সৃষ্টির প্রসার।

॥ ৬ ॥

স্বামী বিবেকানন্দ যে গোঁড়া নীতিবিদ বেদান্তবাদী ছিলেন না, সে কথা আমরা আমাদের নিবন্ধে ইতোপূর্বে কিছু কিছু এনেছি। তিনি শ্রীরামকৃষ্ণকে বেদান্তের সত্যের প্রতিভূ হিসাবে গুরু বলে গ্রহণ করেছিলেন। একে মার্কসীয় পরিভাষায় 'প্রাক্সিস' বলে অভিহিত করেছেন প্রখ্যাত কয়েকজন মার্কসবাদী। আমাদের উপমহাদেশের বাসিন্দাদের একতাবদ্ধ হওয়ার জরুরি প্রয়োজনটিকে সামনে রেখে আমরা স্বামী বিবেকানন্দ বেদান্ত ও ইসলামের সহযোগিতার যে ছবিটিকে সামনে এনেছিলেন উনিশ শতকের শেষের দিকে, সেটিকে শুধু সামনে এনেই আমাদের নিবন্ধের ইতি টানবো।

ইতোপূর্বে আমরা যে বিবেকানন্দ রচনা সংগ্রহের শরণাপন্ন হয়েছি, তারই পঞ্চম খণ্ড থেকে নৈনিতালের মহম্মদ সরফরাজ হুসেনকে আলমোড়া থেকে ১৮৯৮ এর ১০ই জুন স্বামী বিবেকানন্দের লেখা পত্রখানির সবটাই তুলে দিচ্ছি:

আলমোরা

১০ জুন, ১৮৯৮

প্রিয় বন্ধু

আমি আপনার পত্র পেয়ে বিশেষ মুগ্ধ হয়েছি। একথা শুনে যারপরনাই আনন্দিত হলাম যে, আমাদের অজ্ঞাতসরে ভগবান আমাদের মাতৃভূমির জন্য অপূর্ব সব আয়োজন করেছেন।

আমরা যাকে বেদান্তই বলি আর যাই বলি, আসল কথা হল, ধর্মের ও চিন্তার সর্বশেষ কথা অদ্বৈতবাদ; বেকল অদ্বৈতবাদের অবস্থান থেকেই মানুষ সকল ধর্ম ও সম্প্রদায়কে প্রীতির চক্ষে দেখতে পারে। আমার বিশ্বাস, তাই ভাবি সুশিক্ষিত মানবসাধারণের ধর্ম। অন্যান্য জাতি অপেক্ষা অনেক আগে হিন্দুরা এই তত্ত্বে উপনীত হয়েছে বলে দাবি করতে পারে, কারণ তারা হিব্রু কিংবা আরবী জাতি অপেক্ষা প্রাচীনতর। কিন্তু সমগ্র মানবজাতিকে যা আপন আত্মা বলে জ্ঞান করে এবং তার প্রতি তদনুরূপ ব্যবহার করে সেই ব্যবহারিক বেদান্ত হিন্দুদের মধ্যে কখনো সর্বজনীন পুষ্টি লাভ করেনি।

পক্ষান্তরে, আমার অভিজ্ঞতা হল, যদি কোনো ধর্মমত কখনো মোটের ওপর এইরকম বৈশিষ্ট্য ও সাম্য অর্জন করে থাকে তবে তা ইসলাম ধর্ম।

অতএব আমার দৃঢ় ধারণা এই যে, বেদান্তের মতবাদ যতই কেননা সুন্দর এবং আশ্চর্যজনক হোক, ব্যবহারিক ইসলাম ধর্মের সহায়তা ব্যতিত মানব সাধারণের অধিকাংশের নিকট তা মূল্যহীন হয়েই থাকবে। আমরা মানবজাতিকে এমন একটা অবস্থায় নিয়ে যেতে চাই সেখানে বেদও নেই, বাইবেল নেই, কোরানও নেই; অবশ্য এই কাজটি করা সম্ভব বেদ, বাইবেল ও কোরানের সমন্বয় দ্বারাই। মানবজাতিকে এই সত্যটি শেখাতে হবে যে সকল ধর্মমত আসলে একটি মানবধর্মের। সেই এক স্বরূপের প্রকাশমাত্র, অতএব প্রত্যেকেই তাঁর উপযোগী মতটাই বেছে নিতে পারেন।

আমাদের নিজেদের মাতৃভূমির পক্ষে হিন্দু ও ইসলাম ধর্মের, বেদান্ত মস্তিষ্ক এবং ইসলাম দেহের সংযোগই একমাত্র আশা।

আমি মানসচক্ষে দেখছি ভবিষ্যৎ পূর্ণাঙ্গ ভারত বৈদান্তিক মস্তিষ্ক এবং ইসলামিক দেহ নিয়ে এই বিবাদ বিশৃঙ্খলা ভেদ করে মহা-মহিমায় ও অপরাজেয় শক্তিতে জেগে উঠছেন।

ভগবান আপনাকে মানবজাতির, বিশেষ করে আমাদের অতি দরিদ্র জন্মভূমির সাহায্যের জন্য এক মহান হাতিয়াররূপে গড়ে তুলুন, এই আমার সতত প্রার্থনা।

ভবদীয় স্নেহবদ্ধ
বিবেকানন্দ

৫৫ নং চিঠি–
বিবেকানন্দ রচনা সংগ্রহ (৫ম খণ্ড)

মওলানা আজাদের 'গুবারে খাতির' (বিদীর্ণ হৃদয়)

আমাদের উপমহাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের অনন্য নায়ক মওলানা আবুল কালাম আজাদের জন্ম ১৮৮৮-এ মক্কায়। ১০ বছর বয়সে তিনি বাবা-মার সঙ্গে কলকাতায় চলে আসেন। সেই থেকে কলকাতা ছিল তাঁর নিবাস। মৃত্যু ১৯৫৮ তে। ১৯৮৮ তে তাঁর জন্মশতবার্ষিকীতে তাঁর চিন্তাভবনা ও কর্মকাণ্ডকে কেন্দ্র করে নানা ধরনের নিরীক্ষা হয়েছে। প্রশস্তি হয়েছে, বিতর্কও বাদ যায়নি। আজও তাঁর প্রাণবন্ত উপস্থিতি বিশেষ

করে ধর্ম ও রাজনীতি এবং স্বাধীনতা ও গণতন্ত্র সম্পর্কিত প্রশ্নের মীমাংসায় বড় ভূমিকা নিতে পারে। এই সূত্রেই, তাঁর আত্মকথাভিত্তিক 'গুবারে খাতির' (বিদীর্ণ-হৃদয়) গ্রন্থটিকে চূড়ান্তত্ম গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ঐতিহাসিক বৈপ্লবিক দৃষ্টিভঙ্গীর গভীর ব্যঞ্জনাময় অনন্য সৃষ্টিরূপে সামনে আনছি। বইটিকে 'বেদনার্ত হৃদয়ের ছিন্নপত্রডালি' নামেও অভিহিত করা যেতে পারে। উর্দু ভাষায় রচিত। এর কোন ইংরেজি অনুবাদ হয়েছে বলে জানা নেই আমাদের। বাংলা হয়নি। ১৯৪৬ সালে প্রকাশিত হয়। সম্প্রতি দিল্লীস্থ সাহিত্য একাডেমি এর একটি শোভন সংস্করণ প্রকাশ করেছে।

প্রাথমিকভাবে বলে রাখা যেতে পারে, অভূতপূর্ব ব্যঞ্জনাময় নামটি আমাদের উপমহাদেশের সতেরো শতকের একমুখী সাধক মনীষীর একটি ফার্সী পংক্তি থেকে 'গুবারে খাতির' কথাটি নেয়া। মওলানা আজাদের এই গ্রন্থটির পৃষ্ঠা সংখ্যা ২৮৪। এতে ৭০০ দুই পংক্তির আরবী ফার্সী উর্দু কবিতার উদ্ধৃতি রয়েছে। আর্ত হৃদয় কথার বর্ণনা বিশ্লেষণে ভরপুর এর গদ্যাংশ বইটির শতকরা ৬০ ভাগ জায়গা নিয়েছে। এই গদ্য সাবলীল ও লোকায়ত।

সাহিত্য একাডেমির শোভন সংস্করণটির সম্পাদক মালিকরাম মন্তব্য করেছেন যে, মওলানা আজাদ 'আলহেলাল' এবং এই ধরনের অন্যান্য যেসব পত্রপত্রিকা চালাতেন, তাতে অতিরিক্ত আরবী ও ফার্সী শব্দ উর্দু লোকায়তকে ছাপিয়ে গিয়েছে, কিন্তু 'গুবারে খাতির'-এ ব্যবহৃত আরবী-ফার্সী শব্দ 'রুটিতে নুনের মতোই পরিমিত।'

মওলানা আজাদ বরাবরই বস্তুতপক্ষে ও প্রধানত একজন বিশ্লেষক ও ব্যাখ্যাকার রূপে গদ্য বৃত্তান্তের বড় রকমের শিল্পী। তবে তিনি তাঁর রচনাশৈলীর প্রসাদগুণের দিক থেকেও 'গুবারে খাতির' এ চূড়ান্ত উৎকর্ষে পৌঁছেছেন। এতে তিনি বক্তব্যের তীক্ষ্ণতা ও পরিচ্ছন্নতাকে কাব্যিক ব্যঞ্জনাও দিয়েছেন।

মওলানা আজাদ তাঁর এই লেখায় যখনই তাঁর সাবলীল ও স্বাচ্ছন্দ গদ্যে বক্তব্য ব্যক্ত করেও মনে করেছেন যে, কথাটাকে কোন কবিতার দুটি পংক্তি দিয়ে কিংবা আরও বড় পরিসরের কবিতা জুড়ে দিলে অর্থ ও ব্যঞ্জনা বাড়বে, তখন কাব্যের আশ্রয় নিয়েছেন। তবে তিনি নিজে কোন পদ রচনা করেননি। তিনি কবি গালিব, হাফেজ ও অন্যান্য কবির শরণাপন্ন হয়েছেন। সাতশ (৭০০) দুই পংক্তির কবিতার উদ্ধৃতিকে তাঁর 'বেদনার্ত হৃদয়ের ছিন্নপত্রডালি'তে দিয়েছেন, সেগুলি সবই তাঁর কণ্ঠস্থ বা মুখস্থ ছিল বলে অনুমান করে নেয়া যায়। তিনি ছিলেন ইসলামের ধর্মশাস্ত্র ও সাধারণভাবে মধ্যপ্রাচ্যের দর্শনচর্চার পুঁথিপত্রের পাশাপাশি সুফী ও অন্যান্য বিভিন্ন চিন্তাভানায় উদ্ভাসিত আরবী ফার্সী উর্দু পদাবলির স্মৃতিধর ভাণ্ডারী। 'গুবারে খাতিরে'র চিঠি লিখতে বসে যখনই তিনি কোন কবিতার পংক্তিকে স্মরণ করেছেন, তখনই সেই পদ তাঁর কলমের মুখে এসে গিয়েছে। দুরূহ রাজনৈতিক সমস্যা অথবা যুক্তিবিচার ও নন্দনতাত্ত্বিক দর্শন প্রাচ্য ও প্রতীচ্য নির্বিশেষে, ধর্ম ও ধর্মনিরপেক্ষ নির্বিশেষে তাঁর এই বিশেষ অধিকারটিকে আশ্রয় করে কাব্যিক ব্যঞ্জনা লাভ করেছে। আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের আরেকজন পুরোধা ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশনে পূর্ণ স্বাধীনতার প্রথম প্রস্তাব উত্থাপক এবং উপমহাদেশে কমিউনিস্ট আন্দোলন ও সংগঠনের অন্যতম আদি উদ্গাতা মওলানা হযরত মোহানীর মতোই মওলানা আজাদ দুর্ধর্ষ রাজনৈতিক

ক্রিয়াকর্মের সঙ্গে কাব্যের ললিতবাণীর সখ্যস্থাপন করেছেন হযরত মোহানীর মতো পদকর্তা না হয়েও।

মওলানা আজাদ এই ব্যাপারটা ঘটাতে পেরেছিলেন এক ধরনের বিশুদ্ধ মজলিসী বিদ্যাচর্চা ও মজলিসী ধরনের লেখার ধারাতে সময় করে নিয়ে আত্মনিয়োগ করে এবং এতে হৃদয়াবেগ ও 'তবীয়াত' বা মনমেজাজকে অগ্রাধিকার দিয়ে। প্রধানত দিল্লীতে প্রখ্যাত স্বাধীনতা সংগ্রামী হাকিম আফজল খানের বাসভবনে বসতো একই সঙ্গে কাব্য রসিক ও বিদ্বজ্জনের মজলিস। এই মজলিসেই মওলানা আজাদের পরিচয় হয়েছিল দধিওয়াড়ের হায়দরাবাদের ওসমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম উপাচার্য মওলানা হাবীবুর রহমান খান শেরোয়ানীর সঙ্গে যিনি এক সময়ে হায়দরাবাদের নিজামের ধর্মসংক্রান্ত বিষয়ের উপদেষ্টা ছিলেন এবং পরে সপরিবারে আলীগড়ের উপকণ্ঠে বসবাস ও প্রকাশনার কাজ করেছেন। মওলানা হাবীবুর রহমান ছিলেন স্বয়ং কবি এবং আরবী ফার্সী কাব্যের অগাধ ভাণ্ডারের অধিকারী। দিল্লীতে হাকিম আফজল খানের বাসভবনে এই ধরনের যাঁরা আসতেন, তাঁদের সঙ্গে মওলানা আজাদের চলতো বৈদগ্ধ্য চর্চা। এই বৈদগ্ধ্যে থাকতো রসগ্রাহীতা। দৈনন্দিন রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের বাইরের এই মন দেয়া-নেয়ার ফসল মওলানা আজাদের, 'আত্মজীবনীর কড়চা, ও 'কারোয়ানে খেয়াল (ভাবনাকল্পনার যাত্রীরা)। এই তবীয়াতের তথা মানসিকতা বা মনমেজাজের নির্দিষ্ট আবহটিকে মনে রেখে আমরা কোরান শরীফের তরজমাকার, ইমাম উল হিন্দ্, উপমহাদেশের জাতীয় মুক্তিসংগ্রামের সর্বধর্মীয় তথা ধর্মনিরপেক্ষ পথনির্দেশক, বিশেষ বিশেষ সন্ধিক্ষণে জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতিত্বকারী, অক্লান্ত সত্যাগ্রহী কারাবরণকারী, 'আল হেলাল' পত্রিকার সম্পাদকরূপে বিভিন্ন প্রগতিবাদী চিন্তার সমন্বয়সাধক মওলানা আবুল কালাম আজাদের মহাগ্রন্থ 'গুবারে খাতির' বা 'বিদীর্ণ হৃদয়' বা 'বেদনার্ত হৃদয়ের ছিন্নপত্রডালি'র বিষয়বস্তুকে এখানে উপস্থিত করছি। আমরা শুরুতে জানিয়ে রাখছি যে, এই বইটিতে এমন সমস্ত ঘটনা বা চিন্তা ভাবনা পাবো, যা অভাবনীয় এবং সাধারণভাবে আজও অপরিজ্ঞাত। কিন্তু এই সমস্ত তথ্য এখানে অতিসংক্ষেপে শুধু উল্লেখ করে যাওয়াই সম্ভব। যেমন ধারা যাক, মওলানা আজাদ যৌবনের প্রারম্ভে ভারতীয় রাগরাগিনীর চর্চা করেছিলেন কণ্ঠসংগীতে এবং সেতারে সংগীতাচার্যের কাছে বিধিবদ্ধভাবে প্রশিক্ষিত হয়ে।

যাই হোক, এবার আমরা প্রথমে বইটি কি অবস্থাতে লেখা হলো এবং কি ধরনের শৈলীতে রচিত হলো সেটা জানিয়ে এর মূলে প্রবেশ করার চেষ্টা করছি।

॥ ২ ॥

১৯৪২ সালে ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের আগস্ট আন্দোলনের সূচনার একেবারে মুখে অর্থাৎ ৮ই আগস্টের মাঝরাতে মওলানা আজাদ বোম্বাইতে কংগ্রেসের এক বিশেষ অধিবেশনে যোগদানকারী অন্যান্য বিশিষ্ট নেতার মতোই গ্রেপ্তার হন। সেই রাতেই পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু এবং সৈয়দ মাহমুদ প্রমুখ কয়েকজন নেতার সঙ্গে মওলানা আজাদকে ট্রেনে চড়ানো হয় এবং পুনার কাছে তাড়াহুড়ো করে কারাগারে রূপান্তরিত আহমদনগর কেল্লায় নিয়ে আটক করা হয়। এই নতুন বাসায় ৯ই আগস্টের অপরাহ্ণ

আর রাত যার যার কক্ষে ঘুমিয়ে কাটান বন্দীরা। মওলানা আজাদের অভ্যাস ছিল, জেলে থাকুন, বাইরের বাসায় থাকুন অথবা ট্রেনেও, প্রত্যুষে চায়ের পাট আর পেয়ালা নিয়ে বসে যাওয়া। ১০ই আগস্ট আহমদনগরের কেল্লার কারাকক্ষেও তিনি প্রত্যূষে চা পানের প্রস্তুতি নিয়ে বসে গেলেন। তাঁর মনে পড়ে গেলো, ২রা আগস্ট কলকাতা থেকে বোম্বাই রওনা হয়ে ৩রা রাত ভোরে ট্রেনে বসে তাঁর এক শ্রদ্ধেয় সজ্জন এবং বিশেষ করে একই ধরনের মনমেজাজের তবিয়াতী বন্ধু মওলনা হাবীবুর রহমান খান শেরোয়ানীকে একটি চিঠি লিখেছিলেন। কিন্তু বোম্বাইতে নেমে সেই দিনগুলির দারুণ ব্যস্ততার দরুন–সেই চিঠি–ডাকে দেয়া হয়নি। এতে তিনি হৃদয়ের বন্ধুকে হৃদয়ের খবর দিয়ে লিখেছিলেন যে, এবার কলকাতা থেকে বেরোবার আগে কয়েকটা দিন তিনি এবং স্ত্রী জুলেখা বেগম ভিতরে ভিতরে খুবই অস্থির হয়ে উঠেছিলেন, যদিও বাড়ির কাউকে বুঝতে দেননি দুজনের কেউই। ইতোপূর্বে ১৯১৬, ১৯২১ এবং ১৯৩০ এ দু'তিন বছর করে জেলে ঢুকেছিলেন আজাদ। ১৯৪০-এও অল্পকিছুদিনের জন্য জেল হয়েছিল। প্রথমবার স্ত্রী কান্নাকাটি করায় আজাদ রাগ করেছিলেন বলে পরের জেলযাত্রার সময় স্ত্রী পরে কখনও অস্থিরতা প্রকাশ করেননি। অস্থিরও হননি দুজনের কেউ। কিন্তু এবার ৪২ সালে ঘটনাবলি যেদিকে যাচ্ছিল, তাতে বোম্বাইতে কংগ্রেসের অধিবেশনের পরে আজাদের জেলতো হবেই, অন্য আরও কিছু ঘটতে পারে এটা দুজনেই আন্দাজ করেছিলে। এবার দুজনেই বেদনার্ত হৃদয়ে পরস্পরের কাছ থেকে বিদায় নিয়েছিলেন যদিও বাইরে তার কোন প্রকাশ ছিল না। ট্রেনে যেতে যেতেও এবারকার ছাড়াছাড়ির ব্যাপরটাতে আজাদের মনে থেকে যাচ্ছিল বেদনা। বন্ধুকে এই কথাটাই জানিয়েছিলেন তিনি ট্রেনে বসে লেখা চিঠিতে। ১০ই আগস্ট ভোররাতে কারাকক্ষে বসে এই চিঠির উৎকণ্ঠার সূত্র ধরেই তিন বন্ধুকে যেন সামনে বসিয়ে জানাতে বসলেন, পরে কি ঘটল। এই জানানোর ব্যাপারটা রূপ নিলো চিঠি লেখারই এবং এটা জেনেশুনেই যে এই চিঠি ডাকে দেয়াই হবে না কিংবা দেয়া যাবে না। ১০ই আগস্টের এই চিঠিতে ৮ই আগস্ট নিশীথরাত্রিতে গ্রেফতার হয়ে ট্রেনে চড়ে আহমদনগরের কেল্লায় পৌছবার পথে এবং আটক থাকার জায়গায় ঢুকে যা দেখলেন তার বর্ণনা রয়েছে। কোথায় এবং কি পরিবেশে এলেন এবং আপাতত কিভাবে থাকছেন তার একটা ধারণা দিলেন তিনি। প্রত্যেকের আলাদা আলাদা কক্ষ। সামনে বেশ খানিকটা খোলা জায়গা। কেল্লার সেনা আবাসের ব্যারাক খালি করে এই জেল তৈরি হয়েছে। খোলা জায়গাটার একধারে যে পতাকা দণ্ড রয়েছে, তাতে কোন পতাকা নেই। কিছুটা তফাতে একটা কবর। তার পিছনে প্রদীপ জ্বালাবার জন্য ব্যবস্থা রয়েছে। তবে অনেকদিন এখানে কেউ প্রদীপ জ্বালেনি। কবরটাও পরিত্যক্ত। একবার মনে হলো, এটা কি চাঁদবিবির কবর? তখনই মনে পড়ল, না, তাঁর কবরতো কেল্লার বাইরে। বন্ধুকে সম্ভাষণ জানিয়ে আজাদ যেমন একদিকে কারাগারের বর্ণনা দিলেন তন্ন তন্ন করে, তেমনি সারাটি দিন ধরে উদ্বেগে উদ্বেলিত হৃদয়ে যে আবেগমথিত কথাগুলি ভেবেছিলেন, সেগুলি লিখলেন। লিখলেন যে, জেলখানার বাইরে থেকে ভিতরে পা দেয়ার ব্যাপারটা হলো ঠিক যেন জীবন থেকে মৃত্যুর মধ্যে যাওয়ার একটা মাত্র পদক্ষেপ। পতাকাবিহীন উঁচু দণ্ডটার দিকে তাকিয়ে মনে হয়েছিল, হৃদয়ের ক্রন্দনের ঢেউ ঐ উঁচু দণ্ডটাকেও ছাপিয়ে যাবে।

রূঢ় বাস্তবতার সঙ্গে উদ্বেলিত হৃদয়ের বা উৎক্ষিপ্ত মনের কথাগুলিকে সমন্বিত করার এই ধারাটির পাশাপাশি আজাদের প্রত্যূষী সম্ভাষণে যে উৎপেক্ষার বিস্ফোরণ ঘটেছে মাঝে মাঝে, তার পরিচয় আমরা কয়েকটি চিঠির প্রসঙ্গে পাবো। হৃদয়ের ক্রন্দন ও সংকল্পবদ্ধতার দুটো দিকই যে আজাদের চিন্তাভাবনায় জায়গা করে নিয়েছিল তা আমরা দেখতে পাবো। উৎপেক্ষা যেখানে প্রবল, সেখানে, স্বাধীনতাসংগ্রামী আজাদের জীবনের স্থির বহুমুখী স্থৈর্য ও ধৈর্যকে আশ্রয় দিয়েছে সজাগ চৈতন্য। এই সমন্বয়কে সাহায্য করেছিল আজাদের একটা বিশেষ সাধনা, যার খবর আমাদের অনেকেরই জানা নেই।

মওলানা আজাদের এই সাধনা ছিল সংগীতের সাধনা। বিশেষ করে, 'হিন্দুস্তানী' সংগীতের সাধনা। শাস্ত্রচর্চায় এবং কণ্ঠচর্চায় ও বাদনে উভয়ত। 'গুবারে খাতির'-এর এক চিঠিতে এই সাধনার কথা প্রকাশ পেয়েছে। এই চিঠিখানি বইটিতে সবচেয়ে বড় লেখা। বিশ্বের বিভিন্ন দেশের সংগীতের মূল মর্মকে উপস্থিত করার সঙ্গে সঙ্গে বিশেষ করে আমাদের উপমহাদেশে মুসলিম শাহানশাহ ও বাদশা নবাবদের দরবারে কেন্দ্রীয় অথবা আঞ্চলিকভাবে উৎসাহিত হিন্দুস্তানী সংগীতের যে ব্যাপক চর্চা ও প্রসার এবং সৃষ্টির ধারা রচিত হয়েছিল, তার গোটা ইতিহাস সংক্ষেপে আজাদের এই চিঠিখানিতে বর্ণিত হয়েছে। স্বভাবতই আমীর খসরু এবং অযোধ্যা ও লক্ষ্ণৌর সংগীতশিল্পী ও তাঁদের গানের ধারায় উল্লেখ রয়েছে এই বিস্ময়কর নিরীক্ষায়।

এই চিঠিতেই জানা যায় যে, সংগীতে এবং বিশেষ করে রাগসংগীতে আজাদ তাঁর অধিকারটিকে কিভাবে আয়ত্ত করেছিলেন। প্রথম যৌবনে তিনি কলকাতার একটি বইয়ের দোকানে বসে একবার 'রাগদর্পণ' নামক সংস্কৃত গ্রন্থের ফার্সী অনুবাদটি পড়ছিলেন প্রাথমিকভাবে একজন গ্রন্থপিপাসু হিসাবে। সেখানে কলকাতা মাদ্রাসার সাহেব অধ্যক্ষ তাঁকে এই বই পড়তে দেখে বলেছিলেন, 'এই বই-এর মর্ম তুমি কি করে বুঝবে?' আজাদের এতে জিদ চেপে যায় এর তত্ত্বটিকে আয়ত্ত করার। বইটি তিনি কিনে নিয়ে যান। তারপরেই তিনি স্থির করেন যে ব্যাপারটাকে তিনি তত্ত্বের মধ্যেই রাখবেন না। গান শিখবেন তিনি। তাঁর বাবার এক জুরীদ সংগীত সাধকের শরণাপন্ন হলেন তিনি। বছরের পর বছর রেয়াজ করলেন এবং সেতার বাজাতেও শিখলেন।

মওলানা আজাদ যে তাঁর চিঠিতে তাঁর জীবনের একটি চাপা পড়ে থাকা ঘটনাকে খুঁজে বার করে দেখালেন, এর মূলে ছিল জেলখানায় স্ত্রীর মৃত্যু সংবাদ পাওয়ার পরে তাঁর হৃদয়ের উদ্বেলতা। '৪৩-এর ১৬ই সেপ্টেম্বর কারাকক্ষে প্রত্যূষে যথারীতি চায়ের সরঞ্জাম সামনে নিয়ে বসে তিনি লিখলেন, ছেলেবেলায় একটা খেলনার বেলুনকে সুই দিয়ে ছেঁদা করে দেবার সঙ্গে সঙ্গেই বেলুনের গ্যাসটা বেরিয়ে গিয়েছিল। হৃদয়ের জমে থাকা গ্যাস বার করে দেয়ার কথা তিনি ইদানীং ভাবছিলেন। কিন্তু সুঁই পাচ্ছিলেন না যেন। হঠাৎ একদিন দূর থেকে রেডিয়োর সুর ভেসে এলো, বেহালাতে মেন্ডেলসন। তিনি ফিরে পেলেন প্রশান্তিকে। এই সূত্রেই কলমের মুখে বেরিয়ে এলো সংগীতের প্রশান্তি।

'গুবারে খাতির' বইটির চিঠিগুলির মূল ছিল এই ধরনের একেকটি ঘটনা বা পরিস্থিতি। '৪৩-এর সেপ্টেম্বর পর্যন্ত কখনও ঘনঘন এবং কখনো লম্বা বিরতি দিয়ে

আজাদ তাঁর হৃদয় মনকে উপস্থাপিত করেছিলেন ২০টি উপরিক্ত ও অন্যান্য নানা বিষয়ক চিঠি লিখে। প্রত্যূষে চা নিয়ে বসে সামনে বন্ধু বসে রয়েছেন কল্পনা করে নিয়ে অন্তরঙ্গ আত্মকথাটি করেছিলেন তিনি। '৪২-এর বর্ষায় জেলে ঢুকেছিলেন। বর্ষাশেষ হলো, শীত এলো, তারপর বসন্ত এল। তারপর এলো আনন্দময় ফুলের মৌসুম এবং তারপর এলো তাদের নিষ্ঠুর সমাপ্তি। তবে দিবারাত্রির কোন পুনরাবৃত্তি হয়নি জীবনে মানসে। জেলখানার আবদ্ধতার মধ্যেও তাই এসেছে রংবেরং এর অভিজ্ঞতা। এই অভিজ্ঞতাকে প্রতিফলিত করে আজাদের অন্তর্জগতে নানাধরনের তোলপাড় হয়েছে এবং একান্তভাবে বর্তমানের অথবা সুদূর অতীতের ধারাতেই উত্তীর্ণ ভবিষ্যতের চালচিত্রের মতো রূপায়িত হয়েছে নিরীক্ষা। এই ভূতভবিষ্যত বর্তমানের ভাঙ্গাগড়ার মধ্যেই '৪৩-এর এপ্রিলের ৯ তারিখে আজাদ পেয়েছিলেন স্ত্রী জুলেখা বেগমের মৃত্যুসংবাদ। আমরা কিছুটা আভাস দিয়েছি কিভাবে আজাদ বিদীর্ণ হৃদয়ের ভাব ও ভাবনাকে সংহত করেছিলেন। কিভাবে তিনি অন্তর্জগৎ ও বহির্জগতের সাযুজ্যটি রচনা করেছিলেন সে সম্বন্ধে আমরা এখানে কিছু পর্যালোচনা উপস্থিত করছি। তার আগে বইটির প্রকাশনা সম্বন্ধে দু'চার কথা বলে নিচ্ছি।

১৯৪৫-এর মুখে বাঁকুড়া জেল হয়ে আজাদ কারাগারের বাইরে এলেন। অর্থাৎ '৪৩-এর সেপ্টেম্বরের পরে আরও দেড় বছর তিনি জেলে ছিলেন। কিন্তু এই দেড় বছরে বেদনার্ত হৃদয়ের ছিন্নপত্রের ধারায় তিনি কিন্তু লেখেননি। অন্য ধরনের লেখার কাজ করছেন। কিন্তু জেল থেকে বেরোবার মুখে আবার মনে পড়ে গেলো বন্ধুকে, সাজিয়ে গুছিয়ে নিলেন ডাকে না পাঠানো চিঠিগুলির, নকল রাখলেন এবং সেই বন্ধুকে পাঠিয়ে দেবেন বলে মনস্থ করেই বাইরে এলেন। কিন্তু যা মনস্থ করেছিলেন, সেটা করা হলো না। তাঁর ব্যক্তিগত সেক্রেটারি মোহাম্মদ আজমল খানকে বললেন, চিঠিগুলি তখনই এক থোকে পত্রিকায় প্রকাশ করলে ভাল হবে। তাঁর এই তাগিদে চিঠিগুলি পত্রিকায় প্রকাশিত হল। তারপর '৪২-এর ৩রা আগস্টের ডাকে না দেয়া চিঠি, মওলানা আজাদেরই লেখা একটি সংক্ষিপ্ত ভূমিকা এবং '৪৫ সালে জেলের বাইরে থেকে উদ্দিষ্ট বন্ধুকেই লেখা তিনটি চিঠি যোগ করে। প্রকাশিত হলো 'গুবারে খাতির' বইটি।

এখানে বলে রাখার দরকার যে, বন্ধু মওলানা হাবীবুর রহমান খান শেরোয়ানি তাঁকে লেখা চিঠিগুলি গ্রন্থাকারেই পড়লেন এবং সঙ্গে সঙ্গেই বইটির পাঠক-পাঠিকারাও জেনে গেলেন দুই বন্ধুর অন্তরঙ্গতার কথা। এই অন্তরঙ্গতার উপর এখানে দু'চারটি তথ্য দিয়ে আলোকপাত করলে সেটা বইটিকে বুঝতে সাহায্য করতে পারে।

১৯০৫ সালে লক্ষ্ণৌতে উপমহাদেশের প্রখ্যাত আলেম মওলানা শিবলী নোমানীর বাসগৃহে দুজনের প্রথম সাক্ষাত এবং বন্ধুত্বের সূচনা। এরপরে হাকিম আজমল খানের বাসায় দিল্লীতে অতিথি হবার সময় দুই প্রতিভার মন ও মানসের তথা তবীয়াতি সংযোগ ঘটে। আজাদের বয়স কম হলেও হৃদ্যতা ঘটতে অসুবিধা হয়নি। কৈশোর পেরিয়ে যৌবনে পা দিতে না দিতেই মওলানা আজাদ তখন জ্ঞানের আকর রূপে আলেম জগতে বিস্ময় ও শ্রদ্ধা আকর্ষণ করছিলেন। তবে হাবীবুর রহমানের সঙ্গে সহমত গড়ে ওঠার মূলে এক ধরনের হৃদয়বত্তাই কাজ করেছিল বলে মওলানা আজাদ

একটি লেখায় বলেছেন। তিনি এতে লিখেছেন যে, কর্মক্ষেত্রের পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও তবীয়াতই দুজনের সখ্যতা গড়ে ওঠে।

এই প্রসঙ্গেই স্মরণীয় যে, '৪২ এর ৩রা আগস্টের ট্রেনে বসে লেখা চিঠিটা ছিল '৪০ সাল থেকে শুরু করে '৪২ এর মার্চ পর্যন্ত এই বন্ধুকেই লেখা অনেকগুলি চিঠির পরিণতি। এইসব চিঠিতে ছিল ১৯০৫ থেকে শুরু করে ১৯২০ পর্যন্ত বন্ধুর সঙ্গে একের পর এক সাক্ষাৎকারের স্মৃতিচারণ। এই স্মৃতিচারণে দুষ্প্রাপ্য পুঁথিপত্রের প্রসঙ্গটিই বড়। আলমারী খুলতেই তাঁর হাতে এলো একটি দুষ্প্রাপ্য পাণ্ডুলিপি, যেটি ছিল কোন সুফী কবির রচনা। আজাদ চিঠিতে লিখেছেন যে, পাণ্ডুলিপি হাতে নিয়ে তাঁর মনে পড়ে গিয়েছে, মওলানা আজাাদ ও মওলানা হাবীবুর রহমান খান রাত ভোর করে দিয়েছিলেন নিরীক্ষার মহব্বতে বসে।

মওলানা হাবীবুর রহমান খানের তত্ত্বাবধানে এবং আজাদের কাছে তাঁর '৪০ থেকে '৪২ সাল পর্যন্ত লেখা কয়েকটি চিঠি মওলানা আজাদের রচিত গ্রন্থ হিসাবে 'কারোয়ানে খেয়াল', বা 'সেই সব খেয়াল খুশির দিনরাত।' এই দৃষ্টিতে বিদগ্ধমনের অন্তর্জগতের রাগ অনুরাগকে খুব বড় করে তুলে ধরা হয়েছে।

মওলানা আজাদের আত্মকথামূলক ১৯১০ নাগাদ লেখা বই 'তজকিরা' (কড়চা)। এই বইটি এখন আর পাওয়া যায় না। এর শুধু কিছু প্রসঙ্গের উল্লেখ রয়েছে 'কারোয়ানে খেয়াল' বইটির দুয়েকটি চিঠিতে। এতেই পাওয়া যায়, দিল্লীর বাসিন্দা তাঁর বাবা মক্কাশরীফে গিয়ে সেখানে বিয়ে করেছিলেন। বাবা ছিলেন ধর্মগুরু বা পীর। মক্কায় জন্ম আজাদের, তারপর আসেন কলকাতায়। তখনকার অর্থাৎ প্রথম যৌবনের চিন্তা ভাবনা সম্বন্ধে এখানে শুধু একটি ইঙ্গিত রয়েছে। তিনি তখন মধ্যপ্রদেশের বিভিন্ন শহরে ও জনপদে সফর করতে গিয়ে পিতৃবন্ধুদের সঙ্গে আলাপ করতেন। আজাদ লিখেছেন, পিতৃবন্ধুরা বুঝতেন যে, 'এই ছেলের ভাবনাচিন্তার রকমসকম ভিন্ন ধরনের'।

মওলানা আজাদের বহুখ্যাত ও সম্প্রতি বিতর্কিত আত্মকথা 'ভারতের স্বাধীনতা অর্জন' গ্রন্থটির অবশ্য ইংরেজি অনুবাদ হয়েছে। এই বইটির পূর্ণাঙ্গ প্রকাশ আজাদের জন্মশতবার্ষিকীতে প্রচুর আগ্রহের সৃষ্টি করেছে। এতে তাঁর জীবনকথা 'তজকিরা', 'কারোয়ানে খেয়াল' কিংবা 'গুবারে খাতির'-এর চেয়ে অনেক অনেক বেশি ঘটনাসংকুল ও তথ্যসমৃদ্ধ। তাঁর জীবনের পর্বগুলি এতে অনেক বেশি সুবিন্যস্ত। কিন্তু এই বই একজন সচেতন রাষ্ট্রনীতিবিদের কিছুটা নিরাসক্ত বিজ্ঞানীর বক্তব্য, যেখানে হৃদয়ের তথা অন্তর্জগতের ঝড়ঝঞ্ঝা বর্ণবিভা ও সূক্ষ্ম অনুভূতি প্রকাশের স্থান হয়নি। এখানে রাজনৈতিক দরাদরি ক্লান্তিকর বাস্তবতা রাজনৈতিক মুক্তিসংসংগ্রামের বৈপ্লবিক বিন্যাস ও উৎসর্গের ধারাকে কল্পনা ও কাব্যিকতার মহলে ঠেলে সরিয়ে দিয়েছে। 'গুবারে খাতির'কে আমরা তাই এর জাতীয় ও আন্তর্জাতীয় পরিপূরক বলেও উপস্থিত করতে পারি।

॥ ৩ ॥

এবার আমরা 'গুবারে খাতির' গ্রন্থটিকে ধারাবাহিক তথা ঘটনা পরম্পরার ধারায় উপস্থিত করছি। '৪২-এর আগস্ট থেকে '৪৩-এর সেপ্টেম্বর পর্যন্ত এর ব্যাপ্তি। তবে

২৮৪ পৃষ্ঠায় বর্ণিত ঘটনা পরম্পরাকে এখানে শুধু দু'চার কথায় তুলে ধরা হচ্ছে। কিছুটা ভাসাভাসা ভাব সমগ্র ঘটনা উপস্থাপনেও আসতে বাধ্য, এসেছে।

সামগ্রিকভাবে বলা যেতে পারে, আমাদের উপমহাদেশ এবং সেই সঙ্গে বস্তুত পক্ষে সারা বিশ্বের জন্যেই চল্লিশের দশকের মাঝামাঝি সময়টা ছিল উথালপাথালের কাল। কিন্তু মওলানা আজাদ ও তাঁর সঙ্গীদের এমন একটা জায়গায় আটক করা হয়েছিল যেখানে বাইরের কোন কথা পৌছতে পারত না। কঠোর নিয়ন্ত্রণের বেড়া খাড়া করা হয়েছিল কেল্লার মধ্যে স্থাপিত কারাগারের চারদিকে। শাস্ত্রী থেকে শুরু করে যারা বন্দী না হলেও একবার এর ভেতরে ঢুকেছে রক্ষণাবেক্ষণ ও অন্যান্য ব্যবস্থাপনার সূত্রে, তাদেরও থেকে যেতে হয়েছে এখানে। আজাদের সঙ্গে, তিনি যখন যেখানেই যান না কেন, একটা রেডিও থাকতো। এর মারফত তিনি সংগীত জগতের সঙ্গে সংযোগ রাখতেন। এবার কিন্তু আহমদনগরের কেল্লায় ঢুকবার সময় গেটে তাঁর রেডিও সেটটি রেখে দেয়া হয়। এক জমাদার তার কোয়াটারে এই সেটটা নিয়ে গিয়েছিল। সেই এটা বাজাতো এবং আজাদের কানে এর গান বাজনা কালেভদ্রে ভেসে আসতো, এসে লাগতো আজাদের কানেও। তাছাড়া, এক সামরিক কমাণ্ডারের ডেরা ছিল কেল্লার মধ্যেই এক প্রান্তে। এই ডেরাতে একটা রেডিও ছিল। এতে বিবিসি'র প্রচারিত সংগীতের প্রোগ্রাম হতো। খবর হতো না। আজাদ নিস্তব্ধ রাত্রিতে এই সংগীত কান পেতে রেখে শুনতেন। বন্দীদের তরফ থেকে কোন বড় রকমের তোলপাড় স্বাভাবিকভাবেই ছিল অবাস্তব। আজাদ এই পরিস্থিতিটিকে বুঝাবার জন্য গালিবের দুটি পঙ্ক্তি ব্যবহার করেছেন,

> 'ধনুকে কোন তীর যোজনা করলেই
> কোন ব্যাধও বসে নেই কোথাও ওঁৎপেতে
> খাঁচার এক কোণে আছি
> নির্বিবাদে, নিরুপদ্রবে।'

এই ধরনের একটা স্থবির অবস্থার মধ্যে গা ঝাড়া দিয়ে শুধু নড়াচড়া করার জন্যেই জহরলালের উদ্যোগে বন্দীরা '৪২-৪৩-এর শীত চলের যাবার সঙ্গে সঙ্গেই বসন্তের মুখে বন্দীরা সমস্ত আঙ্গিনাটা জুড়ে মৌসুমী ফুলের বাগান করতে লেগে গেলেন। সৈয়দ মাহমুদ প্রথম প্রথম সকালে নাশতা খাওয়ার পরে চিনি আর রুটির টুকরো পিঁপড়ের গর্ত খুঁজে বার করে তাতে গুঁজে দিতেন। পরে তাঁর শখ হয়েছিল এক জোড়া নানাজাতের পাখীকে ডেকে ডেকে রুটির টকুরো খাওয়ানোর। এই পাখীরা তেমন গ্রাহ্য করত না এই আদরকে। কিন্তু কাকেরা খোঁজ পেয়ে গেল। আজাদ একটি চিঠিতে লিখেছেন যে, দলে দলে কাক এসে আকাশ ভেঙ্গে নামতে লাগলো, উড়ে উড়ে ভিড় করতে লাগলো রুটির টুকরোর আশায়। সৈয়দ মাহমুদ বাধ্য হয়ে তাঁর খাদ্য-ছত্র বন্ধ করলেন। বসন্তে যখন মৌসুমী ফুলে কারাগারের আঙিনা ভরে গেলো, তখন এলো কয়েক জোড়া বুলবুল। এরা এদের গানে আর সুরের ঝঙ্কারে ভরে দিলো জেলখানাটাকে। আজাদ একটা চিঠিতে এই সময়ে লিখেছেন যে, তিনি যখন কলম নিয়ে বসে তাঁর হৃদয়ের খতের পট্টিগুলো খুলছেন, তখনই একজোড়া বুলবুল যেন টের পেয়ে গান গাইতে শুরু করেছে। তারা যেন আমাদের যন্ত্রণার উপশম চেয়েছে। তবে আজাদ তাঁর চিঠিতে শুধু

বুলবুলের এই গানের কথাই আনেননি। আমাদের উপমহাদেশে বুলবুলেরা কোথা থেকে কোন পথে যাওয়া আসা করে তার বর্ণনা দিয়েছেন আজাদ ইরানে কি ধরনের বুলবুল দেখেছিলেন তার উল্লেখ করে। আজাদের পক্ষে অত্যন্ত গুরুত্বপুর্ণ এবং অন্যদের কাজে প্রায় অবান্তর ধরনের একটি 'দ্রব্য' নিয়েও তোলপাড়ের কথা আছে দুতিনটি চিঠি জুড়ে। এই দ্রব্যটি হচ্ছে চীনা চা, অর্থাৎ সবুজ চা। এই চা ছিল আজাদের প্রিয়তম এবং প্রতিদিনের অপরিহার্য পানীয়। আজাদ চায়ের কালো পাতাগুলিকে পছন্দ করতেন না। একদিন জেলখানায় এই বহু ইপ্সিত চীনা চায়ের প্যাকেট এসে পৌঁছাল। এটা হলো একটা মস্ত বড় ঘটনা। আমাদের উপমহাদেশে এবং শ্রীলংকায় কি করে চায়ের প্রচলন হয়, উপরিউক্ত সূত্রে আজাদ তার ইতিবৃত্ত দাখিল করেছেন তাঁর চিঠিতে। সঙ্গে সঙ্গে আছে কৌতুক ও পরিহাস, আছে সুক্ষ্ম কথাবার্তা। রয়েছে বিস্ময়বোধ ও কৌতূহলের ছোঁয়া। নিতান্ত দৈনন্দিন আলো-আঁধারিতে এই প্রসঙ্গের অবতারণা। কিন্তু সাদামাটা ঘটনাবলির সঙ্গে যুক্ত করেই আজাদ এমন কতকগুলি সুদূর প্রসারী বক্তব্য হাজির করেছেন এখানে যেগুলো বড় বড় দুর্দান্ত ঘটনার অবতারণার চেয়ে কম প্রাণবন্ত নয়। দর্শন ও সমাজতত্ত্ব এবং ইতিহাসের পর্বপর্বান্তরকে আজাদ সাধারণভাবে দৈনন্দিন ও নিতান্তই সামান্য ব্যাপারে আলোকে উদ্ভাসিত করেছেন, জেলখানার নিস্তরঙ্গ জীবনকে ভরে দিয়েছেন উত্তাল তরঙ্গ ভঙ্গে। এটা করার জন্য তিনি আশ্রয় নিয়েছেন এক হাজার বছরের কবিতার ধারায়। সঙ্গে এসেছে সহজ সরল গদ্যে অভাবিত রূপকল্প ও উপমা।

যেমন ধরা যাক আজাদের কারাকক্ষে চড়ুই দম্পতি ও চড়ুই বাচ্চার প্রসঙ্গ। চড়ুই পাখী তো সর্বত্র বিরাজমান এবং বিশেষ করে আমাদের উপমহাদেশের কারাকক্ষগুলিতে এরা জন্মগত অধিকারের বাসিন্দা। আজাদের ঘরেও চড়ুই দম্পতি বাসা করেছে এবং আজাদকেও তারা টেনে নিয়েছে নিজেদের জীবনবৃত্তে। আজাদ এদের খুঁটিনাটি জীবনের কৌতূহলী দর্শক। দেখলেন বাচ্চা উড়তে শিখছে। গভীর সহানুভূতি নিয়ে এর উড়তে শেখার পদ্ধতিটাকে লক্ষ্য করলেন। এই অভিজ্ঞতার বিবরণ দিয়ে আজাদ চিঠিতে লিখলেন, মানুষ নিজেকে চিনতে শিখতে পারে চড়ুই'এর বাচ্চার মতো কষ্ট ও শ্রমসাধ্য প্রয়াসকে লক্ষ্য করে দেখলে।

আজাদ ভারাক্রান্ত হৃদয়ে বিয়াল্লিশের আগস্টে কারাগারে প্রবেশ করেছিলেন। সঙ্গে সঙ্গেই ছিল স্বাধীনতা অর্জনে জীবনব্যাপী সাধনা ও দায়বদ্ধতা। প্রথম দিকের একটি চিঠিতে একটি দুই পঙ্‌ক্তির কবিতার উদ্ধৃতি দিয়েছিলেন, তা থেকে তাঁর মনের ভাবটিকে ধরা যায়। এই পংক্তি দুটি হলো:

> "ওর আঁচলটা তো দেখা যাচ্ছে দূরে দূরান্তে ঝলকাচ্ছে
> ওরে পাগল হতে, কেন অবসাদ,
> আমার কামিজের বুকের ধারাটাতে রয়েছে নাগালে
> সেটা তো কাছেই রয়েছে।"
>
> —কলিচের কাব্য সঞ্চয়ন

আজাদ কারাগারে বসে তাঁর জীবনের চূড়ান্ত হৃদয়বিদারক ঘটনাটিকে যেভাবে সংবরণ করেন, তাতেই তাঁর সেদিনকার হৃদয়ের দ্বৈতধারাকে প্রতিভাত করেছে। এই ঘটনাটি তাঁর স্ত্রীবিয়োগ। তাঁর স্ত্রী জুলেখা বেগমের অসুস্থ হয়ে পড়ার খবর আসার পরে

সরকারের তরফ থেকে একটা প্রস্তাব এসেছিল, আজাদ কিছু শর্ত মেনে নিয়ে স্ত্রীকে দেখে আসুন। তিনি এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। তাঁর সহবন্দীরা তাঁকে এ ব্যাপারে নৈতিক সমর্থন জানিয়েছিলেন। মৃত্যু সংবাদ যখন এলো তখন স্বভাবতই আজাদ প্রচণ্ড আঘাত পেলেন। কিন্তু তাঁর মুখমণ্ডলে কিংবা কাজকর্মে–কোন প্রতিক্রিয়া ঘটলো না। তবে আজাদ চিঠিতে লিখলেন যে তাঁর ৩৬ বছরের বিবাহিত জীবনে ছেদ পড়ল, মৃত্যু এসে তাঁর এবং তাঁর স্ত্রীর মাঝখানে একটা দেয়াল খাড়া করে দিল। তাঁরা পরস্পরকে দেখতে পাবেন, কিন্তু একজন আরেকজনের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন থাকবেন। আজাদ লিখলেন যে, তাঁর সংগ্রামের সংকল্প তাঁকে পরিত্যাগ করছে না, কিন্তু তাঁর পা দুটো পাথরের মতো ভারি হয়ে গেল।

এছাড়া এই সময়ের পরপর চিঠিতে বিভিন্ন ঘটনার প্রেক্ষিতে যেসব কবিতার পংক্তির উদ্ধৃতি দিয়েছেন, সেগুলিতে একটা বিষাদের সুর অথবা এমনকি ব্যর্থতা বোধও প্রকাশ পেয়েছে।

এই সময়ে তাঁর শোকার্ত মন মাসের পর মাস ভারাক্রান্ত ছিল বলেই মৌসুমী ফুলের ঝরে যাওয়া এবং জঞ্জালে পরিণত হওয়ার দৃশ্য দেখে একটি চিঠিতে কবি সওদার দুটি পংক্তি বসিয়েছিলেন,

'ওরে রক্তাক্ত হৃদয় তুই কোন কাজেই লাগলি না
না হলি তুই কারো কপোলের গোলাপী বর্ণ
না হলি হেনার রং"

এই সময়ে তিনি মানুষের জীবনের ক্ষণস্থায়িত্ব নিয়ে ভেবেছেন এবং চিঠিতে এই ভাবনার উল্লেখও করেছেন। একটি চিঠিতে দুই আরব দার্শনিকের বক্তব্য স্মরণ করেছেন।

"তাঁরা সময়কে তিনভাগে ভাগ করেছেন। অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ। এরা অবিশ্রান্তভাবে একটা আরেকটার পরে চলে যাচ্ছে। এই দার্শনিকদের এবম্বিত বক্তব্যে প্রভাবিত হয়ে আবু তালেব সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিলেন যে, মানুষের জীবনটা মাত্র দুদিনের।" এই বক্তব্যের উপর মন্তব্য করতে গিয়ে আজাদ লিখেছেন। সত্যিই মানুষের জীবন হচ্ছে সকাল সন্ধ্যার। চোখ খুলতে না খুলতে বুঝতে না বুঝতে জীবন চলে যায়।

আজাদ অবশ্য ব্যক্তিক জীবনসত্যের আরেকটা দিককেও স্মরণ করেছেন। লিখেছেন, "তবু ভেবে দেখুন, এই এক সকাল থেকে সন্ধ্যা কাটাতে কত প্রয়াস প্রচেষ্টাই তো করতে হয়। মরুভূমির পর মরুভূমি পার হতে হয়। কত সমুদ্রকে লঙ্ঘন করতে হয়। কত পর্বত চূড়ায় আরোহণ করতে হয়।"

অর্থাৎ জীবনের অনিত্যতার মধ্যে রয়েছে মানুষের শ্রমপ্রচেষ্টার সার্থকতার নিত্যতা। আমরা আজাদের এই নিত্যতা অভিমুখী মনোভাবটিকে নানাভাবে দেখতে পাবো 'গুবারে খাতির' বইটির প্রায় সমস্ত পত্রেই। এক জায়গায় ময়ুরের উপমা দিয়ে তিনি যে কবিতার পংক্তিটির উদ্ধৃতি দিয়েছেন, তার মর্ম হলো, ময়ুর উদ্যান বিরহিত হলেও তার সঙ্গেই উদ্যান থাকে, সেটা তার পেখম।

আজাদের ৬নং চিঠির একটি অংশ এখানে এই প্রসঙ্গে তুলে ধরা যেতে পারে। এতে আজাদ লিখেছেন: "কোন লক্ষ ছাড়া জীবনযাপন সম্ভব হতে পারে না। কোন

প্রেরণা, কোন অনুরাগ, কোন বন্ধন থাকা চাই যেজন্যে জীবনের দিনগুলিকে কাটানো যেতে পারে। এই লক্ষ্য বিভিন্ন মন ও মানসের ধারার সামনে বিভিন্নরূপে প্রতিভাত হয়।"

॥ ৪ ॥

আমরা মওলানা আজাদের মহাগ্রন্থটির সংক্ষিপ্ত পরিক্রমাতে ছেদ টানবো, বেদনার্ত হৃদয় নিয়েই তিনি যে বিশ শতকের সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব ও সমাজতান্ত্রিক সমাজ গড়ার এবং পূর্ণ গণতন্ত্র জাতীয় মুক্তির বিশ্বব্যাপী বহুমুখী প্রসারের সঙ্গে সম্পৃক্ত কয়েকটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ চিন্তাভাবনায় সহযোগী ও সহকর্মী ছিলেন তার কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিয়ে।

কারাগারে বসে আজাদ ফরাসি মনীষী ও লেখকশিল্পী আঁদ্রে জিদের আত্মজীবনীটি পড়েন। আঁদ্রে জিদের একটি বক্তব্য তাঁকে গভীরভাবে নাড়া দেয়। আজাদ একটি চিঠিতে এই বক্তব্যটিকে উদ্ধৃত করেছেন:

"আনন্দে থাকার ব্যাপারটা শুধু ব্যক্তিগত প্রয়োজনের চরিতার্থতা নয়। এটা সঙ্গে সঙ্গেই একটা নৈতিক দায়িত্ব। আমাদের ব্যক্তিগত জীবনের বৈশিষ্ট্যের প্রভাব শুধু আমার নিজের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকতে পারে না। এই বৈশিষ্ট্যের প্রভাব অপরের উপরেও গিয়ে পড়ে। কিংবা কথাটাকে এইভাবেও বলা যেতে পারে যে, আমার সমস্ত অবস্থাটার ছোঁয়াচ অপরের উপরেও বর্তায়। এই কারণে, এটা আমাদের নৈতিক কর্তব্য হয়ে দাঁড়ায় যে আমরা যেন নিজেরা বিষাদগ্রস্ত হয়ে অন্যদেরও বিষাদগ্রস্ত না করে বসি সেটা দেখা। আমাদের জীবন হচ্ছে আয়নার ঘর। প্রত্যেকটি মুখের ছবি একই সময়ে শত শত আয়নাতে প্রতিফলিত হয়। আমাদের প্রত্যেকটি ব্যক্তির জীবন শুধু একেকটি ব্যক্তিগত ঘটনাধারাও নয়। এই জীবন সমগ্র সংঘের ঘটনাধারা। নদীর বুকে হয়তো একটি ঢেউ উঠল। এই ঢেউ কিন্তু একা থাকে না। এই একটি ঢেউ থেকেই অগণিত ঢেউ তৈরি হয়ে যায়। এখানে আমার কোন কথাই শুধু আমার কথা হয়ে থাকতে পারে না। আমি যা নিজের জন্যে করি তাতে অপরদের ভাগ থাকে। যদি আমার চারপাশে বিষাদগ্রস্ত মুখ জড়ো হয়ে যায়, তাহলে আমার আনন্দ আমাকে আনন্দিত রাখতে পারে না। নিজে খুশি থেকে অপরকে আনন্দিত রাখতে পারি এবং অন্যদের খুশি দেখলে নিজেও আনন্দিত হই।"

'৪৩-এর জানুয়ারির ৯ তারিখে লেখা চিঠিতে আমরা ব্যক্তি ও সমূহকে আরেকভাবে দেখতে পাই গভীরভাবে সম্পর্কিত হয়ে। এখানে এই দুইয়ের সম্পর্ককে আজাদ আয়নার রূপকেই উপস্থিত করেছেন, তবে এখানে লেখক লেখিকা ও শিল্পীদের দিকটাকে একটি বিশেষ প্রেক্ষাপটে স্থাপন করেছেন। আত্মকথা লিখবার সময় আজাদকে আত্মশ্লাঘার সমস্যা ও সুষমা ও বিষমতার মুখোমুখি হতে হয়েছে, তার প্রতিফলন পাওয়া যায়। আজাদ লিখেছেন, 'লেখকলেখিকা ও শিল্পীরা তাদের সৃজনশীল কাজে নিজেদের প্রতিফলিত না করে পারেন না এবং প্রকৃতপক্ষে সৃজনশীলতার বিশিষ্ট রূপকর্ম লেখকলেখিকা ও শিল্পীদের ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্যকে বহন করে।' এরপরই তিনি সাবধানবাণী উচ্চারণ করেছেন। লিখেছেন, লেখকলেখিকা শিল্পীরা আয়নাতে নিজেদের যত বড় করে দেখেন, পাঠকপাঠিকার মনের আয়নায় তত বড় থাকে না, সেটা দোষ হয়ে যায়। সুতরাং পাঠকপাঠিকাদের মনের আয়নাতেও যাতে শিল্পী ও

লেখকলেখিকাদের প্রতিফলন বড় মাত্রায় হয়, সেজন্য সচেষ্ট হতে হবে। অর্থাৎ এক কথায় বলতে গেলে বলতে হবে, লেখকলেখিকা ও শিল্পীদের এবং পাঠকপাঠিকাদের মনের যোগকে বড় করে সামনে রেখেই শিল্পরূপ সৃষ্টির কাজটা করতে হবে।

উপরিউক্ত দুটো ক্ষেত্রের বিচারধারা থেকেই আমরা মওলানা আবুল কালাম আজাদকে তাঁর অনন্য সৃষ্টি 'গুবারে খাতির' বা 'বেদনার্ত হৃদয়ের ছিন্নপত্র ডালি'তে পাচ্ছি যে কোন রকমের বিচ্ছিন্নতাবাদী দর্শনের বিপরীত চিন্তার অবস্থানে। আমরা এর মধ্যদিয়ে তাঁর পূর্ণ গণতান্ত্রিক অবস্থানকে বুঝে নিতে পারি।

এরপরেই আমাদের প্রশ্ন হতে পারে স্বাধীনতা সংগ্রামী মওলানা আবুল কালাম আজাদকে আমরা সমাজতান্ত্রিক দর্শন ও কর্মকাণ্ডের পক্ষেও পেয়েছি কি? এই প্রশ্নে এখানে খুব সংক্ষেপে দুটি খবর দেবো।

একটি, সাজ্জাদ জহীরের এক লেখাতে আমরা পাই, কমিউনিস্ট মেনিফেস্টোর প্রথম উর্দু ভাষায় অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছিল, মওলানা আজাদের সম্পাদিত 'আল হেলাল' পত্রিকাতে এবং অনুবাদক ছিলেন মওলানা আবদুর রাজ্জাক মলিহাবাদী।

দ্বিতীয় খবরটি 'গুবারে খাতির' থেকে তুলে দিচ্ছি।

আমরা একটা চিঠির উদ্ধৃতি থেকে ইতোপূর্বেই উল্লেখ করেছি যে, '৪৩ সালে বসন্ত সমাগমে বন্দীরা মৌসুমী ফুলের বাগান করেছিলেন। আমরা জেনেছি, এই ফুলের বাগিচায় বুলবুলরা এসে জুটেছিল। জেনেছি, ফুল গাছগুলি বসন্ত চলে যাবার পরে জঞ্জালে পরিণত হয়েছিল। এবার তার শেষ অঙ্ক নিয়ে আজাদের সমাজতান্ত্রিক চিন্তার কথা।

একটি চিঠিতে আমরা দেখি,

"মৌসুমী ফুলের মৌসুম শেষ হবার পরে ফুলগাছগুলিকে জ্বালানি হিসাবে ব্যবহার করল কারাগারের রক্ষকরা।" আজাদ এই ঘটনাটার সঙ্গে তুলনা করলেন মজুরদের খাটিয়ে তাদের পরিশ্রমের ফল আত্মসাৎ করে পুঁজিপতিরা যেভাবে এই মজুরদের সঙ্গে আচরণ করে সেই ব্যাপারটার সঙ্গে।

আজাদ লিখেছেন, সমস্তকর্মের একটা মিল খুঁজে পাওয়া যাবে। একদিকে মাঠে ঘাটে গর্ত আর খাদ হাঁ করতে থাকে, অন্যদিকে ইটের পাঁজা উঁচু হয়ে উঠতে থাকে। একদিকে গাছগুলোর উপর করাত চলতে থাকে, অন্যদিকে জাহাজ তৈরি হতে থাকে। একদিকে সোনার খনিগুলি শূন্য হয়ে যায়, অন্যদিকে কোষাগারে জমা হয় আশরাফির স্তূপ। একদিকে মজুরেরা মাথা থেকে পা পর্যন্ত ঘাম ঝরিয়ে পরিশ্রম করে, অন্যদিকে পুঁজিপতিদের আরাম আয়েশের আয়োজন নিয়োজন ঘটে। আমরা বাগানের মালীর ফুলেভরা ডালা দেখে খুশি হই, কিন্তু আমরা ভেবে দেখি না যে, কোন বাগানকে উজাড় করে ভরা হলো এই ডালা।"

রবীন্দ্রনাথ : যৌবনের কাছে প্রার্থী

'১৪০০ সাল'। এই শিরোনাম দিয়ে ১৩০২ এর ১৪ই ফাল্গুন রবীন্দ্রনাথ যে কবিতাটি লিখেছিলেন তাতে তিনি শতাব্দিপারের আজকের যৌবনের সঙ্গে তাঁর সময়ের ও নিজের যৌবনের একাত্মতা জানিয়েছিলেন। কবিতার আরম্ভটি নিম্নরূপ:

"আজি হতে শতবর্ষ পরে
কে তুমি পড়িছ বসি
আমার কবিতাখানি
কৌতূহল ভরে।"

এরপরে মাঝখানে 'ফাল্গুনের দিনে যৌবনের রাগে রাঙানো' ধরার খবর এবং আনন্দ অভিবাদন পাঠিয়েছিলেন কবি 'তোমাদের ঘরের নতুন গায়ক কবির হাত দিয়ে'। কবিতার শেষ কয়েকটি পংক্তিতে সংহতির বার্তা:

"আমার বসন্ত গান
তোমার বসন্ত দিনে
ধ্বনিত হউক ক্ষণতরে
হৃদয় স্পন্দনে তব
ভ্রমর গুঞ্জনে নব
পল্লব মর্মরে
আজি হতে শতবর্ষ পরে।"

১৩৯৯-এর পঁচিশে বৈশাখ রবীন্দ্রনাথের জন্মজয়ন্তীতে স্বাভাবিকভাবেই ১৪০০ সালকে সামনে রেখে আমরা তাঁর যৌবনবার্তাকে বড় করে সামনে রাখছি। সঙ্গে সঙ্গেই ১৪০০ সাল-এর যৌবনের একাত্মতার উদ্ভাসটি শতাব্দি পেরিয়ে আজ মোটামুটি কি ধরনের রূপ নিয়েছে অথবা নিতে যাচ্ছে, তা নিয়ে একটি পর্যালোচনা রাখছি এখানে। রবীন্দ্রনাথের প্রত্যাশাটি নিশ্চয়ই বিগত গোটা শতাব্দির প্রচণ্ড ঘাত প্রতিঘাত উত্থান ও বিপর্যয়ে গভীরভাবে জড়িত ও দায়বদ্ধ যৌবনের অবস্থান সম্বন্ধে আশাবাদকে বহন করে নিয়ে চলেছে, এতে 'আনন্দ ধারা বহিছে'। তবে সঙ্গে সঙ্গে যৌবনের আজকের অবস্থানের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের নিজের এবং সমসাময়িক প্রজন্মের চিন্তাভাবনা ও কর্মধারা পর্বে পর্বে পর্যায়ে পর্যায়ে নবনব ভিত্তিতে বিন্যস্ত ও উদ্ভাসিত ধারা প্রত্যর্পিত। আমরা প্রধানত রবীন্দ্রনাথের কাব্য ও নাটকের ধারা থেকে বুঝতে চেষ্টা করতে পারব, রবীন্দ্রনাথের 'যৌবনের কাছে প্রার্থী'-রূপটি সমন্বিত হয়ে আজ কি ধরনের দাঁড়িয়েছে অথবা দাঁড়াতে যাচ্ছে।

॥ ২ ॥

আমরা ফিরে তাকাবো প্রথমে রবীন্দ্রনাথের পরিণত যৌবনের দিনগুলির দিকে। এই দিনগুলিতে রবীন্দ্রনাথ তাঁর জোড়াসাঁকোর কিংবা চৌরঙ্গীর আবাসগৃহের জানালা থেকে মুটেমজুরদের জনতাকে দেখে তাদের প্রাণশক্তিতে অভিষিক্ত হয়ে 'প্রভাত সংগীত' ধরনের মুক্তিধারা রচনার পালা চুকিয়ে বেরিয়ে এসেছিলেন 'এবার ফিরাও মোরে'র কষ্টের সংসারের একবারে মাঝখানে। সংসারের বাস্তবতায় একেবারে মুখোমুখি হবার প্রথম জানাজানি এখানে। সবেমাত্র শুরু অবশ্য। তবে লোকজীবনের প্রত্যক্ষদর্শী হয়েছিলেন পুরোপুরি, প্রত্যক্ষ অংশীদার সামান্যমাত্র হলেও। চলাফেরা করছিলেন হাটে মাঠে ঘাটে অবাধেই। বাইরে থেকে অবশ্য বুঝবার উপায় ছিল না, লোকজীবন থেকে তাঁর যৌবনের দেয়া দিনগুলিতে তিনি কি নিচ্ছেন, লোকজীবনকেই বা কি দিচ্ছেন। কারণ, রবীন্দ্রনাথ এখানে এসেছিলেন জমিদারির আদায় পত্র দেখার দায়িত্ব নিয়ে।

কাছারীতে বসতেন, মহাল দেখতে বেরোতেন নদীপথে নৌকায়। এর পূর্বাহ্নে বিলেত গিয়েছিলেন তখনকার অভিজাত ও সম্পন্ন পরিবারের রীতিমাফিক ব্যারিস্টার হয়ে এসে শহরে বসার জন্য। প্রথম সাগরপাড়িতে এটা না করে এলেও দ্বিতীয় পাড়ির ব্যাপারে কোন অসুবিধা ছিল না। কিন্তু লোকজীবনের সংস্পর্শের মধ্য দিয়ে মাতৃভূমিকে একবার দেখবার পরে তদানীন্তন বিলিতি ধরনের অভিজাত জীবনের জন্য কোন আক্ষেপ রইল না। ১৮৯৩-৯৪'এর রচনা ছিন্নপত্রাবলিতে আমরা দেখতে পাবো, তিনি লিখেছেন, তাঁর যদি পুনর্জন্ম হয় তবে তিনি য়ুরোপে না জন্মে বাংলাদেশেই জন্মাতে চান। বিলেতের অভিজ্ঞতা থেকে পাওয়া যে ব্যাপারগুলোকে তিনি এই সময়ে ভবিষ্যতের জন্য নিজের কাছে রাখলেন ছিন্নপত্রাবলি শুধুমাত্র আভাসে জানিয়েছে, তাদের মধ্যে একটা ছিল বিশ্বের নানা কেন্দ্রে দারিদ্র্যের চক্র ভেঙ্গে বেরিয়ে আসার জন্য 'সোসিয়ালিজমের চিন্তাভাবনা'।

অর্থাৎ সেদিন সামন্ততন্ত্রের এবং ঔপনিবেশিক পুঁজিবাদী সাম্রাজ্যবাদীদের যোগসাজশের সঙ্গে মানিয়ে চলা খাজনা আদায় কেন্দ্রে ভারগ্রস্ত হয়ে বসলেও তাঁর নৈকট্য ও একাত্মতা গড়ে উঠেছিল এই যাঁতাকলের পেষণে জর্জতির দরিদ্রদের সঙ্গে। অর্থাৎ এখানেই তাঁর যৌবনের সৃষ্টি ও দৃষ্টিভঙ্গির একটা সরাসরি জনসম্পর্কভিত্তিক প্রেক্ষিতের সূচনা হয়েছিল। এখানেই তিনি একদিকে যেমন লালন ফকিরের বাংলা গানের মানবতাবাদী ধ্যানধারণার সঙ্গে লোকবাংলার সমস্ত বাধাবিঘ্নভেদী মুক্তচিন্তা ও সংগীতের সঙ্গে যুক্ত হয়ে এদের প্রবক্তা হয়ে দাঁড়ালেন দৃষ্টিতে ও সৃষ্টিতেও তেমনি তিনি তাঁর সোসিয়ালিজমকে ধরে রাখলেন সর্বহারা খেটে খাওয়া নারী ও পুরুষের বিপ্লবী উত্থানের লক্ষ্যরূপে। পরাধীনতা থেকে মুক্তির সংগ্রামের লক্ষ্য ও কর্মসূচির মধ্যে তিনি বরাবরের জন্য রাখলেন সোসিয়ালিজমের মূলসূত্রকে। এটা ছিল রবীন্দ্রনাথের যৌবনেরই একইসঙ্গে ত্যাগব্রতী ও জ্ঞানব্রতী অবস্থানগ্রহণ। যৌবনের রাগরঙ্গ অনুরাগে অনুপ্রাণিত ও অনুরণিত ছিল তাঁর এই অবস্থান। তাঁর উপস্থাপনের ধারা ছিল শিল্পীর ধারা। 'বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি সে আমার নয়' ছিল এদিক দিয়ে তাঁর গঠনমূলক কাজকর্মের নিয়ামক। আনন্দ ও প্রাকৃতিকতাকে রবীন্দ্রনাথ সঙ্গে রেখেছেন যৌবনের স্বাভাবিক দান হিসাবে। '১৪০০ সাল' কবিতাতে আমরা শুরুতেই পেয়েছি যৌবনের দিকটিকে। যে 'ছিন্নপত্রাবলি'তে রবীন্দ্রনাথ লোকসমাজের দারিদ্র্যের ছবি তুলে ধরেছেন সোসিয়ালিজমের প্রসঙ্গ, তাতেই আমরা দেখতে পাবো এই যৌবনের আনন্দের বিশেষ দিকটিকে।

রবীন্দ্রনাথ এই সময়ে বেশ কিছু নতুন ধরনের গান লেখেন তাতে হার্মোনিয়মের সঙ্গতের সঙ্গে সঙ্গে নতুন সুর দিয়ে। তিনি যোগ করতে চেয়েছিলেন ভারতীয় সংগী আনন্দবোধ ও তাঁর প্রকাশকে। তাঁর তখন মনে হয়েছিল, ভারতীয় সংগীত বেদনার গান, যার প্রকাশ ছিল পূরবী, টোড়ি ও ভৈঁরোতে। তিনি ভারতী কিছুটা আনন্দিত রাগিনী রামকেলিতে রচনা করলেন:

> "ওগো, তুমি নব নব রূপে এসো প্রাণে (আমার নিত্য নব)
> এসো গন্ধে বরণে গানে।"

ন
বছরের
সোভিয়েত
লিপ্ত হয়েছে,
তরুণ-তরুণীদের
র একটা প্রভাবশালী
র কৃচ্ছতার জন্য দায়ী
ক বাতিল করে পুঁজিবাদী

অর্থাৎ লালিত্যকে তিনি জড়িয়ে নিয়েছিলেন জীবনের পৃষ্ঠায় যৌবনের স্বাভাবিক প্রকাশ ও বিকাশরূপে। কিন্তু তার সঙ্গেই যে তিনি যৌবনকে রেখে দিলেন তার রুদ্ররূপে, তার প্রকাশ আমরা পাই যে 'বসন্ত' গীতনাট্যটি তিনি বিশের দশকের শুরুতে রচনা করে 'শ্রীমান নজরুল ইসলাম'-কে উৎসর্গ করেছিলেন, তার মধ্যে একটা বিশেষ সত্যকে উদ্ভাসিত করে। 'এই বসন্ত' নাটক রবীন্দ্রনাথের 'ঋতুরঙ্গ' মালার একটি নিবেদন। এতে একটা তত্ত্বকে সামনে আনা হয়েছে। যাতে বলা হয়েছে বসন্তের উত্তরণ ঘটে কালবৈশাখীতে। বিশের দশকের ধূমকেতু স্বরূপ নবযুগকবি কাজী নজরুল ইসলামের মধ্যে যে কোমল ও কঠোরের, মাধুর্য ও বিদ্রোহের সমন্বিত অভিব্যক্তি, তার সঙ্গে মিল দেখালেন রবীন্দ্রনাথ প্রকৃতির ঋতুরঙ্গের। এই সূত্রেই আমরা দেখবো, 'অচলায়তন' থেকে শুরু করে 'তাসের দেশ' পর্যন্ত চারদশক ব্যাপী নাটকে যৌবনকে তিনি দেখিয়েছেন ধ্বংস ও সৃষ্টির কারিকা ও চালিকা শক্তিরূপে।

বৈষম্য আর পীড়ন থেকে সমাজ, মাতৃভূমি ও পৃথিবীকে মুক্ত করার প্রয়াসে যুক্ত হবার ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ সব বয়সের নারী ও পুরুষের সমবয়সী ছিলেন। তিনি এ কাজে উদ্যোগী ভূমিকাতে বয়োবৃদ্ধদেরও নেতৃত্ব দিতে দ্বিধা করেন নি। তাঁর কয়েকটি নাটকে ঠাকুর্দারা যে দুর্ধর্ষ ভূমিকা পালন করেছে, তার কথা অবশ্যই মনে রাখবো। তবে তরুণ-তরুণীদের কাছ থেকে তিনি বেশি কিছু চেয়েছিলেন ভাঙ্গা এবং গড়া দুইয়েরই ক্ষেত্রে, কারণ স্বাভাবিকভাবেই তারা ঝুঁকি নেবার জন্য সদা প্রস্তুত।

রবীন্দ্রনাথের 'রক্তকরবী' নাটকের রঞ্জন কিংবা মুক্তধারার অভিজিতের কাহিনি এদিক দিয়ে স্বপ্নকাল্পনিক কোন কিছু নয়। একেবারে ঘরের কাছাকাছি এবং প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার কষ্টিপাথরে পরীক্ষিত ঘটনাধারার মথিত বা 'জীবন থেকে নেয়া' এরা। বাংলা তথা দুই বাংলার এবং সার্বিকভাবে আমাদের উপমহাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে তরুণ-তরুণীরা প্রাণ ডালি দিয়েছে অবলীলায়। রবীন্দ্রনাথ যে তরুণ-তরুণীদের ডেকে বলেছিলেন, 'যৌবনরে, তুই কি' রবি সুখের খাঁচাতে,' তরুণ-তরুণীরা তাকে গভীরভাবে অর্থময় ও ইতিহাসসিদ্ধ করে গিয়েছে ফাঁসির মঞ্চে কারাগারে।

রবীন্দ্রনাথ যৌবনের কাছে কোন অবাস্তব, কোন অন্ধ দাবি করেন নি। তিনি যা বাস্তব, যা মানবিক, তাই চেয়েছেন। এদিক দিয়ে তাঁর 'ঘরে বাইরে' কিংবা 'চার অধ্যায়' উপন্যাসের তারুণ্যের উপস্থাপনকে আমরা অবশ্য বিবেচনায় রাখবো। 'ঘরে বাইরে'র অমূল্য চরিত্রটি এবং তার মৃত্যু নায়িকা বিমলাকেও ব্যথিত করেছিল, আমাদেরও বেদনার্ত করে। 'চার অধ্যায়' উপন্যাসে এদিক দিয়ে রবীন্দ্রনাথ সেই সময়ের বৈপ্লবিক উন্মাদনায় সমীক্ষায় বড় রকমের ঝুঁকি নিয়েছিলেন যৌবনের কাছে ...র দাবির পরিমাপ সম্বন্ধে বাংলার তারুণ্যের তরফ থেকে অবধানতা তৈরিতে। কিন্তু ...য়ে যে সাময়িক বিভ্রান্তি ঘটেছিল, সেটা যৌবনের কাছে রবীন্দ্রনাথের পূর্বাপর কষ্টে...রপ্রসারী প্রাণবন্ত ধারায় ধুয়ে মুছে যাওয়াই তো উচিত।

প্রথম জ...র্ব নিজের এবং প্রজন্মের পর প্রজন্মের যৌবন রবীন্দ্রনাথের ত্যাগব্রতী হয়েছিলেন ...ন্দব্রতী কিভাবে সাড়া দিয়েছে, তার একটা দৃষ্টান্ত দিচ্ছি এখানে। মাঠে ঘাটে অ...াসের দেশ' নাটকটি তাঁর জীবনের প্রায় শেষের দিকে লেখা। এই তাঁর যৌবনের দে... তিনি উৎসর্গ করেছিলেন স্নেহভাজন সুভাষচন্দ্র বসুকে তাঁর কারণ, রবীন্দ্রনাথ এ

রাজনৈতিক দিক দিয়ে বিদ্রোহী ও বিতর্কিত চিন্তাভাবনা ও কর্মকাণ্ডকে সামনে রেখেই। নাটকটি তদানীন্তন বাংলার তারুণ্যকে যথেষ্ট আলোড়িত করেছিল।

তবে তখনই এর কোন গণউপস্থাপনা হয়েছিল বলে জানা নেই। এই ধরনের উপস্থাপন হলো পূর্ব বাংলায় তথা বাংলাদেশে ১৯৬১ সালে রবীন্দ্র জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপনের সময় ঢাকায়। তখন পাকিস্তানের আমল এবং সারা পাকিস্তানে সামরিক শাসন জারী রয়েছে। জেলখানাগুলি রাজনৈতিক বন্দীতে ভরা। সামরিক শাসকরা তাদের পশ্চিমা সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধবাজ প্রভুদের উচ্ছিষ্টের উপর ভর করে গোঁড়া ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতাবাদী মৌলবাদীদের উৎসাহিত করে গণতান্ত্রিক অভ্যুত্থানকে ঠেকাবার ধান্ধায় ছিল। তারা এই সময়ে এবং ষাটের দশকের শেষের দিকেও বিশেষ করে বাহান্নর ভাষা আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে উৎসারিত গণতান্ত্রিক চিন্তাচেতনা ভিত্তিক উত্থানকে দমাবার উদ্দেশ্যে অসাম্প্রদায়িক রবীন্দ্রনাথকে চাপা দেয়ার জন্য মৌলবাদীদের রবীন্দ্রবিরোধী প্ররোচনাকে উৎসাহিত করেছিল। ১৯৬১ সালের রবীন্দ্র জন্মশতবার্ষিকী অনুষ্ঠিত হয়েছিল এই ধরনেরই একটি ত্রাস ও বিরুদ্ধতার পরিবেশে। কিন্তু বাংলাদেশের মুক্তিধারার জনচেতনার উপর ভর করে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক গোষ্ঠী একটি মোটামুটি ব্যাপক ধরনের আয়োজন করেছিল। অনুষ্ঠানের একটি অঙ্গ ছিল 'তাসের দেশ' নাটকের উপস্থাপন। ইঞ্জিনিয়ারিং ইনস্টিটিউটের (ঢাকায়) প্রেক্ষাগৃহ ভরে গিয়েছেল জনসমাগমে। এই নাটকের উপস্থাপনের মূলে ছিল যৌবন। ছাত্রছাত্রী ও বুদ্ধিজীবী সমাজ। নবীন-নবীনা শিল্পীরা।

॥ ৩ ॥

সেদিন বাংলাদেশের তারুণ্য শক্তি যৌবনের প্রতি রবীন্দ্রনাথের আবেদনকে সামনে রেখে যে সাহসী পদক্ষেপ করেছিল, তা বৈপ্লবিক রূপ নিয়ে ঘটিয়েছিল মুক্তিযুদ্ধ, যার সংগীতের পুরোভাগে জায়গা নিয়েছিল রবীন্দ্রনাথের 'সোনার বাংলা'। লাখো লাখো শহীদ এই গানে নতুন করে রবীন্দ্রনাথকে জানিয়ে দিয়েছে যৌবনের সাড়া কিভাবে অব্যাহত রয়েছে।

আজ কিন্তু আরেকটা বিরুদ্ধ পরিস্থিতির কথা আমাদের মনে এসেছে ১৪০০ সালকে, অর্থাৎ 'ছিন্নপত্রাবলির' দিনগুলিকে সামনে রেখে। রবীন্দ্রনাথের স্যোসিয়ালিজম্ আজ বিপন্ন। এবং সেটা কোথায়? সেই রাশিয়ার যেখানে ১৯৩০ সালে সফরে গিয়ে সমাজতন্ত্রের জয়ের কথা লিখেছিলেন রাশিয়ার চিঠিতে। এর মূল আবেদন ছিল আপন ভূমিতে দারিদ্র্যের চক্র থেকে জনগণের বেরিয়ে আসার প্রত্যাশা। তারপরে ষাট বছরের সমাজতন্ত্র নির্মাণের কাজ ও তাকে রক্ষা করার লড়াই চালাবার পরে সোভিয়েত ইউনিয়নই ভেঙ্গে গেল। এই ভেঙ্গে যাওয়ার ব্যাপারে রাশিয়ার যৌবনশক্তি লিপ্ত হয়েছে, এটা বোধহয় সবচেয়ে বেশি অপ্রত্যাশিত এই কারণে যে, রাশিয়ার তরুণ-তরুণীদের পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় ভোগবাদ পেয়ে বসেছে। অন্ততপক্ষে যুবসমাজের একটা প্রভাবশালী অংশ যে মার্কস ও লেনিনকে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার সমস্ত রকমের কৃচ্ছতার জন্য দায়ী করে মূর্তি ভাঙ্গাভাঙ্গি করে সাত দশকের সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে বাতিল করে পুঁজিবাদী

ব্যবস্থার পণ্য সামগ্রীর পশ্চিমী ধরনের খোলাবাজার চালু করার প্রতিবিপ্লবে শিখণ্ডীর কাজ করল। লেনিনগ্রাদ হয়ে গেলো আবার পেত্রোগ্রাদ। এটাকে যদি ঘটনাচক্রের ব্যাপার বলে ধরে নেয়া যায়, তবু সমস্ত রকমের দারিদ্র্যের অন্যতম মূল কারণকে মুষ্টিমেয়ের অন্ধ ভোগবাদ, তার পাল্লায় যে রাশিয়ার যৌবন পড়ে গেলো, এটা নির্মম বাস্তব। তবে যৌবনকেই আবার এই বিপর্যয়ের প্রতিবিধানের জন্য উদ্যোগী হতে হবে। পেত্রোগ্রাদেই শুরু হয়েছিল ১৮২৫ সালে জারের স্বৈরাচারী মুষ্টিমেয় ভোগবাদী শাসনপীড়নের সামাজিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে ফরাসি বিপ্লবের সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতার আদর্শে তরুণ সৈনিকদের উত্থানের প্রয়াস। এই 'ডিমেক্রিস্ট' অভ্যুত্থানের চেষ্টা করেছিলেন, তাঁরা প্রাণ দিয়েছিলেন বধ্যভূমিতে। এরপরে একটা শতাব্দি ধরে প্রথম দিকে গণতান্ত্রিক এবং তারপরে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবী উত্থানের প্রয়াস চলল ব্যাপক থেকে ব্যাপকতর হয়ে, তাতে তরুণ-তরুণীরাই প্রধানত ত্যাগবাদের পতাকাকে সামনে রেখে জোগালো শক্তি সাহস। পুশকিন থেকে শুরু করে দস্তয়েভস্কি, গোগোল, তলস্তয়, তুর্গেনিভের, গোর্কির উপন্যাসে রক্তের আখরে লেখা রয়েছে যৌবনের এই অমর 'মৃত্যুসুধা'। পেত্রোগ্রাদ যে লেনিনগ্রাদ হয়েছিল, তাতে কারাখানার শ্রমিক আর ক্ষেতখামারের কৃষকের বিপ্লবী উত্থানে রাশিয়ার যৌবন সামনের সারিতে চলেছিল। তারপর এই লেনিনগ্রাদকে রক্ষা করতেও যৌবন যে পুরোভাগে থেকেছে, তার কথা পাওয়া যাবে আখমাতোভার কবিতাতেও। সুতরাং, ইতিহাসের চাকা ভোগবাদের পাল্লায় পড়ে পিছনের দিকে ঘুরবে না এটাই প্রত্যাশা করা যায়। এই প্রত্যাশার ভিত্তি রয়েছে।

আমাদের দুই বাংলার এবং সেই সঙ্গে সমগ্র উপমহাদেশের যৌবন '৯১ এর সোভিয়েত ইউনিয়নের বিপর্যয়ে একটা বড় আকারের স্নায়ুযুদ্ধের চাপের পাল্লায় পড়েছে। তবে আমরা এক্ষেত্রে প্রত্যাশা করতে পারি, যৌবনের কাছে, ভোগবাদের বিরুদ্ধে অবস্থান নেবার জন্য রবীন্দ্রনাথের আহবান যৌবনকে দেবে সমাজতন্ত্রের পক্ষে দাঁড়াবার জন্যে নতুন করে সংকল্প ও হিম্মত।

রাশিয়ার চিঠিতে কোরীয় যুবকের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের আলাপের ছবিটি এই সূত্রে নতুন করে আলো দেবে যৌবনকে, আমাদের মতো তৃতীয় বিশ্বের যৌবনকে।

লালন : শাশ্বত ও বৈপ্লবিক

লোকবাংলার মরমী কবি বাউল চূড়ামণি লালন শাহ ফকিরের দ্বিশততম জন্মবার্ষিকী সত্তরের দশকে দুই বাংলায় মহাসমারোহে উদ্‌যাপিত হয়েছে। এবার নববর্ষ এর দশকের শুরুতে আরও বেশি উৎসাহের সঙ্গে পালিত হয়েছে লালনের জন্মশতবার্ষিকী। এই দুই আয়োজনেই উভয় বাংলার শিল্পী বুদ্ধিজীবী এবং বিশেষ করে বাউল তথা লোকসংগীতের লোকজন ব্যাপকভাবে সহযোগী হয়েছেন। বিশাল বিশাল জনসমাবেশে বাউল ও লোকসংগীতের মেলায় গান পরিবেশনের পাশাপাশি ভাব নিয়ে বড় মাত্রায় বিচার বিবেচনার নিরীক্ষাও হয়েছে। এই সূত্রেই লালন, বাউল ও লোকসংগীতের শাশ্বত মানবিক আবেদনের সঙ্গে সঙ্গে একটা বৈপ্লবিক দিকও সামনে এসেছে। আবহমান

বাংলার বাউল ও লোকসংগীতের ধারায় লালনগীতি ঋতুরঙ্গ কিংবা নদীমালার মতো প্রবাহিত হয়ে উৎসবে ও বিপর্যয়ে জনগণমনে আনন্দ ও আশ্বাস এবং সেই সঙ্গে একটা নিগূঢ় মানবিক বিশ্বদর্শন জুগিয়ে আসছে। এই দর্শন অতীন্দ্রিয় ও আত্মিক। তবে বাউল ও লোকসংগীতের তরঙ্গ থেকে লালন সাঁই এবং অন্যান্য লোকসাধকেরা কায়েমি স্বার্থ ও রক্ষণশীলদের প্রতিষ্ঠানিকতার বিরুদ্ধে অবস্থান নেবার দরুন তাঁদের চিন্তাভাবনা ও কথাবার্তা ইতোপূর্বে কৃষক ও অন্যান্য নিপীড়িতজনের বিদ্রোহ কিংবা গণতান্ত্রিক অভ্যুত্থানে বিপ্লবী ভূমিকা নিয়েছে। সম্প্রতি বিশেষ করে দুটো কারণে এই বিপ্লবী ভূমিকা বাউল ও লোকসংগীতের শাশ্বত আত্মিক আবেদনকে সমাজবদলের পালায় যুক্ত হয়েছে। এই দুটো কারণ হলো: (১) আমাদের উপমহাদেশ জুড়ে ধর্মীয় সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধি ও সংঘর্ষের নিরসনের জন্য আজ চাই জনগণমনে মানবিকতাবোধ ও বৈপ্লবিক চিন্তাভাবনা; (২) দুই বাংলার রাজনৈতিক কাঠামোকে অক্ষুণ্ন রেখে মৈত্রীর সেতুকে নবায়িত করা। এই দুটো ক্ষেত্রের গতানুগতিক ও স্বতঃস্ফূর্ত কর্মসূচি পরিহার করে চিন্তায় ও কাজে সংগ্রামের প্রয়োজনে বিপ্লবাত্মক এবং ব্যাপক জনগণ-আশ্রয়ী পদক্ষেপ নেয়া দরকার। অর্থাৎ যে অর্থে আজ আমাদের ঐক্যবদ্ধ হয়ে পুঁজিবাদী সাম্রাজ্যবাদ ও তার বশংবদ কায়েমি স্বার্থের রক্ষকদের ক্রমাগত বাঁধিয়ে চলা যুদ্ধের বিরুদ্ধে উঠে পড়ে লেগে লড়তে হচ্ছে, সেই অর্থেই আমাদের উপমহাদেশে সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ বাঁধানোর হাজার চেষ্টার বিরুদ্ধে লড়তে হচ্ছে। এই লড়াইও যুদ্ধবিরোধী লড়াই-এর মতো জনচেতনা এবং গণঐক্যের দাবিদার। এই লড়াইও সমাজবদলের বিপ্লবী দিনবদলের পালার কঠিন লড়াই। তবে লালন এবং অন্যান্য বাউলদের জীবন ও দর্শনের মুক্তধারা সহজসাধনাকে বরাবরই কঠিন ব্রতে ব্রতী করে এসেছে। আজও প্রয়োজনীয় বিপ্লবী প্রয়াস থাকবে মূলত সহজিয়াই অর্থাৎ ব্যাপকভাবে জনবোধ এবং আত্মিক মানবিক আবেদন-সমন্বিত থাকবে এই লড়াই। এই বৈপ্লবিক সংযোগ প্রক্রিয়ার ধারাটাও এমন যে, একে নিঠুর দরদীর মতো মানসমুকুলকে আগুনে ভাজতে হবে না। এই ধারাটা ইতোমধ্যে বাস্তবে রূপ নিয়েছে। এখানে দুটো দৃষ্টান্ত দেয়া যেতে পারে।

॥ ২ ॥

প্রথম দৃষ্টান্তটি আমরা পাবো ১৯৮৭ সালে ঢাকার কালিকলম প্রকাশনী থেকে প্রকাশিত সৈয়দ আমীরুল ইসলামের লেখা "বাংলাদেশ ও ইসলাম-ইতিহাসের প্রেক্ষাপট" আলোচনা বইটিতে, প্রায় হাজার বছরের বিভাগপূর্ব ও পরবর্তী বাংলাদেশের জনগণের জীবন ও মানস এবং ধর্মের ইতিবৃত্তে ইসলাম ধর্মের বিশিষ্ট ও নির্দিষ্ট মর্মকে মানবিক ও জনগণ-আশ্রিত দৃষ্টিভঙ্গিতে উপস্থিত করেছেন।

লেখক তাঁর প্রায় ৪০০ পৃষ্ঠার বইটি শেষ করেছেন বৈপ্লবিক মানসিক ছবি দিয়ে। শেষটা নিম্নরূপ:

"যুগটাই বদলে যাচ্ছে। গেছেও। এ যুগটা আর অতীতের মত পৃথিবীর একপাশে পড়ে থাকার যুগ নয়। পলাশীর যুদ্ধ যখন চলছিল তখন নাকি ক্ষেতে কৃষকরা ঠিকই ধানচাষ করছিল। কিন্তু এ কালের আধুনিক বোমা হিরোশিমা নাগাসাকিতে চল্লিশ বছর আগে পড়লেও তার ফল আজো তাড়িয়ে বেড়াচ্ছে মানবসমাজকে। এখন একপাশে

পড়ে থাকতে চাইলেও পারা যায় না। শ্রেণিবিভাগ সমাজে প্রচণ্ড ব্যক্তিস্বার্থের কারণে একে অপরের শত্রুতে পরিণত হয়ে প্রতিটি মানুষই সমাজে 'আউট সাইডার' বলে নিজেকে প্রতিপন্ন করতে পারে, কিন্তু একক দ্বীপ মানুষ কোনদিনই ছিল না। সব সময়েই সে যুথবদ্ধ। আপাতবিচ্ছিন্ন থাকলেও বিশ্বের প্রেক্ষিতে সমষ্টিবদ্ধ। মানুষের সভ্যতার ধারাটাই এমন যে, দমকে দমকে এসে তাতে যুক্ত হয়েছে নানা দেশের নানাজাতির নানা বর্ণের সংস্কৃতি সেই অতীত থেকে আজ পর্যন্ত। কোথাও কোনস্থানেই অবিমিশ্র কোন জনগোষ্ঠী পাওয়া সম্ভব নয়। ...শিগমির কালচার আলাদা মনে হলেও শিকড়ের গভীরে রয়েছে বিশ্বমানবেরই ধারা। কবির কথায় 'আমার শোণিতে রয়েছে ধ্বনিতে তার বিচিত্র সুর'। লোককবির সত্যদৃষ্টি তাই, 'নানানবরণ গাভীরে ভাই একই বরণ দুধ/জগৎ ভরিয়া দেখলাম একই মায়ের পুত'।

এই লোককবি হলেন লালন, যাঁর মনে অতীত বর্তমান নয় শুধু, ভবিষ্যৎ বিধৃত।

"বাংলাদেশ ও ইতিহাস" গ্রন্থের লেখক লালনকে ধর্মীয় সংকীর্ণ-চিন্তা ও সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধেই দাঁড় করিয়ে ক্ষান্ত হননি, তাঁকে সমগ্র মানবসমাজের বৈপ্লবিক সাম্যবাদী বিন্যাসের প্রবক্তারূপে উপস্থাপিত করেছেন।

।৩।

আমাদের দ্বিতীয় দৃষ্টান্তটি হচ্ছে রবীন্দ্রনাথের লোকায়ত ভাবনাচিন্তা ও রূপ সৃষ্টির ক্ষেত্র। একে একটি বড় আকারের চলচ্ছবিও বলা যেতে পারে। এই ছবিটি হচ্ছে এক বিপ্লবী মুক্তধারা।

এই সূত্রেই বাংলাদেশেরই ১৯৮৬-র মে মাসে (১৩৯৩-র ২৫ শে বৈশাখ) প্রকাশিত 'সীমার মাঝে অসীম' নামের সংকলন গ্রন্থটির উল্লেখ করা যেতে পারে। ঢাকার বাংলা একাডেমির এই গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন দিক নিয়ে ১৬জনের লেখায় কবির সমগ্র রূপটিতে উপস্থিত করার যে প্রয়াস করা হয়েছে প্রামাণ্য নথিপত্র দাখিল করে, তাতে লালন ও অন্যান্য বাউলদের প্রভাবে গড়ে ওঠা রবীন্দ্রনাথের লোকমুখী দিকটি প্রাধান্য পেয়েছে। এই চলচ্ছবির দুটি দিকের কথা এখানে শুধু উল্লেখ করে রাখছি। এই দুটি দিকের কোনটি বড় তা নিয়ে তর্ক হতে পারে। তবে দুটি দিকই জোরাল। একটি হলো, রবীন্দ্রনাথ যে লোকমুখী হতে পারলেন তার মূলে কাজ করেছেন লালন ও অন্যান্য বাউলরা। দ্বিতীয় দিকটি হলো, রবীন্দ্রনাথ নিজেই বিপ্লবী বাউল হয়েছেন এবং তাঁর নাটকের বাউলদের বিপ্লবীতে পরিণত করেছেন বাউল গীতিকে বৈপ্লবিকভাবে রূপান্তরিত করে। প্রথম দিকটির দৃষ্টান্ত হিসাবে বলা যেতে পারে, বাংলা কাব্যসংগীতের 'রাবীন্দ্রিক পরিণতি' নামের নিবন্ধে অধ্যাপক করুণাময় গোস্বামী দেখিয়েছেন যে, বাউল তথা লোকসংগীত শুধু যে রবীন্দ্রানাথের 'মানুষের ধর্ম' নিবন্ধ কিংবা ভারতীয়দর্শন কংগ্রেস সভাপতির ভাষণকে লোকায়ত ধারা এবং মুক্ত মানবিক চিন্তায় সংক্রামিত করেছে তাই নয়, তাঁর সংগীতের ধ্রুপদী ধারায় একটা লোকায়ত রীতি এনে দিয়েছে। অধ্যাপক গোস্বামী দেখিয়েছেন যে, রবীন্দ্রনাথের রচিত স্বদেশি গান এসেছে লোকসংগীতের তথা বাউল গানের সংস্পর্শে। এরই পাশাপাশি রবীন্দ্রনাথের নিজেরই বাউল হয়ে যাওয়ার ব্যাপারটির ব্যাখ্যা পাওয়া যায় 'সীমার মাঝে

অসীম' গ্রন্থের প্রবন্ধ আবুজাফর শামসুদ্দীনের রবীন্দ্রনাথ প্রাণের আলোকেতে। তিনি এখানে লালন প্রমুখ বাউলদের শিরোমনি হয়েছেন। রবীন্দ্রনাথের এই লোকায়ত ধারা মূলত সহজিয়া ধরনের বিপ্লবী অবস্থান। এই সহজিয়া ধরনের মুক্তিসংগ্রামটি, বিপ্লব ব্যাপারটি রবীন্দ্রনাথের সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সংক্রান্ত চিন্তাভাবনা ও সৃষ্টিকে প্রভাবিত করেছে। রবীন্দ্রনাথের শেষ লেখালেখিতে যখন তিনি বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে 'বিশ্বপরিচয়' লিখেছেন তখনও এই সহজিয়া বিপ্লবী মানবিক মুক্তিধারা বড় জায়গা নিয়ে রয়েছে। এখানে সাধারণভাবে বাউল এবং বিশেষ করে লালন সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের চিন্ত াভাবনা সম্বন্ধে একটা কথা বলে রাখা দরকার। সেটা এই যে, লালনের গান যৌবনের প্রারম্ভে শুনে যেমন এই বাউলের গানকে তিনি মনে মনে লালন করে 'গোরা' উপন্যাসের সূচনাতে ধ্বনিত ও রণিত করার ব্যবস্থা করেছিলেন, তেমনি শেষ বয়সেও লালনকে কাব্যের জগতেও একটা বড় রকমের মর্যাদা দিয়ে তাঁর দুটি গানের উদ্ধৃতি দিয়েছিলেন ১৯৩০ সালে, কলকাতা বিশ্বদ্যািলয়ে প্রদত্ত 'ছন্দ' সম্পর্কিত বক্তৃতায়। এই দিকটা আজকের শিল্পরূপ-চিন্তার একটি বিপ্লবী সূত্রস্বরূপ।

সাম্যবাদী উত্থান প্রত্যাশা

রাহুল সাংকৃত্যায়ন জন্মশতবার্ষিকীতে

মার্কসপন্থী অমর বৌদ্ধ মহাপণ্ডিত ও পরিব্রাজক রাহুল সাংকৃত্যায়নের জন্মশতবার্ষিকী চলছে এ বছর '৯২তে। জন্ম ১৮৯২-এর ৬ এপ্রিল। তাঁর জন্মদিনটিকে সামনে রেখে কলকাতার সুধীজনদের উদ্যোগে তাঁর সমগ্র ও বিশেষ দিনগুলি নিয়ে নিরীক্ষা শুরু হয়েছে। এরপর কলকাতার বাইরেও গোটা বছরটা ধরেই এই পর্যালোচনা চলবে। এই সময়টাও হচ্ছে এমন যখন কমিউনিস্ট তথা সাম্যবাদী মার্কসীয়-লেনিনীয় মতাদর্শ ও কর্মধারা এবং এর অনুসারী সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব ও নির্মাণ দুটোই ব্যাপকভিত্তি গড়ে তুলবার পরেও দারুণভাবে বিপর্যস্ত। পাশাপাশি সমাজতন্ত্রের সহযোগীরূপে এবং নিজস্ব ধারার দেশে-দেশান্তরে বিশেষ করে গত পঞ্চাশ বছরে সাম্রাজ্যবাদী শোষণ শাসন ও যুদ্ধের চক্রকে ভেঙ্গে যে সার্বভৌম স্বাধীন রাষ্ট্র ও গণতন্ত্রের উদ্ভব ও প্রতিষ্ঠা ঘটছে, সেই প্রক্রিয়াও আজ বিপন্ন। সমাজতন্ত্র, স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের উত্থান-পর্বেই রাহুল সাংকৃত্যায়ন নিজেকে কায়মনোবাক্যে এদের এগিয়ে নেবার প্রয়াসে নিবেদিত ও জড়িত করেছিলেন। বৌদ্ধ ধর্মশাস্ত্র ও দর্শনের উদ্ঘাটনে বিপুল অবদানের সঙ্গে তিনি যুক্ত করেছিলেন মার্কসীয় তত্ত্বের আলোকে রচিত কয়েকটি মৌলিক গ্রন্থ। যেমন 'মানবসমাজ', 'ভল্গা থেকে গঙ্গা'। এই সঙ্গে তিনি লিখেছিলেন, 'পালিও না, পৃথিবীটাকে বদলে দাও' নাম দিয়ে জনহিন্দী ভাষায় মার্কসীয় দর্শনের সহজ সরল আবাহনী। আজকের সমাজতন্ত্র, স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের বিপন্নতার ঘেরের মধ্যে পড়েছেন স্বাভাবিকভাবে রাহুল সাংকৃত্যায়নও অর্থাৎ গত চার দশক ধরে তাঁর রেখে যাওয়া চিন্তাভাবনা এবং কর্মসূচিও। তবে বিশেষ করে গত চার দশক ধরে অভ্যুত্থানের পর অভ্যুত্থানের বিপ্লবী পথে যে গণতন্ত্র, স্বাধীনতা ও সমাজতন্ত্রের উদ্ভব ও প্রসার

ঘটেছে নানা ধরনের ভয়াবহ বিপর্যয়কে কাটিয়ে উঠে, সেই প্রক্রিয়াও তো স্তব্ধ হয়ে যায়নি কোথাও কোন সময়েই। মার্কসীয়-লেনিনীয় তত্ত্বের ক্ষেত্রেও এটা ঘটেছে। উঠে এসেছে বারবার এই তত্ত্ব সমাজতন্ত্র, স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের পুণরুত্থানের দিশারীরূপে। তাই রাহুল সাংকৃত্যায়নও অবশ্যই বিপন্নতার ঘের থেকে বেরিয়ে আসবেন। তাঁর জন্মশতবার্ষিকীতে এ ব্যাপার বড় মাত্রায় সহায়করূপে পাচ্ছি। তাঁর সমাজ এবং বিশেষ বিশেষ দিকগুলি নিয়ে ব্যাপক পর্যালোচনা শুধু যে তাঁকেই নতুনতর পরিমাপ দেবে তা নয়, মার্কসীয় চিন্তাভাবনা ও কর্মসূচিকে নতুনতর পরিমাপে সজ্জিত করবে। আমরা এখানে আমাদের সংক্ষিপ্ত প্রস্তাবনাতে এই নব উজ্জীবনের দুয়েকটি বিষয়কে শুধু তুলে ধরছি।

শুরুতেই অবশ্য বলা দরকার যে, রাহুল সাংকৃত্যায়নের কোন কোন অভিমতকে মার্কসীয় মহলগুলির সবাই মেনে নিতে পারেন নি। তিনি কোন কোন বিতর্কে জড়িত হয়ে পড়েছিলেন। চল্লিশ দশকের শেষের দিকে এবং পঞ্চাশের দশকে যখন মার্কসীয়-লেনিনীয় মহলে কতকগুলি বিষয়ে গুরুতর মতভেদ নতুন করে দেখা দিতে শুরু করে এবং আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনে বিপর্যয়ের সূচনা হয় তখন তাঁকে নিয়ে বিতর্কের ব্যাপারটাকে মীমাংসা হওয়া দূরে থাকুক বরং সেটা মূল প্রসঙ্গগুলির বাইরে পড়ে যায়। আমরা আশা করব, রাহুল সাংকৃত্যায়নের জন্মশতবার্ষিকীতে একদিকে যেমন মার্কসীয় আলোকে তাঁর লেখাজোখাগুলি গোটা বিশ্বের কিংবা বিশেষ বিশেষ দেশ-দেশান্তরের মার্কসীয়-লেনিনীয় চিন্তাভাবনা ও কর্মসূচির ক্ষেত্রে অবসাদকে কাটিয়ে তুলতে সহায়তা করবে তেমনি তাঁর বিতর্কিত অথবা বিতর্কবহির্ভূত বিশিষ্ট মতামতগুলি নিয়ে দরকার হলে তর্ক হবে এবং সঙ্গে সঙ্গে তর্কের মীমাংসায় পৌঁছে আজকের সমাজতন্ত্র স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের সংকট দূর করার প্রয়াসে নিয়ে আসা হবে সেই রকমের প্রাণবন্যার ঢেউ, যেমনটি এসেছিল যখন রাহুল সাংকৃত্যায়ন তাঁর বিপুল শ্রমশক্তি ও বিশাল জ্ঞানের ভাণ্ডার নিয়ে কমিউনিস্ট পার্টির সাধারণ সদস্যপদ পাবার পরে। এই ঢেউ শুধু বুদ্ধিজীবীদের মহলে প্রাণের উচ্ছাস এনেই ক্ষান্ত হবে না, শ্রমজীবীদের মধ্যেও আবেগ ও বিবেচনাবোধ বড় পরিমাপে জানিয়ে দেবে বিশ, তিরিশ ও চল্লিশের দশকের মতোই। আমাদের উপমহাদেশের রাজনৈতিক সামাজিক, অর্থনৈতিক সামাজিক, অর্থনৈতিক বিপ্লবের গণউত্থানপর্বে রাহুলের প্রাণবন্ত আবির্ভাবকে—আমরা আজ গভীর ও নতুন প্রত্যাশা নিয়ে স্মরণ করছি।

॥ ২ ॥

আপাতত রাহুল সাংকৃত্যায়নকে আজকের ত্রিবিধ অর্থাৎ সমাজতন্ত্র, স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের সংকট থেকে বেরিয়ে আসার প্রয়াসে একজন খোলামনের এবং একইসঙ্গে বিদগ্ধ ও সহজ সরল জনবোধ্য সূত্রের মার্কসপন্থী উপস্থাপকরূপে বিশেষভাবে ভেবে দেখার জন্য আবেদন রাখছি। এই সূত্রে এখানে একটি বই-এর উল্লেখ করছি। এই বইটির নাম 'নয়ে ভারতকে নয়ে নেতা' (নতুন ভারতের নতুন নেতা)। বিভাগপূর্বকালে চল্লিশের দশকের প্রথমদিকে এই বইটি প্রকাশিত হয়। এর দ্বিতীয় সংস্করণ বেরোয়

উক্ত দশকের শেষের দিকে। সেই সময়ে বইটি আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। কিন্তু পরবর্তী সময়ে এই বইটি যেন হারিয়ে গিয়েছে। সম্প্রতি যেসব আলোচনা পর্যালোচনা হয়েছে রাহুলকে নিয়ে, তাতে এই বইটির নামোল্লেখ হয়েছে মাত্র, বিষয়বস্তু সামনে আসেনি। এইজন্য বইটিতে কি আছে সে সম্বন্ধে ধারণা দিচ্ছি প্রথমে।

এতে যে ১৯ জনের জীবন কথা বিবৃত হয়েছে তাঁরা হলেন, যথাক্রমে শেখ আবদুল্লাহ, সন্ত সিং ইউসুফ, রুদ্র দত্ত ভরদ্বাজ, এস. জি. সরদেশাই, স্বামী সহজানন্দ, শ্রীপদ অমিত ডাঙ্গে, কল্পনা দত্ত, সরস্বতী যোশী, বঙ্কিম মুখার্জী, পি. সুন্দরায়া, কারেলিয়ান, রামচন্দ্র মোরে, ড. গঙ্গাধর অধিকারী, ড. কুয়োঁর মুহাম্মদ আশরাফ, পূরণচন্দ্র যোশী, সোলি বাটলিওয়ালা, মুহম্মদ শহীদ (বোম্বে), সৈয়দ জামালউদ্দীন বুখারী, ফজল ইলাহী কুরবান, মুবারক সাদর।

দুটি দৃষ্টান্ত দিলে আমরা বুঝতে পারব, প্রত্যেকের জীবনকথা কিভাবে তথ্যের ভিত্তিতে রাহুল লিপিবদ্ধ করেছেন। যেমনঃ প্রথমত, সন্তসিং ইউসুফ। তথ্যগুলি বের করলে আসলে দাঁড়ায়ঃ শিখ পরিবারের জন্ম ১৯০৯। শিক্ষারম্ভ ১৯১৩-তে। লাহোরে রোজগারের কাজে লেগে যাওয়া ১৯২১-এ। লাহোরে পাকাপাকি মজুর ১৯২৩ সালে। রেলে ১৯২৫ সালে। ১৯২৬ সালে রেল ধর্মঘটে। বিজলীর মিস্তিরি। ১৯২৭ সালে দিল্লীতে মিস্তিরির কাজ। ১৯২৮ সালে মজুর সভায়। ১৯২৯ সালে দিল্লীতে সাধারণ ধর্মঘট। ইউনিয়নের সেক্রেটারি। ১৯৩০ সালে সত্যাগ্রহে ৪ মাস জেল। ১৯৩১ সালে দিল্লীর নওজোয়ান ভারত সভায় সেক্রেটারি। ১৯৩৩ সালে একবছর জেল। দিল্লী থেকে বহিষ্কৃত। বোম্বাইতে গিয়ে কাজ। ১৯৩৩ সালে মুহম্মদ ইউসুফ নাম নিয়ে আহমেদাবাদে মজুর। দেড় বছরের জেল। ১৯৩৫ সালে আবার জেল। আবার ছদ্ম নাম। অবশ্যই একা একা। সংগঠন করেননি পরেও। রুদ্র দত্ত ভরদ্বাজ, সবদেশাই, জামালুদ্দীন বুখারী, মুহাম্মদ শহীদ ও মুবারক সাদর প্রমুখের সঙ্গে মিলে শ্রমিক আন্দোলন, সমাজতান্ত্রিক চিন্ত ভাবনা ও স্বাধীনতা সংগ্রামে রেখেছেন যুক্ত প্রয়াস।

দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত সৈয়দ জামালউদ্দীন বুখারী। জন্ম আহমেদাবাদে। ১৯০২-এর ১৪ ই জুলাই। পীর পরিবার। শিয়া হলেও এই পীর পরিবারের সুন্নীদের মধ্যে সুহৃদ। পিতা ফার্সী ও আরবীর সঙ্গে ইংরেজি ও সংস্কৃত আয়ত্ত করেছিলেন। সুফীমত ও যোগের দিকে মন ছিল। অর্থাৎ গোড়ামি থেকে মুক্ত। পিতার নাম জয়নুল আবেদীন, মা শরীফুন্নেসা। জামালুদ্দীন বুখারী শ্রমিক আন্দোলন ও সংগঠন গড়তে গিয়ে অবিন্যস্ত ভাবে জেলে ঢুকেছেন, বেরিয়েছেন। গড়ে তোলেন করাচির জাহাজী শ্রমিক ইউনিয়ন এবং পাশাপাশি কিষাণ সভার সংগঠন।

এখানে দুটি জীবনকথার যে তথ্যগুলির উল্লেখ করা হলো, সেগুলিকে নিয়ে রাহুল সাংকৃত্যায়ন অবশ্য হৃদয়গ্রাহী চরিতকথা দাঁড় করিয়েছেন বিপ্লবের আদর্শে নিবেদিত একেকটি উল্কা যেন।

উপরে যে পূর্ণ তালিকাটি দেয়া হয়েছে, তাতে উল্লেখিত প্রত্যেকটি জীবন কথাই এইভাবে উপস্থাপিত। এতে একটি বিষয় দ্ব্যর্থহীনভাবে বেরিয়ে এসেছে। সেটা হচ্ছে আমাদের উপমহাদেশের মুক্তিসংগ্রামে উত্তর-দক্ষিণ পূর্ব-পশ্চিম মধ্য অঞ্চলের একটা সুন্দর ছবি বেরিয়ে এসেছে সম-গুরুত্ব নিয়ে। তাছাড়া এখানে কমিউনিস্ট ও

অকমিউনিস্ট নির্বিশেষে প্রত্যেকটি চরিতকথাও পেয়েছে সমান গুরুত্ব। যে মূলাধারের উপর জোর দেয়া হয়েছে প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে, সেটি হলো ধর্মনিরপেক্ষ ও ভাষা নিরপেক্ষ লোকউত্থান এবং নিঃশর্ত আত্মনিবেদন।

আমাদের উপমহাদেশে বিশ শতকের শুরু থেকে মোটামুটি চল্লিশ বছরের স্বাধীনতা গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের স্বতন্ত্র ও সম্মিলিত উত্থানের ঘটনাবহুল চিত্রাবলি এসেছে 'নয়ে ভারতকে নয়ে নেতা'তে। 'এতে যেমন ঐতিহাসিক ঘটনাগুলিকে আনা হয়েছে তেমনি ব্যক্তিগত দিকগুলি পেয়েছে দরদী শৈলীর ছোঁয়া। এই বইটি একটা অত্যন্ত দরকারী ব্যাপারকেও সঙ্গে সঙ্গে উপস্থিত করেছে। আজকের সংকট থেকে বেরিয়ে আসার জন্য যেটা দরকারী সেটা হলো, মার্কসবাদ একদিকে যেমন বিজ্ঞানভিত্তিক, তেমনি মনুষ্যত্বশীল। আমরা মনে রাখবো, রাহুল যখন চরিতকথাগুলি লিখেছেন, তখন তিনি শুধু মার্কসীয় দর্শনকে গ্রহণ করেননি, তিনি কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য হয়েছেন। সুতরাং একজন মার্কসপন্থী এবং একজন কমিউনিস্ট হয়ে তিনি যে মার্কসবাদ বহির্ভূত অকমিউনিস্টদের প্রতি কোন রকমের অপক্ষপাতমূলক ধারণা পোষণ করেন নি, এটা আমাদের সমাজধারায় স্বাধীনতা, সমাজতন্ত্র ও গণতন্ত্রের সাধারণ লড়াইতে নানাভাবে উঠে আসা সহনশীলতার অভাবকে কাটিয়ে ওঠার ক্ষেত্রে বিশেষভাবে কাজ করবে।

সমাজতন্ত্র, স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের বর্তমান সংকট কাটিয়ে ওঠার জন্য পুনরুত্থানে অবশ্যই শরৎচন্দ্রের 'পথের দাবি' উপন্যাসের মনুষ্যত্বের পথকে বুঝে নিতে হবে নতুন করে। এই মনুষ্যত্বের মধ্যে অবশ্যই থাকবে মমতা, মাধুর্য, সাথীত্ববোধ। রাহুল সাংকৃত্যায়ন তাঁর উপরিউক্ত গ্রন্থে এই মাধুর্যকে যুক্ত করেছেন হাজার ব্যস্ততার মধ্যে। যেমন, তিনি কৌতুক ও আনন্দবোধের পরিচয় দিয়েছেন স্বামী সহজানন্দের ছেলেবেলার ডাকনাম 'নও রং' উল্লেখ করে।

ভল্গা থেকে গঙ্গা : মহালগ্নের মহাগ্রন্থ

১৯৪২ সালে হাজারীবাগ সেন্ট্রাল জেলে বসে স্বাধীনতা সংগ্রামী এবং কৃষক আন্দোলনে স্বামী সহজানন্দের সাথী মহাপণ্ডিত বৌদ্ধ মনীষী রাহুল সাংকৃত্যায়ন তাঁর মাতৃভাষা সংযুক্ত প্রাদেশিক হিন্দীতে লিখেছিলেন আমাদের উপমহাদেশের এক মহাগ্রন্থ, ঐতিহাসিক কাহিনিমালা 'ভল্গা থেকে গঙ্গা (ভল্গা সে গঙ্গা)। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়, 'এই ভারতের মহামানবের সাগরতীরে' যুগে যুগে এসে সমবেত লোকসমাজের কয়েক হাজার বছরের জীবনকথা। এই জীবনকথাকে বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের ভাষায় বলা যেতে পারে এক মুক্তমনা মহৎ বুদ্ধিজীবীর কলমে ধরা যুগযুগান্তের আন্তর্জাতীয় নিপীড়িত জনমনমথিত বাণী। আমাদের উপমহাদেশে উত্থিত ও সমাগত বহু ধর্ম ও বহু দার্শনিক চিন্তা ও মানসের মর্মকথা এই গ্রন্থে যেমন প্রত্যেকের ধারকবাহকদের পুরুষাণুক্রমিক স্বাতন্ত্র্যের ধারায় চিহ্নিত হয়েছে, তেমনি সঙ্গে সঙ্গে দেয়ানেয়ার মধ্য দিয়ে গড়ে ওঠা এদের সমগ্র ধারাটিও সম্মিলিত জনজীবনের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ঐক্যের আয়োজনের পাশাপাশি চিন্তাভাবনার ঐক্যের

প্রয়োজন ও আয়োজন নিয়োজনকে সামনে নিয়ে এসেছে বড় বড় কালের ব্যবধানকেও অতিক্রম করে। প্রায় একই সময়ে ভিন্ন জেলে বসে লেখা পণ্ডিত জহরলাল নেহেরুর 'ভারত আবিষ্কার' এবং মওলানা আবুল কালাম আজাদের 'বিদীর্ণ হৃদয়ের যন্ত্রণা (গুবারে খাতির) আমাদের উপমহাদেশের হাজার হাজার বছরের চিন্তাভাবনা ও সামাজিক রাজনৈতিক অর্থনৈতিক জনবিন্যাসকে আধুনিক মানসের এবং বিপ্লবের প্রয়োজনের আলোকে ও নিরিখে উপস্থিত করে। এই দুটি বইও আমাদের উপমহাদেশের বিশ শতকের বিপ্লবী মহালগ্নের মহাগ্রন্থ। এদের উপস্থাপনের ধারা আলাদা আলাদা। রাহুল সাংকৃত্যায়নের ভল্গা থেকে গঙ্গার উপস্থাপনও একই মুক্তি সংগ্রামের সমস্যা ও সমাধানের ভূত ভবিষ্যত বর্তমান ধারাতে একটি স্বতন্ত্র রূপরীতিতে বিন্যস্ত। একে এক অনুপম সৃষ্টি বললে অত্যুক্তি করা হবে না। এ এক নতুন কালের গদ্য মহাকাব্য।

রাহুল সাংকৃত্যায়নের এই উপন্যাসোপম বইটিতে আমাদের উপমহাদেশের বহু ধর্ম ও বহু দর্শনের ঐতিহাসিক পরম্পরা ও সূত্রনিরূপণ মাঝে মাঝে অসামান্য ও সামান্য নারীপুরুষ কুশীলবের সংলাপের মাধ্যমে ন্যায়শাস্ত্রের রীতিতে উপস্থিত করা হয়েছে পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা জুড়ে। তবে এই ঋজু, বস্তুনিষ্ঠ ও সত্যসন্ধানী প্রশ্নোত্তর কাহিনির গতিকে কখনও মন্থর করে দেয়নি। এর কারণ হলো এই যে, গোটা ব্যাপারটাই মানবিকতার রসাপ্লুত। ইউরোপ ও এশিয়ার উত্তরাঞ্চলের মাঝামাঝি এলাকার বাসভূমির পর বাসভূমি ছেড়ে এক আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীর প্রথমে মাতৃতান্ত্রিক ও পরে পিতৃতান্ত্রিক লোকজন দক্ষিণের দিকে বসতির সন্ধানে যাত্রা করে শেষ পর্যন্ত আমাদের উপমহাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। 'ভল্গা থেকে গঙ্গা'তে এই ছড়িয়ে পড়া জনগোষ্ঠী পরম্পরার সামাজিক-অর্থনৈতিক-রাষ্ট্রিক-সাংস্কৃতিক-দার্শনিক-কাব্যিক আবহের বিবরণ দেয়া হয়েছে প্রতিটি যুগের প্রামাণ্য শাস্ত্রগ্রন্থ ও ঘটনা সম্পর্কিত বিবৃতিকে ভিত্তি করে। রাহুল তাঁর এই বিবরণীতে স্বাভাবিকভাবেই তাঁর বৌদ্ধধর্ম সম্পর্কিত বিশেষ জ্ঞান ও অনুশীলনকে কাজে লাগিয়েছেন। তবে তিনি নার্য্য ও অনার্য্য নারী ও পুরুষ চরিত্র সমূহকে পুনরুজ্জীবিত করেছেন এমনভাবে যে, মনে হয় মানুষী বর্ণবিত্তা ও প্রাণধারায় এরা হাজার বছরের আগের কেউ নয়। এরা আমাদের চিরপরিচিত মানবমানবী—নারী ও পুরুষ দেহে ও মনে। প্রবৃত্তিতে নিবৃত্তিতে। রাহুল তাঁর গ্রন্থের ভূমিকাতে লিখেছেন যে, তিনি যে আমাদের উপমহাদেশের একটি বিশেষ জাতিগোষ্ঠীর তথা বিশেষ করে আর্যজাতিগোষ্ঠীর উপরেই আলোকপাত করেছেন, তার কারণ এই জাতিগোষ্ঠীর ইতিবৃত্তকে তিনি তাঁর শাস্ত্রীয় এবং প্রব্রজ্যার ধারায় বিশেষভাবে চিনেছেন। তিনি তাঁর লক্ষ মানবিক রূপকে সহজভাবে তুলে ধরার জন্য তাঁর বিশেষভাবে পরিচিত জাতিগোষ্ঠীর নারী ও পুরুষ প্রতিভূদেরই ছবি তুলে ধরেছেন।

জেলখানায় বসে বহুধর্ম, বহুদর্শন এবং বহু রাজনৈতিক মতাদর্শকে প্রেক্ষাপটে রেখে এই ধরনের কয়েক হাজার বছরের মানবমানবীর কথা বলতে পারার বুকের পাটা তথা আত্মবিশ্বাসের মূলে রয়েছে অবশ্য অন্তত পক্ষে প্রাচ্য বিদ্যার প্রচণ্ড দখল। এশিয়া মহাদেশের অনেকগুলি ভাষাকে রাহুল আয়ত্তে এনেছিলেন। এই কারণেই জনবোধ্য হিন্দীর একটি বিশেষ ধারাতে সমস্ত কাহিনি রচিত হলেও তাকে রাহুল একটি বিশেষ

ধরনের হিন্দীতে উত্তরিত করে নিয়েছেন। এই হিন্দীতে ঐতিহাসিক আদি মধ্য ও আধুনিক পর্বগুলিতে উত্তরিত বিভিন্ন প্রজন্মের বিভিন্ন অঞ্চল অনুযায়ী উচ্চারিত সংলাপ বিস্ময়কর স্বাচ্ছন্দ পেয়েছে। ঘরে বাইরের বিভিন্ন জনভাষী বা ভাষিণীরাও সমস্ত কাহিনিতে বরং প্রগলভ্ বা প্রগল্ভা। বোধ হয় এই কারণেই রাহুলের এই মহাগ্রন্থ আমাদের উপমহাদেশের বিভিন্ন আঞ্চলিক ভাষায় স্বচ্ছন্দে অনুবাদিত হয়েছে।

সুতরাং একটি কথা এই সূত্রে বলে রাখা যেতে পারে যে, মহাপণ্ডিত রাহুল সাংকৃত্যায়নের বৈদগ্ধ বহু জাতিগোষ্ঠীর বহু সম্প্রদায়ের বহু ধ্যানধারণাকে আয়ত্তে আনতে সক্ষম হওয়ায় আমাদের উপমহাদেশের মুক্তি সংগ্রামের সামান্য ও অসামান্য নির্বিশেষে নারী ও পুরুষ কুশীলবদের সহজতম সবলতম বক্তব্যকেও আজকালকার ক্যাসেটের মতো ধরতে পেরেছে। এর মূলে যে বড় কারণটা কাজ করেছে, সেটি আমাদের ধারণায়, রাহুলের জনগণমুখিতা, যা তাঁকে শেষ পর্যন্ত একজন মার্কসবাদীতে পরিণত করেছিল।

এই মহালগ্নের মহাগ্রন্থটিও অবশ্য যাকে বলে প্রকৃত পক্ষে যেন সময়ের কোন খাঁজে চাপা পড়েছে। বইটি প্রকাশিত হবার পরে আমাদের উপমহাদেশে চার পাঁচ দশকে ঐতিহাসিক উলট পালট হয়ে গিয়েছে। রাহুল প্রায় তিন দশক হলো প্রয়াত। এই পরিব্রাজক আর তাঁর নিবন্ধ অথবা কাহিনি রচনার বিশেষ রীতি অনুসারে প্রত্যক্ষদর্শীরূপে আমাদের উপমহাদেশের দূর-দূরান্তের বাসিন্দাদের মুখ থেকে নব নব উত্থানের মর্মকথা খতিয়ে দেখার জন্য উপস্থিত হচ্ছেন না। নব্বই এর দশক থেকে হিসেব করলে প্রায় ৫০ বছর আগে লেখা 'ভল্গা থেকে গঙ্গা' ধরেই রাহুলের এই বইটির প্রতি সর্বতোভাবে দৃষ্টি দিতে হবে আমাদের। এই তাগিদের একটি বড় কারণ অবশ্য আগামী ১৯৯৩-এর এপ্রিলে রাহুলের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপনের জন্য তৈরি হওয়া। তবে এই নব্বই-এর দশকের শুরু থেকেই আমাদের উপমহাদেশে তো বটেই সারা বিশ্বেই প্রগতিবাদী গণতন্ত্রী সাম্যবাদী সমাজতন্ত্রী জনমুক্তিধারা যে বিভ্রান্তির খাদের মধ্যে পড়েছে, তা থেকে বেরিয়ে আসার প্রয়াসে রাহুল এবং তাঁর লেখা ভল্গা থেকে গঙ্গা ও অন্যান্য গ্রন্থ বড় ভূমিকা নিতে পারে। সুতরাং এই ভূমিকাটিকে বুঝে নেয়া দরকার। আমরা এর তিনটি দিককে সামনে রাখছি। এই তিনটি দিক হলো:

(১) ব্রাহ্মণ সন্তান রাহুল সমগ্র সংস্কৃতশাস্ত্র অধ্যয়ন শেষ করে এবং তার পাশাপাশি তদানীন্তন যুক্ত প্রাদেশিক বৌদ্ধদের রীতি অনুসারে উর্দু ও ফার্সী ভাষা আয়ত্ত করে তীর্থযাত্রার পথে উপমহাদেশ ভ্রমণে বেরিয়ে বৌদ্ধমত গ্রহণ করলেন এবং গভীর অন্বেষণ ও অনুশীলন করে বৌদ্ধ দর্শনের দিকপালে পরিণত হলেন। তাঁর পরিভ্রমণের বিশেষ ধরন এবং বৌদ্ধধর্ম ও দর্শনের কতকগুলি নির্দেশ এবং সূত্রও অবশ্য হাজার হাজার বছর জুড়ে চলে আসা অবনত ও শোষিত জনের মানব-মানবীর কায়মনোবাক্যের আয়োজিত মুক্তিপ্রয়াসে শরিক করে দেয়। এই পথেই তিনি বৌদ্ধ ছাড়াও অন্যান্য ধর্ম ও দর্শনের বিদ্রোহী লোকায়ত ধারা এবং তাদের ধারক বাহক জনমোর্চার সঙ্গে নিজেকে একাত্ম করে এগিয়ে আসেন। এই ধারাতেই এগিয়ে এসে তিনি পৌঁছে যান মার্কসীয় দর্শন ও বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের চিন্তাভাবনার প্রয়োগে। এই ক্ষেত্রে তিনি যেমন মার্কসীয় ধ্যানধারণাকে তাঁর চিন্তাভাবনার ঐতিহাসিক পরিণতিরূপে

গ্রহণ করলেন তেমনি মার্কসীয় চিন্তা ও তার প্রয়োগের সামগ্রিক ও সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম দিকগুলিকে আমাদের উপমহাদেশের বহুমাত্রিক ও বৈচিত্র্যময় জনজীবনের সমস্ত ঐতিহাসিক পর্বগুলির ভিন্ন ভিন্ন বিন্যাসে খতিয়ে যাচাই করে নিলেন। রাহুল এক্ষেত্রে বিশেষ করে বৌদ্ধদর্শনের ন্যায়শাস্ত্রে মার্কসীয় ভাবনার দ্বান্দ্বিক গতিধারায় তত্ত্বের মিল খুঁজে পান। ভল্গা থেকে গঙ্গার কাহিনিমালায় তিনি প্রয়োগ করেছেন মার্কসীয় ঐতিহাসিক বস্তুবাদকে। প্রাগৈতিহাসিক থেকে আধুনিক পর্বে উপমহাদেশের জনবিন্যাসের উত্তরণকে তিনি প্রকৃতপক্ষে ফ্রেডরিক এঙ্গেলসের 'পরিবার, ব্যক্তিগত সম্পত্তি ও রাষ্ট্র' গ্রন্থটির পর্ব পর্বান্তরের ছাঁচে ঢেলে দেন। তবে এটাও তিনি করেছেন স্বচ্ছন্দে, 'সৃষ্টি সুখের উল্লাসে'। এক মুক্তমনা শিল্পীর বাধাহীন সৃষ্টির কাজ 'ভল্গা থেকে গঙ্গা'। এ কাজ রাহুল করতে পেরেছেন যেমন একদিক দিয়ে তাঁর বুদ্ধি ও কল্পনাকে পুরোপুরি স্বাধীনতা দিয়ে তেমনি ওটা সম্ভবপর হয়েছে মার্কসীয় দর্শন ও প্রয়োগের বৈপ্লবিক নমনীয়তা ও গ্রহণ ক্ষমতার জন্য। আমাদের আলোচ্য মহাগ্রন্থটির এই দিকটি মার্কসবাদের বর্তমান সংকটে নবজাগৃতির কাজে লাগবে।

(২) রাহুল তাঁর বইটিতে আমাদের উপমহাদেশের ধর্ম ও দার্শনিক চিন্তাসমূহকে আনুপর্বিক ঐতিহাসিকতার মর্যাদা দিয়েই একদিকে যেমন কায়েমি স্বার্থের সঙ্গে সম্পর্কের প্রেক্ষিতে রক্ষণশীলতার অন্যায়গুলোকে চিহ্নিত করেছেন, তেমনি উদার ও গণতান্ত্রিক মুক্তি ধারার মানবিকতার দিকগুলিকেও সামনে এনেছেন। ধর্মীয় প্রাতিষ্ঠানিক গোঁড়ামির প্রবক্তাদের তিনি যেমন ধিক্কৃত করেছেন, তেমনি প্রকৃতপক্ষে ধর্মনিরপেক্ষতা ও অসাম্প্রদায়িকতায় অবস্থানগ্রহণকারী ধর্মের উদার ও মুক্তবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যাখ্যাকারদের তিনি একেকটি পর্বে ঐতিহাসিক পুরোধারূপেও উপস্থিত করেছেন। এটা করতে গিয়েই রাহুল তাঁর ভল্গা থেকে গঙ্গার কাহিনিগুলিতে মুক্ত ধর্মকে গভীর ও অন্তরঙ্গভাবে দেখতে এবং দেখাতে চেয়েছেন। তথাকথিত মৌলবাদীদের যুক্তিতে মানবতাবাদী ব্যাখ্যাকাররা বুদ্ধির লড়াইয়ে বরাবরই হারিয়ে দিয়েছেন। এদিক দিয়ে রাহুলের বিদ্রোহী নায়কনায়িকারা ধর্মের ভিত্তিটাকে পরখ করেছেন সামাজিক রাজনৈতিক অর্থনৈতিক সাংস্কৃতিক জীবনে পরস্পরের প্রতি আচরণের কষ্টিপাথরে। সাম্যের অপরিহার্য ও অনিবার্য প্রয়োজন উঠে এসেছে এখানে ধর্মের নিয়ন্তা রূপে। ধর্মবিচারে এখানে জাতপাত ও অস্পৃশ্যতা এবং সাম্প্রদায়িকতা অচল। এই সঙ্গেই স্বাধীনতা ও শোষণমুক্ত সমাজের জন্য যে লড়াই একদিকে জাতীয় ঐক্য এবং আরেকদিকে আন্তর্জাতিক মৈত্রীর ধারাকে অপরিহার্য করে তুলেছে, তার পথে জাতপাত ও সাম্প্রদায়িকতা নিরেট প্রতিবন্ধক। এই সত্যটি ভল্গা থেকে গঙ্গার আনুপর্বিক সমস্ত কাহিনিতে উচ্চারিত হয়েছে মুক্তি সংগ্রামীদের আচার আচরণের মধ্য দিয়ে। এর বিরুদ্ধে যে কোন অবস্থান আমাদের উপমহাদেশের যে কোন ধর্মের ও ঐতিহাসিকতার বিরোধী।

(৩) রাহুলের 'ভল্গা থেকে গঙ্গা' আরেক দিক দিয়ে আমাদের আজকে নব্বই-এর দশকে একজন মার্কসপন্থীর একটা বিশেষ বিষয়ের উপর গুরুত্ব প্রদানকে বড় মাত্রায় স্থাপন করেছে। এই বিষয়টি হচ্ছে বুদ্ধিজীবীদের সবসময়েই বিদ্রোহের অবস্থান গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা। রাহুল এই অবস্থান গ্রহণকে আমাদের উপমহাদেশের আনুপর্বিক ঐতিহাসিকতার মর্যাদা দিয়েছেন। একটি দৃষ্টান্ত সুপর্ণ বৌধেয়। উজ্জয়িনীর অন্যতম

রাজরত্ন কবি কালিদাসকে তাঁর শিষ্য সুপর্ণের জেরায় ফেলে রাহুল যে বিতর্কের ছবি দিয়েছেন সেটি আজও বিশেষ করে বুদ্ধিজীবীদের ভাবাতে পারে। সুপর্ণ তাঁর গুরু কালিদাসকে প্রশ্ন করেছিলেন, তিনি এত বড় কবি হয়েও সম্রাটের দরবারে কেন চাটুকারিতা (হিন্দীতে চাপলুসী) করেছেন। কালিদাস ক্রুদ্ধ না হয়ে তখনকার বাস্তব অবস্থাটা বুঝিয়ে বলেছিলেন।

প্রতিটি অধ্যায়েই এই ধরনের কথাবার্তা রয়েছে, যা একেকটা যুগকে কোন পুরুষ কিংবা নারীর অন্তরঙ্গ বক্তব্যের মধ্য দিয়ে উদ্‌ঘাটিত করে রেখেছে। যুগান্তকারী সমস্ত সিদ্ধান্ত কোন কোন সময়ে প্রণয়-সম্ভাষণ অথবা কোন কোন সময়ে তত্ত্ব জিজ্ঞাসার মাধ্যমে উচ্চারিত হয়ে রয়েছে। এরা ঐতিহাসিক, কিন্তু উপন্যাসের নায়ক নায়িকাদের ধারাকে এখানে প্রাধান্য দেয়ার ফলে অন্তরঙ্গতা সৃষ্টিতে বেশি কার্যকর। একেকটা যুগকে চিহ্নিত করা হয়েছে কোন নায়িকা কিংবা নায়কের সঙ্গে যারা সকলেই ঐতিহাসিক, কিন্তু নেপথ্যচারী অথবা নেপথ্যচারিণীতে। মূল মহাগ্রন্থটি না পড়লে এর সূক্ষ্ম সৌন্দর্যঘটিত পরিকল্পনাগুলির আস্বাদ পাওয়া সম্ভব নয়। তবু রাহুলের এই রচনাটির বিস্তার ও গভীরতা ও বৈচিত্র্যের একটি পরিচয় চোখের বা মনের সামনে রাখার জন্য এখানে গ্রন্থকার রচিত সূচিপত্রটি তুলে দিচ্ছি পর্ব-পর্বান্তের ধারায়:

(১) নিশা—দেশ—ভল্গা-তট (উত্তরী), জাতি—হিন্দী ইউরোপিয়, কাল—৬০০০ খৃষ্টপূর্ব। আজ (বিশ শতক) থেকে ৩৬৩ পীড়হি (প্রজন্ম) আগেকার কাহিনি যখন ভারত, ইরান ও য়ুরোপের সমস্ত বাসিন্দা একটি জাতিগোষ্ঠী বা ট্রাইবের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

(২) দিবা—দেশ—ভল্গা-তট (মধ্য), জাতি—হিন্দী শ্লাভ, কাল—৩৫০০ খৃষ্টপূর্ব

(৩) অমৃতাশ্ব—দেশ—মধ্য এশিয়া, পামীর (উত্তর পূর্ব)
জাতি—হিন্দী, ইরানি
কাল—৩০০০ খৃষ্টপূর্ব
আজ থেকে ২০০ প্রজন্ম আগেকার কথা

(৪) পুরুহূত—দেশ—বহু উপত্যকা (তাজিকিস্তান)
জাতি—হিন্দি, ইরানি
কাল— ২৫০০ খৃষ্টপূর্ব
আজ থেকে শতাধিক প্রজন্ম আগেকার কথা

(৫) পুরুধান—দেশ—উত্তরী খণ্ড
জাতি—হিন্দি আর্য
কাল—২০০০ খৃষ্টপূর্ব

(৬) অঙ্গিরা—স্থান—পাঞ্জাব (তক্ষশীলা)
জাতি—হিন্দী আর্য
কাল—১০০০ খৃষ্টপূর্ব
আজ থেকে ১২০ প্রজন্ম আগেকার কথা

(৭) সুদাস—দেশ—কুরু পাঞ্চাল (পশ্চিমী যুক্তপ্রান্ত)
জাতি—বৈদিক আর্য

কাল–১৫০০ খৃষ্টপূর্ব
আজ থেকে ১৪৪ প্রজন্ম আগেকার কথা

(৮) প্রবাহন–স্থান–পাঞ্জাব (যুক্তপ্রান্ত)
কাল–৭০০ খৃষ্টপূর্ব
আজ থেকে ১০৮ প্রজন্ম আগের কথা

(৯) বন্ধুলমল্ল–কাল–৮০০ খৃষ্টপূর্ব
আজ থেকে ১০০ প্রজন্ম আগেকার কথা

(১০) নাগদত্ত–কাল–৩৩৫ খৃষ্টপূর্ব

(১১) প্রভা–কাল–৫০ খৃষ্টপূর্ব

(১২) সুপর্ণ যৌধেয়–কাল–৪২০ খৃষ্টাব্দ

(১৩) দুর্মুখ–কাল–৬০০ খৃষ্টাব্দ

(১৪) চক্রপাণি–কাল–১২০০ খৃষ্টাব্দ

(১৫) বাবা নূরদীন–কাল–১৩০০ খৃষ্টাব্দ

(১৬) সুরৈয়া–কাল–১৬০০ খৃষ্টাব্দ

(১৭) রেখা ভগতে–স্থান–হরিহর ক্ষেত্রের মেলা প্রাঙ্গণ থেকে সূচনা
কাল–১৮০০ খৃষ্টাব্দ

(১৮) মঙ্গল সিংহ–কাল– ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দ

(১৯) সফ্‌দর–কাল–১৯২২ খৃষ্টাব্দ

(২০) সুমের–কাল–১৯৪২ খৃষ্টাব্দ

সাম্যবাদী উত্থান প্রত্যাশা : আত্মজিজ্ঞাসা

উনিশ'শ ছেচল্লিশের কলকাতা মহানগরী ৪৫-৪৬ এর উপমহাদেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের দাবিতে উত্তাল গণউত্থানের মর্মকেন্দ্র হয়ে দাঁড়িয়েছিল। ডাক-তার ধর্মঘটের সমর্থনে হরতালের মাধ্যমে এখানে প্রকাশ পেয়েছিল গণঐক্যের মহাবৈপ্লবিক সম্ভাবনা। এই বৈপ্লবিক সংহতির মধ্যে আঘাত হানার মতলব নিয়ে সাম্রাজ্যবাদী শাসক ও সাম্প্রদায়িকতাবাদী কায়েমি স্বার্থের চক্র যোগসাজক করে এই অতর্কিত দাঙ্গার জন্য প্রস্তুত না থাকলেও কমিউনিস্ট ও অন্যান্য বামপন্থি গণতন্ত্রী স্বাধীনতাব্রতীরা সাধ্যমতো প্রতিরোধ করেছিলেন। এই দাঙ্গাবিরোধী কর্মকাণ্ডে গভীরভাবে যুক্ত তরুণ কমিউনিস্ট যুব অসীম রায় তৎক্ষণাৎ একটি পূর্ণাঙ্গ মহাকাব্যিক উপন্যাস লিখেছিলেন ছেচল্লিশের কলকাতা নিয়ে। এই উপন্যাসের নাম 'একালের কথা'। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার বিরুদ্ধে সম্মিলিত অসাম্প্রদায়িক অবস্থান ছিল এই উপন্যাসের মূলমর্ম।

এই অসীম রায়ই পরবর্তী পর্যায়ে বিশেষ করে ছোট গল্পের লেখক হিসেবে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। ১৯৮১ সালে কলকাতার মনীষা প্রকাশনী 'অসীম রায়ের গল্প' নাম দিয়ে যে বের করেছে, তাতে ষাট ও সত্তর দশকের বিশেষ করে পশ্চিম বাংলার এবং সেই সঙ্গে পূর্ব বাংলা তথা বাংলাদেশের সাধারণভাবে বামপন্থি কমিউনিস্টদের গণঅভ্যুত্থান প্রয়াসের নায়ক নায়িকাদের প্রত্যাশা ও যন্ত্রণায় মথিত দিবারাত্রির কাহিনি বর্ণিত হয়েছে। 'ঝাড়পোছ' এই গল্পমালার একটি স্তবক।

এই গল্পটিতে নায়ক এককালের প্রেসিডেন্সি কলেজের কৃতি ছাত্র এবং ঘটনাকালে বামপন্থি কমিউনিস্ট ঝড়ের পাখি। '৪৮ সালে কলকাতা এবং ঢাকার যুগপৎ কমিউনিস্ট আন্দোলনে তাঁর হাতে খড়ি। তবে সত্তরের দশকের মাঝামাঝি পর্যন্ত পৌঁছেছে এই কাহিনি স্মৃতি বিস্মৃতির ধারায়। তখন নায়ক অতীতের সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ করে শাঁসালো চাকরি ও ঘরসংসারে ব্যস্ত। '৪৮-এর কর্মকাণ্ডকে মনে হচ্ছে অবান্তর। সুতরাং বই এর শেল্‌ফ থেকে ঝেড়ে পুরানো বই কাগজপত্র বিক্রি করে দেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে নায়ক। হঠাৎ রাতে ঘুম থেকে উঠে শেল্‌ফের কাগজ বইপত্র বাছতে বাছতে সে সিদ্ধান্ত করল, কিছু রেখে দেবে স্মৃতি হিসেবে। এই দোটানার ব্যাপারটা দিয়ে গল্প শেষ।

কিন্তু এ গল্পের কি শেষ আছে? এই ঝাড়পোছ আর এর কুশীলবদের ধরে রাখবে কি শুধু স্মৃতিকথা? ঝাড়পোছ দুই বাংলারই আশির ও সমাগত নব্বইয়ের দশকের পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে জড়িত প্রজন্মের কর্মে ও মানসে কি কোন বিবেচনার ইঙ্গিত বা পাথেয় রাখেনি? অসীম রায়ের সৃষ্টি আর সাধনার সার্থকতা আজ ও আগামীতে কিভাবে নির্ণীত হবে? পঞ্চাশ ষাট সত্তরের দশকের 'রক্তে বোনা ধান' নিয়ে নব্বইয়ের দশকের সাম্যবাদী বিবেচনার মেলবন্ধন অসীম রায়ের উপস্থাপিত দ্বান্দ্বিক অগ্রগতির ছবি ও ভাবনায় আলোকিত ফেলে আসা ঘটনাবলিকে কিভাবে নেবে? ঝাড়পোছের বর্জন ও বহাল রাখার ইঙ্গিত ও পাথেয়র ব্যাপারে আমরা তাঁর সমসাময়িক আরো কয়েকজনের কাজের ধারা থেকে সূত্র নিলে আমাদের প্রশ্নের জবাবটা পরিষ্কার বেরিয়ে আসতে পারে। এই প্রসঙ্গে যেসব মুখ মনে জাগছে তাঁদের একজনের কথা প্রথমে বলা যেতে পারে।

দৃষ্টান্ত সত্যেন্দ্রনারায়ণ মজুমদার। এখানে অবশ্য একটা ভিন্ন মেজাজে এবং ভিন্ন অভিজ্ঞতায় সাম্যবাদী আন্দোলনের প্রতিফলন ও বিচারকে উপস্থিত করছি সত্যেন্দ্রনারায়ণ মজুমদারের রেখে যাওয়া কাজের একান্ত সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়ে। সত্যেন্দ্রনারায়ণের জন্ম ১৯১০ সালে, মৃত্যু ১৯৮৭ তে। স্বাধীনতা সংগ্রামীর ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ জীবন। ব্রিটিশ আমলে কারাগারে কাটিয়েছেন '৩৪ সাল থেকে '৪৫ সাল পর্যন্ত। ১৯৩৭ সালে আন্দামান সেলুলার জেলে কমিউনিস্ট হন। '৪৬ সালে দার্জিলিং জেলায় কমিউনিস্ট পার্টি এবং চা শ্রমিক আন্দোলন গড়ে তোলেন, '৪৯ থেকে '৫২ সাল পর্যন্ত জেলে। রাজ্যসভায় সদস্য '৫২ থেকে '৫৭ এবং পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার সদস্য '৫৭ থেকে '৬২ সাল। এই সমস্ত ব্যস্ততার মধ্যেই আঞ্চলিক সংস্কৃতি এবং বিশেষ করে নেপালি ভাষা ও সংস্কৃতি নিয়ে উল্লেখযোগ্য কাজ করেছেন। লোকসংস্কৃতি ও জাতি সমস্যার গভীরে গিয়েছেন। কয়েকটি নিবন্ধ গ্রন্থে ধরা রয়েছে শতাব্দির সমাজতন্ত্রী সাম্যবাদী, জাতীয় মুক্তি আর গণতান্ত্রিক জনউত্থানের চিন্তা-ভাবনা সৃষ্টির সাধনা। বইগুলোর নাম কাঞ্চনজঙ্ঘা, মার্কসীয় দৃষ্টিতে লোকসংস্কৃতি, রবীন্দ্রনাথ ও ভারতবিদ্যা, Marxism and the Language Problem in India, In Search of a Revolutionary Ideology (আত্মজীবনী), মৌনমুখর, সেলুলার জেল, আমার বিপ্লব জিজ্ঞাসা, রবীন্দ্রনাথের জীবনবেদ, রবীন্দ্রনাথের উত্তরাধিকার।

এই সাথেই স্মরণীয়, সত্যেন্দ্রনারায়ণ মজুমদার ছিলেন 'মূল্যায়ন' পত্রিকার অন্যতম উদ্যোক্তা ও কর্ণধার। অর্থাৎ জড়িত ছিলেন সমবেত মার্কসীয়-লেনিনীয়

নিরীক্ষায় মতামত বিনিময় করে মতামত স্থির করার ধারায়। এখানে শুধু একটা ধারণাই মাত্র করা যায় জাতীয় মুক্তিসংগ্রামী সত্যেন্দ্রনারায়ণ মজুমদার, সমাজতন্ত্রের প্রতি দায়বদ্ধতার ভাবনা নিয়ে কত ব্যাপক প্রস্তুতি সমেত আন্দোলন ও সংগঠনে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। তবু একটা সিদ্ধান্ত টানা যেতে পারে খুব পরিষ্কার করেই। সমাজতন্ত্রের বা কমিউনিজমের বিশ্বজোড়া তাগিদ গণতন্ত্রের জন্য সংগ্রামে জড়িত হয়ে আমাদের উপমহাদেশে তথা বাংলায় তথা দুই বাংলাতে কোনো রকমের মৌসুমী ফ্যাশন বা হুজুগরূপে আঞ্চলিক রূপ পরিগ্রহ করেনি। ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যবাদী শাসন, শোষণ এবং দখলদারির সামরিক রাজনৈতিক বেষ্টনী ভাঙার জন্য জনগণের অভ্যুত্থানের প্রক্রিয়া ও লক্ষ্যের মর্মকেন্দ্ররূপে বিন্যস্ত ও উৎসারিত হয়েছে সমাজতন্ত্র ও কমিউনিজমের চিন্তা ও প্রকল্প। ভুলের, বিভ্রান্তির যান্ত্রিকতার অনুকরণসর্বস্বতার, গাফিলতির, আত্মতুষ্টির, বিকৃতির মাশুল দিতে হয়েছে পদে পদে। ঘটাতে হয়েছে সূত্রবদ্ধ মার্কসীয়-লেনিনীয় ভাবনার প্রসার স্বকীয় চিন্তার উদ্ভাবনে। ভাঙাভাঙি ও ভাগাভাগির মধ্যেও তাই গড়ে উঠেছে সংগ্রাম ও সাধনার সাফল্য, সার্থকতার ভিত্তি; প্রসারিতও হয়েছে এই ভিত্তি।

উপরিউক্ত 'ঝাড়পোছ' এবং কর্মকাণ্ডের ধারা দেখিয়ে দিচ্ছে সাম্যবাদী মেলবন্ধনের কথাটা স্বপ্নকল্পনা নয়। দৃষ্টান্ত দুটোই এক কথায় বলতে গেলে ঘরোয়া। এবার তাই দুটো দৃষ্টান্তের উল্লেখ করছি কিছুটা দূর-দূরান্তের, যদিও একই গোত্রের।

প্রথমেই উল্লেখ করব, ৮০র দশকের শুরুতে হাতে এসেছিল একটি বই। লেখক ফেলিক্স গ্রিন (Felix Green)। বইটির নাম 'শত্রু (মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ)'–'The Enemy (US Imperialism)' বিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের মাঝামাঝি সময়ে সমাজতন্ত্র ও সাম্যবাদের ভাঙাভাঙির মধ্যেও যে এরকমের একটি চরিত্র এবং এমন ধরনের চিন্তা সাম্যবাদ-সমাজতন্ত্রের মহলে সম্ভবপর হতে পেরেছে, সেটা প্রহেলিকার মতো মনে হয়েছিল বইটি পড়ে। ফেলিক্স গ্রিনের এই উপস্থাপনটি হাতছাড়া হয়ে গিয়েছে, কিন্তু সারমর্ম লিখে রেখেছিলাম ডায়েরিতে। এখানে সেই কথাগুলো হুবহু সাজিয়ে দিচ্ছি।

ফেলিক্স গ্রিন শান্তি আন্দোলনের প্রসঙ্গে 'ইলিউশন এন্ড রিয়ালিটি'র লেখক এবং ১৯৩৬-৩৭ সালে স্পেনে গণপ্রজাতন্ত্রী সরকারের পক্ষে এবং ফ্যাসিবাদী জেনারেল ফ্রাঙ্কোর সেনাবাহিনীর হানাদারির বিরুদ্ধে যুদ্ধে শহীদ ক্রিস্টোফার কডওয়েলের লেখা থেকে উদ্ধৃতি দাখিল করেছেন। ব্রিটিশ কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য এই কডওয়েলের বক্তব্যকে গ্রিন বড় মাত্রায় উপস্থিত করেছেন।

ফেলিক্স গ্রিন তাঁর বইটিতে কার্ল মার্কসের লেখা থেকে যেমন প্রসঙ্গ টেনেছেন, সেখানে রয়েছে মার্কসের চিন্তা-ভাবনার প্রতি গভীর আস্থা ও একাত্মতা। তিনি সেই সময় পশ্চিমা অর্থনীতিবিদকে নিয়ে পরিহাস করেছেন যাঁরা 'শোষণ' ও 'শ্রেণি'র মতো কথাগুলোকে পরিহার করে চলেন, কারণ এই সমস্ত কথা কার্ল মার্কস ব্যবহার করেছেন। ফেলিক্স লিখেছেন, মার্কস ছিলেন এমন একজন মহান লেখক ও সংগ্রামী যাঁর বক্তব্য সবসময়েই বিষয়ানুগ থাকতো।

ফেলিক্স গ্রিনের যেসব মতামত তাঁর বইতে ব্যক্ত হয়েছে তাতে দেখা যায় তিনি একদিকে মাও-সে-তুঙের অনুসারী আবার সেই সঙ্গেই ভিয়েতনাম ও কাস্ত্রোর সমর্থক।

এরই পাশাপাশি তিনি সোভিয়েত সমাজতন্ত্রী অক্টোবর বিপ্লবের প্রবক্তা। ফেলিক্স গ্রিনের গর্ব, বিশ্বে প্রথম মহাকাশে নভোচারী পাঠিয়েছে অক্টোবর সমাজতন্ত্রী বিপ্লবের মধ্য দিয়ে অধিকারী হয়ে ওঠা শ্রমজীবী মানুষেরা।

ফেলিক্স গ্রিনের আরেকটা পরিচয় এই যে তিনি একজন প্রথম শ্রেণির চলচ্চিত্রকার। ছবি করেছেন গণচীন এবং ভিয়েতনাম নিয়ে।

হয়তো আমরা আমাদের কঠোর পক্ষাপক্ষ বিচারের দরুন ফেলিক্স গ্রিনের তাত্ত্বিক কাজ এবং ছবি তৈরির ব্যাপারটাকে আমলে আনিনি। কিন্তু এই ব্যক্তিটি সেদিকে ভ্রূক্ষেপ করেননি। তাঁর কাজ তিনি করে গিয়েছেন, বক্তব্য বলে গিয়েছেন। সেই বক্তব্য ও কাজ হচ্ছে অপক্ষপাতিত্বের। মেলবন্ধন ঘটানোর। আজ আমরা বুঝতে পারছি এই সাম্যবাদী মেলবন্ধনের প্রয়োজন কত সুদূরপ্রসারী। এই সঙ্গেই আমরা নিশ্চয় সিদ্ধান্তে আসতে পারি যে এই ধরনের অন্তঃসলিলার মতো ভাবনা-চিন্তা ও সৃষ্টির ধারা নিয়ে অনেকে কাজ করেছেন। আজ তাই যখন বিভ্রান্তি ও যান্ত্রিকতার দরুন যে ক্ষতি হয়েছে, তা পূরণ করে নেওয়ার জন্য খুঁজে বের করতে হবে ফেলিক্স গ্রিনের বর্তমান উপস্থিতি ও অবস্থিতিকে এবং সেই সঙ্গে এই ধরনের আরো অসংখ্য কর্মীকে এবং তাঁদের সৃষ্টিকে। শরিক করে নিতে হবে এদের সর্বাত্মকভাবে। এই সূত্রেই উপস্থিত করছি আরেকটি দৃষ্টান্ত। এই দৃষ্টান্ত পাবলো নেরুদা।

ঢাকার জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী ১৯৭৯ সালে চিলি তথা লাতিন আমেরিকার সাম্যবাদী মহাকবি পাবলো নেরুদার রচনা নিয়ে 'আত্মস্মৃতি ও কয়েকটি কবিতা' নাম দিয়ে একটি বই প্রকাশ করে। ১৯৮৭তে এর দ্বিতীয় মুদ্রণ বেরিয়েছে। এতে ১৯৭৩ সালে পাবলো নেরুদার মৃত্যুর আগে লিখে রেখে যাওয়া 'আত্মস্মৃতি' এবং 'কাঠুরেরা জেগে উঠুক'-এর কিছু বিখ্যাত কবিতার বাংলা ভাষ্য রয়েছে। আত্মস্মৃতির অনুবাদ করেছেন মোজাম্মেল হোসেন। কবিতার অনুবাদকেরা হলেন শামসুর রাহমান, শহীদ কাদেরী, রফিক আজাদ, মফিদুল হক ও খান মোহাম্মদ ফারাবী।

এখানে আমাদের সাম্যবাদী সমাজতন্ত্রী মেলবন্ধন যে রক্তে বোনা ধানে উৎসারিত রয়েছে, তার দৃষ্টান্ত হিসাবে নেরুদার আত্মস্মৃতি থেকে দুটি উদ্ধৃতি উপস্থিত করছি।

(১) "কমিউনিস্টদের উপর যে বিশ্বাস ও আস্থা স্থাপন করেছে হাজার হাজার শ্রমিক যাদের অধিকাংশই পড়তে-লিখতে জানত না, তা শুরু হয়েছিল লুই এমিলিও রেকাবারেনের নেতৃত্বে, যিনি এই (অর্থাৎ চিলির) দগ্ধ প্রান্তর থেকেই সংগ্রাম শুরু করেছিলেন। উত্তেজনা সৃষ্টিকারী ও পাঁড় নৈরাজ্যবাদী থেকে তিনি একজন রূপকথার নায়কে রূপান্তরিত হয়েছিলেন, এক বিস্ময়কর ব্যক্তিত্বে, যিনি সমগ্র এলাকাকে শ্রমিক ইউনিয়ন ও ফেডারেশনে গেঁথে দিয়েছিলেন এবং ১০টিরও বেশি সংবাদপত্র প্রতিষ্ঠা করেছিলেন প্রধানত তাঁর নবগঠিত সংগঠনগুলোরই সমর্থনে। এবং এসবই করেছিলেন একটি কপর্দক ছাড়া, এইসব সংগঠনেরই মাধ্যমে কিন্তু প্রধানত শ্রমিকদের চাঁদায়।"

(২) ১৯৭০-এর এক সকালবেলায় আমার পার্টির (অর্থাৎ কমিউনিস্ট পার্টির) সাধারণ সম্পাদক ও আরো কয়েকজন কমরেড আমার সাগর তীরের বাসায় দেখা করতে এলেন। আমাকে (চিলির) প্রেসিডেন্ট পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার জন্য তাঁরা প্রস্তাব দিলেন। এছাড়া উপায় ছিল না। সেই মুহূর্তে ঐক্যভিত্তিক কোন বিকল্প ছিল না। আমি

এই প্রস্তাব গ্রহণ করলাম। বিরাট সাড়া পড়ে গেলো—কিন্তু আনন্দপূর্ণ সংবাদ এলো যে খুব সম্ভব আলেন্দে পপুলার ইউনিটি বস্নকের প্রার্থী হবেন। সেই মুহূর্তে আলেন্দের সমর্থনে আমার মনোনয়ন প্রত্যাখ্যান করলাম।"

অবশ্য কমিউনিস্ট পার্টির পূর্ণ সমর্থন পেলেন সমাজতন্ত্রী জননায়ক সালভাদর আলেন্দের পাশে গিয়ে দাঁড়ানোর ব্যাপার। আলেন্দে জয়ী হলেন। ১৯৭৩ সালে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের অনুচর সামরিক চক্র আলেন্দেকে হত্যা করে ক্ষমতা দখল করল। মৃত্যুশয্যাশায়ী কবিকে গৃহবন্দী করল। নেরুদারও মৃত্যু হলো এই '৭৩ সালেই। কিন্তু চিলি আবার সামরিক চক্রের শাসন থেকে মুক্ত হয়েছে সাধারণ নির্বাচনের মাধ্যমে। এমন সময়ে পশ্চিম গোলার্ধে ইউরোপে, প্রতিষ্ঠিত সমাজতন্ত্র বিপর্যয়ে পড়েছে। এখানে একটি সহজ সরল প্রশ্ন, দুটি দশকের মধ্যেই যখন চিলি গা ঝাড়া দিচ্ছে, তখন ইউরোপ উঠে দাঁড়াবে না?

এ মশাল 'নেভে নেভে নেভে না'
(রোমাঁ রলাঁকে জন্মদিনে)

বিশ্ববিশ্রুত অমর ফরাসি মনীষী ও সংগীত ও কথাশিল্পী এবং সেই সঙ্গেই বিশ্ব শান্তি, জাতীয় মুক্তি, গণতান্ত্রিক জোট ও গণরাষ্ট্র ব্যবস্থা, ব্যক্তিস্বাধীনতা ও সমাজতন্ত্রের অতন্দ্র প্রবক্তা রোমাঁ রলাঁর জন্ম ১৮৬৬'র ২৯ শে জানুয়ারি। বেঁচেছিলেন ৭৮ বছর এবং আমৃত্যু পর্ব থেকে পর্বান্তরে বুদ্ধিজীবী ও মেহনতী মানুষের মেলবন্ধনকে সামনে রেখে স্বাধীনতা গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের বিশ্বব্যাপী পতাকাবাহীদের পাশে থেকেছেন। রোমাঁ রলাঁ ছিলেন প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তরকালে ব্রাসেলসে আহূত যুদ্ধ ও সাম্রাজ্যবাদবিরোধী আন্তর্জাতিক সংঘের অন্যতম পুরোধা। তিনি ছিলেন ফ্রান্সে ফ্যাসিবাদী সাম্রাজ্যবাদের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখলের বিরুদ্ধে জনফ্রন্ট বা পিপলস ফ্রন্টের সমাবেশের প্রাণপুরুষ স্বরূপ। রলাঁ ছিলেন আমাদের উপমহাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামীদের অন্তরঙ্গ সুহৃদ ও পরামর্শদাতাদের একজন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি ছিলেন রবীন্দ্রনাথ ও বাংলা সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সৃষ্টি এবং দৃষ্টির বড় রকমের অনুরাগী ও সমঝদার।

আমরা ৯২ এর সূচনার আলো-আঁধারিতে দুই বাংলায় আমাদের একান্ত আপনজন হিসাবে রলাঁর ১২৬তম জন্মদিনে এবারকার ২৯ শে জানুয়ারিকে কেন্দ্র করে সারা পৃথিবীর মুক্তিধারার অপরাজেয় সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতা ও সমাজতন্ত্রের সাধনাকে সামনে রেখে তাঁকে বিশেষভাবে উপস্থিত করছি। আমরা চাই যে, বুদ্ধিজীবী ও মেহনতী জনগণের যে মোর্চার জোরে দেশে দেশে সার্বিক মুক্তিসংগ্রাম বারবার বিপর্যস্ত হয়েও লক্ষ্যপথে এগিয়ে চলেছে, তার সামনে রোমাঁ রলাঁ অন্যতম দিশারী রূপে থাকুন। রলাঁর একই সঙ্গে মানসিকতায় অভিষিক্ত ব্যক্তিস্বাধীনতা ও সংঘশক্তির, ধর্মবোধ ও যুক্তিবাদী মুক্তবুদ্ধির এবং প্রত্যয় ও কর্মকাণ্ডের সম্মেলন সাধনের জনবাদী ধারা বিশ্বজুড়ে অথবা আঞ্চলিকভাবে সমস্ত রকমের সামাজিক রাজনৈতিক আধিব্যধিকে জয় করে সাম্য ও স্বাধীনতার পতাকাকে এগিয়ে নিতে সহায়তা করেছে এবং করবে। এই সূত্রেই সমস্ত প্রগতিবাদী সংগ্রামী মহান রলাঁকে নিয়ে আজ ও আগামীতে যে সব আলাপ-আলোচনা কথাবার্তা হবে, তাতে বিবেচনার জন্য এখানে কিছু কথা রাখছি।

বিশ্বের বর্তমান শতাব্দির অন্যতম শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক ও সুর-সংগীতের শিল্পীভাষ্যকারের একটি বক্তব্য গণউত্থান ও গণচেতনাকে সাময়িক বিপর্যয় ভেদ করে এগিয়ে নিয়ে চলার ক্ষেত্রে বিশেষভাবে বিবেচনার দাবিদার। এই বক্তব্যের দুটি দিক হলো যুক্তি ও বিশ্লেষণের জন্য বুদ্ধিমত্তা প্রয়োগ করতে গিয়ে বাস্তব বাধাবিপত্তি পতন ও বিপর্যয়কে এড়িয়ে না নিয়ে বরং দুঃখবাদী হওয়া শ্রেয়। আরেকটি দিক হলো এই বাস্ত বতাকে জয় করার জন্য চাই ইচ্ছাশক্তির প্রয়োগের ক্ষেত্রে প্রচণ্ড আশাবাদী অবস্থান গ্রহণ। এই বক্তব্যকে অবশ্য রলাঁ তত্ত্ব হিসাবেই শুধু নিরূপিত করেন নি। তিনি গত দুই শতাব্দির দুই মহান গণবিপ্লবের প্রায়শ-বিপর্যয়গ্রস্ত ধারার রূঢ় বাস্তবতার প্রেক্ষিতে একে উপস্থিত করেছেন। এই দুই বিপ্লবের একটি ১৭৮৯-৯৪'এর ফরাসি বিপ্লব, তথা সাম্য স্বাধীনতা ও মৈত্রীর গণতান্ত্রিক গণঅভ্যুত্থান এবং আরেকটি লেনিনের নেতৃত্বে সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক অক্টোবর বিপ্লব।

রলাঁ লিখেছেন, ১৯৮৯-৯৪ এর ফরাসি বিপ্লব নিয়ে গণনাট্যমালার প্রত্যেকটিতেই অর্থাৎ বাস্তিল কারাগার ভাঙার ১৯৮৯'এর জুলাইয়ের গণউত্থান থেকে শুরু করে প্রজাতন্ত্রী গণতান্ত্রিক বিপ্লবের 'অপাপবিদ্ধ' নায়ক রবেসনীয়রের পতন পর্যন্ত প্রত্যেকটি অধ্যায়েই যবনিকা পড়েছে বিয়োগান্তক বাস্তবতার উপস্থাপনে। কিন্তু এই নাট্যমালা হচ্ছে গ্রীক নাটকের বিয়োগান্ত পরিণতির মতোই পরিশোধনের মধ্য দিয়ে নবজীবনের উত্থানের বাণীবাহক। ফরাসি বিপ্লবের ধারা সমস্ত উনিশ শতক জুড়ে এবং পরেও শুধু ইউরোপে নয়, ইউরোপের বাইরে এশিয়া আফ্রিকা লাতিন আমেরিকাতে সাম্য স্বাধীনতা ও মৈত্রীর আদর্শকে দিয়েছে শত সহস্রভাবে গণউত্থানের সার্থকতা। রলাঁ তাই বলেছেন, ফরাসি বিপ্লবের বিশেষ করে ১৭৯৩-এর ঘূর্ণিঝড় টর্নেডো আজও পৃথিবীগ্রহের চারদিকে চক্রাকারে ঘুরছে। প্রখ্যাত হাঙ্গেরীয় মার্কসবাদী তাত্ত্বিক গিওর্গি লুকাচ তাঁর ঐতিহাসিক উপন্যাস গ্রন্থে রলাঁর এই উক্তিটিকে রেখেছেন এই বলে যে, রলাঁর একটি উপন্যাস 'কোলাস ব্রিউগন'র (Colas Breugnon) উপস্থাপনে রলাঁর এই উক্তিটিকে রেখেছেন এই বলে যে, রলাঁর সর্বশেষ গণউপন্যাসের মূল মর্মবাণীটি হলো, জনগণের দিলখোলা দিলদরাজ আশাবাদ কখনো হার মানে না। আমাদের সংক্ষিপ্ত প্রস্তাবনাতে ফরাসি বিপ্লব নিয়ে রলাঁর বিপর্যয়ভেদী আশাবাদের বিস্তারিত ব্যাখ্যায় না গিয়ে এবার দ্বিতীয় বিপ্লব অর্থাৎ সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক অক্টোবর মহাবিপ্লব সম্পর্কে রলাঁর অবস্থানটি উল্লেখ করব।

সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক অক্টোবর মহাবিপ্লব যখন সমস্ত সাম্রাজ্যবাদী শক্তির ঘেরাও এবং হস্তক্ষেপে বিপন্ন তখনই একেবারে শুরুতেই রলাঁ ম্যাক্সিম গোর্কির কাছে পত্র পাঠিয়ে "দুই হাত" বাড়িয়ে সমাজতন্ত্রের প্রথম পরীক্ষাগারে স্বাগত অভিনন্দন জানিয়েছিলেন। এই অভিবাদন ছিল নিঃশর্ত। ফরাসি বিপ্লবের ক্ষেত্রে যে কারণে বিয়োগান্তক পরিণতি ও বিপর্যয় ঘটেছিল তার কথা তুলে তিনি হুশিয়ারিও দিয়েছিলেন। ব্যক্তিস্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের প্রয়োজনের কথাটাও মনে করিয়ে দিয়েছিলেন। তবে যে সাম্রাজ্যবাদীরা সোভিয়েত সমাজতন্ত্রকে উৎখাত করার জন্য উঠেপড়ে লেগেছিল, তাদের বিরুদ্ধে আপোষহীন, দ্ব্যর্থহীন সুস্পষ্ট বক্তব্য রেখেছিলেন। রোমাঁ রলাঁর ভাষায়

সেদিনকার সোভিয়েত সমাজতন্ত্রের নির্মাণের প্রয়াস ছিল যুদ্ধবাজ সাম্রাজ্যবাদীদের শোষণশাসন ও স্বেচ্ছাচারিতার পথে এক প্রচণ্ড প্রতিবন্ধক।

রলাঁ সোভিয়েত সমাজতন্ত্রকে মশালের সঙ্গে তুলনা করে বলেছিলেন, এই মশাল সাম্রাজ্যবাদীদের গোটা পরিকল্পনার পক্ষে অসুবিধাজনক, অন্তরায়। এই অসুবিধাজনক মশালটিকে (Inconvenient torch) নেভানোর জন্য তো হন্যে হয়ে তারা চেষ্টা করবেই। রলাঁ চেয়েছিলেন এই মশালকে যেন কেউ কখনো নেভাতে না পারে।

সুতরাং '৯২-এর সূচনার মুখে বিভিন্ন ঘটনাচক্রে সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের যে আনুষ্ঠানিক বিলুপ্তি ঘটলো সাম্রাজ্যবাদীদের উল্লাসধ্বনির মধ্যে, তখন রলাঁকে স্মরণ করতে গিয়ে আমরা তাঁর ফরাসি বিপ্লবের টর্নেডোর উপমাটিকে মনে রেখে বলবো, রলাঁ যাকে মশাল বলে অভিহিত করেছিলেন, সেই সোভিয়েত সমাজতন্ত্রের গণঅভ্যুত্থানের অবিশ্রান্ত ধারার মধ্য দিয়ে শত সহস্র মশাল জ্বালিয়ে দিয়েছে। সুতরাং সোভিয়েত বিপ্লবের মশাল আজ সাময়িকভাবে চোখের আড়ালে গেলেও একে নির্বাপিত করার প্রচেষ্টা তো আজ আরও হাজারগুণ বেশি সুদূর-পরাহত হয়ে গিয়েছে। গণগীতিকার সত্যেন সেন '৫২-এর ভাষা আন্দোলনের বিদ্রোহকে নিয়ে '৫৫-তে জেলখানায় বসে গান লিখেছিলেন "এ আগুন নিভাইব কেরে, এ আগুন নেভে নেভে না"। আমরা আজ রলাঁর মশালের কথাটিকে স্মরণ করে বলবো, "এ মশাল নেভে নেভে নেভে না। এ মশাল নেভাইব কেরে"।

সুতরাং আজকের সমাজতন্ত্রের ক্ষেত্রে যেসব বিয়োগান্তক ঘটনা ঘটেছে, তাদের বাস্তব বিপর্যয়কে গভীরভাবে তলিয়ে বুঝে নিয়েই তাদের দুঃখগ্রস্ত পরিস্থিতিকে পুরোপুরি বিচার বিবেচনায় রেখেই আমরা রলাঁর বিপর্যয়কে অতিক্রম করার ইচ্ছাশক্তির আশাবাদী নির্দেশনাকে সামনে আনবো।

রোমাঁ রোলাঁকে তাঁর ১২৬তম জন্মদিনে স্মরণ করতে গিয়ে আমরা আজকের একটি বিশেষ প্রসঙ্গকে সামনে এনে আমাদের এই প্রতিবেদনে ছেদ টানবো।

১৯২৬ সালের ফেব্রুয়ারিতে ম্যাক্সিম গোর্কি প্যারিসের 'ইউরোপ' নামের একটি আলেখ্য পাঠিয়েছিলেন। এই সময়টা ছিল এমন যখন গোর্কি রলাঁর জন্মদিনে তাঁকে অভিনন্দনবাণী পাঠানোর জন্য সোভিয়েত ইউনিয়নের লেখক-লেখিকাদের তাগিদ দিতেন। গোর্কি 'ইউরোপ'-এ প্রকাশিত নিবন্ধটিতে লিখেছিলেন, "রোমাঁ রলাঁ সত্যিকার একজন ফরাসির মতোই জেদী ও সাহসী এবং তিনি সত্য সত্যই একজন স্বাধীনচেতা মানুষ। নিজের সত্যবোধের প্রতি গভীর বিশ্বাস থাকার দরুন তিনি লেনিনের মৃত্যুর পরে বস্তাপচা হাটুরে বুদ্ধিজীবীদের বিদ্বেষভরা উল্লাসকে লক্ষ্য করে বক্তব্য নিক্ষেপ করে বলতে পেরেছিলেন, 'লেনিন ছিলেন আমাদের যুগের শ্রেষ্ঠতম সংগ্রামী মানুষ এবং আপন প্রয়োজনের প্রতি সবচেয়ে কম আগ্রহী।"

আজ যখন লেনিনের ভাবমূর্তিকে নষ্ট করার জন্য সাম্রাজ্যবাদীরা এবং তাদের কায়েমি স্বার্থবাদী ধামাধারীরা উঠে পড়ে লেগেছে, তখন লেনিন সম্বন্ধে রলাঁর এবং গোর্কির বক্তব্য অবশ্যই বিশ্বের মুক্তিধারাকে এগিয়ে নিয়ে চলার পথে কাজে লাগবে। জয় রলাঁ।

'অপরাজিত' উপন্যাসে কমিউনিস্ট চরিত্র

বিভূতি বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাস বিশের দশকে লেখা 'পথের পাঁচালী'। এতে প্রধানত বিশ শতকের শুরুর দিকের একই সঙ্গে শাশ্বত ও ভাঙ্গাগড়ার ছোঁয়া লাগা বাংলার পাড়াগাঁর ছবি। এর শিশু কিশোর চরিত্র অপূর্ব কৈশোর থেকে যৌবনে পা দেবার মুখে এবং পূর্ণ যৌবনে প্রধানত কলকাতাকে কেন্দ্র করে যে নিম্নবর্গীয় জীবনের বাস্তবতা ও স্বপ্নের জগতে প্রবেশ করল, সেই সব কিছুকে নিয়ে লেখকের 'অপরাজিত' উপন্যাস রচনা। বিশ শতকের প্রায় মাঝামাঝি সময়ে অর্থাৎ তিরিশের দশকে বসে লিখলেও এই উপন্যাসটিতে এসেছে বিশের দশকের বাংলা উপন্যাস ও ছোট গল্পের কল্লোল ও বঙ্গবাণী পত্রিকার গণউত্থানভিত্তিক ধারায় আলোকিত কলকাতা। দেশ ও পৃথিবীর পৃষ্ঠপট। লেখক বিভূতি বন্দ্যোপাধ্যায় অবশ্য কল্লোলীয় গোষ্ঠীর বাহিরে থেকে ঘরোয়া জীবনের প্রতি বিশেষ মমতা ও সহানুভূতির দৃষ্টি নিয়ে নিম্নবর্গীয় ও বর্গীয়দের জীবননাট্য উপস্থিত করেছেন। অপূর্বের সহপাঠী বন্ধু প্রণবকেও তিনি এই ঘরোয়া জীবনেরই একজন হিসেবে দেখিয়েছেন। উপন্যাসের একেবারে শেষের দিকে যেখানে নায়ক অপূর্ব ঘরোয়া জীবন ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে পড়ে, সেখানে জানা যায়, প্রণব কমিউনিস্ট হয়েছে।

প্রণবের এই কমিউনিস্ট হওয়ার কোন ঘটনাপঞ্জী উপন্যাসটির কোন পর্বেই উল্লেখিত হয়নি। উপন্যাসের সমাপ্তির মুখে নায়ক অপূর্ব পৃথিবী পরিক্রমায় রওনা হবার মুখে বন্ধু ও পরে ঘটনাচক্রে আত্মীয়–প্রণবকে একটি দীর্ঘ চিঠি লিখেছে তার জেলখানার ঠিকানায়। এখানেই জানা যায়, প্রণব এবার কমিউনিস্ট হিসাবে বন্দী। এর আগে সে আটক ছিল একজন স্বদেশি কারাবন্দী হিসাবে। প্রণবের এই দিকটা প্রকাশ পাওয়াতে তাঁর জীবনবৃত্তের একটা আলাদা মাত্রা পাওয়া গেলো, তা নিয়ে অবশ্য অপূর্ব কোন উচ্চবাচ্য করল না তার বিস্তারিত চিঠিতেও। এর কারণটা হয়তো এই যে, চিঠিটা অপূর্ব লিখেছিল আত্মীয়তার দায়দায়িত্বেই প্রধানত।

'অপরাজিত' উপন্যাসের দ্বিতীয় পর্বে যখন অপূর্ব কলকাতায় বসবাস শুরু করেছে এবং প্রথম যৌবনের চোখে সবকিছু রঙ্গীন করে দেখলেও জীবিকার ব্যাপারে একা একা ভেসে বেড়াচ্ছে, তখন প্রণবের সঙ্গে দেখা। প্রণব তাকে নিয়ে গেলো প্রথমে প্রণবের মামাতো বোন অপর্ণার বিয়েতে। সেখানে বিয়ের আসরে বর এলে দেখা গেলো সে যেমন মূর্খ তেমনি পাগলাটে। ঘটকদের ছলনা ধরা পড়ে গেল। বিয়ে ভেঙ্গে যাবার পরে সেই রাতেই বিবাহ-আসরে অপূর্ব অপর্ণার পাণিগ্রহণ করল। তারপর অপূর্ব কলকাতায় এসে সংসার পাতল। উপন্যাস ভরপুর হয়ে উঠলো কলকাতার এক জনবহুল পাড়ার এই অল্পবয়সী দম্পতির সংসার মাধুর্যে। প্রণব এই জীবনবৃত্তে নেই। অপূর্বের জীবনবৃত্তে এলো নবজাতকের বার্তা এবং সেই সঙ্গে গ্রামের বাড়িতে অন্তঃসত্তা অপর্ণার যাত্রা ও মৃত্যু। এর ফলে যে তোলপাড় এলো অপূর্বের জীবনে, তারই ধারায় শুরু হলো তার যৌবনের পথের পাঁচালী। আবার সে চলল অজানাকে জানতে। অপরিচিতের পরিচয় পেতে।

এই ধরনের ঘটনাধারা ও তার গতিপরিণতিতে প্রণয়ের কাহিনি আশা করা যায় না। সুতরাং প্রণবের কমিউনিস্ট হওয়া কিংবা কমিউনিজম বা সাম্যবাদী চিন্তাভাবনা না আসায় এই উপন্যাসের মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যাওয়ার কথা নয়। বস্তুতপক্ষে 'অপরাজিত' উপন্যাস নিয়ে চল্লিশের দশকে বিশেষ করে বইটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠ্য হবার পরেও যেসব কথাবার্তা হয়েছে, তাতে এই প্রসঙ্গটি উত্থাপিতই হয়নি। এমনকি সত্যজিৎ রায় যে 'অপুর সংসার' নাম দিয়ে ছবি করেছেন প্রণব ও অপূর্বকে অন্তরঙ্গভাবে দেখিয়ে, সেখানেও প্রণবের এই দিকটা আসেনি এবং এই না আসা নিয়েও কেউ কোন প্রশ্ন করেননি। আমরা চল্লিশের দশকের প্রগতি লেখক-লেখিকাদের সৃষ্টি নিয়ে হৈচৈ করেছি। টেনে এনেছি বিশ ও তিরিশের দশকের কল্লোলীর ধারক বাহক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপ্যাধ্যায় ও মানিক বন্দ্যোপ্যাধ্যায়কে বাংলা উপন্যাসে কমিউনিস্ট চরিত্রকে বড় করে দেখাবার শিল্পী হিসাবে। আমাদের নিরীক্ষাতেও টেনে আনতে চেষ্টা করেছি বুদ্ধদেব বসুকে আমাদের সাথী হিসাবে। কিন্তু বিভূতি বন্দ্যোপাধ্যায়কে এই আমরাও আমাদের মধ্যে ডাকিনি। 'অপরাজিত' উপন্যাসে প্রণবের কমিউনিস্ট হওয়ার ব্যাপারটা নিয়ে তাই আমাদের তরফ থেকে খোঁড়াখুঁড়ি হয়নি।

আমাদের তরফ থেকে 'অপরাজিত' উপন্যাসকে কিংবা এর লেখককে আমাদের বৃত্তে না আনাটা যে আমাদের চিন্তাভাবনা ও কর্মধারার একটা শূন্যতা ঘটিয়েছে, এটা খেয়ালে আসেনি 'আরণ্যক' কিংবা 'অশনি সংকেত' উপন্যাস দুটি পেয়েও।

সত্তরের দশকের শেষের দিকে বিভূতি বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবনের একটা পর্বের কথা জানতে পেরে ফিরে যেতে হলো 'অপরাজিত' উপন্যাসে এবং প্রণবের কমিউনিস্ট হবার উল্লেখের সূত্র সন্ধানে। খবরটা হলো এই যে, মীরাট ষড়যন্ত্র মামলার অন্যতম অভিযুক্ত রাধারমণ মিত্র এবং বিভূতি বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন সহপাঠী ও অন্তরঙ্গ বন্ধু। তারা একবার দুজনে মিলে হাওড়ায় শরৎচন্দ্রকে দেখতে গিয়েছিলেন। ঘরোয়া বৈঠকে বসে রাধারমণ দা অবশ্য ১৯২৯-৩০ সালে জেলখানায় বসে 'পথের পাঁচালী' বইটি পড়ার গল্প শুনিয়েছিলেন। সেই সময়ে একটা যেন বড়রকমের বিদ্যুৎ-ঝলকে মনে পড়ে গিয়েছিল প্রণবের কমিউনিস্ট হওয়ার উল্লেখটি। মনে হয়েছিল, বন্দীর ঠিকানাটাও ছিল মীরাট জেল। 'অপরাজিত' বইটি জোগাড় করে অবশ্য দেখলাম, প্রণব কমিউনিস্ট হচ্ছে, সে কথা আছে, কিন্তু ঠিকানাটা নয়। মীরাট তবু মনে হলো, প্রণবের কমিউনিস্ট হওয়ার খবরটা নতুন প্রজন্মকে জানানো দরকার এবং এই সূত্রে 'অপরাজিত' উপন্যাস এবং সেই সঙ্গে অন্যান্য লেখাকেও নতুন করে দেখা দরকার।

সত্তরের দশকের শেষের দিকে কলকাতার 'সাহিত্য চিন্তায়' বিষয়টিকে লোকচক্ষে আনতে চেষ্টা করি। '৯৩ তে কিছুটা ঘষামাজা করে আবার উপস্থিত করছি। বিভূতি বন্দ্যোপাধ্যায়কে আমাদের মার্কসীয় আলোকে নতুন করে বুঝে নেবার জন্য দৃষ্টি আকর্ষক প্রস্তাবটি আরেকটি সূত্রে নতুন প্রজন্মের কৌতূহলের দাবিদার হতে পারে। সেটা এই যে, '৯২-এর শেষের দিকে সত্যজিৎ রায়ের 'পথের পাঁচালী' ছবি তৈরির কাহিনি জানাতে গিয়ে শ্রদ্ধেয় গোপাল হালদার জানিয়েছেন যে, তিনি ছিলেন 'পথের পাঁচালী' উপন্যাসের প্রথম প্রকাশক। বিভূতি বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিশের দশকের জীবনবৃত্তে একটা নতুন মাত্রা যোগ করার মতো খবর নয় কি এটা? এবং সেই সঙ্গে নিরীক্ষাতেও?

॥ ২ ॥

প্রস্তাবনাটিকে এখানে অবশ্য 'অপরাজিত' উপন্যাসেই নিবদ্ধ রেখে খতিয়ে দেখবো।

এই উপন্যাসটির 'বিংশ' ও 'ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদে লেখক তাঁর নায়কের চিন্তার এমন কতকগুলো মতামত বা সিদ্ধান্তকে সহজ সরল ভাবে উপস্থিত করেছেন সেগুলোকে বিশ শতকের বিশের দশকে বাংলার রাজনৈতিক কর্মীরা 'স্বাধীনতার স্বরূপ' নাম দিয়ে মজুর কৃষকদের সংগঠন গড়ার ভাবনাচিন্তায় পরিষ্কার করে নিচ্ছিল। অর্থাৎ সাম্যবাদী বা কমিউনিস্ট বা সমাজতন্ত্রী চিন্তাভাবনাগুলি আসছিল এই কর্মীদের বাস্তব আবহ এবং চরিত্র ও অভিজ্ঞতা থেকে। অপূর্বের মতামত ও সিদ্ধান্তগুলিও, দেখা যাবে, তার নিজ জীবনের অভিজ্ঞতা এবং তার মানবিকতাবাদী চরিত্র থেকে উৎসারিত হয়েছে। এরা অপু চরিত্রেরই উদ্‌ঘাটন।

অপূর্বের কৈশোর ও যৌবনে জিজ্ঞাসার সঙ্গে এদের পারম্পর্য রয়েছে। আবার এরা নিজের মধ্যে নিবদ্ধও নয়। শুধু তাই নয়। উপরিউক্ত দুটি পরিচ্ছেদ পড়ার পরে মনে হয়, অপূর্ব কমিউনিস্ট হয়ে যেতে পারত। উপন্যাসের লেখক তাকেও অসম্পূর্ণ রেখে দিয়েছেন।

বিংশ পরিচ্ছেদে অপু যা ভেবেছে তা নিম্নরূপ :

"দুখের নিশীথে তার প্রাণের আকাশে সত্যের যে নক্ষত্ররাজি উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে—তাকে লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়া যাইবে। জীবনকে সে কিভাবে দেখিল তাহা লিখিয়া রাখিয়া যাইবে—

নিজের প্রথম বইখানির দিনে দিনে প্রবর্ধমান পাণ্ডুলিপিকে সে সস্নেহ প্রতীক্ষার চোখে দেখে-বইয়ের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কত কথা তাহার আগ্রহভরা বক্ষ স্পন্দনে আশা, আনন্দের সংগীত জানায়-মা যেমন শিশুকে চোখের সম্মুখে কান্নাহাসির মধ্য দিয়া বাড়িতে দেখেন, দুরু দুরু বক্ষে তাহার ভবিষ্যতের কথা ভাবেন-তেমনি।

বই লেখার কষ্টটুকু করার চেয়ে বইয়ের কথা ভাবিতে ভাল লাগে। কাদের কথা বইতে লেখা থাকিবে? কত লোকের কথা। গরীবের কথা। ওদের কথা ছাড়া লিখিতে ইচ্ছা হয় না।

পথে, ঘাটে, হাটে, গ্রামে, শহরে, রেলে কত অদ্ভুত ধরনের লোকের সঙ্গে পরিচয় ঘটিয়াছে জীবন-কত সাধু সন্ন্যাসী, দোকানী, মাস্টার, ভিখারী, গায়ক, পুতুল নাচওয়ালা, আম পাড়নি, ফেরিওয়ালা, লেখক, কবি, ছেলেমেয়ে-ওদের কথা।"

'ত্রয়োবিংশ' পরিচ্ছেদে দেখা যায়, অপূর্বের উপন্যাসের দ্বিতীয় সংস্করণও বেরিয়ে গিয়েছে। লেখক হিসাবে সে সাফল্যের তোরণে উপনীত। প্রকাশকের কাছ থেকে দ্বিতীয় সংস্করণ বাবদ টাকা পেয়ে রাস্তায় শিশুদের সরবৎ খাইয়েছে। এখানেও তার চিন্তা নিজেকে স্বপ্নাচ্ছন্ন করে রাখা নিয়ে নয় এবং লেখা শুধু জীবনের সত্যতার ছবি আঁকা নয়। একটা বৈপ্লবিক বোধ তার মনে কাজ করেছে। এই বোধ বিশ্বমানবতার বোধ। এই পরিচ্ছেদটিতে তাই দেখি: "বাসায় ফিরিয়া তাহার মনে হইল, বড় সাহিত্যের মূলে এই মনোবেদনা। ১৮৬৩ সাল পর্যন্ত রাশিয়ার প্রজাস্বত্ব আইন, সার্ফনীতি। জারশাসিত রাশিয়ার সাইবেরিয়া, শীত, অত্যাচার, কুসংস্কার, দারিদ্র্য- গোগোল, টলস্টয় ডস্টয়েভ্স্কি, গোর্কি ও চেকভের সাহিত্য সম্ভব করিয়াছে। ... সে

যেন কল্পনা করিতে পারে, দাস ব্যবসায়ের দুর্দিনে, আফ্রিকার এক মরুবেষ্টিত পল্লীকুটির হইতে কোমলবয়স্ক এক নিগ্রো বালক পিতামাতার স্নেহকোল হইতে নিষ্ঠুরভাবে বিচ্যুত হইয়া কত দূর বিদেশের দাসের হাটে ক্রীতদাসরূপে বিক্রীত হইল, কতকাল আর সে বাবা-মাকে দেখিল না, ভাই-বোনদের দেখিল না, দেশে দেশে তাহার অভিনব জীবনধারার দৈন্য অত্যাচার ও গোপন আক্রমণের কাহিনি, তাহার জীবনের সে অপূর্ব ভাবানুভূতির অভিজ্ঞতার কথা সে যদি লিখিয়া যাইতে পারিত। আফ্রিকার নীরব নৈশ আকাশ তাহাকে প্রেরণা দিত, তাম্রবর্ণ মরুদিগন্তের স্বপ্নমায়া তাহার চোখে আগুন মাখাইয়া দিত; কিন্তু বিশ্বসাহিত্যের দুর্ভাগ্য, তাহারা নীরবে অত্যাচার সহ্য করিয়া বিদায় লইল"।

অপূর্বের উপরিউক্ত চিন্তাধারার মধ্যে তিনটি নির্দেশক পাওয়া যেতে পারে। প্রথমত, রুশ সাহিত্যকে সে সামাজিক ও রাজনৈতিক বিদ্রোহের রূপাভাস বলে মনে করেছে। দ্বিতীয়ত, অপূর্ব আফ্রিকার গভীর বেদনাকে প্রত্যক্ষ করেছে। তৃতীয় আফ্রিকার প্রসঙ্গে সে বলেছে, "আফ্রিকার তাম্রবর্ণ মরুদিগন্তের স্বপ্নমায়া তাহার চোখে আগুন মাখাইয়া দিত"।

বিভূতি বন্দ্যোপাধ্যায় যখন 'অপরাজিত' উপন্যাস লিখেছেন, উপরিউক্ত তিনটি বিষয়ই বাংলা উপন্যাস ও কাব্যের প্রাণের উপকরণ। বিভূতি বন্দ্যোপাধায় এই তিনটি বিষয় বিস্তারিত বিন্যাসে যাননি, কিন্তু একটি মাত্র পংক্তিতে যেমন করে চোখে আগুন মাখিয়ে দেবার কথা বলেছেন, তেমনভাবে সাধারণভাবে সেই সময়ে এত কঠোর ভাষায় শোষণের বিরুদ্ধে খুব বেশি লেখা হয়েছে কী? তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি, বিভূতি বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর দ্বিতীয় উপন্যাস 'অপরাজিত' লিখেছেন সেই জীবনের সত্যকে নিয়ে যেখান থেকে আমাদের সেদিনকার বাংলা ও সারা উপমহাদেশের বিপ্লবী উত্থানের বোধও বেরিয়ে এসেছিল, স্বদেশি ও সাম্যবাদী তথা কমিউনিস্ট ও স্বদেশি কমিউনিস্ট চরিত্র ও সংগ্রামশীলতা লেখক লেখিকাদের কাছ থেকে আলেখ্য দাবি করেছিল। বিভূতি বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর বন্ধু রাধারমণ মিত্রের মত প্রত্যক্ষ রাজনীতি না করলেও বলেন নি, 'এ ব্যাপারে মুখ খুলবো না, মুখ খুললে প্রত্যক্ষ রাজনীতি হয়ে যাবে'। এবং তিনি অপূর্বের চিন্তাধারাকে সোজাসুজি ভাষা দিয়েছেন জেনে বুঝেই যে, 'যদি কেউ কমিউনিস্ট মনে করে তাঁকে, করুক'।

সুতরাং, আমরা এবার একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছুতে পারি। প্রণবের স্বদেশি বা কমিউনিস্ট হওয়া নিয়ে কোনরকমের ব্যাখ্যায় না গেলেও বিভূতি বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর নায়কের সামান্য শ্রমজীবী ও লোকমুখী চিন্তাভাবনাতে কমিউনিজমের সহজ বাস্তবতাজাত ভাবনাগুলিকে কোথাও মৃদু এবং কোথাওবা দরকার মত প্রবল স্বরে সোচ্চার করেছেন। অবশ্য ততটুকুই, যতটুকু বিশ শতকের বিশের দশকে আমাদের উপমহাদেশে কিংবা আফ্রিকাতেও গণউত্থানের ভাষায় নজরুলী ধারায় কমিউনিস্টরা বলতে পেরেছিল। সমাজের নিম্নবর্গীয়দের ঘরভাঙ্গা ঝড়জলের রাতের আকাশে হাউই বাজির মত ছুটে ছুটে বেরিয়ে আশা চেতনার আলোকমালাই ছিল এই কমিউনিজমের মর্ম। এই মূলমর্মই মিল খুঁজে পেয়েছিল সেই সময়ের আন্তর্জাতিক বিপ্লবী মুক্তিসংগ্রামী মতামত বিনিময়ের মধ্যে দিয়ে গড়ে ওঠা মার্কসীয় চিন্তাভাবনার নানা ধরনের ঘোষণার সঙ্গে। সেদিন

আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামীদের মধ্যে যারা দীপান্তরে কিংবা দীর্ঘমেয়াদী কারাগারে আটক হয়েছিলেন, তাদের ভবিষ্যতের পথের সন্ধানে এবং কারাগারের বাইরে শ্রমিক ও কৃষকদের সংগঠন গড়ার প্রয়াসের মধ্য দিয়ে শুরু হয়েছিল মার্কসীয় সূত্রের সত্যতা চাই। শুরু হয়েছিল তাত্ত্বিক তর্কবিতর্ক। এবং সেই সঙ্গেই কাব্যে উপন্যাসে নাটকে স্বাধীনতা ও সাম্যের জন্য বিপ্লবী লোকউত্থানের উদ্ভাস। বিভূতি বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'অপরাজিত' উপন্যাস এর সাক্ষী।

॥ ৩ ॥

'অপরাজিত' উপন্যাসটিকে আমাদের চোখের সামনে রেখে আমরা এর মৌলিকতাটিকে বুঝতে চেষ্টা করছি এখানে সমসাময়িক অন্যদের কিছু কাজের পাশাপাশি।

বিশের দশকে উদাত্তকণ্ঠী সাম্যবাদী কাজী নজরুল ইসলামের 'মৃত্যুমুখী' উপন্যাসে যৌবন সন্ধান করছে নিম্নবর্গীয় দারিদ্র্যের রূঢ় বাস্তবতার মধ্যে নিজেকে একাত্ম করে সমস্ত সামাজিক কাঠামোটাকে বদলাবার দুরূহ পথের। চটকল শ্রমিকদের চোখের সামনে রেখে রবীন্দ্রনাথ লেখেন 'রক্তকরবী' নাটক পুঁজিবাদী ব্যবস্থার বিরুদ্ধে খোলাখুলি ডাক দিয়ে এই ব্যবস্থার একটা সামগ্রিক শ্রেণিভিত্তিক চেহারাকে তাত্ত্বিক বিতর্কের মারফত উন্মোচিত করে। শরৎচন্দ্রের 'পথের দাবি' উপন্যাসও শ্রমিকভিত্তিক বিপ্লবের আবাহন। নায়ক ডাক্তার সব্যসাচী স্বাধীনতা সংগ্রামী, বিশের দশকের শুরুর দিকের সাম্যবাদী আন্তর্জাতিকের তাত্ত্বিকদের বক্তব্যকে সামনে এনেছেন। প্রেমেন্দ্র মিত্রর 'পাঁচক' উপন্যাসটিকে বলা যেতে পারে বাংলা কথাসাহিত্যে জেনে হোক না জেনে হোক সমাজতন্ত্রী বাস্তবতাবাদের প্রয়াস। এই আবহে রাধারমণ মিত্রর প্রিয় বন্ধু বিভূতি বন্দ্যোপাধ্যায় 'পথের পাঁচালী' লেখা শুরু করেন গ্রামের গরিব মানুষকে নিয়ে। এই 'পথের পাঁচালী'র সর্বসাধারণমুখী মন নিয়ে তিনি উত্তীর্ণ হয়েছিলেন তিরিশের দশকে 'অপরাজিত' উপন্যাসে। এই তিরিশের দশকে মার্কসীয় সাম্যবাদী সংজ্ঞা ও সূত্রগুলি স্বাধীনতা সংগ্রামীদের কৃষক-মজুর সংগঠন গড়ার অভিজ্ঞতার মধ্যে পরীক্ষিত ও নিরীক্ষিত হচ্ছিল। দৃষ্টান্ত তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'গণদেবতা' এবং মানিক বন্দোপাধ্যায়ের 'শহরতলী', যথাক্রমে গ্রামাঞ্চল ও মহানগরীর প্রেক্ষাপটে। বিভূতি বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'অপরাজিত' উপন্যাসেও ঐ ধারা সংক্রামিত হয়েছে। তবে একথাও সত্য যে তিনি সহজিয়া শান্ত স্বাভাবিকতাবাদী ধারার লেখক এবং সেটা আগাগোড়া।

বাংলাদেশে 'নয় এ মধুর খেলার' রচয়িত্রীরা

প্রথমে দুজনের কথা। বেগম সুফিয়া কামাল ও বেগম জাহানারা ইমাম। প্রথম জন ৯২ সালে ৮২ তে পা দিয়েছেন। দ্বিতীয় জন সত্তরের কাছাকাছি পৌঁছেছেন। এই দুই প্রবীণা বাংলাদেশের বর্তমান গণতান্ত্রিক বিপ্লবের অভিভাবিকারূপে বিবেচিতা। বেগম সুফিয়া কামাল বিশের দশক থেকেই বিশিষ্টা কবি। বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের শিষ্যা ও রবীন্দ্রনাথের স্নেহধন্যা সুফিয়া কামাল বরাবরই প্রগতিবাদিনী। দেশ ভাগের পরে কলকাতা থেকে ঢাকা। যে মুক্তিধারায় স্বাধীন গণপ্রজাতান্ত্রিক বাংলাদেশের

উদ্ভব ঘটলো, তার সঙ্গে আপন চিন্তাভাবনা ও নারী সমাজের অন্তরঙ্গতা ও একাত্মতা প্রকাশের সহজ সরল বাণীরূপ নিয়ে গড়ে উঠেছে তাঁর কবিতার জগৎ। সাধারণভাবে মমতাময়ী জননীস্বরূপ সুফিয়া কামাল কোন সময়েই কঠোরভাষিণী না হলেও মুক্তি সংগ্রামের ধাপে ধাপে পুরোভাগে থেকে বিপ্লবের চারনীতি–জাতীয়তা, গণতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা ও সমাজতন্ত্রের সমন্বিত চিন্তার তথা নারী পুরুষ নির্বিশেষে সর্বজনের সর্বাত্মক স্বাধীনতার কবি হয়ে উঠেছেন। সঙ্গে সঙ্গে একাত্তরের আগে ও পরে জনতার প্রতিটি উত্থানের পুরোভাগে এসে দাঁড়িয়েছেন। সঙ্গে চলেছেন। বাংলাদেশের মহিলা সমাজ যে ৬৯-৭১ সালে অবরোধ ভেঙ্গে গ্রামাঞ্চলে ও শহরে নগরীতে পথে প্রান্তরে লাখে লাখে সমাবেশে মিছিলে যোগ দিয়েছে, তাতে দিশারী তারা রূপে প্রতিভাত রয়েছেন বেগম সুফিয়া কামাল। বেগম রোকেয়ার অনুরাগিনী তিনি আধুনিক শিক্ষায় নিজে যেমন এগিয়েছেন, তেমনি নারী সমাজকে ডাক দিয়েছেন। বেশ কয়েকটি সন্তানের জননী তিনি, কাজ করেছেন গঠনমূলক ও বিপ্লবাত্মক উভয় ধারাতেই। যুক্ত করেছেন তিনি আন্তর্জাতিক সমাজতান্ত্রিক ধারার সঙ্গেও। অসমসাহসিকা এই মহিলার হাতে রয়েছে বাংলাদেশের নারী আন্দোলনের বিদ্রোহী পতাকা। ১৯৮৮তে প্রকাশিত তাঁর 'একাত্তরের ডায়েরী'র সংক্ষিপ্ত তথ্য-ছবিগুলি একাত্তরের মহাবিদ্রোহের গভীর বাণী ভাষ্যরচনার কাজ করবে। একাত্তরের শহীদদের উদ্দেশ্যে নিবেদিত এই ১০৭ পৃষ্ঠার বইটির লেখিকার নিজেরই ভূমিকার নাম 'ভূমিকা নয়, রক্তে লেখা শোক।'

বেগম জাহানারা ইমাম '৪৬-এ কলকাতায় লেডি ব্রাবে কলেজের ছাত্রী ছিলেন। রংপুরের মেয়ে জাহানারা ইমাম দেশ ভাগের পরে পূর্ব বাংলায় চলে যান এবং বিবাহিত সাংসারিক জীবনযাপন করেন স্কুলশিক্ষয়িত্রীর কাজের পাশাপাশি। এই অবস্থান থেকেই বেগম জাহানার ইমাম বর্তমানে বাংলাদেশে গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার ও তার পূর্ণ প্রতিষ্ঠার বিপুল ও ব্যাপক গণউত্থানের জনমাতা পতাকাবাহিনীরূপে সামনে এসে গিয়েছেন। জাহানারা ইমাম একাত্তরের তরুণ শহীদ মুক্তিযোদ্ধা 'রুমীর আম্মা' নামে খ্যাতা ও আদৃতা। গত দুই দশকে এই খ্যাতি ও আদর দুদিক দিয়ে বিস্তার ও গভীরতা পেয়েছে। প্রথমত তিনি বাংলাদেশের ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ প্রত্যক্ষ রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে মনেপ্রাণে শরিক। এক্ষেত্রে তাঁর শান্ত, সাহসী ও সুদৃঢ় মতামত বিপ্লবের কর্মসূচির প্রেক্ষিত রক্ষায় ও বাস্তবায়নে বড় ভূমিকা পালন করছে। বেগম সুফিয়া কামালের মতোই জাহানারা ইমাম নারী পুরুষ নির্বিশেষে বিপ্লবী ঐক্যজোটের দেশব্যাপী বিশাল সমাবেশগুলির সভানেত্রীরূপে আমন্ত্রিতা! দ্বিতীয় জাহানারা ইমাম বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের এবং সাধারণভাবে গণতান্ত্রিক বিপ্লবের নীতিসূত্রগুলির দিকদর্শিকা লেখিকা হয়ে উঠেছেন। তাঁর একটি উপন্যাসের নাম 'নয় এ মধুর খেলা'। এই নামটি আমরা আমাদের লেখাটির শিরোনামে এনেছি। তাঁর 'একাত্তরের দিনগুলি', 'বিদায় দে মা ঘুরে আসি' এবং ৯১-৯২তে ঢাকার 'অধুনা' পত্রিকাতে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত আত্মকথা 'জীবনের স্রোত বহে নিরবধি' বিশেষ করে নিরীক্ষাধর্মী ভাষ্যরচনার ক্ষেত্রে তাঁকে ষাট থেকে সত্তরে এগিয়ে চলা বয়সে বাংলাদেশের জবরদস্ত প্রথম সারির সম্ভাবনাময়ী বিদ্রোহিনী লেখিকারূপে উদ্ভাসিত করেছে। প্রকৃতপক্ষে জাহানারা ইমাম বেগম সুফিয়া কামালের মতোই সুকান্তের ভাষায় কঠিন কঠোর গদ্যের শিল্পী হয়ে উঠেছেন। দুজনেই

তাঁদের নারীত্ব নিয়েই নারীসমাজের সমস্ত রকমের বিদ্রোহের পতাকা হাতে বাংলাদেশের বিশেষ করে বাহান্নোত্তর সাহিত্যধারার পরিশ্রমী কর্মী।

এই ধরনের 'কঠিন কঠোর গদ্য' লেখার ব্যাপারটা বাংলাদেশে প্রবীণদের মধ্যেই সীমিত থাকেনি, বেশ কয়েকজন নবীনা লেখিকার কাজেও বিপ্লবাত্মকভাবেই প্রকাশ পেয়েছে। বাংলাদেশের সাহিত্য কর্মীদের মধ্যে নারীর সংখ্যা পুরুষের পিছনে থাকেনি। কাব্যে উপন্যাসে ছোটগল্প নাটকে বড় বড় কাজ করেছেন নারী। এর মূলেও রয়েছে বাংলাদেশের মুক্তিধারা, অবিশ্রান্ত গণউত্থানে মুক্তিযুদ্ধে বিপ্লবের সাধারণ অভিশাপকে নারীসমাজ 'একান্ত আপন' করেছে। আমরা এখানে সাহিত্যের অন্যান্য ধারার মধ্যে না নিয়ে নিরীক্ষাধর্মী লেখাগুলিকে সামনে আনছি। স্বভাবতই একটা অসমাপ্ত বিপ্লবের সমস্ত রকমের অস্থিরতা কোন কোন নবীনা লেখিকার কাজে প্রবল বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটিয়েছে। বাংলাদেশের বিপ্লবের আনুপার্বিক ভাঙ্গাগড়ায় যুক্ত হয়েছে বহুস্তরের বহুমতের অনুসারিনী ও অনুসারীরা। বিপ্লব এখনও চলছে সম্ভাব্যতার নানা অনিশ্চয়তার মধ্য দিয়ে। সুতরাং, বাংলাদেশকে এবং সেই সঙ্গে বাংলাদেশের বাইরের বিভিন্ন দেশ-দেশান্তরকে এই নবীনা লেখিকাদের আগামী দিনের কাজগুলির জন্য।

আমরা এবার এই নবীনাদের কাজের কিছু পরিচয় দেবো।

॥ ২ ॥

এই পর্যায়টির এক নবীনতমার প্রসঙ্গ দিয়েই পরিচিতি শুরু করা যাক।

এই নবীনা তসলিমা নাসরিন। তিনি এই '৯২ তে কলকাতার একটি বিশিষ্ট সাহিত্য পুরস্কারে ভূষিতা হয়েছেন এবং সেইসূত্রেও 'নির্বাচিত কলাম' নামের বইএর লেখিকারূপে পশ্চিম বাংলাতেও ঝড় তুলেছেন। ইতোমধ্যে প্রচুর প্রশংসা কুড়িয়েছেন এবং সঙ্গে সঙ্গেই ধর্মীয় মৌলবাদের আক্রোশের পাশাপাশি নৈতিকতার মাপকাঠি দিয়ে বিচারের ক্ষেত্রে ধিকৃতা হয়েছেন। পশ্চিম বাংলার নামী দামী কাগজে এই সমস্ত মিশ্রিত সূত্রেই তাঁর ছবি তাঁকে প্রায় রাতারাতি নিয়ে গিয়েছে দূর গ্রামাঞ্চলেও। তাঁর পক্ষে ও বিপক্ষে বক্তব্য শোনা যাচ্ছে অপ্রত্যাশিতভাবে। তিনি এক কথায় আধুনিক নারীর একুশ শতকের মুখে ব্যক্তিক বিদ্রোহের এক প্রতিভূ হয়ে দাঁড়িয়েছেন দুই বাংলাতেই।

আমরা তাঁর ঢাকা এবং কলকাতা থেকে প্রকাশিত বইটি পেয়েছি এবং আগ্রহ নিয়েই পড়েছি। এই বই সম্বন্ধে আমাদের সংক্ষিপ্ত বক্তব্যের শুরুতেই বলবো যে 'নির্বাচিত কলাম' এবং এর সাহসিকা লেখিকা বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের তথ্যসমগ্র বিপ্লবের নারী উত্থানের কাছ থেকেই ছাড়পত্র নিয়ে উপস্থিত। এই সূত্রেই সমগ্র বিপ্লবের চার নীতি তথা জাতীয়তা, গণতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা ও সমাজতন্ত্রের কঠিন কঠোর গদ্য-ভাষ্য রচয়িত্রী হিসাবেও তসলিমা নাসরিন দাবিদার হলে সে দাবি মেনে নিতে হবে। এই দিকটি ইতোমধ্যে দুই বাংলাতে এবং বিশেষ করে পশ্চিম বাংলায় তসলিমা-প্রসঙ্গ বিচারে সামনে আসেনি। দ্বিতীয়ত, বাংলাদেশের বিপ্লবে নারীসমাজের ঐতিহাসিক ভূমিকা ও অবদান পশ্চিমবঙ্গে তেমন জানা না থাকায় এবং প্রবীণা ও নবীনা–'নয় এ মধুর খেলা'র নিরীক্ষাধর্মী লেখিকাদের বড় মাত্রায় কাজের প্রসঙ্গ একেবারেই বাদপড়ায় তসলিমা নাসরিনকে নারী উত্থানের বিদ্রোহী প্রস্তাবনাতে একাকিনী বলে চিহ্নিত করা হয়েছে।

এই দিকটাকে সামনে রেখেই আমরা 'নির্বাচিত কলাম' ও তার রচয়িত্রীকে বাংলাদেশের সমগ্র জনগণের ও সেইসঙ্গে তাঁদের অবিচ্ছেদ্য অংশ নারীসমাজের গণতান্ত্রিক বিপ্লবযাত্রার মাঝখানে রেখে বিচার করছি। ঢাকা থেকে 'নির্বাচিত কলাম' নাম দিয়ে যে বইটি বেরিয়েছে, সেটি পুরুষবিরোধী বক্তব্যে তথা মেজাজে ও ঝাঁজে বিচ্ছিন্নতাবাদী বলে প্রতিপন্ন হতে পারে, যদি সমস্ত বর্ণিত ঘটনা ও মন্তব্যকে মুক্তিযুদ্ধের আবহ এবং এই আবহে গড়া তসলিমার মনোজগৎ থেকে সরিয়ে রেখে বিচার করি। কিন্তু 'যাবো না কেন? যাবো' নামের যে বইটিকে যুক্ত করে কলকাতা থেকে 'নির্বাচিত কলাম' বেরিয়েছে তাতে একদিকে যেমন মুক্তিযুদ্ধের বিষয়টিকে হৃদয়গ্রাহী করে উপস্থিত করা হয়েছে, তেমনি তসলিমার আজও পর্যন্ত গড়ে উঠা সমগ্র মনোজগৎ জোরালোভাবে সামনে এসে গিয়েছে। এখানে তসলিমা নাসরিন চিন্তা-ভাবনাকে গুছিয়ে লেখার ব্যাপারে বেশ খানিকটা আত্মস্থ। দৃষ্টান্ত হিসাবে বলা যেতে পারে, ঢাকা থেকে প্রকাশিত 'নির্বাচিত কলাম' বইটিতে লেনিনের অনুসারী কমিউনিস্টদের যে উল্লেখ রয়েছে, তাতে কমিউনিস্টদের পুরুষ হিসাবে দেখিয়ে নারীদের ভালমন্দের প্রতি উদাসীন বলে ধিক্কার দেয়া হয়েছে। উনিশ শতকের জার্মান সমাজতান্ত্রিক দলকে নারীর ভোটাধিকার বিরোধী বলে উপস্থিত করা হয়েছে। কিন্তু কলকাতা থেকে প্রকাশিত 'নির্বাচিত কলাম' বইটিতে 'যাবো না কেন? যাবো' কে যুক্ত করে যে সার্বিক বা পরিপূরক বক্তব্য উপস্থিত করা হয়েছে, তাতে '৯০-৯১-এর সমাজতন্ত্রের সংকট ও লেনিনের অবমাননার এক বিস্ময়কর আবেগময় প্রস্তাবনা বেরিয়ে এসেছে লেখিকার কলম থেকে। এ ধরনের বক্তব্যকে হঠাৎ আলোর ঝলকানি বলে মনে করে নিলে ভুল হবে। এই কলামটিতে তসলিমা নাসরিন সোভিয়েত সমাজতন্ত্রের পতন ও লেনিনের মূর্তি ভাঙ্গার ঘটনায় শোকাহত মস্তক অবনত করেছেন। এইভাবে শোক জানাবার মধ্যদিয়ে এই বিদ্রোহিনীর মাথা সারা বিশ্বের মুক্তিধারায় আলোকিত-ঝলকিতা হতে থাকবে। সমাজতন্ত্র বা লেনিনের প্রতি অনুরাগের ধারাটা লালিত হয়েছে বাংলাদেশের রাজনীতির মুক্তিযুদ্ধ বা বিপ্লবের প্রস্তুতিতে। সুতরাং সারাবিশ্বে যখন সমাজতন্ত্রকে হেনস্থা করা হয়েছে, তখন সমাজতন্ত্রকে হৃদয়ের অনুরাগ জানাতে লেখিকার পক্ষে বিস্তর ব্যাখ্যা বিশ্লেষণে যেতে হয়নি। এই সঙ্গেই উল্লেখ করা যেতে পারে যে, মুক্তিযুদ্ধ চলার সময়ে দখলদার সেনাবাহিনীর নারীধর্ষক ও জল্লাদী চেহারার যে ছবিটি রয়েছে শেষের দিকে, তাতে তখনও বালিকা থেকে যাওয়া লেখিকার মনে যে প্রচণ্ড ঘৃণা প্রকাশ পেয়েছে দখলদারদের বিরুদ্ধে, সেটা সামগ্রিক। সেটা নিছক নারীনিগ্রহ নিবারণের সীমিত তাগিদের অথবা ব্যক্তিক বিদ্রোহের তীব্র ও তীক্ষ্ণতম অভিব্যক্তিতে থেমে থাকতে পারে না। তবে সবাইকে যে একইভাবে সামগ্রিকতা সম্বন্ধে সচেতন থাকতে হবে এবং সবাই যে তা থাকবেন এটা আমরা বলবো না। আপন অভিজ্ঞতার আলোয় দেখা বিভিন্ন কৌণিকতার উপস্থাপনা ও সৃষ্টির মধ্যে যে বিশেষ বিশেষ কাজ ও মেজাজ চলে আসে, তার একটা বিশেষ সার্থকতা থাকে লেখাজোখার মৌলিকতার বিচারে। অর্থাৎ শৈলীর অভিনবত্বের একটা সার্থকতা থাকে বক্তব্যের মধ্যে বাস্তবের খণ্ডন ঘটলেও। এদিক দিয়ে তসলিমা নাসরিনকে আমরা বাংলা কঠিন কঠোর গদ্যের ধারাতে স্বাগত জানাচ্ছি। তসলিমা তাঁর লেখার এক জায়গায় শৈলীর প্রশ্নে নারী লেখিকাদের একজনের মাত্র নাম করেছেন। এই নামটি সেলিনা হোসেন। আশেপাশে

খোঁজ করলে তিনি আরও কয়েকজনকে পাবেন যারা বাংলাদেশে একদিকে যেমন শৈলীর দিক থেকে মৌলিকতা দেখিয়েছেন তেমনি নারীর যে ব্যক্তিক, পারিবারিক, সামাজিক, রাজনৈতিক সমধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি এত ব্যগ্রতা, এত অস্থিরতা ও অধীরতা প্রকাশ করেছেন, সেই বিষয়ে আরো বড় মাপের কাজ করেছেন এমন আরও সঙ্গিনীকে পাবেন। দুই বাংলাতে যাঁরা তসলিমা সম্পর্কিত বিতর্কে যুক্ত হয়েছেন কিংবা ভবিষ্যতে হতে পারেন, তাঁদের বিচার বিবেচনায় এই অন্যদের কথাটাকে রাখতে বলবো।

॥ ৩ ॥

আমরা প্রথমেই দুই প্রবীণার কথা দিয়ে আমাদের বক্তব্যের সূচনা করেছি। তবে তসলিমা নাসরিনের লেখার মূলপাঠকে তন্ন তন্ন করে না দেখে যেমন তাঁর অবস্থানটিকে তাঁর সম্বন্ধে বিভিন্ন জনের শুধুমাত্র মতামত মিলিয়ে বুঝতে পারা যাবে না তেমনি জাহানারা ইমাম ও বেগম সুফিয়া কামালের লেখালেখিতে উচ্চারিত প্রতিটি শব্দপদের সঙ্গে পরিচয় না ঘটলে একটা সাধারণ ধারণা হবে মাত্র। এই কারণে আমরা এই দুই প্রবীণা লেখিকার সৃষ্টির সঙ্গে প্রত্যক্ষ পরিচয় পাবার জন্য ব্যাপকভাবে সর্বসাধারণকে এগিয়ে আসার আহবান জানাচ্ছি। এই একই আহবান আমরা জানাচ্ছি, বাংলাদেশের 'নয় এ মধুর খেলা'য় নবীনা রচয়িত্রীদের লেখাজোখাগুলোকে নিয়ে অন্ততপক্ষে দুই বাংলাতে জনপাঠক-পাঠিকাদের মধ্যে একটা তোলপাড়ের। এখানে বস্তুতপক্ষে কয়েকজন লেখিকার নাম এবং তাঁদের দুয়েকটি করে বই-এর উল্লেখ করছি।

প্রথমে ধরা যাক মতিয়া চৌধুরীর। একটি মাত্র বই লিখেছেন, 'দেয়াল দিয়ে ঘেরা'। বাংলাদেশের অগ্নিকন্যা নামে পরিচিত। এই মতিয়া চৌধুরী–ষাটের দশকের শেষের দিকে কারাগারে নিক্ষিপ্ত হন। তিনি বেরিয়ে আসেন '৬৯-এর গণঅভ্যুত্থানের চাপে জেলখানার দরজা খুলে গেলে। তিনি "দৈনিক সংবাদ" এর কলামে তাঁর জেলের অভিজ্ঞতা ধারাবাহিকভাবে লেখেন। এর মধ্যে একদিকে যেমন সেই সময়ে যে গণবিদ্রোহ ঘটছে, তার ছবিগুলিকে তিনি সাজিয়েছেন, তেমনি তাঁর কারাসঙ্গিনীদের কাহিনিও বলেছেন। এই কারাসঙ্গিনীরা তথাকথিত 'অরাজনৈতিক' নারী, যাদের প্রত্যেকের ব্যক্তিগত সমস্যার গভীরে যেতে হয়েছে তাদের বুঝতে! মতিয়া চৌধুরী প্রধানত বাংলাদেশের বিপ্লবের নারী পুরুষ নির্বিশেষে জনগণের রাজনৈতিক নেত্রী। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীদের প্রতিনিধিরূপে বাংলাদেশের মুক্তিধারার ভাষ্য উপস্থিত করেছেন মূখ্যত বিশাল বিশাল জনসমাবেশে প্রদত্ত ভাষণে। সেই কারণে 'দেয়াল দিয়ে ঘেরা'র বাইরে তাঁর কোন ভাষ্যকে পাওয়া যাবে না, তবে তাঁর লেখা কারাকাহিনিটি দলিত বঞ্চিত নারী জীবনের ছবি দেশবাসীর বিবেকের কাছে তীব্র ও তীক্ষ্ণতাবোধ উপস্থিত করেছিল।

জানি না, তসলিমা নাসরিন এই বই পড়েছেন কিনা। তসলিমাকে যাঁরা বাংলাদেশে নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠায় একাকিনী মনে করেন, তাঁরা এই বইটি খুঁজে বার করুন এই অনুরোধ রইল।

এর পরেই নাম করছি মালেকা বেগমের। মালেকা বেগমও নানা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রী সংগঠন থেকে বেরিয়ে এসেছেন বৃহত্তর কর্মক্ষেত্রে। তিনি অবশ্য বেছে

নিয়েছেন বাংলাদেশের নারী সমাজের সংগঠন ও অধিকার আন্দোলনের ক্ষেত্রটিকে। মালেকা গত দুই দশকে বাংলাদেশে মহিলা সমিতির সাধারণ সম্পাদিকার কাজ করে এসেছেন। বর্তমানে এক পুত্র ও এক কন্যার জননী মালেকা বিশেষ করে নারীসমাজের সমস্যা ও তার প্রতিকারের প্রেক্ষিত নিয়ে নিরীক্ষাধর্মী বই লিখতে ব্যস্ত। ১৯৮৮ সালে প্রকাশিত হয় তাঁর বই 'নারী আন্দোলন–সমস্যা ও ভবিষ্যৎ'। তাঁর শেষ লেখাটির নাম 'নারীমুক্তি ও সমাজতন্ত্র'। এতে নারী সমাজের তরফ থেকে সমাজতন্ত্রকে পরিপূর্ণ মুক্তির বিধায়করূপে উপস্থিত করা হয়েছে। এই নিবন্ধের সিদ্ধান্তসূচক ঘোষণা: 'নারীমুক্তির দর্শন মার্কসবাদ।' কর্মক্ষেত্রে বাংলাদেশের নারী সমাজ সাম্প্রতিক।

নাচোল বিদ্রোহের নায়িকা ইলা মিত্রের জীবনী রচয়িত্রী মালেকা বেগম নারীমুক্তি আন্দোলনের সূত্রেই একটি ঐতিহাসিক বই লিখে ফেলেছেন বহু পরিশ্রম করে। ভবিষ্যতের গবেষিকা হিসাবে তিনি যে পদ্ধতি নিয়ে চলেছেন, এক্ষেত্রে তাঁর পদ্ধতি ভিন্ন ধারায় বেরিয়ে এসেছে। বইটির নাম 'সূর্যসেনের পুষ্পকুন্তলা'। চট্টগ্রাম যুব বিদ্রোহের সমস্ত নথিপত্র বই তন্ন তন্ন করে ঘেঁটেছেন মালেকা। সূর্যসেনের আত্মীয়া ও আত্মীয়দের সঙ্গে কলকাতায় দেখা করেছেন। বিপ্লবী সূর্য সেনের নারী সম্পর্কিত চিন্তাভাবনাতে একটা আমূল পরিবর্তনের কথা এনেছেন ১৯২৯ সালে পুষ্পকুন্তলার মৃত্যুর কাহিনি বলতে গিয়ে। সূর্য সেন যে চট্টগ্রাম বিদ্রোহে মেয়েদের দলে এবং প্রত্যক্ষ কর্মসূচিতে নিয়েছিলেন, তার মূলে ছিল তাঁর স্ত্রী। এদিকে এর আগে আর কেউ চেয়ে দেখেননি।

মালেকা বেগম সম্মন্ধে উল্লেখ এখানেই শেষ করছি শুধু এই কথাটা বলে যে, বাংলাদেশে নবীনারা কত বড় মাপের কাজ করেছেন কঠিন কঠোর গদ্যে, তার একটি দৃষ্টান্ত এই 'সূর্য সেনের স্ত্রী পুষ্পকুন্তলা'।

আরেকটি নাম সেলিনা হোসেন। বাংলাদেশের ষাটের দশকের অভ্যুত্থানের আঁচ গায়ে লাগিয়ে লেখার জগতে প্রবেশ করেন সেলিনা। তিনি একটির পর আরেকটি রাজনৈতিক ভাষ্য উপস্থিত করে চলেছেন, বাংলাদেশের বিপ্লবে বিশিষ্ট নারীদের নিয়ে। তাঁর মাধ্যমে উপন্যাস যা আসলে 'নয় এ মধুর খেলা।' আধুনিক ধ্রুপদী উপন্যাস তিনি বেশ কয়েকটি লিখেছেন। আবার বিপ্লবিনীদের আলেখ্যকেও তিনি উপস্থিত করে আসছেন উপন্যাসের ধাঁচে। তাঁর দুটি বই 'কাঁটাতারে প্রজাপতি' এবং 'ভালবাসা প্রীতিলতা'। প্রথমটি ইলা মিত্র-এ নাচোল বিদ্রোহ, তথা ইলা মিত্রের নারীসত্তা ও গণউত্থান। দ্বিতীয় বইটি এখনও হাতে আসেনি। সুতরাং সেলিনা হোসেনের সাম্প্রতিকতম কাজের শুধু নামোচ্চারণই করতে পারছি।

এরপরেই নাম করছি পান্না কায়সারের। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে শহীদ বুদ্ধিজীবীদের একজন শহিদুল্লা কায়সার। বাংলাদেশের প্রখ্যাত লেখকদের একজন তিনি। কমিউনিস্ট, বাংলাভাষা আন্দোলনের একজন পরিচালক 'সংশপ্তক' নামের রাজনৈতিক উপন্যাসের রচয়িতা। তাঁরই স্ত্রী পান্না কায়সারের লেখা 'মুক্তিযুদ্ধঃ আগে ও পরে' বইটি একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের একটি মহাসাহসিক ভাষ্য। গত দু'বছরে দুটি সংস্করণ হয়েছে এর। দখলদার সেনাবাহিনীর বশংবদ মৌলবাদী ঘাতকেরা ডিসেম্বরের দ্বিতীয় সপ্তাতে পান্না কায়সারের স্বামীসহ অন্যান্য বুদ্ধিজীবীদের নেতাকে যেভাবে হত্যা করে, তার বর্ণনা রয়েছে এই গ্রন্থে। একজন নারী হিসাবে সেই সন্ধিক্ষণে স্বামীকে

হারিয়ে যে অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে আসেন তিনি, তার সমগ্র চিত্রটিকে পান্না কায়সার এই গ্রন্থে উপস্থিত করেছেন আগামী দিনগুলিকে মনের মধ্যে রেখে। পান্না কায়সারের এই বই-এর মধ্য দিয়ে বেরিয়ে এসেছে বাংলাদেশে বিপ্লবে যে লাখ লাখ পরিবারের মেয়েরা গভীর অনিশ্চয়তার মুখে এসে পড়ে, তাদের সমস্যাগুলি। পান্না কায়সার অধ্যাপিকা। উদীচী গণসংগীত সংঘের সভানেত্রী। 'খেলাঘর' শিশু কিশোর কিশোরী সংস্থার পরিচালিকা। তাঁর কন্যা শমী কায়সারও লিখছে। বহুদিক সামলাতে হয় তাঁকে। এর মধ্যেই সময় করে তিনি 'মুক্তিযুদ্ধঃ আগে ও পরে' নাম দিয়ে লিখেছেন কঠিন ও কঠোর গদ্যে একটি প্রস্তাবনা, আর একটি বক্তব্য, নারীর একান্ত নিজস্ব সমস্যা বাংলাদেশের সমগ্র বিপ্লবের আবহে কোন মতেই গৌণ নয়, উপেক্ষীয় নয়।

আমাদের প্রস্তাবনাটি শেষ করছি আপাতত আলোচ্য বিষয়ের সঙ্গে গভীরতা সংশ্লিষ্ট দুই প্রবীণার লেখা দুটি বই-এর নাম। একটি বই সৈয়দা মনোয়ারা খাতুনের লেখা 'স্মৃতির পাতা'। মনোয়ারা লিখেছেন, অবরোধ ভেঙ্গে বেরিয়ে আসার এক মহাআলেখ্য'একটি ছোট্ট বইতে। তিনি গত কয়েক দশকের মধ্যে কোন এক ফাঁকে প্রয়াতা। কিন্তু রেখে গিয়েছেন নবীনাদের জন্য এবং সেই সূত্রে নারী পুরুষ নির্বিশেষে নতুন প্রজন্মের জন্য নারী মুক্তির একটা বড় মাপের তাগিদ।

দ্বিতীয় বইটি 'সপ্ত নারীর কাহিনি-গ্রাম বাংলার রেখাচিত্র'। লেখিকা রোকেয়া রহমান কবীর। দীর্ঘকাল অধ্যাপনা করেছেন। যাকে এককথায় জাঁদরেল বলা যায়, তিনি বাংলাদেশের সেরকম একজন মহিলা। কলকাতার ছাত্রী ছিলেন। বিদুষী। তিনি আজ গ্রামে চলে গিয়েছেন গোড়াঘর ঠিক করতে। সেখানে যেসব মেয়ে গতর খাটিয়ে খায়, হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে তাদের কয়েকটি আলেখ্য তুলে ধরেছেন সপ্ত নারীর কাহিনির লেখিকা।

এই লেখাও 'কঠিন কঠোর গদ্যে' রচিত মহাজীবনভাষ্য।

আরও যাঁদের লেখা বই সংগ্রহ করতে পারি নি, তাঁদের কথাও এই '৯২ তেই দুই বাংলায় উঠবে, এই প্রত্যাশা নিয়ে আমাদের ভাষ্যটি শেষ করছি শহীদ সেলিনা পারভিনকে স্মরণে এনে, যাঁকে বাংলাদেশে অন্যান্য বুদ্ধিজীবীদের সঙ্গে এক কাতারে হত্যা করা হয়েছিল। একটি আবেদন রাখছি এই সঙ্গে—তাঁর লেখাগুলি নিয়ে বই চাই।

বিজন ভট্টাচার্য

বরেণ্য বিপ্লবী লোকায়ত নট ও নাট্যকার

গত শতকের দ্বিতীয়ার্ধের মাঝামাঝি থেকে বর্তমান শতকের দ্বিতীয়ার্ধের মাঝামাঝি পর্যন্ত বাংলা নাটকের প্রবর্তন ও প্রসারের শতবর্ষে—প্রথম থেকেই এমন সব নাটক লেখা হয়েছে, যেগুলিকে তদানীন্তন চিরায়ত বিশ্ব-নাটকের নিরিখে শুরুতে মনে হয়েছিল সাময়িক ঝাঁজালো সমস্যা নিয়ে রাগী নাটক। লোকের রাগ পড়ে গেলে এ নাটকও পড়ে যাবে। এদের কয়েকটা নাটক কিন্তু একশ বছর পরে মঞ্চস্থ হয়েও দর্শকমণ্ডলীতে প্রবলভাবে নাড়া দেয়। দৃষ্টান্ত দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পন'।

বাংলা নাটকের এই বিশেষত্ব ব্যতিক্রম নয়, মূলধারা। এর আসল কারণ, বাংলা নাটক পরাধীনতা থেকে মুক্তির সংগ্রামের একাদিক্রমিক গণঅভ্যুত্থানের যে ঘটনাগুলি থেকে নর নারীকে গ্রহণ করেছে, সেগুলি পরস্পর থেকে অবিচ্ছেদ্য। এজন্য এরা চিরায়তের মাত্রা পেয়েছে।

বিজন ভট্টাচার্যের 'নবান্ন' নাটক এই মূলধারার অন্তর্ভুক্ত। তেরশ পঞ্চাশের বাংলা মম্বন্তরের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের ডাক এর বিষয়বস্তু। এই প্রতিরোধ বাংলা নাটকের মূল ধারার প্রকাশ। পড়ে যাওয়া দূরে থাক, আগামী একশ বছরে 'নবান্ন' দর্শকমণ্ডলীকে মানুষের জন্যে মানুষের করণীয়কে এবং চিন্তনীয়কে জাগিয়ে রাখবে।

বাংলা নাটকের একশ বছরের পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও সাধনা এবং লড়াই-এর একজন যোগ্য ধারক ও বাহক বিজন ভট্টাচার্য। একাধারে নট ও নাট্যকার আরও হয়েছেন। যেমন গিরিশ ঘোষ। বিজন ভট্টাচার্যও সেই ঘটনা ঘটিয়েছেন।

সঙ্গে সঙ্গে বিজন ভট্টাচার্যের সৃষ্টি এক অদ্বিতীয়ের সৃষ্টি।

তিনি বাংলার প্রথম বিপ্লবী লোকায়ত নট ও নাট্যকার। নাটক লেখা ও তার নট হিসেবে তিনি যেমন উৎসর্গিত একাদিক্রমে বিপ্লবে, তেমনি একাদিক্রমে লোকায়তে। এর আগে এমনটি আর কেউ করেন নি। বিপ্লবী নাটক ও নাটকে গত একশো বছরে আমরা আরও পেয়েছি, কিন্তু এই দুটির সর্বাত্মক সম্মিলিত সন্নিবিষ্ট রূপ দিয়ে বিজন ভট্টাচার্য প্রবর্তন করেছেন নবযুগের। গত শতবর্ষের এক সৃষ্টি তিনি, আবার আগামী শতবর্ষের স্রষ্ঠা তিনি। বাংলা নাটকে লোকায়ত চিন্তা ও জীবনের প্রয়োগ রবীন্দ্রনাথও করেছিলেন। 'অচলায়তন' এবং এমনকি, 'রক্তকরবী' নাটকে এসেছে লোকায়ত বস্তুবাদী লৌকিক পরিবর্তন। আরও কারো কারো লেখায় লোকায়ত এসেছে। কিন্তু বিজন ভট্টাচার্যের 'নবান্ন' থেকে শুরু করে 'দেবী গর্জন'–প্রায় প্রত্যেকটি নাটকের পরিমণ্ডলই লোকায়ত। একটিমাত্র বড় নাটক ব্যতিক্রম, সেটি 'অবরোধ'। সম্ভবত, নাট্যকার এই নাটকটিতে যন্ত্রশিল্পের কর্মীদের কোন লোকায়ত প্রতীকের আবর্তে দেখাতে পারেননি বলেই এই ব্যতিক্রম। চেষ্টাও ছাড়েননি। তার প্রমাণ 'চলো সাগরের'। যন্ত্রশিল্পের কর্মীদের জীবনকেও তিনি এখানে লোকায়ত পরিমণ্ডল দিয়ে আগাগোড়া মুড়ে দিয়েছেন। অবশ্য এজন্য তাঁকে অমানুষিক পরিশ্রম করতে হয়েছে। কলকাতার শহরতলীর কারখানার বঙ্গভাষী ও বঙ্গসংস্কৃতিতে যে লোকায়ত ভিত্তি অন্তঃশীল রয়েছে, তাকে তিনি মজুরদের দৃশ্যগোচর শ্রবণগোচর করেছেন। এজন্য তাঁকে গানের আশ্রয় নিতে হয়েছে।

লোকায়ত রীতিনীতি ও চিন্তাও বস্তুমর্মিতা প্রয়োগ তিনি যেমন গীতিনাট্য 'জীয়নকন্যা' লিখেছেন ওঝা নিয়ে, তেমনি নাটকের পর নাটক লিখেছেন আউল বাউল কীর্তনিয়া নিয়ে।

কিন্তু ব্যাপারটা গীতিপ্রবণ থাকেনি। এই সঙ্গে আর একটি অভিধা প্রযোজ্য। সেটি 'বিপ্লবী'। এই বিপ্লব বাস্তববাদী। তাঁর নাটক বিয়োগান্তক, কারণ বিপ্লবীদের প্রাণ দিতে হয়েছে। বিজন ভট্টাচার্যের নাটকে যেমন লোকায়ত দৃষ্টি সর্বাত্মক, তেমনি বিপ্লবও সর্বাত্মক।

যে হাজার হাজার বছরের লৌকিক চিন্তার বস্তুতান্ত্রিকতাসম্মত রীতি আচার ধ্যানধারণা থেকে এককেকটি লোকায়ত প্রতীকের উদ্ভব ও তার পরিমণ্ডল, তাদের খণ্ডিত না করে কিংবা বিন্দুমাত্র অবমূল্যায়ন না করে একটা সম্পূর্ণ নতুন লোকজগৎ গড়বার নিরন্তর সংগ্রাম হচ্ছে বিজন ভট্টাচার্যের নাটক ও নটজীবনের প্রাণসত্তা।

অল্প বয়সে স্বাধীনতা সংগ্রামে কোন কোন শ্রমিক শ্রেণির বিপ্লবীর সংস্পর্শে আসার সুযোগ, গ্রামীণ জীবনে ও নিপীড়িত কৃষকদের সঙ্গে সহযোগিতা এবং প্রগতি লেখক সংঘ ও কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যপদ বিজন ভট্টাচার্যকে স্বদেশিকতা ও আন্তর্জাতিকতার বিপ্লবে একাত্ম করেছিল। 'বিপ্লব' ও 'লোকায়ত' এই দুটি অবিভাজ্য অভিধা লৌকিক লৌকিকতার মধ্যে যে ব্যক্তিক চারিত্রিক সূক্ষ্ম কাজের সমন্বয়ের দাবি, তাকে অন্তর নিঙড়ে প্রকাশ করার ব্যাপারটাকে বুঝিয়ে দেবার জন্যেই সম্ভবত বেঁচে থাকার শেষ দিনটি পর্যন্ত তাঁকে প্রধান নটের কাজও করতে হয়েছে তাঁর নিজের লেখা নাটকে।

লোকায়ত জীবন দর্শনের প্রতীকে তিনি আশ্রিত করেছেন শ্রমজীবী জনগণের সেই শ্রেণিগত অভ্যুত্থানকে, যার মধ্য দিয়ে সমস্ত শোষণ, ক্রন্দন, অন্ধত্বের অবসান ঘটানো সম্ভবপর বলে তিনি মার্কসীয় দর্শন থেকে জেনে নিয়েছিলেন। ধ্রুবতারা করেছিলেন তিনি মার্কসবাদ লেনিনবাদকে।

লোকজীবনের উপস্থাপন যাতে বস্তুনিধি হয় সেজন্যে লোকায়ত প্রতীক নিয়ে বিজন ভট্টাচার্য যে চর্চা করেছেন, সেটা যেন তান্ত্রিকের ধ্যানস্থ্ হওয়া। কিন্তু এটাও তিনি সম্ভব করেছেন যেন, হাজার হাজার বছরের লৌকিক প্রতীকের কোন মোহকেই তিনি গ্রাহ্য করেন নি। লোকজীবনকে তার বিপ্লব সজ্জায় সাজাবার ব্যাপারে কোনো দ্বিধা আসেনি তাঁর মনে।

তাঁকে চল্লিশ, পঞ্চাশ, ষাট ও সত্তরের দশকের বিশ্ববিপ্লবী আবহে রেখে দেখলে তাঁর এই মোহহীনতার একটা পরিষ্কার কৈফিয়ত পাওয়া যেতে পারে।

স্বদেশে ও অন্য সর্বত্র অপ্রতিরোধ্য বিপ্লবী গণঅভ্যুত্থানের ও গণজাগরণের বাস্তব সংঘটন তাঁকে শক্তি যুগিয়েছে। তবু একটা খটকা থাকতে পারে। লোকায়ত প্রতীক বা আবহ বা রীতির ব্যবহার বস্তুতান্ত্রিক হওয়া সত্ত্বেও শক্তি জোগাবার সঙ্গে সঙ্গে স্ববিরোধিতা ও প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হতে হয়েছে। লোকায়তে যে আদিমতা কিংবা আবহমানতার আতিশয্য, তাতে বস্তুতান্ত্রিকতার আওতাতেও গুণগত উত্তরণের অবকাশ নেই। অথচ বিশ্বকে বদলাবার এবং নিজেদের বদলাবার জন্যে এই গুণগত উত্তরণের উল্লম্ফন অপরিহার্য। একথা ঠিক যে, লোকায়ত প্রতীককে গণবিপ্লবে ব্যবহার করা সম্ভব, কারণ এর মধ্যে লোকজীবনের আশা আকাঙ্ক্ষার বস্তুতান্ত্রিক উপকরণ রয়েছে। কিন্তু একই সঙ্গে এই প্রতীককে তারাও ব্যবহার করার জন্যে প্রয়াসী হতে পারে যারা স্থিতাবস্থার শোষণ ব্যবস্থাকে বজায় রাখার জন্যে পুরাতনকে আঁকড়ে ধরার সুপারিশ করে। লোকায়ত প্রতীকের বৈপ্লবিক উপকরণগুলোকে পাঠ করার জন্যে নিছক পুরাতনের উপকরণগুলোকে ব্যবহার করার প্রচেষ্টা চালিয়ে আসছে সাম্রাজ্যবাদ ও তার তাঁবেদাররা।

সুতরাং বিজন ভট্টাচার্যকে লোকায়তকে নিয়ে কাজ করতে গিয়ে বাছবিচার ঝাড়াই বাছাই করতে হয়েছে। কাজটা হয়েছে তাই গুরুতর রকমের পরিশ্রমসাধ্য। কঠোর

সাধনাসাধ্য। কয়েকটা কথা কানে এলো, আর সংলাপ তৈরি করলাম কিংবা একটা সুর কানে এলো আর গান বেঁধে ফেললাম, এত স্বচ্ছন্দ হয়নি, ঘটনাটা বরং ভাটিতে উজানে দাঁড় টানতে হয়েছে অনেক সময়। কিন্তু নদী তিনি প্রধানত একটাই বেছে নিয়েছিলেন। সেটা লোকায়ত। আর এই লোকায়তের গহীনেই বাংলা নাটককে বিপ্লবের বাহক করেছিলেন।

এখানে তাঁর অনন্যপূর্বতার সবচেয়ে বড় স্বাক্ষর। তিনি অনন্যপূর্ব এই জন্যেও যে তিনি স্ববিরোধিতাকে জয় করেছেন। যে শ্রমজীবী নরনারী একালে বিপ্লবের পুরোধা, তাদের সত্তার মজ্জায় মজ্জায় লোকাচার মিশে থাকায় তাদের পরিপূর্ণ বিপ্লবী বিন্যাসের জন্যে এই লোকাচার সম্বন্ধে জ্ঞানবোধ ও সহমর্মিতা চাই-ই চাই। এই লোকাচার তিনি জুগিয়েছেন। চল্লিশের দশকে গণনাট্য আন্দোলনের গোড়াপত্তনে এটা ছিল একটা মূল উপকরণ। কবিয়ালরা এসে দাঁড়িয়েছিলেন গণমুখী আধুনিক লেখক লেখিকা ও শিল্পীদের পাশে এই তাগিদেই। বিপ্লবের সাধারণ গুণনীয়কটিকেও অবশ্য পাওয়া গিয়েছিল এই সঙ্গে। লাল পতাকা নিয়ে সামনে এগিয়ে চলেছিল শ্রমিক শ্রেণি। দেশের স্বাধীনতার সংগ্রামের এবং সাম্যবাদী বিশ্ববিপ্লবের আহবান আঁকা রয়েছে এই পতাকায়।

বিজন ভট্টাচার্য এই সাধারণ গুণনীয়কটিকে দেশের মাটিতে গভীরতম শিকড়ে-শিকড়ে বুঝে নিতে পেরেছিলেন। তিনি হয়েছিলেন গণনাট্য আন্দোলনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কর্মী। সফলতায় অভিষিক্ত করেছিলেন তিনি গণনাট্য আন্দোলনকে, লোকায়তকে বিপ্লবে পরিপূর্ণভাবে বিন্যস্ত করে।

বাংলা গণনাট্য আন্দোলনের বিপ্লবী লোকায়তের উপকরণের সবচেয়ে বড় অংশ জুগিয়েছেন বিজন ভট্টাচার্য।

উপরিউক্ত কৃতিত্বের অবিচ্ছেদ্য অনুষঙ্গ হিসেবে বিজন ভট্টাচার্যের নাট্যকর্মের দুটি বিশেষত্বের এখানে উল্লেখ করে রাখা যেতে পারে। এই বিশেষত্ব দুটি তাঁকে লোকায়তের সঙ্গে সঙ্গে বিপ্লবী গণনাটকের অন্যান্য ধারার সঙ্গে অচ্ছেদ্য আত্মীয়তার সম্পর্কে জড়িয়েছে।

প্রথমত, অনন্য নট ও নাট্যকার হলেও যেহেতু একটা নতুন পর্বের তিনি প্রবর্তন করতে চেয়েছেন এবং যেহেতু এই নতুন পর্বে ব্যক্তি ও সমূহ পরস্পরের পরিপূরক, সেজন্যে রীতিপদ্ধতি ও ব্যক্তিত্বের দিক দিয়ে নিজেকে তিনি নিঃশেষে উৎসর্গ করেছেন সম্মিলিত বৈপ্লবিক নাট্য উদ্যোগ। গণনাট্য আন্দোলন যখন বহুধাবিভক্ত, তখন লোকায়ত ধারা পরীক্ষা-নিরীক্ষার কোনো কোনো সময়ে একক হয়ে পড়লেও বিচ্ছিন্নতাবাদের শিকার হতে দেননি তিনি নিজেকে।

তাঁর এই সম্মিলিত বৈপ্লবিক উদ্যোগে উৎসর্গিত রূপটিকে প্রত্যক্ষ করার সৌভাগ্য হয়েছিল আমাদের কয়েকজনের, তাঁকে যখন প্রথম দেখি ঢাকায় ১৯৪৪ সালে প্রগতি লেখক ও শিল্পী সম্মেলনে। কলকাতার গণনাট্য সংঘ 'জবানবন্দী' নাটক, নবজীবনের গান, মহামারী নৃত্য ও মধুবংশীর গলির সম্মিলিত কার্যক্রম এবং সম্মিলিত শিল্পীদের নিয়ে উপস্থিত হয়েছিল ঢাকায়। বিজন ভট্টাচার্যকে দেখেছিলাম অন্য সব শিল্পীদের সঙ্গে এক হয়ে মিশে রয়েছেন। তখন তাঁর চোখেমুখে যৌবন বহ্নি। বয়স ছাব্বিশ-সাতাশ।

নবজীবনের গানের রূপবান যুবা ও উদাত্ত কণ্ঠস্বরের অধিকারী গায়ক বিজন ভট্টাচার্যই জবানবন্দীতে দুর্ভিক্ষপীড়িত রূপলাবণ্যহীন রুক্ষ বিদ্রোহী চাষীর ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন।

বুঝে নিয়েছিলাম, এই শিল্পী সত্য সত্যই জনগণের শিল্পী, নিজেকে বিপ্লবে উৎসর্গিত করতে সক্ষম, অন্যদেরও সঙ্গে নিতে সক্ষম।

তাঁর সঙ্গে একই সাথে সেদিন কিংবা পরে কাজ করেছেন এরকম দুজনের কথা মনে পড়ে যায় এই কথার সূত্রে। জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র ও ঋত্বিক ঘটক। নিজেদের উৎসর্গিত করেছিলেন তাঁরা গণ-লোকনাট্যে।

বিজন চরিত্রের দ্বিতীয় বিশেষত্বটি এই যে, তাঁর সব কটি নাটকের মধ্যে এবং তাঁর নটজীবনের অন্তরঙ্গতার একটা বিশেষ উপকরণ তিনি নিয়েছিলেন বিপ্লব থেকে। এই উপকরণটি 'ক্রোধ'। অর্থাৎ বিজন ভট্টাচার্যের আরেকটি অভিধা–তিনি রাগী। অন্যায় ও অবিচারের বিরুদ্ধে তিনি ছিলেন প্রচণ্ড রাগী।

কোনো কোনো নাটক দেখতে দেখতে মনে হয়েছে, এই ক্রোধকে তিনি নিয়েছেন আধুনিক ইউরোপিয় নাটক থেকে।

খুব সংক্ষেপে বলতে চাই, এই ক্রোধের উপকরণ ব্যবহারে তিনি জার্মান কমিউনিস্ট নাট্যকার ব্রেখটের সহযোগী, সাথী। বিজন ভট্টাচার্যের ক্রোধ, জীবনের প্রতি ধিক্কার-উচ্চারক 'এবসার্ড' নাটকের ক্রোধ নয়। বিজনের ক্রোধ মানুষের শৃঙ্খলমুক্ত হবার সংকল্পের ক্রোধ।

ব্রেখটের সঙ্গে অবশ্য তার আর কবি উপকরণে সহযোগিতা রয়েছে। সেটি গণসংগীত। অর্থাৎ বিপ্লবের সংগ্রামের লোকগীতি রচনা।

দেখেছি, ভেবেছি, বুঝেছি

হিন্দী উপন্যাস, ছোটগল্প ও নিবন্ধ সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ রূপকার যশপালের লেখনী চিরকালের জন্য স্তব্ধ হয়ে গিয়েছে। মৃত্যুকে কে ঠেকাতে পারে? কিন্তু তাঁর লেখা এমন আলো জ্বালেনি যা সহজে নিভে যায়। বরং অনেক লেখাই গভীরভাবে প্রাণবন্ত, জ্বালাময়, শিখাময়। এমনি একটি গ্রন্থ 'দেখেছি, ভেবেছি, বুঝেছি' (দেখা, সোচা, সমঝা)। নিবন্ধমূলক আত্মকথার এই সংকলনটি ১৯৫১ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়। ১৯৬৮ সালে যে চতুর্থ সংস্করণ বেরিয়েছে, তাতে রয়েছে সাতটি নিবন্ধ: (১) সেবাগ্রাম দর্শন, (২) সাহিত্যের মূল্যায়ন, (৩) শিমলা থেকে কুলু, (৪) নাদিরশাহী ব্যক্তিক স্বাতন্ত্র্য, (৫) বিচারধারার স্বতন্ত্র সত্তা, (৬) আমার সম্পাদকীয়দের জন্য আমার দেয়, (৭) এই নৈনিতাল।

এই লেখাগুলি ধারাবাহিক আত্মকাহিনি নয় অথবা আত্মকথা নয়, কিন্তু 'দেখেছি, ভেবেছি, বুঝেছি'তে সমগ্রভাবে রয়েছে সোচ্চার অনন্য যশপাল চরিত্র। একজন বিপ্লবী এবং কথাশিল্পী হিসেবে যশপাল তাঁর যুগে নিপীড়িত শ্রেণিগুলির পক্ষ নিয়েছেন। যুক্তির দিক দিয়ে কেন নিয়েছেন, সেই কথা যেমন ধারালোভাবে তেমনি রসিয়ে রসিয়ে বলেছেন তিনি তাঁর প্রতিটি ছত্রে। তাঁর শৈলিতে ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণের সঙ্গে মিশে

রয়েছে কাহিনিকারের কাজ। এই কারণে প্রতিপক্ষ সুচিহ্নিত। প্রতিদ্বন্দ্বীদের ছবিও গল্পের ছত্রে কথাসাহিত্যের ধারায় এঁকেছেন স্থূল সূক্ষ্ম দাগ মিলিয়ে। অস্পষ্টতার ধার ধারবার লোক ছিলেন না যশপাল। অথচ উপন্যাস থেকে শুরু করে ভাববাদী এবং দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদী দর্শন নিয়ে যশপালের অতিবিস্মৃত ও গভীর ধ্যানধারণা। সংগ্রাম ও কাজ এবং এদের সমসাময়িক পটভূমিকে একটি চুম্বকের মতো ধরেছে 'দেখেছি, ভেবেছি, বুঝেছি' বইটি। সুতরাং নিবন্ধ লেখার মধ্যে প্রয়োগনৈপুণ্য এবং সংযমও লক্ষণীয়। মাত্র ১৪০ পৃষ্ঠার বই।

কোথাও রসভঙ্গ হয়নি, অথচ বলেছেন সমসাময়িক সমস্ত বিষয়েই একজন মার্কসবাদীর তরফ থেকে যা না রেখে ঢেকে একান্তই বলা দরকার সে সব কথাই।

যে সাধারণ নিপীড়িত মানুষের পক্ষে তিনি কথা বলেছেন তারা এবং যাদের তিনি যুক্তি দ্বারা প্রতিপক্ষ হিসেবে নাকচ করেছেন তারা সিংহভাগ নিয়েছে তাঁর নিবন্ধে। এ কারণে যশপালকে যেখানে বেশি রকম সংযত হতে হয়েছে সেটি তাঁর আত্মজীবনের ছবি দাখিল করার কাজ। এই দিকটাকে আমরা কিছুটা জানি, কারণ তিনি আমাদের উপমহাদেশের আধুনিক ইতিহাস গড়ার সামনের সারির মানুষ। তাঁর বইটিতে যে সব কথা বলেছেন, তাকে বুঝবার জন্য সংক্ষেপে তাঁর জীবন ও চিন্তা সম্বন্ধে কয়েকটা কথা বলে নেয়া যেতে পারে।

যশপাল আমাদের উপমহাদেশের এক অশান্ত সন্তান। বিপ্লবী বলতেই বিশ শতকের বিশাল গণ–অভ্যুত্থানের তৃতীয় দশকে যেমন হওয়া উচিত বলে আমাদের মনে হয়, তিনি ছিলেন সেই মানুষ। পরাধীনতার শিকল ভাঙার সংগ্রামে বিশের দশকে মহান বিপ্লবী ভগৎ সিং-এর অন্তরঙ্গ সাথী হিসেবে সশস্ত্র বিপ্লবের আয়োজন-নিয়োজনের দায়ে কারাগারে নিক্ষিপ্ত হয়েছিলেন। ফাঁসিতে যে তিনি ঝোলেন নি, সেটা পুলিশ মামলা সাজাতে ব্যর্থ হয়েছিল বলে। কথাটা কৌতুকের সঙ্গে বলেছেন তাঁর বইয়ের এক জায়গায় যশপাল। জেল থেকে বেরিয়ে এসেই আবার বিপ্লবের কাজে জীবন উৎসর্গ। বিপ্লবকে যা দিয়েছিলেন, তা তো ফিরিয়ে নেওয়া যায় না। তবে এবার কলমের কাজ। স্বাধীনতা এবং সাম্যবাদী সমাজের জন্য সংগ্রামে নিয়োজিত নিপীড়িত মার্কসবাদী হয়েছিলেন। অনেকগুলি বিদেশি ভাষা শিখেছিলেন। বিশ্ব সাহিত্যের সঙ্গে সরাসরি যোগ ঘটেছিল। এই প্রস্তুতিপর্বে তত্ত্ব এবং শিল্পরূপকে ভাগ করে দেখেন নি। তবে লেখার ব্যাপারে শিল্পরূপের কাজই তাঁর বেশি মনে ধরেছিল যে অগণিত লোক নিয়ে বিপ্লব, সেই লোকচরিত্রের টানে তিনি বেছে নিয়েছিলেন চরিত্রচিত্রকারের কাজ, অর্থাৎ উপন্যাসের শিল্পরূপ। হিন্দী উপন্যাসে ছোট গল্পে রাজনৈতিক বিপ্লবীধারাকে প্রেমচন্দ সমর্থন জানালেও তখনো পর্যন্ত খোলাখুলি গণবিপ্লববাদী রাজনৈতিক সামাজিক উপন্যাসের রেওয়াজ প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করতে পারে নি। যশপাল শুরু করলেন এই ধরনের উপন্যাস দিয়ে এবং এই ধারাটিকে নিয়েই লেগে রইলেন। চল্লিশের দশকে প্রগতি ধারায় হিন্দী উপন্যাস ও ছোটগল্পের যে প্রাবল্য ঘটে তাতে রাহুল সাংকৃত্যায়নের পাশাপাশি যশপালের রয়েছে বিশিষ্ট ভূমিকা।

যশপালের বিশিষ্টতা এই যে, তিনি উপন্যাসে কৌতুক ও বিদ্রুপের রসের দিকটিকে প্রাধান্য দিয়েছেন এবং বোধহয় এই কারণেই তথাকথিত আধুনিক ও

চিরাচরিত ধারার উপন্যাস-শিল্পীরাও তাঁকে প্রধানত শিল্পী হিসেবেই নিজেদের একজন হিসেবে গণ্য করেছেন।

যশপাল তাঁর বৈপ্লবিক রাজনৈতিকতা সম্বন্ধে অতিমাত্রায় সচেতন ছিলেন। রাজনীতিতে একতিল আপস ছিল তাঁর চোখের বালি। কিন্তু তিনি তার সর্বসময়ের প্রধান কাজ হিসাবে কথাসাহিত্যেরই এমন একটা ছাঁচ বেছে নিয়েছিলেন যেখানে মানবমানবীকে দেখানো দরকার চারমাত্রিক গতিশীল চরিত্র হিসেবে, পট থেকে যে সব মাত্রায় মানব-মানবী নেমে এসে মাটিতে পা ফেলে চলতে পারে সেই সমস্ত মাত্রায়। জেলখানায় নিশ্চয় তৈরি করেছিলেন নিজেকে এইজন্যে। কিন্তু প্রস্তুতিকে কাজে ফলানো সহজ ছিল না। সাহিত্য থেকে রাজনীতিতে আসা সম্ভব, কিন্তু রাজনীতি থেকে সাহিত্যে আসা কি ততটাই সম্ভব? এই প্রচলিত দুরূহ দ্বিধাটিকে কাটিয়ে উঠেছিলেন যশপাল লেখার কাজ শুরু করার সঙ্গে সঙ্গে কৌতুক, রসিকতা ও বিদ্রুপের উপাদান তাঁকে বিশেষভাবে সাহায্য করেছিল। রাজনীতি এবং সাহিত্যকে দুটো আলাদা কামরা বলে মনে করেন নি তিনি। সাময়িক পত্রিকা প্রকাশ করে তাতে নিবন্ধ লেখাও শুরু করেন সঙ্গে সঙ্গে। তাঁর কলম থেকে একেবারে শুরুতেই ঝলকে ঝলকে স্বচ্ছন্দে বেরিয়ে এসেছিল রূঢ় বাস্তববোধ, কবিকল্পনার রামধনু এবং জীবনের নানারকম অসঙ্গতি ও উদ্ভটকে নিয়ে রসিকতা, কৌতুক, অট্টহাস্য।

রাজনীতি এবং শিল্পরূপের অনুমানঘটিত বিষমতা নিয়ে তিনি দুশ্চিন্তাগ্রস্ত ছিলেন না।

এদিক দিয়ে যশপালকে উপমহাদেশের গদ্যসাহিত্যের কাজী নজরুল ইসলাম বলে অভিহিত করা যেতে পারে।

যশপাল যে পত্রিকা সম্পাদনা করতেন তার নাম রেখেছিলেন 'বিপ্লব'। রসের ক্ষেত্রে জাত যাবার তোয়াক্কা তিনি করেন নি কাজী নজরুল ইসলামের মতো। কারণ তিনি ছিলেন জাতরসিক ও জাতবিপ্লবী একই সঙ্গে। 'দেখেছি, ভেবেছি, বুঝেছি' গ্রন্থের নিবন্ধ সপ্তকে যশপালের চরিতকথার চারটি গম্ভীর সূত্র পাওয়া যায়:

(১) পরাধীনতা থেকে মাতৃভূমির মুক্তি এবং শোষণের নাগপাশ থেকে মেহনতী মানুষের মুক্তির দাবিকে সমস্ত রকমের ন্যায়বিচারের মূল সত্য বলে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন তিনি। শোষণের পক্ষে যারাই মায়াজাল ছড়াক না কেন, সেই জাল ছিঁড়তে তিনি দ্বিধাহীন, সংকোচহীন এবং কাজী নজরুল ইসলামের ভাষায় 'দুর্বিনীত'।

(২) একজন জাতীয় লেখক হিসেবে সমাজের উপরতলা ও নীচতলার মাঝামাঝি জায়গায় অবস্থানের সুযোগ লাভের দরুন সামাজিক সুখসুবিধাগুলি নাগালের মধ্যে পাবার ব্যাপারে যে আকর্ষণ-বিকর্ষণ ঘটেছে তাঁর জীবনে, সেটিকে তিনি অকপটে ব্যক্ত করেছেন।

(৩) শোষিত মানুষ কি কারণে পরনির্ভর দুঃখীর জীবনযাপন করতে বাধ্য হয় এবং মালিক শ্রেণির মানুষ কি কারণে সুখী ও ভোগীর স্বচ্ছন্দ স্বাধীন জীবন যাপন করতে পারে, সেটার খোঁজ দিতে গিয়ে তিনি দেখিয়েছেন ঘটনা একটাই। বিত্তহীন মানুষ বিত্তবানের শোষণ-যন্ত্রে শৃঙ্খলিত।

(৪) নিজেকে কমিউনিস্ট বলেছেন তিনি নির্দ্বিধায়। কমিউনিজমকে তিনি অন্যান্য আদর্শবাদ অথবা প্রতিপক্ষীয় মতবাদের আঘাত ও আক্রমণ থেকে সুরক্ষিত করতে

চেয়েছেন। এ বিষয়ে তাঁর যুক্তির পদ্ধতি দুইদিক দিয়ে অনন্যতা সৃষ্টি করতে পারে। প্রথমত, তিনি প্রতিপক্ষের সমস্ত যুক্তিকে উত্থাপন করে নিয়ে সেগুলিকে একে একে খণ্ডন করেছেন। অর্থাৎ তিনি প্রতিপক্ষকে হাওয়ার উপর দাঁড়াবার সুযোগ দেননি। দ্বিতীয়ত, তাঁর যুক্তির মূল শক্তি তিনি সংগ্রহ করেছেন উপমহাদেশের প্রাচীন ও আধুনিক ইতিহাসের বহুজনবোধ্য উপকরণ থেকে। যদিও তিনি বিভিন্ন নিবন্ধে জানিয়েছেন যে তিনি 'মার্কসবাদ' গ্রন্থের প্রণেতা এবং আলোচ্য গ্রন্থে তিনি মার্কসীয় সূত্রসমূহের ব্যাখ্যাকার। কিন্তু 'দেখেছি, ভেবেছি, বুঝেছি' গ্রন্থে যশপাল কোথাও যেন-বা ভুলক্রমেও কোনো মার্কসীয় উদ্ধৃতি দাখিল করেননি। অথচ বুঝিয়ে দিয়েছেন যে, তাঁর বিষয়ধারা মার্কসবাদী দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদী। মার্কসবাদী সূত্রগুলিকে তিনি নিজের ভাষায় উপস্থিত করেছেন। নিবন্ধাবলি থেকে কয়েকটি দৃষ্টান্ত নিলে বুঝতে পারা যাবে যশপাল কিভাবে তাঁর বক্তব্যগুলিকে পেশ করেছেন।

যশপাল লিখেছেন,

(১) "আমি মনে করি সর্বসাধারণ-জনগণ শোষণ ও অন্যায় দ্বারা প্রপীড়িত। এই অন্যায় থেকে জনতার মুক্তির উপায় হিসেবে সমাজতন্ত্রের দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদী বিচার ধারাকে আমি গ্রহণ করেছি। আমার সম্পর্ক এই বিচারধারার সঙ্গে। জনতার মধ্যে এই বিচারধারার স্পষ্টীকরণ ও প্রচার আমার তরফ থেকে দেয়"।

(২) "আমি সুবিধাভোগীদের একজন, সুতরাং আমি শোষণের জালের বাইরে রয়েছি। নদীতে মাছ ধরার জন্য যে জাল ফেলা হয়, তা থেকে ছিটকে বেরিয়ে কোনো কোনো মাছ জালের ফাঁস থেকে বেঁচে যায়। কিন্তু তবু কথাটা এই যে, মাছ তো মাছই থেকে যায়। এবং মাছ যাদের জালে ধরা পড়ে সেই মালিকশ্রেণীর সঙ্গে তার সম্পর্কও বদলে যায় না।

নিজেকে এইভাবে জালের ভিতর মাছদের সঙ্গে সম্পর্কিত করে যশপাল লিখেছেন,

"আমি বিত্তাধিকারী না হয়ে নিজের শ্রমের উপরেই জীবিকা নির্বাহ করতে আগ্রহী। শ্রেণিগত দৃষ্টিভঙ্গিতে আমি একজন কলমজীবী (লেখক)। কখনো কখনো মালিকশ্রেণীর কাঁধে কাঁধ ঠেকিয়ে ওদের মধ্যে ঘোরাঘুরি করে ওদের মধ্যে ওঠাবসা করার জায়গা করে ফেলি আমি। এই অবস্থাতেও আমার দৃষ্টিকোণ থেকে যায়। এর কারণ, নৈনিতালে রোচক ও শোষক এই দুটি রূপকেই আমি দেখেছি।" ('এই নৈনিতাল')

(৩) দেশি ও বিদেশি ধনীরা তাদের নাদিরশাহী স্বাধীনতায় খুশি হলেও জনগণ তলায় পড়ে পিষ্ট হতে থাকায় যশপাল অখুশি: "আমার জীবনের বড় অংশই আমি আমার স্বদেশের স্বাধীনতার জন্য ব্যয় করেছি। অন্যান্য দেশবাসীর মতো আমিও স্বদেশের স্বাধীনতা তথা স্বতন্ত্রতা নিয়ে ভেবেছি। পুনরুক্তিতে কি লাভ? স্বতন্ত্রতার আকাঙ্ক্ষা নিয়ে আমি কংগ্রেসের ডাকে কলেজের সঙ্গে অসহযোগ করেছি, তারপর চন্দ্রশেখর আজাদ এবং ভগৎ সিং এর সঙ্গে একত্রিত হয়ে প্রাণ বাজি রেখেছি। এই কারণেই যখনই স্বতন্ত্রতা নিয়ে কথা ওঠে, তখন আমি গভীরভাবে চিন্তা না করে পারি না যে, স্বতন্ত্রতার রূপে আমি কি পেলাম এবং কীইবা পাবার আশা রাখি? দেশের স্বতন্ত্রতা এবং ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্যকে আমি ভিন্ন ভিন্ন করে দেখি না। আমার দেশের স্বতন্ত্রতা বলতে হিমালয়, কিংবা বিন্ধ্যাচল কিংবা গঙ্গা-যমুনার স্বতন্ত্রতা নয়। এই

দেশের স্বতন্ত্রতা বলতে এদেশের ব্যক্তিবর্গেরই স্বতন্ত্রতাকে বোঝানো উচিত। ১৯৪৭ সালে স্বরাজ বা স্বাধীনতার ঘোষণাকে আমি এবং আমার মতাবলম্বীরা এই দেশের ব্যক্তিবর্গেরই স্বাধীনতা বলে বুঝেছি। স্বাধীনতাকেই কোনোদিন অনুভবের মধ্যে ঠাহর করতে পারলাম না। সর্বদা এই স্বাধীনতার অভাবই অনুভব করলাম। আমার কাছে আর্থিক স্বাধীনতা ছাড়া অন্য কোনো স্বাধীনতারই উপযোগিতা নেই।"

('নাদিরশাহী ব্যক্তিগত স্বতন্ত্রতা')

(৪) উপন্যাসের শিল্পরূপ নিয়ে প্রখ্যাত হিন্দী সাহিত্যিকদের সঙ্গে এক বেতার বিতর্কে একটি প্রশ্নের জবাব দিতে গিয়ে যশপাল বলেছিলেনঃ "উপন্যাস লেখাতে আমার যা অভিপ্রায় সেটা হচ্ছে একটি কথাকে সুস্পষ্ট করে তোলা। মানবসমাজ রীতিগতভাবে চলে আসা বিচারধারার দান নয়, বরং স্রষ্টা। সমাজের জীবনে যা প্রায়শ ঘটে থাকে তাকে উপন্যাসের পরীক্ষা-পাত্রে দেখাতে চাই, কীভাবে এই ঘটনা দ্বারা আমাদের বিচার-ধারায় পরিবর্তন আসে অথবা সমাজের নব নব অনুভব কিভাবে নতুন বিচারধারা জন্ম দেয়। বলা হয়ে থাকে, মূল্যায়নের নিজেরই একটা স্বতন্ত্র মাত্রা রয়েছে, মানবসমাজের মূল্যায়নের ধারা মানবসমাজের ক্রমবিকাশকে নির্দিষ্ট করে। মূল্যায়নের এই স্বতন্ত্র ধারা এবং মূল্যায়ন-অনুযায়ী জীবনের নির্দিষ্ট হওয়া নিয়ে এই যে ধারণা, এর নাম ভাববাদ বা আইডিয়ালিজম। এর বিপরীত মেরুতে জীবনের বস্তুগত পরিস্থিতি ও অনুভব থেকে সমাজের বিচারধারাকে উপজ বলে মনে করার যে ধারণা, তাকেই বলব বস্তুবাদ বা মেটেরিয়ালিজম। আমি উপন্যাসের মধ্যে দিয়ে সামাজিক ঘটনাবলিকে বিশ্লেষণ করার প্রয়োজনের উপর জোর দিতে গিয়ে বলতে চাই, সমাজের বিচারধারা ও আদর্শ সমাজের জীবনকে পিঠমোড়া দিয়ে বেঁধে চলৎশক্তিহীন করে রাখার নিয়ম শৃঙ্খলা নয়। এর বিপরীত ব্যাপারটাই আমার প্রতিপাদ্য। বিচারধারা ও আদর্শের কাছ থেকে চাই সমাজের আর্থিক ও বস্তুগত পরিস্থিতি থেকে উপজ সামাজিক স্বাচ্ছন্দ্য। এই বিচারধারা সমাজকে তার পরিবর্তনশীল পরিস্থিতির সপক্ষে স্বচ্ছন্দে নিজ জীবন গড়ে তোলার জন্য সহায়তা করতে পারে।" উপরিউক্ত উদ্ধৃতি চতুষ্টয় থেকে মনে হতে পারে, গুরুগম্ভীর তথ্য দ্বারা বুঝিবা যশপালের আত্মকথামূলক নিবন্ধগুলি ভারাক্রান্ত। ব্যাপারটা কিন্তু মোটেই তা নয়। যশপাল তাঁর সিদ্ধান্তগুলিকে যুক্তির উপরে কিভাবে দাঁড় করিয়েছেন, সেটা দেখানোই এই উদ্ধৃতি দাখিলের উদ্দেশ্য।

গুরুগম্ভীর কথাবার্তার মধ্যে হালকা মেজাজ তৈরির কাজে কিংবা তিক্ত শ্রেণিসংগ্রামী বক্তব্য রেখেও মানবিকতাকে সবসময় লক্ষ্য হিসেবে উপস্থিত করার সক্ষমতায় যশপালের চারিত্রিক উচ্ছলতা ও সজীবতা সক্রিয় থেকেছে।

যশপাল প্রতিদ্বন্দ্বীদের, তাঁরা যত বড় পদাধিকারীই হোন না কেন, মতাদর্শকে বিতর্কের জাঁতায় পিষে ফেলতে দ্বিধা করেন নি। কিন্তু প্রতিদ্বন্দ্বীদেরও চরিত্রনিধনে প্রবৃত্ত হননি তিনি তর্কে জিতবার তাড়নায়। এই কারণেই, তর্কে জিতবার সঙ্গে সঙ্গে সৎ প্রতিদ্বন্দ্বীকে জয় করে দলে টানার কৌশলটাও তিনি দেখিয়েছেন। তর্ক করতে গিয়ে যেমন শত্রুবৃদ্ধি করেছেন, তেমনি বন্ধু-সংগ্রহের পদ্ধতিও বাতলেছেন।

'সাহিত্যের মূল্যাংকন' নিবন্ধটিতে দুই বৃকোদর সাহিত্য-পৃষ্ঠপোষকের যে ছবি তিনি এঁকেছেন, তাতে যেমন রয়েছে শ্লেষ, তেমনি রয়েছে কৌতুক। যশপালকে এদের

লেখা শোনাতে গিয়ে কি বিপদে পড়েছিলেন, তার বর্ণনা দিয়েছেন তাঁর 'দেশদ্রোহী', 'পিঁজড়ে কি উড়ান', 'উয়ো দুনিয়া' প্রভৃতির প্রসঙ্গমাত্র টেনেছেন এতে। ঐ দুই বৃকোদর–ভ্রাতা শয়নরত অবস্থায় তাঁর গল্প শুনেছেন। অর্থাৎ শোনেন নি, তবু বলেছেন, চমৎকার। যশপাল বলেছেন, এক ভাই অর্ধেক শুনেছেন, আরেক বাকি শুনেছেন। দুজনে মিলে একটা রায় দিয়েছেন।

আশ্চর্য ক্ষিপ্রতা ও লঘুতার প্রয়োগ করেছেন তিনি লেখকের দুর্ভাগ্য বর্ণনায়। তত্ত্বের বিন্দুমাত্র অবতারণা করেন নি।

যশপাল তাঁর শিল্পীচিত্তের অধীরতাকে এই নিবন্ধে চাপা দিয়ে রেখেছেন, কারণ অনেক লেখক-লেখিকাকেই তো পৃষ্ঠপোষক পাবার জন্য অধীরতাকে চাপা দিয়ে জীবনব্যাপী ধৈর্যের পরীক্ষা দিতে হয়। অবসরভোগী শ্রেণি কর্তৃক শাসিত ও শোষিত সমাজে এই যে শিল্পীর দুর্ভাগ্য, এতে যশপাল সচেতনভাবে শরিক।

কিন্তু যশপাল অধীরতাও প্রকাশ করেছেন স্থানকালপাত্রকে পরোয়া না করে। এতে লাভ ছাড়া লোকসান হয়নি। 'শিমলা থেকে কুলু' নিবন্ধে আলমোড়ায় নিকোলাস রোয়েরিখের বাড়িতে–তাঁর আঁকা ছবি দেখতে দেখতে এক জায়গায় বলে বসেছেন, "অধিকাংশ ছবি ছিল হিমাচ্ছাদিত পর্বত শৃঙ্গের। উর্দি পরা আর্দালি ছবিগুলিকে ঠিকমতো নামানো-ওঠানোর কাজ করছিল। সঙ্গে সঙ্গে ছবিগুলি সম্বন্ধে আমাদের আলাপও চলছিল (শিল্পী এবং আমার মধ্যে)। ছবিগুলির মধ্যে মানবভাব যে কম সে কথা না বলে থাকতে পারলাম না। বললাম, সূর্যোদয় কিংবা সূর্যাস্তের আলোয় প্রদীপ্ত হিমাদৃত পর্বতশৃঙ্গের চেয়েও আমার কাছে কুঁড়েঘরের বস্তি অনেক বেশি মর্মস্পর্শী বলে মনে হয়েছে। এতে মানুষ দেখানো হয়েছে শিল্পী (রোয়েরিখ) আমার এ কথায় ক্ষুব্ধ হননি। বিষয়টি নিয়ে কিছু কিছু কথাও হল। পিকাসোর কথাও উঠল"।

যশপাল তত্ত্বের স্রষ্টা মানব-মানবীকে বড় করতে চেয়েছেন বলে শুকনো ডালেও বসন্তের কোকিলকে বসাতে দ্বিধা করেন নি। 'সেবাগ্রাম দর্শন' নিবন্ধে পথের যে ছবি এঁকেছেন, তাতে পরবর্তী বিতর্কের তিক্ততার আভাস মাত্র নেই।

"রোদ ছিল কড়া। চারিদিকেই রুক্ষ এলাকা। এই অঞ্চল কমলালেবুর জন্য প্রসিদ্ধ। কমলালেবুতে ভরা গাছগুলিকে দেখতে বেশ লাগছিল, কিন্তু রোদের ঝাঁজে ফলগুলো ফিকে হয়ে গিয়েছিল। এদের দেখে মনে হচ্ছিল এরা যেন সুন্দর সুন্দর কাপড় পরা শহরে স্বাস্থ্যহীনা নিস্তেজ নারীরা। তবে হ্যাঁ। কমলালেবুর বাগিচায় গাছগুলিকে যে মেয়েরা জল দিচ্ছিল কিংবা গাছ থেকে ফল পেড়ে স্তূপ করছিল, তারা অমন বিরস ছিল না। এদের গায়ের রঙে ছিল সবুজের ছোঁয়া, আর লাবণ্যের রসে ছিল ঝাঁজ।"

১৯৪৬-৪৭ সালের লেখা যশপালের 'শাক' (সাগ) গল্পটি পড়েছিলাম। এটি একটি জেলখানার গল্প। বন্দীদের যে 'শাক' খাওয়ানো হত, তার কথা। এই শাকের মধ্যে মৃত বন্দীর মাটি চাপা দেওয়া দেহের কথা। আমাদের পরাধীনতায় আমাদের কথা। এদের অত্যাচারীর বিরুদ্ধে জনগণের ক্রোধকে জাগ্রত করতে চেয়েছিলেন শিল্পকে। সেজন্য এক ফোঁটা রস রাখেন নি। তিনি যদি না করতেন তবেই সত্যের অপলাপ হত।

কিন্তু ক্রোধের পরেও কথা আছে। সেটা হচ্ছে মানব-মানবী যে সাম্য ও স্বাধীনতার জন্য লড়াই করছে, তার লক্ষ্য এবং উপকরণ আনন্দ, যার ঝর্ণাধারা হচ্ছে সাধারণ নারী-পুরুষে মেহনতির শ্রম।

যশপাল শুধু একে দূরকালের পাওনা হিসেবে রাখেন নি, একে সংগ্রামী জীবনের কোষে কোষে রেখেছেন। বিপ্লবীর জীবনের তিক্ততা এবং মাধুর্য দুইই পালনীয়।

আদিবাসী বিদ্রোহের শিল্পরূপ-সন্ধান

গত শতকের শেষের দশকে ভারতবর্ষের বিহার রাজ্যের অরণ্যভূমি ছোট নাগপুরের মুণ্ডা উপজাতীয় আদিবাসীরা ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে যে ব্যাপক বিদ্রোহ করেছিলেন, তাকে মহাশ্বেতা দেবী তাঁর 'অরণ্যের অধিকার' উপন্যাসে তুলে ধরেছেন। শহীদ মুণ্ডারি নেতা বীরসার নামে এই বিদ্রোহের যে-সব গাথা বর্তমান শতাব্দির শুরু থেকেই ছোটনাগপুরের আদিবাসীদের গানের মধ্য দিয়ে প্রচারিত হলেও আমাদের উপমহাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সাহিত্যের সদর পর্যন্ত পৌঁছাতে পারেন নি এতদিন, মহাশ্বেতা দেবী তাদের একটানে উপন্যাসের শিল্পরূপে এনে ফেলেছেন, এটা প্রথমেই লক্ষণীয়। বাংলা উপন্যাসের এটা গর্বের ব্যাপার। বাংলা উপন্যাসের বিস্তার ও গভীরতার এই 'অরণ্যের অধিকার'। প্রায় শতাব্দিকাল ধরে চাপা পড়া ছোটনাগপুরের আদিবাসীদের মুক্তিযুদ্ধের নায়ক-নায়িকাদের পুনরুত্থান ঘটেছে এই উপন্যাসে। তার শিল্পী হিসাবে মহাশ্বেতা দেবী বাংলা উপন্যাসকে বাংলা ভাষীদের সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য ভাষা-ভাষীদের কাছে আদরণীয় করে তোলার কাজেও বড় রকমের সংযোজন করেছেন।

যে আদিবাসী মুণ্ডাদের নিয়ে এই উপন্যাসটি লেখা হয়েছে, তাঁদের পরিপূর্ণ বিপ্লবী অভ্যুদয় ইতোমধ্যে নিশ্চয় আসন্ন হয়ে উঠেছে এবং তাঁদের মাতৃভাষায় বড় ধরনের কাব্য ও উপন্যাসও নিশ্চয় আসন্ন। তবে বাইরে থেকেও বিপ্লবী অভ্যুদয়ের একটা বর্হিরূপ দেয়া যে সম্ভব তার একাধিক প্রমাণ রয়েছে দেশ-দেশান্তরের উপন্যাসের শিল্পরূপের সাধনায়। মাতৃভাষা যতক্ষণ না পর্যন্ত সমস্ত ধরনের শিল্পরূপকে দখলে নিচ্ছে, ততদিন অন্য ভাষা তার কাজকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে। কালো আফ্রিকায় বিশেষ করে মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে লেখা উপন্যাসের ক্ষেত্রে এটা ঘটছে গত কয়েক দশক ধরে। এতে অবশ্যই সমগ্র সত্যকে তার সমস্ত সূক্ষ্মতায় পাবার আশা করা যায় না। তবু, এই ধরনের উপন্যাসের মধ্যে দিয়ে একটা ব্যাপক পরিচয় ঘটছে এই সমস্ত সমস্যার। মহাশ্বেতা দেবীর 'অরণ্যের অধিকার'কেও আমরা এই কৃতিত্ব দেব নিশ্চয়।

আলোচ্য 'অরণ্যের অধিকার' উপন্যাসের কাহিনি নির্বাচন সুষ্ঠু। বীরসার নেতৃত্বে মুণ্ডাদের বিদ্রোহ ছিল একই সঙ্গে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের ঔপনিবেশিক রাজের বিরুদ্ধে ও ব্রিটিশ শাসকদের ধারকবাহক মহারাজা জমিদার মহাজনদেরও বিরুদ্ধে। ব্রিটিশের বন্দুক ও বেয়নেটের মোকাবেলা করেছিল আদিবাসীদের তীর ধনুক ও বল্লম। স্বাধীনতার ডাকে সাড়া দিয়েছিলেন আবালবৃদ্ধবনিতা। উনিশ শতকেরই মধ্যভাগে সাঁওতাল পরগণা ও সন্নিহিত এলাকার সাঁওতাল আদিবাসীরা নিজ বাসভূমে অধিকার

পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্যে যে বিদ্রোহাগ্নি জ্বেলেছিলেন, তাতেও একজন তরুণ মুণ্ডা নেতা যুদ্ধে যোগ দিয়েছিলেন। বীরসার নেতৃত্বে আয়োজিত মুণ্ডাঅভ্যুত্থানে ও তাদের ভূমিকা ছিল। তবে অরণ্যের অধিকারের বিদ্রোহের উদ্ভব, ছাঁচ, ধ্যান-ধারণা একটা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ব্যাপার। মুণ্ডা আদিবাসীদের 'পুরাণ' থেকে এসেছে এই বিদ্রোহের মন্ত্র। নেতা বীরসাকে বিদ্রোহী মুণ্ডারা প্রেরিত ভগবান বলে মনে করেছেন। এই মুণ্ডা বিদ্রোহের রণধ্বণি ছিল 'উলগুলনি'। আবার বিশ শতকের শুরু হতে যাচ্ছে, তখনকার বাস্তবতা হচ্ছে এই যে, বীরসা খ্রীস্টান মিশনারি স্কুলে পড়েছেন। আধুনিক শিক্ষা না হলে যে দারিদ্র্য ও পরাধীনতার জিঞ্জির ভেঙে বেরিয়ে আসা যাবে না, এই চিন্তা করে বীরসা মিশনারি স্কুলে ভর্তি হয়েছিলেন এবং খ্রিস্টানও হয়েছিলেন। কিন্তু আচারে আচরণে মুণ্ডারি না হলেও সমস্ত মুণ্ডাদের নিয়ে মুক্তিযুদ্ধে নামা যাবে না, এ কথাটা বীরসা মর্মে-মর্মে বুঝেছিলেন। সেই জন্যেই দেখা গেল, হাজার হাজার বছরের মুণ্ডা-মানস বিদ্রোহের মধ্য দিয়ে প্রতীকী হয়ে উঠল। বীরসা ভগবান হিসেবে এলেন এই কারণেই।

কামান-বন্দুকের সামনে অবশ্য বীরসা ও বীরসাহিরা তীর-ধনুক বল্লম নিয়ে তাঁদের বিদ্রোহকে রক্ষা করতে পারেন নি। অরণ্যের ঘাঁটিতে বীরসা ধরা পড়লেন ব্রিটিশের সেপাইদের হাতে। শত শত মুণ্ডাও গ্রেপ্তার হলেন সংগ্রামের ধারায়। বীরসার মৃত্যু হল রাঁচি জেলে কলেরায়, বিচারাধীন থাকার সময়। যাঁরা পুলিশ কিংবা ফৌজের গুলিতে কিংবা জেলখানায় নিদারুণ নিগ্রহে মরলেন না, তাঁদের তিনজনের ফাঁসি হল। অনেকের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হল। যাদের কম মেয়াদের সাজা হল, তাদের মধ্যে মেয়েরাও ছিলেন।

এই বিদ্রোহ যে প্রশমিত হয়নি, তার প্রমাণও দাখিল করা হয়েছে 'অরণ্যের অধিকার' উপন্যাসে। এই সমস্ত ব্যাপারগুলিই ইতিহাসের সত্য ঘটনা। অর্থাৎ মূল ঘটনাগুলো নিয়ে যে কাঠামো, সেখানে কোনো কল্পনা স্থান পায়নি। বীরসা সম্বন্ধে ছোটনাগপুরে এবং বিশেষ করে রাঁচিতে একটা কাহিনি বিশের দশকে প্রচারিত ছিল। সেটা এই যে, বীরসার ফাঁসি হয়েছে। উপন্যাসের কোনো কোনো ঘটনার বর্ণনার সঙ্গে সেদিনকার লোকশ্রুতির পার্থক্য রয়েছে। কিন্তু মহাশ্বেতা দেবীর মূল কাহিনিকেই আমরা শতকরা শতভাগ সঠিক বলব।

তবে 'অরণ্যের অধিকার' উপন্যাসকে এর রচয়িত্রী যে কল্পনায় ভরে দিয়েছেন একথাটাও এখানে বলতে হবে। যদিও বাস্তবের ভিত্তির উপর দাঁড়িয়েই তিনি কল্পনার বিস্তার ঘটিয়েছেন, তবু যেসব মুণ্ডা নরনারী চরিত্রকে তিনি সামনে এনেছেন এবং তাদের দিয়ে যেসব কথা বলিয়েছেন, তাদের অনেকটাই একান্তভাবে শিল্পমানসের ধারণা থেকে বেরিয়ে এসেছে।

এদিকটা মাঝে মাঝে প্রবলভাবে প্রচণ্ড আবেগে উপস্থাপিত হয়েছে যে, 'অরণ্যের অধিকার' উপন্যাস পড়ে কোথাও কোথাও মনে হতে পারে, বস্তুভিত্তিক উপন্যাস এক্ষেত্রে বুঝিবা অনুভূতিপ্রধান কাব্যের জন্যে জায়গা ছেড়ে দিয়েছে। বস্তুতপক্ষে এই উপন্যাসটি মহাশ্বেতা দেবীর অন্যান্য উপন্যাস এবং বিশেষ করে তাঁর অধিকাংশ ছোটগল্পের বস্তুপ্রধানের পাশাপাশি একেবারে একটি ভিন্ন ধরনের কাজ।

মহাশ্বেতা দেবীর 'হাজার চুরাশির মা'র পাশাপাশি 'অরণ্যের অধিকার' উপন্যাসের বীরসার মায়ের চরিত্রের একটা সাযুজ্য খুঁজে পাওয়া যেতে পারে মাতৃহৃদয়ের তরফ থেকে। কিন্তু 'অরণ্যের অধিকার' উপন্যাসে বীরসা ও তার মা কবসির যে কোমল কাব্যিক রূপকথার ধরনের মমতার ছবিগুলি রয়েছে সেগুলো কিছুটা বিস্ময়কর নিশ্চয়।

সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয় বোধহয় এই যে, মহাশ্বেতা দেবী তাঁর আদিবাসীদের বিদ্রোহের এই কাহিনিকে এমনভাবে রূঢ়তা থেকে মুক্ত রাখলেন কি করে?

বীরসার প্রতি সালীর ভালবাসার যে বর্ণনা এতে রয়েছে এবং সালীকে যে একটি প্রাণবন্ত রূপ দেয়া হয়েছে তাতে কোন বিকৃতির ছায়া পড়েনি।

মহশ্বেতা দেবী মুণ্ডাদের দারিদ্র্যেরও বঞ্চিত ও লাঞ্ছিত জীবনকে একান্ত সত্য করে তুলে ধরেছেন। কিন্তু এই দুর্বিপাকের মধ্যেও মুণ্ডা নারীপুরুষ কেউ অশ্লীলভাষী হয়ে ওঠে নি। এটা কি বীরসার প্রভাবে ঘটেছিল?

এর মূলে যাই হোক না কেন, এতে আশা হারাবার বদলে আশান্বিত হওয়া উচিত। বিদ্রোহ বা বিপ্লব যখন যেখানে এসেছে, তখন সেখানে একটা সুস্থতার এবং উন্নত মানবিক মূল্যবোধের তরঙ্গোচ্ছ্বাস ঘটেছে। এটা আমাদের অনেকের বাস্তব অভিজ্ঞতা। 'অরণ্যের অধিকার' উপন্যাসটি এই অভিজ্ঞতাকে জোরদার করেছে।

যুগ যুগ ধরে যারা অরণ্যের আদিবাসী হিসেবে সহজ সরল সম্পর্কের জীবনযাপন করে এসেছেন, তাদের স্বাধীনতা ও সাম্যবাদী সমাজের ধ্যান-ধারণাগুলিতে একটা স্বতঃস্ফূর্ত সজীবতা থাকবে সেটা স্বাভাবিক। সেদিক থেকে বীরসা এবং তাঁর সংগ্রামী সাথীরা স্বতঃস্ফূর্ত সজীবতার স্বাভাবিকভাবেই অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। লোকায়ত বিদ্রোহের কাহিনিতে তাই কোমলতা একান্ত সত্য। রোমাঁ রলাঁর মতো মানবিক মূল্যবোধ সচেতন কথাশিল্পীও যে ঐতিহাসিক উপন্যাসে লোকায়ত চরিত্র চিত্রিত করতে গিয়ে সাংঘাতিকভাবে রূঢ় হচ্ছেন, সেটা একান্ত সত্যের আরেকটি দিক। সেইভাবেই আমরা মহাশ্বেতা দেবীর অন্যান্য লেখার পাশে 'অরণ্যের অধিকার'কে দেখতে পারি।

জীবনের সত্যের একদিকে রয়েছে কোমলতা, আরেকদিকে রয়েছে রূঢ়তা। এ দুটোর কোন একটাকে কাউকে সর্বময় মনে করতে দিতে পারেন না কোন সত্যের শিল্পী।

নৈরাশ্য ও আত্মতুষ্টি দুইই জীবনে অর্ধসত্য। বস্তুবাদী এবং ভাববাদী উপন্যাস ও কাব্য পড়তে পড়তে অনেক সময় আমরা এই অর্ধসত্যের ফাঁদে পা দিয়ে বসি।

একটা ব্যর্থ বিদ্রোহের কাহিনি পেশ করতে গিয়ে মহাশ্বেতা দেবী যে আদিবাসী নরনারীদের অন্তরের মধ্যে উলুগখানের অপরাজেয়তাকে উৎসাহিত হতে দেখতে পেয়েছেন, সেটা সত্যের দ্বৈতরূপে উপলব্ধি থেকেই এসেছে নিশ্চয়।

দুই আধুনিক মাতৃতন্ত্রী সাম্যবাদী নাট্যশিল্পী

চল্লিশের দশকে যুক্তবাংলার এবং পরবর্তী দশকগুলিতে দুই বাংলার সংগীত ও নাট্যজগতে লোকজীবনকে ভিত্তি করে গণসংগীত ও সাধারণত মুক্তমঞ্চে অভিনয়ের একটি অনুশীলিত ও পরিশীলিত লোকধারা সাধারণভাবে গণনাট্য নাম নিয়ে কাজ করে

আসছে। এই গণনাট্যধারা পঞ্চাশ-ষাট ও সত্তর আশির দশকে সামাজিক রাজনৈতিক পরিস্থিতির পরিবর্তনে এবং নানা ধরনের বিক্ষোভ ও উত্থানে রসদ জুগিয়েছে। এই গণনাট্যের যেমন কয়েকটি পর্বান্তর হয়েছে, তেমনি এর প্রয়োগকর্তা বা কর্ত্রীরা বিষয় ও আঙ্গিকের ধারায় ক্রমাগত রদবদল করেছেন। এ ব্যাপারে যেমন একেকটা ক্ষেত্রে ধৈর্য্যের তেমনি অস্থিরতারও প্রকাশ ঘটেছে। এমন সব বিতর্কের অবতারণা হয়েছে যেগুলির মীমাংসা হয়নি। এইভাবে যেসব শিল্পী কাজ করেছেন, তাঁদের দু'জনকে এখানে সামনে রেখে বিগত পাঁচদশকে প্রথমে যুক্তবাংলার এবং পরে দুই বাংলায় লোকভাষা, লোক চৈতন্য ও লোকশক্তির উত্থানের ধারায় যেমন দু'জনের নির্দিষ্ট সৃষ্টি ও ভূমিকাকে, তেমনি সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র গণনাট্য ধারায় অবদান ও প্রতিশ্রুতিকে বুঝতে চেষ্টা করছি। এই দুজন হচ্ছেন বিজন ভট্টাচার্য ও ঋত্বিক ঘটক। বিজন প্রধানত মঞ্চনাট্যের, ঋত্বিক মূখ্যত চলচ্চিত্রের মাধ্যমে আলাদা আলাদাভাবে কাজ করেছেন। এঁদের মেজাজ ও ব্যক্তিত্ব দু'ধরনের হলেও এঁরা বিশেষ একটা বিষয়কে ক্রমেই বড় করে সামনে আনতে চেয়েছেন। সেটা হলো এঁরা দুজনেই আধুনিক মাতৃতন্ত্রী-সাম্যবাদী নাট্যশিল্পীরূপে প্রবলভাবে আত্মপ্রকাশ ঘটিয়েছেন। এঁরা দুজনেই সত্তরের দশকে প্রয়াত। এরপরে দুটো দশক অতিক্রান্ত হতে চলেছে। তবে দুই বাংলারই লোকভাষা, লোকচৈতন্য ও লোকশক্তির বৈপ্লবিক সাম্যবাদী গণতান্ত্রিক দৃষ্টি ও সৃষ্টির ধারায় এঁদের দু'জনের কাজ ও প্রভাব নবীন নবীনাদের পরীক্ষা নিরীক্ষায় রয়েছে এবং থাকবে। এই সময়ে একটা নিশ্চয়তা নিয়েই '৯৩-এর অমর একুশের শহীদ স্মরণ আবহে এঁদের সামনে রাখছি বিশেষ করে আধুনিক বৈজ্ঞানিক সাম্যবাদী ভাবনা ও নির্মাণের সাম্প্রতিক বিপর্যয়কে অতিক্রম করে সাধারণভাবে সমগ্র সাম্যবাদী প্রত্যাশা পূরণের কর্মকাণ্ডে এগিয়ে চলা সম্ভব হবে মনে করে। এই নব্বই-এর দশকে আরেকটা শতাব্দির মুখে গত শতাব্দি কাল ধরে পৃথিবী জুড়ে গড়ে ওঠা বহুজাতি গোষ্ঠীগত বহুভাষী গণ-সংস্কৃতির পুরোনো ও নতুন ভিতগুলোকে ধস নামায় আমাদের বিবেচ্য দুই শিল্পীর সৃষ্টি 'কি রবে আর কি রবে না' নিয়ে বড় করে কিছু দেখতে যাওয়াটাই বিতর্কিত হতে পারে। কিন্তু এই বিতর্কের ঝুঁকি নিচ্ছি একথা মনে করে যে, আজকের সাম্যবাদের ভবিষ্যত নিয়ে এর নানা ধরনের ধারকধারিকাদের বহুমুখী প্রত্যয়কে নতুনভাবে প্রাণবন্ত করতে সাহায্য করবে বিজন ও ঋত্বিকের সৃষ্টি ও দৃষ্টির ধারা। এর একটা বড় কারণ হলো, এঁরা দু'জনেই বৈজ্ঞানিক সাম্যবাদের অনুশীলন ও পরিশীলন করেও প্রথমত যান্ত্রিকতা পরিহার করে সাম্যবাদী মূল্যবোধগুলিকে বুঝতে ও বুঝাতে চেয়েছিলেন। দ্বিতীয়ত, এঁরা মাতৃতন্ত্রী সাম্যবাদী ধ্যানধারণার উৎস ও প্রযোজক রূপে দেখেছিলেন লোকশক্তিকে তথা শ্রমজীবী জনগণকে সমগ্রভাবে। তৃতীয়ত, দুই বাংলাতেই বর্তমানে লোকজীবনকে বিভক্ত করার জন্য কায়েমি স্বার্থের পরিপোষক ধর্মীয় মৌলবাদীরা যে নতুন করে দাঙ্গা হাঙ্গামা ও বিষাক্ত পরিবেশের সৃষ্টি করেছে, সেখানে মাতৃতন্ত্রী সাম্যবাদী লোকসমাজকে একত্রিত রাখতে সহায়তা করবেন আমাদের বিবেচ্য দুই শিল্পী।

॥ ২ ॥

উপরিউক্ত শেষোক্ত ঘটনার প্রেক্ষিতে আমরা প্রথমে চল্লিশের দশকের একটি গানের কথা বলবো। 'নবান্ন' নাটকের রচয়িতা ও উপস্থাপক বিজন ভট্টাচার্য এবং 'তিতাস একটি নদীর নাম' চলচ্চিত্রের স্রষ্টা ঋত্বিক ঘটকের মাতৃতান্ত্রিক সাম্যবাদী

লোকউত্থানের দিকে ঝুঁকে পড়ার মূলে যে কারণগুলি ও ঘটনা প্রবাহ রয়েছে তাতে যাবার আগে চল্লিশের দশকে বিশেষ করে দুর্ভিক্ষের দিনে বিজন ভট্টাচার্য গণনাট্য ও গণসংগীতের দলের অন্যতম পুরোধা গায়ক হিসেবে যে গান গেয়ে সারা বাংলা মাতিয়েছিলেন, তার প্রথম পংক্তি ছিল

ও হোসেন ভাই
দামুকাদিয়ার চাচা
ও পীতম ভাই
ময়নামতির বাঁছা
দুইখানা এক করিয়া আমাগোরে বাঁচা।

গ্রামবাংলার এই মুরুব্বিদের আমরা দুই শিল্পীরই পরবর্তী পর্যায়ের তথা মাতৃতন্ত্রী ঝোঁকের পর্বেও বিভিন্ন সৃষ্টিতে পেয়েছি।

আজ আমরা সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে বাংলা দেশের বিপ্লবের ধারাকে এগিয়ে নিয়ে চলার কাজে দুই বাংলার এই মুরুব্বিদের ডাক দিয়ে বিজন ভট্টাচার্যের 'দেবী গর্জন' ও ঋত্বিক ঘটকের 'যুক্তি তক্কো গপ্পো'র ধরনের কাজের ধারাকে খতিয়ে দেখবো।

॥ ৩ ॥

এই দুই বিদ্রোহী আধুনিক শিল্পীর প্রায় চল্লিশ বছরের কাজ বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে, দুজনেই আধুনিক নাট্যজগত থেকে বেরিয়ে গণনাট্যের উৎস ও উপকরণের সন্ধানে শ্রমজীবী জনগণের সঙ্গে মিশে যেতে চেষ্টা করে এমন কতকগুলি ভাব-প্রতীকের খোঁজ করছিলেন, যেগুলির মাধ্যমে বৈজ্ঞানিক সাম্যবাদ নিয়ে লেখা আধুনিকতম নাটককেও লোকসমাজের সংগ্রামীবোধের মর্মভূমিতে স্থাপন করা যেতে পারে। এই প্রয়াসে মাতৃ প্রতীকই তাঁদের কাছে সবচেয়ে বেশি হৃদয়গ্রাহী বিষয় ও মাধ্যম বলে মনে হয়েছিল।

তিরিশের দশকের শেষে এবং পুরো চল্লিশের দশকটাতেই এই শিল্পীর প্রথম যৌবনের একই সঙ্গে জিজ্ঞাসু ও সত্যসন্ধী মনে তখনকার মার্কসবাদী লেনিনবাদীদের একটি প্রিয় কথা রং ধরিয়েছিল। কথাটা ছিল—'জাতীয় রূপাধারে সমাজতান্ত্রিক মর্মবস্তু।' বস্তুতপক্ষে এঁরা দুজনেই যেমন জনগণের মুক্তির উপায়কে সাম্যবাদী সমাজের রূপরেখায় স্থাপন করেছিলেন, তেমনি সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা বিনা দ্বিধায় বাংলার গণমানসের প্রিয় রূপাধারগুলিকে নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা চালাবার কাজে অন্যান্য সাথীদের সঙ্গে মিশে গণনাট্য আন্দোলনের যৌথ প্রয়াসে শরিক হয়েছিলেন। মাতৃভাব প্রতীক এবং মাতৃতন্ত্রকে জাতীয় মুক্তি সংগ্রামে ও সাম্যবাদী সমাজ গড়ার কাজে জাগাবার উৎসসূত্র এটাই।

দু'জনেরই জীবনে আরেকটি তাগিদও মাতৃ প্রতীককে প্রাধান্য দেবার উপকরণ সন্ধানে ব্যাপৃত করেছিল। বিশেষ করে শ্রমজীবী নারীকে অবক্ষয়ী পুঁজিবাদী সামন্তবাদী সাম্রাজ্যবাদী সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা যে চরম দুঃখ লাঞ্ছনা ও অবমাননার চক্রে নিষ্পেষিত করে আসছে, এবং এই চক্র থেকে বেরিয়ে আসার জন্য বিশেষ করে বাংলার শ্রমজীবী নারীর তরফ থেকে যে মর্মন্তদ আকাঙ্ক্ষা রয়েছে, তাতে বিজন

ভট্টাচার্য ও ঋত্বিক ঘটক সমসাময়িক আরও অন্যান্য যুবার মতো আলোড়িত হয়ে বিশেষ করে চল্লিশের দশকের যুদ্ধ ও দুর্ভিক্ষ এবং দেশভাগের সময়ের শ্রমজীবী নারীর চরম অবমূল্যায়নে গভীরভাবে ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন। তাঁরা দুজনেই তখন বিকল্প সমাজের ভিত্তিকে রাতারাতি গড়ে তুলবার ব্যবস্থা করতে না পেরে শ্রমজীবী নারীদের মধ্যে থেকে মাতৃরূপের বর্ম তৈরি করেছিলেন এবং নারীকে সেই বর্ম পরিয়েছিলেন। এই বর্মের ছাঁচটাকে তাঁরা দু'জনেই নিয়েছিলেন বাংলার নিপীড়িত জনগণের ঐতিহ্য থেকে, যারা হাজার হাজার বছর ধরে তাদের নারী সমাজকে দুর্ভেদ্য ভাবপ্রতীকরূপী মর্যাদায় বসিয়েছে এবং চরম বিপর্যের মধ্যেও সেই মর্যাদাকে রক্ষা করে এসেছে। নারীকে শক্তিরূপিনী করতে গিয়ে জনগণ অতিপ্রাকৃত শক্তি আরোপ করেছে।

তৃতীয় যে ঘটনা বিজন ও ঋত্বিককে মাতৃতান্ত্রিকতার প্রতি আকৃষ্ট করেছিল, সেটা হচ্ছে সম্প্রদায় ও ধর্ম নির্বিশেষে মাতৃ প্রতীকগুলির গভীর ঐতিহ্যের আকর্ষণীয়তা। '৪৭ সালে ধর্মের ভিত্তিতে উপমহাদেশ বিভাজনের কারণ ও পরিণতিগুলি এই দুই নাট্যশিল্পীর মনে গভীর ক্ষত সৃষ্টি করেছিল। যে সাম্প্রদায়িক বিভেদ ও হানাহানি বিভাজনের আগে থেকেই পুঞ্জিভুত হয়ে দেশভাগের পরে তাদের সমস্ত গলিত বিষাক্ত পুঁজি নিয়ে বেরিয়ে এসেছিল এবং শ্রমিকশ্রেণী ও কৃষক সমাজকে সাময়িকভাবে হলেও ছত্রভঙ্গ করে বিপ্লবী বুদ্ধিজীবীদের একাংশকে বিভ্রান্ত করতে পেরেছিল, তার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিলেন দু'জনেই। সাম্প্রদায়িক বা ধর্মীয় হানাহানির দরুন বিপর্যস্ত রাজনৈতিক ও সামাজিক বিপ্লবী মূল্যবোধগুলিকে নতুন করে সংহত করার উপায় তাঁরা পেয়েছিলেন জনমানসের মূল্যবোধের ক্ষেত্রে মাতৃতান্ত্রিক ভাবপ্রতীকগুলিতে। তাঁরা দেখেছিলেন, জনগণ চরম বিপর্যয়ে পড়েও কতকগুলি মূল্যবোধ হারায়নি এবং এই সুরক্ষিত মূল্যবোধগুলির একটি হচ্ছে মাতৃতান্ত্রিকতা।

এই বিষয়টিকে আধুনিক সাম্যবাদের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ করে নিতে পারার মূলে আরেকটি ব্যাপারও উৎসাহ যুগিয়েছিল। বিশ্বের একজন সেরা কমিউনিস্ট নাট্যশিল্পী বা রচয়িতা বার্টোল্ড ব্রেখটের প্রবল মাতৃঝোঁক বস্তুতপক্ষে বর্তমান বিশ্বের সর্বত্রই উপরিউক্ত আকাঙ্ক্ষিত সামঞ্জস্য-বিধানের প্রয়াসকে মহিমান্বিত করেছে। এ প্রসঙ্গে ব্রেখটের নাটক 'মাদার কারেজ' ও 'কাসিয়ান চক মার্কেভ' উল্লেখ্য। ব্রেখ্‌ট তাঁর মাতৃতান্ত্রিক ঝোঁককে শোষণের বিরুদ্ধে শ্রমজীবী নরনারীর সংগ্রাম ও বিভেদকে জার্মান পরিবেশের ভিতরে ও বাইরে দ্বন্দ্বকে কাজে লাগিয়ে যে বিশ্বব্যাপী রেওয়াজ গড়ে দিয়েছেন, তাতেও বিজন ও ঋত্বিক অনুপ্রাণিত হয়েছেন।

চল্লিশের দশকে গণনাট্য আন্দোলনের উদ্বোধন ও প্রাসঙ্গিক অনুষ্ঠানগুলিতে ম্যাক্সিম গোর্কির 'মা' উপন্যাসের নাট্যরূপের মঞ্চায়ন মাতৃতান্ত্রিকতার সপক্ষে একটি রেওয়াজ তৈরি করেছিল, একথাটিও এখানে প্রণিধানযোগ্য। আমাদের আলোচ্য দুই নাট্যশিল্পীর কাজে এই মায়ের প্রভাব বড় মাত্রাতেই পড়েছিল।

॥ ৪ ॥

উপরিউক্ত বিবেচনাগুলি থেকে আমরা এবার একটা সাধারণ প্রাথমিক সিদ্ধান্তে পৌঁছে যেতে পারি। সেটা হলো নিম্নরূপ: আদিম সাম্যবাদী মানবগোষ্ঠীগুলিকে বিপর্যস্ত করে

যে শ্রেণি সমাজের উদ্ভব ঘটে ব্যক্তিগত সম্পত্তি প্রথার প্রবর্তনকে ভিত্তি করে, তাতে পরবর্তীকালে অভিজাত সামন্ত শাসকগোষ্ঠীরূপ ও তন্ত্রের উভয় দিকেই মাতৃতান্ত্রিকতার একটা ভাববাদী ধারা আরোপ করেছিল। এই ভাববাদীধারা বিজন কিংবা ঋত্বিককে কোনক্রেমেই মোহগ্রস্ত করতে পারেনি। কারণ তাঁরা দুজনেই অভিজাত ভাববাদী মূল্যবোধ নিয়ে কাজ করার কথা ভাবতেই পারেন নি। হাজার হাজার বছর ধরে শ্রমজীবী লোকসমাজে যে সাম্যবাদী মাতৃতন্ত্র বহুক্ষেত্রে চাপাপড়া অন্তঃস্রোতরূপে কাজ করে এসেছে, তাকে মুক্ত করার প্রয়াসই করেছেন দুজনে। তাঁরা সঙ্গে সঙ্গে এমন সমস্ত লোকনাট্য প্রতীককে নতুন করে বিশেষভাবে সামনে নিয়ে এসেছেন, যেগুলি এদের ধারক বাহকদের কাছেও গতানুগতিক হয়ে পড়েছে, অনুষ্ঠান সর্বস্ব হয়ে দাঁড়িয়েছে।

উদাহরণস্বরূপ ছৌনাচের মুখোশগুলিকে নিয়ে কাজ করার কথা বলা যেতে পারে। বিশেষ করে ঋত্বিক ছৌনাচের মুখোশগুলিকে ব্যবহার করেছেন শোষণ ও লাঞ্ছনার বিরুদ্ধে অবনত শ্রেণির মানুষের মহাক্রোধের অভিব্যক্তিরূপে। বিজন ভট্টাচার্য বেদে এবং সাপুড়িয়াদের মনসামঙ্গলের প্রতীকগুলির পুনর্বিন্যস্ত করে তাদের মধ্য দিয়েই অবনত শ্রেণির বিদ্রোহী মানসকে অগ্নিশিখায় রূপ দিয়েছেন।

বস্তুতপক্ষে এঁরা দুজনেই লোকায়তকেও অপরিবর্তিত রেখে কাজ করেন নি। এঁরা দুজনেই লোকায়তকে আবহমান রেখেছেন বৈপ্লবিক উত্থান ও পরিবর্তনীয়তাতেই। এই আবহমনতা শ্রমজীবী জনগণের প্রকৃতিজয়ী নবনব পরীক্ষায় নিকষিত গতিশীলতা। এই গতিশীলতায় সংহতির চুম্বক হিসাবে কাজ করেছে মাতৃপ্রতীক। সেই পরিপ্রেক্ষিতেও সাধারণভাবে গণনাট্য আন্দোলন এবং বিশেষ করে বিজন ও ঋত্বিকের সৃষ্টিতে ও ভাবনায় স্থান করে নিয়েছে মাতৃতন্ত্র।

যদি কোন স্ববিরোধীতা এই দুই নাট্যশিল্পীকে উত্যক্ত ও উৎক্ষিপ্ত করে থাকে তবে তা আর যাই হোক না কেন, অভিজাত ভাববাদী চিন্তায় সংক্রামিত স্ববিরোধীতা নয়। এদিক দিয়ে বিজন ও ঋত্বিকের কাজ বাংলার সমগ্র নাট্যশিল্প রূপের উত্তরণে ও পরীক্ষা নিরীক্ষায় একটা আধুনিক অগ্রপদক্ষেপ। লোকায়তকে অতিরিক্ত গুরুত্ব দেবার দিকে তাঁদের ঝোঁকে এটা ইতিবাচক ধারা হিসেবে বিশেষভাবে লক্ষণীয়। লোকায়তকে অভিজাত শ্রেণির ভাবনাবিস্তার ভাববাদী সংক্রামকতা থেকে রক্ষা করতে গিয়ে তাঁরা শ্রেণি সংগ্রামকে ব্যাপক মানবিকতায় অভিষিক্ত করে শ্রেণিগত যান্ত্রিক ধ্যানধারণা থেকে মুক্ত রাখতে পেরেছেন। মাতৃপ্রতীক হয়েছে সাধারণভাবে সকল ও প্রতিটি নির্বিত্ত মানবমানবীর মুক্তির প্রতীক। লোকায়তের ব্যাপারে তাঁদের আতিশয্য আধুনিক সাম্যবাদী বিপ্লবকে জুগিয়েছে ব্যাপকতা ও গভীরতা।

॥ ৫ ॥

আরেকটি আতিশয্যও এখানে বিচার্য। ক্রোধ, যন্ত্রণা ও বেদনা মাঝে মাঝে বিজন ভট্টাচার্যের নাটক এবং ঋত্বিক ঘটকের চিত্রনাট্যকে এত ভারাক্রান্ত করেছে যে, মনে হয় তাঁরা দুজনে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালের ক্রুদ্ধ নাট্যকার যাঁরা মানবজীবনকে অর্থহীন প্রতিপন্ন করার প্রয়াসের অনুসারী। কোন রকম ইচ্ছা সুখের মাধুর্যের সামান্য অবকাশটুকুকেও তাঁরা মেনে নিতে নারাজ। বরং এর বিপরীত দিকটাকে উপস্থিত করাই যেন তাঁদের একমাত্র করণীয়।

'যুক্তি তক্কো গপ্পো' চিত্রনাট্যে কিংবা 'চলো সাগরে' নাটকে এই দিকটা চরমে পৌঁছেছে। কিন্তু, তবু কি ঋত্বিক ও বিজন জীবনকে এবং তার নায়কনায়িকাদের আত্মসত্তা প্রকাশের প্রয়াসকে এবং সেই সঙ্গে জনগণের উত্থানকে বদ্ধগলিতে এনে দাঁড় করিয়ে দিয়েছেন কোন নাট্যসৃষ্টিতে?

এটা অবশ্যই কেউ দেখাতে পারবেন না। বরং জীবনের নায়ক-নায়িকাদের আত্মসত্তা প্রকাশের প্রয়াসকে এবং জনগণের উত্থানকে অর্থপূর্ণ করে তোলার জন্যই।

ঋত্বিক ঘটকের 'যুক্তি তক্কো গপ্পো'তে যে লোকউত্থানের উপস্থাপনা রয়েছে সেটি এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে লক্ষণীয়। এতে ঋত্বিক ও বিজন দুজনেই উপস্থিত। এঁরা প্রত্যেকেই রূপরস সৃষ্টির ক্ষেত্রে স্বাধীনতা খাটাবার ব্যাপারে চূড়ান্ত করে ছাড়ার লোক হওয়া সত্ত্বেও সাম্যবাদী মাতৃতন্ত্রী উত্থানের সঙ্গে হাতে হাত রেখে নিজেদের যুক্ত করেছেন। শুধু তাই নয়, এতে তৃপ্তি মিত্র ও শাঁওলী মিত্রকে তাঁরা সমবেত করেছেন পরিপূর্ণ অভিব্যক্তির সুযোগ দিয়ে। বঙ্গবালা এখানে শরণার্থিনী হলেও অনাথিনী নয়। আরও কথা আছে। চল্লিশের দশকের ঐক্য অভিমুখী গণনাট্য আন্দোলন ও সংঘ গড়ার ব্যাপারটা পঞ্চাশের দশকেই বিপর্যস্ত হয়েছে। এর অনেক কারণের একটা কারণ হচ্ছে কমিউনিস্টদের রাজনৈতিক বিভাজন। 'যুক্তি তক্কো গপ্পো'তে এই রাজনৈতিক বিভাজনের ষাট ও সত্তরের দশকের গভীর আবর্তের দিকে ইঙ্গিত থাকলেও কমিউনিস্টদের ঐক্যের আবশ্যিকতাকেও ঋত্বিক ঘটক তুলে ধরেছেন। মাতৃতন্ত্র এখানে শ্রমজীবী জনগণের বিপ্লবী মানবিক শ্রেণিগত উত্থানের বৈজ্ঞানিক-মনস্তাত্ত্বিক ভাষ্যের মাধ্যমে উপস্থাপিত। এখানে ঋত্বিক একটি তৃতীয় নামকে যুক্ত করেছেন। সে নাম মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের শেষের দিকের লেখায় ক্রমেই বেশিবেশি করে শক্তিরূপিনী হয়ে উঠেছে সাধারণ শ্রমজীবী নারীরা। কলে-কারখানায় ক্ষেতে-খামারে সমস্ত কর্মবিভাগে শ্রমজীবী নারী গণউত্থান গড়ে তোলার ক্ষেত্রেও সামনের সারিতে। এদিক দিয়ে নারী সম্পর্কে একটা নতুন মাত্রার মূল্যবোধ এসেছে বাংলা সাহিত্যে। নারীকে দেয়া হচ্ছে সত্য বা তত্ত্ব গঠনেও পুরুষের সমান মর্যাদা।

॥ ৬ ॥

আমাদের সর্বশেষ বক্তব্যটি হলো এই যে, বিজন ও ঋত্বিক দুজনেই নাটকে ও চিত্রনাট্যে ব্যবহার করেছেন সেই ভাষা যা পূর্ববাংলার হোক অথবা পশ্চিম বাংলারই হোক একান্তভাবেই শ্রমজীবীর মাতৃভাষা। মাতৃভাষার এই জনগণাত্মক ব্যবহার মাতৃতন্ত্রকে মাতৃধর্মের গণ্ডী অতিক্রম করতে সহায়ক হয়েছে।

জীবনানন্দের মার্কস লেনিন কমিউনিস্টরা

"বেলা অবেলা কালবেলা" ও রূপসী বাংলার কবি জীবনানন্দ দাশের দুটি উপন্যাস 'বাসমতীর উপাখ্যান' ও 'জলপাইহাটি'। কবির মৃত্যুর তিন দশক পরে প্রকাশিত। মহাকাব্যিক গদ্যে রচিত প্রত্যাশিত ও অপ্রত্যাশিত ঘটনা ও সংলাপবহুল এই দুটি

উপন্যাসে একদিকে যেমন এদের রচয়িতার প্রতিভার একটা অপ্রত্যাশিত দিক বেরিয়ে এসেছে, তেমনি এদের মধ্যে মার্কস লেনিন ও কমিউনিস্টদের নিয়ে যেসব কথাবার্তা রয়েছে, তা থেকে বুঝতে পারা যায়, বিশ ও তিরিশের দশকে যখন আমাদের উপমহাদেশ তথা বাংলায় বিষয়টি সম্বন্ধে ভাবনা-চিন্তা ও লেখাজোখা শুরু হয়েছিল, তখন থেকেই এই নিয়ে কবি জীবনানন্দ ভাবনা চিন্তা শুরু করেছিলেন এবং চল্লিশের দশকে শুধু কাব্যে নয় বড় মাত্রার উপন্যাস লেখারও প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। এখানে সাধারণভাবে উপন্যাস দুটির বৈশিষ্ট্যের উপর আলোকপাত করে বিশেষ করে মার্কস লেনিন ও কমিউনিস্টদের তথা সমাজতন্ত্র ও সাম্যবাদকে তিনি বিশ্ব উপমহাদেশীয় এবং তার মধ্যেই প্রথমে যুক্ত ও পরে দুই বাংলার স্বাধীনতা ও সাম্যের দাবিতে লোকউত্থানের ঘটনা পরম্পরার প্রেক্ষাপটে যেভাবে দেখেছিলেন, তার একটা নিরীক্ষা উপস্থিত করছি।

॥ ১ ॥

অস্তমিতপ্রায় বিশশতকের প্রভাতী বাংলার বিপ্লবী বিদ্রোহী জাতীয় মুক্তি সংগ্রামী লোকউত্থানের উদগাতা চারণ যুবাকবি অগ্নিবীণার সুরসাধক ও জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সাম্যবাদী ভাবনার উদাত্ত ভাষ্যকার বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম। তারই সমবয়সী ও সেই সঙ্গেই কল্লোল কালিকলম প্রগতি গোষ্ঠীর আধুনিক লোকবাদী ধারারই এক অভিনব রূপকার কবি জীবনানন্দ দাশ। অনন্য তাঁর কাব্যের ভঙ্গী তাঁকে দিয়েছে একটা বিশেষ স্বাতন্ত্র্য। এদিক থেকে তিনি বাংলা কাব্যে একটি নতুন রাগসৃষ্টিরও অধিকারী বলে সাব্যস্ত হয়েছেন। কিন্তু তাঁর এই বৈশিষ্ট্যের বিচার বিবেচনা ও পরিণতি তাঁর দৃষ্টি ও সৃষ্টির সমগ্র মহাজীবন ভাবনা ও লোকমুখিতার দিকটাকে প্রায় চাপা দিয়ে রেখেছে। সুতরাং মার্কস লেনিন ও কমিউনিস্টদের কাজ-কারবারের সঙ্গে তাঁর প্রত্যক্ষ পরিচয় তো দূরের কথা, সাধারণভাবে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক এমনকি সামাজিক সাংসারিক ঘটনা ও সম্পর্ক এবং সেই সূত্রে এই সব ক্ষেত্রে বিদ্রোহ ও বিপ্লবের আঁচও গায়ে লাগাননি তিনি, এই ধরনের একটা সাধারণ ধারণা বিশ তিরিশ ও চল্লিশ দশকে প্রবল থেকে গিয়েছে আধুনিক বাংলাকাব্যের জমজমাট আসরে ঘরে বাইরে। বর্তমান তো দূরের কথা, সুদূর অতীতের ইতিহাসের তত্ত্বে ও তথ্যের উদ্ধারণে কিংবা ভবিষ্যতের কল্পনায় কোনরকমের সাম্যবাদী উত্থানের সঙ্গে তাঁর হৃদ্যতা নিয়ে কোন কথা বলাবলি ছিল সাধারণভাবে কাব্যসমীক্ষার আসরে জোরাজুরি। আমাদের উপমহাদেশের এবং বাংলার পৌরাণিক অথবা আদি পর্বকে তিনি কাব্যে স্বপ্নের আধারে স্থাপন করেছেন এবং মানবমানবীর আধুনিক বৈজ্ঞানিক জনউত্থানের প্রতি তাঁর কোন ঔৎসুক্য নেই–এই ধরনের একটি ধারণা শুধু যে লোকশ্রুতি হয়ে উঠেছিল তাই নয়, আধুনিকতার আলোচক সমালোচকরাও তাঁর কবিতার উদ্ধৃতি দিয়েই সে কথা বলতে বলতে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছিলেন। এমনকি আশির দশকেও তাঁকে বাংলা কাব্যের জনবৈপ্লবিক সামাজিক রাজনৈতিক সাম্যবাদী ধারার বিপরীত মেরুতে স্থাপন করে তাঁকে পলাতক আখ্যা দেয়া হয়েছে কোনো কোনো বিদগ্ধজনের ভাষ্যে। এটা করা হয়েছে তাঁর কাব্যের মৌলিকতার নাম করেও। কিন্তু এই ধারণাটাকে আজ অবধি

কিংবা নব্বই এর-দশকে, তাঁর মৃত্যুর চারদশক পরে না বদলালে আর চলছে না। উপরিউক্ত ধারণাটাই বরং আর একটা জোরাজুরির ব্যাপার বলে বিবেচিত হতে বাধ্য। অভিজ্ঞ অনভিজ্ঞ সকল মহলেই। ১৯৪৭ সালে আমাদের উপমহাদেশ দীর্ঘ দু'শত বছরের ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যবাদী বৈদেশিক শাসনের নাগপাশ ছিন্ন করে বেরিয়ে এলেও সাম্রাজ্যবাদী অভিসন্ধির পাল্লায় পড়ে ধর্মীয় ভিত্তিতে বিভক্ত হবার সময় মর্মন্তুদ ব্যাপক আত্মঘাতী রক্তাক্ত মৃত্যু ও মড়কবাহী নারকীয় অধ্যায়ের মুখোমুখি হয়। এই সময়ে ললিতবাণীর শুধু নয়, রূঢ় কড়চা লেখার ব্যাপারিও সাধারণভাবে স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু এই নারকীয় ডামাডোলের মধ্যেই জীবনানন্দ দাশ দুটি মহাকাব্যিক ধারার উপন্যাস রচনা করেছিলেন 'বাসমতীর উপাখ্যান' ও 'জলপাইহাটি' নাম দিয়ে। অবশ্য এই উপন্যাস নিয়ে তখনই কোন প্রকাশকের সঙ্গে সংযোগ সাধন করেননি তিনি। হয়তো তাঁর ভাষাতেই একটা সুস্থির সুস্থিতির জন্য তিনি অপেক্ষা করতে চেয়েছিলেন। চেয়েছিলেন একটানে লিখে ফেলা এই দুই গদ্য-মহাকাব্যিক লেখাকে মাজাঘষা করতে। কিন্তু আকস্মিক দুর্ঘটনা বাদ সাধল। কলকাতা মহানগীর যে পথে ঘাটে তাঁর নিত্য যাওয়া-আসা ছিল বহু বছরের, সেখানে সামান্য অসতর্কতায় তিনি প্রাণ হারালেন। তাঁর পাণ্ডুলিপি 'রূপসী বাংলা' কাব্য অনুরাগী মহলে তাঁকে হারাবার বেদনাকে কিছুটা প্রকাশিত করল প্রকাশিত হবার পরে। শুধু তাই নয়। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের বিপ্লবী গণঅভ্যুত্থানে তার 'রূপসী বাংলা' তাঁকে এক বিপ্লবী কবির মর্যাদায় অভিষিক্ত করল। তিনি এমন কি বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের কবিদের একজন হয়ে গেলেন। এই সূত্রেই জীবনানন্দ দাশের কাব্যসমগ্র পেলো গভীর ও ব্যাপক সমাদর, তাঁর কাব্যের সূচনাপর্ব থেকে পরিণত সৃষ্টিকে খতিয়ে দেখার জন্য বিশিষ্ট গবেষকরা ব্রতী হলেন। এই পর্বেই প্রকাশ পেলো যে, একেবারে শুরুতেই কিছুটা অস্থিরতার মধ্যে এবং পরবর্তী মৌলিক রূপরসরাগ নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষার পর্যায়ে পর্যায়ে বিশেষ করে 'বেলা অবেলা কালবেলা' কাব্যের পর্বে জীবনানন্দ দাশ মার্কস ও লেনিনকে বিশ্ব মানব-মানবীর ইতিহাসের ধারায় মহামহিম প্রাজ্ঞ পুরোধা বা ধারাবাহক রূপে উপস্থাপিত করেছেন। তবু যেন কোথায় একটা সংশয় থেকে যাচ্ছিল, যে কারণে তাঁর রূপরসরাগ সৃষ্টির পদ্ধতিটিকেই তাঁর কাব্যের তথা সমগ্র সৃষ্টি দৃষ্টির বড় কাজ বলে চিহ্নিতকরার রেওয়াজটা থেকে যায়।

তবে এই দোলাচলের মুহূর্তেই প্রকাশিত হলো তাঁর রেখে যাওয়া দুই উপন্যাস 'বাসমতীর উপাখ্যান' ও 'জলপাইহাটি'। এই দুটি উপন্যাস প্রকাশিত হবার আগে তাঁর রেখে যাওয়া পাণ্ডুলিপি থেকে উদ্ধার করে তাঁর সহোদর ভ্রাতা অশোকানন্দ দাশ 'মাল্যদান' উপন্যাসটি প্রকাশ করেছিলেন, যেমন তিনিই প্রকাশ করেছিলেন 'রূপসী বাংলা'। এই 'মাল্যবান' উপন্যাসটি এক আধুনিক বাঙালি গৃহস্থ নাগরিকের কলকাতা-কেন্দ্রিক নিত্যদিনের ঝুটঝামেলার মধ্যেই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড নিয়ে চিন্তা-ভাবনার ঝুটঝামেলার কাজ। এতেও মাতৃভূমির স্বাধীনতা এবং বিপ্লবের প্রসঙ্গ এসেছে। তবে এখানেও আধুনিক ইউরোপীয় উপন্যাসের মনস্তাত্ত্বিক চেতন-অবচেতনের ব্যাপারটা নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষার ভাবটাই যেন প্রাধান্য পেয়েছে। সুতরাং জীবনানন্দ দাশের কাব্য সম্বন্ধে যে ধারণাটা বদ্ধমূল থেকে যাচ্ছিল, সেটাই জোরদার হয় 'মাল্যদান' উপন্যাসের

ঘরোয়া ধরনের সহজ সাবলীল গদ্য সত্ত্বেও। এই পরিস্থিতিতে কবি কন্যা মঞ্জুশ্রীর উদ্যোগে প্রকাশিত জীবনানন্দের দুই উপন্যাস 'বাসমতীর উপাখ্যান' ও 'জলপাইহাটি' বিশেষ করে একালের সাম্যবাদীর উত্থানের প্রত্যয় ও আত্মজিজ্ঞাসাকে এত বড় মাত্রায় সামনে নিয়ে এসেছে যে, তাঁর সমগ্র কাব্য ও নিবন্ধমালাও পেয়ে গিয়েছে শতাব্দির স্বাধীনতা, লোকায়ত গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের জন্য অবিরত জনবিপ্লবী উত্থানের অভিনব রসরূপরাগের উপস্থাপনের কৃতিত্ব।

॥ ২ ॥

প্রকৃত পক্ষে শরৎচন্দ্রের 'পথের দাবি' উপন্যাসের পাশাপাশি রাখার মতো বড় কাজ রয়েছে জীবনানন্দের এই দুটি উপন্যাসে। 'পথের দাবি' উপন্যাসকে আবার সামনে নিয়ে আসার তাগিদও দেবে এরা। সাম্যবাদী উত্থানেরই এরা ফসল। সাম্প্রতিক সমাজতন্ত্রের বিপর্যয় মুহূর্তে এটা হবে একটা মহৎ নিদর্শন। সঙ্গে আসবে বিশ তিরিশ ও চল্লিশের দশকে বাংলা কাব্যে নাটকে উপন্যাসে গল্প এর একটা কারণ এই যে, এই সাম্যবাদী প্রসঙ্গ আশ্রিত হচ্ছে নিজ বাসভূমের অবিরত জনউত্থানে।

দুটি উপন্যাসেই আমরা যে গভীর ও তীব্র তীক্ষ্ণ বাস্তবতাবোধ আধুনিকতম ইতিহাস চিন্তায় এবং ইতিবাচক দৃষ্টিতে স্থাপিত মার্কস লেনিন ও তাঁদের অনুগামী কমিউনিস্টদের নামে বিভিন্ন বক্তব্য পাই, তারা শুধু যে বড় মাপের তা নয়, তারা মার্কসীয় ধ্যানধারণাতে জীবনানন্দের গভীর আগ্রহ ও অভিনিবেশ এবং রাজনৈতিক-সামাজিক-অর্থনৈতিক একাত্মবোধের কথা বলে বিবেচিত হতে পারে। বস্তুতপক্ষে এই উপন্যাস দুটিতে প্রকাশ পেয়েছে যে, ঐতিহাসিক বস্তুবাদী দর্শন ও অর্থনীতি এবং এদের আবহে স্থাপিত ও নির্মীয়মাণ সমাজতন্ত্রের পরীক্ষাতেও রাশিয়াকে যাঁরা বিশ তিরিশ ও চল্লিশের দশকে বাংলা কাব্যে ও উপন্যাসে স্বাদেশিক ও লোকায়ত চৈতন্য ও সংগ্রামের সঙ্গে যুক্ত করে নিজনিজ রূপে ও ভঙ্গীতে চিত্রিত করেছেন–জীবনানন্দ তাঁদেরই একজন। দৃষ্টান্ত দিয়েই একথাটা বলা যায়। বিষ্ণু দে ও সমর সেনের কবিতাতে এবং তারাশঙ্কর মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ও গোপাল হালদারের উপন্যাসে মার্কসীয় লেনিনীয় চিন্তা ও কর্মধারার বিপ্লবী মর্মবস্তুকে রচয়িতাদের নিজ নিজ অভিপ্রায় ও দূরদর্শিতার সমন্বিত করা হয়েছে। জীবনানন্দ সেই ধারাতেই কাজ করছেন আপন অভিপ্রায় ও উপলদ্ধির বিশিষ্ট ধাঁচে ও ছাঁচে ফেলে। তবে এই কাজটি তিনি করেছেন কাব্যে কিংবা উপন্যাসের চল্লিশের দশকেই প্রধানত। 'বাসমতীর উপাখ্যান' ও 'জলপাইহাটি' প্রমাণ করে যে, জীবনানন্দ তাঁর সাম্যবাদী উত্থান সম্পর্কিত চিন্তাভাবনার প্রস্তুতি চালিয়ে ছিলেন বিগত তিরিশের দশকেই। প্রস্তুতি বহুদিনের। আমরা আমাদের উপস্থাপনাটির পরিশিষ্টতে দুটি উদ্ধৃতি দাখিল করছি। এরা প্রমাণ করে যে, জীবনানন্দ তাঁর দুটি উপন্যাসেই যে কয়েকজন বিভিন্নস্তর ও মেজাজের পুরুষ ও নারীকে মুখর ও মুখরা করেছেন, তারা কোথাও আড়ষ্ট নয়। বরং তারা অতিমাত্রায় স্বচ্ছন্দ।

জীবনানন্দের 'বাসমতীর উপাখ্যান' ও 'জলপাইহাটি' ও সারা শতাব্দির সারা পৃথিবীতে মহাদেশে দেশে রক্তে বোনা ধানের মতো ছড়ানো সাম্যবাদী চিন্তা-ভাবনা এইভাবে আশ্রিত। উপন্যাস দুটি তাই আজ ব্যাপক ও গভীর জানাজানি ও অধ্যায়ের

দাবিদার। এই দাবিকে সামনে রেখে এখানে খুব সংক্ষেপে দুটি উপন্যাসের একটি সংক্ষিপ্তসার তুলে ধরছি।

॥ ৩ ॥

'বাসমতীর উপাখ্যান' ও 'জলপাইহাটি' রচিত হয়েছে '৪৭-৪৮ সালের ধর্মীয় ভিত্তিতে আমাদের উপমহাদেশের বিভাজনের চূড়ান্তভাবে ঘোরালো পরিস্থিতির মধ্যে, এ কথাটি আগেই বলেছি। তবে এই সঙ্গে যে কথাটি খুব জরুরি সেটা হলো এই যে, উপন্যাসটির বিষয়বস্তু ও নায়ক-নায়িকারা এই বিভাজনের পরিস্থিতিকে তার বিস্তারিত বাস্তবতার ও সম্ভাব্যতায় সুস্থিরতা রক্ষা করে মহাকাব্যিক মাত্রাতেই ধারণ করেছে। এদিক দিয়ে দেখতে গেলে আমাদের উপমহাদেশের এবং বিশেষ করে বুদ্ধিজীবী ও বুদ্ধিজীবীরা কিভাবে অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবার কথা ভেবেছিল এবং কিভাবে উত্তীর্ণ হয়েছিল, তার সত্যসন্ধ উচ্চারণ রয়েছে পরিস্থিতির লোকায়ত বর্ণনায় এবং সহজসরল খোলামেলা সংলাপে। জীবনানন্দ দাশের জীবনের অধিকাংশ সময় পূর্ব বাংলার যে শহরে অতিবাহিত হয় এবং যে মহানগরী কলকাতাও ছিল তাঁর নাড়ির মধ্যে জড়িয়ে বিভিন্নসূত্রে, তাদেরই নাড়িনক্ষত্র দিয়ে তৈরি দুটি উপন্যাসেরই কাহিনিভূমি। তফাৎ শুধু এই যে, 'বাসমতীর উপাখ্যানে'র ঘটনা পরম্পরার সবটাই বিভাগপূর্বকালের পূর্ববাংলার এক নদীআশ্রিত তথাকথিত মফঃস্বল শহর এবং বিশেষ করে তার কলেজ এলাকা। 'জলপাইহাটি' উপন্যাসটিতে বিভাগোত্তর পূর্ববাংলার এক কলেজকেন্দ্রিক শহরের পাশাপাশি এসেছে বিভাগোত্তর কলকাতা মহানগরীর জীবনবৃত্ত।

'বাসমতীর উপাখ্যানে' বাংলা বিভাজনের পূর্বাহ্ণে ব্রিটিশ শাসনের জোয়াল থেকে আসন্ন মুক্তি ও স্বাধীন রাষ্ট্রগঠনের সম্ভাবনা যখন খুব বড় হয়ে সামনে এসেছে, তখন বাস্তব পরিস্থিতির ভিত্তিতে স্বাধীনতার আদর্শও এবং রাষ্ট্রগঠনের বিভিন্ন বিকল্প নিয়ে বিভিন্ন ধরনের যেসব মতামত বেরিয়ে এসেছে, তাতে জল্পনা কল্পনার ধারা মন্থর ও উগ্রতা বিরহিত। বিতর্ক রয়েছে, তবে সিদ্ধান্তের জন্য তেমন কোন জেদাজেদি নেই। কিন্তু 'জলপাইহাটি' উপন্যাসে বাংলা ও উপমহাদেশ বিভক্ত হয়েছে। স্বাধীনতা এসেছে ধর্মকে ভিত্তি করে দু'টি রাষ্ট্রে। তখনই বিকল্প রাষ্ট্র কাঠামো গঠনের চিন্তাভাবনার অবকাশ নেই। শরণার্থীদের স্রোত ক্রমেই প্রবল হচ্ছে। সুতরাং এখানে কর্মক্ষেত্র ও মর্মক্ষেত্র বেছে নেবার সিদ্ধান্তের দিকেই ঝোঁক বেশি। জলপাইহাটি উপন্যাসে তাই জেদাজেদি ও উগ্রতার পাশাপাশি মনবিনিময়ের দিকটাতে বাস্তব পরিস্থিতির হিসাবটা খুব বড়। দ্বান্দ্বিক যুক্তিপ্রণালীর বিচার বিবেচনার ধারা এখানেও প্রাধান্য পেয়েছে। এই সূত্রে জীবনানন্দকে এখানে বাংলা উপন্যাসের ধ্রুপদী ও আধুনিক ধারাতে একটি নতুন মাত্রা যোগ করার অধিকারী বলে বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। সেটা হচ্ছে, যাবতীয় সমস্যা ও প্রশ্নের বিবেচনাকে বিশেষজ্ঞদের মহলকে সাধারণভাবে কৌতুহলী মহলের সঙ্গে সংযুক্ত করা। মার্কসবাদ ও রাশিয়াতে তার বলশেভিক প্রয়োগকে এবং এই সংক্রান্ত ঘটনাবলিকে নিত্যনৈমিত্তিক ভাষ্য দেয়া হয়েছে এই কারণেই। 'বাসমতীর উপাখ্যানে' দেখা যায়, এই কলেজ শহরের এক দামাল ছেলে স্বদেশের সন্ধানে ব্রতী হয়ে ইউরোপে প্রবাসী হয়ে শেষ পর্যন্ত মস্কোতে গিয়ে বলশেভিকদের সঙ্গে মিলিত হয়েছে।

'জলপাইহাটি'তে দেখা যায়, অধ্যাপক নিশীথ সেনের ছেলে হারীত সেন দেশ স্বাধীন করার সংগ্রামে ব্রতী হয়ে জেল খেটেছে। তারপর জেল থেকে বেরিয়ে এসে কমিউনিস্ট হয়ে গণসংগঠন গড়ায় উৎসাহিত করেছে নিজেকে। অধ্যাপক নিশীথ সেনের ভাষায় সে বিপ্লবের অলাতচক্রে অর্থাৎ জ্বলন্ত কাঠের ঘুণ-চক্রে নিজেকে জুড়ে দিয়েছে। নিশীথ সেন জলপাইহাটির কলেজের অধ্যাপনায় বিরতি দিয়ে কলকাতায় উপস্থিত হয়েছেন আর্থিক সংস্থানের তাগিদে। ছেলে হারীত সেন তার প্রধান কর্মক্ষেত্র কলকাতা থেকে জলপাইহাটিতে এসেছে একই সঙ্গে কিছুদিন বিশ্রাম এবং অসুস্থতাকে দেখাশোনা করার জন্য। পিতাপুত্র উভয়েই অবশ্য একটা নৈতিক দায়বদ্ধতার শরিক। পায়ের তলায় মাটি আছে দুজনেরই।

বাসমতীর উপাখ্যানে রয়েছে জীবানন্দীয় কাব্যিক ধারায় উদ্ভাসিত পূর্ববাংলার নৈসর্গিক পরিবেশ, বৃক্ষরাজি, আকাশ, চাঁদ, মেঘ, নদী ও গ্রামীণ ধরনের ঘরবাড়ির বিন্যাসে নায়ক নায়িকাদের চলাফেরা ও চিন্তাভাবনার মধ্যে একটা বিশেষ পূর্ববঙ্গীয় ধারা। তেমনি 'জলপাইহাটি' উপন্যাসেও মেঘ চাঁদ আকাশের এবং বৃক্ষরাজির কোন ঘাটতি নাই। অপরদিকে কলকাতা মহানগরীর গতি এবং বিশেষ করে তার বিদুষী নারীদের নাগরিকতার ধারা জলপাইহাটি উপন্যাসটিকে খুব বেশি প্রভাবিত করেছে। তবে বাসমতীর উপাখ্যান উপন্যাসেও কলকাতা মহানগরী বিশেষ করে বিশ্ববিদ্যালয়ের সূত্রে জোরালো ছায়াপাত করেছে।

এই সূত্রেই আরেকটি ব্যাপার লক্ষণীয়। জলপাইহাটিতে যেমন অধ্যাপক নিশীথ সেন কেন্দ্রীয় চরিত্র, তেমনি বাসমতীর উপাখ্যানে কেন্দ্রীয় চরিত্র অধ্যাপক সিদ্ধার্থ সেন। বস্তুতপক্ষে দুটি অধ্যাপক চরিত্রই যেন অধ্যাপক জীবনানন্দের দুই প্রতিরূপ। এই দুই অধ্যাপক চরিত্রের মধ্যে দিয়ে জীবনানন্দ তাঁর অসাম্প্রদায়িক, ধর্মনিরপেক্ষ, বুদ্ধিবাদী ও একই সঙ্গে স্বপ্ন কল্পনার ও রূপরঙ্গী অনুভবের উৎসারণ ঘটিয়েছেন। তবে তিনি কোনোমতেই তাঁর উপন্যাসের ধারাকে আত্ম জৈবনিক করে ফেলেন নি। এই দুই অধ্যাপক ছাড়াও যে বেশ কিছু সংখ্যক নারী ও পুরুষ চরিত্রের ঘনিষ্ঠ জীবন-যাপনের কথা উপন্যাসটিতে, বিস্তারিতভাবেই বেরিয়ে এসেছে, তারা তাদের স্বাতন্ত্র্য ও বৈচিত্র্য ও অনন্যতা নিয়ে দুই অধ্যাপকের জীবনচর্চায় নিজেদের সহজ ছন্দে যুক্ত করেছে। আর এদের সঙ্গে একাত্ম হয়ে উদ্ভাসিত হয়েছে দুই বাংলার এবং সমভাবেই আমাদের উপমহাদেশের এক ঐতিহাসিক সন্ধিক্ষণের কণ্ডারি ও পথসন্ধানী জনসাধারণ। এই জনসাধারণকে নিয়ে দুচার কথাই মাত্র বলেছেন লেখক। কিন্তু বিভিন্ন ছোটখাট ঘটনার মধ্য দিয়েও এই জনসাধারণ যখন সামনে এসেছে তখন বুঝতে পারা গিয়েছে যে, এরাই একদিন বিপ্লবী উত্থান ও স্বাধীনতার দায়িত্ব গ্রহণের জন্য। তাছাড়া দুই অধ্যাপকের চরিত্রই যে আত্মকেন্দ্রিক হয় নি, তার মূলে রয়েছে সমসাময়িক টালমাটাল এবং এমনকি মার্কসীয় তত্ত্ব ও বিপ্লবের ক্ষেত্রে কয়েকটি নারী চরিত্রের উদ্যোগ ও ভাবনা চিন্তার সম্ভাবনা। উপন্যাস দুটিতেই আমরা মার্কস লেনিন ও কমিউনিস্টদের পেয়েছি একটা সাধারণ অবস্থানে। রাশিয়াতে সমাজতন্ত্রের ব্যর্থতা নিয়ে যেসব কথা আছে উপন্যাসে, তাতে বর্তমান নব্বই এর দশকের কথা মনে জাগবে। কিন্তু জীবনানন্দের স্পষ্টভাষী ও স্পষ্টভাষিণীরা যেখানে ব্যর্থ প্রত্যাশার কথা বলেছে,

সেখানেও মার্কস ও লেনিন মানবমুক্তির পথদ্রষ্টা হিসাবে যে ভূমিকায় উত্তীর্ণ, সেখানে নীতি ও আদর্শের ব্যাপারটিকে কখনও খর্ব করার প্রশ্ন ওঠে নি।

সুতরাং 'বাসমতীর উপাখ্যান' ও 'জলপাইহাটি'র বিস্তারিত না গিয়ে এ পর্যন্ত যা পেয়েছি তার ভিত্তিতে এই আশাই ব্যক্ত করব যে, মার্কসীয়-লেনিনীয় চিন্তার এবং সেই সঙ্গে সাম্যবাদী উত্থানধারার একটা বৈশিষ্ট্য বলো, ধ্রুপদী ও আধুনিকভাবে উভয়ত এর সত্যতা ও প্রাণশক্তি বিশ্বের বিভিন্ন ও বিচিত্র পর্যায়ের এগিয়ে আসা বহুজাতির বহুবর্ণের লোকশক্তির মধ্যে সঞ্চারিত হয়ে রয়েছে। সমূহ বিপর্যয়কেও ভেদ করে সাম্যবাদী উত্থানের ধারা সমাজতন্ত্র স্বাধীনতা ও লোকায়ত গণতন্ত্রের পুনর্বাসন ও নবনব বিন্যাসের মধ্য দিয়ে ঘটবে, অবশ্যই অসঙ্গতিগুলিকে দূর করে। শতাব্দির পর শতাব্দি ধরে সাম্যবাদী উত্থান পরম্পরার স্পার্টাকাসের দাস-বিদ্রোহ হয়ে ফরাসি বিপ্লব হয়ে অক্টোবর সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব হয়ে আফ্রিকা এশিয়া লাতিন আমেরিকার মহাজাগরণ ও উত্থান হয়ে অসঙ্গতি দূর করে এগিয়ে এসেছে সাম্যবাদী উত্থানের ধারা। জাঁ পল সার্ত্রে'র ভাষায় ফরাসি বিপ্লবের বুদ্ধি ও যুক্তির মুক্তির ক্ষেত্রে যে অসঙ্গতি দেখা দিয়েছিল, তাকে দূর করেন কার্ল মার্কস। মার্কসবাদ এই জন্যেই তাঁর দৃষ্টিতে এমন একটি দর্শন যাকে পাশ কাটিয়ে যাবার কোন উপায় নেই সাম্যবাদের পক্ষের যে কোন ব্যক্তি বা সংঘের।

এই জাঁ পল সার্ত্রে ১৯৬৮ সালে পশ্চিম ইউরোপে এক সাংস্কৃতিক বিপ্লবী উত্থানের পুরোভাগে দাঁড়িয়েছিলেন প্রথাসিদ্ধ পথ পরিহার করে। এই বছরেই গণজীবনে মাও সে তুং-এর নেতৃত্বে যে সাংস্কৃতিক বিপ্লব ঘটে, তাকে পাশাপাশি রেখে সার্ত্রে '৬৮ সালের সাংস্কৃতিক বিপ্লবের হিসাব নিকাশ রেখে গিয়েছেন তাঁর 'অস্তিত্ববাদ থেকে মার্কসবাদ' নামের সর্বশেষ গ্রন্থে। এখানে তিনি ইউরোপ ও গণচীনের উত্থান দুটির অসঙ্গতির ব্যাপারটাকে খোলাখুলিভাবে সামনে আনতে দ্বিধা করেন নি। তাঁর বক্তব্য, এই অসঙ্গতিকে অবশ্যই দূর করতে হবে সাফল্যে পৌঁছবার জন্যে।

॥ ৪ ॥

আমাদের প্রস্তাবনার এক জায়গায় বলেছি, জীবনানন্দ দাশের উপন্যাস দুটি থেকে তাঁর অবস্থানকে নিয়ে কিছু দৃষ্টান্ত দেবো। তদানুযায়ী এখানে 'বাসমতীর উপাখ্যান' ও 'জলপাইহাটি' থেকে একটি করে উদ্ধৃতি দাখিল করছি এখানে।

(১) 'বাসমতীর উপাখ্যান' থেকে–এই উপন্যাসের ২৪৫ পৃষ্ঠায় আমরা দেখি, অধ্যাপক সিদ্ধার্থ সেনের দুই তরুণী ছাত্রী নায়িকা রমা আর বনচ্ছবিকে স্বদেশ ও বিশ্বের সমসাময়িক জীবন দর্শন নিয়ে ভাবনা চিন্তায় ব্রতিনী। এখানে তিনি এমনভাবে শতাব্দির মাঝামাঝি সময়ে এই দুটি মেয়ের করণীয়কে সামনে রেখেছেন যা শরৎচন্দ্রের 'পথের দাবি' উপন্যাসের নায়িকা সুস্মিতা কিংবা রবীন্দ্রনাথের শেষের দিকের কিছু নাটক, কবিতা ও ছোটগল্পের নায়িকাদের উপস্থাপিত বক্তব্যের পাশাপাশি চলতে পারে কিংবা কোথাও কোথাও ছাড়িয়েও যেতে পারে।

'বাসমতী উপাখ্যানে'র অন্যতম নায়ক ও স্থানীয় ব্রাহ্ম সমাজের অন্যতম পরিচালক এবং পদার্থবিজ্ঞানের এম.এস.সি. নীরেন মহালনবিশ শুনলো যে বনচ্ছবি এবং আরেকটি মেয়ে বিশাখা বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্থনীতিতে এম.এ পড়তে চায় শুনে বলল,

"বেশ ভাল কথা। অনেকদিন ধরে ইকনমিক্সে পুরুষেরা ধস্তাধস্তি করে আসছে। তার শেষে মার্কসে এসে সিদ্ধি পেয়েছে। রাশিয়া সেটাকে প্রাথমিক সাফল্য দিচ্ছে–শুনে ভাল লেগেছিল। কিন্তু হল না কিছু। পুরুষের ধাতে এ শাস্ত্র মনের ভূমিতে বা সমাজভূমিতে খুব সম্ভব সিদ্ধ হবার নয়, ইকনমিক্স নিছক বিজ্ঞান নয়। কিন্তু এটা কি তাহলে? কোন জিনিস মেয়েরা পারে কিন্তু পুরুষেরা পারে না? আছে কিছু এমন জিনিস? রান্না, সেলাই আলপনা আঁকা, পিঠে তৈরি করা? সব জিনিসেই পুরুষদের ভেতর থেকে ওস্তাদ জুড়ি এসে জুটবে। তবে মেয়েরা সৃষ্টি রক্ষা করছে, কিন্তু তাওতো পুরুষের সঙ্গে মিলে যুগল হয়ে। কিন্তু মেয়েরা, সব মেয়েরা নয় অবশ্যি নিজেদের পরম ভূমিকায় দাঁড়িয়ে মায়ের মত শুশ্রুষা করতে পারে। কখনো কোন পুরুষের বাবার মতো শুশ্রুষার সঙ্গে তার কোন তুলনা হয় না। আজকের পৃথিবীর এই শুশ্রুটা চাইছে–জ্ঞানের ভিতর দিয়ে। দরকার একটা বিশেষ জ্ঞান ইকনমিক্স। কিন্তু একে এর আধুনিক অবস্থায় ফেলে রাখলে চলবে না। অনেক দূর এগিয়ে নিতে হবে, মানুষের সেবা শুশ্রুষা বড় ব্যাপ্ত প্রাণবল সুর এর ভেতর ফুটিয়ে তুলে। পুরুষেরা কি তা পারবে?"

(১) 'জলপাইহাটি' উপন্যাস থেকে–এই উপন্যাসটির ৩২৩-২৪ পৃষ্ঠায় আমরা দেখি। দুই তরুণী সুলেখা ও জুলেখাদের বাসায় বসে হারীত সুলেখার সঙ্গে নিভৃতে আলাপ করছে:

"ভারি চমৎকার দেখাচ্ছে কিন্তু মেঘগুলোকে। যেন ভেঙে গেছে সূয্যি। রাশি রাশি সাদা মেঘ জ্বলজ্বল করে বেড়াচ্ছে। আমাদের ছেলেবেলায় দেখেছি এরকম। আমাদের মৃত্যু হয়ে গেলেও থাকে ওরা। দেশ থেকে দেশে চলে যায়। কেমন অতিমানবের মত মনে হয় সব। ওদের মিথ্যে বলে উড়িয়ে দিয়ে আমরাই মিথ্যে হয়ে উড়ে যাই। ওরা টিকে থাকে কীরকম স্বচ্ছ আনন্দের অন্তঃশীল আনন্দে।"

সুলেখা ভর্ৎসনার সুরে হেসে উঠে বললে, 'এ কেমন স্টালিনের মত কথা হল?'

'স্ট্যালিন?'

'এ কেমন বুখারিনের মত কথা বললে তুমি হারীত?'–নিজেকে শুধরে নিয়ে সুলেখা বললে।

'বুখারিনের মত? কথাটা বলেছি হোরেন্সের নিজের মত, নিশীথ সেনের মত, লুক্রেশিয়াসের মত। এরা বুখারিনের এলাকার বাইরে। সে যা হোক বুখারিনের কথায় অন্য কথা মনে পড়ে গেল। বিপ্লব করতে গিয়ে লোকটা একটা মাত্র ট্রাপের পাকে জড়িয়ে গেল। জড়িয়ে পড়তে হয় বুঝি মানুষকে সব দেশে সব কালেই।'

সুলেখা কথা বলবার আগে মুখটা অন্যদিকে ফিরিয়ে রাখল এক আধ মুহূর্ত, তারপর ঘুরিয়ে এনে একটু চুপ করে থেকে, পরে বলল, 'সব কালেই সব দেশেই। ভারতবর্ষেও যদি তুমি বিপ্লব কর, সবাই যদি বিপ্লবী হয়ে যায়, তাহলেও ওদের হাতে তোমার, তোমাদের মত লোকদের বিচার হবে। তাতে তুমি টিকে থাকতে পারবে বলে মনে হয় না।'

হারীত আকাশের চিলের ডানার অঙ্গে চোখ বুলিয়ে নিয়ে চোখটাকে স্নিগ্ধ করে আনতে আনতে বললে, 'তা হবে খুব সম্ভব। তা আমি জানি। বুখারিনের ভাগ্যের জন্যে প্রস্তুত আছি আমি।'

॥ ৫ ॥

জীবনানন্দের উপন্যাসের উপরিউক্ত দুটি উদ্ধৃতি থেকে লেখক ও তাঁর কুশীলবদের সাম্যবাদী উত্থান নির্মাণ সংক্রান্ত চিন্তাভাবনা ও কর্মধারার একটা দিক খুব স্পষ্ট হয়েই বেরিয়ে আসে। সেটা হলো এই যে, মার্কস এবং বলশেভিক তথা লেনিনের প্রতি অন্ধ আনুগত্যের কোন প্রশ্রয়ই ওঠে না সাম্যবাদী তথা সাম্য মৈত্রী ও স্বাধীনতার সাধনার প্রস্তাবনায়। কিন্তু সাম্যবাদী উত্থানে মার্কস ও লেনিনের আবদ্ধ ধারার সঙ্গে সংযুক্তি ও তার প্রতি দায়বদ্ধতা বা স্বীকৃতিতে কোন দ্বিধারও ছায়া পড়ে নি কোন কথায় বা আচরণে।

সাধারণত প্রথাসিদ্ধভাবে দেখার দরুন এখানে এই স্বীকৃতি বা দায়বদ্ধতা মনে ধরার কথা নয়। ধরেনি আরও অনেকের ক্ষেত্রে। যেমন মেক্সিকোর চিত্রশিল্পী ডিয়েগো রিভেরা, গ্রীসের সংগীতশিল্পী মিকিস থিও ডোরাকিস, ফ্রান্সের দার্শনিক ভাষ্যকার কথাশিল্পী জাঁ পল সার্ত্রে এবং এমনকি 'মায়া ও বাস্তবতা' গ্রন্থপ্রণেতা ক্রিস্টোফার কডওয়েলের অবস্থান ও কাজকে প্রথাসিদ্ধভাবে দেখে এদের এক সময়ে মার্কসীয় লেনিনীয় ধারা থেকে খারিজ করা হয়েছে। কিন্তু আজ শতাব্দি শেষের টানাপোড়নে উত্থান পতন পুনরুত্থানের পালায় জমা খরচের হিসাবে এদের দৃষ্টি ও সৃষ্টির সুকান্তের ভাষায় 'রক্তে বোনা ধান' বলেই গণ্য হচ্ছে। এদের দায়বদ্ধতার দিকটা সাম্যবাদী উত্থানের সামগ্রিক ও অবিরত ধারায় বিচার বিবেচনার ক্ষেত্রে বড় মাত্রায় সম্পদ বলেই ধার্য হচ্ছে!

জীবনানন্দ দাশের অবস্থান আজ সাম্যবাদী উত্থানের নব নব সম্ভাবনার প্রত্যয়কে আত্মজিজ্ঞাসায় নিকষিত করেই উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতর হয়ে উঠবে। তাঁর লেখা দুটি উপন্যাসের পাশাপাশি আজ নিশ্চয় নতুন করে তাঁর সমগ্র কাব্য এবং কবিতার কথা ও ফ্যাসিবিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘের চল্লিশের দশকের 'কেন লিখি' সংকলনে তাঁর লেখা সাম্যবাদী উত্থানের শতাব্দির হিসাবের খাতায় আসবে।

কিছুটা পুনরুক্তি হলেও আমরা স্মরণ করব যে, 'বাসমতীর উপাখ্যান' ও 'জলপাইহাটি' উপন্যাসের প্রস্তুতি শুরু হয়েছিল বিশের দশকেই। তখন বঙ্গবাণী পত্রিকাতে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের প্রয়াণের পরে তাঁকে নিয়ে জীবনানন্দের লেখা দীর্ঘ নির্ঘোষপন্থী কবিতা ছাপা হয়েছিল বঙ্গবাণীতে। এই পত্রিকাটিতেই প্রায় একই সময়ে সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়ের 'লেনিন' নামক কবিতা বেরিয়েছিল লেনিনের মৃত্যুর পরে। সর্বোপরি উল্লেখ্য এই যে, বঙ্গবাণী পত্রিকাতে একই সময়ে ক্রমশ প্রকাশিত হয়েছিল শরৎচন্দ্রের 'পথের দাবি' উপন্যাস। আমাদের উপমহাদেশের অগ্নিযুগের বিপ্লবীরা যে কল-কারখানার শ্রমিকদের সংগঠিত উত্থানকে স্বাধীনতার জন্য বিপ্লবের আয়োজনকে পুরোভাগে রেখে চিন্তাভাবনাকে নতুনভাবে বিন্যস্ত করছিলেন বিশের দশকের শুরুতে, তার গভীর ও বিস্তারিত পরিচয় রয়েছে 'পথের দাবি' উপন্যাসের নায়ক ডাক্তারের দীর্ঘ সংলাপে। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করে রাখা যেতে পারে, তদানীন্তন শাসক ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষীয়রা আইনমন্ত্রকের পরামর্শে 'পথের দাবি' উপন্যাসকে নিষিদ্ধ করেছিল। আইনমন্ত্রক বলেছিল 'পথের দাবি' খোলাখুলি বলশেভিকবাদ ও শ্রমিকবিদ্রোহের ডাক দিয়েছে এবং সরকারের পতন ঘটাতে চেয়েছে। জীবনানন্দ দাশের চিত্তরঞ্জন দাশকে

নিয়ে লেখা কবিতা এই সব কিছু জেনে শুনে বুঝেই লেখা। সাম্য স্বাধীনতা, গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের চিন্তাভাবনা হয়েছিল তাঁর নিজস্ব পরিবেশেরই ব্যাপার। তিনি যে তাঁর কবিতায় চল্লিশের দশকে লেনিনকে মনুষ্যত্বের ও মানবিকতার ইতিহাসে বুদ্ধ ও সক্রেটিসের পাশে রেখেছেন, এটা তাঁর উপরিউক্ত লালনের একটা ইশারা। 'বাসমতীর উপাখ্যান' ও 'জলপাইহাটি' জীবনানন্দ অবশ্যই তাঁর নিজস্ব ভঙ্গীতেই লালিত ও অবিরত নিরীক্ষিত সাম্যবাদী উত্থানঘটিত অবস্থান বিষয়ে বড় মাত্রায় নিয়ে এলেন আমাদের উপমহাদেশের বিভক্ত স্বাধীনতা লাভের সন্ধিক্ষণে। প্রমাণ রেখে গেলেন তিনি সাম্যবাদী উত্থানকে কত গভীরভাবে রেখেছিলেন তাঁর সৃষ্টি ও দৃষ্টিতে। এই দুটি উপন্যাস প্রমাণ করছে, সাম্যবাদী উত্থানের প্রতি তাঁর এবং গোটা শতাব্দিরই রূপকারদেরই দায়বদ্ধতা কত গভীর। সঙ্গে সঙ্গেই সাম্যবাদী উত্থানের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া যে কত সুদূরপ্রসারী ও প্রবল এবং নিত্য নব সৃষ্টি দৃষ্টির দাবিদার, তার প্রমাণ রয়েছে উপরিউক্ত দুটি উপন্যাসে।

আন্তর্জাতিক জিজ্ঞাসা

ল্যাটিন আমেরিকার মুক্তিসংগ্রামের ঔপন্যাসিক আলেজো কার্পেনটিয়ার

ল্যাটিন আমেরিকার মুক্তিসংগ্রামে গেরিলা গণবাহিনীর মুক্তিযোদ্ধাদের গৌরবময় ভূমিকার পাশাপাশি লেখক কবি ও বিভিন্ন রূপকার শিল্পীদের সুদূরপ্রসারী কাজ সমান মর্যাদার দাবি করতে পারে। এই কাজ একদিকে যেমন বিপ্লবের প্রত্যেকটি ওঠা-নামা-ওঠার মুহূর্তকে প্রতিমূর্ত করেছে, তেমনি মুক্তির বিন্যাসের জন্যে এক অমোঘ ধ্রুপদি মানস-ভিত্তিও রচনা করেছে। বিপ্লবী কিউবার ঔপন্যাসিক আলেজো কার্পেন্টিয়ারের (ALEJO CARPENTIER) কাজ এর প্রকৃষ্ট প্রমাণ। তিনি ল্যাটিন আমেরিকার মুক্তিযুদ্ধের উনিশ শতকের শেষার্ধের নায়ক তাত্ত্বিক, কবি ও নিবন্ধকার জোলে মার্তির সুযোগ্য উত্তরসূরি। পাবলো নেরুদা স্পেনিশ ভাষায় কবিতায় যা করেছেন, আলেজো কার্পেনটিয়ার তা উপন্যাসে করেছেন। '৬৭ সালের নোবেল প্রাইজ বিজয়ী গুয়াতেমালার "সাইক্লোন" উপন্যাসের রচয়িতা আস্টুরিয়াস পঞ্চাশের দশকে যেমন করে ল্যাটিন আমেরিকার দিগন্ত কে আলোকিত করেছিলেন, ষাট ও সত্তরের দশকে কার্পেনটিয়ার তার চেয়ে বেশি ছাড়া কম কাজ করেন নি। ল্যাটিন আমেরিকার কলম্বিয়ার ঔপন্যাসিক গার্সিয়া মার্কোয়েজ (Marquez) কার্পেন্টিয়ারের সুযোগ্য সতীর্থ। কার্পেন্টিয়ার বস্তুত পক্ষে ল্যাটিন আমেরিকার উপন্যাসের শিল্পরূপকে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ উপন্যাসের কাজের স্তরে তুলেছেন। তিনি ঔপন্যাসিক হিসেবে শ্রেষ্ঠ ফরাসি, স্পেনিশ ও মেক্সিকান পুরস্কার পেয়েছেন। তার 'রাষ্ট্রের স্বার্থ' (Reason of State) উপন্যাসকে ভিত্তি করে যৌথ মেক্সিকান ফরাসি কিউবান চলচ্চিত্র তৈরি হয়েছে মেক্সিকোতে। বিপ্লবী কিউবাতে তিনি সাংস্কৃতিক বিপ্লবের অন্যতম পুরোধারূপে সম্মানিত। সত্তরের দশকে কার্পেন্টিয়ার নতুনভাবে বিন্যস্ত গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রীয় পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন। ইতোপূর্বে তিনি কমিউনিস্ট পার্টির

সদস্যপদ পেয়েছিলেন। ফ্রান্সে কিউবার দূতাবাসের সাংস্কৃতিক বিভাগের অধিকর্তা হিসেবে স্বদেশের সাংস্কৃতিক পরিচিতি ও ইউনেস্কোর কার্যক্রমের একজন বিশিষ্ট প্রবক্তা হিসেবে কর্মব্যস্ত থাকার সময়েই প্যারিসে গত বছর এপ্রিলের শেষের দিকে ৭৬ বছর বয়সে তাঁর জীবনাবসান হয়েছে।

॥ ২ ॥

কার্পেন্‌টিয়ারের জীবন এত পরিব্যাপ্ত ছিল যে, তাকে রূপকথা বলে মনে হতে পারে। অবশ্য ল্যাটিন আমেরিকার দেশ দেশান্তরের মুক্তিসংগ্রামের ব্যাপ্তিকে মনে রাখলে আমরা বলবো, এরকম না হলে চলতো না।

কার্পেন্‌টিয়ারের জন্ম হাভানাতে ১৯০৪ সালের ২৬ ডিসেম্বর। বাবা ফরাসি স্থপতি জর্জেস জুলিয়েন কার্পেন্‌টিয়ার। হাভানার বহু বিখ্যাত বাড়ি তাঁর নক্সায় তৈরি। মা রুশ বংশোদ্ভূতা ভাষা শিক্ষিকা। নাম লিনা ড্যালমন্ট। শৈশবেই কার্পেন্‌টিয়ারের সুর ও সংগীতের দিকে ঝোঁক ছিল। সাত বছর বয়সে তিনি শপাঁ ও দেবাসির সুর বাজাতে পারতেন পিয়ানোতে। তাঁর বাবা তাঁকে শৈশবে হাভানাতে কোন স্কুলে না দিয়ে গ্রামের বাড়িতে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। ১৩ বছর বয়সে কার্পেন্‌টিয়ার হাভানায় মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি হন। ছাত্রজীবনে তিনি দেখতে না দেখতেই সমাজকে বদলাবার লড়াইতে শরিক হয়ে যান। কিউবার কমিউনিস্ট পার্টির পুরোধা এবং একাধারে সাংস্কৃতিক বিপ্লবী যুবাকর্মী জুলিও এন্টোনিও মেল্লা, রুবেন মার্টিনেজ ভিল্লেনা এবং জুয়ান মারিনেল্লোর সঙ্গে মিলে তিনি ১৯২৫ সালে স্বাধীনচেতা যুব সংখ্যালঘু গোষ্ঠী গঠন করেন। প্রথম লেখা প্রকাশিত হয় হাভানার একটি দৈনিক পত্রিকায়। মেক্সিকোর ঔপন্যাসিক জুয়ান দ্য বজোর্কোয়েজের আমন্ত্রণ পেয়ে তিনি ১৯২৬ সালে মেক্সিকোতে যান। সেখানে প্রখ্যাত চিত্রকর ডিয়েগো রিভেরা এবং জোসে ক্লেমেন্টে অরোজ্‌কোর সাক্ষাতকার পান তিনি। মেক্সিকো থেকে দেশে ফিরে এসে কার্পেন্‌টিয়ার স্বৈরাচারি শাসক গেরার্ডো মাচাদোর বিরুদ্ধে আয়োজিত আন্দোলনে যোগ দেন। সরকার বিরোধী ঘোষণাপত্রে স্বাক্ষর দেবার দায়ে তাঁকে ১৯২৭ সালের জুলাই মাসে কারারুদ্ধ করা হয়। সাত মাস জেলে থাকার সময় তিনি তাঁর উপন্যাস 'ইকুয়ে-ইয়াম্বা-ও'র (Ecue Yamba-O) প্রথম খসড়াটি তৈরি করেন। কৃষক জীবন নিয়ে লেখা এই বইটির নাম ছিল আন্ডিস পর্বতমালার আদিবাসিদের ভাষায়, যার মর্ম, 'বিধাতার জয় গাও'। পরবর্তীকালে এই লেখাটি বই আকারে প্রকাশিত হয়েছিল, তবে কার্পেন্টিয়ার তাঁর এই উপন্যাসটিকে বিশেষ আমল দিতে চাননি। একজন শহূরে মানুষ কৃষকজীবন দিয়ে ভাব-বিলাস করুক, এটা তাঁর কাম্য ছিল না। বইটি তাই ছিল বলে তিনি মত প্রকাশ করেছিলেন। শেষ পর্যন্ত কার্পেন্‌টিয়ারের মত ছিল এই যে, অভিজ্ঞতা ছাড়া উপন্যাস লেখা যায় না।

সে যাই হোক, সেবার জেল থেকে বেরিয়ে কার্পেন্টিয়ার 'কলকাতার কল্লোল' ধরনের কিউবার আধুনিকতাবাদীদের 'আভান্ট গার্ড' গোষ্ঠীর পত্রিকার প্রথম সংখ্যার পাঁচজন লেখকের একজন হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেন। এতে সরকারি হয়রানির শিকার হয়েছিলেন তিনি। ত্যক্তবিরক্ত হয়ে তিনি পাসপোর্ট ছাড়াই ফরাসি সুরিয়েলিষ্ট কবি রবার্ট ডেসমোসের সহায়তায় দেশ ছেড়ে ফ্রান্সে গিয়ে প্যারিসে উপস্থিত হন। এখানে

তাঁর সঙ্গে কবি আঁদ্রে ব্রেঁত'র (Brenton) সাক্ষাত হয়। ব্রেত তাকে 'লা রিভলিউশন সুরিয়েলিষ্ট' পত্রিকার কাজে সহযোগিতা করতে বলেন। কার্পেন্টিয়ার এখানে লুই আরাগঁ, ট্রিস্টান জারা, পল এলুয়ার এবং অন্যান্য বিদ্রোহী মানবতাবাদীদের সহযোগী হিসেবে কাজ করেন। সুর ও সংগীতে পারদর্শী কার্পেন্টিয়ার এখানে আরাগঁ এবং এলুয়ারকে ইউরোপিয় সুর ও সংগীতের মর্ম বুঝিয়েছিলেন। এই প্যারিসেই একসময় কার্পেন্টিয়ার ব্যালে নাচের নিরীক্ষার সূত্রে প্রখ্যাত নর্তক নর্তকী এবং সুরশিল্পী ও চিত্রকরদের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসেন। এই সব চিত্রকরদের মধ্যে ছিলেন ব্রাক ও পিকাসো। কৈশোরে তিনি কিউবাতে আনা পাভলোভার নাচ দেখেছিলেন এবং রুশ ব্যালের শৈলির সমঝদার হয়ে উঠেছিলেন। তিরিশের দশকে যখন বিপ্লবী প্রজাতান্ত্রিক স্পেন বিশ্বের প্রগতিবাদী বামপন্থি ও কমিউনিস্ট লেখক, কবি ও শিল্পীদের চুম্বকক্ষেত্র হয়ে ওঠে, তখন কার্পেন্‌টিয়ারের মানসকেন্দ্র হয়ে দাঁড়ায় মাদ্রিদ। ১৯৩৩ সালে মাদ্রিদ থেকে তাঁর উপন্যাস 'ইকুয়ে ইয়াম্বাও' স্পেনিশ ভাষায় প্রকাশিত হয়। স্পেনের গৃহযুদ্ধের সময় গণতান্ত্রিক প্রজাতান্ত্রিকদের একজন হিসেবে কার্পেন্টিয়ার ছিলেন একজন সৈনিক সাক্ষী। মাদ্রিদের পতন এবং ফ্যাসিস্টদের শাসন কায়েম হবার পরে কার্পেন্টিয়ার প্রথমে স্পেন এবং তারপরে ইউরোপ ছেড়ে ল্যাটিন আমেরিকায় ফিরে আসেন।

এই পর্যায়ে বিশেষ করে ক্যারিবীয় সাগরের কিউবা এবং অন্যান্য অসংখ্য দ্বীপমালা এবং সংলগ্ন মূল ভূখণ্ডের ছোট বড় দেশগুলির অধিবাসী জণগণের সঙ্গে তাঁর গভীর ও ঘনিষ্ঠ পরিচয় হয়। মধ্য ও দক্ষিণ আমেরিকায় স্পেনিশ ও অন্যান্য ইউরোপিয় বাসিন্দা, আদিবাসীদের বিভিন্ন গোষ্ঠী এবং আফ্রিকীয় বংশোদ্ভূতদের পাশাপাশি মিশ্রিত বর্ণের মেস্টিজোদের স্বতন্ত্র ও সম্মিলিত জীবনের ধারার মধ্যে স্বল্পাংশ শোষক এবং অধিকাংশ শোষিতের শ্রেণি-সম্পর্কের প্রত্যক্ষ পরিচয় পেয়েছিলেন কার্পেন্টিয়ার তার চল্লিশের দশকের দেশ দেশান্তরে ঘুরে বেড়াবার সময়। শতাব্দির পর শতাব্দি ধরে মধ্য ও দক্ষিণ আমেরিকায় রাজতন্ত্রী স্পেনিশ ও অন্যান্য ইউরোপিয় সাম্রাজ্য বিস্তারকারীরা যে লুণ্ঠন ও শোষণের জাঁতাকল বসিয়ে ছিন্নমূল দরিদ্র সর্বহারা শ্বেতাঙ্গ ও মিশ্রিত বর্ণের অন্যান্য বাসিন্দা এবং আদিবাসী ও আফ্রিকীয় ক্রীতদাসদের পীড়ন করে আসছিল তার বিরুদ্ধে চাপা এবং খোলা বিদ্রোহও ঘটেছিল অনেক। চেতনা এবং অচেতনার এক জটিল বিন্যাস ঘটেছিল গণমনের বিক্ষোভ ও যন্ত্রনায়। সাম্রাজ্যবাদীরা পরগাছাদের উৎসাহিত করে ল্যাটিন আমেরিকায় দেশে দেশান্তরে পেটোয়া সামরিক শাষক ও স্বৈরাচারীদের একটা ধারা সৃষ্টি করে ফেলেছিল। এরা যেমন নির্মম, তেমনি স্বেচ্ছাচারী। অপরদিকে রাজতন্ত্রী স্পেনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ থেকে শুরু করে অন্যান্য ইউরোপিয় লুটেরাদের বিরুদ্ধে মেক্সিকোর মত দেশগুলির মুক্তিযুদ্ধেরও একটা রেওয়াজ গড়ে উঠেছিল। এই মুক্তিযুদ্ধ এবং বিদ্রোহের পুরোভাগে এসে দাঁড়ায় কিউবার ফিদেল কাস্ট্রো এবং চে গুয়েভারার নেতৃত্বে পঞ্চাশের দশকে। এই বিপ্লবী প্রক্রিয়ার প্রথম সারির কলাশিল্পীদের অন্যতম হয়ে ওঠেন কার্পেন্‌টিয়ার।

১৯৪৩ সালে যখন তিনি হাইতিতে ছিলেন তখন ইহজাগতিক রাজ্য (Kingdom of this World) নাম দিয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ উপন্যাস লেখায় হাত দেন। ১৯৪৯ সালে এই

উপন্যাস প্রকাশিত হয়। এরপর দুই পর্যায়ে রচিত হয় তাঁর উপন্যাসমালা। ১৯৫৯ সালে কিউবার বিপ্লব সফল হবার আগে এবং পরে এই দুটি পর্যায়। তাঁর সর্বশেষ দুটি বই সত্তরের দশকের শেষার্ধে তাঁর মৃত্যুর কিছুকাল আগে প্রকাশিত হয়েছে। দুটি বই হচ্ছে 'The Right of Spring' (বসন্তের আবাহনী) এবং 'The Harp and the Shadow' (বীণা এবং প্রতিচ্ছায়া)। বসন্তের আবাহনী প্রকাশিত হয়েছে কিউবা থেকে এবং 'বীণা ও প্রতিচ্ছায়া' প্রকাশিত হয়েছে প্যারিস থেকে। প্যারিসের গাইলহার্ড প্রকাশনালয় থেকে প্রকাশিত 'বীণা এবং প্রতিচ্ছায়া' উপন্যাসটির ২০ হাজার কপি কয়েক সপ্তাহের মধ্যে বিক্রি হয়ে যায়।

'বসন্তের আবাহনী' উপন্যাসটির নাম নেওয়া হয়েছে স্ট্রাভিন্স্কির একটি ব্যালে নৃত্যনাট্যের নাম থেকে। এর নায়িকা একজন রুশ ব্যালে নর্তকী, যিনি রুশ বিপ্লবের পর দেশত্যাগ করে ঘুরতে ঘুরতে গিয়ে উপস্থিত হয়েছেন স্পেনের মাদ্রিদে তিরিশের দশকে। সেখানে তাঁর সঙ্গে কিউবার এক স্থপতির সাথে দেখা। মাদ্রিদের গণতন্ত্রের জন্য যুদ্ধের অগ্নিশিখার আলোকিত চেতনায় এদের প্রেম। অতঃপর কিউবার। সেখানে নায়িকা ব্যালে নর্তকী তিনটি সংস্কৃতির ধারার সংযোগ স্থলে এক নতুন সংস্কৃতি সৃষ্টির প্রয়াসে ব্রতী হন। এই তিনটি ধারা হল ইউরোপিয়, আফ্রিকীয় এবং ল্যাটিন আমেরিকার আদিবাসীদের সংস্কৃতি নায়ক এই প্রয়াসে তাঁর নিজস্ব কৃতি নিয়ে সহায়। কিউবার বিপ্লব এনেছে এই নতুন মানসসৃষ্টিকে নব বসন্তের ফুলে ফুলে ভরে দেবার সম্ভাবনা হিসেবে।

'বীণা এবং প্রতিচ্ছায়া'র বিষয়বস্তু হচ্ছে কলম্বাসের চরিত কথা। এখানে কার্পেন্‌টিয়ার কলম্বাসকে একজন লোভী স্বর্ণ-সন্ধানী হিসেবে চিহ্নিত করেছেন।

॥ ৩ ॥

ইউরোপ এবং আমেরিকার এবং এই সঙ্গে আফ্রিকার সংযোগের যে মহাবৈপ্লবিক স্বজনাত্মক সম্ভাবনা গড়ে উঠেছে সাম্রাজ্যবাদী নষ্টামির সমস্ত ক্ষয়, অবক্ষয় ও অপচয়কে ভেদ করে, আলেজো কার্পেন্‌টিয়ার তার কথাশিল্পি। সুরিয়েলিস্টদের সঙ্গে তিনি কাজ করেছিলেন। সেই প্রভাব আছে তাঁর লেখায়। সুর ও সংগীতে তাঁর যে বৈদগ্ধ্য, সেটিও একটি প্রধান উপাদান হিসেবে কাজ করেছে তাঁর উপন্যাসে।

স্পেনে তিরিশের দশকে প্রজাতন্ত্রী গণতন্ত্রীদের পরাজয় তাঁকে জনগণের বৈপ্লবিক সম্বন্ধে নৈরাশ্যবাদী করেছিল। কিন্তু চল্লিশের দশকে ল্যাটিন আমেরিকায় মুক্তি সংগ্রামের সুদীর্ঘ স্রোতধারার অন্তঃশীল শক্তির পরিচয় পাবার পরে আবার ফিরে পেয়েছিলেন বৈপ্লবিক আস্থা। এই আস্থার মূলে রয়েছে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা। অর্থাৎ সব মিলিয়ে যে ধারা গড়ে তুলেছেন কার্পেন্‌টিয়ার উপন্যাসের শিল্পরূপে তার নাম দেওয়া হয়েছে magical reality.

এই সঙ্গে আপাতত কার্পেন্‌টিয়ারকে অভিনন্দিত করে বক্তব্য শেষ করছি। তিনি সারা বিশ্বের সামনে ষাট ও সত্তরের দশকের সমস্ত বিভ্রান্তির মধ্যে দ্ব্যর্থহীনভাবে প্রমাণ দাখিল করেছেন যে, আজ এবং আগামীতে ললিত কলার শ্রেষ্ঠ প্রবক্তাদের সামনের সারিতে কমিউনিস্টরা আছেন এবং থাকবেন।

মার্কোয়েজের অন্যান্য উপন্যাস
"একশ বছরের নিঃসঙ্গতা" নিয়ে কিছু কথা

[**প্রাককথন:** বিশ্বউপন্যাসের বয়স হয়েছে পাঁচশ' বছর। বাংলা উপন্যাসই শতাব্দি ছাড়িয়েছে। উপন্যাসের বিন্যাস কিন্তু খুব বেশি বদলায়নি যদিও অসংখ্য নরনারী-জীবনের ধারা দেশ-দেশান্তর থেকে এসে এতে মিশেছে। এই জন্যেই এর মূল কিংবা অনুবাদের ভাষা জানা থাকলে কাহিনির মধ্যে ব্যাপকতম পাঠক-পাঠিকা সরাসরি প্রবেশ করতে পারেন। যে দেশ যত রহস্য কিংবা বাধা দিয়েই ঘেরাও হয়ে থাক না কেন, এর হৃদয়কে জানতে কষ্ট হয় না। দ্বীপমালা দিয়ে গাঁথা মধ্য ও দক্ষিণ আমেরিকার তথা লাতিন আমেরিকার ভিতরটা আমাদের ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের গণ্ডি থেকে দূরে। কিন্তু এর উপন্যাস হাতে এলে এই অঞ্চলের বিশাল বিশাল নদী, পর্বতমালা, উপত্যকা আর আগ্নেয়গিরি ও অরণ্যের আদি ও নব বাসিন্দাদের কোটি কোটি নরনারীকে যেন আমাদের ঘরের পাশে কথাবার্তা বলতে শুনতে পাই। এমনি একটি উপন্যাস মার্কোয়েজের "একশ বছরের নিঃসঙ্গতা"। লাতিন আমেরিকার চিলির কবি পাবলো নেরুদা আমাদের একান্ত চেনা মানুষ। তিনি জন্মেছিলেন বিশ শতকের শুরুতে। বিশ শতকের শেষার্ধে এসেছেন কলম্বিয়ার মার্কোয়েজ। ঔপন্যাসিক। কিছু প্রশ্নের মধ্য দিয়ে উপন্যাস ও তার লেখককে হাজির করা হলো এখানে। বইটি স্পেনিশ ভাষায় লেখা। ইংরেজি ভাষায় অনুদিত এই উপন্যাসটির নাম "One Hundred Years of Solitude"–লেখক।]

॥ ১ ॥

দক্ষিণ আমেরিকার কলম্বিয়া প্রজাতন্ত্রের অতিসাম্প্রতিক লেখক গার্সিয়া গ্যাব্রিয়েল মার্কোয়েজের উপন্যাস "একশ বছরের নিঃসঙ্গতা" ১৯৮২ সালে নোবেল পুরস্কার পাবার আগেই বিশ্বের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। নোবেল পুরস্কারের পরে স্বাভাবিকভাবেই এর পরিচিতির পরিধি বেড়েছে। শুরু থেকেই সাধারণভাবে বামপন্থি ও বিশেষভাবে মার্কসবাদী মহলের যে আগ্রহ প্রকাশ পেয়েছিল, তা একটা দায়িত্বেরও রূপ নিয়েছে। বইটিকে কেন্দ্র করে উপন্যাসের শিল্পরূপের মূল-প্রশ্নগুলি নিয়ে যে ব্যাপক আলোচনার ক্ষেত্র উন্মুক্ত হয়েছে, তাতে সাধারণভাবে বামপন্থি ও বিশেষভাবে মার্কসবাদী বক্তব্যকে যে কোন বিতর্কের মোকাবেলা করতে হবে।

কয়েকটি প্রশ্ন বইটি পড়েছেন এমন অনেকের মনেই জেগে থাকতে পারে। এই প্রশ্নগুলি একটি মূলপ্রশ্নকে ঘিরে রয়েছে। সেটি এই যে, মার্কোয়েজের উপন্যাসটির বিপুল ধ্রুপদী ও আধুকিতম লৌকিক মানসিকতাও ঘটনা-বিন্যাসের মধ্যে যে অলৌকিক ঘটনার উল্লেখ রয়েছে, সেগুলি কি রসগ্রাহ্য হলেও চিন্তা ও চেতনায় আধুনিকমনা পাঠক-পাঠিকাদের কাছে যুক্তিগ্রাহ্য? সাধারণভাবে উপন্যাসের চারশ' বছরের পরিণত শিল্পরূপের বিচারেই বা এই অলৌকিকতার উপাদানের জায়গা কোথায় ? ইতোপূর্বে মানুষের বহিঃপ্রকৃতির ঘটনার চেয়েও অন্তঃপ্রকৃতির ঘটনাকে বড় করে তুলে ধরে শেষ পর্যন্ত নরনারী-চরিত্রকে ভেঙ্গে চুরে কতকগুলি জৈব মানসিক আচরণের ঘোলাটে প্রবাহে পরিণত করার যে রীতি গড়ে উঠেছিল, মার্কোয়েজ কি তার উপন্যাসের মধ্যে দিয়ে

তেমনি তালগোল পাঁকাতে চেয়েছেন? প্রশ্নটিকে সর্বোপরি আরেকভাবেও উপস্থিত করা যেতে পারে? মার্কসীয় রূপবিচারে এই বইটিকে কিভাবে দেখবো? উপন্যাসের অলৌকিকতার উপাদানকে মার্কসীয় দৃষ্টিভঙ্গি কোন রীতিতে দেখে?

॥ ২ ॥

উপরিউক্ত প্রশ্নগুলির জবাবের সূত্রেই আমাদের এই আলোচনা।

গোড়াতেই বইটির একটি সারমর্ম উপস্থিত করছি। এতে লৌকিকের মধ্যে অলৌকিকের উপস্থাপন সম্বন্ধে একটা আন্দাজ পাওয়া যাবে। সারমর্মটি নিম্নরূপ:

উনিশ শতকের শুরু থেকে বিশ শতকের দুই দশক পর্যন্ত এক শতাব্দিকালে দক্ষিণ আমেরিকার কলম্বিয়ার একটি অত্যন্ত দুর্গম এলাকায় একটি গৃহ এবং তাকে ঘিরে একটি জনপদ গড়ে ওঠার পটভূমিতে মধ্যযুগীয় জীবনযাপন থেকে আধুনিকতম নাগরিক জীবনধারায় লালিত ও বর্ধিত একটি পরিবারের চার প্রজন্মের কথা নিয়ে রচিত হয়েছে "একশ বছরের নিঃসঙ্গতা" উপন্যাস। এই পরিবার ও তার গৃহকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা জনপদে ইউরোপীয় মধ্যযুগের শেষের দিকের শিল্প ও বিজ্ঞান বিপ্লবের তৈজসপত্র যেমন আমদানি হয়েছে, তেমনি এরোপ্লেনের যুগ পর্যন্ত ব্যবহারিক বিজ্ঞানের শতাব্দিব্যাপী সম্ভার একের পর এক এসে পরিবারটিকে এবং সেইসঙ্গে জনপদটিতে পশ্চিমী ধনতান্ত্রিক সভ্যতার চরম ও পরম ভোগ এবং তাড়নার সৃষ্টি করেছে। এই জনপদ ও তার কেন্দ্রীয় পরিবারটি দক্ষিণ ও মধ্য আমেরিকা তথা লাতিন আমেরিকার রাজনৈতিক মুক্তিসংগ্রামের দ্বন্দ্বাত্মক উত্থানপতনের শরিক হয়েছে। গোঁড়া ক্যাথলিক ধর্মাবলম্বী পুরোহিত শাসিত স্পেনিশ উপনিবেশ স্থাপনকারী জনপদটি এবং তার কেন্দ্রীয় পরিবারটি হচ্ছে ঘটনাবলির মূলাধার। আদিম জীবন যাপনে অভ্যস্ত আদিবাসীরা তাদের চিন্তাচেতনার একটা বাতাবরণ দিয়ে জনপদটিকে ঘিরে রেখেছে। কিন্তু যেন কোন সুড়ঙ্গ পথে ইতালির বাদক থেকে শুরু করে আরবের সওদাগর পর্যন্ত এসে এখানে আস্তানা গেড়েছে। এসেছে নানারকমের যান্ত্রিক সরঞ্জাম। এসেছে রেললাইন। এসেছে মার্কিন ধনকুবের এবং তার খামার। এককথায় আধুনিক লৌকিক জীবনের একসময়ের শান্ত সরল ধারা সময়ান্তরে প্রচণ্ড অস্থির ও জটিল হয়ে উঠেছে।

এই সঙ্গে পাল্লা দিয়েছে পরিবারটির এবং জনপদেরও চার প্রজন্মের চরিত্রাবলি। এই সমস্ত চরিত্রই একান্তভাবে মানবিক প্রচণ্ড আবেগ ও সূক্ষ্ম অনুভূতি ক্রমান্বয়ে একেকটি চরিত্রকে বিশেষত্ব দিয়েছে। এদের চরিত্রের প্রত্যেকের স্বকীয়তা যতটা সময়ে স্পষ্ট হয়ে উঠতে পারার, ততটা আয়ু এরা পেয়েছে। দীর্ঘায়ুদের সংখ্যা অনেক। কয়েকজন শতায়ু। ধ্রুপদী ও ঐতিহাসিক ধরনের উপন্যাসে এরা সবাই বাস্তব চরিত্র। এদের একেক জনের একেক রকমের ঝোঁক পেয়েছে প্রচুর পরিসর। পরিবারগুলি লৌকিক। তৈজসপত্রের বর্ণনায় মনে হয় মিউজিয়ামে বসে সব দেখছি।

একটি অদ্ভুত চরিত্রের শতায়ূ লোক অবশ্য এই উপন্যাসের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত রয়েছে। জনপদটি সূচনার সময়ে মহাদেশে দেশে ভ্রাম্যমাণ এক বেদিয়া দলের সঙ্গে সে এসে কেন্দ্রীয় পরিবারটির সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছিল। সে ছিল এক ধরনের মধ্যযুগীয় খ্যাপাটে বিজ্ঞানী। নানারকমের আকারা বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি দিয়ে জাদুর খেলা

দেখাতো। সে পরিবারটির কর্তার নির্দেশে একটি ঠিকুজি তৈরি করেছিল পরিবারের উত্থানপতনের। ঠিকুজিটি রচিত হয়েছিল সান্ধ্য ভাষায়। ভাষাটা আসলে সংস্কৃত। কিন্তু লাতিন আমেরিকায় তখন কে পড়বে এর লেখন? রহস্যময় লোকটি পরিবারের শেষ বংশধরকে তার মৃত্যুর মূলে এই ঠিকুজির মর্মন্তুদ ব্যাখ্যা শুনিয়ে নিজেও মরে গেল। পরিবারটিও শেষ হলো, পদটিও ধবংস হয়ে গেল। মনে হতে পারে এই ব্যাপারটা বুঝিবা অলৌকিক। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই ঠিকুজিটি মানব প্রকৃতি-বিজ্ঞান। রহস্যময় লোকটি আসলে প্রকৃতি বিজ্ঞানী।

সমস্ত কাহিনিটি বুঝিয়ে দেয় যে, লৌকিক কার্যকরণ সম্পর্কের ধারা বেয়ে উপন্যাসের চরিত্রসমূহ তাদের পরিণতির দিকে ধেয়ে চলেছে। এর মধ্যে যেমন সূক্ষ্ম বাস্তব রয়েছে, তেমনি কার্যকারণের স্থূল ও বৃহৎ পটভূমিও রয়েছে। পরিণতিগুলি চরিত্রাবলির প্রত্যেকের এবং পরস্পরের সৃষ্টি। বিশেষ করে নরনারীর প্রেম ও আকর্ষণ বিকর্ষণের রক্তমাংসের ব্যাপারটা অত্যন্ত স্পষ্ট ও প্রচণ্ডভাবে রূঢ়।

এই লৌকিক বিন্যাসের আরেকটি দিকও কিন্তু সমানভাবে স্পষ্ট—সেটা হচ্ছে, কেন্দ্রীয় পরিবারটি হোক, কিংবা তাকে ঘিরে ওঠা বিন্দু থেকে সিন্ধুতে পরিণত জনপদটি হোক, এরা একটা নিদারুণ নিঃসঙ্গতা বা একাকিত্ব বা বিচ্ছিন্নতার শিকার। এরা বাইরের জগতের সঙ্গে যুক্ত হয়েও যেন একঘরে হয়ে গিয়েছে। কেন্দ্রীয় পরিবারটির চার প্রজন্মের প্রত্যেকটি চরিত্রই বস্তুতপক্ষে নিজ নিজ গণ্ডির মধ্যে বদ্ধ। জনপদটিও সমস্ত লৌকিক সম্ভার নিয়ে একটা ঐক্যবদ্ধ সত্তা নিয়ে গড়ে উঠতে পারে নি। পরিবারটির একজন লাতিন আমেরিকার মুক্তিযুদ্ধের নায়ক হলেও নিজ বাসভূমে যেন পরবাসী হয়ে রয়েছে। স্পেনের ঔপনিবেসিক সাম্রাজ্যকে ভেঙ্গে ফেলে মুক্তিযোদ্ধার প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত করলেও জনগণ ক্ষমতার কাঠামোতে জায়গা পায়নি। বিপ্লব থেকে গিয়েছে অসমাপ্ত। এর ফলে যা হবার তাই হয়েছে। জীবন চলেছে গড্ডালিকা প্রবাহে। এর মধ্যেও দূরাকাঙ্ক্ষীদের অভাব হয়নি। তবে এরা কেউ গিয়েছে প্যারিসে, কেউ রোমে। মাঝে মাঝে গতানুগতিকার জীবনে যেসব উৎক্ষেপ ঘটেছে, সেগুলির জন্য কেউ কেউ ছিটকে বেরিয়ে গিয়েছে দূরান্তরে। এইমাত্র। উপন্যাসটির নামকরণের মধ্যে রয়েছে বিচ্ছিন্নতার সমস্যাদি। শব্দানুগ অনুবাদে নামটি হওয়া উচিৎ ছিল, 'নিঃসঙ্গতার একটি বছর'। অবশ্য এতে নিঃসঙ্গতার তারতম্য ঘটেনি।

লৌকিকতার বিপুল বিন্যাসের মধ্যে এই যে বিচ্ছিন্নতা ও নিঃসঙ্গতা, এটাও কিন্তু অলৌকিকতার পর্যায়ে পড়ে না। এটা দ্বন্দ্বাত্মক জীবনের নেতিবাচক দিক। ধনতান্ত্রিক সভ্যতা তার সমাজ সম্পদ দিয়ে একে নিবারিত করতে পারেনি। বরং এটা বিচ্ছিন্নতা ও একাকিত্বকে পরিপুষ্ট করেছে। এই নেতিবাচকতাই উপন্যাসের কাহিনিকে মর্মন্তুদ বিয়োগাত্মক পরিণতির দিকে টেনে নিয়ে গিয়েছে। নিশ্চিহ্ন হয়েছে পরিবারটি, ধ্বংস হয়েছে জনপদটি।

এখন প্রশ্ন, তাহলে এই কাহিনির মধ্যে সেই অলৌকিকতাটা কোথায় যেজন্য বইটি নিয়ে একটা মৌলিক প্রশ্ন দেখা দিয়েছে?

এই প্রসঙ্গে বলা যেতে পারে, কাহিনির শুরু হয়েছিল একটা অলৌকিক কাণ্ড ঘটার আশঙ্কা নিয়ে। সেটা হচ্ছে একটা আদিম খ্রিষ্টীয় ধর্মীয় অতি প্রাকৃত সংস্কার। লাতিন

আমেরিকার একটি স্পেনিশ বসতির এক যুবক ও যুবতী আত্মীয়তার সূত্রে ভাইবোন হওয়া সত্ত্বেও বিয়ে করেছিল। অতি প্রাকৃত সংস্কার কিন্তু তাদের তাড়া করে না। ভাইবোনের বিয়ের সন্তান একটা লেজ নিয়ে জন্মাবে, এই সংস্কার তাদের বসতি ছাড়া করল। তারা বেরিয়ে পড়ল এক দুর্গম এলাকায় যেখানে কোন সমাজ নেই সেখানে একটা ঘর বেঁধে থাকার উদ্দেশ্যে। এরা স্থাপন করল গৃহ। এল সন্তান সন্ততি। গড়ে উঠলো জনপদ। কিন্তু প্রজন্মের পর প্রজন্মে সমস্ত সন্তানই বিচিত্র রকমের চরিত্রের হলেও দৈহিকভাবে স্বাভাবিক রইল। লৌকিক জীবনের ধারায় অতি প্রাকৃত সংস্কার নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত অপ্রত্যাশিতভাবে অলৌকিক ব্যাপারটি ঘটলো বংশের শেষ সন্তানের বেলায়। শেষ প্রজন্মের সম্পর্কিত দুই ভাইবোনের নেতিবাচক আত্মনিবদ্ধ ভোগসর্বস্ব জীবনের লাগামহীন দৈহিক তাড়নার ফল এই অস্বাভাবিক সন্তান। সে মৃত অবস্থাতেই জন্মাল। জননীও সঙ্গে সঙ্গে মারা গেল। অতি প্রাকৃত সংস্কারকেই এইভাবে গ্রিক নাটক ইডিপাসের ভয়ঙ্কর পরিণতির মত একান্ত আধুনিক কালের মানুষের জীবনে জয়পতাকা উড়াতে দেখা গেল।

এক শতাব্দিব্যাপী জীবনের ধারায় ভ্রান্ত বলে প্রমাণিত একটি অলৌকিক সংস্কারকে এইভাবে পুনর্জাগরিত করার ব্যাপারটাই প্রধানত মার্কোয়েজের উপন্যাসে চাপিয়ে দেয়া বলে মনে হবে। উপন্যাসের লৌকিক বিন্যাসের ফাঁকে ফাঁকে অবশ্য আরও কয়েকটি ঘটনা বর্ণিত হয়েছে, সেগুলিকে অতিপ্রাকৃত বলা যায়। যেমন পরিবারের সবচেয়ে সুন্দরী ও অভিমানিনী কন্যা যখন শেষের দিকে আঙ্গিনায় ঘুরছিল, তখন কে যেন তাকে আকাশ থেকে টেনে নিয়ে চলে যায়। তাছাড়া পরিবারের এক ছেলে যখন আলাদা বাড়িতে বদ্ধ ঘরে অপঘাতে বন্দুকের গুলিতে মরল, তখন তার রক্তের ধারা মায়ের বাড়ির দরজা পর্যন্ত গড়িয়ে এসে মৃত্যুর কথাটা জানিয়ে দিল। এছাড়া আরও অলৌকিক ঘটনা ঘটেছে। আকাশ থেকে বৃষ্টির মত কখনো ফুল ঝরেছে। ঝাঁকে ঝাঁকে কখনো বা মরা পাখি ঝরে পড়েছে। চারবছর ধরে একটানা বৃষ্টি হয়ে সমগ্র জনপদটাকে তছনছ করে দিয়েছে। এগুলোকে অতিপ্রাকৃত ছাড়া কি বলবো? এইসব ঘটনা মূল লৌকিক ঘটনাবিন্যাসের সঙ্গে কার্যকারণগত যুক্ত হয়ে ঘটেনি অবশ্য। আদিবাসীদের কোন কোন ধ্যান ধারণা মাঝে মাঝে পরিবারটিতে ছায়া ফেলেছে, কিন্তু সেগুলিও স্থায়ী হয়নি। এরা কাহিনির গতিপরিণতির উৎক্ষেপ মাত্র। খ্রিষ্টান পুরোহিত খ্রিষ্টীয় জমায়েতে বেদির উপর দাঁড়িয়ে ভাষণ দেবার সময় দেখা যায়, পুরোহিত বেদী থেকে আলগা হয়ে যেন শূণ্যে ভর করে দাঁড়িয়ে আছে। একেও বিচ্ছিন্ন ঘটনা বলা যেতে পারে। কিন্তু লেজধারী সন্তান জন্মাবার ঘটনাটা শুরু আর শেষকে একটা গতিপরিণতির ধারায় জোর করে হলেও গেঁথে দিয়েছে। এই অলৌকিকতাকেই আমরা উপন্যাসটির সঙ্গতির ব্যাপারে মূল প্রশ্ন হিসেবে দেখবো।

॥ ৩ ॥

আমরা দুদিক থেকে এই সঙ্গতির প্রশ্নটিকে খতিয়ে দেখবো। প্রথমত, উপন্যাসের শিল্পরূপের দিক থেকে। দ্বিতীয়ত, মার্কসীয় বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গি থেকে। শুরুতেই একথা জানিয়েছি।

এখন প্রথমে উপন্যাসের শিল্পরূপের দিকটাকে বিচার করা যাক।

আমরা জানি, গদ্যমহাকাব্য হিসেবেই উপন্যাসের আবির্ভাব। তবে যুগযুগান্ত ধরে চলে আসা মহাকাব্যের সঙ্গে উপন্যাসের পার্থক্য শুধু গদ্যে সূচিত হয়নি। মহাকাব্য থেকে একটা বড় পার্থক্য নিয়ে উপন্যাসের সৃষ্টি। মহাকাব্যে মানুষের জয়পরাজয়ের ইতিবৃত্তের সঙ্গে জড়িয়ে থাকতো অলৌকিকতা। বস্তুতপক্ষে দেবদেবী প্রভৃতি অতিপ্রাকৃত শক্তির অঙ্গুলিহেলনেও মহাকাব্যের বীর ও বীরাঙ্গনারাও চলতে বাধ্য হত। উপন্যাস এসে এই দেবদেবী প্রভৃতি অতিপ্রাকৃত শক্তি বা অলৌকিকতার নির্দেশ থেকে মানুষের অভিযাত্রাকে মুক্ত করে দিল। জন্মমৃত্যু মিথুনের জৈব সীমাপরিসীমা মানব প্রকৃতির অঙ্গ হিসেবে বহাল রইল। কিন্তু তাতে অলৌকিকতা রইল না। দেবদেবীরা অন্তর্ধান করল। নরনারীর পার্থিব ও সামাজিক জীবন হলো জীবনমৃত্যুর সমস্ত রহস্যের মূলাধার। মানুষের কীর্তি ও অকীর্তি হয়ে উঠলো গদ্যমহাকাব্যের বিষয় সম্পদ। লাগামছাড়া কল্পনাও দৈবকে আশ্রয় করল না। মানুষের বহির্জগত ও অন্তর্জগৎ নিয়ে দ্বন্দ্ব বাঁধল। সেখানে মানুষকে নিয়ে ভাংচুর হলো কিন্তু মানুষই রইল সমস্ত উপন্যাস জুড়ে। বহিঃপ্রকৃতির দিক থেকে বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে তার যোগ, এই জন্যে প্রকৃতি উপন্যাসে বড় জায়গা পেয়েছে। অন্তঃপ্রকৃতির দিক থেকে মানুষের যোগ যুগ-যুগান্তরের চিন্তাভাবনার সঙ্গে। সেইজন্যে চিন্তাভাবনাও উপন্যাসে বড় জায়গা নিয়েছে। এছাড়া মানুষতো কোন দিনই একক ছিল না। অন্তরে বাহিরে বহুর সঙ্গে জড়িত তার সত্তা। এইসব উপাদান নিয়ে অবিশ্রান্ত পরিবর্তনের ধারায় মানুষের অন্তরঙ্গ কাহিনিকে উপন্যাস অসংখ্য পরিমাপে রূপায়িত করেছে। ধ্রুপদী উপন্যাসই হোক অথবা অতিআধুনিক মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাস হোক, একটা ব্যাপার এদের সাধারণ গুণনীয়ক। সবার উপরে মানুষের সত্তা সত্য।

বাংলা উপন্যাসের দৃষ্টান্ত রয়েছে আমাদের কাছে। এর গতিপরিণতি উপন্যাসের মূল বৈশিষ্ট্য অনুসারেই ঘটেছে। বাংলা উপন্যাস শুরু থেকেই বাংলা সাহিত্যের অন্যান্য আঙ্গিক থেকে আলাদা। বাংলা কাব্য ও নাটকে অতিপ্রাকৃত শক্তির উপাদান আছে। বিশ শতকেও এটা চলে। কিন্তু উপন্যাসে এই অতিপ্রাকৃত শুরুতেই বর্জিত হয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্রের আনন্দমঠ উপন্যাসে পৌরানিক প্রসঙ্গ থাকলেও সেগুলি নায়ক নায়িকার জীবনধারাকে নিয়ন্ত্রিত করেনি। খোঁজাখুঁজি করলে গত একশ' বছরের বাংলা উপন্যাসে অলৌকিক ও অতিপ্রাকৃত উপাদান যে পাওয়া যাবে না তা নয়। তবে এরা কোন উপন্যাসিকেরই মূল প্রবণতা নয়। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'দৃষ্টিপ্রদীপ' ও 'দেবযান' উপন্যাসে অতিপ্রাকৃত ব্যাপার রয়েছে, কিন্তু অধ্যাত্মবাদীরাও এদের সামনে আনেন নি। তারাশঙ্কর তান্ত্রিকদের নিয়ে লিখলেও তাঁর সমস্ত উপন্যাসে মানুষই বড়, মানুষই নিয়ন্তা। মহাশ্বেতা দেবী যে আদিবাসীদের নিয়ে একাধিক উপন্যাস লিখেছেন, তাতেও তিনি অলৌকিকতাকে আনেন নি। এর কারণ, বাংলা উপন্যাস যেভাবে শতাব্দি জুড়ে গড়ে উঠেছে, তাতে অলৌকিক নিয়ে লেখা কঠিন কাজ।

উপন্যাসের শিল্পরূপের মূলধারার বিচারে এই দৃষ্টান্তই নিশ্চয় যথেষ্ট। আমরা বিস্তারিত আলোচনায় যাবো না। আমাদের বিবেচ্য 'একশ বছরের নিঃসঙ্গতা' উপন্যাসের বিপুল লৌকিক বিন্যাসে অলৌকিকতা আরোপের যৌক্তিকতা অথবা অযৌক্তিকতা।

আপাতদৃষ্টিতে আমাদের বাংলা উপন্যাসের পাঠক পাঠিকাদের কাছেও মনে হবে, মার্কোয়েজ উপন্যাসের মূল ধারাকে ভেঙ্গেছেন এবং কয়েক'শ বছর পিছিয়ে গিয়েছেন। মার্কোয়েজের তরফ থেকে এ সম্বন্ধে কিছু বলার রয়েছে কি?

সরাসরি মার্কোয়েজ কিছু বলেছেন কিনা জানি না। তবে একটা বক্তব্য সাধারণভাবে লাতিন আমেরিকার তরফ থেকে বলা হয়েছে, যা থেকে মার্কোয়েজের অলৌকিকতার মিশ্রণকেও উপন্যাসে মানুষের জয়জয়কারেরই একটা পদ্ধতি বলে নির্দিষ্ট করা যেতে পারে।

বক্তব্য নিম্নরূপ

আঠারো শতকের শেষের দিকে কিংবা উনিশ শতকের শুরুতে যখন স্পেনের উপনিবেশিক সাম্রাজ্যবাদী শাসকের বিরুদ্ধে মধ্য ও দক্ষিণ আমেরিকা তথা সমগ্র লাতিন আমেরিকার স্পেনিশ বসতি স্থাপনকারীদের পাশাপাশি আদিবাসী জনগণ কিংবা আফ্রিকা থেকে আনীত দাসদের প্রজাতান্ত্রিক বিদ্রোহ ঘটে, তখন স্পেনের উপনিবেশিক শাসন উৎখাত হয়ে গোটা বিশেক জাতীয় প্রজাতন্ত্র স্থাপিত হলেও এদের বিকাশ প্রায় এক শতাব্দিকাল অবরুদ্ধ থাকে। বিশ শতকে এসে আরম্ভ হয় এদের দ্বিতীয় দফার জাতীয় মুক্তিযুদ্ধ এবং এই সঙ্গে বিকাশের ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ প্রয়াস। লাতিন আমেরিকার উপন্যাস তাই মূলত বিশ শতকের ঘটনা। এই উপন্যাসে লাতিন আমেরিকায় মানুষের আত্ম-প্রতিষ্ঠার ব্যাপারটা একটা বিপ্লবাত্মক উপাদানকে আশ্রয় করে গড়ে ওঠে। এই উপাদান হচ্ছে, লাতিন আমেরিকার স্বকীয়তা। যেহেতু মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ও তার দোসরেরা এই স্বকীয়তাকে ধবংস করে তাকে মানসিকভাবেও পরনির্ভর করতে চাইছে, সেজন্য এই স্বকীয়তাকে এর সবকিছু সমেত রক্ষা করা বৈপ্লবিক দায়িত্ব। উপন্যাস তার কাঠামোর দিক দিয়ে মহাকাব্যিক গদ্য হলেও এই স্বকীয়তাকে প্রতিফলিত করতে গিয়ে এবং উপন্যাসকে ব্যাপকভাবে জনগ্রাহ্য করতে গিয়ে লাতিন আমেরিকার জনগণের বহুজাতিক সংস্কৃতির নানারকম অতিপ্রাকৃত বিশ্বাসকেও মানুষের জয়জয়কারের ইতিবৃত্তে যুক্ত করতে হয়েছে। বিশ শতকে সাম্প্রতিককালে লাতিন আমেরিকার শ্রেষ্ঠ উপন্যাসিকরা একটা বিশেষ বাস্তববাদকে কাজে লাগাচ্ছেন। এর নাম ঐন্দ্রজালিক বাস্তববাদ। এক সময়ে কিউবার আলেজো কার্পেনটিয়ার প্যারিসে পল এলুয়ার ও লুই আরাগঁর সঙ্গে সাহিত্যের কাগজ বার করতেন। তিনি এই ঐন্দ্রজালিক বাস্তববাদের বড় কারিগর। সম্প্রতি প্রয়াত এই উপন্যসিকের লেখায় মুক্তিযুদ্ধের বিষয়বস্তুতেই অলৌকিকতা যুক্ত হয়েছে। মার্কোয়েজ এই কার্পেন্টিয়ারের অনুসারী। কার্পেন্টিয়ার ছিলেন শিল্পরূপের চিন্তাধারার আধুনিকতম প্রবক্তা। কিন্তু লাতিন আমেরিকার স্বকীয়তার প্রশ্ন তাকে ঐন্দ্রজালিক বাস্তববাদে টেনে নিয়েছিল। সচেতনভাবেই তিনি অযৌক্তিকতাকে ব্যবহার করেছিলেন। মার্কোয়েজ সচেতনভাবে তাই করেছেন।

সুতরাং, বাংলা উপন্যাসের চেয়ে অনেক দেরিতে লাতিন আমেরিকার উপন্যাসের প্রসার ঘটলেও সেই বিলম্বই এর মধ্যে অলৌকিকতার উপাদান সংযোজনের কারণ নয়। এই উপন্যাস তার মহাদেশের মুক্তি সংগ্রামকে রক্ষা করার জন্য অলৌকিকতা প্রয়োগ করেছে। এই অলৌকিকতার উপাদান বাদ পড়লে এই মহাদেশের আত্মপরিচয়ের হানি হবে। এখনও এই উপাদান জড়িত আছে মহাদেশের গণজীবনে।

এই ঘটনাটি আফ্রিকার উপন্যাসের ক্ষেত্রেও সমভাবে প্রযোজ্য। বিশেষ করে কালো আফ্রিকার দেশগুলির উপন্যাসে রয়েছে অলৌকিকতার ছড়াছড়ি। আদিবাসী প্রধান এই সব দেশ বর্তমানে যে ধর্মেরই অনুসারী হোক না কেন, আদিম আফ্রিকার সংস্কৃতিকে রক্ষা করার মধ্য দিয়েই মুক্তি সংগ্রাম করে আসছে। উপন্যাসিকরা ধ্রুপদী উপন্যাসের শিল্পরূপ সম্বন্ধে অজ্ঞ তো নয়ই, বরং এদের মধ্যে অনেকে রয়েছেন যাঁরা সমগ্র বিশ্ব সাহিত্যের ধারক ও বাহক। তবু, যে কারণে লাতিন আমেরিকার কার্পেন্‌টিয়ার ও মার্কোয়েজের উপন্যাসে অলৌকিকতা এসেছে, সে কারণেই আফ্রিকার উপন্যাসেও অতিপ্রাকৃত উপাদান ব্যবহৃত হয়েছে। এই অলৌকিকতার উপাদান নিয়ে লেখা উপন্যাসই যে কোন চারশ' বছরের উপন্যাসে দেশেরও আধুনিকতম কাজের সঙ্গে তুলনীয়।

'একশ বছরের নিঃসঙ্গতা' উপন্যাসের রচয়িতা মার্কোয়েজও ধ্রুপদী ও আধুনিক উপন্যাসের রীতিনীতিতে দক্ষ, তার পরিচয় ছড়িয়ে রয়েছে সমস্ত বইটিতে, তিনি তড়িঘড়ি করে লেখেন নি। তিনি বহুদর্শী। লাতিন আমেরিকার বিশেষ উপন্যাস লিখতে বসে তিনি আঞ্চলিকতা নিয়ে যেমন বাড়াবাড়ি করেছেন, তেমনি সর্বকালের বিশ্ব-ঔপন্যাসিকের একটি বড় নির্দেশও পালন করেছেন। মহাশক্তিধর বিবেকের অধিকারী মানুষও যে চিন্তায় চেতনায় আচরণে কত ভঙ্গুর হয়, সেটা মার্কোয়েজ জানেন এবং সেটা তিনি তাঁর উপন্যাসে জানিয়েছেনও। উপন্যাসের একটা বহু শতাব্দিব্যাপী ধারা এই যে মানুষ তথা নরনারী যেমন মহৎ হতে পারে, তেমনি ক্ষুদ্রও হতে পারে। ঔপন্যাসিকের শিল্পরীতি হচ্ছে এই বৈপরীত্যকে যথাযতভাবে, গুরুমশায়ের শাসনের চোখে নয় কৌতুকের দৃষ্টিতে দেখা এবং দেখানো। মার্কোয়েজ এ ব্যাপারে স্পেনের সার্ভেন্টিস, ফান্সের রাবেলা (Rabelais) কিংবা রুশিয়ার গোগোলের সমকক্ষতা দেখিয়েছেন বললে অত্যুক্তি হবে না। এই পূর্বসুরীদের মানবতা ও হৃদয়তার মধ্যে যে গভীর কৌতুকরস ছিল, মার্কোয়েজ তাকে আয়ত্ব করেছেন। কোন কোন ব্যাপারে নর-নারীর আচরণের চিত্রে তাঁর সঙ্গে 'লেডি চ্যাটার্জির প্রেমিক' উপন্যাসের লেখক ডি, এইচ লরেন্সের মিল পাওয়া যায়। সেটা বাইরের মিল। কারণ, লরেন্স কোনদিন কৌতুকের ধার ধারেন না।

মার্কোয়েজ ছোট গল্প ও উপন্যাসের তফাৎ বুঝাবার জন্য এদের যে সংজ্ঞা দিয়েছেন তাতেও এই কৌতুকের মেজাজটি প্রকাশ পেয়েছে। মার্কোয়েজ বলেছেন ছোট গল্প হচ্ছে প্রেম আর উপন্যাস হচ্ছে বিবাহ।

বিস্তারিতে না গিয়ে আমরা সিদ্ধান্ত টানতে পারি যে, মার্কোয়েজ তা উপন্যাসে বহিঃপ্রকৃতিকে খাটো করে অন্তঃপ্রকৃতিকে অস্বাভাবিকভাবে বাড়িয়ে মানবজীবনে ভূতুড়ে কাহিনির মতো কোন উপন্যাস লিখতে চেষ্টা করেন নি। তাঁর বই তালগোল পাকায়নি। তিনি মূলত ধ্রুপদী মহাকাব্যিক ঔপন্যাসিক। 'একশ বছরের নিঃসঙ্গতা' উপন্যাসের একাধিক রহস্যময় পুরুষ রহস্যময়ী নারী রয়েছে ঠিকই। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের ভাষায়, সবচেয়ে দুর্গম যে মানুষ, তার রহস্যের উদ্‌ঘাটন এখনও কে করতে পেরেছে। উপন্যাসের কাজই তো হচ্ছে এই রহস্যকে ভেদ করা। রহস্যময় মানুষের অবতারনা না করলে রহস্যভেদের প্রক্রিয়া কি করে এগিয়ে যাবে?

॥ ৫ ॥

এবার আমরা সর্বশেষ প্রশ্নটিতে যেতে পারি। প্রশ্নটি হচ্ছে, মার্কসীয় দৃষ্টিতে আমরা বইটিকে কিভাবে দেখবো এবং উপন্যাসের অলৌকিক উপাদানকে মার্কসীয় দৃষ্টিভঙ্গী কোন রীতিতে দেখে।

প্রথমে দ্বিতীয় অংশটি নিয়ে আলোচনা করা যায়। অর্থাৎ উপন্যাসে তথা মানুষের জীবনে অলৌকিক বা অতিপ্রাকৃত উপাদান সম্বন্ধে মার্কসবাদের বক্তব্য কি?

এ সম্বন্ধে সাধারণ ধারণা এক কথায় বলবো যে, মার্কসবাদ অলৌকিকতা বা অতিপ্রাকৃত শক্তিতে বিশ্বাস করে না। মার্কসীয় দর্শন হচ্ছে বস্তুবাদী। এর দৃষ্টিতে বস্তু বা প্রকৃতি হচ্ছে প্রাথমিক। বস্তু থেকে ভাবের জন্ম। ওপরে এবং এর আগে কোন আদ্যাশক্তি নেই, মানুষের জীবনের মৌল ভিত্তি ও নির্দেশক হচ্ছে প্রকৃতি ও লৌকিকতা। অবশ্য মার্কসবাদ যান্ত্রিক বস্তুবাদীয় নয়, দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদী। মানুষের জীবনে ভাবের পরিবর্তন-সাধক সক্রিয় ভূমিকা রয়েছে। তবে এর উৎসও লৌকিক। এর লক্ষ্যও লৌকিক।

এই ধারণা অনুসারে উপন্যাসে অলৌকিক ও অতিপ্রাকৃত উপাদানের ব্যবহারে বিধেয় হতে পারে না।

এইখানেই আমাদের আলোচনার ইতি টেনে দেয়া যেতো এবং মার্কোয়েজের বইটিকে বড় জোর মার্কসবাদ-বহির্ভূত একটি বামপন্থি চিন্তার ফসল হিসেবে মেনে নেয়া যেতো।

কিন্তু মার্কসীয় দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের কাণ্ড থেকে অনেক ডালপালা বেরিয়েছে এবং ফুলেফলে মঞ্জরি হয়ে চলেছে। রূপকের ভাষায় বলা যেতে পারে, একটি বৃক্ষ থেকে উৎসারিত ও প্রসারিত হয়ে বেরিয়ে আসছে একটি উদ্যান। বিশ্বব্যাপী মানবমুক্তির সংগ্রামে মার্কসবাদের প্রাকৃতিক ও লৌকিক বৈজ্ঞানিক সত্যতা বাস্তবে ফলিত হচ্ছে। উক্ত দর্শন হিসেবেই মার্কসবাদ এটা করতে সক্ষম হচ্ছে।

মার্কসবাদের স্রষ্টা কার্ল মার্কস ও এঙ্গেলস্ দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের উদ্ভাবনের সঙ্গে সঙ্গেই প্রসারমান ও বিচিত্র লোকজীবনে এর সারসূত্রের পাশাপাশি এর বৈচিত্র্যকেও উপস্থাপিত করেছিলেন।

মার্কসবাদের প্রবর্তকেরা তত্ত্বকে জীবন থেকেই উদ্ভূত ও জীবনের সহযোগী বলে মনে করতেন। মানবজীবনের রহস্যময়তা ও বৈচিত্র্যকে তাঁরা চূড়ান্ত মূল্য দিতেন। এই ব্যাপারে তাদের মন যে খোলা ছিল, তার একটা দৃষ্টান্ত দেয়া যেতে পারে এখানে।

দার্শনিক স্পিনোজা ছিলেন প্রকৃতিবাদী। প্রকৃতিই ঈশ্বর, ঈশ্বরই প্রকৃতি–এই ছিল তাঁর একটি বক্তব্য। অন্যদিকে দার্শনিক লাইবনিজ ছিলেন অতিপ্রাকৃত শক্তিতে বিশ্বাসী। প্রকৃতি ও ঈশ্বর ছিল তাঁর কাছে ভিন্ন। এদিক থেকে দেখলে স্পিনোজাই বাস্তববাদীদের নিকটতর ছিলেন। কিন্তু মার্কস একটা বিশেষ বিচারে লাইবনিজকে স্পিনোজার উপরে জায়গা দিয়েছিলেন। ব্যাপারটা তিনি কিছুটা কাব্যিকভাবে ব্যাখ্যা করেছিলেন। বলেছিলেন স্পিনোজার জগৎ একরঙা, লাইবনিজের জগৎ রামধনুর জগৎ।

আসল কথা এই যে, মার্কস জীবনের বৈচিত্র্যকে বড় করে দেখেছিলেন।

এই সঙ্গেই 'মিথ' বা পৌরাণিক কল্পনা সম্বন্ধে মার্কসের বক্তব্যকে বুঝে নেয়া যেতে পারে। আমাদের আলোচ্য বিষয়ে এই বক্তব্য তো একান্তভাবেই প্রাসঙ্গিক।

বিষয়টিকে বুঝবার জন্য অতি সরলীকরণ করে পটভূমিটাকে তুলে ধরা যেতে পারে।

মানবজাতির ইতিবৃত্ত শুরু হয়েছে আদিম যুগ থেকে। আরণ্যক জীবন, দেশে দেশান্তরে ভ্রাম্যমাণতা ও স্থিতি সভ্যতা–তিনটি পর্ব এই ইতিবৃত্তের। গ্রীকরা যখন স্থিতির সভ্যতায় প্রবেশ করেছে, তখনও পৌরাণিক কল্পনার জগৎ তাদের উপর ভর করেছে। এই পৌরাণিক কল্পনার দেবদেবীও অলৌকিকতা ও অতিপ্রাকৃত শক্তি গ্রীকদের কাব্যে ও নাটকে মানুষের জীবনের নির্দেশক হিসাবে কাজ করেছে। এদের বাদ দিলে সমগ্র গ্রীক শিল্পকলার ভিত্তি ধ্বসে যেতো।

মিথ বা পৌরাণিক অতিপ্রাকৃতিক শক্তির কল্পনা ও ধারণা এইভাবে গ্রিকজীবনের যে স্থিতি নিয়েছিল, তাকে মার্কসও মানুষের ইতিবৃত্তের অংশ হিসেবে মেনে নিয়েছিলেন। অবশ্যই তিনি গ্রিক নাটক ও কাব্য গভীর আগ্রহ নিয়ে পড়তেন এবং সেটা আদ্যোপান্তই পড়তেন।

তদানীন্তন জীবনে এই মিথের ব্যাপারটার একটা বাস্তবতা ছিল। এটাই হবে আমাদের সিদ্ধান্ত। মার্কস কিন্তু এখানেই থামেননি। তিনি বলেছেন, আজও এই মিথে পরিপূর্ণ নাটক ও কাব্য আমাদের টানে। ব্যাপারটা কি? এই আকর্ষণের কারণ হিসেবে মার্কস 'গ্রুণ্ডড্রিসো' গ্রন্থে যে বক্তব্য বলেছেন তার একটি অংশ হচ্ছে নিম্নরূপ: "আদিম বা পৌরাণিক যুগের শিল্পকলা, সংগীত ও কাব্য যত উচুতেই উঠুক না কেন, তারা অনগ্রসর অর্থনৈতিক ব্যবস্থারই ফসল। তবু এরা মানবসমাজের শৈশবের ফসল। এই কারণে উত্তরকালে অর্থনৈতিক ব্যবস্থা যতই উন্নত হয়ে থাক না কেন, পূর্বতনের একটা বড় আকর্ষণ ও মূল্য থেকে যাচ্ছে। কারণ মানুষের কাছে তার শৈশবের সবকিছুর একটা আলাদা কদর থাকে।"

উপরের কথাটা বলা বাহুল্য, হুবহু মার্কসের বক্তব্যের আক্ষরিক অনুবাদ নয়। এটি তর্জমা।

এ কথাটার অর্থ দাঁড়ালো, শুধু আজ নয়, আগামীকালেও মানুষ তার শৈশবের আজগুবি ধারণাগুলোকে মানসপট থেকে নির্মমভাবে ছেঁটে তো ফেলবে না, বরং ধরেও রাখবে, হয়তো মায়ার ভরে। কিন্তু ধরে রাখবে।

আরও একটা সিদ্ধান্ত আমরা মার্কসের পৌরাণিক প্রভাবিত সাহিত্য শিল্পকলা সম্পর্কিত বক্তব্য থেকে টানতে পারি। সাহিত্যে শিল্পকলার অতিপ্রাকৃত বা অলৌকিকতা থাকলে মার্কসীয় দৃষ্টিতে এর জাত যায় না। এ কথা সত্য যে, মার্কসীয় দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদী দর্শন পুরাণের মধ্যেও এবং পুরাণ-প্রভাবিত সাহিত্যে শিল্পকলায় তো বটেই মানুষের লৌকিক ও প্রাকৃতিক সম্পর্ক ও জীবনধারার সূত্রের অনুসন্ধান করে। এখানে মার্কসীয় দর্শন মানুষের মুক্তিসংগ্রামকে প্রধানত দেখতে পায়। মার্কসবাদ মানুষেরই সন্ধান করে দেবদেবী অধ্যুষিত স্বর্গেও। কিন্তু মার্কসবাদ যদি অলৌকিকতা কিংবা অতিপ্রাকৃত সম্বন্ধে শুচিবায়ুগ্রস্ত হতো, তাহলে নিশ্চয় পুরাণের মধ্যে তার পক্ষে মানুষের সন্ধান করা সম্ভব হবে না।

দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদী মার্কসীয় দৃষ্টিভঙ্গির এদিকটাকে দুজন মার্কসবাদী লেখকের লেখায় গভীর অনুসন্ধিৎসা নিয়ে তুলে ধরা হয়েছে। এঁদের একজন ক্রিস্টোফার কডওয়েল। তাঁর বইটির নাম 'মায়া ও বাস্তবতা' (Illusions and Reality) আরেকজন অধ্যাপক ডি. ডি. কোসাম্বী। তাঁর বইটির নাম 'পুরাণ ও বাস্তবতা' (Myth and Reality)।

কডওয়েল তাঁর গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়ে পুরাণের অবসানের কথা বলতে গিয়ে গ্রিককাব্যে তার টানাপোড়নের মমতাময় ছবি এঁকেছেন। অধ্যাপক কোসাম্বী তাঁর গ্রন্থের সমস্ত অধ্যায়ে ভগবদগীতা, উর্বশী প্রভৃতির মধ্যে মানুষের লৌকিক বস্তুগত জীবনধারার প্রক্রিয়াটিকে অনুসন্ধান করে দেখেছেন। কডওয়েলের মার্কসবাদী দৃষ্টিভঙ্গি বিশ্ববিদিত। অধ্যাপক কোসাম্বী তাঁর গ্রন্থে বলেছেন, মার্কসই তাঁকে পুরাণ ও বাস্তবতার পথের সন্ধান সবচেয়ে বেশি করে দিয়েছেন।

পুরাণের অলৌকিকতা ও অতিপ্রাকৃতের মধ্যে ম্যাক্সিম গোর্কি মেহনতী মানুষের অভিযাত্রার সন্ধান পেয়েছেন। তিনি একটি নিবন্ধে বলেছেন, সাম্য হচ্ছে সমস্ত সংস্কৃতির উৎস। এই নিবন্ধেই তিনি বলেছেন, গ্রিক পুরাণের হারকিউলিস হচ্ছে মেহনতী মানুষের আদর্শ বীর। আদিম মেহনতী মানুষের শ্রম চেতনার অতিপ্রাকৃত শক্তির কল্পনা থেকেই হারকিউলিস চরিত্রের সৃষ্টি।

মার্কসীয় দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদী দর্শন এইভাবে দেখিয়েছে যে, অলৌকিকতা ও দেবদেবী এবং অন্যান্য অতিপ্রাকৃত ঘটনা আদিম ও অনগ্রসর অর্থনৈতিক ব্যবস্থার যুগের মানুষের ইচ্ছা ও কামনার কল্পনার সৃষ্টি। অগ্রসরকালে অনগ্রসর অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় যখন মানুষ প্রকৃতির উপর আধিপত্য শুরু করেছে, যখন তারা বজ্রের চেয়েও শক্তিশালী বিদ্যুৎ-ভাণ্ডার তৈরি করছে, যখন তারা মহাকাশে যাত্রা করছে, তখন অলৌকিকতা ও অতিপ্রাকৃত শক্তির স্তবস্তুতি সম্বন্ধে সংস্কার পোষণ তারা করতে পারে না। পৃথিবীর চূড়ান্ত বিচ্ছিন্ন ও অনগ্রসর এলাকার মানুষেরও আজ অন্তত পক্ষে শুনতে বা জানতে বাকি নেই যে, আদিম দেবদেবীদের চেয়ে মানুষ বেশি শক্তিশালী। তবু একথাও কি সত্য নয় যে অনগ্রসর দেশ ও এলাকাসমূহের লৌকিক সমাজ ও মানসিক কাঠামোর অচলায়তন এখনও ভেঙ্গেও ভাঙ্গছে না। এরমধ্যেই একটা স্বকীয়তারও উপাদান পাওয়া যাচ্ছে। এটা বিপ্লববাদ। তাছাড়া যেসব দেশ ধনতান্ত্রিক অগ্রসর অর্থনৈতিক ব্যবস্থার শীর্ষে রয়েছে, তাদেরও শাসক ও শোষকচক্রগুলি ধনতান্ত্রিক সাম্রাজ্যবাদী অচলায়তনকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য আদিম সংস্কারকে নিজেদের উন্নত দেশেও প্রশ্রয় দিচ্ছে। এই জন্যই অলৌকিকতা ও অতিপ্রাকৃত শক্তির ব্যাপারটা নানাদিক দিয়ে আজও বাস্তব। মার্কসবাদ এই বাস্তবতার মোকাবিলা করতে বাধ্য। একে পাশ কাটিয়ে যাবার উপায় নেই।

উপরিউক্ত পটভূমি ও দৃষ্টিভঙ্গীকে সামনে রেখেই মার্কসবাদীরা অন্যান্য বামপন্থি ও স্বাধীনতাকামীদের সঙ্গে সঙ্গে মার্কোয়েজের উপন্যাসটির মধ্যে লাতিন আমেরিকার দেশ দেশান্তরের মুক্তিসংগ্রামের ও বিপ্লবের অসমাপ্তির জন্য যে ক্ষোভ ও যন্ত্রণা রয়েছে, তাকে মর্মবস্তু করে 'একশ বছরের নিঃসঙ্গতা'কে উপন্যাসের শিল্পরূপের প্রাণবন্ত ধারার বাহক হিসেবেই নির্দিষ্ট করবে।

লাতিন আমেরিকায় একদিক দিয়ে বিবেচনা করলে বিশ শতকে দ্বিতীয় মহাজাগরণের পালা চলেছে। উনিশ শতকে সাইমন বলিভার থেকে শুরু করে জোসে মার্তি পর্যন্ত যেসব মুক্তিযোদ্ধার সাধনা শত শত বছরের সামাজিক অচলায়তনের হেরফেরে কবরস্থ হয়েছিল, তার পুনরুত্থান ঘটেছে। কিন্তু আবার যেন শুধু সাফল্যেরমগুলি না আসে সে জন্য এবং এখনও যে কারণে মাঝে মাঝেই অপহৃত ঘটছে সেটা বুঝে নেয়া দরকার সেজন্যেও লাতিন আমেরিকার মানুষ আজ বাস্তবতার গভীরে যেতে চাইছে। উপন্যাস যত গভীরে যেতে পারে, ইতিহাস কিংবা অন্য কোন খতিয়ান ততটা পারে না। মার্কোয়েজের উপন্যাসটিতে সেই অঙ্গিকার রয়েছে। এই কারণে ধবংস ও বিপর্যয় দিয়ে শেষ হলেও বইটি পুনরুত্থানকেই প্রতিফলিত করেছে।

কখনো চম্পা কখনো অতসী

প্র থ ম প র্ব

অনুলিখন : সঙ্গীতা বসু মজুমদার

একটু নাটকীয়ভাবেই শুরু করতে চাই। তাহলে বলতে হবে, যে উনিশ শতককে পেছনে ফেলে এসেছি আমার জন্মদিবসে, উনিশশো বার সালের পনেরো-ই জানুয়ারি–তার ধারাটা ফেলে আসা শতাব্দিকে অতিক্রম করে বেশ কয়েকটা বড় দাগে। যেমন, উনিশ শতক ছিল আমাদের উপমহাদেশকে ব্রিটিশ শাসন ও শোষণের মধ্যে টেনে নেয়ার সর্বব্যাপী প্রয়াস, আর বিশ শতকটা হলো ব্রিটিশ শাসন ও শোষণের শৃঙ্খল থেকে বেরিয়ে আসার ঘটনা পরম্পরা। অর্থাৎ, আমরা একদিকে যেমন উনিশ শতকের শেষে শুরু করি ব্রিটিশ শাসনের মধ্যে চলে যাওয়ার চূড়ান্ত পর্ব তেমনি শুরু করি ব্রিটিশ শাসন থেকে বেরিয়ে আসার প্রথম পর্ব।

শৈশবে প্রথম চার বছর আমার কেটেছিল রাঁচির এ.জি. অফিসের কর্মীদের থাকবার সরকারি আবাসে। খুব ধোঁয়াটে ধরনে মনে পড়ে এই চার বছরের শেষের দিকের কিছু কথা। ডিব্রুগড়ে মাতুলালয়ে জন্মগ্রহণের মাস দুই পরেই মায়ের কোলে-পিঠে চড়া অবস্থায় চলে এসেছিলাম বাবার কর্মস্থল রাঁচিতে ডুরাণ্ডার সরকারি কোয়ার্টারে। শৈশবের এই আবাসের নাম ছিল '64 quarters'। ব্যারাকের মতো করে সারি সারি চৌষট্টিটা বাড়ি ছিল এই আবাসনে, এই জন্যেই নাম ছিল '64 quarters'। মা, আমার পাঁচ বছরের বড় দিদি প্রতিভা (ডলি), ছোট বোন শেফালী (খুকি), বাড়ির কাজের লোক, যার কাজ ছিল বাসন মাজা এবং ছোট ভাই ছুটু (অজিত), প্রতিবেশী এক জবরদস্ত হাঁকডাক করা বছর তিরিশেক বয়সের অমৃত বাবু– এরাই ছিল তখন আমার চেনা মানুষ। অর্থাৎ বুঝতে পারা যায়, সেই সময়টা ছিল প্রশান্ত। রোমাঞ্চকর কোন ঘটনার ছায়া পড়ে নি আমার সেই শৈশবে। ধু-ধু করে এখন চোখে ভাসে '64 quarters'-এর পাশে উঁচু পদের কর্মচারীদের জন্য মানে সাহেবদের জন্য তৈরি একটা বাংলো থেকে মালির চোখ ধুলো দিয়ে ফুল ছিঁড়ে নিয়ে আসার ছবি। মেম সাহেবরা ছিল তখন আমাদের কাছে ভীতিপ্রদ।

এই যখন অবস্থা তখন প্রথম বিশ্বযুদ্ধ লাগল। বাবা পুণায় বদলি হলেন মিলিটারি এ্যাকাউন্ট্সে। আমি, মা, শেফালি আর ছুটু পুরুলিয়ায় জেঠামশাই শ্রীনিবারণ চন্দ্র দাশগুপ্তর বাসায় গিয়ে উঠলাম। জেঠামশাই ছিলেন তখন পুরুলিয়া জেলা স্কুলের হেড মাস্টার। ওখানে যাওয়ার পরেই সংসারের রান্নাবান্না ও ঘরোয়া কাজের সমস্ত দায়িত্ব নিতে হলো মাকে। জেঠাইমা তার দু'এক বছর আগে গত হয়েছিলেন। জেঠামশাইয়ের বড় ছেলে বিভূতিদা এবং বড় মেয়ে মালতীদি পুরুলিয়ায় ছিলেন। জেঠতুতো ভাই চিত্ত ও জেঠতুতো বোন অন্নপূর্ণা আর বাসন্তী (বাসু) থাকতো মাতুলালয়ে। এই জেঠতুতো ভাইবোনেরা

মামাবাড়িতে থাকার দরুন মাতুলালয়ের চিন্তা-ভাবনায় লালিতপালিত হয়েছিল। পুরুলিয়ার এই সময়কার জীবন ধারাটাতে আমরা ভাইবোনেরা সবাই হেড মাস্টারের বাড়ির উপযোগী চিন্তাভাবনায় প্রভাবিত ছিলাম। জেঠামশাই ছিলেন অত্যন্ত কর্মমুখী। এত বড় একটা স্কুলের শিক্ষার দায়দায়িত্বে গভীরভাবে আটক। আমাদের বাসস্থান তথা হেডমাস্টারের কোয়ার্টার ছিল সবরকম হৈচৈ থেকে দূরে। বিভূতিদা, কখনো কোনো স্কুলে ভর্তি হয়েছিলেন কি না বলতে পারব না, তখন প্রাইভেট পরীক্ষার্থী। তখনকার আমলে কিছুটা পৃথক ধরনের ছিল তার বই খাতা নিয়ে শিক্ষার ধারা। জেঠামশাই কোনোদিন বিভূতিদাকে ডেকে পড়াশোনার তাগিদ দিয়েছিলেন বলে মনে পড়ে না। পুরুলিয়ার বাড়ির কোনোরকম চলাফেরাতেও এরকম জবরদস্ত শিক্ষকের কোনো হস্তক্ষেপ ছিল না। সুতরাং হেডমাস্টারের বাড়ির ভেতরে বিভূতিদা ছিলেন পরিচালক, মা ছিলেন রন্ধন ও পরিবেশনার কর্ত্রী আর গুরুপদ বলে একটি পরিচারক ছিল সমস্ত ঘরোয়া কাজকর্মের ইঞ্জিন। এই সাংসারিক দিকটা সম্বন্ধে পরে দু'চার কথা আসবে।

আমাকে ভর্তি করে দেয়া হয়েছিল পুরুলিয়া শহরের একটি পাঠশালায়। পাঠশালার নাম ছিল রামপদ পণ্ডিতের পাঠশালা। হেড মাস্টারের বাড়ির সঙ্গে তার শিক্ষার দিক দিয়ে কোনরকম সঙ্গতিই ছিল না। কিভাবে যে এই পাঠশালার ছাত্র হিসাবে তিন বছর কাটিয়ে দিলাম সেটা মনে পড়লে বিস্ময় জাগে। তবে এখানে একটা কথা বলে রাখা দরকার, পাঠশালা সেই সময়ে একটা বিশেষ পাঠ ব্যবস্থার ভিত্তি গড়ে তুলেছিল দু'শ একশ' বছরে। বিভূতিদা মাঝে মাঝে হস্তক্ষেপ করতেন আমার পাঠশালা যাওয়া-আসায়, হঠাৎ যদি কোনো কিছু আপত্তিকর ঘটনা ঘটত। অর্থাৎ, বলতে গেলে একটা মুক্ত ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে পড়াশোনার জগতে প্রবেশ করেছি।

এখানেই বলা দরকার, বাবা, জেঠামশাই শ্রীনিবারণচন্দ্র দাশগুপ্ত এবং আরেক জেঠামশাই শ্রীঅক্ষয় দাশগুপ্তর মধ্যে তৃতীয়জনের কথা। এই জেঠামশাইকে দেখিনি। তিনি আমাদের বিক্রমপুরের বাসগ্রাম গাউপাড়ার থেকে বাইরে আসেন নি। আমাদের এই সূত্রে দুই ভাই ও এক বোন। শরদিন্দু, বিমলেন্দু ও লীলা। জেঠামশাইয়ের মৃত্যুর পরে জেঠিমা ছিলেন এই তিনজনের কর্ণধার। বড়দা শরদিন্দু আমাদের এই সময়ের পুরুলিয়ার জীবনে কদাচ উপস্থিত ছিলেন। পরবর্তীকালেও এই শরদিন্দু দাশগুপ্ত বিশের দশকের প্রথমার্ধে কোলিয়ারিতে টাইপিস্টের কাজ করে স্বতন্ত্র জীবনযাপন করতেন। আমাদের অন্য ভাই বিমলেন্দু পুরুলিয়ার বাসাতেই থাকতেন বিভূতিদার যমজ ছোট ভাইয়ের মতো। তিনি মাঝে মাঝে স্কুলে পড়তেন আবার ছেড়ে দিতেন। ইনুদা ছিলেন খেয়ালি স্বতন্ত্র স্বাধীন জীবনের ধারকবাহক। জেঠামশাই যখন উনিশশো একুশ সালে মহাত্মা গান্ধীর ডাকে সাড়া দিয়ে Non Co-operation (অসহযোগ)-এর পথ বেছে নিয়ে হেড মাস্টারের চাকুরি এবং কোয়ার্টার ছেড়ে পুরুলিয়ার উকিল অতুলচন্দ্র ঘোষের সঙ্গে স্বাধীনতা সংগ্রামীর জীবন বেছে নিলেন এবং দু'জনে মিলে নিজেদের ও পরিবারের এবং অসহযোগ আন্দোলনে যোগদানকারী কিছু কর্মীর বাসস্থান স্থাপন করলেন 'শিল্পাশ্রম' নাম দিয়ে, তখন ইনুদা, সমবয়সী বিভূতিদা ও এক মাদ্রাজি বাংলাভাষী তরুণ বীররাঘব আচারিয়া এ আশ্রমের কর্মীদলের পুরোভাগে রইলেন। যুদ্ধ থেমে যাওয়ার পর ১৯১৯ সালের শেষে বাবা পুণা থেকে ফিরে রাঁচির অ.এ-তে এলে আমরা সরকারি আবাসনে ফিরে এলাম। তবে আগের

বাসায় নয়। নতুন আবাস হলো ডুরান্ডার একটা কোয়ার্টারে। গুর্খা ক্যান্টনমেন্টের পাশে ক্যান্টনমেন্টের বিশাল মাঠের ধারে বাসা।

রাঁচির জীবনের কথা বলার আগে পুরুলিয়ায় যে দিনগুলি মা, দিদি, খুকি আর ছুটুর সঙ্গে জেঠামশায়ের বিরাট কম্পাউন্ড ঘেরা বাংলোতে প্রায় চার বছর অতিবাহিত করেছি তার একটা আভাস মাত্র দিয়েছি। এই পুরুলিয়ায় থাকার সময়ের আরো কিছু কথা বলা দরকার। রামপদ পণ্ডিতের পাঠশালার কথাও কিছুটা বলবো। রামপদ পণ্ডিত খানিকটা দূরেই জমজমাট হাই স্কুলের পাঠক্রমের ও শিক্ষা ব্যবস্থার ধার ধারতেন না। এখানে কী পড়ি এবং কিভাবে পড়ি জেঠামশাই সে বিষয়ে কোনোদিন কোনো কথা জিজ্ঞেস করেন নি। বিভূতিদা মাঝে মাঝে খোঁচাতেন; কিন্তু সেটাও আমি যাতে হেড মাস্টারের বাগানের ফুল-ফুলুরি বাড়াবাড়ি রকমে পণ্ডিত মশাইকে ভেট দিতে না পারি সেই জন্যে। নিয়মিত স্কুল পাঠক্রম নিয়ে এগোচ্ছি কি না সেটা নিয়ে কোনো চাপাচাপি করেন নি। এটাই একটা আশ্চর্যের ব্যাপার ছিল যে হেড মাস্টারের বাড়িতেই লেখাপড়া নিয়ে কোনো ধমকধামক শোনা যায়নি। ইনুদা নিয়মিতভাবে স্কুলে ভর্তি হয়েছিলেন। বিভূতিদা তৈরি হচ্ছিলেন প্রাইভেটে ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিতে। বড় দুই বোন প্রতিভা ও মালতি বইপত্র নিয়ে বসতেন, তবে পড়াশোনাটা বাংলা উপন্যাসের শুরুর থেকে শেষের চর্চা। জেঠতুতো আর দুই বোন অন্নপূর্ণা ও বাসন্তী আর ভাই চিত্ত এই কারণে মামা বাড়িতে বকা খেতো। মামাবাড়ির লোকদের অসন্তোষ প্রকাশ পেত জেঠামশাইয়ের বিরুদ্ধে। আমার জেঠতুতো ভাইবোনদের মামাবাড়িতে অবস্থান কখনো বন্ধ হয় নি। পুরুলিয়ায় থাকাকালে পরে আমাদের কী গতি হবে তা নিয়ে কোনো ভাবনাচিন্তা ছিল না। আমি অন্তত পুরুলিয়ায় থাকার সময় কখনো অন্দরমহলে কী চলছে না চলছে তা নিয়ে অভিভাবক বাড়িটাকে রাগারাগি করে থমথমে করে তুলছেন এমনটা দেখি নি। সুতরাং জেঠামশাই যখন হেড মাস্টারের চাকুরি ছেড়ে দিয়ে অসহযোগের অংশীদার উকিল অতুলচন্দ্র ঘোষের সঙ্গে ডেরা বাঁধলেন তখন একটা জাতীয়তাবাদী স্কুল দেশ জুড়ে স্থাপন করার যে চিন্তাভাবনা চলেছে সেটা আশ্রমে সেভাবে কার্যকর হয় নি।

রাঁচিতে যখন ১৯২০ সালে ফিরে এলাম, তখন বয়স দশ বছর হতে চলেছে অথচ কোনো স্কুলে নাম লেখাই নি। তা নিয়ে আশপাশ থেকে অনেক প্রশ্নবাণ ছোঁড়া হতো। ১৯২৩ সাল পর্যন্ত প্রথম তিন বছরে পাঠশালায় যা পড়েছিলাম, তাই সম্বল করে কিছু কিছু বাংলা উপন্যাস পড়া শুরু করি। বস্তুতপক্ষে বাবা অফিসে বেরিয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই আমি চড়ায়বড়ায় ঘুরে বেড়াতাম। রাঁচির আশেপাশের বিভিন্ন পাহাড়ি নদীর উৎস সন্ধানের জন্য প্রায় বলতে গেলে একটা পাঠক্রমই তৈরি করে ফেললাম। একটা হাফপ্যান্ট পরা ছেলে আমাদের ডুরান্ডার বাসা থেকে কখন বেরিয়ে যায় তা নিয়ে কোনো প্রশ্ন কেউ কখনো বাবাকেও করে নি, মাকেও করে নি। বাবা রাঁচিতে পা দিয়েই যুদ্ধের আগেকার বন্ধ হয়ে যাওয়া ফুটবল প্রতিযোগিতার পুনঃপ্রবর্তন করেন এবং ডুরান্ডার বিশাল ক্যান্টনমেন্টের মাঠে এই প্রতিযোগিতার আয়োজন শুরু করে দেন। এই ব্যাপারটা বর্ষার চার মাস রাঁচিকে কিছুটা তোলপাড় করত। তাই প্রত্যেক বছরই নতুন করে কমিটি হতো, অদলবদল হতো পরিচালকদের মধ্যে আর বাবা বরাবরই টুর্নামেন্ট কমিটির সম্পাদক থাকতেন। আমি ছিলাম বাবার পিওন।

এই সময়টাতেই আমাদের কোয়ার্টারের ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার্থীর রণেন মজুমদারের চোখ পড়ল আমার ওপর। রণেনদা হঠাৎ আমাকে একটা খেলার মাঠে জিগ্যেস করলেন, 'তুই স্কুলে পড়িস না? এত বড় হয়ে গেছিস! আশ্চর্য!' তারপর বলা নেই কওয়া নেই আমাকে রাঁচি জেলা স্কুলের ইংরেজ হেড মাস্টার মি. মার্টিনের সামনে হাজির করে বললেন, 'এর একটা গতি করুন'। মার্টিন সাহেব আমার দিকে তাকিয়ে আমার কথা চিন্তা করে রণেনদাকে বললেন, 'এ তো কিছুই জানে না স্কুলে পড়তে গেলে কী করতে হয়, একে কোন ক্লাসে দেবো? ক্লাস টিউটর তো আপত্তি করবেন! যাই হোক, জোরাজুরি করতে হবে এর ব্যাপারে। সতেরো বছর বয়সেও অন্তত যাতে ম্যাট্রিক দিতে পারে সেটা ভেবে আমরা ওকে ক্লাস সিক্সে নেবো।' এবং এই হেড মাস্টার নিজে আমাকে নিয়ে গিয়ে ক্লাস টিচারের হাতে দিয়ে বললেন, 'চালিয়ে নিন'। ক্লাস টিউটর হেড মাস্টারের কথা তো আর ফেলতে পারেন না, গাঁইগুঁই করে আমাকে ভর্তি করে নিলেন। যতগুলো বিষয় পাঠক্রম অনুযায়ী পড়তে হয় সেগুলি কিনে নিতে বললেন। আর বললেন, 'তোমাকে দু'সপ্তাহ সময় দেয়া হলো তোমার ক্লাসের অন্য ছেলেমেয়েরা যা পড়ছে তা বুঝে নিতে।' আমি তো এতগুলো বই একসাথে কিনলাম ইতিহাস, ভূগোল, বিজ্ঞান বিষয়ে এবং এটাই একটা বিস্ময়ের বিষয় যে, যে পর্যন্ত ক্লাসের পড়াটা হয়ে গিয়েছিল বিভিন্ন বিষয়ে, আমি সেটা ধরে নিতে পারলাম। আমার সহপাঠীদের বুঝতে দিই নি যে, আমি একজন নবিস। প্রথম টার্মিনালেই আমি তৃতীয় হলাম। এই প্রথম চার মাস আমি আমার ভবঘুরে জীবনের দিকে ফিরে তাকাই নি। এবার টার্মিনাল পরীক্ষার পরে সেই ভবঘুরে জীবনে ফিরে যাওয়ার চেষ্টা চালালাম। কিন্তু তা কেটে গিয়েছিল মনে হয়। জেলা স্কুলের দালানটা ক্রমেই আমাকে গ্রাস করে ফেলল। তবে যারা প্রথম দ্বিতীয় হতো তাদের সঙ্গে আমার ছাত্রজীবনে একটা ফাঁক থেকে গেল।

১৯২৩ সালে আমার শিক্ষাজীবন শুরু হওয়ার পরের একটা ঘটনা উল্লেখযোগ্য। তখন প্রবাসী জীবনে আত্মীয়স্বজনের উপস্থিতি ও পরামর্শ বড় মাত্রায় কাজ করত এবং আত্মীয়স্বজনের থাকা-খাওয়া নিয়ে সমস্যার প্রতিকার হতো। ১৯২৫ সালে আমাদের ইতোপূর্বেই ব্রাহ্ম হয়ে আলাদা হয়ে যাওয়া একটা অংশের সঙ্গে সংযোগ ঘটল। আমাদের ঠাকুর্দারা ছিলেন তিন ভাই। এক ভাই ব্রাহ্ম হয়ে গিয়েছিলেন। তিনি বরিশাল গিয়ে বাড়ি করেছিলেন। এই ঠাকুরদা করুণাচরণ সর্বানন্দ নাম নিয়েছিলেন। তাঁর ছেলেরা বরিশালের বাড়িটার নাম রেখেছিলেন 'সর্বানন্দ ভবন'। এই ঠাকুরদার ছেলেরা সবাই সরকারি উচ্চপদস্থ কর্মচারী হয়েছিলেন–দু'জন বাদে। এঁদের মধ্যে একজন সত্যানন্দ দাশ শিক্ষাক্ষেত্রে যথেষ্ট নাম করেছিলেন। তিনি একটা স্কুলের হেড মাস্টার ছিলেন। তাঁর দুই ছেলে– জীবনান্দ ও অশোকানন্দ। ১৯২৫ সাল নাগাদ এই সত্যানন্দ জেঠামশাই বাবাকে লিখলেন, অশোকানন্দ এম.এসসি. পাশ করেছে কিন্তু কোথাও চাকুরি পাচ্ছে না, এর চাকুরির ব্যবস্থা করতে হবে। এ প্রস্তাব বাবা খুব আনন্দের সঙ্গে গ্রহণ করেন এবং এ.জি. অফিসে চাকুরি নিয়ে অশোকদা রাঁচিতে আসেন ও আমাদের বাসায় ওঠেন। অশোকদা ১৯২৬-২৮ এই তিন বছর আমাদের রাঁচির বাসায় ছিলেন, পরে একটা বড় চাকুরি পেয়ে চলে যান। তিনি খুব মিশুক ছিলেন। আমাকে পড়ানোর দায়িত্বটা তাঁর ওপরেই পড়ল। কিন্তু স্কুল পাঠ্য নিয়ে তিনি খুব একটা মাথা ঘামাতেন না, আমিও ঘামাতাম না। তাঁর কাছেই শুরু হয় আমার বিশ্বসাহিত্য পাঠের হাতেখড়ি। তিনি খুব বই পড়ুয়া ছিলেন।

ডুরান্ডার লাইব্রেরিটাকে তিনি জমিয়ে তুললেন। তখন বেশ জাঁক করে সাহিত্যের নোবেল প্রাইজ ঘোষণা করা হতো। ডুরান্ডা লাইব্রেরিতে সেসব বই কেনা হতো। সুতরাং নাইন-টেন-ইলেভেন-এ আমি বিশ্ব সাহিত্য সম্পর্কে একটা মোটামুটি জ্ঞান অর্জন করলাম। সব বই ইংরেজিতেই পড়তে হতো। অশোকদা খুব স্বল্পভাষী ছিলেন। তিনি প্রথম আমাদের বাসায় সেকালে মাখন টোস্ট চালু করেছিলেন। আমি যেবার মেট্রিক পাশ করি অশোকদা সেবছরই চাকুরি নিয়ে পূণায় চলে যান। তাঁর প্রসঙ্গ পরে এক জায়গায় আসবে। অশোকদা পরবর্তীকালে বেথুন কলেজের প্রিন্সিপ্যাল নলিনি চক্রবর্তীকে বিবাহ করেন। তিনি ছিলেন সত্যজিত রায়ের পরিবারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ। *'সন্দেশ'* পত্রিকা মাঝখানে বন্ধ হয়ে গিয়েছিল সুকুমার রায়ের মৃত্যুর পরে। পরবর্তীকালে সন্দেশ পুনঃপ্রকাশিত হয় সত্যজিত রায়ের উদ্যোগে। নলিনি দাশ তাঁর পারিবারিক সূত্রেই *'সন্দেশ'* পত্রিকার পরিচালন ভার নেন। চাকুরি থেকে অবসর গ্রহণের পর অশোকদারও একটা বড় কাজ হয়ে দাঁড়ায় *'সন্দেশ'* পরিচালনা। অশোকদার সঙ্গে যখন আমার দেখা হয়, তখন কাব্য ও সাহিত্যের রস আহরণের দিকেই তিনি ঝুঁকেছিলেন বেশি। প্রধানত পাঠক হিসেবেই এই আহরণের কাজ তিনি করেছেন। তিনি একদিন, খুব সম্ভবত ১৯২৮ সালে, বরিশাল থেকে রাঁচি ফিরে আমার হাতে তুলে দিয়েছিলেন একটি বই। এই বইটি ছিল সদ্য প্রকাশিত জীবনানন্দ দাশের প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'ঝরা পালক'। তখন বাংলা কাব্যের আধুনিক পর্বে বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুলের 'অগ্নিবীণা' প্রচণ্ড ঝড় তুলেছে, নজরুলকে উৎসর্গীকৃত রবীন্দ্রনাথের 'রক্তকরবী' এক নতুন লোকায়ত রবীন্দ্রনাথকে সামনে নিয়ে এসেছে, তাঁর 'মহুয়া' কাব্য অতি আধুনিক বাংলা কাব্যের মুক্তধারাকে প্রভাবিত করেছে, কল্লোল যুগের কবিরা আধুনিক বাংলা কাব্যের বৈপ্লবিক উত্তরণ ঘটিয়েছে– এই মুহূর্তে জীবনান্দ দাশের *'ঝরা পালক'* কাব্যগ্রন্থের স্বতন্ত্র সুর সমগ্র আধুনিক ধারাতে পরম আত্মীয়ের ইশারা বয়ে নিয়ে এসেছিল। তবে নজরুলের আবির্ভাব যেমনভাবে শব্দ-পদের ব্যবহারে একটা প্রলয়কাণ্ড ঘটিয়েছিল, ১৯২১-২২ সালে অসহযোগ ও খিলাফত আন্দোলন ব্যাপক কাব্যিক উচ্ছ্বাসে পালাবদল ঘটিয়েছিল– জীবনানন্দের *'ঝরা পালক'* তার পাশাপাশি ধ্রুপদী ধারারই প্রকাশ ছিল বলেই বোধ হয় তেমন ব্যাপকভাবে সাড়া জাগাতে পারে নি। একমাত্র ঢাকা প্রগতি গ্রুপ, বুদ্ধিজীবী গ্রুপ, বুদ্ধদেব বসু-অজিত দত্ত প্রমুখ কবি জীবনানন্দকে নিয়ে একটা তোলপাড় তুলেছিলেন। আমিও সে সময় তাঁকে নিয়ে একটা বড় রকমের কাব্যধারাকে ভবিষ্যতের উত্থানের কোঠায় রেখে দিয়েছিলাম। জীবনানন্দ দাশ এর পরে পাঁচের দশকে তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত সাধারণভাবে একটা অন্যতম আধুনিক ধারারূপেই গবেষণার আওতায় থেকে যান। বরং ইতোমধ্যে তাঁর যে ব্যক্তিগত দিকটা পরবর্তীকালেও বিশেষভাবে আলোচিত হয় নি সে সম্বন্ধে আমি ব্যক্তিগতভাবে ভাবনাচিন্তা করেছি। সুতরাং বিশের দশকের জীবনের খোঁজ-খবরের মধ্যে তাঁকে আর আনছি না। উনিশ থেকে বিশে উত্তরণ ও বিশের দশকের বিস্তারিতে যাওয়ার আগে যা চেয়েছি, যা পেয়েছি তার কথাই প্রথমে বলে নিই।

আমার মায়ের কথা কিছু বলি এখানে। তখনো ডুরান্ডার বাসায় অশোকদার আবির্ভাব ঘটেনি, রান্নাঘরেই বসতো আমাদের সাহিত্যের আড্ডা। তখন পর্যন্ত প্রকাশিত বাংলা উপন্যাসের কোনটিই তাঁর পড়ায় বাদ ছিল না। তবে মায়ের বিশেষত্ব

ছিল এই যে, নিজে থেকে কোনোদিন কোনো উপন্যাসের কথা পাড়তেন না। প্রসঙ্গক্রমে কিংবা সেই সময়ের কোনো ঘটনার কথা উঠলে মা বুঝিয়ে দিতেন, ওপর থেকেভাববাদী বলে মনে হলেও উপন্যাস ও কাহিনি আমাদের জীবনধারার সমস্ত উপকরণের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে। রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসগুলো মা মুখে মুখে বলতে পারতেন। তখন তাঁর বয়স কতোই বা ছিল, বিয়ে হয়েছিল ১২ বছর বয়সে। পরবর্তীকালে আশ্চর্য হয়ে ভেবেছি, আমার সাহিত্যের প্রতি অনুরাগের মা-ই ছিলেন উদ্‌গাতা। জীবনের অনেক বিষয়ের মূলে কতো ছোটোখাটো প্রস্তুতি থাকে মায়ের কথা মনে পড়লে তা হৃদয়ঙ্গম করি। বাংলা উপন্যাস নিয়ে পরবর্তীকালে বিশিষ্ট মনীষীদের বিশেষ আলোচনা অবলম্বন করে আধুনিক ইউরোপিয় ধারায় মার্কসীয় চিন্তাভাবনার গুরুগম্ভীর কথাবার্তার ফাঁকে ফাঁকে কোনো কোনো সময় মনে হয়েছে মায়ের কথা বলি। কিন্তু তা করা হয়ে ওঠে নি কখনো। এখন শুধু তাঁর অবস্থানটাকেই সাধারণভাবে উপস্থিত করা ছাড়া উপায় নেই। মা আমার সাহিত্য সাধনার বহু কথাবার্তার উত্থাপক। মায়ের সূত্রেই এবার আমার জীবনের একটা দিকের কথা বলতে হয়। এর আগেও বোধ হয় বলেছি, আমার জন্ম আসামের ডিব্রুগড়ে। আমার দাদামশাই ছিলেন ডাক্তার। এবং অত্যন্ত জনপ্রিয় ডাক্তার। প্রচুর হাতযশ ছিল তাঁর ডাক্তারিতে। আমার মামাবাড়ি ছিল বিক্রমপুরের বিখ্যাত গ্রাম সোনারঙে। একটা দৃষ্টান্ত দিয়ে বলা যায়, রবীন্দ্রনাথের শান্তিনিকেতন তথা বিশ্বভারতীর এক বিশিষ্ট স্তম্ভ ছিলেন ক্ষিতিমোহন সেন, তাঁর বাড়ি ছিল সোনারঙে। আমার মা কিংবা বাবা অবশ্য এই সোনারঙ গ্রামটিকে বিয়ের পর আর দেখেন নি। তবে হয়তো মায়ের মনে জন্মস্থানের জন্য একটা গর্ব ছিল। কিন্তু কখনো বলেন নি, কারণ কোনো গর্বের ধার তিনি ধারতেন না। বাবা ফুটবল খেলোয়াড় হিসেবে কলেজ জীবনে কলকাতায় প্রবেশ করেন। সেখানে শ্বশুড়বাড়ির সংযোগ তো দূরের কথা আমাদের পদ্মাপাড়ের পিতৃপুরুষের গ্রামের দিকেও কোনো টান অনুভব করতেন না।

মামাবাড়ির সঙ্গে জীবনের যে সম্পর্ক সে সূত্র উত্থাপন করি। আমার মামারা এবং দিদিমা-দাদামশাইরাই বরং বিহার আর আসামের অর্থাৎ রাঁচি আর ডিব্রুগড়ের দূরত্ব ও ব্যবধানকে জীবনে অপ্রাসঙ্গিক করেছিলেন। দাদামশাই-দিদিমাই আমাদের খোঁজখবর নিতেন। মায়ের কাছে রান্নাঘরে উনুনের পাশে ছেলেবেলায় মামাদের এবং দাদামশাইয়ের জীবনের টুকিটাকি খবর পেতাম।

আমার এক মামা ১৯২০ সালে বিলেত ফেরত হলেন। তখন এই উপমহাদেশটাকে আর আগের মতো দমন করে রাখা যাবে না বুঝে শতাব্দির গোড়ার দিকে এখানকার বাসিন্দাদের মধ্যে উদ্যোগী শিক্ষিতদের জন্য দ্বার অবারিত করেছিল, নানারকম সার্ভিসের প্রবর্তন করেছিল ব্রিটিশ সরকার। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অবসানের পরে বিভিন্ন সার্ভিসের পত্তন হয়েছিল। আমার মামা বিনয়রঞ্জন সেন স্কটিশচার্চ কলেজ থেকে বি.এ. পরীক্ষা দেয়ার সঙ্গে সঙ্গেই Indian Civil Service ev I.C.S-ভর্তি হওয়ার পরীক্ষা দিয়েছিলেন। বিশের দশকে আমার জ্যোতিমামা বিলেতে পড়তে যান মেডিকেল সার্ভিসে। জ্যোতি মামা ও বিনয় মামা অবশ্য বিলেতে বেশিদিন থাকেন নি, কারণ এক চান্সেই পাশ করেছিলেন। জ্যোতি মামা যেন বিলেতে থাকবার জন্যই

মেডিকেল কলেজের ছাত্রজীবনে ছেদ টেনে বিলেতে গিয়ে জমিয়ে বসেছিলেন। তখন একটা রব উঠেছিল জ্যোতি মামা মেম বিয়ে করে আসবেন। এই মেম বিয়ে করাটা তখন মধ্য-নিম্নবিত্তের যুবাদের একটা হুজুগে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। তবে জ্যোতি মামার মেম বিয়ে করে ওঠা হয় নি। সেটা কেন, তা একান্ত ব্যক্তিগত ব্যাপার বলে এখানে বলছি না। যুদ্ধ শেষ হওয়ার সাথে সাথেই বিনয় মামা আই.সি.এস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং মেম সাহেবের ধার না মাড়িয়ে ১৯২২-২৩ সাল নাগাদ দেশে ফিরে আসেন মহকুমা শাসকের চাকুরি নিয়ে। এই প্রসঙ্গেই বলা যেতে পারে, নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু আই.সি.এস পরীক্ষার্থী হিসেবেই বিলেত যান, সম্ভবত প্রথম বছরেই উত্তীর্ণ হয়েছিলেন। কিন্তু তখন শুরু হয়েছে মহাত্মা গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলন। চিত্তরঞ্জন দাশ ব্যারিস্টারি ছেড়ে এই অসহযোগ আন্দোলনে নেমে পড়েছেন ও কারাবরণ করেছেন। সুভাষচন্দ্র বসু আই.সি.এস-এর চাকুরিতে ইস্তফা দিয়েছেন। তিনি ফিরে আসেন ১৯২২ কি ২৩ সালে। যোগ দেন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের সঙ্গে। আমাদের মামা বিনয় সেন ইস্তফা দেন নি। আগেই বলেছি, তিনি মহকুমা শাসকের পদে ছিলেন। এখানে একটা কথা বলে রাখা দরকার, বিনয় মামা ক্রমেই একটু বেশি বেশি করে একটা আমলাতান্ত্রিক ব্যক্তিত্ব নিয়ে চাকুরি চালিয়ে যান। তখনকার দেশব্যাপি অসহযোগের তোলপাড়ের মধ্য দিয়ে। এই ধারাটি বরাবরই ছিল, দেশ স্বাধীন হওয়ার পরে জাতিসংঘের একজন পদস্থ কর্মী হিসেবে কাজের সময়ও। কিন্তু আমরা যখন প্রথম প্রথম তাঁকে দেখি তখনও তাঁর কথাবার্তায় একটা সারল্য ছিল, তিনি একজন কৃতি পুরুষ হিসেবে নাম করলেও এখানে শুধু উল্লেখ করব, আমার মায়ের সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্বের ভাবটা কখনো ক্ষুণ্ন হয়নি।

বিশের দশকটাকে এদিক থেকে দেখলে বুঝতে কিছুটা সহজ হবে। আমার পক্ষে বহুদিকের আত্মীয়তা হওয়ার ফলে সাহেবিয়ানার একটা আকর্ষণ এদিক থেকে প্রবল হওয়ার কথা। বস্তুতপক্ষে হয়তো মনে মনে ক্ষোভ ছিল যে সাহেবিয়ানার দিকে যেতে পারছি না। এর কারণ হলো, বিভিন্ন উপলক্ষে কলকাতায় গিয়ে মনে হয়েছে কলকাতায় বসবাসকারী মাসতুতো ভাইরা একটা আলাদা জগতের বাসিন্দা। সাহেবিয়ানায় তারা মামাদের জীবনের সঙ্গী। কলকাতায়,এরই পাশাপাশি একটা আকর্ষণ ছিল, মামাদের এবং মাসতুতো ভাইদের ক্যালকেশিয়ান অনেক বিষয়ে সহজ আলাপ-আলোচনা। দিন কয়েকের জন্য কলকাতায় যাওয়াটা এমন অনিবার্য ছিল, কারণ কলকাতাকে জানবার জন্য অন্য সুযোগও ছিল না। তবে, কলকাতা যাওয়া-আসায় কোন আক্ষেপের অবকাশ ছিল না। রাঁচিতে ফিরে এলেই কোনো কিছু থেকে বঞ্চিত হওয়ার ভাবটা থাকতো না। এর কারণ মাসতুতো ভাইদের প্রতি কণামাত্র ঈর্ষার ভাবও ছিল না, কেননা বাবা ছিলেন বেশবাসে কথাবার্তায় যেন জন্মগতভাবে সাহেব। আসলে এখানে বিভেদের ব্যাপারটা বড় ছিল না। কলকাতায় থাকতে পারা না পারাটাই বড় প্রশ্ন ছিল। কলকাতার আর রাঁচির জীবন দুটো বিপরীত মেরু। কলকাতা ছিল যন্ত্রনগরী, অপরদিকে রাঁচিতে কলকারখানা প্রায় ছিল না-ই বলা যায়। রাঁচি ছিল প্রকৃত নগরী। দুটো সম্পূর্ণ আলাদা।

রাঁচির নগরীত্ব ব্যাপারটা ছিল বিহার প্রদেশের গ্রীষ্মকালীন রাজধানী হওয়ার সুবাদে। বিহারের বিঘোষিত রাজধানী ছিল পাটনা। গ্রীষ্মকালে বিভিন্ন বিভাগীয় কাজকর্মের জন্য পাটনা উপযোগী বিবেচিত হয়নি। কারণ বিভিন্ন বিভাগীয় কর্মরতদের অধিকাংশই সাহেব ছিল বোধ হয়।

বর্তমান শতাব্দির প্রারম্ভে ক্রমেই বড় বড় কর্মচারীদের আচার-আচরণ, সাজ-পোশাক, মেজাজ বড় বেশি সাহেবি হয়ে উঠলেও এটা বলা যেতে পারে, বেশিরভাগ সরকারি পদে ইংরেজ সাহেবরা আকৃষ্ট ছিল না। এদেশের প্রবীণ কর্মচারীরা বড় সাহেব, মেজ সাহেব, ছোট সাহেব নামধারী হয়ে উঠলেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শেষ হওয়ার সময় এই ধারাটা আরো বড় আকার ধারণ করে। আপাতদৃষ্টিতে বাংলোগুলোকে শ্বেতাঙ্গ ও শ্বেতাঙ্গিনীরা দখল করে রাখলেও এবং টেনিস কোর্টগুলোতে শ্বেতাঙ্গদেরই উচ্ছল আধিপত্য থাকলেও অশ্বেতকায়দের প্রবেশ নিষিদ্ধ ছিল না। বিশের দশকে টেনিস কোর্টে অশ্বেতকায়দের দেখতে পাওয়াটা পরিবর্তনটাকে দর্শনীয় করে তুলেছিল। তবু এই দিকটাকে নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি হয়নি, কারণ সমগ্র উপমহাদেশে স্বাধীনতা সংগ্রামের উত্তাল তরঙ্গগুলো বিশের দশকের পরবর্তী পর্যায়ে একেবারেই নেমে গিয়েছিল। তিরিশের দশকের গোড়াতে আবার উত্তাল তরঙ্গ উঠে আসে। উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের ক্ষেত্রে অশ্বেতকায়দের আবার দর্শনীয় করে তোলে, কিন্তু তখন পরিস্থিতিটা ভবিষ্যৎ নিয়ে জল্পনা-কল্পনাকে আর একটা স্তরে নিয়ে যায়। এই স্তরে উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের দেশি-বিদেশি বলে চিহ্নিত করার কোনো অবকাশই ছিল না। কথাটা এই যে, বিশের দশকে বিনয় মামার চরিত্র বিচার আমাদের আর আগের মতো কৌতূহলী করেনি।

১৯৩০ পর্যন্ত টেনিস কোর্টের বাইরে আমলাদের বর্ণ নিয়ে দেশবাসীর মনে যেসব কথা উঠতো সেগুলোর মধ্যে একটা অন্তবর্তী বিচারের টানাপোড়েন ছিল। একটা উদাহরণ দেয়া যেতে পারে, আজকের ভারতের অথবা কলকাতাকেন্দ্রিক সারা বাংলার এক বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব অন্নদাশঙ্কর রায় তিরিশের দশকের শেষের দিকে আই.সি.এস হয়ে ইংল্যান্ড থেকে ফিরে এক মার্কিন মহিলাকে বিবাহ করলেন, এ খবর দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। রাঁচি শহরেই ডুরান্ডার একটি বাসায় এ বিবাহ সম্পন্ন হয়েছিল। রাঁচি থেকে তাঁর স্ত্রীকে নিয়ে তদানীন্তন বাংলায় ম্যাজিস্ট্রেটের চাকুরিতে চলে যাওয়ার সময় বিকেলের কলকাতার ট্রেনে ওঠেন। বেশকিছু লোকজন তাদের শুভবিদায় জানানোর জন্য রাঁচি স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে জমা হয়েছিলেন। তখন সেই জনতার মধ্যে আমিও একজন ছিলাম। অন্নদাশঙ্কর রায়ের ব্যক্তিত্বকে ছাপিয়ে মিসেস লীলা রায়ের ব্যক্তিত্বই প্রধান হয়ে দেখা দিয়েছিল। একজন ইন্ডিয়ান আই.সি.এস-কে সরাসরি এভাবে দেখতে পাওয়াটা ছিল যেন একটা ভাগ্যেরই ব্যাপার। তিরিশের দশকের জন-উত্থানের উত্তাল তরঙ্গ অন্নদাশঙ্কর রায়ের ব্যক্তিত্বকে ঢেকে দিয়েছিল। এরপরে ব্রিটিশ রাজত্ব চলে যাওয়ার আগের কিংবা পরের অন্নদাশঙ্কর রায়ের আই.সি.এস-এর ভাবমূর্তি আমাদের তথা দেশের কাছে অবান্তর হয়ে দাঁড়ায়। কলকাতায় তাঁর একটা সংবর্ধনা সভায় কয়েক বছর আগে তাঁর পাশে বসে তাঁকে বলেছিলাম রাঁচিতে তাঁর বিয়ের কথা। তিনি তখন এ

প্রসঙ্গটাকে কৌতুকভরে উপভোগ করেছিলেন। তবে তিরিশের দশকের এই ব্যক্তিগত ঘটনাটা তাঁর ও আমাদের মনে প্রায় বলতে গেলে সত্তর বছর পরেও জীবনের মুক্তো-তরঙ্গমালার একটা ছবি নিশ্চয় তুলে ধরে।

আরো এগোবার আগে গোড়াতেই যে আত্মকথা শুরু করেছি তার ধারাটাকে নিয়ে কিছু বলে রাখি। বলতে গেলে শতাব্দির সমস্ত দশকে সাধারণভাবে বিশ্ব, আমাদের উপমহাদেশ এবং বিশেষ করে দুই বাংলার সর্বসাধারণের জীবনকথা বলা। এই কারণেই, যে দশকটার গভীরে গিয়ে এই আত্মকথার বিশেষ ঘটনাকে পেরিয়ে এসেছি তার একটা গতিধারা, মোটামুটি প্রধান প্রধান দিকগুলোকে সাজিয়ে নেয়া দরকার। এদিক দিয়ে হয়তো শতাব্দির শুরু থেকেই আমাদের উদ্দিষ্ট জাতীয়-আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সৃজনশীলতার ওপর আলোকপাত করা। আমরা এই নব্বইয়ের দশকে কয়েকজনের জন্মশতবার্ষিকী পালন করেছি। এদের সৃজনশীলতার প্রয়াসের ভিত্তিতেই বিশের দশকের ভাবনা-চিন্তা, লেখালেখির গোড়াপত্তন। তবে আত্মকথায় প্রথম দু'টি দশকের মধ্যে বিশেষ যাবো না। যখন থেকে একজন সাক্ষী হিসেবে শতাব্দি-কথার মধ্যে প্রত্যক্ষভাবে জড়িয়েছি, সেখান থেকে শুরু করাটা উচিত বলে মনে হয়। এখানে দ্বিতীয় দশকে, প্রকৃতপক্ষে উল্লেখ পর্বে বাংলো জীবন সম্পর্কে একটু আভাস দিয়েছি মাত্র, কারণ দ্বিতীয় দশক সম্বন্ধে কিছু বলতে গেলে মনে হয়েছে যে স্বপ্ন-কল্পনাই সেখানে বড়। বিশের দশকেই প্রকৃতপক্ষে ব্যক্তিগত চরিত-কথার মধ্যে বিস্তারিতভাবে যেতে পারি।

রামপদ পণ্ডিতের পাঠশালায় যে স্বরবর্ণ, ব্যঞ্জনবর্ণ ও যোগ-বিয়োগ-গুণ-ভাগের পৃষ্ঠপটটাকে সামনে রেখে প্রবেশ করেছি সেই সময়টা ছিল আলো-আঁধারির। যুদ্ধ শেষ হয়ে আসছে এবং পৃথিবী জুড়ে দেশে-বিদেশে চলছে বড় বড় ভূকম্পন। পরে জেনেছি ও বুঝেছি সেই সময়টাকে, পরের দশকে আমাদের কাছে তখন সুস্পষ্ট– যাকে বলে বিপ্লব, তা-ই। যেমন, তখন ঘটেছিল রুশ বিপ্লব, স্বাধীনতা আর পরাধীনতার মধ্যে দেশ-দেশান্তরে হেঁচকাহেঁচকির বিস্ময়ের কথা সব জানছিলাম। এ বিপ্লব নিয়ে তেমন কেউ আলোচনাও করে নি বোধ হয়। কিন্তু বিশের দশকে প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গেই চারদিকে বিগত চার বছরের ঘটনা নিয়ে আলোচনার তোলপাড়। তবে এর মধ্যেই একটা বোধ আমাদের কৈশোরের ভাবনাচিন্তাতেও কাজ করেছিল, কোন্‌টা যৌক্তিক কোন্‌টা অযৌক্তিক সেটা প্রশান্ত মনে বুঝে নেয়ার একটা তাগিদ ছিল। কোনোরকম রাজনৈতিক, বৈজ্ঞানিক ধ্যান-ধারণার ভিত্তি ছাড়াই নতুন বিশ্ব গড়ার ছোট বড় অসংখ্য সৃষ্টি আর দৃষ্টির পালা। এরই দৌলতে ১৯২৩-২৪-২৫ সালে রবীন্দ্রনাথের *'রক্তকরবী'* আর শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের *'পথের দাবি'*-র বক্তব্য বুঝে ফেলেছি। এ ব্যাপারে পরে বেশ কিছু বুঝিয়ে বলতে হবে।

এমন তরো আবহাওয়া থাকলেও পরবর্তী বেশ কয়েক দশক পরেও অর্থাৎ অনেক কিছু পড়াশোনার পরেও এবং মার্ক্‌স্‌পন্থী-লেনিনপন্থী হওয়ার পরেও, সার্টিফিকেটগুলো গলায় ঝুলোবার মতো হলেও, বিপ্লব, স্বাধীনতা-সাম্যের মূল কথাগুলোর স্বাভাবিকতা নিজেদের কাছে তো ছিল, আমাদের প্রজন্মের জানাজানির বাস্তবতাকে, তার সমস্ত অন্তর-বাহিরের ব্যাপারকে আমাদের গুরুজনদের কাছে উপস্থিত করতে পেরেছি গ্রহণযোগ্য

হিসেবে। আজ হয়তো খতিয়ে সেদিনকার দেখার প্রয়োজনটা নিজেদের মনের মধ্যে নানা ধরনের প্রশ্ন তুলছে এবং তুলতে পারে। কিন্তু সে দিন অর্থাৎ, বিশের দশকের বহুমুখী ঘটনা প্রশ্নাতীত বলে প্রতীয়মান। এই ধরনের কাণ্ড-কারখানাই হয়তো বিপ্লব। বহুমুখী বিপ্লব। এবং প্রকৃতপক্ষে ভাঙা-গড়ার চিন্তা ও কর্মধারা শিক্ষা ও অশিক্ষার ধার ধারে না। সাক্ষরতা বিশাল ও প্রবল উথালপাতালকে ছাপিয়ে নতুন পৃথিবীর সংজ্ঞা নবীন-নবীনা, প্রবীণ-প্রবীণা নির্বিশেষে মধ্যবিত্ত ও নির্বিত্ত নরনারীর কাছে ঝড়ের পরে ধুয়ে সাফ করা আকাশের মতো ঝকঝক করে। এ ব্যাপারটাতে কোনোরকম আপত্তির কথা অবশ্যই পরে এসেছে। কী করে এটা ঘটে সেটা নিয়ে আজ গবেষণার ও গবেষণাগারের প্রয়োজন হয়তো আমরা যারা আজ পর্যন্ত বেঁচে আছি অর্থাৎ বিপ্লব, সাম্য, স্বাধীনতা নানা ধরনের আঁকাবাঁকা বাস্তবায়নের মুখোমুখি হওয়ার দরুন সন্দিগ্ধ ও সন্দিহান হয়ে কর্মযজ্ঞে প্রবৃত্ত তাদের মধ্যে জটিলতার টানাপোড়েন তিক্ত বিতর্কের মানসিকতাই তৈরি করে ফেলেছে, তারাও বিশের দশকে নতুন পৃথিবীকে তর্কাতীত বলেই গ্রহণ করি। বিশের দশকের দিকে ফিরে তাকিয়ে আজও সহজিয়া কবির মতোই উপস্থিত করা যায় বলে মনে করি।

ড. ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, স্বামী বিবেকানন্দের ভ্রাতা এবং বৈজ্ঞানিক ও মার্কসবাদী, বহুমুখী, সত্যাশ্রয়ী এবং বাংলার অগ্নিযুগের চিন্তাচেতনার ধারক-বাহক, তাঁর 'বাংলা প্রগতি সাহিত্য' গ্রন্থে এক জায়গায় কবি কাজী নজরুল ইসলামকে কবি চণ্ডীদাসের পরে মানুষের জয়গান গাওয়ার মহান স্রষ্টা-শিল্পী বলে অভিহিত করেছিলেন।

বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের শতবার্ষিকী সমাগত। তাঁর কাব্যের গোড়াপত্তন হয়েছিল বিশের দশকের জনউত্থানে। আপাতত তাঁর কাব্যকে বিশের দশকের সমগ্র কাব্যপ্রয়াসের মর্মবাহকরূপে সামনে রেখে এই দশকের চরিত্র বিচারে প্রবৃত্ত হওয়া যেতে পারে, আত্মকথার বিশ্লেষণ এই মানদণ্ডে রেখে। এই দশকের সমগ্র ধারার সাবলীলতার মাধ্যমে একই সঙ্গে সার্বিক দৃষ্টির দিকে ঝুঁকেছিলাম। আমাদের বয়সী ছাত্রদের কোটের পকেটে থাকতো *'অগ্নিবীণা'* বইটি। তখন বোধ হয় আমার চৌদ্দ বছর বয়স, রাঁচির ব্রহ্মচর্য বিদ্যালয়ের ইংরেজি শিক্ষক মৃদু হেসে উচ্চারণ করেছিলেন শুধু একটা কথাই—'নজরুল'! এতে কিছুটা নজরুলকে সবার ওপরে রাখার একটা ঝোঁক আমার নিজের মনেও দেখা দিল। নজরুলকে কল্লোল গোষ্ঠীর একজন বলেই হয়তো স্থাপন করেছিল অর্থাৎ, তখন ছিল একের নয়, বহুর পাওয়া। নজরুলের সৃষ্টি বহুজনের সৃষ্টির বিচারকেন্দ্রিক। নজরুল বিশের দশকের কাব্যের ব্যাপক ও গভীর প্রতিভূরূপে আমাদের সমবয়সী ও বয়সিনীদের কায়োমনোবাক্যে পরিব্যাপ্ত থাকলেও একক ছিলেন না, তিনি বিশের দশকের একটা বৈপ্লবিক বিশেষত্বের তথা একটা কাব্যিক প্রজন্মেরই অংশ ছিলেন। প্রথম প্রথম এই সত্যটাকে বুঝে উঠতে পারি নি। কারণ উপরিউক্ত নতুন প্রজন্মের সঙ্গে পরিচিতি ঘটেছে এই দশকের শেষের দিকে। আধুনিক বাংলা গদ্যের ধারাটাকে বুঝতে কিছুটা সময় লেগেছিল। আধুনিক বাংলা সাহিত্যের রূপ-রীতি-ভাষার মধ্যকার নানা ধরনের বিদ্রোহ, নানা ধরনের অভিনবত্বের ওপর দখল নিতে আমাদের প্রজন্মের বই পড়ুয়ারা বেশ কিছু সময় নিয়েছে। বিশেষ করে আমার এবং আমার মতো বাউণ্ডুলে ধরনের পড়ুয়াদের কিছুটা অসুবিধা হয়েছিল।

ব্যাপারটা একটু বুঝিয়ে বলি, বিশের দশকে একদিকে 'কল্লোল' এবং অন্যদিকে ঢাকার বুদ্ধদেব বসুদের ছাত্র জৈবনিক কিংবা *'কালি ও কলম'* পত্রিকার লেখাগুলো ছিল পৃথক। *'কল্লোল'* পত্রিকা ছিল লোকগদ্যভিত্তিক। *'প্রগতি'* কিংবা *'কালি ও কলম'*-এর গদ্যরীতি ছিল বিদ্রোহী, বিপ্লবী কিন্তু বুদ্ধিবিচারভিত্তিক। আমরা প্রথম দিকে কিছুটা সহজিয়া ধরনের কাব্য অথবা কাব্যসাহিত্যের ও আবেগভিত্তিক লেখাগুলোকে ধরেই সাহিত্যচর্চায় এগিয়েছি। নজরুল ছিলেন সহজিয়া। বুদ্ধিভিত্তিক আধুনিক বাংলা সাহিত্যের যুক্তিতর্কজাল এড়িয়ে যেতে চেয়েছিলেন এবং এজন্যেই বিশের দশকটাকে সামগ্রিকভাবে ধরতে নজরুল হয়েছেন সমগ্রভাবে আধুনিক বাংলা সাহিত্যের প্রত্যন্তে ধারক-বাহক। এবং এই জন্যেই, খোলাখুলি বলা ভালো, কিছুটা বুদ্ধি-বিবেচনা জটিল ও বহুস্তরীয় ও বহুমর্মীয় সাহিত্য জিজ্ঞাসা খুব উঁচু স্তরের বলে গ্রহণ করতে পারি নি সে সময়। আমরা নজরুল প্রেমিকরাও যখন বুদ্ধদেব বসুদের লেখাজোখায় আকৃষ্ট হয়েছি, তখন মনে হয় নজরুলকে কিছুটা পেছনেই রাখলাম। নজরুলকে বিশাল, ব্যাপক, গভীর ও বহুমর্মীয় বহুস্তরীয় দিক থেকে বুঝে নেয়ার চেষ্টা করি, তিনি যে লোক আবেদনকে সুদূরপ্রসারী, জনবিপ্লবী, সমগ্র বিশ শতকের ধারাবাহী এটা বুঝতে পারিনি। তাঁর গদ্য লেখাগুলোকে সমসাময়িক জীবনের সর্বাত্মক বিশ্লেষক বলে গ্রহণ করতে পারি নি। সেই সময় আমাদের আধুনিক বাংলা সাহিত্য বিচারে কিছুটা অপ্রয়োজনীয় বলে মনে হয়েছে। যে বাংলা লোকগীতিকে অবলম্বন করে শতাব্দির প্রথম দুই দশকে বিশেষ করে বঙ্গভঙ্গবিরোধী লোক উত্থান, প্রাণ মাতানো, মন মাতানো একটা মহাকাব্যিক মাত্রা নিয়ে তার সঙ্গে যুক্ত হতে পেরেছিল নজরুলের লোকগীতির সৃষ্টি। নজরুল গীতির মহাকাব্যিক মাত্রাগুলোকে আজ শতাব্দির গীতিকাব্যের সামগ্রিক রূপে রসে শুধু বিশ শতকের বাংলা লোকসংগীতের ভিত্তিস্থাপক বলে উপস্থিত করতে গিয়ে বুঝতে পেরেছি সেটা শুধু সারা শতকটিরই ধারকবাহক নয়, আগামী শতাব্দিতেও প্রাণ পেতে পারে নতুন করে। আধুনিক বুদ্ধি ও যুক্তিভিত্তিক জীবনবোধ ও জীবনবেদকে বুঝতেও যে নজরুলের গদ্য রচনা বিচার্য ও বিবেচ্য সেটা নজরুল-বিচারের প্রধান সূত্রগুলোরই মধ্যে পড়ে। এই সূত্রেই আজ বিশের দশকের গদ্যকাব্যিক ও ছন্দকাব্যিক সমস্ত রকমের লেখাগুলোকে বুঝবার জন্য কাজে লাগাতে হবে।

দ্বি তী য় প র্ব

পলাশ ভট্টাচার্য কর্তৃক নেয়া সাক্ষাৎকার

[লেখক সমাবেশ পত্রিকায় প্রকাশিত]

বিভিন্ন দিনে, বিভিন্ন সময়ে রণেশ দাশগুপ্তের কাছে লেনিন স্কুলে হাজির হয়েছিলাম। তিনি ধারাবাহিক চিত্র তুলে ধরবার চেষ্টাও করেছেন। এই ব্যাপারে যাদের কাছ থেকে প্রত্যক্ষ উৎসাহ পেয়েছি তাঁরা হলেন কবি কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত, কবি দীপেন রায়, রানা চট্টোপাধ্যায়, সাহিত্যিক অমলেন্দু চক্রবর্তী, কবি ও সম্পাদক আলোক কুমার ঘোষ এবং সর্বোপরি আপসহীন সাহিত্যিক শ্রীমিহির আচার্য, যিনি সবসময় উৎসাহ দিয়ে লেখক সমাবেশে ধারাবাহিকভাবে রণেশ দাশগুপ্তের জীবনকাহিনি প্রকাশ করেছেন। এঁদের সবার কাছে আমি ঋণী ও কৃতজ্ঞ।

পলাশ ভট্টাচার্য

বাল্যকাল

পলাশ: রণেশদা আপনার বাল্যজীবন সম্বন্ধে কোথাও কিছু বলেন নি। সেই সময়টা জানতে আমি খুবই আগ্রহী। সেই সম্বন্ধে কিছু বলুন।

রণেশ: আমার জন্ম ১৯১২ সালের ১৫ জানুয়ারি ডিব্রুগড়ে দাদামশায়ের বাড়িতে। আমার বাবা-রা তিন ভাই। বড় জ্যাঠামশাইয়ের নাম অক্ষয় দাশগুপ্ত, মেজ জ্যাঠামশাইয়ের নাম নিবারণচন্দ্র দাশগুপ্ত এবং ছোট হলেন আমার বাবা অপূর্বরত্ন দাশগুপ্ত। আমার বাবা অতীতের একজন খ্যাতনামা খেলোয়াড় ছিলেন। সেই সময়কার স্পোর্টিং ইউনিয়নে খেলতেন। বাবার সময় যাঁরা খেলতেন তাঁদের মধ্যে মোহনবাগানের অভিলাষ ঘোষ, ভাদুড়ি ব্রাদার্স উল্লেখযোগ্য। বাবা খেলার জন্য কখনো শিলিং, ময়মনসিং ও অন্যান্য জায়গায় যেতেন। এই সূত্রে মাকেও যেতে হতো। আমার মেজ জ্যাঠা রাজনৈতিক কর্মী ছিলেন। তিনি বিহারে থাকতেন। একসময় বিহার কংগ্রেসের সভাপতিও ছিলেন। মেজ জ্যাঠা নিবারণ দাশগুপ্তর রাজনৈতিক জীবন মাত্র ১৪ বছর (১৯২১-১৯৩৫)। তিনি পুরুলিয়ায় জেলা স্কুলের হেড মাস্টার ছিলেন। আমার জ্যাঠাই আমার বাবাকে এ.জি. বিহার-এর চাকুরি দিলেন। সেই সূত্রে রাঁচিতে বসবাস শুরু করলাম। বাবার সাংগঠনিক উদ্যোগে কোলকাতার মোহনবাগান দল রাঁচিতে খেলতে যায়। সেই দলে গোষ্ঠ পাল, মোনা দত্ত, উমাপতি কুমার ছিলেন। ১৯১৪-১৯১৮ এই যুদ্ধকালীন সময়ে এজি-র কয়েকজনকে রাঁচি থেকে পুণার মিলিটারির অ্যাকাউন্টস্-এ বদলি করা হয়। এই বদলির সময়ে আমরা দুই ভাই ও দুই বোন জ্যাঠামশাইয়ের কাছে থাকলাম। প্রায় তিন বছর আমরা ওখানে ছিলাম। ১৯১৭ সালে আমরা পুরুলিয়ায় চলে যাই। ১৯২০ সালে বাবা আবার রাঁচি ডিভিশনে ফিরে এলেন। আমরা দ্বিতীয়বার রাঁচিতে চলে যাই।

আমার বয়স তখন আট বছর। আমাদের কোয়ার্টার্সে অমিতা সেন ও ললিতা সেন নামে দুই বোন থাকতো। ওরা খুব ভালো রবীন্দ্রসংগীত গাইতে পারত। অমিতার বয়স তখন চার বছর মাত্র। এই ললিতা, রবীন্দ্রনাথের *নটীর পূজার* ফিল্ম-এ নটীর অভিনয় করেছিল। অমিতা সেনরা ব্রাহ্ম ছিল। সারা পরিবারে সংস্কৃতির একটা হাওয়া বইতো। দশ বছর বয়সে আমরা রাঁচির অন্য একটা কোয়ার্টার্স-এ চলে যাই। এই সময় আমাদের প্রতিবেশি ছিলেন রণেন মজুমদার। ইনি শিল্পী ছিলেন এবং আমাকে খুব ভালোবাসতেন। সত্যিকথা বলতে কি, আমি দশ বছর বয়স পর্যন্ত কোন স্কুলে ভর্তি হয় নি। যখন পুরুলিয়াতে ছিলাম তখন রাম পণ্ডিতের পাঠশালায় বছর তিনেক পড়াশুনা করেছিলাম। আমর বয়সের ছেলেরা স্কুলে যেত আর আমি বল নিয়ে খেলতাম, মনের আনন্দে মাঠে ঘাটে ঘুরতাম। একদিন রণেনদা আমাকে জিগ্যেস্ করল, হ্যাঁরে? তুই স্কুলে যাস্ না কেন? আমি বললাম যে স্কুলে ভর্তি হই নি। রণেনদা বললেন সেকি! বলেই আমাকে তার পরের দিন রাঁচি জেলা স্কুলের হেড মাস্টারের কাছে নিয়ে গেলেন। তখন স্কুলের সেশন শুরু হয়ে গেছে।

রণেনদা হেডমাস্টারের প্রিয় ছাত্র ছিলেন। ওঁর অনুরোধে আমাকে ছয় ক্লাসে ভর্তি করে নেন। তখন সব স্কুলই 'ইংলিশ মিডিয়াম' ছিল। আমার তো প্রথম প্রথম খুব অসুবিধা হতো! তবে স্কুলের শিক্ষক মশাইদের যত্ন ও তাগিদে পিছিয়ে যাওয়া

পড়াগুলিকে পুরোপুরি আয়ত্তে আনতে পেরেছিলাম। আমাদের বাড়ি থেকে জেলা স্কুল প্রায় তিন মাইল দূরে ছিল এবং তোমাকে একটা কথা বলি, বার্ষিক পরীক্ষায় আমি দ্বিতীয় স্থান পেলাম। সেই সময়ে বিজলী বাতির কোন রকম ব্যবস্থা ছিল না। মিউনিসিপ্যালিটির আলো বলতে ঐ কেরোসিনের আলো ছিল। আমরা ভাই-বোনেরা বাড়িতে কোন প্রাইভেট টিউটর কিংবা অন্য কারোর কাছে পড়তাম না। বাবা খেলাধূলা নিয়েই ব্যস্ত থাকতেন। সুতরাং পড়াশুনার সময় কারোর কাছেই পড়তে পারি নি। আমি যখন ক্লাস এইটে পড়ি, তখন জীবনানন্দ দাশের ভাই অশোকানন্দ দাশ এজি-র চাকুরি নিয়ে রাঁচিতে আসেন। এই রাঁচিতে আসার জন্য তিনি আমাদের বাড়িতে থাকতেন। একটা আলাদা ঘরে আমি আর অশোকদা থাকতাম। অশোকদা এম.এসসি পাশ করেছিলেন।

রাঁচির ডুরাণ্ডা পাবলিক লাইব্রেরি খুব বড় ছিল। সেই সময় অশোকদা ক্ল্যাসিকাল সাহিত্য এনে পড়তেন এবং আমাকেও পড়াতেন। ক্লাস এইটে পড়বার সময় আমি *'রেজারেকশন্'* ও *'ওয়ার এন্ড পিস্'* পড়ে ফেলি। সোভিয়েত দুনিয়া ও সাহিত্যের সাথে আমার পরিচয় গড়ে উঠল।

পলাশ: আপনি কিছুক্ষণ আগে বললেন, যে, গৃহশিক্ষক বা অন্য কারো সহযোগিতা ছাড়াই পড়াশুনা করতে হয়েছে। আপনি এগোলেন কিভাবে?

রণেশ: আসলে কি জানো, আমাদের স্কুলে পড়াবার পদ্ধতিই ছিল অন্যরকম। শিক্ষকরা প্রতিটি ছাত্রের ব্যাপারে যত্ন নিতেন। আমি শুধু নই, অন্যান্য ছাত্ররাও ইংরেজি ভাষাকে রপ্ত করে ফেলে। সেই সময়ের শিক্ষকদের মধ্যে হরিপদ চট্টোপাধ্যায়, তারাপদ বসু, কালীপদ চৌধুরী, বিজয় মুকুট ধন, বি.ডি.কশ্যাপ্ ও আরো অনেকের কথা মনে পড়ে–।

পলাশ: কোনদিন কি আপনার মধ্যে আপনার বাবার মতো খেলোয়াড় হয়ে ওঠার প্রবণতা আসে নি?

রণেশ: বাবা খেলাধূলা ভালোবাসেন বলে আমার মধ্যেও খেলাধূলার প্রতি টান্ বা ভালোবাসা গড়ে উঠেছিল। ম্যাট্রিক-এর টেস্ট পরীক্ষার সময় লন্ টেনিস খেলতে শুরু করি। প্রায় নেশার মতো ছিল। এর ফল কি হলো জানো? আমি চতুর্থ হলাম। শিক্ষক মশাইরা তো রেগে উঠলেন। খেলার ঝোঁক তারপর কমে এল।

পলাশ: বাংলা সাহিত্যের প্রতি আপনার ভালোবাসা কিভাবে গড়ে উঠলো?

রণেশ: এটা আমার মা-র কাছ থেকে পেয়েছি। আমার তিনটা হ্যাবিট আমি তিনজনের কাছ থেকে পাই। মার কাছ থেকে বাংলা সাহিত্য, অশোকদার কাছ থেকে ইংরেজি ও ক্লাসিক্যাল্ সাহিত্য আর বাবার কাছ থেকে খেলাধূলা। বাবা পড়াশুনার ব্যাপারটা না দেখলেও আমি প্রথম তিন-চারজনের মধ্যে থাকতাম বলে বাবার একটা গর্ব ছিল।

আমার দিদি ও আমি সেই সময় খুব দেশাত্মবোধক গান করতাম। বাবা কিন্তু মেয়েদের স্বাধীনতা ও পড়াশোনার পক্ষপাতী ছিলেন। আমি যখন ক্লাস এইটে পড়ি তখন দিদির বিয়ে হয়ে যায়। মনে আছে সালটা হবে ১৯২৫।

পলাশ: রণেশদা, সেই সময়কার স্কুল ও তার পরিবেশ সম্বন্ধে কিছু বলুন।

রণেশ: রাঁচির জেলা স্কুলে মাইনে ছিল ২ টাকা। তখন ২ টাকায় ১ মণ চাল পাওয়া যেত। রাঁচিতে সেন্ট পলস্ জার্মান মিশন ও রোমান মিশন ছিল। তখন জেলা স্কুলের হেড মাস্টার হিসাবে মি. মার্টিন, মি. কুপার ও মি.টি.আর. স্পিলরকে পেয়েছিলাম। সাধারণভাবে আদিবাসী ছেলেরা মিশনারি স্কুলে পড়তো। প্রত্যেকটি স্কুলের মধ্যে কমপিটিশন হতো। মিশনারি স্কুলের ছেলেরা স্পোর্টসে প্রাইজ পেত। তবে একজন মাত্র ছেলে পুরুষমোহন জেলা স্কুলের হয়ে হাইজাম্পে প্রত্যেকবার ফার্স্ট হতো। কিন্তু পড়াশোনার ব্যাপারে মিশনারি স্কুলের চেয়ে জেলা স্কুল ভালো রেজাল্ট করত। জেলা স্কুলের ছাত্রদের মধ্যে একটা বড় অংশ ছিল বাঙালি, হিন্দীভাষী ও উর্দুভাষী। বিহার, রাঁচি ও পাটনায় শিক্ষিত বিহারি মুসলমানদের প্রাধান্য ছিল বেশি। তবে উকিল, ব্যারিস্টার, শিক্ষক ও ডাক্তারি পেশায় বাঙালিরা প্রধান ছিল।

এই রাঁচি, বিহারের সামার হেড কোয়ার্টার্স বা গ্রীষ্মাবাস হওয়াতে সরকারি ও অন্যান্য অফিসগুলি এখানে ও পাটনায় ছিল। কিন্তু বিশেষ কোন কলকারখানা এখানে গড়ে ওঠে নি। ফ্যাক্টরি বলতে একমাত্র বরফের কল ছিল।

রাঁচির বিভিন্ন বাসিন্দা ও আদিবাসীদের জীবনযাত্রা সম্পর্কে তোমাকে পরে জানাবো।

পলাশ: সেই সময় কি বাংলাদেশে গিয়েছিলেন?

রণেশ: না। অল্প বয়সে বাংলাদেশ বা পূর্ববাংলায় কোনদিন যাওয়া হয় নি। কিন্তু বেশ কয়েকবার কোলকাতায় গেছিলাম।

পলাশ: ছাত্রজীবনে কবিতা ভালোবাসতেন না গদ্যসাহিত্য?

রণেশ: শৈশবে গদ্যসাহিত্যেই ঝোঁক ছিল বেশি। পাঠ্যপুস্তকের কবিতা ছাড়া খুব বেশি কবিতা পড়িনি। তবে প্রচুর ইংরেজি উপন্যাস পড়তাম। নজরুলের কবিতা আমার ভালো লাগতো।

সেই সময় প্রবাসী, ভারতবর্ষ, বসুমতী ও বিচিত্রা মাসিক পত্রিকাগুলো আমাদের বাড়িতে আসতো। কল্লোল পত্রিকার দু'এক কপি পেয়েছিলাম এবং পড়েও ছিলাম।

স্কুল জীবনে আমরা লম্বা কোট পরতাম। কোটের পকেটগুলোও ছিল বড় বড়। নজরুল ইসলামের *'অগ্নিবীণা'* কোটের পকেটে থাকতো। সময় পেলেই 'বিদ্রোহী' ও 'কামাল পাশা' আবৃত্তি করতাম। স্কুল জীবনেই স্বদেশি ভাবনা চলে আসে।

হরিপদ দে ছিলেন আমার দীক্ষাগুরু আর বিভূতি দা তখন স্বদেশি করতেন।

আমার জ্যাঠামশাই নিবারণ দাশগুপ্ত যুদ্ধের আগে থেকেই পুরুলিয়ায় থাকতেন। তোমাকে আমি আগেই বলেছি যে যুদ্ধের সময় বাবা যখন পুণায় চলে গেলেন তখন আমরা এই জ্যাঠামশাইয়ের বাড়িতে চলে গেছিলাম। তাঁর রাজনৈতিক জীবনের শুরু ও সবকিছুই এই পুরুলিয়াতেই হয়। জ্যাঠার বন্ধু ছিলেন অতুলচন্দ্র ঘোষ। এঁর স্ত্রী লাবণ্যপ্রভা ঘোষ, যিনি কংগ্রেসের এম.এল.এ ছিলেন। পুরুলিয়ার রাজনৈতিক জীবনে আমার জ্যাঠা ও অতুলচন্দ্র ঘোষের যথেষ্ট অবদান রয়েছে।

জ্যাঠামশাইয়ের দুই ছেলে ও তিন মেয়ে। বিভূতি দাশগুপ্ত, চিত্ত দাশগুপ্ত, মালতী, অন্নপূর্ণা ও বাসন্তী। পুরুলিয়ার 'শিল্পাশ্রম' তৈরি করেন আমার জ্যাঠামশাই ও তাঁর সতীর্থরা। উনি গান্ধীজীর অনুরাগী ছিলেন।

আশ্রমে চরকায় কাটা সুতো, সাবান, দেশলাই তৈরি হতো। জ্যাঠামশাই-এর তত্ত্বাবধানে স্বদেশি চেতনার পত্রিকা 'মুক্তি' বেরোতো। আমরা এই 'মুক্তি' পড়তাম। সরকার প্রায়ই 'মুক্তি' বাজেয়াপ্ত করে দিত, না হয় বন্ধ করে দিত। তখনকার দিনে প্রতিটি স্বদেশি চেতনার পত্রিকার উপর এ ধরনের আঘাত আসতো। আমার জ্যাঠামশাই ১৯২১ সালে চাকুরি ছেড়ে সরাসরি রাজনীতিতে যোগদান করেছিলেন। যদিও এই প্রতিষ্ঠানের নাম 'শিল্পাশ্রম' কিন্তু এর আসল কাজ ছিল রাজনৈতিক চিন্তা আদান-প্রদান করা। সেই সময়ে এই আশ্রমে তাঁত, চরকা, দেশলাই ইত্যাদি করে অনেকেই সংসার চালাতেন। জ্যাঠামশাইরা এই সময়ে তীব্র অর্থনৈতিক সংকটে ভুগছিলেন। চিত্তপ্রসাদকে কোলে রেখে আমার জ্যাঠিমা ১৯১৬ সালে মারা যান। জ্যাঠামশাই পাঁচ পুত্র-কন্যা নিয়ে প্রবলভাবে স্বদেশি আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েন। একমাত্র বিভূতিদা তাঁর বাবার সাথে থাকতো, বাকিরা ওদের মামার বাড়িতে থাকতো। বিভূতিদা আমার থেকে ১০ বছরের বড় ছিল। জ্যাঠামশাই স্কুলের হেডমাস্টার হওয়া সত্ত্বেও বিভূতিদা কোনদিন স্কুলে ভর্তি হননি। সব সময় বাবার সাথেই থাকতেন, কাজ করতেন। জ্যাঠতুতো ভাই-বোনেরা মামার বাড়িতে থাকলেও আশ্রমের ওপর খুব টান ছিল। ভীষণ কঠোর পরিশ্রম করতে পারতেন এই জ্যাঠামশাই। এই আশ্রমের সঙ্গে সেই সময়কার বিপ্লবীদের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল।

ডালহাউসি স্কোয়ার বোমা মামলার তদন্তকারী অফিসার টেগার্টকে মারবার জন্য ১৯৩০ সালে অনুজা সেনগুপ্ত ও দীনেশ মজুমদারের ওপর ভার পড়ে। অনুজা সেনগুপ্ত বোমা ফেটে মারা যান এবং দীনেশ মজুমদার পালিয়ে যান। এই ডালহাউসি স্কোয়ার মামলায় তাঁকে পুলিশ খুঁজছিল।

সেই সময় এই ঘটনা সারা বাংলায় দারুন আলোড়ন তুলেছিল। এই কেসে আরো আসামির মধ্যে তরুণ ডাক্তার নারায়ণ রায়, ড. ভূপাল বসুও ছিলেন। দীনেশ মজুমদার অনেক কেসের আসামি ছিলেন। পলাতক থাকা অবস্থায় দীনেশ মজুমদার জ্যাঠামশাইয়ের শিল্পাশ্রমে আশ্রয় নিয়েছিলেন। জ্যাঠামশাই গান্ধীবাদী হওয়া সত্ত্বেও বিপ্লবীদের আশ্রয় দিতেন। ১৯৩০ সালে বাঁকুড়া কনফারেন্সে বিপিনবিহারী গাঙ্গুলিকে দেখেছি জ্যাঠামশাইকে প্রণাম করতে। এই বিপ্লবীদের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসেন বিভূতিদা। অসহযোগ আন্দোলনের শরিক ছিলেন এবং গণআন্দোলনেও ছিলেন। বিভূতিদা খুব ভালো গান করতে পারতেন। কর্নওয়ালিশ স্ট্রিটের একটা বাড়িতে ১৯৩৪ সালে দীনেশ মজুমদার ধরা পড়েন। পুলিশের সাথে গুলি বিনিময় হয়। পরে ফাঁসি হয়।

আমাদের রাঁচির বাড়িতে আমার জ্যাঠতুতো ভাই-বোনেরা আসতো। তাদের গায়ের খদ্দরের কাপড়, স্বদেশি গান ও কবিতা আমাকে ছাত্রজীবন থেকেই আকৃষ্ট করত।

পলাশ: স্কুল জীবনের কথা বলতে গিয়ে আপনি আদিবাসীদের কথা বলেছেন। এদের জীবনযাত্রা সম্বন্ধে যদি কিছু বলেন তাহলে খুব ভালো হয়।

রণেশ: আমার ছাত্রজীবনে খুব বড় একটা ফাঁক থেকে গেছে। সেটা হলো জেলা স্কুলে পড়বার সময় আমার বন্ধুরা ছিল বাঙালি, হিন্দুস্থানী ও বনেদী মুসলমান। কিন্তু

বিরাট সংখ্যক আদিবাসীদের সাথে যে যোগাযোগ গড়ে ওঠা উচিত ছিল তা করতে পারিনি। এই আদিবাসীরা প্রকৃতির মতোই থেকে গিয়েছে। যেমন বনরাজি, পর্বত, নদী ঠিক তেমনিই এই আদিবাসী। মিশনারী স্কুলে পড়লে হয়তো পুরো ধারণাটাই বদলে যেত। বদলে যেত আমার চেতনা। কিন্তু হয় নি। তা আমি পরে বুঝতে পেরেছি। আদিবাসী সম্প্রদায়ের মধ্যে কংগ্রেসের মনোভাব কাজ করত। এই আদিবাসী সম্প্রদায়ের একমাত্র কংগ্রেস 'তানাভাগৎ' গ্রুপ করেছিল। বাকি কোনো রাজনৈতিক দল ওদেরকে নিয়ে তেমন কোনো কাজ করে নি।

সাধারণভাবে আদিবাসী পুরুষদের কৌপিন জাতীয় বস্ত্র ছাড়া কিছুই থাকতো না। পুরুষরা কাঠ কেটে নিয়ে আসতো। রাঁচি শহরের সমস্ত জ্বালানি ওরাই সরবরাহ করত! ওখানে কাজের ব্যাপারে আদিবাসী মেয়ে ও পুরুষদের মধ্যে কোনো ভেদাভেদ ছিল না। অদক্ষ শ্রমিক হিসেবে মেয়েরাই অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করত। মেয়েরা হাটে ঘাস নিয়ে আসতো। স্থায়ী বাজার বলে তেমন কিছু ছিল না। সপ্তাহে দু'দিন ডুরান্ডা হাটে আসতো। সবজি ও অন্যান্য জিনিস নিয়েও আসতো। তখনকার দিনে দৈনিক মজুরি ছিল ৪ আনা। চুক্তি ভিত্তিতে কাজ করত। হাটের ইজারাদাররা এই আদিবাসী সম্প্রদায়ের কাছ থেকে 'তোলা' আদায় করত। এর জন্য বল প্রয়োগও করত। পুলিশের কোনো পাত্তাই ছিল না। যে দামে ওরা ঘাস বিক্রি করত সে তুলনায় তোলার রেট খুব বেশি ছিল। তখন সামনে থেকে ইজারাদারদের চেহারা দেখে খুব ভয় করত। যে আদিবাসী ছেলেরা শিক্ষিত হতো তারা কিংবা কোনো মিশনারির ফাদার, কোনো নেতা কিংবা অন্য কেউই এর প্রতিকারের কথা তেমনভাবে চিন্তা করেনি। এ এক ভয়ঙ্কর সমস্যা ছিল। রাঁচি থেকে পুরুলিয়ায় দিনে একটা করে ট্রেন যাওয়া-আসা করত। সেই ট্রেন অধিকাংশ সময় ভরে থাকতো আসামের দিকে বেরিয়ে যাওয়া অল্প বয়সী (১৭-২০ বছর) আদিবাসী পুরুষ ও মেয়েদের নিয়ে। চা-বাগানের কাজের জন্য এই আদিবাসীদের ব্যবহার করা হতো। এরা ভাবতো একটা নব-জীবনের দিকে যাচ্ছে। আরণ্যক জীবনের কষ্ট থেকে মুক্তি পাওয়ার আশায় দলে দলে চলে যেত। পাহাড়ী জীবনের সে কি কষ্ট তা ভাবা যায় না! অনাহার জীবনকে সবসময় বেঁধে রাখতো।

নারীরা নিজেদের তৈরি কস্তাপেড়ের মোটা (খাটো) শাড়ি পড়তো খুব শালীনতার সঙ্গে। আমার অদ্ভুত লাগতো ওদের দেখে, প্রকৃতির মতোই ওরা মনের দিক দিয়ে নির্মল ছিল বলে আমার মনে হয়। মেয়েরা তাদের শরীর ঢেকে রাখতো একটাই কাপড়ে।

একবার চা-বাগান থেকে একজন আদিবাসী ফিরে এসে আমাদের বাড়ির পাশ দিয়ে যাবার সময় হঠাৎ পড়ে গেল। আমি জিজ্ঞাসা করলাম বাড়ি কোথায়? বলতে পরল না। ওকে আমরা হাসপাতালে নিয়ে গেলাম। সেবা-শুশ্রুষা করা হয়েছিল কিন্তু বাঁচাতে পারিনি। ওদের সমস্ত জীবন-যৌবন চলে যেত এই চা বাগানে কাজ করে। যখন ফিরত তখন নিঃশেষ হয়ে যেতো।

আমাদের বাড়ির পাশে ক্যান্টনমেন্ট মাঠ, তারপরেই আদিবাসীদের গ্রাম ছিল। ভাত ও চাল থেকে এক ধরনের মদ তৈরি হতো, যাকে ওরা বলতো 'হাড়িয়া'। সেই

হাড়িয়া খাওয়া ওদের জীবনযাত্রার সঙ্গে ওঁতোপ্রোতভাবে জড়িত ছিল। কায়িক পরিশ্রম করার জন্য দেহের শক্তির উৎস হিসেবে 'হাড়িয়া' কাজ করত। মেয়ে-পুরুষ আদিবাসীরা অনেক সময় রাস্তার ধারে বেহুঁশ হয়ে পড়ে থাকতো।

যারা হাটে বাজারে কনট্রাক্ট-এ কাজ করতে আসতো তাদের মধ্যে একতা ছিল। এই একতার জন্য কোনো রকম দৈহিক অত্যাচার কিংবা প্রলোভন দেখিয়ে ওদের নিয়ে আসা নিস্ফল হতো। ওদের শরীর-গঠন দেখে মনে হতো সে শরীরটাই হচ্ছে কাজের জন্য।

পলাশ: আপনি আগে বলেছেন যে, হরিপদ দে ছিলেন আপনার দীক্ষা গুরু। হরিপদ দে-র সাথে কিভাবে আলাপ হলো এবং তাঁর সম্বন্ধে যদি কিছু বলেন তা হলে ভালো হয়।

রণেশ: আমি ১৭ বছর বয়সে মেট্রিক পরীক্ষার আগেই হরিপদ দে-র সংস্পর্শে আসি। এই হরিপদ দে হলেন আমার রাজনৈতিক দীক্ষাগুরু।

হরিপদ দে রাঁচির technical school-এ পড়তে আসেন। আমার চেয়ে ৫/৬ বছরের বড় ছিলেন। আমার জীবনে স্বদেশি অভিজ্ঞতা ছিল। হীনু ও ডুরান্ডা বলে রাঁচিতে দুটি পাড়া ছিল। সরকারি কোয়ার্টারগুলো ওখানেই ছিল। আমরা থাকতাম ডুরান্ডায় আর হীনু পাড়ায় থাকতেন হরিপদ দা। এই দুই পাড়ার মধ্যে একটা ছোট নদী ছিল। এই ছোট নদী সুবর্ণরেখায় গিয়ে পড়তো। আমরা হীনুর থিয়েটার ও জিম্‌নেসিয়াম হলে যেতাম। জিম্‌নেসিয়ামের দু'জন শিক্ষকের মধ্যে একজন ছিলেন এই হরিপদ দে। আমরা প্রায় ১০/১৫ জন ছিলাম। হরিপদ দা একদিন আমাকে বললেন যে, এবার থেকে আমরা একটু আলাদাভাবে বসবো। প্রথম মিটিং-এ ৮/১০ জন ছিলাম। সেই সভা থেকে শোষণ, শাসন, অর্থনৈতিক বঞ্চনাদির কথাগুলি জানলাম। এবং সেখান থেকেই সশস্ত্র অভ্যুত্থানের কথা জানলাম। আস্তে আস্তে একটা ইউনিট হতে থাকল। এই বড় ইউনিট হলো রাঁচির 'তরুণ সংঘ'। এই তরুণ সংঘের সদস্যদের মধ্যে প্রতুল মিত্রের নাম উল্লেখযোগ্য। তরুণ সংঘে কুস্তি, ব্যায়াম ও নানাবিধ শরীরচর্চা হতো। তখনও আমি জানতাম না যে অনুশীলন সমিতির সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়ছি। কেননা হরিপদ দা কোনোদিনও কোনো রাজনৈতিক দল কিংবা কোনো রাজনীতির ওপর বিশেষভাবে আলোকপাত করেন নি। ১৯২৭ থেকে ১৯২৯ সাল পর্যন্ত হরিপদ দার সঙ্গে গভীর যোগাযোগ ছিল। পরে হরিপদ দা জামসেদপুরে চলে যান। ১৯৩৪ সালে তিনি আন্তঃপ্রাদেশিক ষড়যন্ত্র মামলায় অভিযুক্ত হয়ে আলিপুর জেলে আটক হন। এই জেল থেকে হরিপদ দা, পূর্ণানন্দ দাশগুপ্ত, নিরঞ্জন ঘোষাল ও আরো দু'একজন প্রাচীর ডিঙিয়ে পালিয়ে যান। পরে সকলেই ধরা পড়েন এবং দীর্ঘমেয়াদী কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়ে আন্দামানে প্রেরিত হন।

রাঁচির তরুণ সংঘের নেতা প্রতুল মিত্র আন্তঃপ্রাদেশিক ষড়যন্ত্র মামলায় অভিযুক্ত হয়ে কারাগারে আটক হন এবং ১৯৩৮ সালে মুক্তি পান। এই প্রতুল চন্দ্রের বাবা ড. পূর্ণচন্দ্র মিত্র সেই সময় রাঁচি কংগ্রেসের নেতা ছিলেন। ড. পূর্ণচন্দ্রের সর্বক্ষণের সহকারী ছিলেন কুঁড়ে পাণ্ডে। এই পরিবারটির কথা যখন মনে হয় তখন সতীনাথ ভাদুড়ীর 'জাগরী' উপন্যাসের কথা মনে পড়ে।

বাঁকুড়া হয়ে কলকাতা

১৯২৯ সালে মেট্রিক পরীক্ষায় পাশ করে বাঁকুড়ার কলেজে পড়তে গেলাম। কেননা রাঁচিতে কোনো ভালো বড় কলেজ ছিল না। বাঁকুড়ার কলেজ হোস্টেলে থাকতাম। এই কলেজে গিয়েই অনুশীলন সমিতির সঙ্গে জড়িয়ে পড়ি। বাঁকুড়ার তৎকালীন বড় নেতা ছিলেন শ্রীঅনিল দাশগুপ্ত। এই অনিল দাশগুপ্ত বাঁকুড়ার অনুশীলন সমিতির চার্জে ছিলেন। সেই সূত্রে হোস্টেলে কানাই রায় বলে আমার থেকে দু'বছরের সিনিয়রকে পেলাম। তখন চারিদিকে আন্দোলন শুরু হয়েছে। যতীন দাশ অনশন করে প্রাণ দেয়ার পর সারা ভারত কেঁপে উঠেছিল। যার ঢেউ বাঁকুড়াতেও এসে পড়ল। এর মধ্যে শুরু হলো ১৯৩০ সালের আইন অমান্য আন্দোলন, চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার দখল, লবণ-এর জন্য সত্যাগ্রহ, মদের দোকান বন্ধ করা ইত্যাদি। কলেজে ধর্মঘট শুরু হল। আমার ওপর কলেজ হোস্টেলের দায়িত্ব ছিল। খুব সক্রিয় ভূমিকায় ছিলাম। কলেজ দীর্ঘদিন বন্ধ থাকল। এই বন্দ্ ডেকেছিল কংগ্রেস ও অন্যান্য রাজনৈতিক দল। সেই সময় কংগ্রেসের দুটি ভাগ হয়ে যায়। সুভাষচন্দ্র বসুর দল, অন্যটি যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্তের অনুগামী দল। যুগান্তর দলের সদস্যরা ছিলেন সুভাষচন্দ্র বসুর পক্ষে। সেই সময় ধর্মঘটের জন্য প্রিন্সিপাল 'ব্রাউন' সাহেব ১৯৩০ সালে আমাদের ১৬ জন ছাত্রকে কলেজ থেকে বহিষ্কার করলেন।

এই ধর্মঘটের মাঝখানে শান্তিদি অর্থাৎ শান্তি দাশ (পরবর্তীকালে হুমায়ুন কবীরের স্ত্রী) কলেজের গেটে এসে পিকেটিং পরিচালনা করেন। এই সব দেখে 'ব্রাউন' সাহেব কলেজ বন্ধ করে দিয়ে আমাদের বাড়ি পাঠিয়ে দিলেন।

বাঁকুড়া কলেজ থেকে বহিস্কৃত হওয়ার পর ১৯৩০ সালের আগস্ট মাসে বাবার সঙ্গে কলকাতা এসে সিটি কলেজে ভর্তি হই। ব্রাহ্ম কলেজ হওয়ার জন্য ভর্তি হওয়ার সুযোগ পেলাম। শ্রীব্রজসুন্দর রায় দূর সম্পর্কে আমার ভগ্নিপতি ছিলেন। সেই সময় Expelled Certificate নিয়ে ভর্তি হওয়ার কোথাও কোনো সুযোগ ছিল না। আমি রামমোহন রায় হোস্টেলে থাকতাম। মাসে ১০ টাকা করে লাগত। কলেজের সেকেন্ড ইয়ারে ভর্তি হলাম। মানিক বন্দোপাধ্যায়ের সঙ্গে আমার যোগাযোগ হয় সিটি কলেজে। মানিক বন্দোপাধ্যায় অন্য কলেজ ছেড়ে আমাদের সিটি কলেজে ভর্তি হয়েছিল।

সিটি কলেজে পড়াশুনা চলাকালীন অনুশীলন সমিতির অনিল দাশগুপ্ত আবার যোগাযোগ শুরু করলেন। কানাই-দা (কানাই রায়) বাঁকুড়া কলেজ থেকে B.Sc করে M.Sc-তে ভর্তি হন। সুতরাং আমাদের পুরোনো যোগাযোগ বাড়তে থাকে। কানাইদা খুব ভালো ছাত্র ছিলেন। পরে ডক্টরেট করে ১৯৩৫ সালে জার্মানিতে চলে যান।

অনুশীলন সমিতি 'যুগবাণী' সাহিত্যচক্র ছিল বেচু চ্যাটার্জি স্ট্রিটে একটা ছোট্ট দোকানের মধ্যে। সেখানে আমরা আলাপ আলোচনার জন্য আসতাম। যুগান্তর দলের আস্তানা ছিল কলেজ স্ট্রিটের সরস্বতী লাইব্রেরি। যুগবাণী সাহিত্যচক্রে শ্রীদেবজ্যোতি বর্মণ আসতেন। ইনি সাতটি বিষয়ে এম.এ পাশ করেন। এখান থেকে শ্রীবর্মণের 'কার্ল মার্কস' বইটি প্রকাশিত হয়। এই অনুশীলন সমিতির আড্ডাতেই কৃষক, শ্রমজীবী মানুষ, সোভিয়েত রাশিয়ার বিষয়গুলো এসে পড়ে। এই আড্ডাতেই সান্ত্বনা গুহ বলে একজন তরুণ সাহিত্যিকের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল। শান্তি নিকেতনে পড়াশোনা করত।

ওর লেখা পড়ে মহিলা সাহিত্যিক ভেবে বুদ্ধদেব বসু খুব প্রশংসা করেছিলেন। বইটির নাম ছিল *'অগ্নিমন্ত্রে নারী'*। এই সান্ত্বনা গুহ আমার সমবয়সী ছিল। দেবজ্যোতি বর্মণ আমাকে সান্ত্বনার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেয়। পরবর্তীকালে জানতে পারি, ১৯৩২ সালে আইন ভঙ্গের জন্য সান্ত্বনা গুহ কারাবরণ করে। বীরভূম জেলে ছিল এবং ডিসেন্ট্রির জন্য মারা যায়। এখনো ওর কথা মনে পড়ে। সুপুরুষ চেহারা ছিল। শ্যামবর্ণ রঙ হলেও বুদ্ধিদীপ্ত চেহারা ছিল। রবীন্দ্রনাথের প্রিয়পাত্র ছিল বলেও শুনেছি।

যুগান্তর দলের অন্যতম সাহিত্যিক মুখপত্র ছিল স্বাধীনতা। সেই সময় স্বাধীনতা পত্রিকা যুব সম্প্রদায়ের মধ্যে দারুণ প্রভাব ফেলেছিল। ১৯৩০ সালের এপ্রিলের শেষ সপ্তাহে চট্টগ্রামের অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের পর স্বাধীনতায় একটি জোরালো সম্পাদকীয় লেখা হয়, "ধন্য চট্টগ্রাম কি দেখাইলে!" এই সম্পাদকীয়ের জন্য কাগজটি বাজেয়াপ্ত করা হয়। এরপরে বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু অনুশীলন পার্টির কোলকাতায় কোনো মুখপত্র ছিল না। একমাত্র ঢাকা থেকে নলিনীকিশোর গুহ-র সম্পাদনায় 'সোনার বাংলা' প্রকাশিত হতো। কলেজে পড়ার সময় যুগান্তর দলের স্বাধীনতা পত্রিকার তরুণ সাহিত্যিক বিমল সেনের লেখার সঙ্গে আমার পরিচয় হয়। ঐ সময় ম্যাক্সিম গোর্কির 'মা'-এর বাংলায় সংক্ষিপ্ত অনুবাদ করেছিলেন বিমল সেন। আমি বুঝতে পেরেছিলাম সোভিয়েত দেশে সাহিত্য ও রাজনীতির আদর্শ এই দুই দলের মধ্যে ছড়িয়ে রয়েছে।

মানবেন্দ্রনাথ রায় সেই সময় আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট সংগঠনের নেতৃস্থানীয় ছিলেন। বিশের দশক থেকে মানবেন্দ্রনাথ রায় অনুশীলন ও যুগান্তর দুই দলকে নিজের দিকে আনতে চেষ্টা করেছিলেন। সেই জন্য তিনি রাশিয়া থেকে নলিনী দাশগুপ্তকে (নলিনী গুপ্ত) জাহাজের খালাসী করে ১৯২৪/২৫ সালে ভারতবর্ষে পাঠান। তিনি ভারতবর্ষে এসে মুজাফ্ফর আহ্মদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। কানপুরে কমিউনিস্ট পার্টির কংগ্রেস হয়। এরপর কানপুর ষড়যন্ত্র মামলা শুরু হয় এবং নেতৃস্থানীয় সবাইকে গ্রেপ্তার করা হয়। এই মামলায় শওকত ওসমানী, নলিনী গুপ্ত, এস.এ. ডাঙ্গে, মুজাফ্ফর আহ্মদ ও আরো অনেককে গ্রেপ্তার হয়। মানবেন্দ্রনাথ রায়ও আসামি ছিলেন। নলিনী গুপ্তের সঙ্গে অবনী মুখার্জিও ভারতবর্ষে আসেন। অবনী মুখার্জি প্রধানত অনুশীলন দলের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। এই অবনী মুখার্জির সঙ্গে যোগাযোগের ফলেই গোপেন চক্রবর্তী মস্কোতে যান। অনুশীলন ও যুগান্তর দলের উভয়ের লক্ষ্য ছিল সশস্ত্র অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে দেশের স্বাধীনতা আনা। তখনকার অনুশীলন সমিতির একজন তরুণ উদীয়মান ছাত্রনেতা পুলকেশ দে সরকার সেই সময় 'বিপ্লবী অবনী মুখার্জি' বলে একটি বই লেখেন। এই প্রসঙ্গে আর একজনের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করা প্রয়োজন। তিনি হলেন ড. ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত। যিনি যুগান্তর দলের সক্রিয় কর্মী ও নেতা ছিলেন।

ড. ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত ১৯১৯-২০ সাল নাগাদ বার্লিন হয়ে মস্কোতে যান। ১৯২৪ সাল নাগাদ মস্কো থেকে ভারতবর্ষে ফিরে আসেন। তিনি ভারতবর্ষে এসে শ্রমিক ও কৃষকদের মধ্যে যুগান্তর দলের বেশ কিছু কর্মীকে নিয়ে কাজ আরম্ভ করেছিলেন। সেই সময় ভূপেন দত্ত নিজ দলীয় গণ্ডিতে কাজ করতে থাকেন। প্রধানত হুগলী ও চব্বিশ পরগনায় তিনি প্রচুর কাজ করেছিলেন এবং বেশ কিছু সংখ্যক শ্রমিক ও কৃষক নিয়ে আলাদা আলাদাভাবে শ্রমিক সংগঠন ও কৃষক সংগঠন গড়েছিলেন।

রুশ বিপ্লবের পর আমাদের দেশে অগ্নিযুগের দলের মধ্যেও তৃতীয় পথের (মার্কসবাদ) প্রভাব পড়তে থাকে। উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য এক থাকা সত্ত্বেও যুগান্তর ও অনুশীলন কখনো একই প্ল্যাটফর্মে কাজ করতে চায় নি। যুগান্তর ও অনুশীলন দলের মধ্যে সমাজতন্ত্রকে মোটামুটিভাবে কমবেশি গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু একটি বিপ্লবী দল আদর্শগতভাবে কমিউনিজমের ও সমাজতন্ত্রের বিরোধী ছিল। তারা হলো বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্স কোর ও শ্রীসংঘ। এই দলের নেতারা ছিলেন মেজর সত্য গুহ, ভূপেন্দ্রকিশোর রক্ষিত রায়। এদের মাসিক পত্রিকার নাম ছিল 'রেণু'। এরা সশস্ত্র অভ্যুত্থান ছাড়া কিছুই বুঝতো না। বিনয়, বাদল, দীনেশ এই দলেরই সদস্য ছিল। দার্জিলিং-এ অ্যান্ডারসনকে হত্যা করার পরিকল্পনার অন্যতম নায়িকা ছিলেন উজ্জ্বলা মজুমদার। ইনি পরে ভূপেন্দ্রকিশোর রক্ষিত রায়কে বিয়ে করেন। এদের ধারণা ছিল সোশ্যালিস্টরা দলে ঢুকলে দল ভেঙে দেবে। 'রেণু' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন ভূপেন্দ্রকিশোর রক্ষিত রায়। লীলা রায়ের উদ্যোগে 'জয়শ্রী' পত্রিকা প্রকাশিত হয়। দুটি পত্রিকায় ঢাকা থেকে বের হত। 'রেণু' পত্রিকাতে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাঁর *'বিপ্রদাস'* উপন্যাসটি লিখতে শুরু করেছিলেন। পরে ১৯৩১-৩২ সালে 'রেণু' পত্রিকা বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু 'জয়শ্রী' প্রকাশিত হতে থাকে। 'রেণু' তখন বাংলার যৌবনের মাসিক মুখপত্র হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল। স্বামী বিবেকানন্দের ছোট ভাই মহেন্দ্রনাথ দত্ত একসময় ছদ্মনামে 'সুদূরের চিঠি (?)' বলে কাব্যিক লেখা লিখতেন। *'বিপ্রদাসের'* কয়েকটি অংশ এই পত্রিকায় প্রকাশিত হওয়ার পর বন্ধ হয়ে যায়। পরে 'বিচিত্রা' পত্রিকায় *'বিপ্রদাস'* প্রকাশিত হয়।

প্রবাসী, ভারতবর্ষ, মাসিক বসুমতী ও বিচিত্রা ছাড়া ঐ পত্রিকাগুলোও প্রকাশিত হতো। ঢাকা থেকে বিশের দশকে বুদ্ধদেব বসুর সম্পাদনায় প্রগতি প্রকাশিত হতো। সম্পাদকদ্বয় ছিলেন বুদ্ধদেব বসু ও অজিত দত্ত। ওরা দুজনই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলেন।

আমার প্রিয় কবি ছিলেন বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়। তাঁর 'সব হারাদের গান' ও নজরুলের 'সব্যসাচী' সব সময়ই আবৃত্তি করতাম। শরৎচন্দ্রের 'পথের দাবি' ছিল তখন আমার প্রিয় বই।

সিটি কলেজ থেকে আইএসসি পাশ করলাম ১৯৩১ সালে। ৬ মাস এ কলেজে পড়বার সুযোগ হয়েছিল। মজার কথা হলো, কলেজে পরে ভর্তি হওয়ার জন্য আমার এমন একটা রোল নম্বর হলো যা নিয়ে ক্লাসের শিক্ষক মশাই কৌতুক করতেন। যেমন রোল ডাকতে ডাকতে ১৯৫-এর পর আমার নাম আসতো এবং আমার রোল নম্বর ছিল ৬০৪। এই ১৯৫ ও ৬০৪-এর ফারাক এতো বেশি হওয়ার কারণ আমি পরে এসে ভর্তি হই। একবার টেস্ট পরীক্ষায় ৪০ নম্বরের উত্তর দিয়ে চলে আসি। তার জন্য অধ্যাপক মহাশয় ডেকে জিগ্যেস করলেন, তোমার মতলব কি? এটা ঠিক নয়। ফাইনালে সমস্ত লিখতে হবে এবং কোয়েশ্চান করে দিলেন। সেই সময় অধ্যাপকরা প্রতিটি ছাত্রের ওপর দারুণভাবে নজর রাখতেন।

রামমোহন রায় হোস্টেলে থাকতাম। শ্রীনির্মল চক্রবর্তী সেই সময়ে হোস্টেলের সুপার ছিলেন। একদিন সকালে এসে বললেন যে হোস্টেল সার্চ হবে। আমার কাছে

তখন অনুশীলন সমিতির প্রচুর বই ছিল। উনি দেখে সব বই নিজের বাড়িতে নিয়ে রাখলেন। পুলিশ এসে কিছু পায় নি। পরে অবশ্য একটা সূত্র ধরে পুলিশ নির্মল বাবুর বাড়িতে সার্চ করতে যায় এবং নির্মল বাবু বইগুলো অন্য বাড়ির ছাদে ফেলে রেহাই পান। তারপর আমাকে বুঝিয়ে বললেন যে বইগুলো সরিয়ে ফেলো এবং বই-এর ভার থেকে মুক্তি দাও। আমি তারপর বইগুলো দিয়ে আসি। এরপর কি হলো জানো? আমার বাবার কাছে সবকিছুর রিপোর্ট গেল। তখন বাবা আমাকে ১৯৩১ সালের জুলাই মাসে বরিশালে পাঠালেন।

বরিশালের জীবন

বরিশালের বাসায় জ্যাঠামশাই সত্যানন্দ দাশ, জেঠিমা কুসুমকুমারী দাশ, সুচরিতা (জীবনান্দ দাশের বোন) কমলা দাশ (আর এক জ্যাঠামশাই অতুলানন্দ দাশের মেয়ে), জীবনানন্দ দাশ ও তার স্ত্রী লাবণ্যপ্রভা দাশ থাকতেন। জীবনানন্দ দাশের সবেমাত্র বিয়ে হয়েছিল। ঐ দুই বোন ও বৌদির ভালোবাসা ও স্নেহ দারুণভাবে পেয়েছিলাম। জীবনানন্দ দাশ তখন সম্পূর্ণভাবে বেকার ছিলেন। এই জ্যাঠামশাইয়ের পরিবার ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষিত ছিল। আমি তারপর ইংরেজিতে অনার্স নিয়ে বরিশালের ব্রজমোহন কলেজে বিএ-তে ভর্তি হই। জ্যাঠামশাইয়ের বাড়িতে তিন মাস ছিলাম। অন্যান্য জ্যাঠামশাইরা সমস্ত দিক দিয়ে আমাদের ব্যাপারে খুবই আন্তরিক ছিলেন।

এই কলেজে পড়তে পড়তে আবার সেই বিপ্লবীদের সঙ্গে যোগাযোগ শুরু হল। আমি যে ঘরে থাকতাম সে ঘরটি আলোচনার জায়গা হয়ে উঠল। বিপ্লবী বন্ধুদের মধ্যে সুবোধ রায় বলে একজন ছিল, যার মধ্যে আমি বিরাট সম্ভাবনার প্রকাশ দেখতে পেয়েছিলাম। সুবোধ রায় আমার থেকে এক ক্লাস উঁচুতে পড়তো। তার কথা আমার মনের মধ্যে গেঁথে রয়েছে।

জ্যাঠামশাইরা প্রত্যক্ষভাবে রাজনীতি করতেন না। যেহেতু আমার সঙ্গে বিপ্লবীদের যোগাযোগ ছিল তাই পুলিশ নজর দিল। জ্যাঠামশাই শিক্ষকতা করতেন। তিনি ব্রজমোহন স্কুলের প্রধান শিক্ষক ছিলেন। জ্যাঠামশাইদের অন্যান্য ভাইরা উঁচু পোস্টে কাজ করতেন। একমাত্র ছোটজন ছাড়া। তার মধ্যে অতুলানন্দ দাশ ছিলেন আইএফএস, প্রেমানন্দ দাশ আইএমএস এবং যোগানন্দ দাশ ছিলেন এক্সাইজ সুপারিনটেনডেন্ট। এই পরিবারের মধ্যে থেকেই স্থানীয় বিপ্লবীদের সঙ্গে যোগাযোগ চলছে। পুলিশ থেকে জ্যাঠামশাইদের কাছে রিপোর্ট করল। আমাকে তখন বিএম কলেজের হোস্টেলে চলে যেতে হল।

আমি একবার কলকাতায় এলাম। তখন যোগানন্দ জ্যাঠামশাই বললেন যে, বৌদিকে (জীবনানন্দের স্ত্রী) নিয়ে বরিশালে যেতে হবে। ওরা শিয়ালদহ স্টেশনে অপেক্ষা করছিলেন। বৌদির শিয়ালদহ স্টেশনে আসার কথা ছিল। আমি বৌদিকে খুঁজতে খুঁজতে একটা কামরার সামনে চলে এলাম। সেখানে যোগানন্দ দাশ দাঁড়িয়ে ছিলেন। বৌদি আমাকে ইশারায় প্রণাম করতে বললেন। আমি খুবই উদ্ধত ছিলাম। কিছুতেই প্রণাম করছিলাম না। তখন যোগানন্দ দাশ বললেন, 'ওকি প্রণাম করবে? ও তো বলশেভিক্'। তখন বলশেভিকদের ব্যাপারটা ভালো করে বুঝে উঠি নি।

সোভিয়েত দেশের সংবাদ খুব বেশি একটা না এলেও চিন্তায় ও মননে সোভিয়েত ঘোরাফেরা করত। বিশেষ করে রবীন্দ্রনাথের *'রাশিয়ার চিঠি'* পড়ার পর।

জ্যাঠামশাই যোগানন্দ দাশের বড় ছেলে নির্মলানন্দ দাশ ১৯২০ সাল নাগাদ বিলেতে পড়তে যায়। সেখানকার একটি থিয়েটার দলে যোগ দিয়ে আমেরিকায় চলে যায়। তারপর সে কোনোদিন ফিরে আসে নি এবং কোনো খবরও পাওয়া যায় নি। এই আঘাত জ্যাঠামশাইয়ের মনে মৃত্যুর শেষদিন পর্যন্ত ছিল। নির্মল দা আমার চাইতে ১০/১১ বছরের বড় ছিলেন।

১৯৩১ সালে কলেজে ঢুকবার পরেই সহপাঠী একজনের সঙ্গে বিশেষ ঘনিষ্ঠতা হয়। তার নাম হিমাংশু দাশগুপ্ত। তার বড় ভাই সুধাংশু দাশগুপ্ত মেছুয়াবাজার বোমার মামলায় ধরা পড়ে জেলে যান। ছোট ভাই প্রেমাংশু দাশগুপ্ত, সেও বিপ্লবীদের সঙ্গে জড়িত থাকার সুবাদে জেলে ছিল। প্রেমাংশুর ডাকনাম ছিল কিষণ। বাবা মতিলাল দাশগুপ্ত কবিরাজ ছিলেন। ওদের এক বোনকে বিয়ে করেন অধীর চক্রবর্তী। আমি হিমাংশু দাশগুপ্তের বাড়িতে প্রায়ই যেতাম। ওর বাবার ডিস্‌পেন্সারিতে মাঝে মাঝে যেতাম। তখন ওর বাবা বলতেন যে, 'তুমি কী হে! তুমি কি এই পোনাটারেও জেলে ঢোকাবা?' হিমাংশুর মারফত কলেজের আরো কয়েকটি ছেলের সঙ্গে যোগাযোগ হয়। যেমন মতি মৌলিক, অমৃত নাগ, সত্য সেন, প্রমথ সেনগুপ্ত, কৃষ্ণ চ্যাটার্জি এবং সেই সূত্রেই শান্তিসুধা ঘোষ ও মনিকুন্তলা সেনের সঙ্গে পরিচয় হয়। এদের সহায়তায় প্রথম বরিশালে 'মার্কসীয় গ্রুপ' তৈরি হয়। এই গ্রুপের তরফ থেকে একটি হাতে লেখা পত্রিকা বের করা হয়। পত্রিকার নাম ছিল 'জাগরণী'। এই পত্রিকায় যারা লিখতেন তাদের মধ্যে শান্তিসুধা ঘোষ ও মনিকুন্তলা সেন ছিলেন। ওরা তখন ছাত্রী। জাগরণী পত্রিকায় যারা হাতে লিখে সাহায্য করতেন তারা ছিলেন আমার দুই বোন সুচরিতা ও কমলা।

আমার বন্ধু হিমাংশু দাশগুপ্তকে ১৯৩২ সালের প্রথমে জেলে নিয়ে গেল। সুতরাং ওরা তিন ভাই জেলে থাকল। হিমাংশু জেল থেকে বিএ ও এমএ পরীক্ষা দেয় এবং ভালোভাবে পাশ করে। তারপর এজি অফিসে ঢুকল। আমি যখন ১৯৩১ সালে কলকাতায় এলাম তখন একদিন হিমাংশু এসে হাজির। তখনো এজি বেঙ্গল-এর চাকুরি করছে। তারপর আর দেখা হয় নি। ডোয়ার্কিন এন্ড সন্স কোম্পানির মালিকের দুই মেয়েকে ওরা দুই ভাই অর্থাৎ সুধাংশু দাশগুপ্ত ও প্রেমাংশু দাশগুপ্ত বিয়ে করেন।

সেই সময়ে অমিয় দাশগুপ্ত মহারাজ আমাদের সংস্পর্শে আসেন এবং উনি তখন বিখ্যাত ছাত্র, পরে অধ্যাপক সমিতির সাধারণ সম্পাদক হন। ম্যাট্রিক পরীক্ষায় ফোর্থ হয়েছিলেন। আবার এই সময়েই তাকে জেলে যেতে হয় এবং পরে ছাড়া পান। এই অমিয় দাশগুপ্ত পরে দেখা হওয়ার পর আমাকে বলেছিলেন যে, আপনার কাছ থেকেই প্রথম মার্কসের নাম শুনেছিলাম। কিন্তু আমার বিদ্যা তখন একটি মাত্র বই দেবজ্যোতি বর্মণের কার্ল মার্কস, এই দেবজ্যোতি বর্মণ জেলে গিয়ে সাতটি বিষয়ে এমএ পাশ করেন। তিনিই প্রথম বাংলা ভাষায় কার্ল মার্কসের ওপর পূর্ণাঙ্গ বই লিখেছিলেন।

আমার দিদি মাঝে মাঝে ঢাকা শহরের রামকৃষ্ণ মিশন রোডে আমাদের মামার বাড়িতে যেতেন। এটা আমাদের দাদামশাইয়ের বাড়ি। দাদামশাই রিটায়ার করার পর

ঢাকায় বাড়ি করেন। ওখানে আমাদের পিসতুতো ভাইদেরও বাড়ি ছিল। ঐ বাড়িতে গিয়ে আমার দিদি প্রতিভা সেনগুপ্তা (ডলি) দেশাত্মবোধক গান শিখে আসতো। রজনীকান্ত, অতুলপ্রসাদ ও রবীন্দ্রনাথের গান গাওয়া হতো। রজনীকান্ত সেনের গান বিশেষভাবে মানুষের মুখে মুখে ঘুরত। এইভাবে স্বদেশি গানের প্রভাব আমাদের মধ্যেও পড়ে।

কলকাতার সিটি কলেজ থেকে পাশ করার পর বরিশাল কলেজে ইংরেজি অনার্স নিয়ে বিএ পড়তে শুরু করলাম। আমি যখন কলেজ হোস্টেলে থাকি সেই সময় সমস্ত দেশজুড়ে রবীন্দ্রজয়ন্তী অনুষ্ঠান শুরু হলো কবিগুরুর ৭০ বছর পূর্তি উপলক্ষে। আমি সেবার হোস্টেলে অনুষ্ঠিত একটি সভায় রবীন্দ্রনাথকে নিবেদিত স্বরচিত কবিতা পড়ি। তারপর থেকেই বরিশালের নবীন কবিদের একজন হয়ে গেলাম। বিভিন্ন জায়গা থেকে কবিতা পড়ার আমন্ত্রণ পেতে থাকলাম। এই কবিতা পাঠ নিয়ে একটি অদ্ভুত ঘটনা ঘটেছিল। বরিশালে 'সারস্বত সমাজ'-এর হলঘরে আয়োজিত হয়েছিল 'গীতা জয়ন্তী'। আমাকে গীতার ওপর স্বরচিত কবিতা পাঠের আমন্ত্রণ জানানো হল। আমি যথারীতি আমার চিন্তাধারা অনুযায়ী একটি কবিতা লিখে নিয়ে গেলাম। সভা রীতিমত জনাকীর্ণ ছিল। সভাপতি ছিলেন বরিশালের রাশভারি উকিল রায়বাহাদুর গণেশ দাশগুপ্ত। আমি কিছুক্ষণ কবিতা পড়ার পর পেছন থেকে বলতে শুনলাম, 'ও মশায়! ও মশায়!' প্রথমে বুঝতে পারি নি যে আমার উদ্দেশ্যেই বলছেন। কেননা এই রকম ডাক শুনতে অভ্যস্ত ছিলাম না। আবার যখন কয়েকবার ডাক শুনলাম, পেছন ফিরে দেখলাম যে সভাপতি মহাশয় আমার দিকে তাকিয়েই বলছেন। আমি থেমে জিগ্যেস করাতে উনি বললেন যে, এটা রজনীতির সভা নয়! আপনি পড়া বন্ধ করুন। বলাবাহুল্য আমি বিপ্লবের কথাই বলছিলাম গীতার ভাষ্য হিসেবে। সেই কথা শুনে আমি কবিতাটি সম্পূর্ণ না পড়ে নেমে এলাম এবং বললাম যে আমি চললাম। ব্যাপারটি কিন্তু সেখানেই শেষ হলো না। আমি বেরিয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই হল প্রায় খালি হয়ে গেল। যাঁরা এইভাবে প্রতিবাদ করে বেরিয়ে এলেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন বরিশাল রামকৃষ্ণ মিশনের অধ্যক্ষ স্বামী জ্ঞানাত্মানন্দ সুধীর মহারাজ। স্বামী জ্ঞানাত্মানন্দই পরে কলকাতার গোলপার্কের রামকৃষ্ণ ইনস্টিটিউটের প্রথম অধ্যক্ষ হন। তিনি এক সময় রেভলিউশন সেল-এর বন্দী ছিলেন। তাঁর বরিশালে থাকার সময় রামকৃষ্ণ মিশনে যাতায়াত আরম্ভ করেছিলাম। এই প্রতিষ্ঠানটিতে সেই সময়ে সমস্ত রাজনীতি সচেতন ছাত্ররা যাতায়াত করত। মিশনের ঠিক উল্টো দিকেই ছিল 'শঙ্কর মঠ'। এটি 'যুগান্তর বিপ্লবী গোষ্ঠী'র একটি বিশিষ্ট সংগঠন ছিল। রামকৃষ্ণ মিশনে যাতায়াতের ফলে আমি স্বামী জ্ঞানাত্মানন্দের বিশেষ স্নেহভাজন হয়ে পড়েছিলাম। এই সূত্রেই তিনি সেদিন ঐ সভা থেকে বেরিয়ে এসেছিলেন। তিনি অবশ্য এর পরে আমাকে ডেকে পাঠান। আমি গিয়ে দেখি যে আমাদের কলেজের প্রিন্সিপ্যাল সতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সেখানে উপস্থিত। তিনিও একসময় রাজনৈতিক কারণে বার্মায় নির্বাসিত ছিলেন। ওঁরা দুজনে প্রস্তাব করলেন যে আমার কবিতা পাঠের একটি সভার আয়োজন করবেন। প্রিন্সিপাল আমার কবিতার খুব প্রশংসা করলেন এবং বললেন নতুন করে আর একটি কবিতা লিখে সভায় পাঠ করতে। আমার বিতর্কিত কবিতাটি পাঠ করার ঝুঁকি নিতে চাইলেন না। আমি রাজি হলাম না।

আমি বললাম, এ কবিতাটি যদি পড়তে না দেন তবে অন্যভাবে লিখে কবিতা পাঠে আমি রাজি নই। সুতরাং ঘটনাটির পরিসমাপ্তি ঘটলো সেইভাবেই। বস্তুতপক্ষে তখন আমি নতুন একটা ছোটখাটো রাজনৈতিক গ্রুপের একজন প্রধান হয়ে উঠেছি। এই গ্রুপটির নাম ছিল জাগরণী গোষ্ঠী। এর কিছু কথা আগে বলেছি। এই গ্রুপ থেকে হাতে লেখা পত্রিকা প্রকাশিত হতো। আমি বরিশাল ছেড়ে আসার পরে জাগরণী গোষ্ঠী কলকাতায় সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সাথে যোগাযোগ করে সম্পর্ক স্থাপন করে। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই মেছুয়াবাজার বোমা মামলায় অন্যতম অভিযুক্ত ও দণ্ডিত বিপ্লবী নেতা মুকুল সেন আন্দামানে টি.বি-তে আক্রান্ত হয়ে জেল থেকে বেরিয়ে আসার পরে বরিশালে 'হোম ইন্টার্ন' থাকা অবস্থায় জাগরণী গোষ্ঠীর প্রধান উপদেষ্টা হয়ে দাঁড়ান। মুকুল সেন এবং অন্য যারা সে সময় আন্দামানে কমিউনিস্ট মতাদর্শ গ্রহণ করেছিলেন তাঁরা তখন আব্দুল হালিম ও সরোজ মুখার্জি গ্রুপের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন। এইভাবেই শেষ পর্যন্ত জাগরণী গোষ্ঠী ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির বরিশাল জেলার প্রধান শাখা প্রতিষ্ঠান হয়ে দাঁড়ায়। তিরিশের দশক ধরেই জাগরণী গোষ্ঠীর সদস্যরা কলকাতায় বসবাস করার সময় সৌমেন ঠাকুর ও আব্দুল হালিম উভয়ের সাথেই যোগাযোগ রাখতো। এই গ্রুপের মধ্যে কয়েকজনের কথা তোমায় বলেছি। যেমন অমৃত নাগ, মতি মৌলিক, কৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়, প্রমথনাথ সেনগুপ্ত, মনিকুন্তলা সেন এবং প্রেমাংশু দাশগুপ্ত (কিষণ)। এই প্রেমাংশু দাশগুপ্ত পরবর্তীকালে 'কলকাতা ট্রাম শ্রমিক ইউনিয়ন' গড়ে তোলার ব্যাপারে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছিল। মতি মৌলিক–১৯৩৬ সালে কলকাতায় 'নিখিল ভারত কৃষক সভা'র প্রতিটি সম্মেলনের উদ্যোগ আয়োজনে অংশ নিয়েছিলেন। অমৃত নাগ–কলকাতা থেকে বরিশাল ফিরে যান এবং বরিশালের কমিউনিস্ট পার্টির প্রধান সংগঠক হয়ে পড়েন। মনিকুন্তলা সেন–পরবর্তীকালে কলকাতা কমিউনিস্ট পার্টির অন্যতম নেত্রী হয়ে ওঠেন। প্রমথনাথ সেনগুপ্ত ও কৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় অধ্যাপনার ক্ষেত্রে বিশেষ স্থান গ্রহণ করেছিলেন এবং বুদ্ধিজীবী হিসেবে কমিউনিস্ট আন্দোলনে বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন।

এই গ্রুপের সঙ্গে সংযোগ ঘটেছিল তরুণ ছাত্র বীরেন রায়ের (ভোলা)। এই বীরেন রায় পরবর্তীকালে কলকাতা এসে শ্রমিক আন্দোলন ও সংগঠনের কাজে লেগে যান। পরে করপোরেশন শ্রমিকদের কেন্দ্রীয় সংগঠন গড়ে তোলেন। এই সময়েই জাগরণী গ্রুপের সঙ্গে আর একজন ছাত্র যুক্ত হয়েছিল। তার নাম করুণাকর গুপ্ত। বীরেন রায়, করুণাকর গুপ্ত ও অন্যেরা মুকুল সেনের পরিচালনাতেই কাজকর্ম করেছিল।

বরিশালে থাকার সময় চট্টগ্রামের ঘটনা ঘটে গেছে এবং সূর্য সেন ও তাঁর সঙ্গীরা চট্টগ্রামের গ্রামাঞ্চলে অবস্থান নিয়ে গোপনে সশস্ত্র সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছেন। বরিশালে গান্ধীজির আন্দোলনের মূল ধারক ও বাহক ছিলেন সতীন সেন। সতীন সেনের মেজাজে গান্ধীবাদের সঙ্গে মিল না থাকলেও জেলখানায় ধর্মঘট করার ব্যাপারে গান্ধীজিকে অনেকখানি ছাড়িয়ে গিয়েছিলেন। ইনি 'তরুণ সংঘ' নাম দিয়ে একটি সংগ্রামী সংগঠন করেছিলেন। কলকাতার শ্রমিক নেতা নীরেন ঘোষ এই তরুণ সংঘের সদস্য ছিলেন। সতীন সেন যে কোনো ব্যাপারে অনশন করে বসে থাকতেন।

পরবর্তীকালে দেশ বিভাগের পর কংগ্রেসী হিসেবে বরিশালের এম.এল.এ হয়েছিলেন। '৫২ এর ভাষা আন্দোলনে গ্রেফতার হয়েছিলেন এবং '৫৪ সালে যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রীসভা ভেঙে দেওয়ার পর তাঁকে আবার গ্রেফতার করা হয়। ১৯৫৫ সালে জেলে গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং যেদিন চিকিৎসার জন্য বাইরের হাসপাতালে পাঠানো হয় সেদিন উনি মারা যান। তখন তাঁর বয়স প্রায় ৬৫ বছর। ইনি সব সময় সরকারকে আন্দোলনের মধ্য দিয়ে ব্যতিব্যস্ত রাখতে পারতেন। তখনকার বরিশালে সতীন সেনের কর্মকাণ্ডের পাশাপাশি যুগান্তরের শঙ্কর মঠের গ্রুপের বিপ্লবীরা গ্রেফতার এড়িয়ে বিভিন্ন জায়গায় কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হতেন। এঁদের একজন ছিলেন নলিনী দাশ। সেই সময়কার অনেকে নলিনী দাশকে সূর্য সেনের সঙ্গে তুলনা করতেন। এই নলিনী দাশ ১৯৩৪ সালে কর্নওয়ালিস স্ট্রিটে পুলিশের সাথে খণ্ডযুদ্ধ চালাবার পর দীনেশ মজুমদারের সঙ্গে গ্রেফতার হন। ১৯৩১-৩২ সালে বরিশাল জেলে মাদারিপুরের বিপ্লবী মনোরঞ্জন ভট্টাচার্যের ফাঁসি হয়। এইসব কিছু মিলিয়ে বরিশালে তখন রাজনৈতিক দিক দিয়ে উত্তপ্ত আবহাওয়া জারি ছিল।

সাংস্কৃতিক দিক দিয়ে বলতে গেলে বরিশাল ব্রাহ্মসমাজে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন আয়োজনেই জীবন্ত ছিল। এই অনুষ্ঠানগুলোতে ব্রাহ্মসমাজ ভুক্ত নন এমন অনেকেই যোগদান করতেন। তখন বরিশালে 'সারথি' নামে কবিসাহিত্যিকদের একটি পত্রিকা ছিল। এই সারথির কবিরাই বিভিন্ন অনুষ্ঠানে কবিতা পড়তেন। কবি জীবনানন্দ দাশ বরিশালে থাকলেও কোনদিন এই ধরনের অনুষ্ঠানে কবিতা পড়েন নি। এই সময়ে তাঁর কবিতা *'পরিচয়'* পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। জীবনানন্দ দাশের কবিতা নিয়ে বুদ্ধদেব বসু ও কবি অজিত দত্ত তাঁদের সম্পাদিত *'প্রগতি'* পত্রিকাতে আগে থেকেই বেশ কয়েকবার আলোচনা করেছিলেন এবং রবীন্দ্রোত্তর কবিদের মধ্যে জীবনানন্দ দাশকে প্রথম সারিতে রাখেন এবং কাব্য সাহিত্যের সেরা বাস্তববাদী প্রবক্তা হিসেবে ভাওয়ালের কবি গোবিন্দচন্দ্র দাশকে উপস্থিত করেন। জীবনানন্দ দাশের 'উত্তর-সাগরে কাচের গুঁড়ির মত শিশিরের জল যেথা ঝরে' *(ধূসর পাণ্ডুলিপি)* কবিতাটি সেই সময়ে খুব আলোচিত হয়েছিল। এক অভিনব নতুন শব্দ প্রয়োগ এবং চিত্রকল্প আনতে পেরেছিলেন বলে জীবনানন্দ দাশকে প্রথম সারির কবি হিসেবে চিহ্নিত করেছিলেন। সেই সময় *'শনিবারের চিঠি'*তে তাঁর কবিতা নিয়ে নানা রকম ঠাট্টা বিদ্রূপ করা হয়েছিল, কিন্তু কবি কোনদিনই বিচলিত হন নি। তিনি তাঁর কবিতাকে নতুন নতুন পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্য দিয়ে অবিশ্রান্তভাবে উত্তীর্ণ করেছিলেন। ১৯৩১ সালে 'পরিচয়' পত্রিকায় তাঁর যে কবিতাটি প্রকাশিত হয়েছিল তার প্রথম লাইনটি ছিল, "ঘাই হরিণীর ডাক শোনা যায়"। এই কবিতাটি প্রকাশিত হওয়ার পরে তিনি তদানীন্তন বিদগ্ধ কবিদের একজন মুখপাত্র হয়ে ওঠেন এবং তাঁর এক নতুন ভক্তের দল তৈরি হল। মাঝখানে দিল্লি কলেজের অধ্যাপকের চাকুরি চলে যাওয়ার পরে তিনি যে মানসিক অস্বস্তির মধ্যে পড়েছিলেন তা অনেকটা কেটে যায়। এর কিছুদিন পরে তিনি ব্রজমোহন কলেজে অধ্যাপনার চাকুরি পান। এই কলেজে ১৯৪৬ সাল পর্যন্ত চাকুরি করেন। তাঁর 'জলপাই-হাটি' ও 'বাসমতীর উপখ্যান' উপন্যাস দুটিতে এই কলেজের অধ্যাপনার সময়ের জীবনকথা প্রতিফলিত হয়েছে। তিনি সারা উপমহাদেশের তো বটেই, বিশ্বের অন্যান্য দেশের

স্বাধীনতা ও সমাজতন্ত্রের সংগ্রাম সম্পর্কে খুব গভীরভাবে এবং বড় মাপেই খবর রাখতেন। মার্কসবাদ ও লেনিনবাদের তত্ত্ব ও প্রয়োগের দিকটা গভীরভাবে ভেবেছিলেন, যা এই উপন্যাস দুটিতে প্রতিফলিত হয়েছে। তাঁর ৩০-৪০ দশকের কাব্যে মার্কস-লেনিন প্রসঙ্গ শ্রদ্ধার সাথে উচ্চারিত হয়েছে, তবে খুব বেশি আমাদের অবগতির মধ্যে আসে নি। সাধারণভাবে তিনি কথাবার্তা কম ও সংযতভাবে বলতেন। কোনোকিছুর জবাবের চেয়ে প্রশ্নের ধারাটাই বড় ছিল। এই কারণে তিনি মার্কস-লেনিনের কবি হয়ে পরিচিত হন নি। ১৯৩০-এর দশকে ছাত্রজীবনে যখন তাঁর সাথে আমার দেখা হয় এবং আমি যখন গুটিকয় মার্কসীয় গ্রন্থ পড়ে সোচ্চার হতাম, তিনি মাঝে মাঝে স্মিত হেসে দু-চারটে প্রশ্ন করে আমাকে বে-কায়দায় ফেলতেন।

বরিশাল তখন সংগীতের জগতে বিশেষ করে ধ্রুপদী সংগীতে বেশ কিছু নতুন শিল্পী তৈরি করেছিল। এই প্রসঙ্গে আমার একটা অভিজ্ঞতা হল যে, তখনও পর্যন্ত আমার মনে হতো বরিশালে গান শেখার চর্চা কোলকাতা, বাঁকুড়া কিংবা রাঁচির তুলনায় অনেক বেশি। খুব ভোরবেলায় ঘুম ভাঙতো আশপাশের তরুণ-তরুণীদের গলা সাধার রেওয়াজে। সেই সময়ে আমার দুই আত্মীয় ছিলেন বিশিষ্ট সংগীত শিক্ষক। একজন সুরেন দাশ (দাশগুপ্ত) ও অন্যজন সরোজ দাশগুপ্ত। ব্রাহ্ম সমাজের অনুষ্ঠানগুলোতে রবীন্দ্রসংগীত গাওয়া হতো। মাঝে মাঝে অতুলপ্রসাদের গান। তখন রেডিওর ব্যাপক প্রচলন ছিল না এবং বিদ্যুতের ব্যবস্থা প্রায় ছিল না বললেই চলে।

বরিশাল আরো একটি কারণে বিখ্যাত হয়ে ওঠে, সারা বাংলায় মুকুন্দ দাশের যাত্রা দলের জন্য। সেই সময়ে মুকুন্দ দাশকে দু'একবার দেখেছি। একদিন নতুন বাজারের মাঝখানে খোলা মঞ্চ করে একটি যাত্রার পালা উপস্থিত করেছেন। তবে তখন আমার মনে হতো যে, মুকুন্দ দাশকে যতখানি সমাদর করা প্রয়োজন ততখানি হচ্ছে না। সেই সময়ে অর্থাৎ ১৯৩১-৩২ সাল নাগাদ মুকুন্দ দাশ খুব সম্ভবত পারিবারিক কোনো একটি শোকের আঘাতে মৌনী হয়ে গিয়েছিলেন। বাংলার বিভিন্ন জায়গা ছাড়াও বিহার ও উত্তর প্রদেশের বেশ কিছু অঞ্চলে তার গানের কদর ছিল বেশি। তাঁর স্বদেশি চেতনার গানগুলো তরুণ সমাজ ও স্বদেশিদের মধ্যে দারুণ প্রভাব বিস্তার করেছিল। ১৯২৬-২৭ সাল নাগাদ মুকুন্দ দাশ পরপর দু'বার রাঁচি গিয়েছিলেন। এক কথায় বলতে গেলে তিনি শহরটাকে মাত করে রেখেছিলেন। মুকুন্দ দাশ আমার জ্যাঠামশাইয়ের বন্ধু ছিলেন। সেই সূত্রে বাবা তাঁকে খাওয়ার জন্য নিমন্ত্রণ করে বাসায় এনেছিলেন। সেই সময় খুব কাছ থকে তাঁকে দেখার সৌভাগ্য হয়েছিল। মাথাভরা ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুল আর দরাজ গলা আমাকে মুগ্ধ করেছিল। কিন্তু গান গাইবার সময় পাগড়ি বেঁধে সন্ন্যাসীর মতো পোশাক পরতেন। সম্ভবত ১৯০৮ বা ১৯১০ সালে তাঁর রচিত *'মাতৃপূজা'* যাত্রাপালার জন্য তাঁকে গ্রেফতার করে কারাগারে পাঠানো হয়। এক বৎসর কারাগারে ছিলেন।

লোক উৎসবের মধ্যে যাত্রাপালা ছিল প্রধান উৎসব। আমি বরিশালে দু'বছর ছিলাম। বাবা রিটায়ার করার পর হঠাৎ অসুস্থ হয়ে ঢাকায় চলে আসেন। আমাকেও বরিশাল থেকে ঢাকায় পা বাড়াতে হল।

শুরু হলো আর এক জীবন।

ঢাকায় থাকি

১৯৩৪ সালে আমরা রাঁচি থেকে ঢাকায় চলে যাই। আমার বাবা ক্রিকেট খেলতে গিয়ে ডান হাতটিতে ভয়ঙ্করভাবে আঘাত পান। যার জন্য ডান হাতটি অকেজো হয়ে যায়। এর ফলে বাবা কাজ থেকে অবসর নিতে বাধ্য হন। ঢাকায় পিতৃপুরুষের জায়গায় বসবাস করবার উদ্দেশ্যে আমরা সবাই রওনা হই। বাবার খুবই ইচ্ছে ছিল পদ্মাপাড়ের গাউড়াপাড়ায় আদিগ্রামে পিতৃপুরুষের ভিটেয় জীবনের শেষ সময়টুকু কাটিয়ে দেয়ার। কিন্তু তা সম্ভব হয় নি। পদ্মার প্রচণ্ড ভাঙনের কবলে আমাদের ভিটের অনেকাংশ জলের তলায় হারিয়ে যায়। যার ফলে ঢাকা শহরে বাড়ি ভাড়া করে থাকতে বাধ্য হই। এইভাবে শুরু হলো ঢাকায় বসবাসের জীবন। আমার ঢাকা দেখা অবশ্য এই প্রথম ছিল না। বরিশালে পড়বার সময়, ১৯৩১ সালে ঢাকার রামকৃষ্ণ মিশন আয়োজিত সারা বাংলার কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে একটা প্রবন্ধ প্রতিযোগিতা হয়। বিষয়টি ছিল 'স্বামী বিবেকানন্দ'। ঘটনাচক্রে আমি প্রথম হওয়ার সুবাদে ঢাকায় পুরস্কার আনবার জন্য যাই। সেবার ঢাকায় আত্মীয়-স্বজনদের বাড়িতে উঠেছিলাম। যাই হোক, আমরা লক্ষ্মীবাজার এলাকার একটি ভাড়া বাড়িতে বসবাস শুরু করলাম। ছয়টি কামরা যুক্ত দোতলা বাড়িটির মাসিক ভাড়া ছিল ১৬ টাকা। আজ অবশ্য অবিশ্বাস্য বলে মনে হয়। আমাদের সাত বোনের মধ্যে বড় বোনের বিয়ে হয়ে যায় এবং দুই বোন মারা যায়। বাকি চার বোন, চার ভাই ও বাবা-মাকে নিয়ে গড়ে উঠলো আমাদের নতুন সংসার। পারিবারিক ঝামেলা বলতে আমার বিশেষ কিছু ছিল না। ভাই-বোনেরা ঢাকার স্কুলে ভর্তি হতে শুরু করে। বাবার পেন্‌শনের টাকায় আমাদের সংসার মোটামুটি চলতে থাকল। ১৯৩৪ সালে কলেজের পড়াশোনা ছেড়ে দিয়ে কলকাতায় সাংবাদিকতা করার জন্য যাই। আমার প্রবল ইচ্ছা ছিল সাংবাদিক হওয়ার এবং কলকাতার একটি বিশিষ্ট সংবাদপত্রে কাজ করবার সুযোগও ছিল। যাঁর দৌলতে আমি কাজে যোগদান করতে পারতাম, তিনি আমাকে বললেন এখন গিয়ে পড়াশোনা কর। এখনও তোমার কাজ করবার সময় হয় নি। সুতরাং আমিও ঢাকায় ফিরে গেলাম। আমি ফিরে গেলেও সাংবাদিকতার জন্য আকাঙ্ক্ষা রয়েই গেল। আমি ঢাকার সাপ্তাহিক পত্রিকা 'সোনার বাংলা'য় লিখতে আরম্ভ করলাম। আমার প্রথম লেখায় ছিল ম্যাক্সিম গোর্কির ওপরে। ১৯৩৬ সালে গোর্কির মৃত্যুর পর ঐ লেখাটি প্রকাশিত হয়। তারপর আমাকে আর থামতে হয় নি। শুরু হলো সাংবাদিকতার পর্যায়। মূলত প্রবন্ধই লিখতে থাকি। সেই সময় *'সোনার বাংলা'*র সম্পাদক ছিলেন, *'বাংলার বিপ্লববাদ'* গ্রন্থের লেখক নলিনীকিশোর গুহ। ধীরে ধীরে সোনার বাংলার সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতা গড়ে ওঠে। সম্পাদক মহাশয় যদিও ভিন্ন রাজনৈতিক মত পোষণ করতেন কিন্তু আমার লেখা ও চিন্তা-ভাবনা নিয়ে কোনোদিন কোনো প্রশ্ন তোলেন নি। বরং সব সময় আমাকে উৎসাহই দিতেন। তখনকার সময়ে রাজনৈতিক গোঁড়ামি ও দ্বন্দ্ব প্রকট ছিল। সেইদিক দিয়ে আমার প্রতি নলিনীকিশোর গুহর এমন ব্যবহার ব্যতিক্রমী বলাই যায়। সেই সময়টিতে বামপন্থি রাজনীতি নতুন মোড় নিচ্ছিল। অগ্নিযুগের বিপ্লবী দলগুলো ভেঙে জেল ও জেলের বাইরে কমিউনিস্ট সংগঠন গড়ে উঠছিল। বিশেষ করে সুভাষচন্দ্রকে কেন্দ্র করে বামপন্থিদের যে সমাবেশ হচ্ছিল সেখানেও নানা ধরনের টানাপোড়েন

ছিল। এই অবস্থাতেই আমি যখন সোনার বাংলা পত্রিকাতে সহকারী সম্পাদক হিসেবে যোগদান করি তখন আমার যা স্বাধীনতা ছিল তা অবিশ্বাস্য ধরনের। আমি এর পুরো সুযোগ নিয়েছিলাম, এমনকি আমার রাজনৈতিক বন্ধু-বান্ধবদের দিয়েও লেখাতে শুরু করি। R.P.D-i *World Politics*-এর কয়েকটি পরিচ্ছেদ অনুবাদ করে সোনার বাংলা পত্রিকায় প্রকাশ করেছিলাম। ১৯৩৮ সালে আমাদের এক বন্ধু জ্যোতির্ময় সেনগুপ্ত জেল থেকে যক্ষ্মা রোগ নিয়ে বেরিয়ে এলেন। ঢাকার প্রখ্যাত আইনজীবী ব্রজেন সেনগুপ্তর পুত্র ছিলেন জ্যোতির্ময়। ঢাকার রেল ডাকাতি মামলায় তাঁর দশ বছর সাজা হয়েছিল। যক্ষ্মা রোগ হওয়াতে পাঁচ বছর সাজা খাটবার পর ছাড়া পান। জেলে থাকাকালীন গভীরভাবে মার্কস ও লেনিনের বইগুলো অধ্যয়ন করেছিলেন এবং নিজেকে কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে যুক্ত করেছিলেন। আমাব সাথে এঁর যোগাযোগ হয় ১৯৩৫-এর প্রথম দিকে, তাঁর বাসায়। এরপর থেকে আমাদের ঘনিষ্ঠতা বেড়ে ওঠে। তিনি তখন শয্যাগত। তিনি সেই অবস্থাতেই সোনার বাংলা পত্রিকায় লেখা দিতে শুরু করেন। সবই মার্কস-লেনিন সংক্রান্ত। জ্যোতির্ময় লিখতেন 'বিজয় সেনগুপ্ত' ছদ্মনামে। তিনি ১৯৪০ সালে কলকাতায় বসবাস শুরু করেন।

তাঁর আত্মীয়-স্বজনদের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল 'ইস্ট ইন্ডিয়া ফার্মাসিটিক্যাল ওয়ার্কস'। তাঁর বেশকিছু জেলখানার বন্ধুকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত করেন। এদের মধ্যে সুধী প্রধান ও হীরেন দত্তগুপ্তর নাম বিশেষভাবে মনে পড়ছে। পরবর্তীকালে সোমেন চন্দর ভাই কল্যাণ চন্দ এই প্রতিষ্ঠানের কর্মী হিসেবে যোগদান করেন। ১৯৪৩ সালে জ্যোতির্ময় সেনগুপ্তর মৃত্যু হয় কলকাতাতেই। '৭০-এর দশকে সুধী প্রধান এবং অন্যান্য বন্ধুরা তাঁকে নিয়ে একটি স্মারক গ্রন্থ প্রকাশ করেছিলেন। এই গ্রন্থেই সোনার বাংলায় প্রকাশিত সমস্ত লেখাগুলো রয়েছে। ঢাকার রাজনীতির ব্যাপারে জ্যোতির্ময় সেনগুপ্তর প্রসঙ্গ আরো আসবে। প্রকৃতপক্ষে আমার সাংবাদিকতা ছিল রাজনীতির অঙ্গ।

১৯৩৪ সালে আমার বরিশালের বন্ধুরা কলকাতার তদানীন্তন কয়েকজন কমিউনিস্ট নেতার সঙ্গে যোগাযোগ করেন। এঁদের মধ্যে ছিলেন একদিকে সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও আর একদিকে আব্দুল হালিম। আমি বরিশালের বন্ধুদের থেকে খবর পেয়েই ঢাকার মীরাট ষড়যন্ত্র মামলার অন্যতম অভিযুক্ত আসামী গোপাল বসাকের সাথে দেখা করি। পৈতৃক সূত্রে উনি তখন ঢাকার নবাবপুরের প্রখ্যাত বইয়ের দোকান 'অ্যালবার্ট লাইব্রেরি' দেখাশুনা করতেন। এই লাইব্রেরিতে তাঁর সাথে আমার আলাপ হয়। তখন ঢাকা শহরের জেল থেকে বেরিয়ে আসা গোপাল বসাক এক আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব। তাঁরই নেতৃত্বে '৩৫-'৩৬ সালে প্রফুল্ল চক্রবর্তী, অমিত চ্যাটার্জি, দীনেন সেন প্রমুখকে নিয়ে প্রধানত ঢাকা শহর ও জেলার কিছু কিছু গ্রামকে জড়িয়ে কমিউনিস্ট পার্টির ইউনিট গড়ে উঠেছিল। প্রধানত প্রফুল্ল চক্রবর্তী ও দীনেন সেনকে নিয়ে ঢাকায় গড়ে উঠেছিল কতকগুলো ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠন। যে ট্রেড ইউনিয়নগুলো গড়ে উঠেছিল তাদের মধ্যে ছিল 'হরদেও গম্লাস ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন', 'বিদ্যুৎ কর্মী ইউনিয়ন', 'প্রেস কর্মচারী ইউনিয়ন', 'বিড়ি শ্রমিক ইউনিয়ন' ও 'হসপিটাল ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন'। পার্টির ইউনিটটি অবশ্য প্রকাশ্য ছিল না। কারণ তখন কমিউনিস্ট পার্টি বে-

আইনী ছিল। সেই সময় গোপাল বসাকের কিছু কিছু কাজের ভিত্তিতে নারায়ণগঞ্জের আশেপাশে অবস্থিত তিনটি সুতাকলেও শ্রমিক সংগঠন গড়ার চেষ্টা হয়। আমার বেশ মনে পড়ে যে গোপাল বসাকের নির্দেশে শ্রমিক ইউনিয়ন নতুন করে শুরু করার জন্য 'ঢাকেশ্বরী কটন্ মিলে' শ্রমিকদের ব্যারাকে একটি লিফলেট বিলি করা হয়। এই লিফলেট রচনার মধ্য দিয়েই আমার শ্রমিক আন্দোলনের প্রথম হাতে খড়ি। এরপরেই ঢাকার দিনমজুরদের নিয়ে একটি ইউনিয়ন করা হয়। হয়তো এখন খুব বিস্ময়কর মনে হবে কিন্তু এটাই বাস্তব ঘটনা ছিল যে, ঢাকার দিনমজুররা ছিল হিন্দি ভাষী। শুধু ঢাকার নয়, বাংলাদেশের নদী-বন্দর এলাকাগুলোতেও কর্মসংস্থানে হিন্দি ভাষীর সংখ্যা ছিল বেশি। তাদেরকে 'কুলি' নামে চিহ্নিত করা হয়েছিল। রেলস্টেশনেও এদের সংখ্যা ছিল বেশি। অন্য ভাষাভাষীর মানুষেরা সেইভাবে এইরকম কাজে আসেনি। সুতরাং কুলি বলতেই হিন্দিভাষী মানুষ বোঝাতো।

ঢাকায় যখন আমরা এই দিনমজুরদের নিয়ে ইউনিয়ন করলাম তখন ১৯৩৬ সালে মে দিবসে প্রয়োজন হলো হিন্দি ভাষায় লিফলেট লেখবার। এই লেখা নিয়ে একটা মজার ব্যাপার ঘটেছিল। আমার জ্যাঠতুতো বোন বাসন্তী ঢাকায় আশালতা সেনের বাসায় উঠেছিল। ওর হিন্দিভাষায় পারদর্শীতা ছিল। আমি প্রথমে বাংলায় লিফলেটটা লিখি এবং তাকে দিয়ে হিন্দিতে অনুবাদ করালাম। কিন্তু যখন প্রেসে দেয়া হলো সেখানে ম্যানেজার বললেন যে, কম্পোজিটর হিন্দি টাইপ বসাবে বাংলা লেখা থেকে। সুতরাং আমাকে আবার হিন্দির হুবহু বাংলা অক্ষরে লিখে দিতে হল। তারপর লিফলেটটি ছাপা ও বিলি করা হল। ঢাকার এই ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠনগুলো প্রকৃতপক্ষে ছিল তখনকার ঢাকার কমিউনিস্টদের সবচেয়ে বড় আশ্রয় ও ভরসা। বিশেষ করে 'ধাঙ্গড় ইউনিয়ন'-এর মোহন জমাদার ছিলেন কমিউনিস্ট পার্টির লাল ঝাণ্ডার দৃঢ়চেতা ধারক ও বাহক। এই ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠনগুলো অবশ্য ১৯৩৮ সালে অভ্যন্তরীণ বিপর্যয়ে ভেঙে যায়। অভ্যন্তরীণ বিপর্যয়টি ছিল কলকাতার কেন্দ্রীয় কমিউনিস্ট সংগঠনের মধ্যে বিভেদ। কলকাতায় বিশ্বনাথ দুবের নেতৃত্বে গঠিত হয় 'বলশেভিক পার্টি'। এই সংগঠনের মধ্যে ছিলেন শিশির রায়, সুধা রায় প্রমুখ। ঢাকায় এই বিভাজনটি প্রত্যক্ষভাবে কমিউনিস্ট পার্টির শ্রমিক ভিত্তিতে ভাঙন ধরিয়ে দিল। ঢাকাতেও দীনেন সেনের নেতৃত্বে গঠিত হলো 'বলশেভিক পার্টি'। 'ধাঙ্গর' ও 'বিদ্যুৎ' চলে গেল বলশেভিকদের হাতে।

এই ভাঙাভাঙি সত্ত্বেও ঢাকা শহরে শ্রমিকদের ওপর নির্ভর করে কমিউনিস্ট পার্টির ভিত্তি গড়ে ওঠে। তিরিশের দশকের প্রায় মাঝামাঝি সময় থেকে ঢাকায় লাল ঝান্ডা নিয়ে শ্রমিকদের মিছিলগুলো কমিউনিস্টদের উপস্থিতিকে জনসমক্ষে জোরালোভাবে সামনে আনে। এছাড়া 'ইন্‌কিলাব জিন্দাবাদ' কথাটাকে ঢাকার বিভিন্ন মহল্লাতে মাঝ মাঝে শোনা যায়। অবশ্য এই কথাটির অর্থ যেমন শ্রমিকদের মধ্যে অনেকে পুরোপুরি বুঝে নেয় নি, তেমনি সাধারণ শহরবাসীরাও এর তাৎপর্য তেমন বোঝেননি। প্রকৃতপক্ষে এই কথাটির অর্থ ১৯৩৮ সালে কিছুটা ব্যাখ্যাসহ শ্রমিক ও জনসাধারণের মধ্যে প্রচারিত হয়।

এখানে একটা ঘটনার কথা মনে পড়ছে, ১৯৩৯ সালের প্রথম দিকে তদানীন্তন বিখ্যাত কমিউনিস্ট নেতা সোলি বাট্‌লিওয়ালা ঢাকায় এলে তাঁকে নিয়ে তখনকার জনসমাবেশের জায়গা বুড়িগঙ্গার পাড়ে করোনেশন পার্কে (সদরঘাটে) তাঁর বক্তৃতার আয়োজন করা হয়। তখনকার রেওয়াজ অনুযায়ী ঢাকার কংগ্রেস নেতা আইনজীবী নীলকমল চক্রবর্তী এই সভার সভাপতিত্ব করেন। কেননা তখন কমিউনিস্টরা কংগ্রেসের মধ্যেই কাজ করতেন। সোলি বাট্‌লিওয়ালা বোম্বে থেকে এসেছিলেন। তিনি ইংরেজিতে বক্তৃতা করেন এবং এই বক্তৃতার মধ্যে তিনি 'ইনকিলাব জিন্দাবাদ' কথাটির ব্যাখ্যা করেন। সমবেত জনতাকে বারবার প্রশ্ন করে জানবার চেষ্টা করেন যে, অর্থটা তারা ধরতে পেরেছেন কিনা? তিনি বিপ্লবের ব্যাখ্যার সঙ্গে সঙ্গে 'ইনকিলাব জিন্দাবাদ'-এর ব্যাখ্যা করেন। তারপরে যে-রকমভাবে মন্ত্র উচ্চারণ করা হয় সেইভাবে সমগ্র জনতাকে দিয়ে কয়েকবার 'ইনকিলাব জিন্দাবাদ' শ্লোগান উচ্চারণ করান। বাট্‌লিওয়ালা অত্যন্ত সুপুরুষ ছিলেন। টাইফয়েড-এ আক্রান্ত হওয়ার জন্য আমি সেদিনের সভাতে উপস্থিত থাকতে পারিনি। পরদিন সকালে তিনি নেপাল নাগকে নিয়ে একেবারে আমার বিছানার পাশে এসে বসলেন। বাট্‌লিওয়ালা সপরিবারে কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করেছিলেন। ইনি জাতিতে পার্শি ছিলেন। তাঁর স্ত্রী নার্গিস বাট্‌লিওয়ালা সেই সময় 'নিখিল ভারত ছাত্র ফেডারেশন'-এর নেত্রী ছিলেন। কিন্তু ১৯৪০ সালে সুভাষচন্দ্র কংগ্রেস থেকে আলাদা হয়ে ফরওয়ার্ড বস্নক গঠন করার ফলে এবং কমিউনিস্টরা কংগ্রেসে থেকে যাওয়ার দরুণ যে পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় তাতে কিছু সংখ্যক কমিউনিস্ট দোটানায় পড়ে যায়। এদের মধ্যে বাট্‌লিওয়ালাও ছিলেন। শেষ পর্যন্ত কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক শিথিল হয়ে যায়। বাট্‌লিওয়ালার ঢাকায় আসার সুবাদে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, তখনকার সর্বভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির কোনো কোনো নেতা ঢাকায় আসতেন। এদের মধ্যে আমেদাবাদের প্রখ্যাত ট্রেড ইউনিয়ন নেতা দিনকর মেধা অন্যতম। আমরা তাঁর সহজ, সরল, মধুর ব্যবহারে মুগ্ধ হয়েছিলাম। তাঁকে থাকতে দেয়া হয়েছিল পার্টি অফিসের চাটাইয়ের ওপরে। তখন তার বয়স ৩০/৩৫ বছর হবে।

ঢাকার ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠনগুলোর মধ্যে আরো কয়েকটি ট্রেড ইউনিয়নের কথা বলা দরকার। ঢাকার ঘোড়ার গাড়ির গাড়োয়ানদের কথা প্রবাদের মতো এখনও মাঝে মাঝে শোনা যায়। তাদের রসিকতা, চালচলন সম্বন্ধে অনেক গল্পকথা আছে। সেই সময় ঢাকায় ঘোড়ার গাড়ি ছিল শহরের একমাত্র পরিবহন ব্যবস্থা। রিকশার প্রচলন তখনও হয়নি। সুতরাং মোটরগাড়ি বা ঐ ধরনের কোনো যানবাহনের কথা কল্পনাতীত ছিল। ঢাকার কমিউনিস্টদের উদ্যোগে এই গাড়োয়ানদের নিয়ে একটি ইউনিয়ন গঠিত হয়েছিল গোপাল বসাক ও মির্জা আবদুল কাদের সর্দারের নেতৃত্বে। নবাব বাড়ির দৌলতে ঢাকা শহরে মুসলিম লীগের প্রাধান্য ছিল বেশি। কিন্তু মীর্জা কাদের ছিলেন মুসলিম লীগের বিরোধী নেতা কৃষক প্রজা লীগের এ কে ফজলুল হকের অনুগামী। এই ধরনের ঢাকার কিছু স্থানীয় নেতা কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে সহযোগিতা করতেন। এরা ছিলেন জাতীয়তাবাদী মুসলিম। এদের মধ্যে গোলাম কাদের চৌধুরী ও সুফিয়ানির নাম মনে পড়ছে।

ঘোড়ার গাড়ি যেহেতু একমাত্র যানবাহন ছিল, তাই ঢাকা শহরের প্রত্যেকটি মহল্লায় একটি দুটি করে আস্তাবল ছিল। আস্তাবলকে 'আড়গাড়া' বলতো। কয়েক হাজার গাড়োয়ানদের মধ্যে প্রথম ইউনিয়নের মিটিং-এ প্রায় দুশো গাড়োয়ান উপস্থিত ছিল। গোপাল বসাক ও কাদের সর্দার ঢাকাইয়া ভাষাতেই শ্রমিক আন্দোলনের মর্মকথা বুঝিয়ে বলেন। এই মর্মকথা শুধু গাড়োয়ানদের জীবন ও দাবি-দাওয়ার মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না, বিশ্ব শ্রমিক আন্দোলনের তাৎপর্যও ব্যাখ্যা করা হয়েছিল। সেদিন এই গাড়োয়ানদের সভায় উপস্থিত ছিলাম। তারা যেভাবে গভীর অভিনিবেশের সঙ্গে বক্তৃতা শুনেছিল তাতে চমৎকৃত হয়েছিলাম।

ঢাকার এই ট্রেড ইউনিয়ন ও সংগঠনের আন্দোলনের সূত্রেই আরো একটি ঘটনার কথা উল্লেখ করা দরকার। ১৯৩৭ সালে ঢাকা এসেছিলেন তৎকালীন সারা বাংলা সুতাকল শ্রমিকদের সংগঠনের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ও প্রাণপুরুষ নিত্যানন্দ চৌধুরী। ইনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক হওয়ার পর শ্রমিক আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। তিনি পায়ে ঘুঙুর বেঁধে বাউলের মতো শরীর ঝাঁকিয়ে কলকারখানার সামনে নেচে নেচে বক্তৃতা করতেন। তাঁর বক্তৃতায় অভিনবত্ব ছিল, তিনি সমস্যাগুলো বিস্তারিতভাবে শ্রমিকদের সামনে বিশ্লেষণ করতেন। এই সময়ে ঢাকায় তিনি দুটি কাজ করেছিলেন। তখন সারা ভারতে এবং বিশেষভাবে সারা বাংলায় আন্দামান বন্দিদের মুক্তি দাবি ও ঘরে ফিরিয়ে আনবার জন্য বড় আন্দোলন চলছিল। ঢাকাতেও বুড়িগঙ্গার পাড়ে করোনেশন পার্কে বিশাল মিছিল ও জমায়েতের আয়োজন করা হয়েছিল। সমাবেশের আগের দিন মাত্র কয়েকজন ট্রেড ইউনিয়ন কর্মীকে নিয়ে নিত্যানন্দ চৌধুরীর নেতৃত্বে একটি লাল ঝাণ্ডার মিছিল বেরিয়েছিল। 'আন্দামান বন্দিদের মুক্তি চাই' এই দাবি নিয়ে। অত অল্প লোক নিয়ে কিভাবে মিছিল করা যায় তার দৃষ্টান্ত দেখিয়েছিলেন নিত্যানন্দ চৌধুরী। তিনি জনসভাতেও বক্তব্য রাখেন। আশালতা সেনের সভানেতৃত্বে এই সমাবেশের পরিচালক ছিলেন নিত্যানন্দ চৌধুরী। জনসাধারণের মধ্যে তিনি কিভাবে প্রাণের সঞ্চার করেছিলেন, সেদিন প্রত্যক্ষ করেছিলাম। তাঁর দ্বিতীয় কাজটি হলো নারায়ণগঞ্জের মিল এলাকায়। তখনকার লক্ষ্মীনারায়ণ কটন মিলে শ্রমিকরা খুবই সংকটের মধ্য দিয়ে দিন অতিবাহিত করছিল। তাঁদের একটি প্রতিনিধি দল নিত্যানন্দ চৌধুরীকে তাঁদের মিলে নিয়ে গেলেন এবং সেখানে নতুন ইউনিয়ন গঠিত হল।

দাঙ্গার প্রসঙ্গ

সাম্প্রদায়িক বিরোধের ব্যাপারটি ১৯২৬ সালে রাঁচিতে বসেই শুনেছিলাম। তখন কোলকাতায় হিন্দু-মুসলমানের দাঙ্গা হয়। বেশ বড় রকমের দাঙ্গা হয়েছিল। এই দাঙ্গা নিয়ে বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম একটি বিখ্যাত কবিতা লিখেছিলেন। সেই কবিতাটি ছিল ব্রিটিশের বিরুদ্ধে। এই বিভেদের মূলে ছিল সাম্রাজ্যবাদী শাসকেরা। এই ভেদ-বিভেদের দরুণ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার বড় রকমের জড় বা শিকড় রয়ে গিয়েছিল। তার দরুণ যারা চাইছিলেন যে, জনগণ উঠে আসুক মুক্তির সংগ্রামে সেখানে এলো বিরাট বাধা। সবাই একটা ঘোরের মধ্যে ছিলাম। আসলে দাঙ্গা বলতে যা বোঝায়, তা

আমরা রাঁচিতে বসে দেখিনি। বরং মহরমের সময় ১০-১২ দিন জুড়ে মহরমের যে 'বাঘের সঙ' বের করত অল্পবয়সী ছেলেরা পেছন পেছন যেতাম। অন্য ছেলেমেয়েরাও পেছন পেছন যেত। সেই সময় দাঙ্গার ব্যাপার নিয়ে আমরা অন্য কিছু ভাবি নি। সম্প্রদায় ব্যাপারটা সেখানে ছিল। যেমন যখন তাজিয়া বেরোতো, তাজিয়া চলে যাবার পর হিন্দুরা জল ছিটিয়ে দিত। তবে সম্প্রদায় যেমন ছিল তেমনি সম্প্রীতিও ছিল।

তখন আমার বয়স বছর ১৪ হবে। ১৯২৬ সালে হঠাৎ শুনলাম কোলকাতায় হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা বেঁধেছে ভয়ঙ্কর রকমের। এই দাঙ্গার বিরুদ্ধে কাজী নজরুল ইসলাম কবিতা লিখলেন। যার শেষ লাইন ছিল এই রকম যে, "লেজে যদি তোর লেগেছে আগুন, স্বর্ণলঙ্কা পোড়া"। এই যে মানুষের মধ্যে পারস্পরিক আগুন লাগাবার চেষ্টা যারা করেছিল, সেই ইংরেজদের বিরুদ্ধে আগুন জ্বালাবার কথা তিনি বললেন।

এরপর যখন ঢাকায় গেলাম তখন ঢাকায় গিয়ে দেখি, এই শহরটায় মুসলিম লীগের আধিপত্য। ঢাকার নবাববাড়ি এলাকায় মুসলিম লীগের প্রতাপ ছিল। অবশ্য পাশাপাশি মন্দির-মসজিদও ছিল। আমি যখন ঢাকায় যাই তখন আমার ১৮-১৯ বছর বয়স হবে। আমি কলেজে পড়ছি। ঢাকায় প্রত্যেক বস্তি, বসতি এলাকা হিন্দু-মুসলমান হিসেবে বিভক্ত ছিল। তখনও পর্যন্ত ঢাকায় কোনোরকম দাঙ্গা দেখি নি। ঢাকার নবাববাড়িরও দু'টি ভাগ ছিল। একটি মুসলিম লীগের পক্ষে, আর একটি খিলাফতের পক্ষে। আমার বেশ মনে আছে যাদেরকে আমারা জাতীয়তাবাদী মুসলিম বলি তাদেরও একটা জায়গা ছিল। যেমন গোলাম কাদের চৌধুরী। তিনি মিউনিসিপ্যালটির সদস্যও ছিলেন। বলতে গেলে ঢাকায় এরা ছিলেন জাতীয়তাবাদী মুসলমান। ঢাকা শহরে কোনো মিশ্র এলাকা ছিল না। তবে সদ্ভাব ও মেলামেশা ছিল। ঢাকার একটা বিশেষ এলাকায় ছিল ফজলুল হক সাহেবের কৃষক-প্রজা পার্টি। আর একটি ছিল নবাবদের নেতৃত্বে খাজা নাজিমুদ্দিনের পার্টি। সেখানকার মুসলমানরা এই দুটি ভাগে বিভক্ত ছিল। এদের মধ্যে একজন সিনেমার মালিক ছিলেন। তিনি যদিও মারদাঙ্গা করার লোকদের পুষতেন বলে অখ্যাতি ছিল, আসলে তা নয়। তিনি ফজলুল হক সাহেবের অনুগামী ছিলেন। দাঙ্গার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ করতেন। তিনি কখনো হিন্দু-মুসলমান বিরোধের প্রশ্নে আসতেন না। তিনি হাঙ্গামার মধ্যে হয়তো থাকতেন, কিন্তু কখনোই হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গার মধ্যে থাকতেন না।

ঢাকায় আমরা ১৯৪০ সালে প্রথম কমিউনিস্ট পার্টি করলাম। তখন ঢাকায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা আরম্ভ হল। নবাববাড়ির প্রতিপত্তির কথা আগেই বলেছি। ১৯৪০ সালের দাঙ্গার উৎস রাজনৈতিকভাবে নতুন মোড় নিল। তখন রাজনৈতিক ক্ষমতা হস্তান্তর প্রক্রিয়া শুরু হয়ে গেছে। ১৯৩৬ সাল থেকে স্বায়ত্তশাসন, প্রাদেশিক ক্ষমতায়ন ইত্যাদি শুরু হয়ে গেছে। সেই সময় থেকেই আবার দাঙ্গার সূত্রপাত। সমগ্রভাবে উপমহাদেশে ১৯৩৬ সালে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার কারণ হলো পৃথক নির্বাচন। এই নির্বাচনের মধ্য দিয়ে সাম্প্রদায়িকতার বিষটি ছড়িয়ে পড়ে। ক্ষমতা দখল করার জন্য ধর্মীয় ব্যাপারটি সামনে নিয়ে আসা হয়। এটি উত্থাপন করেন মুসলিম লীগের নেতারা। এ বিষয়ে কংগ্রেসও বিভক্ত হয়ে যায়।

১৯৩৫-৩৬ সালের আগে থেকেই অর্থাৎ তিরিশের দশক থেকেই নির্বাচন, পৃথক নির্বচন, ক্ষমতা কার হাতে যাবে, তাই নিয়ে রাউন্ড টেবিল কনফারেন্স হল। গান্ধীজি, জিন্নাহ্ সাহেব লন্ডনে গেলেন। ক্ষমতা কার হাতে থাকবে, কিভাবে যাবে এ নিয়ে আলোচনা শুরু হল। তিরিশের দশকে যখন মনে হলো ক্ষমতা হাতে পাওয়া যাবে, তখন থেকেই সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে ক্ষমতা কী করে দখল করা যায় এইজন্য বিশেষ করে মুসলিম লীগের তরফ থেকে খুব চেষ্টা করা হয়। কংগ্রেস এটাকে সামাল দিতে পারল না। এর ফলে তখনই হিন্দু মহাসভার উৎপত্তি হল। হিন্দু মহাসভার নেতৃত্বে ছিলেন সাভারকার ও তার সহযোগীবৃন্দ। একটা বিরাট দল নিয়ে শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি সাভারকারদের দলে যোগদান করলেন। হিন্দু মহাসভার নেতারা বলতে শুরু করলেন যে, ওরা অর্থাৎ মুসলিম লীগের নেতারা যখন অন্য পথ নিয়েছে আমাদেরও এবার অন্য কথা ভাবতে হবে।

ঢাকার চকবাজারটি ছিল বড় বড় পাইকারদের। এখানে হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মানুষ থাকতেন। এই চকবাজারে দাঙ্গার আগুন ভীষণভাবে ছড়িয়ে পড়ে। দাঙ্গার মূল লক্ষ্য ছিল উচ্ছেদ। অর্থাৎ মুসলমানরা হিন্দু ব্যবসায়ীদের উচ্ছেদ করতে চাইলো তাদের এলাকা থেকে। এই দাঙ্গার আগুন সূত্রাপুর ও অন্যান্য জায়গায় ছড়িয়ে পড়েছিল। তখন ঢাকায় যাদের হাতে বেশি অর্থ ছিল, প্রতিপত্তি ছিল তারাই ব্যবসা করত। যাদেরকে শিল্পপতি বলি, বুর্জোয়া বলি, সে রকম ঢাকায় ছিল না। সঠিকভাবে বলতে গেলে ঢাকা ছিল বাণিজ্য নগর। বাণিজ্যের ব্যাপার নিয়ে উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে দাঙ্গার আগুন ছড়িয়ে পড়েছিল। ১৯৪০ সালে এ নিয়ে হিন্দু-মুসলিম ভাগাভাগি হয়ে গেল। বাণিজ্যের ভিত্তিতে সাম্প্রদায়িক ব্যাপারটি ঘটে গেল। ১৯৪০ সালে দাঙ্গার ওপর সোমেন চন্দ 'দাঙ্গা' গল্পটি লিখেছিলেন। চমৎকার নিখুঁত গল্প। কমিউনিস্ট পার্টির পক্ষ থেকে আমরা প্রথম দাঙ্গার বিরুদ্ধে নামলাম। লাল ঝান্ডা নিয়ে গরিব মানুষ, শ্রমজীবী মানুষের মধ্যে প্রচার করতে শুরু করলাম যে শ্রমজীবী মানুষের কোনো জাত নেই। তাঁরাই তো সব থেকে বেশি লোকসানের মুখোমুখি হন। তাঁদের দিনমজুরী নষ্ট হয়। আমরা মানুষের কাছে আবেদন রাখলাম। আমরা যখন প্রথম লাল ঝান্ডা নিয়ে আন্দোলন শুরু করি তখন একজন ডাক্তার আমাদের সঙ্গে ছিলেন। নাম ডা. মইনুদ্দিন। তিনি কিন্তু মুসলিম লীগ ঘেঁষা ছিলেন। তবে দাঙ্গার বিরুদ্ধে আমাদের প্রচার করার সময় যখন মুসলিম এলাকায় যেতাম, তিনি আমাদের সঙ্গে লোক দিতেন। আবার কখনো নিজেও থাকতেন। সাধারণ মানুষের কথা ভেবে, দাঙ্গার বিরুদ্ধে দাঁড়াবার জন্য, তখন কিছু মানুষ এমনই অবস্থান নিয়েছিলেন। আব্দুল কাদের সরদার যিনি হক সাহেবের অনুগামী ছিলেন, তার সাথে প্রথম যখন দেখা হলো, তিনি ঢাকাইয়া ভাষায় আমাদের বলেন, "আপনাগো লাল ঝান্ডা ওরা খুব ভালোবাসে"।

১৯৪০ সালে সোমেন চন্দকে নিয়ে আমরা প্রগতি লেখক সাহিত্য সংঘ করি। দাঙ্গা তখনও চলছে। কাজী আবদুল ওদুদ সাহেব আমাদের প্রগতি লেখক সংঘের সভাপতিত্ব করলেন। দাঙ্গার বিরুদ্ধে আমরাও দাঁড়ালাম। ১৯৪০ সালে সোমেন চন্দ 'দাঙ্গা' গল্পে এ কথাগুলো বললেন। আমরাও বাস্তবে দেখলাম দাঙ্গার ব্যাপারটা কি। তখন প্রথম দাঙ্গা শহরভিত্তিক ছিল। পরে তা গ্রামাঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। সারা কলকাতা শহরে দাঙ্গা

ছড়িয়েছিল ভয়ঙ্করভাবে। ঢাকা শহরেও হল। কিন্তু গ্রামাঞ্চলে যখন ছড়ালো তার ফল হলো ভয়ানক। গ্রামাঞ্চল থেকে যেসব মানুষ শহরে আসতো তারা জানতো না সে দাঙ্গার প্রকৃত চেহারাটা কি! গ্রাম থেকে যেসব হিন্দু-মুসলিম দলবদ্ধভাবে শহরে আসতো তারা বেঘোরে প্রাণ দিত। তখন আমরা এ নিয়ে ভীষণভাবে ভাবতে শুরু করি। বুঝলাম যতক্ষণ পর্যন্ত না হিন্দু ও মুসলমান এক হচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত দাঙ্গা থামবে না। এই দাঙ্গা ১৯৪০ সাল থেকে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত চলেছিল। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা কখন, কোথায়, কিভাবে লেগে যাবে এটা কখনোই আঁচ করা যেতো না। শহরের মানুষ এ ব্যাপারে কিছুটা অভ্যস্ত হয়ে গেছিল। ঢাকায় দুটি এলাকা ছিল। শাঁখারিবাজার এলাকাটি ছিল হিন্দু প্রধান এলাকা। আর বুড়িগঙ্গার পাশ দিয়ে গড়ে উঠেছিল মুসলমান প্রধান এলাকা। এই হিন্দু প্রধান এলাকা থেকে বুড়িগঙ্গা যেতে হলে মুসলমান প্রধান এলাকার ভেতর দিয়ে যাতায়াত করতে হতো।

ঢাকা শহরটি বলতে গেলে বুড়িগঙ্গার পাশ দিয়ে কয়েক মাইল জায়গা জুড়ে গড়ে ওঠা। সেখানে হিন্দু-মুসলমান এলাকাভিত্তিক পাড়া বা মহল্লা ছিল। পাড়ায় পাড়ায়, মহল্লায় মহল্লায় রেষারেষি গড়ে উঠেছিল। আবার অনেক মহল্লা ছিল যেখানে উভয়ের মধ্যে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান ছিল। আবার এমনও দেখা গেছে দুটো সম্প্রদায় বিশেষ কোনো বৈরিতা নিয়ে দাঙ্গায় নিযুক্ত হয়েছে। এইভাবে এক এলাকা থেকে অন্য এলাকায় দাঙ্গা ছড়িয়ে পড়ে। সেখানে দুটি নাম করা পাড়া ও মহল্লা ছিল। একটি কলতা বাজার, অপরটি শাঁখারি বাজার। কলতা বাজার মুসলমান প্রধান এলাকা ছিল এবং শাঁখারি বাজার হিন্দু প্রধান এলাকা। এই দুটো বাজারের মাঝখানে অনেকখানি ফাঁকা জায়গা জুড়ে একটা রাস্তা ছিল। ব্যাপারটা ক্রমে ক্রমে এমন হয়ে দাঁড়িয়েছিল যে, একে অপরকে পেলে তার জায়গা দখল করে নেবে। আমার কিছু অভিজ্ঞতা হয়েছিল। আমি যখন ঐরকম এলাকা দিয়ে যাচ্ছি, রাস্তার নাম ছিল মদনমোহন বসাক রোড, সেদিন একটা ঘটনা ঘটল। এই রাস্তার একপাশে হিন্দু, অপরদিকে মুসলমান। যারা আক্রমণ করছে তারা আমাকে অনায়াসে হিন্দু বলে চিহ্নিত করতে পারত। কেননা তখন আমি ধুতি পড়তাম। আমাকে তারা ধাক্কা মেরে সরিয়ে দিয়ে বলল, 'আপনি এখানে কেন? সরে যান! সরে যান!' এরপর লড়াইটা শুরু হলো দুই মৈশন্ডি পাড়ার মধ্যে। উত্তর মৈশন্ডি পাড়া ছিল সাধারণ হিন্দুদের দখলে এবং দক্ষিণ মৈশন্ডি পাড়া ছিল সাধারণ মুসলমানদের দখলে। অবশ্য একথা জোর দিয়ে বলতে পারি যে, দাঙ্গায় কোনেদিন আমায় কেউ আঘাত করে নি। এই দাঙ্গা থামাবার জন্য কমিউনিস্ট পার্টি থেকে দলবদ্ধভাবে লাল ঝান্ডা নিয়ে দাঙ্গা কবলিত এলাকাগুলোতে যেতাম, বুঝিয়ে বলতাম এবং বহু ক্ষেত্রে দাঙ্গা থেমে যেতো। তখনও পর্যন্ত সেখানে হিন্দু থাকবে না মুসলমান থাকবে, এ বিষয়টি ঠিক হয়ে ওঠে নি। সবাই মনে করত যে এই উপমহাদেশটায় সবাই একসঙ্গে বসবাস করবে। কিন্তু যখন দেশটা দু'ভাগ হয়ে গেল, ক্ষমতা হস্তান্তরের, দখলের বিষয়টি আসতে লাগলো, তখন মানুষের মধ্যে নানারকম প্রশ্ন এল। এরপর ক্ষমতা দখলের লড়াইটা শুরু হলো সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে। ১৯৪৬ সালে বাংলায় নির্বাচন হল। ঐ নির্বাচনের ইস্যু হয়ে উঠলো হিন্দুস্তান না পাকিস্তান। ব্যাস্ দাঙ্গা বেঁধে গেল নির্বাচনের পরেই।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শেষ হওয়ার পরেই ক্ষমতা হস্তান্তরের বিষয়টি প্রবলভাবে সামনে এল। এই ক্ষমতা হস্তান্তরের আইনগত একটি কাঠামোও তৈরি হয়ে গেল। এর পরেই শুরু হলো গণহত্যা। এই দাঙ্গার কবলে পড়ে এ-পার থেকে মানুষ ও-পারে চলে যেতে থাকল। আবার ও-পার থেকে এ-পারে। আমি তখন ঢাকায়। সোহ্‌রাওয়ার্দি তখন মুসলীম লীগের নেতা। ১৯৪৬ সালে কলকাতায় দাঙ্গার ব্যাপারে সোহ্‌রাওয়ার্দির হাত ছিল বলে তাঁকে অভিযুক্ত করা হয়েছিল। অবশ্য পরবর্তীকালে গান্ধীজির সঙ্গে মিলে সোহ্‌রাওয়ার্দি কলকাতায় দাঙ্গা থামাবার চেষ্টা করেছিলেন। গান্ধীজি তখন কলকাতার বেলেঘাটায় ছিলেন।

হিন্দু-মুসলমান প্রশ্ন নিয়ে এ উপমহাদেশটা দু'ভাগ হয়ে গেল। কোন্ ধর্মের মানুষ কোথায় থাকবে এ ব্যাপারে আলোচনা শুরু হল। ১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের পর যে প্রশ্ন সব থেকে বড় আকারে দেখা দিলে সেটি হলো অপসন। সরকারি কর্মচারীরা দলে দলে অপসন দিতে থাকল। তারা হিন্দুস্থনে থাকবে না পাকিস্তানে যাবে এ ব্যাপারে অপসন দেয়া শুরু হল। আমরা কমিউনিস্ট পার্টির তরফ থেকে অনেক চেষ্টা করলাম। বার-লাইব্রেরিতে বসে মিটিং পর্যন্ত, কিন্তু কিছুতেই রোধ করতে পারলাম না। কমিউনিস্ট পার্টির তরফ থেকে আমরা বিরোধিতা পর্যন্ত করলাম। তখন মানুষ এতোটাই উতলা হয়ে উঠলো যে, এখানে থাকাটা তাদের কাছে অবাস্তব বলে মনে হল। শুধু চাকুরি রাখার ব্যাপারটা নয়, নিরাপত্তার প্রশ্নটাও খুব বড় আকারে দেখা দিয়েছিল। যারা আসল অর্থাৎ যাদেরকে আমরা সরকারি কর্মচারি বলি, যাদের হাতে উভয় দেশের আর্থিক, পারমার্থিক বিষয় নির্ভর করছে, তারাও ভাগ হয়ে গেল। তখন কে, কার ভরসায়, কোথায় থাকবে? এই প্রশ্নটা বড় আকারে দেখা দিল। সত্যি কথা বলতে কি, আমরা এটাকে কোনোভাবেই আটকাতে পারি নি। কমিউনিস্ট পার্টি থেকে আমরা বুঝতে পারলাম যে, এই বিভাজনকে কিছুতেই রোধ করা যাবে না। বিশেষ করে ১৯৪৬ সালে যে ভোটটা হলো তা হলো এই বিভাজনের ওপর ভিত্তি করেই। তখন পশ্চিম বাংলা ও পূর্ব বাংলার অধিকাংশ মুসলিমরা মুসলিম লীগের পক্ষেই ভোট দিল। এই মুসলিম লীগকে ভোট দেয়ার পর পাকিস্তান যখন আলাদা রাষ্ট্র হয়ে গেল, সঙ্গে সঙ্গে রাষ্ট্রের কর্মচারীরা ভাগ হয়ে গেল। তখন প্রশ্ন এলো দেশটাকে শাসন করবে কে? কিভাবে দেশটা চলবে? এবং ভাষার প্রশ্ন এসে গেল।

১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্ট রাতে জিন্নাহর হাতে পাকিস্তানের ক্ষমতা হস্তান্তরিত হল। ১৫ আগস্ট সকালে জওহরলাল, প্যাটেল ও গান্ধীজির হাতে হিন্দুস্থান বা ভারতবর্ষের ক্ষমতা হস্তান্তর হলো, সেই দিনগুলোকেই স্বাধীনতা দিবস হিসেবে ধরা হল।

১৪ আগস্ট ঢাকায় যখন ক্ষমতা হস্তান্তরের উৎসব হলো তখন খাজা নাজিমুদ্দিনের নেতৃত্বে চকবাজার থেকে বিরাট মিছিল বেরোল। এই উৎসবের স্লোগান ছিল 'আমরা স্বাধীন হয়েছি'। ঢাকার কমিউনিস্ট পার্টির তরফ থেকে আমরাও লাল ঝান্ডাসহ মিছিল নিয়ে ঐ উৎসবে যোগ দিয়েছিলাম। ঢাকা জেলার তৎকালীন কমিউনিস্ট নেতা, সম্পাদক জ্ঞান চক্রবর্তী সেই সভায় বক্তৃতা করলেন। তিনি ঐ সভায় বললেন, "এই স্বাধীনতা আমরা সমর্থন করি"। তারপরে আমরা সিরাজউদ্দোল্লা পার্ক, ভিক্টোরিয়া

পার্ক, এখন যার নাম 'বাহাদুর শাহ্ পার্ক', এই সব মাঠে বহু মিটিং, মিছিল করেছি। এই ভিক্টোরিয়া পার্কের চারিদিকের গাছগুলোতে ১৮৫৭ সালে সিপাহী বিদ্রোহীদের ফাঁসি দেয়া হয়েছিল। পাকিস্তান হওয়ার পর 'ভিক্টোরিয়া পার্ক'-এর নাম বদলে 'বাহাদুর শাহ্ পার্ক' নাম রাখা হয়। বাহাদুর শাহ্ পার্কে বড় বড় সভা হয়েছে এবং সেখানে বড় বড় প্ল্যাকার্ডে লেখা হয়েছিল, "পাকিস্তান ও ভারত দুই ভাই, হাত ধরাধরি করে চলেছে'। সম্প্রীতির স্লোগানও আমরা এভাবে এনেছিলাম যে, 'যা হয়ে গেছে, গেছে, আর নয়! আসুন আমরা দুই ভাই হাত ধরাধরি করে দেশ গড়ি"। এরকম নানা স্লোগান ছিল। ব্যাপারটা তখনও ঠিকমতো বুঝে নিতে পারি নি। যখন মানুষ দেশত্যাগী হয়ে এ দেশ ছেড়ে ভারতবর্ষে চলে যাচ্ছে উতলা হয়ে, সরকারি কর্মচারীরা অপসন দিচ্ছে, তখন আমরা বারবার মিটিং করে, কমিউনিস্ট পার্টি থেকে প্রচার করেও কিছুতেই সেটা রোধ করতে পারি নি। একথা আমি আগেও বলেছি, আবারও বললাম।

১৯৪৬ সাল পর্যন্ত দাঙ্গা হয়েছে ঠিকই কিন্তু ১৯৪৭ সালের আগস্ট পর্যন্ত কলকাতায় দাঙ্গা হয়েছিল। দাঙ্গা থামাবার জন্য গান্ধীজিকে কলকাতায় এসে বেলেঘাটায় থাকতে হয়েছিল। তারপর তিনি দিল্লী গেলেন। সেখানেও বড় আকারের দাঙ্গা বেধেছিল। এইসব দাঙ্গার ফলে লক্ষ লক্ষ মানুষ শিকড় উপড়ে গৃহহীন হয়ে পড়েছিল। দাঙ্গা নিয়ে অনেকেই গভীরভাবে উপলব্ধি করেছিলেন।

সমরেশ বসু *'আদাব'* গল্প লিখলেন। সোমেন চন্দ *'দাঙ্গা'* গল্প লিখলেন। ১৯৪৬ সালে দাঙ্গার ওপর অসীম রায় 'বিক্ষোভ' উপন্যাস লিখলেন। যেটা সে সময় দারুণ নাড়া দিয়েছিল। পরবর্তীকালে সাদাত হাসান মান্টো, কীষণ চন্দর এঁরা মহাকাব্যিক লেখা লিখেছেন। সেই সময় কবিরা দাঙ্গা ও দেশবিভাগ নিয়ে প্রচুর কবিতা লিখেছেন। ১৯৪৬-৪৭ সালের দাঙ্গা ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করেছিল। ১৯৪৬-৪৭ সালের ওপর জীবনানন্দ দাশের কালজয়ী কবিতা রয়ে গেছে। জীবন্ত চিত্র ফুটে উঠেছে। দারুণ মর্মস্পর্শী কবিতাটি।

তখন আমি আমার মা, চার বোন ও এক ভাইকে নিয়ে থাকতাম। কলকাতা থেকে আমার এক বন্ধু লিখলো যে, তুমি তো রাজনীতি নিয়ে মেতে আছো, বোনেদের বিয়ের কথা কিছু ভেবেছো? সে নিজেই খোঁজ করে বোনের বিয়ের ব্যাপারে খবর পাঠাল। ছোট বোনকে রাজি করালাম। ১৯৪৮ সালের জানুয়ারি মাসের শেষের দিকে বোনের বিয়ের তারিখ ঠিক হল। আবার গোটা পরিবার নিয়ে ঢাকা থেকে কলকাতার পথে রওনা হলাম। স্টিমারে করে গোয়ালন্দ ঘাটে পৌঁছানো মাত্র বুঝতে পারলাম যে, কী কাণ্ড ঘটতে চলেছে! দেখলাম কলকাতা যাওয়ার ট্রেন দাঁড়িয়ে। শত শত পরিবার ট্রেনের ভেতরে ও বাইরে। কাতারে কাতারে মানুষ আসছে। স্টিমারে লোক আসার কোনো বিরাম নেই। স্টিমারে পৌঁছানো মাত্র পরিবারগুলো ঠিকমতো ভেবে পাচ্ছে না কোথায় যাবে! তখন ট্রেনের কামরার লোকদের অনেক কাকুতি-মিনতি ও অনুরোধ করে, বোনের বিয়ের কথা বলে, কোনোভাবে তিন বোন ও এক ভাইকে ট্রেনের একটি কামরায় অর্ধেক জিনিস নিয়ে দাঁড় করিয়ে দিলাম। দুইদিন বাদে বিয়ে। আমার মা, ছোট বোন ও আমি, সারারাত পদ্মাপারে শতরঞ্চি পেতে কাটালাম। কী ভয়ঙ্কর সেই দিনগুলো ছিল। পরের দিন ট্রেনের জন্য অপেক্ষা করলাম। শুধু আমরা নই, শত শত

পরিবার পদ্মাপারে রাত কাটাতে থাকলো পরের দিনের ট্রেনের জন্য। পরপর স্টিমার আসছে। শেষ স্টিমার এলো চাঁদপুর থেকে। শত শত পরিবার ঘাটে নামছে। সবাই কলকাতা যাবে। কোথায় গিয়ে উঠবে কেউ জানে না। শুধু কলকাতা যাবে এই বাসনা নিয়ে সারারাত স্টেশনে কাটাতে শুরু করল। আমরা পরের দিন নির্দিষ্ট আত্মীয়ের বাসায় উঠলাম। তখন কলকাতায় এতো গৃহসমস্যা অবশ্য ছিল না। সেই উৎখাত, কাতারে কাতারে মানুষের কলকাতার দিকে যাত্রা, অনিশ্চয়তা, অনিদ্রা, শিশুর কান্না, এ চিত্র আমার মনে একেবারে গেঁথে রয়েছে। আর কত স্মৃতির কথা বলবো। ঐ দুর্দশার রাতেও আমরা নানারকম রসিকতা করেছি।

কলকাতায় পৌঁছানোর পর বোনের বিয়ে হয়ে গেল। কিন্তু বিয়ের পরের দিন একটা ভীষণ রকম শোকাবহ পরিস্থিতির সৃষ্টি হল। সেদিন জাতির জনক গান্ধীজিকে হত্যা করা হল। সারা ভারতবর্ষ জুড়ে শোকের ছায়া নেমে এল। কলকাতায় এই শোকাবহ পরিস্থিতির মধ্যে পড়লাম। পরের দিন আমার বোন, মা আর ভাইকে নিয়ে ঢাকায় ফেরার জন্য শিয়ালদহ স্টেশনে অপেক্ষা করছিলাম। কিছু কৌতূহলী লোক এসে জিগ্যেস করল, "আপনারা কোথায় যাবেন?" আমরা বললাম, "ঢাকা।" তারা আশ্চর্য হয়ে গেল। বলল, "সে কি? এখন কেউ ঢাকায় যায় নাকি? বিশেষ করে হিন্দু পরিবার।" তখন মানুষের মধ্যে এরকম আতঙ্ক, বিস্ময়। কেউ ভাবতে পারত না যে, ঢাকায় ঐ সময় কোনো হিন্দু ফিরে যেতে পারে!

এবার শুরু হলো দ্বিতীয় পর্যায়। ১৯৫০ সাল। আবারও দাঙ্গা শুরু হল। যার কথা শওকত ওসমানের *"আর্তনাদ"* উপন্যাসে রয়েছে। তাছাড়া আরোও অনেকে এ বিষয়ে লিখেছেন। ১৯৫০ সালের দাঙ্গাটা সাংঘাতিক রূপ নিয়েছিল।

১৯৪৮ সাল থেকে ১৯৫০ সাল পর্যন্ত আমি জেলে। কমিউনিস্ট পার্টির কর্মীকে বাইরে রাখা হবে না বলে জেলে রাখা হল। শুধু কমিউনিস্ট নয়, যারা যুব-ছাত্র আন্দোলন করছে, আওয়ামী লীগ করছে, তাদেরও রাতারাতি জেলে ভরা হল। একথা বলা যায় যে, অমুসলিম যারা সে সময় পূর্ব পাকিস্তানে ছিল, ১৯৫০-এর দাঙ্গায় তারা আবার উৎখাত হল। আমি জেলে থাকার জন্য আমার আত্মীয়-স্বজনরা খুবই উদগ্রীব ছিল। তারা মা-ভাই-বোনদের কলকাতা ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠল। আমার এক মামা তখন প্লেনের কর্তা। তিনি মা-ভাই-বোনেদের প্লেনে চাপিয়ে কলকাতায় আত্মীয়-স্বজনদের বাড়িতে পাঠিয়ে দিলেন। তাঁরা প্রায় বাধ্য হয়েই দেশ ছাড়ল। আমি শুধু আমার পারিবারিক চিত্র তুলে ধরলাম।

আমার নিকটজনেরা পারিবারিক রাজনৈতিকভাবে দায়বদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও ঘর-বাড়ি ছাড়তে বাধ্য হয়েছিল। কিন্তু সাধারণ মানুষ যাদের দায়বদ্ধতা ছিল না, তাদের শেষ পর্যন্ত কি হলো তা সহজেই অনুমান করা যায়।

পূর্ব বাংলা থেকে হিন্দু পরিবার দলে দলে গিয়েছিল ঠিকই, তেমনি মুসলিম পরিবার পূর্ব পাকিস্তান ও ঢাকায় দলে দলে চলে এসেছিল। অবশ্য পশ্চিম বাংলা থেকে ঢাকায় সেরকম লোক যায়নি। পশ্চিম বাংলার লোকেরা খুলনা, যশোর ও ২৪ পরগণা অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। কেউ বাড়ি বদল করে, কেউ আইনগত বাড়ি বিক্রি করে চলে গেছিল। পূর্ববঙ্গে যেটা হয়েছিল যে, লাখখানেক অ-বাঙালি বিহারি শরণার্থী জড়ো

হয়েছিল। তারা বিভিন্ন জায়গায় ছিল। এই সমস্যাটা এখনো বাংলাদেশে রয়ে গিয়েছে। তাদেরকে পাকিস্তান নিতে চাইছে না।

১৯৫০ থেকে ১৯৭০-৭১ এর মধ্যে– এই বিশ বছরে বহু লোক খোলাপথে, গুপ্ত পথে, সীমানা পার হয়ে চলে এসেছে, চলে গিয়েছে ভারতে। এই দলে দলে পরিবারকে-পরিবার যাতায়াতের মধ্যে পূর্ব ভারতের অবাঙালি বিহারির একটা বিরাট অংশ ঢাকা, চট্টগ্রাম, সৈয়দপুরে চলে গেল। সৈয়দপুর রেলের লোকোশেডের জন্য বিখ্যাত। ঐ অবাঙালি বিহারিরা রেলওয়ের বিভিন্ন কাজে নিযুক্ত হল। Property Exchange-এর মধ্য দিয়ে লাখ লাখ মানুষ ওপারে চলে গেছিল। এই ব্যাপারটি আমরা পরে আন্দাজ করতে পারলাম। দাঙ্গা কিন্তু তখনও চলছে। থামেনি। ১৯৫০ সালে আমাদের কয়েকজনকে ঢাকা জেল থেকে যশোর জেলে পাঠানোর ব্যবস্থা করল। সারা শহর জুড়ে কার্ফু। সুতরাং স্টিমার দিনের বেলায় ছাড়বে। জেল থেকে বার করে সারারাত আমাদের থানায় রাখা হল। ঢাকা শহরে রাত্রিবাসের মধ্যে দিয়ে বুঝতে পারলাম যে, সারা শহর কন্টক-নগরী। আমরা সূর্য ওঠার প্রতীক্ষায় সারারাত জেগে বসে রইলাম। উপলব্ধি করলাম কি পৈশাচিক অবস্থার মধ্যে রয়েছি। আমি তখনও জানতাম না যে আমার মা, ভাই-বোনেরা ঢাকা ছেড়ে কলকাতায় চলে গেছে।

ঢাকা থেকে যশোরে পাঠাবার সময় দুপুরবেলায় আমাদের স্টিমারে তুলল। সেই স্টিমার দেশত্যাগী ও দেশত্যাগিনীদের ভিড়ে বোঝাই হয়ে গেছিল। বরিশালে যাবার সময় এ দৃশ্য চোখে পড়ে। বরিশালে যাবার পথে চাঁদপুর ছাড়লাম। চাঁদপুরে দাঙ্গার কোনো দৃশ্য দেখি নি। খুলনাতেও নয়। একমাত্র বরিশালে দাঙ্গার চিত্র দেখতে পেলাম। বরিশাল হল ফজলুল হক সাহেবের দেশ। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার চেয়ে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন, প্রজা আন্দোলনের জন্য বিখ্যাত ছিল। কিন্তু ১৯৫০ সালে বরিশাল দাঙ্গার কবলে পড়ল। পরিবারকে পরিবার বরিশালের স্টিমারে চেপে দেশ ছেড়ে চলে যাচ্ছে। এখানে এসে ভয়ঙ্কর রকমের অভিজ্ঞতা হল। তারপর স্টিমার খুলনায় এসে থামল। খুলনা থেকে আমাদের ট্রেনে করে যশোর জেলে নিয়ে গেল।

দাঙ্গা প্রতিরোধ

তবে একথা বলবো যে, বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা যেরকম মাথা চাড়া দিয়েছে, তার বিরোধিতা করার লোকেরও অভাব হয়নি। সেই সময়, সবেমাত্র তিন বছর পাকিস্তান হয়েছে, তখনও পর্যন্ত ধর্মীয় ভেদ থেকে গিয়েছিল। রাজনৈতিক চিন্তায় ধর্মীয় ব্যাপার রয়ে গেছে তবুও সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার লোকের অভাব হয় নি। এ ব্যাপারে আমি দু'জন লোকের নাম করব, যাঁরা বাংলাদেশের ভাষা আন্দোলনের জন্য, বৈপ্লবিক সাহিত্য আন্দোলনের জন্য, স্বাধীনতার জন্য কলম ধরেছিলেন। তাঁরা হলেন হাসান হাফিজুর রহমান এবং অপরজন হলেন আলাউদ্দিন আল আজাদ। এরা দু'জনই সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে কবিতা-গল্প রচনা করে প্রাতঃস্মরণীয় হয়ে আছেন। ইদানিং লেখক-লেখিকাদের মধ্যে যাঁকে বিপ্লবী অভিভাবক হিসেবে চিহ্নিত করা হয় সেই শওকত ওসমানের একটি বিখ্যাত বই *'আর্তনাদ'* কয়েক বছর আগে বাংলা একাডেমি থেকে প্রকাশিত হয়। এটা ভাষা আন্দোলনের আগের অবস্থা নিয়ে লেখা। ভাষা

আন্দোলন কিভাবে সাম্প্রদায়িকতার বিষ কাটিয়ে উঠে, বিকশিত হলো, বিপ্লবী উত্থান কি করে হলো, তার আগের পরিস্থিতি কেমন ছিল, সবই গভীরভাবে ধরা আছে এই গ্রন্থে। ১৯৫০ সালের দাঙ্গার কথা উপন্যাসটিতে পরিচ্ছন্নভাবে তুলে ধরা হয়েছে। এই সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে লড়াইয়ের মধ্যে দিয়ে, বিপ্লবের মধ্যে দিয়ে সংগ্রামী শিল্পী, লেখক-লেখিকারা উঠে এসেছেন।

১৯৬৪ সাল বলতে গেলে একটা জাগরণ ঘটাল। তখন গণতান্ত্রিক শক্তি স্বাধিকার, সার্বভৌমত্ব, গণতন্ত্রের দাবি নিয়ে দ্রুত এগিয়ে চলেছে। সেই সময় সমগ্র উপমহাদেশ জুড়ে বড় রকমের একটা দাঙ্গা হয়। সেটা ভারতে হয়েছে, তৎকালীন পাকিস্তানেও হয়েছে, দুই দেশের বহু জায়গায় হয়েছে। এর মূল কারণ ছিল দুটো দেশের গণতান্ত্রিক শক্তিকে বিনষ্ট করার জন্য সাম্রাজ্যবাদীদের গভীর চক্রান্ত। হজরত মুহম্মদের একটি চুলের ঘটনা নিয়ে প্রশ্ন উঠল। ঐ চুল কাশ্মীরের একটি মসজিদে রক্ষিত ছিল, অভিযোগ উঠলো সেটা নাকি বিনষ্ট করা হয়েছে। এই অছিলায় প্রবল উত্তেজনা দেখা দিল ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার ঘূর্ণিঝড় যখন বাংলাদেশের ওপর, সেই সময় বাংলাদেশ এক বৈপ্লবিক পথের দিকে এগিয়ে চলেছে, সামরিক শাসনের মোকাবিলা করছে। এই দাঙ্গা শুরু হলো ১৯৬৪ সালের জানুয়ারি মাসের মাঝামাঝি। সেই সময় যারা বুদ্ধিজীবী, সাংবাদিক, প্রগতিবাদী তাঁদের কাছে নানা প্রশ্ন এল। তাঁরা ভাবলেন কি করে এই দাঙ্গা ঠেকানো যায়। ১৯৬৪ সালের দাঙ্গা শুরু হওয়ার কিছুদিন আগে যখন ঝড়ো হাওয়ার আবহাওয়া তৈরি হচ্ছে তখন আমার একটা ভিন্ন রকমের অভিজ্ঞতা হল। তখন আমি ঢাকার 'দৈনিক সংবাদ'-এর সহকারি সম্পাদক হিসেবে কাজ করছি। এই পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন জহুর হোসেন চৌধুরী। তিনি কমিউনিস্ট পার্টির ঘনিষ্ঠ ছিলেন। নিষিদ্ধ পার্টির লোকেরা ওঁর সাহয্যেই চলাফেরা করতেন। তিনি সম্পাদক হিসেবে রাওয়ালপিন্ডি, করাচি ঘুরে বেড়াতেন। পত্রিকা দপ্তরে আমি তাঁর পাশে বসতাম। ঐ ভয়ঙ্কর পরিস্থিতির কী করে মোকাবিলা করা যায় তাই নিয়ে ভাবনা শুরু হয়েছিল। আমি একদিন অফিসে গিয়ে দেখি জহুর সাহেব বসে আছেন। তাঁর স্বভাবসিদ্ধ নোয়াখালি টানে বলে চললেন, 'রণেশদা বসেন। এবার বুঝি দাঙ্গা থামানো গেল না।' সেদিন সেখানে দু'জন মহিলা উপস্থিত ছিলেন। একজন অধ্যাপিকা আর একজন ইউনিভার্সিটির ছাত্রী। সেদিন ঐ দুই মহিলা ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করেছিলেন। এঁরা জহুর সাহেবকে জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি একটি পত্রিকার সম্পাদক হয়ে কেন বলছেন যে দাঙ্গা থামানো যাবে না? আপনারা চেষ্টা করুন। তার আগেই কেন এভাবে হাল ছেড়ে দেবেন। জহুর সাহেব বললেন, সেটা কি করে সম্ভব? ওঁরা আবার বললেন যে, চেষ্টা করুন। আপনি দৈনিক সংবাদের সম্পাদক। আপনি সকল সম্পাদককে ডাকুন। তাঁদের সঙ্গে কথা বলে ঐক্যবদ্ধ ব্যবস্থা নিন।

দুই মহিলার তাগিদেই জহুর সাহেব শেষ পর্যন্ত একটা চমৎকার বিবৃতি তৈরি করলেন, বিবৃতিটা রচিত হয়েছিল দাঙ্গার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার জন্যে। এই বিবৃতির নিচে সমস্ত সম্পাদকের সই সংগ্রহ করেছিল সালাউদ্দিন মাহামুদ, সে সবেমাত্র এম.এ পাশ করে 'মর্নিং নিউজ'-এ যোগ দিয়েছে। আমার সঙ্গে তার অন্য একটা সম্পর্কও ছিল। সেটা হচ্ছে আমি পলাতক অবস্থায় একসময় তাদের বাসায় ছিলাম। ঐ অবাঙালি

পরিবারে থাকতে থাকতে আমিও তাদের পরিবারের একজন সদস্য হয়ে গিয়েছিলাম। ঐ পরিবারটি ছিল কমিউনিস্ট পার্টির একটা গোপন কেন্দ্রের রক্ষক। এটা একটা রহস্য ছিল। সালাউদ্দিন মাহামুদের পরিবারের কেউই কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য ছিলেন না। তবে শ্রমিক নেতা ড. আব্দুল বারি ছিলেন ওদের আত্মীয়, ওরা পাটনা থেকে এসেছিল। আমার কয়েকজন বড় সম্পাদকের নাম মনে পড়ছে যাঁরা বিবৃতিতে স্বাক্ষর দিয়েছিলেন। যেমন আবদুস সালাম, মৌলানা আকরম খাঁ, মানিক মিঞা (ইত্তেফাকের সম্পাদক)। বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামের ইতিহাসে মানিক মিঞার একটি সংগ্রামী ভূমিকা রয়েছে। যাই হোক, পরের দিন সমস্ত পত্রিকার প্রথম পাতায় সম্পাদকের সই করা ইস্তাহারটি ছাপা হল। এটি প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অন্য একটি ঢেউ উঠল। প্রকাশিত বিবৃতিকে সামনে রেখে দাঙ্গা প্রতিরোধ কমিটির কেন্দ্র স্থাপিত হল। আওয়ামী লীগ ও অন্যান্য সমস্ত রাজনৈতিক দলগুলো মিলে একটি জোরালো কমিটি গঠন করল। মুসলিম লীগ ছাড়া সমস্ত রাজনৈতিক দলের ভূমিকা অভূতপূর্ব ছিল। সেখানে একজন তরুণ নেতা শেখ মুজিবর রহমান নেতৃত্ব গ্রহণ করলেন। ওই দাঙা পীড়িত শহরের মধ্যে তিনিই প্রথম সাহস করে দাঙ্গা প্রতিরোধকারী রাজনৈতিক মিছিল বের করলেন। এই দাঙ্গা থামানোর ব্যাপারে বামপন্থি ও অন্যান্য প্রগতিশীল দলগুলো এক ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করল। ধর্মনিরপেক্ষতা শব্দটি কয়েক বছর পরেই সরাসরি রাষ্ট্রীয় চার নীতির মধ্যে চলে এল। জনগণের উত্থানের মধ্যে দিয়ে দাঙ্গার চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করা হল।

পরের ঐতিহাসিক ঘটনাগুলো আমি পরে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করব।

পরিশিষ্ট

রণেশ দাশগুপ্ত : গ্রন্থ-পরিচয়

ল্যাটিন আমেরিকার মুক্তিসংগ্রাম

প্রথম প্রকাশ: আশ্বিন–১৩৭৭
প্রকাশক: এম. আব্দুল হক, প্রকাশ ভবন, ৫ বাংলাবাজার, ঢাকা–১
প্রচ্ছদপট: হারাধন বর্মণ
মুদ্রাকর: তাজুল ইসলাম, বর্ণমিছিল, ৪২/এ কাজী আবদুর রউফ রোড, ঢাকা–১
মূল্য : তিন টাকা (শোভন সংস্করণ), দুই টাকা (সুলভ সংস্করণ)

উৎসর্গ:

ল্যাটিন আমেরিকার সর্বাত্মক মুক্তিসংগ্রামে
যারা আত্মনিবেদিত,
যাঁরা প্রাণ ডালি দিয়েছেন,
যাঁরা অশেষ নির্যাতম ও লাঞ্ছনা সয়েও গণমুক্তির অনিবার্য জয়ের
পতাকার বয়ে নিয়ে চলেছেন, তাঁদের উদ্দেশ্যে

যে পরিপ্রেক্ষিতে দেখা

কিউবা দ্বীপ, মেক্সিকো, উরুগুয়ে, প্যারাগুয়ে প্রভৃতি চেনা-অচেনা দেশ নিয়ে যে বিশাল ল্যাটিন আমেরিকা মহাদেশ গঠিত, তার এবং আমাদের দেশের মধ্যে দুদিক দিয়ে কমপক্ষে দুটো মহাসাগরের ব্যবধান থাকলেও এই মহাদেশ দারিদ্র্য এবং পশ্চাদপদতায় আমাদের মতো আফ্রো এশীয় দেশগুলির খুবই কাছাকাছি। তবে দুদিন আগে পর্যন্ত এই মহাদেশটির হাল হকিকত সম্বন্ধে আমরা আফ্রিকা কিংবা এশিয়ার লোক-সাধারণ অন্ধকারে ছিলাম।

এতদিন যা জেনে এসেছি তাতে ধারণা জন্মেছিল যে, ল্যাটিন আমেরিকার দেশগুলিতে যা ঘটে, তাতে বোধহয় কোন কার্যকারণ সম্পর্ক থাকে না। ল্যাটিন আমেরিকা আমাদের কাছে বিশেষভাবে পরিচিত হয়েছে রাজনীতির ক্ষেত্রে ঘনঘন সামরিক অভ্যুত্থান ও রাষ্ট্রক্ষমতার প্রভু বদলের জায়গা বলে, এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে ভূমিকম্পের অন্যতম লীলাক্ষেত্র হিসাবে। এছাড়া আরেকটা ধারণাও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালে প্রথম কয়েক বছরে গড়ে উঠেছিল। জাতিসংঘের অধিবেশনে বিভিন্ন উপলক্ষে বিশেষ করে কোরিয়া, চীন, কঙ্গো এবং ভিয়েতনামের প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা এবং ভোটের সময় ল্যাটিন আমেরিকার অধিকাংশ সরকারকেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের লেজুড় হিসাবে উবঠস করতে দেখা গিয়েছে। এই কারণেই মনে হয়েছে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যে বৃহৎ মৎস্য আর ল্যাটিন আমেরিকার সরকারগুলি মাছের পোনার মতো বৃহৎ মৎস্যের গায়ে লেগে থেকে ঘুরছে। এই সব দেশের যেন কোনো স্বতন্ত্র ভূমিকাই নেই, থাকারও প্রয়োজন পড়ে না।

ল্যাটিন আমেরিকার গণজীবনের প্রকৃত আশা-আকাঙ্ক্ষা এবং সেই আশা আকাঙ্ক্ষা পুরণের জন্য জনগণের নিরন্তর সংগ্রামের কথাগুলি আমাদের কাছে কদাচিৎ পৌঁছেছে। যদি বা পৌঁছেছে কখনো, ধারাবাহিকতা রক্ষিত না হওয়ায় সেসব কথা চাপা পড়ে গিয়েছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ বাঁধবার আগে মাঝে মাঝে খবর পেতাম, মেক্সিকো হচ্ছে সারা আমেরিকা মহাদেশেই রাজনৈতিক গণবিপ্লবের জাগ্রত আগ্নেয়গিরি। কিন্তু সে আগ্নেয়গিরি কার দাপটে গভীর অবসাদে ঢলে পড়ল, তা আর জানার উপায় থাকেনি। একটা ব্যাখ্যাই সাধারণভাবে প্রচারিত হয়েছে এবং সেটা এই যে, মেক্সিকোর মতো জায়গাও ঠাণ্ডা মেরে গেছে আপনা থেকে, ল্যাটিন আমেরিকার ধাতটাই এমন। ইদানিং বিপ্লবী কিউবার অভ্যুত্থানের ফলে অবশ্য পরিস্থিতির আমূল পরিবর্তন ঘটেছে। ল্যাটিন আমেরিকার উপর যে অপরিচয়ের পর্দা টাঙানো ছিল, তা' অপসারিত হয়ে যাচ্ছে। কিউবাতে ১৯৫৯ সালে তরুণ বুদ্ধিজীবী বিপ্লবী নেতা ফিদেল ক্যাস্ট্রোর নেতৃত্বে যখন সশস্ত্র অভ্যুত্থানের মারফত গণসরকার কায়েম হলো, তখনও এই ঘটনার পূর্ণ তাৎপর্য উদ্‌ঘাটিত হয়নি। ১৯৬২ সালের আক্টোবর মাসে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যখন কিউবাকে 'শায়েস্তা' করার জন্য যুদ্ধ জাহাজ দিয়ে ঘেরাও করল, তখন কিউবার প্রায় এককোটি অধিবাসী যে দুর্ধর্ষ ও অদম্য প্রতিরোধের মনোভাব দেখালো, তাতে বুঝতে পারা গেল, কিউবা গতানুগতিক ব্যাপার ঘটায়নি; ফিদেল কাস্ট্রোর সশস্ত্র অভ্যুত্থান গতানুগতিক ক্ষমতার দ্বন্দ্ব নয়; এ ঢেউ এক ধাক্কায় উঠে আরেক ধাক্কায় নেমে যাবার নয়। ল্যাটিন আমেরিকাতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বশংবদ বিভিন্ন সরকার কিউবাকে জব্দ করার জন্য উঠে পড়ে লাগলেও ল্যাটিন আমেরিকারই দেশে দেশে কিউবার প্রতি ব্যাপক গণসমর্থনের মধ্য দিয়ে প্রমাণিত হলো যে, কিউবার মতো ঘটনা এই সব দেশেও ঘটতে যাচ্ছে। কিউবার সমাজতান্ত্রিক গণতান্ত্রিক বিপ্লব বিচ্ছিন্ন ব্যাপার নয়। যে সব কারণে কিউবাতে গণবিপ্লব ঘটেছে, সে সব কারণ ল্যাটিন আমেরিকার অন্যান্য দেশেও বিদ্যমান। যে লক্ষ্য ও আদর্শ কিউবার জনগণকে মুক্তিসংগ্রামে অনুপ্রাণিত করেছে, সে লক্ষ্য ও আদর্শ ল্যাটিন আমেরিকার অন্যান্য দেশের জনগণের সামনেও রয়েছে।

কিউবার বিপ্লব আরও একটি কাজ করেছে। কিউবার রাজধানী হাভানা শুধু ল্যাটিন আমেরিকার জনগণের মুক্তিসংগ্রামের প্রাণকেন্দ্র হয়ে ওঠেনি, এখানে এক নতুন সংগ্রামী সংযোগকেন্দ্রও স্থাপিত হয়েছে। এই সংযোগ ল্যাটিন আমেরিকার সঙ্গে আফ্রিকা এবং এশিয়ার ভ্রাতৃত্ব ও সাথীত্বের সক্রিয় সংযোগ। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সমাপ্ত হবার সঙ্গে সঙ্গে যখন এশিয়া এবং আফ্রিকার বিভিন্ন দেশ ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যবাদের শৃঙ্খল ছিন্ন করে বেরিয়ে আসতে থাকে, তখনই দেখা দিয়েছিল আফ্রো-এশীয় সংহতির তাগিদ। ১৯৫৫ সালে বান্দুং সম্মেলনে দারিদ্র্য, পরনির্ভরতা এবং ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যবাদের কবজা থেকে বেরিয়ে আসার তাগিদে আফ্রো-এশীয় দশ দফা কর্মসূচি গৃহীত হয়। তখন পর্যন্ত ল্যাটিন আমেরিকা সরাসরি এই সহযোগিতার চৌহদ্দির অন্তর্ভূক্ত হয়নি। কিন্তু কিউবার বিপ্লবের পরে শুধু যে এই দ্বীপদেশটি আফ্রো-এশীয় সংহতির শিবিরে এসে যোগ দিয়েছে তা' নয়। ল্যাটিন আমেরিকার অন্যান্য দেশের জনগণও আফ্রো-এশিয়ার জনগণের মুক্তিসংগ্রামে সরাসরি এসে শরিক হয়েছে। ১৯৬৬ সালে হাভানাতে সাধারণ

কর্মসূচির ভিত্তিতে স্থাপিত হয়েছে ত্রিমহাদেশীয় তথা আফ্রো-এশীয়-ল্যাটিন আমেরিকার মুক্তিসংগ্রাম সংস্থা। ল্যাটিন আমেরিকা বিশ্বের তৃতীয় দরিদ্র ও অনুন্নত মহাদেশ এবং সেও আর পিছিয়ে থাকতে রাজি নয়।

ল্যাটিন আমেরিকার অধিকাংশ দেশে দেড় শতাধিক বছর পূর্বে আনুষ্ঠানিকভাবে প্রজাতন্ত্র স্থাপিত হলেও এবং পেট্রোল-তেল, মুক্তা, কয়লা, লোহা, সোনা, রূপা, হীরা, টিন প্লাটিনাম, তামা এবং আখ, কলা, কফি ও কোকোর অফুরান্ত সম্পদের ওয়ারিস হওয়া সত্ত্বেও এই মহাদেশের বাসিন্দারা যে আফ্রো-এশিয়ার সদ্যমুক্ত কিংবা এখনও পর্যন্ত শৃঙ্খলিত মানুষের মতোই দারিদ্র্যের পাঁকে ডুবে আছে, সে-কথাটাকে আজ আর চাপা দিয়ে রাখতে পারবে কে? দুনিয়ার সবচেয়ে বড় ধনী বলে যাদের দাপটের সীমা নেই, খয়রাতির থঁলে নিয়ে দরিদ্র দেশগুলিতে যারা মুরুব্বিগিরি করার তালে ঘুরে বেড়ায়, সেই মার্কিনি বৃহৎ পুঁজিপতিদের ছত্রছায়াতলে শতাব্দিকাল থেকেও ল্যাটিন আমেরিকার কোটি কোটি মানুষ অনাহার, নিরক্ষরতা, গৃহহীনতা, বেকার সমস্যা, ঋণের বোঝা, স্বল্পমজুরি, শিশুমৃত্যু, অকাল মৃত্যু, পুষ্টিহীনতা, চিকিৎসার অভাব, কৃষির পশ্চাৎপদতা, শিল্পের অনগ্রসরতা প্রভৃতি বিষয়ে আফ্রো-এশিয়ার অধিবাসীদের এক কাতারেই দাঁড়িয়ে। জীবনযাপনের মান একই রকম নীচু, শোচনীয়ভাবে নীচু। শস্তা কাঁচামাল ও শস্তা মজুরের রেওয়াজ একই ধরণের। মানুষ কিভাবে বাঁচবে? কয়েকটি হিসাব দেখা যেতে পারে। প্যারাগুয়ের লোক বড়জোর ২৮ বছর বয়স পর্যন্ত বাঁচে এবং শতকরা ৪০ ভাগ লোকই ১৫ বছর পার হবার আগেই মারা যায়। মেক্সিকোতে ৩০ লক্ষ শিশু-মজুর দৈনন্দিন জীবিকা অর্জনে ব্যতিব্যস্ত থাকে। হাইতিতে শতকরা ৯০ ভাগ লোক নিরক্ষর। এখানে ৫০ লক্ষ অধিবাসীর জন্য হাসপাতালের বেডের সংখ্যা ৯৬। ১৯৬৫ সালের এই হিসাবে অবাক হওয়ার কথা। কী করে ডলারের আলোর নীচে এত অন্ধকার জমে রইল। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে অবাক হওয়াটাই হবে অজ্ঞতার পরিচায়ক। যে ত্রিবিধ শোষণ আফ্রো-এশিয়ার জনগণের দারিদ্র্যকে জিইয়ে রেখেছে বিভিন্ন দেশের স্বাধীনতার দুই দশক পরেও, সেই ব্যবস্থাই শতাব্দিকাল ধরে ল্যাটিন আমেরিকার দেশে দেশে বহাল রয়ে গিয়েছে, বেশি করে চেপে বসতেও চেয়েছে।

এই ত্রিবিধ শোষণ বলতে সামান্তবাদ বা বৃহৎ ভূস্বামী ব্যবস্থা, ধনতান্ত্রিক ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যবাদ এবং সাম্রাজ্যবাদের উচ্ছিষ্টভোজী দেশীয় পুঁজিপতিচক্র কর্তৃক সম্মিলিত শোষণকে বোঝায়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তরকালে ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যবাদ তার পুরানো সরাসরি দখলের খোলস বদলে এশিয়া এবং আফ্রিকাতে যে অর্থপুঁজির আধিপত্য তথা নয়া ঔপনিবেশিকবাদের খোলসে আবির্ভূত হয়েছে, ল্যাটিন আমেরিকার কাছে তা পুরানো ব্যাপার। এখানে পশ্চিমী শক্তিবর্গের এবং বিশেষ করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শাসকচক্র কখনও আড়াল থেকে, কখনও বা সরাসরিভাবে আধিপত্য করে এসেছে। আধিপত্যটা অভিভাবকের বেশে মুনাফা নিংড়ে নেওয়ার আধিপত্য। ল্যাটিন আমেরিকার জনগণের মুক্তিসনদ দ্বিতীয় হাভানা ঘোষণায় বলা হয়েছে, "দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে ল্যাটিন আমেরিকাতে মার্কিনি পুঁজি এক হাজার কোটি ডলারের সীমানা অতিক্রম করেছে। তাছাড়া ল্যাটিন আমেরিকা সস্তায় কাঁচামাল বিক্রি করছে এবং অতিরিক্ত দাম দিয়ে পণ্য দ্রব্য কিনছে। ল্যাটিন আমেরিকা থেকে তাই অবিশ্রান্তভাবে

অর্থসম্পদ বেরিয়ে যাচ্ছে। প্রত্যেক মিনিটে ৪ হাজার ডলার, প্রত্যেক দিন ৫০ হাজার ডলার, প্রত্যেক বছর ২০০ কোটি ডলার এবং প্রত্যেক পাঁচ বছরের এক হাজার কোটি ডলার করে মুনাফা বেরিয়ে পৌঁছে যাচ্ছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে। এই হচ্ছে সাম্রাজ্যবাদ।" মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীরা তাদের পুঁজি নিয়োগ এবং মুনাফা পাচারের ব্যবস্থাকে পাকাপোক্ত রাখার জন্য ল্যাটিন আমেরিকার দেশীয় কায়েমি স্বার্থবাদীদের সঙ্গে যোগসাজস করে শত শত বছরের জরাজীর্ণ সমাজব্যবস্থাই চাপিয়ে রেখে দিয়েছে বিভিন্ন দেশে। বৃহৎ ভূস্বামী প্রথা বা সামন্তবাদ বজায় থাকার ফলে কৃষকেরা ভূমিদাস বা 'পিয়োন' রয়ে গিয়েছে বিংশ শতাব্দির দ্বিতীয়ার্ধেও। সম্প্রতিও বলিভিয়াতে জমি বিক্রির সময় 'পিয়োন বা গোলাম সমেত জমির গুণ বর্ণনা করে পিয়োন সমেত জমি হস্তান্তরিত করা হয়। তাছাড়া কয়েকটি দেশে ভূস্বামীর কাছ থেকে ক্ষেত বন্দোবস্ত নিতে হলে জমিদারের সমপরিমাণ আয়তনের ক্ষেতে বেগার দিতে হয়। এই প্রথার নাম 'মতা পার মতা'। এই সঙ্গে যুক্ত রয়েছে সাম্রাজ্যবাদের উচ্ছিষ্টভোজী স্থানীয় সামরিক ও বেসামরিক আমলা-পুঁজিপতিদের কাঁচা টাকা কামাবার লালসা। আর এই ত্রিবিধ শোষণ ব্যবস্থাকে বজায় রাখার জন্যই ল্যাটিন আমেরিকাতে জনগণকে রাজনৈতিক ক্ষমতা থেকে বঞ্চিত রাখার ব্যবস্থা চলে এসেছে।

গণভোটের ফলে ল্যাটিন আমেরিকার বিভিন্ন প্রজাতন্ত্রে কোন সাম্যবাদী বিপ্লবীর তো কথাই নেই, কোন উদারপন্থী সৎ বুদ্ধিজীবীও যখন প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়েছেন, তখন উপর্যুক্ত ত্রিবিধ শক্তির চাপ তাঁকে নিষ্ক্রিয় করে দিয়েছে। আড়াল থেকে চাপ দিয়ে ফল না হলে সরাসরি হস্তক্ষেপ করে বিভিন্ন নির্বাচিত প্রেসিডেন্টকে সরানো হয়েছে। সাম্প্রতিক কালের মধ্যে ১৯৫৪ সালে গুয়াতেমালাতে নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট আরবেঞ্জ এবং ১৯৬৪ সালে ব্রাজিলে নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট গুলার্টকে সামরিক চক্র দ্বারা সরিয়ে দেওয়ার দৃষ্টান্ত রয়েছে সকলের সামনে। তাছাড়া ১৯৬৫ সালে জুলিয়ান বোশের নেতৃত্বে যখন ডোমিনিকান প্রজাতন্ত্রে গণ-সরকার কায়েম হতে যাচ্ছে, তখন সেখানে মার্কিন সেনাবাহিনী নামিয়ে দিয়ে পুরানো তল্পীবাহক চক্রকে খাড়া করে রাখার ব্যবস্থা হয়। ল্যাটিন আমেরিকার দেশে দেশে যে লোক-সাধারণ দেড়শত বছর আগে স্পেনিশ সাম্রাজ্যের শৃঙ্খলা ভেঙ্গে বেরিয়ে প্রজাতন্ত্র গড়েছিল, তারা এ অবস্থায় বিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে পৌঁছেও, না পেয়েছে অর্থনৈতিক মুক্তি ও সমৃদ্ধির স্বাদ, না পেয়েছে রাজনৈতিক মুক্তি বা গণতন্ত্রের সাক্ষাৎ। শতাব্দির পর শতাব্দি ধরে দারিদ্র্যপীড়িত ও ঔপনিবেশিক শোষণে জর্জরিত আফ্রো-এশিয়ার জনগণের অবস্থা থেকে তাদের অবস্থা ভিন্ন হবে কি করে? এই অবস্থা থেকে মুক্তির পরিপ্রেক্ষিতে ভিন্ন হবে কি করে?

আফ্রিকা, এশিয়া এবং ল্যাটিন আমেরিকার জনগণের মুক্তি সংগ্রামের সামগ্রিক কর্মসূচি একত্রিত হয়েছে এই কারণেই। ল্যাটিন আমেরিকার সংগ্রামী পরিচয় আজ আর চাপা থাকতে পারে না, পারছে না, পারবে না।

ল্যাটিন আমেরিকা আমাদের খুব কাছে এসে গিয়েছে আরও একটি সূত্রে। এসূত্র হচ্ছে এক অমিততেজা বিপ্লবীর আমৃত্যু সংগ্রাম-সাধনা। বিপ্লবীর নাম চে গুয়েভারা।

বিশেষভাবে কিউবার বিপ্লবের সঙ্গে জড়িত হয়ে সামনে এলেও, কিউবার সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র ল্যাটিন আমেরিকার জনগণের মুক্তিসংগ্রামের প্রতিভূ হিসেবে চে গুয়েভারা

শুধু আফ্রো-এশিয়ার নয়, সারা বিশ্বেরই গণচিত্তে জায়গা করে নিয়েছেন। ল্যাটিন আমেরিকার মূল দক্ষিণাংশের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত বলিভিয়াতে মার্কিনি-তাঁবেদার শাসকচক্রের বিরুদ্ধে গ্রামাঞ্চল থেকে সশস্ত্র অভিযান চালাবার সময় ১৯৬৭ সালের অক্টোবরের আট তারিখে চে গুয়েভারা আহত অবস্থায় বন্দী হন। তাঁবেদার সরকারি সেনাবাহিনীর লোকেরা তাঁকে সেই অবস্থায় গুলি করে হত্যা করে তাঁর লাশ পর্যন্ত গুম করে ফেলে। কিন্তু চে গুয়েভারার সংগ্রাম চাপা পড়া দূরে থাকুক, এক প্রচণ্ড বিস্ফোরণে কাঁপিয়ে দিয়েছে সারা ল্যাটিন আমেরিকাকে তো বটেই, এমনকি খাস যুক্তরাষ্ট্রকেও।

চে গুয়েভারা সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবী কিউবার অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। গণসরকরের মন্ত্রি-সভার সদস্য হিসেবে তিনি কিউবাতে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ভিত্তির স্থাপন করেন। এদিক দিয়ে তাঁর আরও অনেক কাজ বাকী ছিল। কিন্তু ল্যাটিন আমেরিকার অধিকাংশ দেশে এখনও মুক্তিসংগ্রাম সাফল্যে পৌছাতে পারেনি; উনিশ শতকে যে গণতান্ত্রিক আশা আকাঙ্ক্ষা নিয়ে প্রজাতন্ত্র স্থাপন করেছিল কোটি কোটি শোষিত মানুষ, সেগুলি অপূর্ণ থেকে গিয়েছে; এই চিন্তা চে গুয়েভারাকে ১৯৬৫ সালে টেনে নিয়ে যায় বলিভিয়ায়। ল্যাটিন আমেরকার অসমাপ্ত বিপ্লবকে সমাপ্ত করতে হবে; চূর্ণ করতে হবে মার্কিনি শোষণের কাঠামোকে; এই গুরুদায়িত্ব নিয়ে কিউবার বিপ্লবী নেতৃবৃন্দের কাছ থেকে বিদায় গ্রহণ করেন চে গুয়েভারা, মন্ত্রিত্বের দায়িত্বভার অন্য সাথীকে দিয়ে। চে গুয়েভারার এই মরণপণ অভিযাত্রার মধ্য দিয়ে ল্যাটিন আমেরিকার মুক্তিসংগ্রামের তাগিদ জগজ্জনের কাছে উদঘাটিত হয়েছে।

যে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী চে গুয়েভারাকে হত্যা করিয়েছে, তারা তাঁকে ল্যাটিন আমেরিকার জণগণের জীবনযাত্রা থেকে আলাদা করে নিয়ে বিচ্ছিন্ন চরিত্রের রোমাঞ্চকর আখ্যানের নায়ক হিসেবে চিত্রিত করার চেষ্টা করেছে। এর দুটো উদ্দেশ্য। একটা উদ্দেশ্য, ল্যাটিন আমেরিকার নির্যাতিত নিপীড়িত মানুষের যে অদম্য ও অব্যাহত মুক্তিসংগ্রাম থেকে চে গুয়েভারার উদ্ভব, তাকে চাপা দেওয়া। দ্বিতীয় উদ্দেশ্য, ল্যাটিন আমেরিকাতে যে বিপ্লবী গণতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক মার্কসীয় চিন্তার অবিশ্রান্ত প্রয়োগধারায় চে গুয়েভারা লালিত, তাকে চাপা দেওয়া। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদীদের এ দুটো উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হয়েছে। চে গুয়েভারাকে আফ্রো-এশিয়া এবং ল্যাটিন আমেরিকার লোকসাধারণ আরও ভালভাবে তলিয়ে জানতে চেষ্টা করেছে, গণমুক্তিসংগ্রামের ইতিবৃত্তকে আরও ভালভাবে তলিয়ে বুঝতে চেষ্টা করে। মার্কসীয় সমাজতান্ত্রিক চিন্তাধারা গণমুক্তি ও স্বাধীনতা এবং সার্বভৌমত্বের দিশারী হিসেবে প্রথম মহাযুদ্ধের আগেই ল্যাটিন আমেরিকাতে মেহনতী ও বুদ্ধিজীবী সমাজকে প্রভাবিত করেছিল। আজ তা' কিভাবে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর যুগে ব্যাপক সক্রিয় গণকর্মসূচি ও সংগ্রামের পন্থা নিয়েছে, সে কথাও পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে।

মার্কিন বৃহৎ পুঁজিপতিরা কিউবার বিপ্লবের পরে অশান্ত ল্যাটিন আমেরিকাকে শান্ত করার জন্য তাঁবেদার শাসকদের নিয়ে দশবছরের একটা বিশাল খয়রাতি ব্যবস্থার পত্তন করে। এর নাম 'অগ্রগতির জন্য মৈত্রী' বা 'এলায়েন্স ফর প্রগ্রেস।' এ সময়ে মার্কিন শাসকচক্র অন্যত্র যে খয়রাতি বরাদ্দ করে, অগ্রগতির মৈত্রীতে তা তুলনার দ্বিগুণ অর্থ বরাদ্দ করা হয়। রাতারাতি জনসাধারণের জীবনযাপনের মানবৃদ্ধির অসংখ্য প্রকল্প তৈরি

হয়। এদের মধ্যে গরিবদের জন্য ঘর তৈরি করে দেওয়ার ঢালাও বরাদ্দের উল্লেখ করা যেতে পারে। কিন্তু ১৯৬৫ সালে মার্কিনি শাসন কর্তাদের নিজেদেরই স্বীকার করতে হয়েছে যে ল্যাটিন আমেরিকার জনগণের জীবনযাত্রার মান একতিল বাড়েনি। প্রখ্যাত মার্কিনি সাংবাদিকদের কলমে বেরিয়ে এসেছে হাহুতাশ। মার্কিনি কোটিপতিরা এবং তাদের তাঁবেদার চক্রগুলি এজন্য দায়ী করেছে ল্যাটিন আমেরিকার জনগণের তথাকথিত জনচরিত্রকে। ল্যাটিন আমেরিকার মানুষ নাকি কোন গঠনমূলক প্রচেষ্টার উপযুক্ত নয়, এখানে অর্থনীতির নিয়মকানুন অচল, ইত্যাদি বক্তব্য বেরিয়ে এসেছে ব্যর্থতার কৈফিয়ত হিসাবে।

ল্যাটিন আমেরিকার বাসিন্দারা প্রধানত সাম্রাজ্যবাদী মুনাফার যোগানদার হওয়ার দরুণই যে দারিদ্র্যের পাঁক থেকে বেরিয়ে আসতে পারছেনা, সেকথা চাপা দেওয়ার এটা একটা আক্রোশমূলক সাফাই ছাড়া আর কিছু নয়। যে অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক শোষণ ও শাসন জনগণের দারিদ্র্যের জন্য দায়ী, তার গায়ে কোনোরকমভাবে হাত না দিয়ে তাকে আরো বেশি শক্ত ও পোক্ত করার পথই মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীরা নিয়েছে। এই পথে যা ঢালা হয়, তার থেকে বেশি বার করে নেয়া হয়, এটাই নিয়ম। ভিতরে যদিবা কিছু থেকে যায়, তাতে মুষ্টিমেয়ের ধনস্ফীতিই সম্ভব। ঢাক ঢোল বাজিয়ে মার্কিনি খয়রাতি কিংবা পুঁজি খাটাবার ব্যাপারে অংশীদারিরও এই পরিণামই হয়েছে। দেখা গেছে, স্থানীয় পুঁজিপতিরা মাঝে মাঝে পশ্চিম ইউরোপের ধনপতিদের কাছে যাতায়াত করে নিজেদের দর বাড়িয়ে নিয়েছে; মুনাফার বখরা নিয়ে মাঝে মাঝে এদের মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্ব দেখা দিয়েছে। জনগণ যে তিমিরে ছিল, সে তিমিরেই থেকেছে। সুতরাং জনগণের মুক্তির পথ হচ্ছে ত্রিবিধ শোষণের কাঠামোকে ভেঙ্গে বেরিয়ে আসার পথ। কিউবা এই পথেই জনগণের শতাব্দি সঞ্চিত আশা আকাঙ্ক্ষা পুরণের ব্যবস্থা করেছে। ল্যাটিন আমেরিকার অন্যান্য দেশেও জনগণ এই পথেই এগিয়ে আসছে।

মুক্তির পথ অবশ্য দুর্গম সন্দেহ নেই। হাইতি, পানামা প্রভৃতি অধিকাংশ হচ্ছে ছোট ছোট দেশ। এদের আয়তন এবং জনসংখ্যার তুলনায় বিশাল শিল্পসমৃদ্ধ ও অস্ত্রবাহী এবং অর্থশালী মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের শক্তি জগদ্দল পাথর। ল্যাটিন আমেরিকার ছোট বড় সমস্ত দেশের জনগণের মিলিত হবার পথেও সাম্রাজ্যবাদীরা বহু প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে রেখেছে। বিভিন্ন প্রতিরক্ষা চুক্তি মারফত সাম্রাজ্যবাদীরা ল্যাটিন আমেরিকার বিভিন্ন দেশের সেনাবাহিনীকে হাত করে রেখেছে। গণবিক্ষোভ গুলিকে প্রায় ক্ষেত্রে ছত্রভঙ্গ করে দিচ্ছে তারাই। কারাগার হচ্ছে স্বাধীনতাকামীদের প্রধান আস্তানা। সাধারণ বাঁচার দাবিতে সংগ্রামে অংশ নেওয়ার দায়ে নারীদেরও রেহাই দেওয়া হয় না সেখানে। গত দশকে প্যারাগুয়েতে মহিলানেত্রী গিলবার্টা ভের্দুন ন'বছর জেলে থাকার পরেও স্বগৃহে আটক থাকেন। অধিকাংশ দেশেই প্রগতিবাদীদের পক্ষে খোলাখুলি রাজনৈতিক কাজ সম্ভব নয়। ১৯৭০ সালেও পৌঁছে দেখা যায়, ল্যাটিন আমেরিকাতে কিউবা ছাড়া মাত্র চারটি দেশে কমিউনিস্ট পার্টির উপর নিষেধাজ্ঞা নেই। এই চারটি দেশ হচ্ছে উরুগুয়ে, চিলি, ভেনিজুয়েলা এবং পেরু। আর সর্বত্রই কমিউনিস্টসহ সমস্ত প্রগতিবাদীকে গোপনসংস্থা হিসেবে কাজ করতে হয়। ব্রাজিলের মতো অধিকাংশ দেশেরই অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে এমনভাবে প্রধানত মার্কিনি এবং

সাধারণভাবে অন্যান্য পশ্চিমী সাম্রাজ্যবাদীদের স্বার্থে ঢালাই করা হয়েছে যে, আনুষ্ঠানিকভাবে রাজনৈতিক সার্বভৌমত্ব ঘোষণা করা যদিবা সম্ভব, অর্থনৈতিক শৃঙ্খলা ছিন্ন করতে যাওয়া মরণপণ ঝুঁকি। এখানে কিউবার অবস্থা যা' করে রাখা হয়েছিল, তার দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে। মার্কিনি চিনিওয়ালারা কিউবার অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে আখ-উৎপাদনকারী হিসেবে গড়ে তুলেছিল। কোন বিকল্প শিল্প বা ফসলের ব্যবস্থা তারা করেনি। এই কারণেই মার্কিনি কব্জা থেকে মুক্ত হওয়ার পর কিউবাকে অত্যন্ত সঙ্গীন অর্থনৈতিক বিপদের সম্মুখীন হতে হয়েছে। জাতীয়করণের নীতিতে বিরাট ঝুঁকি নিতে হয়েছে। কিউবার সাহসী বিপ্লবী নেতৃত্বকেও বেগ পেতে হয়েছে। সমাজতন্ত্রী দেশসমূহের তরফ থেকে প্রসারিত বন্ধুত্ব ও সহযোগিতার হাত বিপ্লবী কিউবাকে এই সংকট কাটিয়ে উঠতে সাহায্য করেছে। সাম্রাজ্যবাদীদের উচ্ছিষ্টভোগীরা বিপ্লবের প্রাথমিক দিনবদলের সময় জনগণের মনে বিভ্রান্তি সৃষ্টির প্রয়াস করেছিল আর্থিক অসুবিধার কথা তুলে।

ল্যাটিন আমেরিকার বিভিন্ন দেশে প্রগতিবাদীরা যখন সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে সমস্ত রকম সম্পর্কচ্ছেদের কথা বলেছেন, তখন সম্ভাব্য অর্থনৈতিক অসুবিধা সৃষ্টির কথা তুলে জনমনে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করার লোকের অভাব হয়নি। উদারপন্থী কোনো প্রগতিবাদী নেতা সরকার-গঠন করার সঙ্গে সঙ্গেই সাম্রাজ্যবাদীদের অনুচররা অর্থনৈতিক অবরোধ অথবা অচলাবস্থা সৃষ্টি করে তাঁকে 'কাজের লোক নয়' প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করেছে। সোভিয়েট ইউনিয়ন, গণচীন এবং অন্যান্য সমাজতন্ত্রী দেশের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করতেও দেওয়া হয়নি।

এই পটভূমিতে মুক্তিসংগ্রামের পদ্ধতি নির্ণয়ের বিষয়টি এখানে প্রণিধানযোগ্য। ল্যাটিন আমেরিকার বিভিন্ন দেশের মুক্তিসংগ্রামের পদ্ধতির মধ্যে একদিকে যেমন মূলগত ঐক্য রয়েছে, তেমনি কিছু কিছু তারতম্যও ঘটেছে।

সংগ্রামের মূল ধারাটি সমস্ত দেশে মোটামুটি একভাবে পরিণতি লাভ করেছে। এই মূল ধারাটি কি? জবাব হবে, জাতীয় মুক্তি সংগ্রাম। অধিকাংশ দেশ নামকাওয়াস্তে সার্বভৌম স্বতন্ত্র প্রজাতন্ত্র হলেও এইটেই মূলধারা। শুধু তাই নয়। মহাদেশের জাতীয় গণতান্ত্রিক মুক্তিসংগ্রাম ইতিমধ্যে অনেক ক্ষেত্রেই সামজতন্ত্রকে আবশ্যিক কর্মসূচিতে গ্রহণ করলেও তা' জাতীয় মুক্তিসংগ্রাম নামেই অভিহিত। এর কারণ আগেই বলেছি, প্রধান শত্রু হচ্ছে পশ্চিমী সাম্রাজ্যবাদী শোষকচক্র এবং এদের নাটের সলা হচ্ছে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী রাহুগ্রাস। এই রাহু থেকে মুক্ত হতে না পারলে সামজতান্ত্রিক কর্মসূচির বাস্তবায়ন থেকে যাবে স্বপ্ন। স্পেনের রাজকীয় দখল থেকে যারা মুক্ত হয়েছিল, তাদের আজ মার্কিনি দখল থেকে মুক্ত হবার জন্য দ্বিতীয়বার স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করতে হচ্ছে। সুতরাং এটাই হচ্ছে গণমুক্তি সংগ্রামের মূল ধারা।

এই স্বাধীনতা সংগ্রাম পদ্ধতির ক্ষেত্রে প্রধানত গণবিপ্লবমুখী সশস্ত্র খণ্ড খণ্ড সংগ্রামের মধ্য দিয়েই সমাধান চাইছে, একান্তভাবে প্রয়োজনের তাগিদে। মুক্তিসংগ্রামীদের মধ্যে যে অসহিষ্ণু লোক নেই একথা কেউ বলবেন না। কিন্তু কয়েকজন অসহিষ্ণু বিপ্লবী নেতার তাগিদে মুক্তিসংগ্রাম সশস্ত্র রূপ নিচ্ছে এ কথা বলা যেতে পারে না। মুক্তিসংগ্রামীদের মধ্যে যারা সশস্ত্র পথকে একমাত্র পথ বলে মানেন

না, তাঁরাও একে শেষ পর্যায় বলে নির্দিষ্ট করেছেন। এর কারণ কি? এর কারণও খুব স্পষ্ট। অসম বাণিজ্যিক অর্থনৈতিক সামরিক চুক্তির মাধ্যমে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীরা ল্যাটিন আমেরিকার ব্রাজিলের মতো বড় দেশে তো বটেই, হাইতির মতো ক্ষুদ্রায়তন দ্বীপখণ্ডগুলিতেও চেপে বসে রয়েছে। দারিদ্র্যের পাঁক থেকে বেরিয়ে আসার জন্য অস্থির ল্যাটিন আমেরিকার মেহনতী জনতার অবিশ্রান্ত ধর্মঘট, বিক্ষোভ এবং অসন্তোষকে দাবিয়ে রাখার উদ্দেশ্যে মার্কিন বৃহৎ পুঁজিপতিচক্র খোলাখুলি সৈন্য নামিয়েছে অথবা খোলাখুলিভাবে সামরিক উপদেষ্টা দিয়ে নিতান্ত ছোট ছোট দেশগুলিকেও ছেয়ে ফেলেছে। ল্যাটিন আমেরিকার এই বিশেষ অবস্থাতে জনগণকে অস্ত্রধারণ করতে হয়েছে। জাতীয় মুক্তিসংগ্রাম রূপ নিয়েছে সশস্ত্র গণবিপ্লবের। ল্যাটিন আমেরিকার পাহাড়ে জঙ্গলে সশস্ত্র গেরিলা গণমুক্তিবাহিনী গড়ে উঠেছে সেখানকার অনিবার্য ও অপরিহার্য প্রয়োজনে।

অবশ্য কয়েকটি ঘটনা ঘটেছে যাতে প্রামাণিত হচ্ছে যে, জনগণের সংঘবদ্ধ প্রতিরোধ ও বিক্ষোভেও ফল ফলেছে। কোনো কোনো দেশে নাটকীয় পরিবর্তন ঘটেছে কয়েকটি দিক দিয়ে:

(১) কোনো কোনো দেশে সেনাবাহিনী সাম্রাজ্যবাদের পক্ষে উঠবস করতে অস্বীকার করেছে, (২) কয়েকটি দেশের সরকার মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের ভ্রূকুটি তুচ্ছ করে সমাজতন্ত্রী দেশসমূহের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক প্রসারিত করেছে। (৩) বামপন্থীরা ঐক্যবদ্ধ রাজনৈতিক উদ্যোগে অনেকটা এগিয়েছেন।

সুতরাং একথাও সত্য যে, মুক্তিসংগ্রাম সশস্ত্র হয়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে গণসংহতি সমাবেশের মারফত গণ দাবি ও জনমত ব্যক্ত করার পদ্ধতি পরিত্যক্ত না হয়ে পাশাপাশি প্রসার লাভ করেছে। এর কারণ, সচেতন যৌথ গণশক্তি গড়ে তোলার জন্য জনতার বিভিন্ন স্তরের সংহতি কাজ করে আসছে। যৌথ গণশক্তি মুক্তিসংগ্রামের সুনিশ্চিত সাফল্যের অপরিহার্য শর্ত-স্বরূপ। কিউবাতে সশস্ত্র-সংগ্রাম দ্বারা গণ সরকার কায়েম করার সময় দেখা গেছে এই গণশক্তির সাহায্যে বিপ্লবকে রক্ষা করা সম্ভব হয়েছে। এই সচেতন যৌথ গণশক্তি বিপ্লবী সমাজ চেতনার উৎসে পরিণত। সুতরাং, যে সব খণ্ড খণ্ড বিক্ষোভ সংগ্রাম বস্তুতপক্ষে শান্তিপূর্ণ প্রতিরোধেরই নামান্তর, সেইগুলিও মুক্তিসংগ্রামের আওতায় বাইরে পড়ে থাকেনি এবং থাকছে না। সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের বিরুদ্ধে মানবতার জন্য শান্তির পতাকাতলে অবিশ্রান্ত গণসমাবেশও জাতীয় মুক্তিসংগ্রামের অবিচ্ছেদ্য অংশ। সমস্যার যদি উদ্ভব হয়ে থাকে, তবে সেটা এই যে, সাধারণ ধারার মধ্যে বিভিন্ন সংগ্রাম পদ্ধতির সামাঞ্জস্য বিধান সবক্ষেত্রে সহজসাধ্য হচ্ছেনা। বিপ্লবী সংগ্রামী শক্তির অপচয় যাতে না ঘটতে পারে, সে জন্য সুষ্ঠু সংগ্রামী পদ্ধতির তাগিদ সামনে এনেছেন যারা শুধুমাত্র সশস্ত্র পদ্ধতির প্রবক্তা বলে পরিচিত তাঁরাও। গেরিলা গণযুদ্ধ সম্বন্ধে চে গুয়েভারা যে বই লিখেছেন, তাতে এর প্রমাণ পাওয়া যাবে।

এরই মধ্যে পুয়োর্টো রিকো এবং গুইয়ানা প্রভৃতি দেশকে এই মুহূর্তে এখনও সংগ্রাম করতে হচ্ছে পুরোনো ধরণের বৈদেশিক ঔপনিবেশিক দখলের অবসানের জন্য স্পেনের কাছ থেকে পুয়োর্টো রিকোকে হাতিয়ে নিয়ে যুক্তরাষ্ট্র একে একেবারে

গিলেই বসেছে। কিন্তু প্রায় তিরিশ লক্ষ স্পেনিশ ও আফ্রিকী বংশোদ্ভুত অধিবাসীর এই খুদে দ্বীপদেশটি এ অবস্থাকে মেনে নিতে চায়নি কখনও। পুয়োর্টো রিকো যে একটি প্রচণ্ড বিস্ফোরক, তার প্রমাণও পাওয়া গিয়েছে একাধিকবার। পুয়োর্টো রিকোর মুক্তি-আন্দোলন বা এম,পি,আই, এর পতাকা নিয়ে এই দ্বীপবাসীরা সংগ্রাম চালিয়ে আসছে স্বাধীন স্বতন্ত্র প্রজাতন্ত্র ঘোষণার দাবি নিয়ে। গুইয়ানাতে যে গণমুক্তি আন্দোলন চলছে, তারও আশু লক্ষ্য ঔপনিবেশিকতার গাঁটছড়া কেটে দেওয়া। এ ক্ষেত্রে দখলকারী শক্তি হচ্ছে ব্রিটিশ পুঁজিপতিরা। তারা নানাভাবে বর্ণবিভিদের ফ্যাঁকড়া খাড়া করে চেষ্টা করছে ঔপনিবেশিকতার কাঠামোটাকে ভোল পাল্টে বজায় রাখতে। তারা কালা আদমিদের প্রজাতন্ত্রের সার্বভৌমত্বকে মেনে নেওয়ার চেয়ে বরং সাম্রাজ্যিক প্রতিদ্বন্দ্বী মার্কিনি পুঁজিপতিদের হাতে গুইয়ানাকে তুলে দিতে রাজি। মার্কিন পুঁজিপতিরাও এই তালে তাল দিচ্ছে ব্যাঙ্ক-পুঁজি নিয়োগের স্বার্থে।

এইভাবে বিভিন্ন অবস্থায় ল্যাটিন আমেরিকার বিভিন্ন দেশের জাতীয় মুক্তিসংগ্রামের স্তরগুলিতে তারতম্য রয়ে গিয়েছে। এই বিষয়টিকে আমাদের চোখের সামনে রাখতে হচ্ছে মুক্তিসংগ্রামের বিভিন্ন প্রশ্নকে বুঝবার জন্য। সশস্ত্র সংগ্রামের তত্ত্ব চে গুয়েভারা প্রমুখের বই থেকে সংগ্রহ করতে হবে। এই সব বইতে যে সব নীতিগত বিশ্লেষণ আছে তার দুয়েকটি লাইন তুলে কোনো একটি বক্তব্য পেশ করা দুঃসাধ্য। তবু করতে হবে। এরই পাশাপাশি যৌথ গণশক্তি গড়ে তোলার জন্যে যে সংগ্রাম চলছে, তার কথা অতি সামান্যই জনতে পারা গিয়েছে। এ সম্বন্ধে বক্তব্য তুলে ধরাও সহজ নয়। এই গণসমাবেশগুলি সম্বন্ধে সর্বশেষ খবর এই যে, ১৯৬৯ সালে পেরুর রাজধানী লিমাতে দুটো বিরাট সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে সারা ল্যাটিন আমেরিকার মুক্তি সংগ্রামের ঐক্যের ভিত্তিতে। একটি সম্মেলন হচ্ছে ল্যাটিন আমেরিকার আড়াই কোটি শ্রমিকের প্রতিনিধিদের নিয়ে ট্রেড ইউনিয়ন ঐক্য সম্মেলন। এতে সাম্রাজ্যবাদ সামন্তবাদ ও পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে ব্যাপক ঐক্য গড়ে তোলার কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে। দ্বিতীয় সম্মেলনটি হচ্ছে ল্যাটিন আমেরিকার কৃষক ফেডারেশনের কাউন্সিল অধিবেশন। এই সম্মেলনে চূড়ান্ত ও বিপ্লবী ভূমি সংস্কারের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। এই দুটি শ্রেণি-সমাবেশ মুক্তিসংগ্রামের সফলতা আনায়নে যথাযোগ্য স্থান করে নেবে আশা করা যায়।

মুক্তিধারা

প্রথম প্রকাশ: ফাল্গুন ১৩৯৫, ফেব্রুয়ারি ১৯৮৯

প্রকাশক: মালেকা বেগম, জ্ঞান প্রকাশনী, ১৫ লারমিনি স্ট্রীট, উয়ারি, ঢাকা–১২০৩

প্রচ্ছদপট: কাইয়ূম চৌধুরী

মুদ্রাকর: এম. হক, মডার্ন টাইপ ফাউণ্ডার্স প্রিন্টার্স এন্ড পাবলিশার্স লিমিটেড, ২৪৪ নবাবপুর রোড, ঢাকা–১১০০

মূল্য : পঁয়ত্রিশ টাকা

উৎসর্গ:

সাইদুল হাসান, বিষ্ণু চাটার্জি, মাহবুবুর রহমান খান (সংবাদ), কাজী মোহাম্মদ ইদ্রিস, হীরালাল দাশগুপ্ত, শিবেন মুখার্জি, মনোরমা বসু, সেলিনা বানু, কবি মেহেরুন্নেসা, অনিমা সিংহ, খন্দকার আব্দুল বাকী (টাঙ্গাইল), চিত্রশিল্পী রশিদ চৌধুরী, অজিত কুমার দাশগুপ্ত, ইমাদুল্লাহ, জহুর হোসেন চৌধুরী, ইয়াকুব মিয়া, কামরুন্নাহার লাইলী, আবদুল লতিফ খতিব, শামসুল হক (আওয়ামীলীগ যুব ও ছাত্রনেতা), আমীর হোসেন চৌধুরী, মোহাম্মদ তোয়াহা, অধ্যাপক ড. শামসুজোহা, গুরুদাস তালুকদার, আলতাব আলী প্রমুখের স্মরণে–

যাদের নামোল্লেখের সঙ্গে সঙ্গে বাংলাদেশের ঘরে ও বাইরে জনগণমনে জেগে উঠবে আরও শত সহস্র মুক্তিসংগ্রামীর মৃত্যুহীন মুখছবি

লেখকের আরজি

যে শতাব্দি শেষ হতে চলেছে তার প্রধানত রাজনৈতিক বৈপ্লবিক ধারায় দেশেদেশান্তরে উপচীয়মান জাতীয় আন্তর্জাতিক লোকায়ত মানবিক অভ্যুদয় ও বিন্যাস উপস্থিত বইটির বিষয়বস্তু। আরও নির্দিষ্ট করে বলা যায়, বাংলাদেশের অভ্যুদয় ও বিশ্বপ্রেক্ষা বইটির বিচার্য। মার্কসীয়-লেনিনীয় বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গিকে অনুসরণ করে দুই দশকের ('৭১ থেকে '৮৮) রচিত লেখা স্বভাবতই সূত্রাকারে উপস্থাপিত। বস্তুগত উপাদানের সমাবেশ ঘটেছে এই কারণে। তবে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি এবং নির্দিষ্ট ঐতিহাসিক পরম্পরার বিচার যে মানবীয় মনোজগতকে ওতপ্রোতভাবে সঙ্গে নিয়ে চলে, রাজনৈতিক, সামজিক অর্থনৈতিক বিপ্লব যে চেতনা ও অনুভবের বৈজ্ঞানিক বিন্যাস ছাড়া এগিয়ে যেতে পারে না, এই সত্য সজ্ঞানে লেখাগুলির মধ্যে জায়গা করে নিয়েছে। সাধারণভাবে ছাড়াও এই কারণে এমন দুয়েকটা বিশেষ লেখা এই সংগ্রহের অন্তর্ভূক্ত হয়েছে, যাদের মধ্যে ভর করেছে কাব্যিক উপকরণ। অর্থাৎ ভাবপ্রাধান্য বা মনোপ্রাধান্য। ঐতিহাসিক গণবৈপ্লবিক কর্মকাণ্ড অথবা প্রয়াসকে কিছুটা হৃদয়গ্রাহী করে আজকের সংবেদনশীল প্রজন্মের বিবেচনার দরবারে হাজির করার উদ্দেশ্যেই এটা করা হয়েছে। ভারী কিংবা হাল্‌কা বস্তুগত ও মনোগত উভয় ধরনের সূত্র ও সংজ্ঞাই যতটা সিদ্ধান্তমূলক, তার চেয়ে বেশি মালমশলা মূলক। অর্থাৎ উপস্থাপিত বক্তব্য নিয়ে খোলা আলোচনার জন্য দাওয়াত দেয়া হচ্ছে পাঠকপাঠিকাদের। লেখাগুলিকে যেভাবে সাজানো হয়েছে তাতে সময়ের পরম্পরা পাওয়া যাবে। দুটি ক্ষেত্রেই। অর্থাৎ বাংলাদেশের বিপ্লবের সমীক্ষায় এবং সাধারণভাবে জাতীয় ও সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের নিরীক্ষায়। লেখার মধ্যেকার অসম্পূর্ণতা যদি ধরা পড়ে, সেজন্য সন-তারিখকে দায়ী না করে দায়ী করব দূরদৃষ্টির অভাবকে। দূরদৃষ্টির অভাবটাকে দূর করার জন্য আজ উঠেপড়ে ভাবতে হবে স্বদেশে বিশ্বে নতুন জগৎ গড়ার বিপ্লবে নিয়োজিত সবাইকে। দেশেদেশান্তরে দুটি ধারার ধারকবাহক ও ধারাবাহিকারা যে শর্তহীন আত্মসমীক্ষায় ব্রতী হয়েছেন বা হচ্ছেন, তা থেকেই আজ দুরদর্শিতার তাগিদ বড় হয়ে সামনে আসছে। অথবা বলা যায়, এসে গিয়েছে।

আরেকটা কারণে প্রায় ২০ বছর আগে লেখা রাজনৈতিক সামাজিক পরিস্থিতির বিশ্লেষণকে হুবহু উপস্থিত করা হচ্ছে। সেটা এই যে, একটা ধারাবাহিকতার প্রয়োজন বিপ্লবের কর্মকাণ্ডের দিক থেকে অপরিহার্য ও একটা অন্তত মুসাবিদা হাতে পেলে এদিক থেকে সুবিধা হয়। একথাটা চিন্তা করেই '৭১এর বাংলাদেশকে কিংবা '৭১ এর বিশ্ব যেমন দেখেছিলাম, সেভাবেই উপস্থিত করছি। বাংলাদেশকে নিয়ে কয়েকটি লেখা '৭১ এর। সাম্যবাদী প্রত্যয়ের প্রশ্নে, '৭১-এর। তবু মনে হয় ঘটনাধারার দলিল হিসেবেও এরা বাতিল হয়নি। কারণ, গভীরে যাবার চেষ্টা করা হয়েছিল এই দুই গ্রন্থের লেখায়, শুধু সেজন্যেই এদের প্রয়োজন রয়েছে। তাই মালমশলা হিসেবে যদি বিশেষ করে কাজে লাগে তবে বইটির লেখক ধন্য মানবেন। যারা প্রকাশ করছে এবং এজন্য খাটছেন তাদের সবার কাছে কৃতজ্ঞতা রইল।

সেপ্টেম্বর '৮৮ রণেশ দাশগুপ্ত

রহমানের মা ও অন্যান্য

প্রথম প্রকাশ: ৮ ফাল্গুন ১৩৯০, ২১ ফেব্রুয়ারি ১৯৮৪

দ্বিতীয় মুদ্রণ: ফাল্গুন ১৩৯৬, ফেব্রুয়ারি ১৯৯০

প্রকাশক: মফিদুল হক, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী, ৫১ পুরানো পল্টন, ঢাকা–১০০০

প্রচ্ছদ ও সচিত্রকরণ: কাইয়ূম চৌধুরী

মুদ্রক: মুজিবর রহমান, সুবর্ণ মুদ্রায়ণ, ৭৮/২এ রামকৃষ্ণ মিশন রোড, ঢাকা–১২০৩

মূল্য : ত্রিশ টাকা

উৎসর্গ:

অকালে ঝরে যাওয়া রক্ত গোলাপ
স্নেহাস্পদা তরু আহমেদের স্মরণে

সেদিন সকালে ঢাকায়

প্রথম প্রকাশ: ফেব্রুয়ারি, ১৯৮৭

প্রকাশক: কে. এম. ফারুক খান, খান ব্রাদার্স এন্ড কোম্পানি, ৬৭ প্যারীদাস রোড, ঢাকা–১

প্রচ্ছদ শিল্পী: কাজী হাসান হাবিব

মুদ্রাকর: দি ক্রাউন প্রেস, ২ শ্রীশ দাশ লেন, ঢাকা–১

মূল্য : পঁচিশ টাকা মাত্র

উৎসর্গ:

চির জাগরুক প্রগতিবাদী সুহৃদ কবি
সৈয়দ নূরুদ্দীন স্মরণে

ভূমিকা

ষাটের দশকেই দুই পর্যায়ে দৈনিক 'সংবাদ'-এ সম্পাদকীয় বিভাগে থাকার সময় একটি ব্যক্তিগত কলামে লিখেছি। প্রথম পর্যায়ে 'মনে মনে' মধুব্রত নাম দিয়ে এই ধরনের লেখা শুরু করি প্রিয় সুহৃদ কবি ও পঞ্চাশের দশক থেকে প্রগতি লেখক ও পরবর্তী প্রগতিবাদী সংঘ সমিতিতে সদাসক্রিয় সৈয়দ নূরুদ্দীনের 'সংবাদ'-এর ব্যক্তিগত স্তম্ভটিকে অব্যাহত রাখার জন্য। সৈয়দ নূরুদ্দীন পঞ্চাশের দশকের মাঝামাঝি থেকে ষাটের দশকের প্রারম্ভ পর্যন্ত 'সংবাদ'-এর অন্যতম কর্ণধার ছিলেন এবং বিশেষ করে 'মনে মনে' নামে স্তম্ভটিতে লিখতেন। সৈয়দ নূরুদ্দীন একটি আধা সরকারি সংস্থার (কৃষি) দায়িত্ব নেয়ায় 'সংবাদ'-এ নিয়মিতভাবে লেখা বন্ধ করেন। 'মনে মনে' স্তম্ভটির শৈলী অনেকের মতো আমারও খুব পছন্দ ছিল। এই জন্যই সৈয়দ নূরুদ্দীন লেখা বন্ধ করলে আমার পালা শুরু হয় এতে। পরবর্তী পর্যায়ে বাংলাদেশের পরিচিতি যখন নতুন মোড় নেয় তখন স্তম্ভটির নাম পরিবর্তন করি। ৬৯-৭০ সালে বিশিষ্ট প্রকাশক খান ব্রাদার্স এ্যান্ড কোম্পানিকে আমার লেখার 'কাটিংগুলি' একত্রিত করে বইকরে ছাপার জন্য দিয়েছিলাম। মাঝখানে মুক্তিযুদ্ধ হল। স্বাধীন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ গঠিত হল। সৈয়দ নূরুদ্দীন চলে গেলেন। আমার মনে হয়েছিল, আর বই করে দরকার কি? লেখার বান্ডিলটাও চাপা পড়ে গিয়েছিল। সম্প্রতি একে খুঁজে পাওয়া গিয়েছে। খান ব্রাদার্স এ্যান্ড কোম্পানি ছেপে বার করলেন। যাঁর হাত থেকে নিশান নেয়ার মতো শৈলীটি নিয়েছিলাম, তাঁর উদ্দেশ্যে নিবেদিত করছি এই বই।

রণেশ দাশগুপ্ত
২৫-১১-৮৬

সাম্যবাদী উত্থান প্রত্যাশা : আত্মজিজ্ঞাসা

প্রথম প্রকাশ: কলকাতা, এপ্রিল ১৯৯৪
প্রকাশিকা: তপতী বন্দ্যোপাধ্যায়, উত্থক প্রকাশনী, ৪০ মহারাণী ইন্দিরা দেবী রোড, কলকাতা-৭০০০৬০
প্রচ্ছদ: অমিয় ভট্টাচার্য
মুদ্রক: র‍্যাডিক্যাল ইম্প্রেশন, ৪৩ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা ৭০০০০৯
মূল্য : পঁয়ত্রিশ টাকা

উৎসর্গ:

শেষ হয়ে আসা উপস্থিত শতাব্দি জুড়ে একালের সারা পৃথিবীর সঙ্গে সঙ্গে আমাদের উপমহাদেশের এবং বিশেষ করে দুই বাংলার সাম্য স্বাধীনতা জাতীয় মুক্তি সমাজতন্ত্র ও লোকায়ত গণতন্ত্রের জন্যে চলে এসেছে অগ্নিগর্ভ লোকউত্থান। এই জনউত্থানের ঝড় ঝঞ্ঝার মধ্যে কখনো এক পলক অথবা অন্তরঙ্গভাবে কাছে থেকে দেখা নানাভাবে উত্থানের সঙ্গে জড়িত অগণিত বহুদলের প্রদীপ্ত মুখগুলিকে মনে রেখে–

বিভূতিদা (দাশগুপ্ত), ইনুদা (বিমলেন্দু), বীর রাঘব আচারিয়াদা, হরিপদ দে, রাঁচীর প্রতুল মিত্র, ভাই ছুটু (অজিত), দিদি প্রতিভা সেনগুপ্ত, ঢাকার নলীন্দ্র সেন (পদ্মা), সুশীল সরকার, পরিমল চক্রবর্তী, পূর্ণ বসাক, নরেশ গুহ, অমিয়া দত্ত (রবি গুহর দিদি), গোপাল বসাক (ইলেকট্রিক গুড্‌স), মধু ব্যানার্জী, উজ্জ্বলা রক্ষিত রায়, গোলাম কাদের চৌধুরী, এ কে আর আহমদ, নীরদ চট্টোপাধ্যায়, কচি নাগ, প্রদ্যোত সরকার, নাজমা আতাহার, মাহবুবুর রহমান খান (সংবাদ), ৫২'র মোহাম্মদ সুলতান, গোপাল দাস (ঢাকা লন্ড্রী), চট্টগ্রামের ডা. সাফি, কালীপদ চক্রবর্তী, ব্রজেন সেন, কবিয়াল রমেশ শীল, নোয়াখালীর শামসুলগুদা (মীরাট ষড়যন্ত্র), আলী আজম (চটকল), পাটনার বাবর আলী, শাফি আহমদ, আসান শেখ, রাণীগঞ্জের সুকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, কুষ্টিয়ার জমিরউদ্দিন, সেখ রওশন আলী, সিলেটের গোপাল নন্দী, ঢাকা-হুগলীর কায়েম আহমদ (লেখক), ঢাকা নারায়ণগঞ্জের হানিফ খান, রংপুরের জগদীশ দাশগুপ্ত, ময়মনসিংহের কিশোরগঞ্জের ওলি নওয়াজ খান, কুমিল্লা ব্রাহ্মণবাড়িয়ার দেবজ্যোতি বর্মণ, হারাধন বর্মণ (প্রচ্ছদশিল্পী), কলকাতার শিশির গুপ্ত, জ্যোতি দাশগুপ্ত, প্রশান্ত দাশগুপ্ত, নগেন দাশগুপ্ত, বাঁকুড়ার অমর কাননের ধীরুদা (অমিয় চট্টোপাধ্যায়) পুরুলিয়ার আশ্রমমাতা শ্রীযুক্তা লাবণ্যপ্রভা ঘোষ (১৯৯৪ তে ৯৬ চলছে), হুগলীর পাঁচু ভাদুড়ী, দুই বাংলার সুতাকল মজুর সংগঠক নিত্যানন্দ চৌধুরী, রতন সেন, ফরিদউদদাহর (খুলনা), জ্যোতির্ময়ী গাঙ্গুলী (কলকাতা)।

মুখবন্ধ

আমন্ত্রণ ঝরনা তলায় ফুলের মেলায়

বিশেষ করে আমাদের উপমহাদেশের এবং সাধারণভাবে সারা পৃথিবীর পাঁচ মহাদেশেই যুগে যুগে শোষণ পীড়ন দাসত্ব ও আগ্রসণের বিরুদ্ধে ছাড়াছাড়াভাবে সাম্যবাদী লোকউত্থান একালে সাম্য মৈত্রী স্বাধীনতা তথা লোকায়ত গণতন্ত্র, প্রজাতন্ত্র, জাতীয় মুক্তি, সমাজতন্ত্র এবং এদের ভিত্তিতে আন্তর্জাতিকতাকে লক্ষ্য ও আদর্শ করে প্রথমে ১৮৮৯'র ফরাসি বিপ্লব এবং তারপর ১৯১৭'র রুশ সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সুসংহতভাবে উত্তীর্ণ হয়। এই দুই বিপ্লবের ধারা-পরম্পরা দেশ দেশান্তরের পরিস্থিতি, প্রস্তুতি ও উদ্যোগ অনুসারে সাম্যবাদী বিশ্বাসভার লাখো লাখো শহীদের রক্তে-নিষিক্ত ভিত্তি গড়ে তুলেছে। এই লোকউত্থানে পালা ও পালাবদলের ধারার সংঘগত ও ব্যক্তিগত প্রয়াস ও চিন্তা ভাবনার সৃষ্টি ও দৃষ্টি বর্তমান শতাব্দির শেষ হওয়ার মুখে কোথায় এসে দাঁড়িয়েছে, তার একটা সমীক্ষা সুকান্তের ভাষায় "হিসাবের খাতাগুলিতে" গত দুই দশকে রচিত নিবন্ধের সঙ্কলনে রাখছি। মনুষ্যত্ব ও মানবিকতার রসরূপরাগের দিকটিকে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দিকের তুলনায় প্রাধান্য দিয়ে লেখাগুলি তৈরি। অবশ্য মূলাধার, যেমন রাগরঙ্গের তেমনি তত্ত্বের। বিপ্লবী লোকউত্থানই আমাদের এই সমীক্ষায় একদিকে যেমন সাম্যবাদী উত্থান সম্পর্কে দৃঢ় ও সুদূর প্রসারী প্রত্যয়ের

ব্যাপারটাকে গভীর ও বড়মাত্রায় গুরুত্ব দিয়ে উপস্থিত করার চেষ্টা রয়েছে, তেমনি সঙ্গে সঙ্গে আত্মজিজ্ঞাসার তথা আত্মসমালোচনার দিকটাকেও বড় করেই আনা হয়েছে। এর কারণ শতাব্দির শেষের মুখে সমাজতন্ত্রের বিপর্যয়কর পরিস্থিতি। এই বিপর্যয়ও আকস্মিক দুর্ঘটনা নয়। আত্মজিজ্ঞাসার প্রয়োজনও আজই দেখা দিচ্ছে না।

১৯৯৪'এর হিসাবের খাতাগুলি সামনে রেখে দেখা যাবে, দু'শ বছর আগে ফরাসি বিপ্লবে যে জাতীয় গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, সেই লোকরাষ্ট্র শুধু ইউরোপে নয় পৃথিবীর অন্যান্য মহাদেশেও গণপ্রজাতন্ত্র ও সাম্য মৈত্রী স্বাধীনতার আদর্শ এবং মুক্তবুদ্ধির বিদ্রোহী বিপ্লবী জয়বার্তাকে পৌঁছে দিয়ে নিজে ভেঙ্গে পড়েছিল দু'দশক পরেই। ফিরে এসেছিল ফরাসি রাজবংশ ও রাজতন্ত্র ইউরোপের মধ্যযুগীয় রাজতন্ত্রীদের সহায়তা ও সহযোগিতায়। উনিশ শতকের মাঝামাঝি পর্যন্ত এই রাজতন্ত্র অধিষ্ঠিত থাকে। ১৮৪৮ সালে প্যারী নগরীর শ্রমিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে ফিরে আসে প্রজাতন্ত্র। দ্বিতীয় পর্বে রাশিয়ার সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র সারা পৃথিবীতে তার চিন্তাভাবনা ও নির্মাণের ধারার জয়বার্তাকে বিশ্বের কয়েকটি দেশে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা এবং সাধারণভাবে পৃথিবী জুড়ে ফরাসি ধরনের গণপ্রজাতন্ত্র, জাতীয় মুক্তি তথা স্বাধীনতা ও লোকায়ত গণতন্ত্রকে প্রকৃত পক্ষে বর্তমান শতাব্দিতে বিশ্ববিজয়ী হতে সাহায্য করলেও চুয়াত্তর বছরের মাথায় এসে নিজে বিপর্যস্ত হয়ে গেল। আত্মপ্রত্যয়ের মতোই আত্মজিজ্ঞাসার একটা পরম্পরা লক্ষণীয়।

ফরাসি বিপ্লবী প্রজাতন্ত্রের পতনের পরে এর পুনরুত্থানের বিভিন্ন প্রয়াসের মধ্যে আত্মজিজ্ঞাসা একটা বড় ভূমিকা নিয়েছিল। এবং বহুজনের বহুমাত্রার বহুমুখী চিন্তাভাবনা ও উত্তরণের প্রয়াসের মধ্যে থেকে বেরিয়ে এসেছিল সাম্যবাদী সমাজ ও রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার তথা সমাজতন্ত্রের চিন্তাভাবনা ও প্রয়াস কার্ল মার্কস ও এঙ্গেলসের এবং তাদের সাথীদের উদ্যোগে। এই মার্কসীয় সাম্যবাদী লোকউত্থানের ধারক বাহক লেনিন ও তাঁর সাথীরা রাশিয়াতে লোকউত্থানের মাধ্যমে যে সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র স্থাপন করেন তার সমূহ বিপর্যয় সাম্যবাদী চিন্তাভাবনা ও প্রয়োগের ক্ষেত্রে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব ও নির্মাণের প্রশ্নে আত্মজিজ্ঞাসার যে ধারা, রুশ বিপ্লবের পরে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন পরিস্থিতিতে উত্থাপিত হয়েছে তাকে মার্কসীয় চিন্তা ও প্রয়োগের নূতনতর উত্তরণে নিয়োজিত করতে হবে।

উপর্যুক্ত প্রেক্ষাপটে আমাদের সংকলিত লেখাগুলি ছড়িয়ে ছিটিয়ে গত দুই দশকের কাজ। রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'শেষ সপ্তক' কাব্যগ্রন্থের 'চলো যাই ঝরনাতলায়' পংক্তিটি দিয়ে শুরু করা একটি কবিতাতে ফুলের তোড়া না বেঁধে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন ঝরনাতলায় স্নানের সমাবেশে। তাঁকে অনুসরণ করে এই সংকলনের পাঠক পাঠিকাদের আমন্ত্রণ জানাচ্ছি সাম্যবাদী লোকউত্থানের ঝরনাতলায়।

লেখক কলকাতা ৩.৪.৯৪

কখনো চম্পা কখনো অতসী

প্রথম প্রকাশ: ফেব্রুয়ারি ১৯৯৮, ফাল্গুন ১৪০৪
দ্বিতীয় মুদ্রণ: জুন ২০০০, জ্যৈষ্ঠ ১৪০৭
প্রকাশক: মফিদুল হক, সাহিত্য প্রকাশ, ৫১ পুরানা পল্টন, ঢাকা-১০০০
প্রচ্ছদ: অশোক কর্মকার
হরফ বিন্যাস: কম্পিউটার প্রকাশ, ৫১ পুরানা পল্টন, ঢাকা-১০০০
মুদ্রক: কমলা প্রিন্টার্স, ৬০/এ-১ পুরানা পল্টন, ঢাকা-১০০০
মূল্য : পঞ্চাশ টাকা

প্র থ ম প র্ব

অনুলিখন: সঙ্গীতা বসু মজুমদার

দ্বি তী য় প র্ব

পলাশ ভট্টাচার্য কর্তৃক নেয়া সাক্ষাৎকার

রণেশ দাশগুপ্ত : সংক্ষিপ্ত জীবনপঞ্জি

জন্ম: রণেশ দাশগুপ্তের জন্ম ১৯১২ খ্রিস্টাব্দের ১৫ই জানুয়ারি আসামের ডিব্রুগড়ে।

মা-বাবা: মা ইন্দুপ্রভা (সেন) দাশগুপ্ত; বাবা অপূর্বরত্ন দাশগুপ্ত। তাঁর পিতা অপূর্বরত্ন দাশগুপ্ত ছিলেন নামী ফুটবলার। মোহনবাগান, কুমারটুলি ইত্যাদি নামকরা দলের মতো আর একটি দল 'স্পোর্টিং ইউনিয়ন' ক্লাবের হয়ে তিনি খেলতেন। বিয়ের পর এজি অফিসের চাকরিতে প্রবেশ করেন। সেইসূত্রে নানাস্থানে তাঁকে অবস্থান করতে হয়। মা ইন্দুপ্রভা গৃহিণী কিন্তু বিদুষী। রণেশ দাশগুপ্ত তাঁর গ্রন্থ *উপন্যাসের শিল্পরূপ* তাঁর মাকে উৎসর্গ করেন।

ভাইবোন: চার ভাই, পাঁচ বোনের মধ্যে রণেশ দাশগুপ্ত ছিলেন মা-বাবার দ্বিতীয় সন্তান, কিন্তু প্রথম পুত্র। এই পরিবারের প্রথম সন্তানের নাম প্রতিভা দাশগুপ্ত, ডাকনাম ডলি। রণেশ দাশগুপ্তের অন্য ভাইবোনের কয়েকজন হলেন: শেফালি দাশগুপ্ত (খুকি), প্রবীর দাশগুপ্ত, অজিত দাশগুপ্ত (ছুটু)। রণেশ দাশগুপ্তের ডাকনাম ছিল খোকা।

শৈশব ও শিক্ষারম্ভ: রণেশ দাশগুপ্তের শৈশব কাটে ভারতের পুরুলিয়াতে। পুরুলিয়ায় রামপদ পণ্ডিতের পাঠশালায় রণেশ দাশগুপ্তের হাতেখড়ি হয়। পরে রাঁচি জেলা স্কুল থেকে তিনি ম্যাট্রিক পাস করেন ১৯২৯ খ্রিস্টাব্দে।

কলেজ ও প্রাতিষ্ঠানিকশিক্ষা: ১৯২৯ খ্রিস্টাব্দে বাঁকুড়া খ্রিশ্চিয়ান কলেজে ভর্তি; পরের বছর সেখান থেকে রাজনৈতিক কারণে বহিষ্কার। তারপর কলকাতা সিটি কলেজে ভর্তি। ১৯৩১ খ্রিস্টাব্দে আই. এসসি. পাস। বরিশালে আগমন ও ব্রজমোহন কলেজে ইংরেজি সাহিত্যে অনার্স নিয়ে বি.এ. শ্রেণিতে ভর্তি। বি.এ. পাস না করেই ১৯৩৩ খ্রিস্টাব্দে বরিশাল থেকে ঢাকায় আগমন।

রাজনীতি-সংশ্লিষ্টতা: রাজনীতির সঙ্গে রণেশ দাশগুপ্ত জড়িয়েছিলেন স্কুলজীবনে। তখনই গুপ্ত-সংগঠন 'অনুশীলন'-এর সঙ্গে সম্পৃক্ত হন। বাঁকুড়া খ্রিশ্চিয়ান কলেজ ও কলকাতা সিটি কলেজে এই সম্পৃক্ততা ছিল। বরিশালের ব্রজমোহন কলেজে ইংরেজি সাহিত্যে অনার্স নিয়ে বি. এ. শ্রেণিতে ভর্তি হন রণেশ দাশগুপ্ত, সেখানেও যুক্ত থাকেন

রাজনীতিতে। পরে কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য হন। ১৯৫৮ খ্রিস্টাব্দে কমিউনিস্ট পার্টির প্রার্থী হিসেবে নির্বাচিত হন ঢাকা মিউনিসিপ্যালিটির কমিশনার।

কর্ম: প্রথাগত চাকরির অভিলাষী ছিলেন না তিনি। ১৯৫৮ খ্রিস্টাব্দ থেকে বামপন্থীদের পরিচালিত দৈনিক *সংবাদ*-এ যুক্ত হন। ১৯৭৫-পর্যন্ত এ সংযুক্তি অব্যাহত ছিল। এরপর পশ্চিমবঙ্গ-জীবনে আর কোথাও কর্মসূত্রে সম্পৃক্ত তিনি ছিলেন না।

গুরুত্বপূর্ণ রচনাবলি:

উপন্যাসের শিল্পরূপ (১৯৫৯)
আলজেরিয়ার মুক্তিসংগ্রাম (১৯৬২)
শিল্পীর স্বাধীনতা প্রশ্নে (১৯৬৬)
ল্যাটিন আমেরিকার মুক্তিসংগ্রাম (১৯৭০)
আলো দিয়ে আলো জ্বালা (১৯৭০)
রহমানের মা ও অন্যান্য গল্প (১৯৮৪)
আয়ত দৃষ্টিতে আয়ত রূপ (১৯৮৬)
সেদিন সকালে ঢাকায় (১৯৮৭)
সাজ্জাদ জহীর প্রমুখ (১৯৮৮)
মুক্তিধারা (১৯৮৯)
সাম্যবাদী উত্থান প্রত্যাশা : আত্মজিজ্ঞাসা (১৯৯৪)

নামক গ্রন্থাবলি ছাড়াও কার্ল মার্কসের জীবনী, মাও সে তুঙের 'শত ফুল ফুটতে দাও'-এর অনুবাদ, হেনরি এলেগের *দ্য কোয়েশ্চেন*-এর অনুবাদ, *ফয়েজ আহমদ ফয়েজের কবিতা*-অনুবাদ, *জীবনানন্দ দাশের কাব্যসম্ভার* সম্পাদনা, গোর্কি-মায়াকোভস্কি-নেরুদার কবিতাসংকলন *স্বাধীনতা সাম্য বিপ্লবের কবিতা* এবং অসংখ্য অগ্রন্থিত প্রবন্ধ ও কিছু কবিতা।

মৃত্যু: অকৃতদার রণেশ দাশগুপ্ত ১৯৯৭ খ্রিস্টাব্দের ৪ঠা নভেম্বর, মঙ্গলবার কলকাতার পিজি হাসপাতালে মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর মরদেহ ৫ই নভেম্বর বাংলাদেশে এসে পৌঁছে। পর দিন জাতীয় শহীদ মিনার প্রাঙ্গণে তাঁর মৃতদেহে শ্রদ্ধা জানাতে স্মরণকালের বিশাল জনসমাগম ঘটে। পরে পোস্তাগোলা শ্মশানঘাটে অনুষ্ঠিত হয় তাঁর শেষকৃত্য।